উদ্যত খড়্গ সুভাষ

(তিন খণ্ড একত্রে)

ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

নির্দেশিকা ঃ

উদ্যত খড়্গ (প্রথম খণ্ড) ১

উদ্যত খড়্গ (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৩৯

উদ্যত খড়্গ (শেষ খণ্ড) ২৮৪

উদ্যতখড়্গ সুভাষ

(প্রথম খণ্ড)

এক

উনিশ শো উনিশ সালের পনেরোই সেপ্টেম্বর। কলকাতার তক্তাঘাটে বিশালকায় জাহাজ, সিটি অফ ক্যালকাটা, নোঙর তুলছে। জাহাজের রেলিং ধরে ও কে দাঁড়িয়ে? সে কী, চেন না তাকে? ওই তো বাংলার নবজাগ্রত তারুণ্যের প্রতীক, সুভাষচন্দ্র।

চলেছে কোথায়? বিলেতে। আই.সি.এস. হতে। ছাত্র যেমন ভালো ঠিক উঁচু স্থান নিয়ে বেরিয়ে যাবে দেখো। সে তো খুব ভাগ্যের কথা। কিন্তু এমন সুখের দিনে ওর মুখখানা ম্লান কেন? মোটে তো বাইশ বছর বয়েস, বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে চলে যাচ্ছে কোন দূর-দূরান্তরে, একটু মন কেমন করবে না?

একজন সহযাত্রী সুভাষকে জিজ্ঞেস করলে, 'মুখ এত ভার কেন? কী ভাবছ? মা-বাবা?'

'না।'

'ভাইপো-ভাইঝি?'

'না।'

'তবে কী?'

'জালিয়ানওয়ালাবাগ।'

উনিশ শো উনিশ সালের তেরোই এপ্রিল রবিবার বিকেলে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। সুভাষের বিলেত যাবার প্রায় পাঁচ মাস আগে। আই.সি.এস. পাশ করে ব্রিটিশের গোলামি করার উপযুক্ত পটভূমিই বটে। নিরস্ত্র নিরীহ জনতার উপর প্রায় দশ মিনিট অবিচ্ছিন্ন গুলি চালাল ডায়ার। কম করে সরকারী ভাষ্যে তিনশো উনআশি জন নিহত হল আর আহতের সংখ্যা প্রায় বারো শ। ডায়ার কোনো হুঁশিয়ারি দিলে না, জনতাকে বললে না চলে যেতে, আভাসেও জানতে দিল না তার কী নৃশংস মতলব, তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই সিদ্ধান্ত করে নিল তার করণীয় কী।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে বক্তৃতা করছিল, হংসরাজ, জনতাকে উদ্দেশ করে বললে, 'ভয় পেয়ো না। নির্দোষের উপর ওরা গুলি চালাবে না। তোমরা যে যার জায়গায় চুপ করে বসে থাকো।'

ব্রিটিশের সাধুতায় তার বুঝি তখনো বিশ্বাস ছিল। তাই যখন সত্যি-সত্যি গুলি ছোঁড়া শুরু হল তখনো একবার বলেছিল হংসরাজ : 'ও সব ফাঁকা আওয়াজ। তোমরা উঠো না। নিরস্ত্রদের ওরা মারবে না।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শোনা গেল ডায়ারের গর্জন : 'গুলি উঁচুতে ছুঁড়ছ কেন, নিচের দিকে ছোঁড়ো। নইলে তোমাদের কেন এনেছি?'

যারা গুলি ছুঁড়ছিল তাদের মধ্যে কিছু ভারতীয় সৈন্যও ছিল বোধহয়। হংসরাজ একটা শাদা রুমালও নেড়েছিল। আমরা নিরস্ত্র। আমরা নিরুপদ্রব।

গুলি ছোঁড়ো। নিচের দিকে, সিধে, মুখোমুখি ছোঁড়ো। মানুষ লক্ষ্য করে ছোঁড়ো। যেন একটা লোকও না পালাতে পারে।

তুমি গিয়ে কী দেখলে? জিজ্ঞেস করা হল ডায়ারকে।

গিয়ে দেখলাম মার্শাল ল অমান্য করা হয়েছে। আমার আদেশ লঙ্ঘন করে সভা করা হয়েছে। দেখেই আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম। তা জলের মত তরল, আলোর মত পরিষ্কার।

কী কর্তব্য?

গুলি করা। গুলি করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া।

হাণ্টার কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়েছে ডায়ার। স্বয়ং লর্ড হাণ্টার প্রশ্ন করলে : 'তা হলে গুলি করার উদ্দেশ্য ছিল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা ভেঙে যেতে শুরু করল?'

'সঙ্গে-সঙ্গেই!

'তবুও, তার 'পরেও গুলি চালালে?'

'চালালাম।'

'জনতা যখন ছত্রখানই হয়ে গেল, তখন গুলি চালানো বন্ধ করলে না কেন?'

'আমি মনে করলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না জনতা একেবারে সরে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত গুলি চালিয়ে যাওয়াই আমার কর্তব্য। অল্প চালানো অর্থহীন। অল্প চালালে আশানুরূপ ফল হত না।'

'কতক্ষণ চালিয়েছিলে?'

'প্রায় দশ মিনিট।'

'কত রাউণ্ড?'

'ষোল শো পঞ্চাশ রাউণ্ড।'

'জনতা নিরস্ত্র ছিল?'

'সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।' ডায়ার একটা ঢোঁকও গিলল না।

'সামান্য একটা লাঠিও কারু হাতে ছিল না?'

'বোধহয় ছিল না।'

'বেশীক্ষণ গুলি না চালালে জনতা সরে যাবে না এ ধারণা তোমার হল কিসে? অল্পক্ষণ চালাবার পরই জনতা সরে যাচ্ছিল—'

'প্রশ্নটা শুধু জনতার সরে যাওয়াই নয়।' ডায়ার এবার বুঝি তার স্বরূপের আচ্ছাদন তুলল : 'শুধু সরে যাওয়াই যদি প্রশ্ন হত তা হলে আমি মুখেই আদেশ দিতে পারতাম। সভা ভেঙে দেওয়ার পক্ষে আমার একটা মৌখিক আদেশই তো যথেষ্ট ছিল। প্রশ্নটা তার চেয়ে বেশি।'

'সেটা কী? প্রতিশোধ নেওয়া? আইন অমান্যের প্রতিশোধ? না কি শিক্ষা দেওয়া?'

ডায়ার একবার ভুরু কুঁচকোলো। বললে, 'শিক্ষা দেওয়া বলতে পারেন। যদি শুধু আদেশে জনতা সরে যেত, অল্পক্ষণের জন্যে সরে যেত। আবার আরেক সময় একত্র হত, আমার আদেশকে উপহাস করত। আমি বোকা বনেছি এ দৃশ্য আমার কাছে উপভোগ্য হত না। তাই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করলাম যাতে মাঠে সভা করতে

একটা লোকও না থাকে।'

'সেটা কী ব্যবস্থা?'

'যতক্ষণ লোক ততক্ষণ গুলি। একটা লোক একটা গুলি।'

কলকাতায় ভাসা-ভাসা খবর আসছে। সমস্ত পাঞ্জাবে মার্শাল ল, জঙ্গী আইন জারি হয়েছে, তাই এত চাপাচুপি। কিন্তু মেজদা শরৎচন্দ্রের ঘরে বসে কিছু কিছু শুনেছে সুভাষ। শুনেছে আর স্তব্ধ থেকে স্তব্ধতর হয়েছে।

শুনেছে, ঘেরা একটা মাঠের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ আইন না মেনে প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়েছে। তিন দিকেই তার পার্শ্ববর্তী বাড়ীর দেয়ালের বাধা, শুধু উত্তর দিকে ফাঁকা। আর সেইটেই মাঠে ঢোকবার একমাত্র পথ। সেই পথ জুড়েই দাঁড়িয়েছে খুনের দল। খাঁচার মধ্যে আটকা-পড়া অবোলা পশুর মত লোকগুলো ছুটোছুটি করছে। প্রতিবেশী বাড়িগুলির মধ্যে ঢোকবার মত তিন-চারটে গলিঘুঁজি আছে, দু-তিন হাত করে চওড়া, তারই মুখে লোক গাদি মারছে আর সে গাদিতেই গুলির শিলাবৃষ্টি। লোক বেরুতে পাচ্ছে না, সামনে মৃতদেহের স্তূপ আবার আরেক বাধা। তুমি কোথায় বেরুবে, তুমি শুধু স্তূপকে উচ্চতর করো। অনেকে দেয়াল টপকে পালিয়ে যেতে চাইছে কিন্তু দেয়াল যে অনেক উঁচু, নাগালে আসবে কী করে, কী ধরে উঠবে? কত লোক যে পায়ের তলায় দলিত-মর্দিত হয়ে মরেছে তার লেখাজোখা নেই। যারা মাটিতে শুয়ে পড়ে নিস্তার চেয়েছে তারা দূরের মার থেকে বাঁচলেও কাছের মার থেকে বাঁচে নি। শোয়া লোকটা মৃত না জীবিত খোঁজ করতে কাছে এসেছে সৈন্যরা। যদি বুঝেছে বেঁচে আছে তাহলে রাইফেল নিচু করে তাদের মেরেছে, গুলি চলে গিয়েছে মাটির নীচে। কখনো বা হাঁটু গেড়ে বসে তাক করেছে। সব গুলিই পিঠের উপর।

পিঠের উপর! সুভাষ একবার তার নিগূঢ় মর্মের মাঝখানে চমকে উঠল। পলায়নপর জনতা! একবার সবাই মিলে রুখে দাঁড়াতে পারল না? পারল না ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়তে? ওদের কত সৈন্য ছিল, কত বন্দুক? সকলে মিলে একটা বিরাট পিণ্ডে সংহত হয়ে ওদের দিকে তুমুল শক্তিতে নিক্ষিপ্ত হতে পারত না? হলই বা না নিরস্ত্র, তবু একবার দানা বাঁধতে পারলে মরতে-মরতেও শেষ পর্যন্ত পারত ওদের অভিভূত করতে। পায়ের ধূলো করে ফেলতে। গঙ্গা শিবের জটায় বন্দিনী হয়েই রইল। পারল না প্রবাহিনী হতে।

ডায়ারেরও সেই ভয় ছিল। বলছে : 'জনতা এত নিবিড় ছিল যদি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুটে আসতে পারত আমাদের দিকে, ওদের অস্ত্র থাক বা নাই থাক, আমরা শেষ হয়ে যেতাম। কজন সৈন্য ছিল বা আমার সঙ্গে, কী-ই বা অস্ত্রের পরিমাণ! জনসমুদ্র এক বার ছুটে আসতে পারলে আমরা মুছে যেতাম। তাই আমার সর্বক্ষণ দৃষ্টি ছিল জনতার কোনো অংশই যেন এক স্থির লক্ষ্যে সংহত হতে না পারে। তাই যেখানে-যেখানে ভিড় বেশি হয়ে উঠছিল সেখানে-সেখানেই গুলি চালিয়েছি।'

'তার মানেই একটা গুলিও ফসকায় নি।'

'না, তার সুযোগ ছিল না। একটা গুলি ফসকানো মানেই তো একটা গুলির অপচয়।'

মেজদা শরৎ বুঝতে পারছে সুভাষ বাইরে গম্ভীর থাকলেও ভিতরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তাই তাকে শরৎ ছোট্ট একটা হুঁশিয়ারি দিল। বললে, থাক তোমাকে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি ছাত্র, আর ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা।

হ্যাঁ, তপস্যা, নিয়মস্থিতির আরেক নামই তপস্যা।

তা ছাড়া বাবার ইচ্ছে সে আই. সি. এস. হয়। আই. সি. এস. হয়ে আসতে পারলে সব চেয়ে তিনিই বেশি খুশি হবেন। তাঁকে সুখী করার মত আনন্দ আর কিসে।

কিন্তু এই তো শাসক ইংরেজের চেহারা। এই শাদা সাহেবদের আমিও একজন হয়ে যাব! আমিও হুকুম দেব, গুলি ছোঁড়ো। কালো আদমিদের প্রাণের আবার দাম কী! বড় জোর একটা গুলির দাম।

সাক্ষ্যে প্রতাপ সিং বলছে : '১৩ই এপ্রিল আমরা এমন কোনো ঘোষণা শুনি নি যে জঙ্গী আইন জারি হয়েছে বা সভা নিষিদ্ধ হয়েছে। আমাদের বাজারে কোনো ঘোষণাই এসে পৌঁছয় নি। আমি আমার ছেলে কিরপা সিংকে সঙ্গে নিয়ে বিকেল চারটের সময় জালিয়ানওয়ালাবাগে এলাম। ইচ্ছে ছিল বাবু কানহিয়ালালের বক্তৃতা শুনব। তাঁর বক্তৃতা হবে এমনি প্রচার হয়েছিল বাজারে। কিরপারও সাধ কানহিয়ালালকে দেখবে। কিরপার বয়েস আর কত! ন-দশ বছরের বেশি নয়। কিন্তু আমার স্বপ্ন সেও দেশকে ভালবাসতে শিখুক। মিটিংএ পৌঁছবার কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলাম একটা এরোপ্লেনের শব্দ। মাথার উপর দিয়ে একটা শাদা এরোপ্লেন চক্কর মারল বার কতক। সেটা বুঝি শাদা সাহেবের শক্তি আর দম্ভের প্রতীক। দেখলাম হংসরাজ বক্তৃতা দিতে উঠেছে। একটা উঁচু আসনে সে ডক্টর কিচলুর একটা ফোটো রাখলে, বললে, এই প্রতিকৃতিই আজকের সভার সভাপতি। আর রাউলাট য়্যাক্ট বরবাদ করা হোক এটাই এ সভার প্রধান সিদ্ধান্ত। তারপরে, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই, যেমন ধুলোর ঝড় ওঠে তেমনি গুলির ঝড় ছুটল। আর বাপুজি, আমার ছেলে, আমার কিরপা—আমার কিরপা সিং—দেশপ্রেমই যার শৈশবস্বপ্ন—' কান্নায় দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল প্রতাপ সিং।

ধ্বংসলীলার অন্তে, রাত্রে, ডায়ার অমৃতসরের রাস্তায় বেরুল, তার আদেশ কেমন পালিত হয়েছে তা দেখবার জন্যে। রাস্তায় কোথাও একটা মানুষ নেই। এক ফোঁটা আলো নেই। গাছের একটা পাতাও বুঝি নড়ছে না। সমস্ত বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ। দোকান-বাজার পরিত্যক্ত। গৃহহীন যারা পথে শুত তারাও আজ পথহীন।

একটা কান্নার শব্দও শুনতে পাচ্ছি না কেন? ডায়ার কান পাতল। অন্তত একটা আহতের গোঙানি? পুত্রহারা পতিহারাদের বিলাপস্বর? শুনতে পেল আদিগন্ত বিশাল স্তব্ধতা। শাদা এরোপ্লেনটার চলে যাবার পর আকাশের নৈঃশব্দ্য। মৃতের শহর অমৃতসর না, না, অমৃতের শহর অমৃতসর। রক্তের পথ, রক্তের শপথ—রক্তই অক্ষয় অমৃত।

'সরকারী হিসেব যাই বলুক, অন্তত দু হাজার লোক মরেছে, কিংবা তারও বেশি, আর আহতের সংখ্যার কোনো লেখাজোখা নেই।'

'কিন্তু জমায়েত তো হয়েছিল বিশ-পঁচিশ হাজার!'

মনে মনে বুঝি হিসেব করল সুভাষ। শুধু শূন্য? হাজার শূন্য, লক্ষ শূন্য যোগ

করলেও শূন্য? না, কোথাও এক আছে। একজন আছে। যাই বিলেত যাই। আই.সি.এসটা আগে পাস করি। বাবার ভারি ইচ্ছে আই.সি.এস. হই। তাই তো কবে, শৈশবে, মিশনারী স্কুলে আমাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

দুই

কী হল? কী হল? কে পড়ল? কী করে পড়ল? তুমুল কোলাহল উঠল। জল, জল, ডাক্তার—ডাক্তার ডাকো। প্রভাবতী ছুটে এলেন। দেখলেন গেটের সামনে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে, সেখানে ছোটখাটো একটা ভিড়।

সারদা ঝি কেঁদে উঠল: 'সুবি পড়ে গিয়েছে।'

'ছেলে প্রথম স্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছে, এই তো তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দিলুম—তুই কী করছিলি?'

'আমি তো সঙ্গে-সঙ্গেই আসছিলাম,' ক্ষমার অযোগ্য অপরাধীর মত মুখ করল সারদা: 'কিন্তু গাড়ি দেখেই ছেলে ছুট দিল—'

'জানিস দুরন্ত ছেলে, হাতে ধরে এনে গাড়িতে তুলে দিলিনে কেন?

'হাত তো ধরেই রেখেছিলাম কিন্তু গাড়ি দেখেই জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলে—'

'পাঁচ বছরের ছেলেকে তুই ধরে রাখতে পারলিনে?'

'তর সয় না, ছুটেই গাড়িতে উঠতে গেল। পা পিছলে গেল হঠাৎ—'

ততক্ষণে ঘরে আনা হয়েছে সুভাষকে। কাছেই ডাক্তার, চলে এসেছে তড়িঘড়ি। মাথা কেটে গিয়েছে। তা এমন কিছু নয়। ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি। বৈঠকখানায় জানকীনাথ তাঁর আদালতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে নটা, এবার তাঁকে উঠে পড়তে হয়।

হাতে একটা লাল-নীল পেন্সিল, ব্রিফ-নোটটা আবার একবার তলিয়ে দেখছেন এমন সময় ভিতর থেকে সরকার এসে দাঁড়াল। বললে, 'সুবিবাবু পড়ে গিয়েছেন!'

নথি থেকে মাথা তুললেন না জানকীনাথ। বললেন, 'পড়ে গিয়েছেন! ওর না আজ স্কুলে ভর্তি হবার দিন?'

হ্যাঁ, তাই তো যাচ্ছিলেন। গাড়ি দেখে এমন ছুট দিলেন যে পা হড়কে গেল—'

'পাঁচ বছর বয়েস,' নিজের মনেই বলে উঠলেন জানকীনাথ: 'কিন্তু উৎসাহে টগবগ করছে। স্কুলে যেতে অন্য ছেলে কাঁদে আর এ ছেলের দারুণ স্ফূর্তি। তা সারদা কী করছিল? ও হাতে ধরে সুবিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসতে পারে নি?'

'সারদা তো ওর হাত ধরেই রেখেছিল কিন্তু গাড়ি দেখেই হাত ছিনিয়ে নিয়ে ছুট দিলে—'

জানকীনাথ আবার আত্মস্থের মত বললেন, 'দুরন্ত ছেলে! কারুর হাত ধরে চলতে রাজি নয়।' ঘড়ির দিকে তাকাতে গিয়েই বুঝি মুখ তুললেন: 'তা, চোট কি খুব বেশি?'

'হ্যাঁ—না—ডাক্তারবাবু এসে গিয়েছেন। ব্যাণ্ডেজ করছেন।'

'তা ঠিকই করছেন। কিন্তু আমি ভাবছি,' জানকীনাথ উঠি-উঠি করতে লাগলেন। 'স্কুলে যাবার প্রথম দিনেই ছেলেটার বাধা পড়ল। লেখাপড়া কিছু হবে না আর কী।'

'তা কী করে বলা যায়?'

'মানে মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলে যার জন্যে লেখাপড়া করে তা হবে না।' মুখ গম্ভীর করলেন জানকীনাথ: 'সূচনাটা ভালো নয়। আচ্ছা', হঠাৎ উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে উঠলেন: 'চোটটা লেগেছে কোথায়?'

'মাথায়।'

'মাথায়? তা হলে তো কর্মসিদ্ধি। মাথায় বাধা কর্মসিদ্ধির লক্ষণ। স্বামী বিবেকানন্দও ছেলেবেলায় পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিলেন। ফেটে রক্তারক্তি।'

'সুবিবাবুরও তাই।'

'তাই ঠিক বলা যায় না কী হয়!' প্রদীপ্ত মুখে উঠে পড়লেন জানকীনাথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন বিবেকানন্দ সম্পর্কে : ঐ আঘাতে ওর শক্তি বাধা পেয়েছে, নইলে ও জগৎসংসারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারত।

ঘোড়ার গাড়িটা চলে গেল স্কুলের দিকে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, বিছানায় শুয়ে সুভাষ শুনতে পেল সেই মিলিয়ে যাওয়া চাকার শব্দ। কিন্তু তার কান্নার শব্দ কোনো সান্ত্বনায় কোনো আশ্বাসেই শান্ত হতে চাইল না।

সারদা-ঝি পাশে বসে হাওয়া করছে সুভাষকে। কতকটা বা অনুতাপের সুরে বলতে লাগল : 'সবতাতে এমনি দস্যিপনা করতে যাস কেন? ইস্কুল তো তোর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না, আর গাড়ি তো বাড়ির, উড়ে পালাবার নয়। দু চার দশ মিনিট পরে গেলেই বা কী হত!'

'বা, ইস্কুল যে ঠিক দশটার সময় বসে।' ফুঁপিয়ে উঠল সুভাষ।

'তা বসুক না। তোর এক-আধটু দেরি হলে ইস্কুল উঠে যেত না।'

'আমি কিন্তু কাল যাব।'

'কিন্তু গাড়িতে নয়।' সারদা-ঝি গম্ভীর হল।

'গাড়িতে নয় তো কিসে?'

'আমি তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাব। দিন-দিন তুমি যা দুরন্ত হচ্ছ—'

এত কষ্টেও সুভাষের হাসি পেল। বললে, 'কোলে চড়ে বুঝি কেউ ইস্কুলে যায়? এটা সাহেবদের ইস্কুল। তোমাকে ঢুকতেই দেবে না।'

'সে আমি ঠিক ঢুকে পড়ব।'

'তা হলে তোমাকেও ভর্তি করে নেবে।'

স্কুলের নাম প্রোটেস্টান্ট ইউরোপিয়ান স্কুল, সংক্ষেপে পি.ই. স্কুল, পরিচালক ব্যাপটিস্ট মিশন। ইংরেজ আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলে-মেয়েদের জন্যেই এই স্কুল, যদিও কিছু ভারতীয়কে নেবার জন্যে উদারতার দ্বার খোলা আছে। এই স্কুলের প্রতিই জানকীনাথের পক্ষপাত। সব ছেলেমেয়েকেই তিনি এই স্কুল থেকে ঘুরিয়ে এনেছেন। সুভাষও এই পরিবেশের স্পর্শ পেয়ে আসবে তাতে আর বিচিত্র কী।

'ছেলেমেয়েদের ঐ পাদ্রী স্কুলে পড়িয়ে লাভ কী হচ্ছে?' কোনো হিতৈষী আত্মীয় আপত্তি করেছিল একসময় : 'কী শিখছে তারা?'

'ইংরিজি শিখছে।' সরাসরি বলেছিলেন জানকীনাথ।

'দিশি স্কুলে কি ইংরিজি শেখানো হয় না?'

'মিশনারি স্কুলে ভালো শেখানো হয়।'

'ইংরিজি শিখে কী হবে?'

'জগতের সঙ্গে জীবনের তাল রেখে চলে বড় হতে পারবে।'

'ছাই পারবে!' আত্মীয় চটে গিয়েছিলেন, ব্যঙ্গরুক্ষ স্বরে বলেছিলেন, 'ইংরেজে শুধু গোলাম হতে পারবে।'

একটু বোধ হয় হেসেছিলেন জানকীনাথ। বলেছিলেন, 'পরাধীনতার বেদনা বোঝবার জন্যেও ইংরিজি দরকার।'

এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আত্মীয়। কিন্তু তার যুক্তির বাণ তখনো নিঃশেষিত হয় নি। আরো একটা সে নিক্ষেপ করলে। বললে, 'ঐ স্কুলে তো বাইবেল পড়ায়।'

'ভালোই করে।'

'বাঙালি ছেলে তার নিজের ধর্মগ্রন্থ গীতা-উপনিষৎ না পড়ে বিদেশী বাইবেল পড়বে?'

'তোমার দিশি স্কুলে গীতা-উপনিষৎ চালু করতে বলো না। সে তো ভালোই হবে। জ্ঞানের আলো যত পথ দিয়ে আসতে চায় আসতে দাও। জানলা বন্ধ করে দিও না।'

আত্মীয় বুঝল তর্ক করা বৃথা। রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু, কটকের সরকারী উকিল, একাধারে গর্ভনমেন্ট প্লিডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, সরকারি খেতাবে অলঙ্কৃত, তার কাছে বুঝি স্বদেশী মনোভাব আশা করাই বিড়ম্বনা। সে ছেলেমেয়েদের ইংরেজি স্কুলে, পাদ্রীর স্কুলে পাঠাবে এটাই স্বাভাবিক।

আত্মীয় চলে যাচ্ছিল জানকীনাথ ডাকলেন। বললেন, 'ঐ স্কুলে আরো কটা জিনিস বেশি শিখবে।'

'বেশি শিখবে?'

'হ্যাঁ, বেশি শিখবে, যে সমস্ত বিষয় তোমাদের দিশি স্কুলে স্পষ্টাস্পষ্টি শেখানো হয় না। কিংবা যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তোমাদের দিশি স্কুল শিথিল, অমনোযোগী।'

'যথা?'

'যথা সময়নিষ্ঠা, পাঙ্‌চুয়ালিটি! শৃঙ্খলানিষ্ঠা, ডিসিপ্লিন। আচরণ, কণ্ডাক্ট। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিটনেস। কী বলো এ সব বস্তু শিক্ষণীয় নয়?'

আত্মীয় চুপ করে গেল। এবার তার আর নিষ্ক্রান্ত হওয়া ছাড়া পথ নেই। সাত-সাত বৎসর, ১৯০২ থেকে ১৯০৮, এই পাদ্রী স্কুলে অতিবাহিত করল সুভাষ।

প্রথম-প্রথম তার স্ফূর্তি দেখে কে। প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষায়ই সে প্রথম হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসমান দৃষ্টির সে অধিকারী—নতুন একটা প্রাণের জগতে আলোর জগতে সঙ্গীতের জগতে সে এসে পড়েছে—আনন্দে-সুগন্ধে সে ভরপুর। কিন্তু দিনে-দিনে ক্রমে-ক্রমে তার মনের মধ্যে জ্বালা জমতে লাগল, ভারতীয়ের প্রতি ইংরেজের অবজ্ঞার জ্বালা। কেন এমন হয়? যে শুধু শিক্ষক সেও শুধু ইংরেজ বলে নিজেকে কেন উচ্চবর্ণের

বলে মনে করে? একটা হেডমাস্টারের মধ্যেও এই বর্ণকৌলিন্যের মোহ?

হেডমাস্টার মিস্টার ইয়ং। কুড়ি বছর ধরে উড়িষ্যায় আছেন অথচ একটাও ওড়িয়া কথা শেখেন নি। ঘৃণায় শেখেন নি। ভাবখানা এমনি, দেশী ভাষা একটা ভাষা! একমাত্র আমার ভাষা, যেহেতু সেটা শাসকের ভাষা, সেটাই উচ্চ আর তোমার ভাষা, যেহেতু সেটা শাসিতের ভাষা, সেটা উচ্চারণেরও অযোগ্য।

আতরের ঘরে থাকলে আতরের গন্ধ একটু-আধটু গায়ে লেগে যায়, কিন্তু এ কেমনতরো পাষাণ যে এতটুকু একটু ভাষার সৌরভও সে কুড়িয়ে নেবে না? ঔদাসীন্যের পাষাণ নয়, ঘৃণার পাষাণ। ঔদাসিন্যও বুঝি অলক্ষ্যে কিছু নিয়ে নেয়, শুধু ঘৃণাই সজ্ঞানে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

চাপরাশি পেপারওয়েটটা ইয়ং-এর টেবলের উপর না রেখে ভুলে তাকের উপর রেখেছে। দেখেই তো ইয়ংএর রক্ত মাথায় চড়ল। কোনো কাজের এতটুকু বিশৃঙ্খলা সে সহ্য করতে পারে না। জোরে বেল বাজাতে লাগল। বেলের তর্জনেই প্রকট হল সাহেব দুর্দান্ত চটেছে। ত্বরিত পায়ে ঘরে ঢুকল চাপরাশি। ওটা ওখানে রাখো নি কেন? তাকের উপর পেপারওয়েটের দিকে আঙুল দেখাল ইয়ং। ওটার জায়গা ওইখানে? পাজী হতচ্ছাড়া নচ্ছার—

কিন্তু দেশী ভাষায়, চাপরাশির বোধগম্য ভাষায় গালাগাল দেয় ইয়ংএর এমন সাধ্য নেই। ভাষা শেখে নি বলে প্রাণভরে গালাগাল দেবার সুখভোগ তার অদৃষ্টে জুটল না।

শুধু কটমট করে তাকাল চাপরাশির দিকে। পেপারওয়েটটা কুড়িয়ে নিয়ে গায়ের উপর ছুঁড়ে মারবার ভঙ্গি করল। চাপরাশি মুখ টিপে হাসে। ইয়ং তখন ইংরেজিতে বিসুবিয়স ছোটাল। একটা ফুলকিও চাপরাশির গায়ে লাগল না।

তবে তার স্ত্রী মিসেস ইয়ং ওরকম নিরেট নয়। মোটামুটি গুটিকয়েক কথা বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। পত্রবাহক ইয়ংএর কাছে কোন এক ভদ্রলোকের চিঠি নিয়ে এসেছে। তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলা দরকার। চিঠির জবাব ইয়ং ওরই হাত দিয়ে পাঠাতে চায়।

দাঁড়াও! বোসো। একটু অপেক্ষা করো। এ সব কথার দেশী প্রতিশব্দ কী! কী বললে পত্রবাহক সহজে ও সম্পূর্ণ করে বুঝবে তার মনের কথা?

মহা ফাঁপরে পড়ল ইয়ং। ছুটল স্ত্রীর কাছে। বললে তার বিপদের কথা। শিগগির, শিগগির বলো শব্দটা কী।

স্ত্রী শব্দ জুগিয়ে দিলে। তাই বারকতক আবৃত্তি করে মুখস্থ করলে ইয়ং। তারপর পত্রবাহকের কাছে কোনোরকমে কথাটা উগরে দিয়ে রেহাই পেল।

কেন এমন হয়? কেন, প্রতিবেশীর ভাষাটা শ্রদ্ধা ও স্নেহের সঙ্গে শেখা যায় না?

উড়িষ্যায় এত দর্শনীয় জিনিস, পাছে ভাষার সংস্পর্শে আসতে হয়, ভাষা না জানাটা একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই বাইরে কোথাও বেরোয় না ইয়ং। বাড়িতে, স্কুলে, নিজের উচ্চ দাঁড়ে বসেই পুচ্ছ নাচায়। কিন্তু, যাই বলো, একটা হেডমাস্টারের

মত হেডমাস্টার। লোকে যেমন বলে রাজাই রাজ্য, তেমনি হেডমাস্টারই স্কুল। রাজ্য দেখে রাজাকে বোঝো তেমনি স্কুল দেখে বোঝো কে হেডমাস্টার।

সবাই ভয় করে কিন্তু শ্রদ্ধাও করে। স্কুলের বাইরে মনোভাব যাই হোক, স্কুলের মধ্যে তা আন্তরিক। ছাত্রকে শুধু একটি সুগোল ছাত্র বানানো নয়, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে উজ্জ্বল একটা মানুষ করে তোলা। দরকার হয় তো ইয়ং বেত মারতে প্রস্তুত।

ছাত্র হিসেবে অগ্রণী, ইয়ং-এর সুনজরে পড়তে সুভাষের বেগ পেতে হল না। সন্দেহ নেই, ইয়ং-এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে তার চরিত্র সুগঠিত হচ্ছে, তার বিকাশে-প্রকাশে বাবা-দাদারা আনন্দিতই হচ্ছেন, কিন্তু সুভাষের গভীর অন্তরে একটি বিমর্ষতার ছায়া ঘন থেকে ঘনতর হতে লাগল। প্রথম দিকে এসব কিছুই সে বোঝে নি, শুধু একটা নতুনের উত্তেজনায় বিভোর হয়ে ছিল। ক্রমশ বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে সে টের পেল এ গ্লানির পঙ্কিলতা। ইংরেজরা ভারতীয়দের ঘৃণা করে। সমান আসনের অধিকারী বলে মনে করে না।

ইংরেজি রূপকথা শেখায়। দিশি রূপকথার কথা ভাবতেও পারে না। রাজপুত রাজকন্যা রাক্ষস-খোক্কস সব বাজে কথা। তেপান্তরের মাঠ গাঁজাখুরি। আর ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী আষাঢ়ে গল্প। রূপকথা মানেই তো আজব কথা। ইয়ং-এর ঘৃণা আজগুবির জন্যে নয়, আজগুবিটা ভারতীয় বলে। সেই নিরুচ্চার ঘৃণাটা ক্রমশ আরো স্পষ্ট হল। লাগল প্রায় আঘাতের মত।

ভারতীয়রা স্কলারশিপের পরীক্ষায় বসতে পারবে না। এমনিতে ক্লাশে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হলেই স্কলারশিপ পাওয়া যাবে না, স্কলারশিপের পরীক্ষা আলাদা। আর সে পরীক্ষা শুধু য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্যে, ভারতীয়র জন্যে নয়। তার সোজা মানে ভারতীয়রা কোনো স্কলারশিপ পাবে না। ওদের স্কলারশিপের পরীক্ষা দিতে দিলে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা তো নির্ঘাত তলিয়ে যাবে, তাই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের দাবি নিরঙ্কুশ নির্বিঘ্ন করবার জন্যে স্কলারশিপ পরীক্ষার দরজা ভারতীয়দের মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ এ নিয়ে কারুর কোনো দাহ-দুঃখ নেই। এটাই যেন স্বাভাবিক। সাহেবি স্কুল, বৃত্তিও শুধু সাহেবরাই পাবে। কিন্তু ছাত্রে-ছাত্রে ভেদ। মানুষে-মানুষে ভেদ! একই স্কুলে দুই দেশ, দুই নিয়ম। সুভাষের রক্তের গভীরে একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আরো এক ধাক্কা খেল সুভাষ। দেখল ভলান্টিয়র কোরে শুধু য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরাই যোগ দিতে পারছে, ভারতীয়রা নয়। কেন নয়? কাকে জিজ্ঞেস করবে, কে উত্তর দেবে? অভিভাবকদের কাউকে বুঝি একদিন দুঃখের কথাটা বলে ফেলেছিল সুভাষ।

'সাহেব ছেলেরা কেমন সুন্দর বন্দুক কাঁধে করে প্যারেড করছে। আচ্ছা, ঐ প্যারেডে আমাদের কেন নেয় না?'

'থাক। তোমাদের আর বন্দুক কাঁধে নিতে হবে না।' অভিভাবক টিটকিরি দিয়ে উঠেছিল।

'কেন, পারি না নাকি?'

'সাহেবদের তল্পি বইছ, তাই বও, বন্দুক কেন?'

'কিন্তু একই স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে বৈষম্য কেন? যদি সাহেব ছেলেরা বন্দুক পায়, আমরা কেন পাব না?'

'ওরে বাবা, তোমাদের হাতে বন্দুক দিয়ে ওদের ভরসা কোথায়? তোমরা যদি ওদের তাড়াবার জন্যে ওদের উপর গুলি ছোঁড়ো?'

সে সব কথা কে বলছে! আমি বলছি এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়ছি, ছাত্রদের মধ্যে সমান-অধিকার থাকবে না কেন? মাঠেও তেমনি দুই দল—ইউরোপীয়ান আর ইণ্ডিয়ান। যেন ইউরোপীয়ানরাই কৃতকর্মা আর আমরা ভারতীয়েরা অকর্মণ্য। যেন ওরাই ইন্দ্রপ্রতিম আর আমরা ভগ্নদর্প হতপ্রভ। কিন্তু কিছু বলবার নেই, করবার নেই। এই যেন নিয়তিনির্দিষ্ট। বিধাতৃবিহিত।

সাত-সাত বছর পড়ল সেই স্কুলে, সংস্কৃত দূরের কথা, বাংলাও শিখল না। শিখল ইংরিজি, শিখল ল্যাটিন শব্দরূপ। বাংলা সা-রে-গা-মা-র বদলে শিখল ইংরিজি ডো-রে-মি-ফা।

উপায়নিপুণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রক্ষা করলেন। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা, নিয়ম করে দিলেন এবার থেকে ম্যাট্রিকুলেশানে বাংলা অবশ্যপাঠ্য। বাঙালির ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে উঠল। আপন আলো, আরতির আলো। বাঙালি তার জীবন্ত-মাত্র দেহে আত্মাকে খুঁজে পেল। ধুলোর আসন ছেড়ে মানের আসনে উঠে বসল। বাংলা অবশ্যপাঠ্য। এ পর্যন্ত, শুধু ম্যাট্রিক কেন বি-এ পর্যন্ত পাশ করা যেত বাংলা ছাড়া। আর যাবে না। মাতৃভাষার সইবে না আর অনাদর। যেহেতু কটক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত এ নিয়ম সুভাষের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। তাকেও শিখতে হবে সংস্কৃত। শিখতে হবে বাংলা। সুতরাং পাদ্রীর স্কুল ছাড়তে হবে, ঢুকতে হবে অন্য স্কুলে, দিশি স্কুলে। তা নইলে প্রবেশিকাই রুদ্ধ। সুভাষ যেন পিঞ্জরের বাইরে দেখতে পেল আকাশ। অনন্তজীবনপ্রবেশের নির্মুক্তি।

ইয়ং-এর সঙ্গে করমর্দন করল সুভাষ। বললে, 'র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছি।'

না, সুভাষের মনে কোনো গ্লানি নেই, দুঃখও নেই, সে চলেছে আরেক নতুনের দেশে, দুই চোখে তার শুধু এই অতন্দ্র স্বপ্ন! নতুন, নতুন, চিরন্তন নতুন। স্বাধীনতাই নতুনের সম্রাট।

তিন

কাঠজুড়ি নদীর ধারে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল। হেডমাস্টার বেণীমাধব দাস তাঁর অফিস ঘরে বসে আছেন। পরনে প্যান্ট-কোট নয়, ধুতি-পাঞ্জাবি। দিশি স্কুলের ছাত্ররা ধুতি-শার্ট ধুতি-পাঞ্জাবি পরবে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু স্বয়ং হেডমাস্টারও ঐ পোষাকে প্রকাশিত হবে, সুভাষের কাছে এ কেমন অদ্ভুত লাগল। কারা ঘরে ঢুকল দেখে বেণীমাধব চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন বারো-তেরো বছরের একটি জ্যোতিষ্মান ছেলে, পরনে কোট-প্যান্ট, চোখে রোল্ড গোল্ডের চশমা, সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

'বাবু পাঠিয়ে দিলেন।' বললে সেই প্রৌঢ়।

'কে বাবু?'

'জানকীবাবু। রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু।'

একবাক্যে চেনার মত লোক। বেণীমাধব একটু বুঝি চঞ্চল হলেন : 'কেন বলুন তো?'

'এটি ওঁর ছেলে। ষষ্ঠ ছেলে। একে পরীক্ষা করে আপনার স্কুলে ভর্তি করে নিন।'

'বাঃ, ভালো কথা।' বেণীমাধব আরো একটু তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন সুভাষকে। তেজস্বী, শুভ্রভাস্বর মূর্তি, চোখে শুধু পড়বার মত নয়, চোখে লেগে থাকবার মত।

'তোমার নাম কী?' সুভাষকে জিজ্ঞেস করলেন বেণীমাধব।

'শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু।'

'আগে কোন স্কুলে পড়তে?'

'প্রোটেস্টাণ্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে।'

বেণীমাধব চমৎকৃত হলেন। সংক্ষেপে পি.ই. স্কুল বললে না, স্পষ্ট করে সমস্ত নামটা উচ্চারণ করলে। আর উচ্চারণ কী স্পষ্ট, তেজোযুক্ত।

'কোন ক্লাসে ভর্তি হতে চাও?'

'ক্লাস সেভেন-এ।'

'পারবে?' বেণীমাধব চোখ তুললেন।

'পরীক্ষা করে দেখুন।'

'বা, বেশ ভালো কথা।' বেণীমাধব উৎফুল্ল হলেন : 'বীরপুরুষের কথা। পরীক্ষা করে দেখুন। সারা জীবনই পরীক্ষা। তা হলে বোসো। তোমাকে কাগজ-পেন্সিল দিই—'

সুভাষ বসল পরীক্ষা দিতে। বেণীমাধব একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন তার বসবার ভঙ্গি তার লেখবার ভঙ্গি। কেমন ঋজু, ভয়শূন্য।

ক্লাস সেভেন বা ফোর্থ ক্লাসের ঘর। ঘর-ভরতি ছেলে, কোলাহলমুখর। সংস্কৃতের মাস্টার বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ পড়াচ্ছেন। বারান্দায় বেণীমাধবকে দেখা গেল। একটা কুটো পড়ারও শব্দ শোনা যায় চকিতে এমনি স্তব্ধ হয়ে গেল ক্লাস। কথা নয় শব্দ নয়, শুধু উপস্থিতিটাই মন্ত্র। কে জানে শুধু নামটাই একটা দীপ্ত উপস্থিতি। ঐ হেডমাস্টার আসছে—এটুকু বললেই সমস্ত অসৌজন্য মুহূর্তে সংশোধিত হয়ে যাবে, সমস্ত অন্যায় পালিয়ে যাবার পথ খুঁজে পাবে না।

হেডমাস্টারের সঙ্গে সাহেবী পোশাক পরা কে একটা ছেলে। কে রে ছেলেটা? দোরগোড়ায় বেণীমাধবকে দেখেই কাব্যতীর্থ এগিয়ে গেলেন।

'এই ছেলেটি এই ক্লাসে, ক্লাস সেভেন-এ আজ ভর্তি হল।' আর বাড়তি কথা নয়, সুভাষকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে গেলেন বেণীমাধব।

সমস্ত ক্লাস মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সুভাষের দিকে। কে রে ছোঁড়াটা? চিনিস? দেখেছিস কেমন সাহেবি পোশাক ফুটিয়েছে। প্রথম বেঞ্চির ছেলেরা সরে সরে বসে সুভাষকে জায়গা দিল। সুভাষ বসল স্থির হয়ে।

কাব্যতীর্থ চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালেন। শুধালেন, 'তোমার নাম কী হে?'

সুভাষ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু।'

'এর আগে কোন স্কুলে পড়তে?'

'প্রোটেস্টাণ্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে।'

'ওড়িয়া বাজারে সেই মিশনারিদের স্কুলে? তাই বলো না—পি.ই. স্কুল—'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'হেডমাস্টার কে ছিলেন?' কাব্যতীর্থ চশমার ফাঁক দিয়ে আবার চোখ ফেললেন।

'রেভারেণ্ড ইয়ং।'

শুধু ইয়ং নয়, একেবারে রেভারেণ্ড ইয়ং। কাব্যতীর্থ মুখ বাঁকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কী পড়তে সেখানে?'

'ল্যাটিন, ইংলিশ, ইংল্যাণ্ডস হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি আর এরিথমেটিক।'

সুভাষের ইংরিজি উচ্চারণে ক্লাসশুদ্ধু ছেলে হকচকিয়ে গেল। এ ওর মুখের দিকে চেয়ে মুখ বেঁকাল। এ আবার কোন ছিরি!

কাব্যতীর্থও কম রুষ্ট হন নি। একটু রোখা গলায় প্রশ্ন করলেন : 'সংস্কৃত জানো? শব্দরূপ? নরঃ নরৌ নরাঃ? হাঁ করে আছ কী! গৌ গাবৌ গাবঃ—জানো?'

নম্র চোখ নত করল সুভাষ। বললে, 'জানি না।'

'ধাতুরূপ? গচ্ছতি গচ্ছতঃ গচ্ছন্তি—জানো?'

'জানি না।'

'সংস্কৃত কতদূর জানো?' কাব্যতীর্থ মুখিয়ে উঠলেন।

সত্যের মত আরাম নেই। সাহসের মত সুখ নেই। সুভাষ তাই নিষ্কুণ্ঠস্বরে বললে, 'কিছুই জানি না। অক্ষর পরিচয়ও হয় নি।'

ছাত্রের দল শব্দ করে হেসে উঠল। যারা হাসল না তারা পরস্পরের গা টিপল। আর যারা একাকী তারা লম্বা মুখে হতাশার ছবি আঁকলে।

'আর বাংলা?' কাব্যতীর্থ প্রায় ফেটে পড়লেন।

সুভাষ এতটুকু ঘাবড়াল না। বললে, 'বাংলাও ঐ স্কুলে পড়ান হত না।'

'বলো কী! তোমার মাতৃভাষাও তোমাকে পড়ানো হত না?' কপাল চাপড়াবার মতন করে বললেন কাব্যতীর্থ।

'না। তারই জন্যে তো ঐ স্কুল ছেড়ে এই স্কুলে ভর্তি হলাম।' সুভাষ নির্দ্বিধায় বললে, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশানে বাংলাকে অবশ্যপাঠ্য করে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, সংস্কৃতও অবশ্যপাঠ্য। অবশ্যপাঠ্য কথাটার মানে জানো তো?' কাব্যতীর্থ কণ্ঠস্বরে বুঝি একটু বিদ্রূপ মেশালেন।

'বানান জানে কিনা জিজ্ঞেস করুন।' কোণ থেকে কে একটা ছেলে টিটকিরি দিয়ে উঠল। তার কথায় কান দিলেন না কাব্যতীর্থ। সুভাষের দিকেই তেড়ে এলেন: 'অবশ্যপাঠ্য তো বলছ, তা তোমার কী দশা হবে!'

সুভাষ শান্ত মুখে বললে, 'দু একদিনে শিখে নেব।'

হো-হো করে আবার হেসে উঠল ছেলেরা। এর চেয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করব এ বলা সহজ। কিংবা উৎপাটন করব গন্ধমাদন। যার অক্ষর জ্ঞান নেই সে কিনা দু

একদিনেই দিগগজ হবে।

'দু একদিনে শিখে নেব!' কাব্যতীর্থ দস্তুরমত মুখ ভেঙচালেন: 'কী দরকার ছিল এই স্কুলে ভর্তি হবার! সাহেবি স্কুলে গিয়ে সাহেব হয়েছ, সাহেব থাকলেই তো পারতে। মিছিমিছি এই যন্ত্রণা কেন?'

প্রদীপ্ত মুখে সুভাষ বললে, 'বিশ্বাস করুন স্যার, দু একদিনে শিখে নেব।'

এ বিশ্বাস করা মানে পাথরে শস্য বিশ্বাস করার মত কিংবা দিনের বেলা চন্দ্রগ্রহণ। আর যাই হোক, কুশাগ্রের জলে দাবানল নেভানো যায় না।

প্রায় বুড়ো আঙুল দেখালেন কাব্যতীর্থ: 'ছাই শিখবে? কিচ্ছু হবে না তোমার। তোমার লেখাপড়া কিচ্ছু হবে না।'

বোধ হয় তাই। তার কিচ্ছু হবে না। ম্লান বিমর্ষ হয়ে গেল সুভাষ।

মনে পড়ে মিশনারি স্কুলে সুভাষদের ক্লাসে একটা রচনা লিখতে দিয়েছিল: বড় হয়ে কী হবে? সুভাষ লিখেছিল বড় হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হব। দাদাদের কাছে সে শুনেছিল ম্যাজিস্ট্রেট একটা কিছু হওয়ার মত বস্তু। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে কমিশনারও তো কিছু কম নয়। তাই সে লিখেছিল, আগে কিছু দিন কমিশনার থেকে পরে ম্যাজিস্ট্রেট হব। পরীক্ষক শুধু মারতে বাকি রেখেছিলেন। আগে কমিশনার থেকে পরে যদি ম্যাজিস্ট্রেট হয় সেটা তো একটা পতন, অবনতি। সেটা আবার হওয়া কী? সেটা তো পতিত হওয়া। পতিত হওয়া কি হওয়া?

না, বাড়ির আলোচনায় আরো সে শুনেছিল। শুনেছিল সব চেয়ে বড় হওয়া হচ্ছে আই.সি.এস. হওয়া। আবার যে কিনা আই.সি.এস. সে সব কিছু হতে পারে। জজ হতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে, কমিশনার হতে পারে, বসতে পারে হাইকোর্টের বিচারাসনে। সে সর্বগ, সর্বজ্ঞ, সর্বভক্ষ, সর্বকর্তা। সেই সর্বরত্নময় মেরু, সর্বাশ্চর্যময় আকাশ, সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা। সেই সকলের বুকের মণি মাথার মুকুট। সকলজনবল্লভ। বৃক্ষের সেরা অশ্বত্থ, বৃত্তির সেরা ব্রহ্মোত্তর, তীর্থের সেরা কাশী, তেমনি চাকরির সেরা আই.সি.এস.। তার কিচ্ছু হবে না। তার সঙ্গী নেই সাথী নেই কেউ তাকে আপনার বলে মনে করে না। আর এমন সে ভাগ্যহত, খেলাতেও তার রুচি নেই। খেলতে পারলেও সে একটা দাঁড়াবার জায়গা পেত। দলের একজন বলে গণ্য হতে পারত। সেটাও তো একজন হয়ে ওঠা! সে একজন নয়, সে একা জন। বিমর্ষ, অপ্রতিষ্ঠ। সন্দেহ কী, তার কিচ্ছু হবে না। সে কাঠজুরি নদীর ধার ধরে একা একা ঘুরে বেড়াক।

চার

সুভাষ স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু এ তার কী পোশাক! পরনে ধুতি গায়ে পাঞ্জাবি, পায়ে অ্যালবার্ট। হাতে বই-খাতা। বিশুদ্ধ ব্রতধারী। সর্বাঙ্গে মুক্তচ্ছন্দ আনন্দ।

বারান্দায় বাবা জানকীনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জানকীনাথ এগিয়ে এলেন; জিজ্ঞেস করলেন, 'নতুন স্কুলে যাচ্ছ?'

সুভাষ সলজ্জমুখে বিনম্র একটু হাসল।

'কিন্তু এই পোশাক?'

সুভাষ ভয়ে-ভয়ে তাকাল বাবার দিকে! বললে, 'এই পোশাকেই তো ভালো!'

'এতদিন তো প্যান্ট-কোট পরেই স্কুলে যেতে।'

'তখন যে সাহেবদের স্কুলে পড়তাম।'

'আর এখন?'

'এখন আমাদের দিশি স্কুলে পড়ছি, র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে।'

'কিন্তু,' জানকীনাথ দু পা এগিয়ে এলেন: 'সাহেবি পোশাকটা কি ভালো নয়?'

'কিন্তু এ আমাদের জাতীয় পোশাক।' কথায় গর্বের একটু টান দিল সুভাষ।

'আর সব ছেলেরা কী পরে স্কুলে আসে?'

'সবাই এমনিতরো পোশাকে।' সুভাষ সস্নেহে বললে, 'আমি তো ওদেরই একজন।' আমি কেন সাহেবি পোশাক পরে সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকব?'

জানকীনাথ সগর্বে বললেন, 'বেশ, ভালো কথা।'

স্কুলের বারান্দায় হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখা হতেই সুভাষ দু হাত একত্র করে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে নমস্কার করল।

স্নিগ্ধ সৌজন্যে বেণীমাধব নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, 'কাল তোমাকে অন্য পোশাকে দেখেছিলাম না?'

'মিশনারি স্কুলে সাহেবি পোশাক পরে যেতাম বলে কাল প্রথম দিন সেই সাহেবি পোশাক পরেই এসেছিলাম।'

'আজ?'

'দেখলাম সব ছাত্রই জাতীয় পোযাক পরে আসে।' সুভাষ স্বচ্ছ-মুখে বললে, 'ভাবলাম আমি যখন ওদেরই একজন তখন আমারও ওদের মত জাতীয় পোশাক পরে আসা উচিত।'

'উচিত—তোমাকে কে বলে দিল?'

'কেউ বলে দেয় নি। আমি নিজেই অনুভব করেছি।'

'ঠিক অনুভব করেছ।' গরিমা-ভরা প্রসন্ন চোখে তাকালেন বেণীমাধব: 'আমাদের দেশের সংস্কৃতি, আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। কিছুতে তাকে অপদস্থ হতে দেওয়া নয়। আমাদের দেশ আমরা ছাড়া আর কার মুখের দিকে চাইবে? যাও, ক্লাসে যাও।'

কথাগুলি কী সুন্দর! সুভাষের প্রাণে যেন নতুন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহের স্পর্শ লাগল। উনি কবে আমাদের ক্লাস নেবেন? ওঁর কাছে পড়তে পেলে যেন প্রাণের মধ্যে এমনি অনেক উৎসাহের উত্তাপ নেওয়া যেত। আমার হৃদয় এখন এমনি উত্তাপের কাঙাল। কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসে ওঠবার আগে হেডমাস্টারের সান্নিধ্য পাবার সম্ভাবনা নেই। সেকেণ্ড আর ফার্স্ট ক্লাসেই উনি পড়ান, নিচু ক্লাসে নয়। সুভাষের মনে হয় দিন যেমন দ্রুত কাটছে ক্লাসগুলি তত সহজে এগোচ্ছে না।

তোমাদের দেশে তোমাদের পোশাক ভালো হোক, আমাদের দেশে আমাদের পোশাকও সমান ভালো। দরকার হয় তোমাদের পোশাক আমরা পরব কিন্তু অই বলে আমাদের জাতীয় পোশাককে আমরা বর্জন করব না, হেনস্থা করব না। আর তোমাকেও দেব

না আমাদের পোশাক দেখে নাক সিঁটকাতে। তুমি তোমার পোশাকে বোসো আমিও তোমার পাশে আমার পোশাকে বসব—সমান পঙক্তিতে। তুমি তোমার চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে চাও, উঠে যেয়ো, আমি আমার চেয়ার ছাড়ব না। তুমি করমর্দন করতে চাও, হাত বাড়িয়ে দেব, কিন্তু আমি যখন দু হাত তুলে নবস্কার করব তুমিও সে নমস্কার ফিরিয়ে দিও।

আর আমাদের মধ্যে যারা পরানুকরণে অন্ধ হয়ে আছি তারা প্রথম চোখ মেলেই যেন নিজেদের নির্লজ্জতাকে ধিক্কার দিই। ধিক্কার দিই আমাদের দাসমনোভাবকে।

'কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ
ছদ্মবেশে বাড়ে নাকি চতুর্গুণ লাজ॥'

এ তো রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি!

আর প্রভুদের কী কূটকৌশল! পাঠ্য তালিকা এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে মনে-প্রাণে ভারতীয়রা ইংরেজের স্তাবক হয়ে উঠতে পারে। শুধু ইংলণ্ডের ইতিহাস আর ভূগোল পড়, নিজেদেরটা চুলোয় যাক। ভাবখানা এমন, তোমাদের পড়বার মত আছেই বা কী। দিশি নাম ও পদবী বিদেশীভাবে বিকৃত করে দিয়েছে আর সেই বিকৃত উচ্চারণ করতে পেরেই আমরা কৃতার্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায় বাংলায় 'হস্তিমুর্খ' হতে আমাদের আপত্তি নেই, ইংরিজিতে 'ইগ্নোরেন্ট' হলেই লজ্জা।

না, নিজের দেশকে জানো, নিজের দেশকে ভালোবাসো—বেণীমাধব যেন তারই নীরব ও নির্ভীক ঘোষণা। আর, ভালোবাসতে হলে সর্বপ্রথমে যাকে ভালো বাসবে তাকে জানা দরকার। দেশকে না জানলে তাকে ভালোবাসবে কী করে।

স্কুলের বারান্দা দিয়ে যখন হেঁটে যান তখন সমস্ত পরিপার্শ্ব সতর্ক হয়ে ওঠে। কোথাও যেন সামান্য ছন্দচ্যুতি না ঘটে। শ্রী ও শৃঙ্খলার এতটুকু না বিঘ্ন হয়। সর্বত্র একটি মনোযোগ যেন জাগ্রত হয়ে থাকে।

একটি চারুদর্শন ছেলেকে হঠাৎ সেদিন ডাক দিয়ে উঠলেন: 'ওহে চারু, শোনো।'

ছেলেটির নাম চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। র‍্যাভেনশ কলেজের ইংরিজির প্রধান অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে।

চারু কাছে এসে দাঁড়াল।

'তোমাদের ক্লাসে নতুন একটি ছাত্র এসেছে—'

'হ্যাঁ স্যার, সুভাষ—সুভাষ চন্দ্র বসু।'

'খাঁটি ছেলে।'

'হ্যাঁ স্যার, ইংরেজিতে বেশ স্ট্রং।'

'তুমি তো ক্লাসে ফার্স্ট হও।' হেডমাস্টার সস্মিত স্নেহে তাকালেন: 'তোমার এবার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটল।'

'কিন্তু স্যার, সংস্কৃত কিছু জানে না—' চারু এতটুকু ভড়কাল না: 'আর বাংলাতেও কাঁচা।'

বেণীমাধব বললেন, 'শিখে ফেলবে, দেখতে-দেখতে শিখে ফেলবে। যেমন বুদ্ধি তেমনি মেধা। ভেতরে স্থির শিখার সঙ্কল্পের আলো জ্বলছে।'

নিজের ইচ্ছেয়ই পোশাক বদলেছে। কেউ কোনো শাসন-ত্রাসন করে নি। না অভিভাবক, না বা শিক্ষক। নিজের থেকেই বুঝেছে অসাম্য। সকলের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছে। সকলের মধ্যে হতে চেয়েছে একজন।

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করো। কত ছেলে-বয়সে বিলেতে গিয়েছিলেন কিন্তু বিদেশী পোশাক পরেন নি কখনো, ইংরেজদের বিদ্রূপ সত্ত্বেও। বরং মাত্র ষোল বছর বয়সে বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন :

'মা এবার মলে সাহেব হবো,
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে পোড়া নেটিভ নাম ঘোচাবো।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা বাগানে বেড়াতে যাবো,
আবার কালো বদন দেখলে পরে ব্লাকি বলে মুখ ফেরাবো।'

আবার কী বলছেন পরবেশধারী ছদ্মবেশীদের ?

'কে তুমি ফিরিছো পরি প্রভুদের সাজ,
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ?
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমাকেই করিছে না নিত্য অপমান?
বলিছে না, ওরে দীন, যত্নে মোরে ধরো
তোমার চর্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর?
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান
পৃষ্ঠে তব কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে?...
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কি অহঙ্কার
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার।

তার পরে স্মরণ করো দ্বিজেন্দ্রলালকে :

'আমরা ছেড়েছি টিকির আদর
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর
আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পরে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর।
আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি
কিন্তু বিপদেতে দিই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।।'

কিন্তু এ ছেলে কি চম্পট দেবে বলে মনে হয়? বিপদের সম্মুখীন হতে ভয় পাবে? না কি বাহুবীর্যোপজীবী ক্ষত্রিয়ের মত সমস্ত বাধা-বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করে যাবে? দু দিনে শিখে নেব। এ কি শুধু একটা কথার কথা, মৌখিক আস্ফালন? না কি বজ্রগর্ভ আত্মবিশ্বাসের উচ্চারণ?

স্কুল ছুটি হয়ে যাচ্ছে, বেজেছে শেষ ঘণ্টা। ছেলেরা বেরুচ্ছে হুড়মুড় করে। বারান্দায় বেণীমাধব। চারুকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন।

'এবার তোমাদের ক্লাসে বার্ষিক পরীক্ষায় কে ফার্স্ট হল?'

'সুভাষ, স্যার।'

'বলো কী? সংস্কৃতে কত পেয়েছে?'

'একশোর মধ্যে একশো।'

'বলো কী,' বেণীমাধব যত না বিস্মিত তার চেয়ে বেশি গর্বিত হলেন: 'একশোর মধ্যে একশো! আর তুমি?'

সুন্দর মুখে চারু হাসল। বললে, 'নিরানব্বুই।'

দেখা গেল পণ্ডিতমশাই যাচ্ছেন ওদিক দিয়ে। ওঁকে একবার ডাকো তো।

ডাকতেই বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ হেডমাস্টারের কাছে এলেন। বেণীমাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'সুভাষকে সংস্কৃতে একশোর মধ্যে একশো দিলেন?'

বিশ্বনাথ বললে, 'কী আর করব বলুন, একশোর মধ্যে একশো দশ তো আর দেওয়া যায় না।'

পাঁচ

উনিশশো এগারো সালের এগারোই অগাস্ট। দশুই অগাস্ট সুভাষ ক্লাসের ছেলেদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছে: 'উনিশ শো আট সালের এগারোই অগাষ্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল। এটি আমাদের গভীর শোকের দিন। এটি আমরা পালন করব। কী করে পালন করব? আমি বলি উপবাস করে। আমরা কাল ছাত্ররা পুরো দিন অনাহারে থাকব। কি, তোমরা রাজি?'

ছাত্রদল একবাক্যে রাজি।

'এই বাঙলার প্রথম তরুণ যে দেশ-মায়ের মুক্তির জন্যে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছিল। দেখিয়েছিল বাঙালি মরে না, বাঙালি প্রাণ দেয়। পথটাই বড় কথা নয়, প্রাণটাই বড় কথা। ফল বড় কথা নয়, স্বপ্নই বড় কথা, সঙ্কল্পই বড় কথা।' যেন নেতার ব্যক্তিত্ব নিয়ে বলছে সুভাষ, বলছে সেনাপতির সাহস নিয়ে।

'রাজি, আমরা রাজি।' সরবে সমর্থন করল ছেলেরা: 'কাল উনুন জ্বলবে না, হাঁড়ি চড়বে না, আমরা সবাই উপোস করে থাকব।'

ইংরেজের কারসাজিটা একবার দেখ। তার সমস্ত অশান্তির উৎস বাংলাদেশ, বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করো। দু টুকরো হয়ে গেলেই বাঙালির সংহতি শিথিল হয়ে যাবে, নির্বিষ হয়ে যাবে তার ব্রিটিশ-বিরোধিতা। ঢাকায় যদি আরেকটা রাজধানী করা যায়, কলকাতা

ম্লান হয়ে যাবে। আর কলকাতা যদি খর্ব হয় সমস্ত বাঙালিই দুর্বল হয়ে পড়বে। বাঙালি যদি দুর্বল হয় তা হলে ব্রিটিশকে কে হটায়। বাঙালি গেলে ব্রিটিশের অসপত্ন রাজত্ব। শুধু হিন্দুতে-মুসলমানে ভেদ করে ইংরেজের সুখ নেই, এবার বাংলাদেশটাকেই ভাগ করো। পূর্ববঙ্গ যাক আসামের সঙ্গে আর পশ্চিমবঙ্গ বিহারের গলগ্রহ হয়ে থাকুক। বাঙালির ক্ষোভ এবার ক্রোধে ফেটে পড়ল। দেখা দিল সক্রিয় বিপ্লববাদ। উচ্চারিত হল সেই মহামন্ত্র, মাতৃমন্ত্র—বন্দেমাতরম। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, বাংলা ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গের দিন ধার্য হল।

কে আমাদের ভাঙে, কে আমাদের পৃথক করে। বাংলাকে শান্ত করুন, কেন্দ্রীয় আইনসভায় দাঁড়িয়ে বড়লাটকে বলেছিল গোখেল। বড়লাটও বিলেতে গিয়েছিল তদবির করতে। কিন্তু ভারতসচিব মর্লে শুনলে না। বললে, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, প্রস্তাবটা বাঙালির মনঃপূত নয়, কিন্তু কী করা যাবে, যা একবার স্থিরীকৃত হয়েছে তার আর খণ্ডন সম্ভব নয়।

সুরেন্দ্রনাথ হুঙ্কার ছাড়লেন: 'উই শ্যাল আনসেটল দি সেটেলড ফ্যাক্ট। অটলকে আমরা টলিয়ে দেব, ঔদ্ধত্যকে থাকতে দেব না খাড়া হয়ে।'

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে লিখলেন: ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নি তাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করবার জন্যে সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখি-বন্ধনের দিন করে পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বেঁধে দেব। রাখি-বন্ধনের মন্ত্রটি এই, ভাই ভাই এক ঠাঁই। কবি সেই মহামন্ত্র গানে বেঁধে দিলেন :

'বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান॥
বাংলার ঘর বাংলার হাট বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক হে ভগবান॥'

তারপর নিজেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে গান ধরলেন। সঙ্গে সহস্র কণ্ঠের সহযোগে।

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥
আজকে যে তোর কাজ করা চাই
স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই—
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥'

এ গান শেষ হল তো আরো এক গান শুরু হল :

'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—

তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমনি অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান॥
চিরদিন টানবে পিছে চিরদিন রাখবে নীচে
এত বল নাই রে তোমার, রবে না সেই টান॥
শাসনে যতই ঘের' আছে বল দুর্ব্বলেরও
হও না যতই বড়ো আছেন ভগবান॥
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে
বোঝা তোর ভারি হলেই ডুববে তরীখান॥'

বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল। ঠিক হল পূর্ববঙ্গের লেফটেনাণ্ট গভর্নর বমফিল্ড ফুলারকে হত্যা করতে হবে। হেমচন্দ্র কানুনগো আর বারীন ঘোষ ছুটল বোমা নিয়ে। বোমা ছোঁড়া হল না, ফুলার প্রাণের ভয়ে চম্পট দিয়েছে।

ফুলার পালাক, ফ্রেজার আছে, এণ্ড্রু ফ্রেজার, পশ্চিম বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর। বড়লাট কার্জনের কুকীর্তির মন্ত্রী। তিন-তিনবার তাকে হত্যা করবার চেষ্টা হয়েছিল, তিন-তিনবারই চেষ্টা বিফল হল। তারপর ফ্রেজার যখন ট্রেনে করে মেদিনীপুরে সফরে যাচ্ছে ট্রেনের লাইনে বোমা রাখা হল। নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে বোমা ফাটল। বিস্ফোরণে ট্রেনের কয়েকটা কামরা ছিটকে বেরিয়ে গেল লাইন থেকে, প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে গেল লাইনের নিচে, কিন্তু ছোটলাট ফ্রেজারের গায়ে আঁচড়ও লাগল না। ভাগ্য এখনো ইংরেজের বুক-পকেটে।

এবারের লক্ষ্য কিংসফোর্ড। কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। গর্বিত, উদ্ধত, হঠকারী। তেরো বছরের ছেলে সুশীল সেনকে পনেরো ঘা বেত মারবার হুকুম দিলে। সেই তেরো বছরের ছেলের অপরাধ সে এক আস্ত-মস্ত সাহেবকে ঘুষি মেরেছে। সেই সাহেবটা কী করেছিল? বালকের সামনে বালকের মাতৃভূমিকে অপমান করেছিল। সাহেব উলটে এল সাহেবের আদালতে নালিশ করতে। নৃশংস আদেশ। পনেরো ঘা বেত। আর সে-বেত মারা হল প্রকাশ্য আদালতে। কচি ছেলে, সুশীল, বেত খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এ ঘটনা দেখে বা এ ব্যাপার শুনে বাংলাদেশের কোন মানুষ সুশীল হয়ে থাকবে? কার গায়ে এমন মাছের রক্ত যে তপ্ত হবে না? কার হাতের মুষ্টি এমন শিথিল যে সেখানে প্রতিশোধের অস্ত্র উঠবে না উদ্যত হয়ে?

বিপ্লবীদের গুপ্ত আদালত বসল। তিন জজের ট্রাইবুন্যাল। বিচারক শ্রী অরবিন্দ, চারুচন্দ্র দত্ত আর রাজা সুবোধ মল্লিক। বিচারে সম্মিলিত রায় বেরুল—কিংসফোর্ডের মৃত্যুদণ্ড। তার বেতের বেতন। কে এই হুকুমজারির ভার নেবে? ডাকো বারীন ঘোষ আর হেম কানুনগোকে। ফুলার পালিয়েছে কিন্তু কিংসফোর্ড মজুত আছে।

ওদিকে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট আলেন গুলি খেয়েও বেঁচে গিয়েছে। আসছিল কলকাতায়, সিরাজগঞ্জ রেল স্টেশনে বিপ্লবীর গুলি তার পিঠে বিঁধল। আলেন পড়েও মরল না। কিন্তু এবার কিংসফোর্ডের মাথাটা যেন না ফসকায়। হাতে যার এমন দুর্দান্ত বেত, ইংরেজ সরকার তাকে তো প্রমোশন দেবেই। লজ্জায় তো মুখ কালো হবার নয়,

অহঙ্কারে আরো লাল হয়ে উঠল। কিংসফোর্ডকে জেলা-জজ করে মজঃফরপুরে বদলি করে দিল। সরিয়ে দিল কলকাতার খপ্পর থেকে।

কিন্তু 'বেত দিয়ে কি মা ভোলাবি?' না কি দূরে গিয়েই বেত ভোলাবি?

মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের নামে একটা বই পাঠানো হল পার্শেল করে, বইয়ের মধ্যে বোমা। কী না কী বই, পার্শেল খুলল না কিংসফোর্ড। এত চাপরাশি আর্দালি থাকতে জজসাহেব নিজে কি পার্শেল খোলে? খুলতে গেল চাপরাশি। সঙ্গে-সঙ্গেই সর্বনাশ। কিংসফোর্ড দূরেই থেকে গেল।

না, কত দিন দূরে থাকবে? এবার পাঠানো হল দুটি তরুণকে, ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকীকে, সামনাসামনিই তারা মোকাবিলা করবে। দুটি তরুণ, দুটি মৃত্যু-না-মানা মাতৃপূজারী। দুটি নির্বাণ-না-জানা বহ্নিশিখা।

ওদিকে চন্দননগরের মেয়র তার্দিভ্যাল জনসভা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছে। কথাও বলতে দেবে না ওরা? গানও গাইতে দেবে না? শুধু কাঁদতে দেবে? আর সেই কান্না শুনে আহ্লাদ করবে নিজেরা?

'ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি
এবার কঠিন হয়ে থাক না ওরে বক্ষদুয়ার আঁটি।'

তার্দিভ্যালের ঘরে বোমা পড়ল। বোমা ফাটল বটে কিন্তু তার্দিভ্যালকে স্পর্শ করল না। ভাগ্য বর্ম হয়ে ঘিরে রইল তাকে।

এখনো কাল পরিপক্ক হয়নি। দুর্যোগের রাত্রি এখনো আসে নি শেষ যামে। দেখো তোমাদের যেন ভুল না হয়। তোমরা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। উনিশশো আট সালের তিরিশে এপ্রিল। স্টেশন ক্লাবের রাস্তার কাছাকাছি দু বন্ধু, ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল, ঘোরাফেরা করছিল। এই রাস্তা দিয়েই গাড়ি করে কিংসফোর্ড বাড়ি ফিরবে। কিংসফোর্ডের গাড়ি তারা চিনে রেখেছে। রাত সাড়ে আটটা। কতক্ষণের মধ্যেই ক্লাব ভাঙবে। ঐ, ঐ কিংসফোর্ডের গাড়ি। আর কথা নেই। নাগালের মধ্যে এসে পড়তেই দু বন্ধু গাড়ির মধ্যে বোমা ছুঁড়ল। বোমার বিস্ফোরণে শুনতে পেল না গাড়ির ভিতরে দুটি মহিলার আর্তনাদ।

বোমা ছুঁড়েই দু বন্ধু পালাল। রেল-লাইন ধরে হাঁটতে লাগল। কোথায় আহার কোথায় আশ্রয়, এক রাতে দু বন্ধু প্রায় চব্বিশ মাইল হাঁটল! যতক্ষণ না অন্ধকার অতিক্রান্ত হয় ততক্ষণ হাঁটব। যতক্ষণ না সূর্যোদয়ের দেশে গিয়ে পৌঁছুই ততক্ষণ হাঁটব। ভাগ্য কঠিন হয় হোক, প্রতিজ্ঞাও কঠিন।

দুপুরের কাছাকাছি উইনি স্টেশনের কাছে একটা মুড়ির দোকান চোখে পড়ল। ক্ষুদিরাম গেল মুড়ি কিনতে। প্রফুল্ল একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। খানিকটা শুকনো মুড়ি চিবিয়ে এক কণ্ঠ জল খাওয়া না জানি কত বড় সুখ! কিন্তু নিয়তি এক মুঠ শুকনো মুড়িও তাদের অদৃষ্টে রাখে নি।

খুন করে আসামী পালিয়েছে দিকদিবিকে পৌঁছে গিয়েছে এত্তেলা। সমস্ত থানা আর পুলিস ফাঁড়ি সজাগ হয়ে উঠেছে। কোণ-কানাচ খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে কনস্টেবলরা। আর কী কুক্ষণে দুজনে এসে গিয়েছে উইনি স্টেশনের সেই মুড়ির দোকানের কাছাকাছি।

শিওপ্রসাদ সিং আর ফতে সিং। ছেলেটাকে দেখে কেমন সন্দেহ হল। কী রকম উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা! চুল উসকোখুসকো, বেশবাস ম্লান, দু পায়ে ধুলো, যেন কতদূর পথ হেঁটে এসেছে। দুপুরবেলা, আর কিছু জোটে নি, মুড়ি কিনছে। যে মুড়ি কেনে সেই তো সন্দেহভাজন।

হায়, কনস্টেবলরাও দুই বন্ধু। ধরে ফেলল ক্ষুদিরামকে। ক্ষুদিরামের সঙ্গে রিভলভার ছিল, গুলি চালাবার জন্যে উঁচিয়েও ছিল অস্ত্রটা কিন্তু ঘোড়া টেপবার আগেই দুই সিং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রফুল্ল পালাল।

ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসা হল মজঃফরপুরে। চলল তার উপর খরনখর অত্যাচার। কিন্তু মায়ের জন্যে বলিপ্রদত্ত বালক নির্মল, নিশ্চল, নির্বিকার। এক ইঞ্চি টলল না, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না, একটা শব্দ পর্যন্ত বেরুল না মুখের থেকে।

'তোমার সঙ্গে যে ছেলেটা ছিল তার নাম কী?' জিজ্ঞেস করল ইনস্পেকটর।

'দীনেশচন্দ্র রায়।'

'গেল কোথায়?'

'ভগবান জানেন।'

'এবার বলো কে তোমাদের এই কাজের ভার দিয়েছে?'

'কে আবার দেবে? আমরা নিজেরাই কাজে নেমেছি।'

'বোমা পেলে কোত্থেকে?'

'নিজেরাই তৈরী করেছি।'

'রিভলভার?'

'জানি না।'

চলল অত্যাচারের ঝড়। কিন্তু সমস্ত ঝড়ের মধ্যেও সেই বালক একটি প্রশান্ত প্রদীপ। নিষ্পাপ মুখে অমিয়ময় লাবণ্য। নির্ভয়-নিষ্কম্প।

প্রফুল্ল সমস্তিপুরে পৌঁছে কলকাতার গাড়ি নিল। আর সেই ট্রেনে প্রফুল্লর কামরাতেই কিনা সাব-ইনস্পেকটর নন্দলাল ব্যানার্জি চলেছে। ভাগ্য তো ইচ্ছে করলে দুজনকে দু কামরায় তুলতে পারত। কেন তুলল না কে বলবে? ধূর্ত নন্দলাল প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে মজঃফরপুরের গল্প পাড়লে। কানাঘুষো শুনেছে অনেকে কিন্তু এবার বুঝি খাঁটি খবর শোনা যাবে।

'খুন হয়েছে মশাই, জোড়া খুন—'

'জোড়া খুন—সে কী, কী করে?' কে একজন প্যাসেঞ্জার কৌতূহলী হল।

'ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে বোমা ছুঁড়ে মেরেছে।'

'কে-কে মরল?'

'দুটি ইংরেজ মহিলা, মশাই। ব্যারিস্টার কেনেডি সাহেবের স্ত্রী আর মেয়ে—'

কোণ ঘেঁষে বসে ছিল প্রফুল্ল। সেও শুনছিল। হঠাৎ অজানতে সে চমকে উঠল। মুখ দিয়ে অস্ফুট বিস্ময়ে কথা বেরিয়ে এল: 'সে কী? কিংসফোর্ড নয়?'

খুব সূক্ষ্ম কানে নন্দলাল ধরে নিয়েছে কথাটা। কিন্তু ধরে যে নিয়েছে তা প্রফুল্লকে বুঝতে দিল না। দেখল অবসাদে ডুবে গেল ছেলেটা।

আরোহীদের মধ্যে কে আরেকজন বললে, 'নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের কাণ্ড।'

'অ ছাড়া আবার কী। যত সব বাউণ্ডুলে কাণ্ড!' নন্দলাল অচ্ছিল্যে সব উড়িয়ে দিতে চাইল: 'বোমা ফাটিয়ে ইংরেজ তাড়াতে পারবে? দু-চারটে ইংরেজ কমলেই কি তাদের রাজত্ব লুপ্ত হবে? কত তাদের সৈন্যসামন্ত, গোলাবারুদ—'

মোকামাঘাট স্টেশন আসতেই নন্দলাল টুক করে নেমে গেল। নামবার আগে কোণের ছেলেটাকে আরেকবার দেখে নিল। কেমন যেন স্বাভাবিক নয়, বিষাদে ও ব্যর্থতায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। দেখা যাক না ফসল কিছু মেলে কি না! পুরস্কার বিঘোষিত হয়ে গেছে। যদি ছেলেটা সত্যি মাল হয় তা হলে কে জানে ধরতে পারলে নন্দলাল হয়তো রাতারাতিই আনন্দলাল হয়ে উঠবে। নন্দলাল রেলওয়ে পুলিসের শরণ নিল। দুজন সশস্ত্র কনেস্টবল নিয়ে এগুলো কামরার দিকে।

বিপদ শুঁকতে পেরেছে প্রফুল্ল। বুঝেছে এখান থেকে পালানো অকল্পনীয়। তবু শেষ চেষ্টা দেখা যাক। পকেট থেকে মুক্ত করল সে রিভলভার। তাতে তিনটে মাত্র গুলি আছে। নন্দলালের মাথা লক্ষ্য করে প্রফুল্ল ফায়ার করলে। ঐ মাথার কত বুদ্ধি, চট করে মাথা নুইয়ে দিল নন্দ, গুলি লাগল না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

কিন্তু না, আর গুলি খরচ করা যায় না। প্রফুল্ল শুধু একবার বললে, 'আপনি বাঙালি হয়ে আমাকে ধরবেন? কিন্তু কে আমাকে ধরে?' বলে বাকি দুটো গুলি প্রফুল্ল নিজের বুকের মধ্যে গ্রহণ করলে।

এই নিয়তির নির্দেশ, ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষর, প্রফুল্ল চাকী বিংশ শতাব্দীর প্রথম শহিদ বলে চিহ্নিত হল। বীতরাগ ও বীতশোক, জননী জন্মভূমির জন্যে প্রসন্ন আত্মোৎসর্গ। এই আত্মোৎসর্গই অব্যয়, অবিনাশী। আর এই জননী জন্মভূমিই সমস্ত প্রাণ মন শরীর, সমস্ত কর্ম, সমস্ত কামনা, সমস্ত গন্ধ, সমস্ত রস, প্রতিমুহূর্তের নিশ্বাস। জননী জন্মভূমিই বৃহত্তম আদর্শ, অমৃত ও অনাময়। এর জন্যে প্রাণ দেব না তো কার জন্যে দেব?

প্রফুল্লের মাথা শরীর থেকে আলাদা করা হল। কর্তিত মাথাটা নিয়ে যাওয়া হল মজঃফরপুরে।

এ সব কার কীর্তি? আর কার! নন্দলালের। যেন সম্মুখযুদ্ধে সে-ই প্রফুল্লকে নিধন করেছে। নন্দলালের কী হল? পদোন্নতি হল? পদোন্নতি হবার সময় পেল না। কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে বাংলার বিপ্লবীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হল। গোপনচরণে কেবল তুমিই আস না, তোমার মৃত্যুও আসে।

কিন্তু ক্ষুদিরামের কী হল? তার কথা বলো।

মজঃফরপুরে স্পেশাল জজ কার্নডাফ তার ফাঁসির হুকুম দিল। হাইকোর্ট সে রায় বহাল রাখলে। ক্ষুদিরাম মায়ের স্নেহাঞ্চল ভেবে ফাঁসির রজ্জুকে গলায় জড়াল। উচ্চারণ করলে সেই জ্যোতির্বাক্য, জীবনের প্রথম গায়ত্রী: বন্দেমাতরম।

এতটুকুও চোখ ছলছল করল না, মুখে ফুটল না বিষাদের বিন্দু-বিসর্গ, মুখখানি যেমন কৈশোর স্নেহে কমনীয় তেমনি কমনীয় রইল। ইংরেজ জানল পেলবমেদুর মেঘের নিচে কী বজ্রবিদ্যুৎ, কী মৃত্যুহীন বৈশ্বানর। কিন্তু দেশের লোক শোকে ভেঙে পড়ল। চারণ-বাউলের কণ্ঠে গান হয়ে ফেটে পড়ল:

বিদায় দে মা একবার ঘুরে আসি
হাসি-হাসি গলায় ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।
মেটে বোমা তৈয়ার করে
ফেলেছিলাম গাড়ির পরে
বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ইংলণ্ডবাসী॥
অভিরাম যায় দ্বীপচালানে
ক্ষুদিরামের ফাঁসি॥
দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নেব মাসির ঘরে
চিনতে যদি না পারিস মা
দেখবি গলায় ফাঁসি॥
ষোল হাজার তেত্রিশ কোটি
রইল মা তোর বেটা-বেটি
বেটা-বেটি কোরো খাঁটি
বউদের কোরো দাসী।
অভিরাম যায় দ্বীপচালানে
ক্ষুদিরামের ফাঁসি॥

র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের হস্টেল। রান্নার উনুন ধরে নি আজ, সামান্য জল গরমও হয় নি। ছাত্রেরা অভুক্ত থেকে ক্লাস করেছে। কোনো বিরক্তি-বিক্ষোভ জানায় নি, আচরণে কোনো আস্ফালন নেই, শুধু নির্বিচলে ব্রত-উদযাপন করেছে।

এখন ক্লাসের শেষে দলে-দলে ঘরে বসে গুলতানি লাগিয়েছে। কেউ আজ খেলতে যায় নি। দলে-দলে বসে ক্ষুদিরামের গল্প করছে। গল্প করছে আলিপুর বোমার মামলার কথা! যতটুকু তারা শুনেছে লোকমুখে।

'এই স্যার আসছেন—স্যার।' ছেলের দল সচকিত হয়ে উঠল। যেখানে যেটুকু ন্যূনতা ছিল, শ্রদ্ধা দিয়ে স্তব্ধতা দিয়ে শৃঙ্খলা দিয়ে পূরণ করল ছেলেরা।

বেণীমাধব বারান্দা দিয়ে ধীরে পায়ে হেঁটে চলে গেলেন। চলায় গর্বের ভাব, মুখে আনন্দের আভা। ছেলেরা যেন বুঝেছে, লেখাপড়ার বাইরে, শুধু জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হবার বাইরে জীবনের আরো কোনো বৃহত্তর আদর্শ আছে। যার জন্যে মুহূর্তে সমস্ত কিছু ত্যাগ করা যায়, কৃপণ স্বার্থকে নিঃশেষে দেওয়া যায় জলাঞ্জলি! শুধু এক দিনের অন্ন নয়, ইহকাল-পরকাল।

কিন্তু এরা নিঃশব্দ কেন? একটা ঘরে, যে-ঘরে বেশি ছেলের ভিড় দেখলেন, তার দরজায় এসে দাঁড়ালেন বেণীমাধব। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা স্বদেশী গান জানো না?'

ছেলেরা বলে উঠল, 'জানি স্যার।'

'তবে তাই গাও না।'

জানি বলা যেমন সহজ গান গাওয়া তত সহজ নয়। এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল, কোন গানটা ধরে, আর কেবা প্রথমে ধরে!

বেণীমাধব ভাবল তার জন্যেই বুঝি ছেলেরা আড়ষ্টতা অনুভব করছে। সরে যাবেন ভাবছেন, হঠাৎ দলের মধ্যে একজনের উপর নজর পড়ল! মুহূর্তে উথলে উঠলেন বেণীমাধব: 'এ কী, সুভাষ, তুমি এখানে?'

সুভাষ নীরবে একটু হাসল।

'বাড়ি যাও নি?'

'যাব। এদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটিয়ে দিয়ে যাব।'

বেণীমাধব ইঙ্গিতটুকু বুঝল। তার মানে, যারা তার ডাকে আজ উপবাস করেছে তাদের সে ছাড়তে, ছেড়ে দিতে পারে না। তাদের থেকে পারে না সে আলাদা হয়ে থাকতে। দলের একজন হয়েই সে দলপতি, দলের বাইরে থেকে সে নিজেকে আরোপ করে না, ছলে-বলে চায় না করতে। যে পরের দাস হতে জানে না সে পরের প্রভু হবে কী করে? কেমন সুন্দর ধীর শক্ত প্রশান্তমূর্তি! যেন নেতা হবার মত। যেন মুহূর্তে সমস্ত সংসারসমুদ্র ছিন্ন করে নিতে পারে। কিন্তু আমি কি ঠিক দেখছি? আমি কি দূরদৃক?

বেণীমাধব ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন। বারান্দায় আসতেই ঘরের ভিতর থেকে ছেলের দল সমস্বরে গান গেয়ে উঠল :

'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন॥
বন্দেমাতরম॥

বেণীমাধব শুনতে শুনতে হেঁটে চলে গেলেন ধীরে ধীরে।

নিজের ঘরে এসে বসলেন বেণীমাধব। দেখলেন সামনেই দেয়ালে ভারতবর্ষের মানচিত্র। দেশ কী? দেশ কি শুধু একটা পটে আঁকা ছবি? শুধু একটা ভূগোল-ভাগবিশেষ? শুধু সজল নির্জল জনপদ? মাটি পাহাড় নদী অরণ্য? না কি রত্ন খনি পণ্য শস্য, দ্রব্যের ভাণ্ডার? না কি শুধু মানুষ? সে সব মানুষই বা কারা? দেশই মানুষের বৃহত্তম প্রাণচেতনা। তার অস্তিত্বের পরিপূর্ণ বিস্তার। তার জীবনে সার্থকতম এক দৈবত আবির্ভাব। যা কিছু নিয়ে সে বাঁচবার আয়োজন করেছে, তার ভাষা, তার ভাব, তার ভালোবাসা, তার ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি—তার জীবনে যা কিছু অর্থবহ তারই এক

উদাত্ত উচ্চারণ। পার্থিব হয়েও এক অপার্থিব উত্তেজনা।

রবীন্দ্রনাথ ধরিত্রীকে বলেছেন তীর্থদেবতার মন্দিরপ্রাঙ্গণ আর স্বদেশকে বলেছেন ভারততীর্থ, মহামানবের সাগরতীর। তাঁর বিশ্বদেবতার প্রতিমূর্তি।

'হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে?
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে॥'

'আসতে পারি?' বাইরে থেকে কে একজন কথা কয়ে উঠল।

'আসুন।'

একটি বাঙালী ভদ্রলোক ঘরে ঢুকল। 'নমস্কার।'

বেণীমাধব নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন।

'আমাকে চিনতে পারছেন বোধহয়। আমি এখানকার কলেজের প্রফেসর।'

'হ্যাঁ, চিনতে পারছি বসুন।'

প্রফেসার বসল। বললে, 'ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

'ডিস্ট্রিট ম্যাজিস্ট্রেট?' বেণীমাধব ভ্রূকুঞ্চন করলেন: 'কেন বলুন তো?'

'তিনি আপনার স্কুল সম্বন্ধে কটা খবর চান।'

'স্কুল সম্বন্ধে? তা তিনি নিজে না এসে আপনাকে পাঠিয়েছেন কেন?'

'না, না, তেমন কিছু নয়।' প্রফেসর গম্ভীর হল: 'সে খবর তো শহরের সকলেই জানে।'

বেণীমাধব একটু হাসতে চেষ্টা করলেন। বললেন, 'যা সকলেই জানে তা আবার জানবার জন্যে লোক পাঠাবার দরকার কী? তবু জিজ্ঞেস করি সেটা এমন কোন খবর?'

'কেন, আপনার স্কুলের ছেলেরা এগারোই আগষ্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন পালন করে নি?' প্রফেসর তম্বি করে উঠল: 'সারা দিন রাত উপোস করে থাকে নি?'

বেণীমাধব শান্ত ও দৃঢ়স্বরে বললে, 'ছেলেরা উপোস করেছে কি না করেছে তা ছেলেরা জানে! ছেলেদের জিজ্ঞেস করুন।'

'আপনি জানেন না?'

'এগারোই আগস্ট যে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন এ কে না জানে?' বেণীমাধব সুন্দর করে হাসলেন: 'আপনি জানেন না?'

প্রফেসর বিরক্ত হল। তার ভাবখানা এই যেহেতু সে কলেজের শিক্ষক সে স্কুলের যে কোনো শিক্ষকের চেয়েই উঁচু। তাই এবার তার স্বরে ঝাঁজ এল। 'সে কথা হচ্ছে না। কিন্তু সেই ফাঁসি উপলক্ষ করে ছেলেরা হস্টেলে রান্না হতে দেয় নি আর আপনি হেডমাস্টার, জেনে-শুনেও কিছু বলেন নি।'

বেণীমাধবও একটু রূঢ় হলেন : 'ছেলেরা নিজের ইচ্ছেয় খাবে না, রান্না হতে দেবে না, তাতে আমার বলবার কী আছে?'

'না, আপনি হেডমাস্টার, আপনি বারণ করতে পারতেন।'

'একটা ভালো কাজ আমি বারণ করতে যাব কেন?'

'ভালো কাজ?' প্রায় একটা ঘা খেল প্রফেসর : 'একজন বিপ্লবীর হত্যাকাণ্ডকে ছেলেরা সমর্থন করবে?'

'আসল কথাটা তা নয়।' বেণীমাধব শান্ত মুখে বললেন, 'আসল কথা দেশকে ভালোবাসা, দেশের জন্যে সর্বস্ব—এমন কি প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করা—এমনি একটা আদর্শের প্রতি প্রণাম জানানো। একে আপনি ভালো কাজ বলবেন না? নিজের দেশ হলে আপনার ঐ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটও এটাকে ভালো কাজ বলতেন।'

'হ্যাঁ, সেই কথাটাই জানতে এসেছিলাম।'

দেশকে ভালোবাসা—সে কি শুধু ঘরে বসে স্তুতি-বন্দনা করা, না, মাঠে দাঁড়িয়ে গলাবাজি করা? কিছু একটা কাজ তো করতে হবে যাতে দেশের কিছু কল্যাণ হয়। দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করাটাই কি দেশের বৃহত্তম কল্যাণ নয়? সে মুক্তিসাধনের চেষ্টাতেই তো ক্ষুদিরামের আত্মদান। আদর্শটা দেখ, দেখ সেই আদর্শের প্রতি আনুগত্য।

দেশ আমাদের মা। 'জনক-জননী-জননী'। কী বলছেন রবীন্দ্রনাথ? বলছেন, 'এমন মায়ের মত দেশ আছে? এত কোলভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথী-প্রাণা কোমলহৃদয়া, তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়?

'তোমার যা দৈন্য মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি,
পরধনে ধিক গর্ব, ভরি করজোড়,
ভরি ভিক্ষাঝুলি!
পুণ্য হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।।'

কদিন পরে বেণীমাধবের নামে লম্বা খামে চিঠি এল। তার ঘরে আরো কয়েকজন শিক্ষক বসে আছে, বেণীমাধব খামে মুখটা সরল রেখায় ছুরি দিয়ে কাটলেন। খামটার খুলতে পর্যন্ত তিনি সৌন্দর্যের প্রতি সজাগ। ব্যস্ত হাতে বিশ্রী করে খামের একটা দিক ঝপ করে ছিঁড়ে ফেলে চিঠি বার করার তিনি পক্ষপাতী নন। যত বড় কঠিন চিঠিই হোক, খামটা সুশ্রী ভাবেই খুলতে হবে।

চিঠিটা খুলে পড়লেন বেণীমাধব। পড়তে-পড়তে মুখটা একটু কঠিন হয়ে উঠল। তারপর চিঠিটা আবার ধীরে ধীরে পুরলেন খামের মধ্যে।

কী না কী চিঠি! সবাই বেণীমাধবের মুখের দিকে তাকাল।

'আমাকে বদলি করে দিল।'

'বদলি করে দিল! হঠাৎ?'

'হ্যাঁ, এই তো অর্ডার।'

'কোথায়?'

'কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল।' বেণীমাধব নির্লিপ্ত মুখে বললেন।

'একেবারে কৃষ্ণনগর? এ তো শাস্তি!' শিক্ষকদের একজন বললেন।

আরেকজন সত্য কথাটা বললে। 'এ আর কিছুই নয়, সেদিনের সেই ক্ষুদিরামের জের।'

বেণীমাধব ম্লান মৃদুরেখায় হাসলেন, বললেন, 'যে কারণেই হোক সরকারি চাকরিতে বদলি আছেই, তা নিয়ে মন খারাপ করলে চলে না।'

'এ তো সে রকম নয়। এখানে কারণটা যে রাজনৈতিক।' বললে আরেকজন।

'সে আমার দেখবার কথা নয়।' বেণীমাধব দ্রব অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমার উপর আদেশ হয়েছে, আমি তা মানব। আদেশ পালন করব, আমার চাকরির এই সর্ত লঙ্ঘন করব কী করে?'

'আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করব।' কয়েকজন মাস্টার তপ্ত হয়ে উঠল।

চারিদিকে হঠাৎ একটা চাপা কোলাহল শোনা গেল : 'বদলি! বদলি! কৃষ্ণনগর! স্যার বদলি হয়ে যাচ্ছেন—'

কোলাহলটা বাড়তে-বাড়তে একেবারে সুভাষচন্দ্রের একক কণ্ঠে স্পষ্টোচ্চারিত হল। 'আমরা এ হতে দেব না। আমরা বদলির অর্ডার রদ করাব। আমরা ধর্মঘট করব।'

সম্মিলিত ছাত্রজনতা সায় দিল : ধর্মঘট করব।

উনিশশো এগারো সালে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেই সুভাষ বেণীমাধবের সংস্পর্শে এসেছে। দৃঢ় অথচ স্নেহল, সুনীতিপরায়ণ অথচ উদারবুদ্ধি, নিরাসক্ত অথচ আত্মীয়তম, বেণীমাধব যেন সুভাষের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বেণীমাধব যেন দূর দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় এক সমতল শস্যক্ষেত্র। কী সুন্দর করে যে পড়ান আর পড়ার বিষয়েরও বাইরে কত কী যে জানেন, সমস্ত ব্যক্তিত্বটাই বিনয় দিয়ে বিদ্যা দিয়ে তেজ দিয়ে মাধুর্য্য দিয়ে আলোকিত। সত্যবোধের দৃঢ়তা দিয়ে তাঁর মেরুদণ্ড ঋজু, অথচ চিত্ত মমতায় ভরা।

'সুভাষকে ডাকো।'

ছেলের দলকে পিছনে রেখে সুভাষ হেডমাষ্টারের ঘরে প্রবেশ করল।

'তোমরা এসব কী আওয়াজ তুলছ?' বেণীমাধব অন্তরঙ্গ অথচ একটু বা কঠিন গলায় প্রশ্ন করলেন।

সুভাষ চুপ করে রইল।

বেণীমাধব বললেন, 'আমার বদলির চাকরি, যেখানে বদলি করবে সেখানেই হাসিমুখে কাজ করব। এতে আবার বিক্ষোভ কিসের?'

'কিন্তু যে কারণে বদলি করা হচ্ছে সেটা অন্যায়।' সুভাষ বললে দৃপ্তস্বরে।

'কারণটা তো তোমরা অনুমান করছ।' বেণীমাধবের মুখ শান্ত ও নির্লিপ্ত : 'অন্য কারণও হতে পারে। কারণ যাই হোক বদলি বদলি, কর্তব্য কর্তব্য। তোমাদের কাজ হচ্ছে লেখাপড়া শিখে বড় হওয়া আর আমার কাজ হচ্ছে ঘুরে ঘুরে হেডমাস্টারি করা— শুধু পড়ানো নয়, তোমাদের প্রাণে বড় হবার মন্ত্র দেওয়া। এর মধ্যে বিক্ষোভ কোথায়?'

'ধর্মঘট না হয়, অন্য কোনো পথে কি প্রতিকার খোঁজা যায় না?'

'অন্য আবার কী পথ? আবেদন-নিবেদন?'

কথাটা ভাবতেই সুভাষের মুখে দৈন্যের ছায়া পড়ল।

সুভাষ দলবল নিয়ে চলে গেল।

কাঠজুড়ি নদীর ধার ধরে দু বন্ধুতে বেড়ায়, সুভাষ আর চারু। আর, আশ্চর্য, তারা দেশের কথা নিয়ে আলোচনা করে। তারা দুজনেই শুনেছে তখন রুশ-জাপান যুদ্ধের কথা। জাপানের য়্যাডমিরাল টোগো কেমন রাশিয়ার বিশাল বল্টিক বাহিনীকে উড়িয়ে দিয়েছে। জাপান তো কত ছোট দেশ, দুর্বল দেশ, সে যদি রাশিয়ার মতন বিরাট দেশকে ঘায়েল করতে পারে, ভারতবর্ষ কেন এঁটে উঠবে না ইংরেজের সঙ্গে? চাই গঠনশক্তি, চাই বলসাধনা, চাই একত্ববোধ। ইংরেজ তো শঠতা করে সেই একত্ববোধের মূলেই কুঠার হানছে। আগে মানুষে-মানুষে ভেদ করো পরে প্রদেশে-প্রদেশে ছেদ করব। জাপানের মত জাগ্রত দেশ প্রাচ্যে আর কোথায়? জাপানের জয়ে সমগ্র এশিয়ার অভ্যুত্থান। জাপানের দেখাদেখি ভারতবর্ষও এবার জাগুক। তার মরা গাঙে বান আসুক। তার আগে ব্যুয়র যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় হল। যেহেতু ইংরেজ হেরেছে তাইতেই ভারতবর্ষের আনন্দ। শত্রুকে নির্জিত দেখার মত সুখ কোথায়?

নদীর ধারে কখনো বা হেডমাস্টারের সঙ্গেই দেখা হয়ে যায়। সাধারণত এ অবস্থায় ছাত্ররা দূর থেকেই পলায়ন করে কিংবা দৈবাৎ মুখোমুখি হয়ে পড়লে পাশ কাটায়। কিন্তু সুভাষ পালাতে জানে না। নম্র হয়ে বেণীমাধবকে অভিবাদন করে। যদি মাস্টারমশাই নতুন কিছু শোনান।

'তুমি কি ইংরেজের উপর রাগ করে স্বদেশী হবে?' বেণীমাধব জিজ্ঞেস করলেন, 'না কি স্বদেশের জন্যেই স্বদেশী হবে?'

সুভাষ বললে, 'স্বদেশের জন্যেই স্বদেশী হব।'

'সেইটেই বড় কথা। দেশকে ভালোবাসি ইংরেজের উপর রাগ করে নয়, দেশকে ভালোবাসি একান্ত করে সে আমারই দেশ বলে। আর সেবা না করে আমাদের উপায় কী। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ভগবান আমাদের কত ভাবে সেবা করছেন, আলো হয়ে জল হয়ে বাতাস হয়ে আগুন হয়ে, আর ক্রমাগত ডাকছেন, আমার মতন এমনি সেবাপরায়ণ হও। চোখের উপর তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন তবু আমরা দেখেও দেখি না, আলস্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি।'

'আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি দেখতে চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, এমনি একটি আদর্শকে চোখের সামনে নিরন্তর দাঁড় করিয়ে রাখবে। এই আদর্শদর্শনই শ্রেষ্ঠ দর্শন।'

আরো কত সময় কত কথা। অনুপ্রেরণার কথা।

কিন্তু তাঁকে তো এবার বিদায় দিতে হবে। তিনি চলে গেলে আদর্শদর্শন হবে কী করে?

হবে, তাহলেও হবে। কে যেন মনের গভীর থেকে বললে। আত্মদর্শনই আদর্শদর্শন।

কটক স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়াল।

প্ল্যাটফর্মে ছাত্রদের ভিড়। মাঝখানে বেণীমাধব। গলায় ফুলের মালা। যে ছেলে আসছে সেই তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে।

কোন একখানি পরিচিত প্রদীপ্ত মুখের জন্য বেণীমাধব যেন ভিতরে-ভিতরে চঞ্চল হয়ে রয়েছেন। সুভাষ কোথায়? সে তার গুরুর কাছ থেকে শেষ আশীর্বাদ নিয়ে যাবে না?

ভাবতে-ভাবতেই সুভাষ এসে হাজির। হাতে সুন্দর একটা মালা। উদার শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে সে মালা বেণীমাধবের গলায় পরিয়ে দিয়ে আভূমি নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলে।

বেণীমাধব সুভাষকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি একটা মানুষের মত মানুষ হও।'

আমাদের প্রার্থনা। আশীর্বাদ ভগবানের।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

বেণীমাধব দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। এ কী, তাঁর চোখে জল কেন?

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে সুভাষ। ট্রেনের দিকে সে তাকাতে পারছে না, তারও চোখ ফেটে জল বেরুচ্ছে।

এই চোখের জলেরই আরেক নাম আগুনের ফুলকি।

সাত

উনিশশো এগারো সালেই বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল। ধূর্ত ইংরেজ দেখল এ ছাড়া বাংলাকে শান্ত করা যাবে না। না গ্রেপ্তার, না কারাদণ্ড, না জরিমানা। শত দমনে-পীড়নেও সে অবশীভূত। যাকে ভেবেছিল কুসুমসুকুমার সে যে আসলে কুলিশের চেয়েও কঠোর তারই পরিচয় পেল ইংরেজ। মনে মনে বলল, এখন তো পার্টিশন বাতিল করে দিই, তারপর আবার সময়মত পার্টিশন করিয়ে নেব। শোধ তুলব সুদে-আসলে।

এর মধ্যে অনেক জল বয়ে গিয়েছে গঙ্গা দিয়ে। আলিপুর বোমার মামলা শেষ হয়ে গিয়েছে। অরবিন্দ ঘোষ ছাড়া পেয়েছে। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশই তাকে ছাড়িয়ে এনেছে। অরবিন্দ ধরা পড়ে ৪৮ নং গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে। গ্রেপ্তার করতে পুলিসের সঙ্গে গিয়েছে এক ইংরেজ অফিসর। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে সে তো হতভম্ব। আর ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে আছে যে লোকটা সেই অরবিন্দ?

'হ্যাঁ, আমিই অরবিন্দ ঘোষ।'

ইংরেজ অফিসর তাকাল পুলিসের দিকে। অবিশ্বাস্য, এই অরবিন্দ ঘোষ, যে নয় দীর্ঘ বছর বিলেতে কাটিয়ে এসেছে। যে চাল-চলনে খানা-পিনায় পুরোদস্তুর সাহেব? যে নাকি ভালো করে বাংলা পর্যন্ত বলতে পারে না, তার এই দৈন্যদশা? তার একটা শোবার তক্তপোশও জোটে না? না বিছানা-বালিশ? এ যে একেবারে ইংরেজি ভোগ-বিলাসের প্রতি পরম তিরস্কার।

অরবিন্দের দিকে চেয়ে ইংরেজ অফিসর ধিক্কার দিয়ে উঠল। বললে, 'আই য়্যাম য়্যাশেমড অব ইউ।'

অরবিন্দ হাসল। তুমি হতভাগ্য তোমাকে কী করে বোঝাব এই ভোগবিরতি জীবনের কত বড় বিভূতি।

সার্চ করে পাওয়া গেল এক কৌটো মাটি। কী ওটা? বোমার মশলা?

'তার চেয়েও মারাত্মক।' বললে অরবিন্দ।

'কী? অফিসর আঁতকে উঠল।

'দক্ষিণেশ্বরের মাটি।'

'তার মানে?'

'তার মানে রামকৃষ্ণ পরমহংসের চরণ-ছোঁয়া তীর্থরেণু।'

'বোমার চেয়েও মারাত্মক কেন?'

'তার প্রতি ধূলিকণায়ই একেকটা বোমা। আর তার সবচেয়ে বড় বোমাটার নাম শোনেন নি? সে বোমাটার নামই স্বামী বিবেকানন্দ।'

ফ্রেজারকে আবার মারবার চেষ্টা হয়েছিল ওভারটুন হলে। এবারও গুলি ফসকাল। ধরা পড়ল জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিচারে দশ বছর জেল হয়ে গেল।

আলিপুর বোমার মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস। তাকে খুলনা জেলার শোভনা গ্রামের চারু বসু আলিপুর কোর্টেই গুলি করে মারলে। চারু ধরা পড়ল। প্রাথমিক তদন্ত করে তাকে দায়রায় সোপর্দ করা হল। চারু চেঁচিয়ে বললে, 'নো সেসনস ট্রায়াল, হ্যাং মি টুমরো।' সেসনস ট্রায়ালে দরকার নেই, আমাকে কালই ফাঁসি দাও।

আরো একটা কথা বললে চারু। আর সেটাই চরম কথা। বললে, 'ইট ওয়জ অল প্রিঅর্ডেনড—এ সবই আগে থেকে নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে আছে যে আশুবাবু আমার হাতে মারা যাবেন আর আমি ফাঁসির দড়িতে মারা যাব।'

এ যেন গীতার কথা। ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিস পুলিন দাস সহ চুয়াল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করলে। যার বাড়িতেই সার্চ করে তার বাক্সেই গীতা-চণ্ডী পায়। পুলিস এক গাদা গীতা-চণ্ডী ধরে আলামত বানালে। সার্চলিস্টে রাখলে তার বিস্তৃত ফিরিস্তি। আপিলে মামলা হাইকোর্টে এসেছে। সরকারী কৌঁসুলি সার্চ লিস্টটা পড়ছে সাড়ম্বরে, কোন কোন আসামীর বাড়ীতে গীতা-চণ্ডী পাওয়া গিয়েছে। যেন গীতা-চণ্ডী বোমা-রিভলভারের চেয়েও ভয়ানক।

বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। জিজ্ঞেস করলেন, 'ও দুটো বইয়ের অমন সবিস্তার উল্লেখের কারণ কী?'

'গীতা সাংঘাতিক বই।' বললে কৌঁসুলি।

'তার মানে?'

'গীতা রাজদ্রোহে প্রেরণা দেয়।'

'আর চণ্ডী?'

'ও আরো ভয়াবহ। ও একেবারে প্রত্যক্ষ খুনখারাপিতে উৎসাহ যোগায়।'

'আপনাকে এসব কে বাতলাল?' বিচারপতি রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালেন কৌঁসুলির দিকে: 'গীতা-চণ্ডী বহু হিন্দু বাড়িতে নিত্য পাঠ হয়। আমার বাড়িতেও হয়।'

'আপনার বাড়িতে!' সরকারী কৌঁসুলি তখন পালাবার পথ পায় না।

টেগার্টের আমলে যে বিপ্লবীকেই ধরা যায় তারই বাক্সে মেলে স্বামী বিবেকানন্দ। হয় রাজযোগ, নয় জ্ঞানযোগ, নয় অন্য কোনো গ্রন্থ।

'বিপ্লবের এত বীজ ছড়াচ্ছে এ স্বামীটা কে? জিজ্ঞেস করে টেগার্ট : এটাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?'

'কী করে ধরবেন? বেঁচে নেই যে। মানে দেহে নেই।'

'বেঁচে নেই তো, লোকটার লেখা বইগুলো প্রস্ক্রাইব করা হচ্ছে না কেন?'

'ওগুলো সব ধর্মের বই। ইংরেজ যে আবার এদিকে খুব উদারপন্থী কারু ধর্মে হাত দেয় না।'

আশু বিশ্বাস খুন হল বটে কিন্তু মিস্টার হিউম খুন হল না। হিউমও আলিপুর বোমার মামলায় সহকারী উকিল ছিল। প্রথম চেষ্টা হয় গ্রে স্ট্রিটে, হিউম যখন যাচ্ছে গাড়ি করে। ছোঁড়া বোমা গাড়ি ছুঁতে পারল না, পড়ল গিয়ে চারজন পথচারীর উপর। দ্বিতীয় চেষ্টা হল হাওড়া স্টেশনে। হিউম ট্রেনে করে যাচ্ছে, চার-চারটে নারকেল বোমা ছোঁড়া হল তার কামরা লক্ষ্য করে। তিনটে তো কামরার মধ্যেই ঢুকল না আর একটা যদি বা ঢুকল, ফাটল না। রাখে কৃষ্ণ মারে কে। আরো দুবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু হিউম অক্ষত রইল।

সি.আই.ডি. পুলিসের বড় কর্তা ডেনহাম। তাকে খুন করবার উদ্দেশ্যে কলকাতার রাস্তায় তার গাড়িতে ছোঁড়া হল বোমা। এবারও সেই ভুল। গাড়িতে ডেনহাম নয়, কাউলি নামে আরেক ইংরেজ। লাভের মধ্যে চুঁচুড়ার ননীগোপাল মুখুজ্জের দ্বীপান্তর।

বোমা বিদীর্ণ হোক বা স্তব্ধ থাকুক, লক্ষ্যভ্রষ্ট হোক বা বাঞ্ছিত ফল এনে দিক, সবই হচ্ছে পরাধীনতার আর্তনাদ। এ সন্ত্রাস নয় এ বিপ্লব। সাফল্য বা বৈফল্য, সমস্ত সেই বিপ্লবের ঢেউ। মোট কথা, বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ চাই। আর অস্ত্রের উত্তরে অস্ত্র, অত্যাচারের উত্তরে অত্যাচার। কৃষ্ণ শুধু মুরলীই ধরে নি, চক্রও ধরেছে। তাই সুদর্শনধারী কৃষ্ণের উদ্বোধন। 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারি।'

রুশ যুদ্ধে জয়ী হবার পর জাপানীরা কী বলছে? বলছে, 'অন্তরে-অন্তরে আমরা যা ছিলাম তাই আছি। কিন্তু যেদিন দলেদলে রাশিয়ান হত্যায় কৃতকার্য হলাম সেদিনই ইউরোপ-আমেরিকা আমাদের জাতে তুলে নিল। আমরা আর অসভ্য থাকলাম না। আমরা পুরোদস্তুর সভ্য বনে গেলাম।'

তা হলে সভ্যতার মানদণ্ড কী? মানদণ্ড অস্ত্রশক্তি। যে যত বেশি হিংস্র সে তত বেশি সভ্য। যার যত বেশি ধ্বংস করার ক্ষমতা তারই তত বেশি মর্যাদা।

শামসুল আলম খুন হল কলকাতার হাইকোর্টের সিঁড়িতে। কলকাতা-পুলিসের ডি.এস.পি গোয়েন্দা-দলের সর্দার এই শামসুল। আলিপুরের বোমার মামলার প্রধান তদবিরকার। সে মামলার আপিল চলছে তখন হাইকোর্টে, সেই সূত্রে শামসুলের রোজ আনাগোনা। সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠছে, বীরেন দত্তগুপ্ত তার পিছন থেকে গুলি মারে। এক গুলিতেই খতম শামসুল।

বীরেনের সঙ্গে ছিল রাজসাহীর সতীশ সরকার। গুলির পর সতীশ আগের থেকে ভাড়া করে রাখা গাড়ি চড়ে চলে যায় কিন্তু বীরেন শুধু উত্তেজনায় গুলিই ছুঁড়তে থাকে। তাকে যে পালাতে হবে, সতীশ যে তার জন্যে গাড়িতে অপেক্ষা করছে, এসব কথা তার মনেই থাকে না। তার অরাতিঘাতন মন্ত্র যে সফল হয়েছে এই আনন্দেই

সে পরিপূর্ণ, বদান্য ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ।

গুলি ফুরিয়ে যেতেই ধরা পড়ল বীরেন। পুলিসি পীড়নের উত্তরে তার শুধু এক কথা : কিছু বলব না।

কিছুই বলবে না? না, বিন্দু-বিসর্গও না। যা ইচ্ছে তাই করতে পারো।

আদালতেও সে সম্পূর্ণ উদাসীন। আঠারো বছরের ছেলে, অভী-র প্রতিমূর্তি। না, উকিল নেই আমার। আমার শুধু এক বন্ধু আছে। সে ফাঁসি। শত উকিল লাগালেও সে ফাঁসি খসিয়ে নিতে পারবে না।

আদালতে সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য হচ্ছে, আসামীর পক্ষ থেকে কোনো জেরা নেই। ওরা যা খুশি বলুক, যেমন ইচ্ছে মিথ্যের পর মিথ্যের ইট সাজিয়ে অতিরঞ্জনের পেলেস্তারা দিক, কিছুই চঞ্চল করতে পারল না। মাঝে মাঝে হেসে উঠছে বীরেন আর অনেক সময় সে-হাসি এমন উচ্চনাদ হয়ে উঠছে যে সাক্ষীর প্রাণে ভয় ধরে যাচ্ছে। কে জানে বাইরে বেরুলে কী গতি হয়! হাইকোর্টের যে চাপরাশিটা বীরেনকে ধরেছিল সাক্ষীর কাঠগোড়ায় উঠে তার কী দশা! বীরেন এবার হাসল না, শুধু চোখ পাকিয়ে চাপরাশির দিকে তাকিয়ে রইল। তাতেই, বিরাট ব্যাপার, চাপরাশি মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

যথারীতি মামলা দায়রায় গেল। বিচারপতি ব্যরিস্টার নিশীথ সেনকে বললেন আসামীর পক্ষে দাঁড়াতে। কিন্তু কে নিশীথ সেন, বীরেন তার সঙ্গে একটা কথাও বললে না। নিশীথ সেন ভাবল, লোকটা বুঝি পাগল, নইলে আমার সাহায্যও প্রত্যাখ্যান করে। জজ-সাহেবকেও তাই জানাল, লোকটা পাগল, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চায় না।

পাগল? 'আমায় দে মা পাগল করে!' 'যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিসনে কিছু। আজকে তোরে কেমন ভেবে, অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে, কাল সে প্রাতে মালা হাতে আসবে রে তোর পিছু পিছু।'

বীরেনের ফাঁসি হয়ে গেল। এই সূত্র ধরে কী করে কে জানে পুলিস ঠিক করল অরবিন্দ ঘোষকে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে জড়াতে হবে। এত বড় একটা মনীষা ও আধ্যাত্মশক্তিকে জেলের বাইরে রাখা ঠিক হবে না। ভগিনী নিবেদিতা এ খবর পেল। আর পেয়েই তা পৌঁছে দিল অরবিন্দের কাছে। পালাও। দেরি কোরো না। অরবিন্দ চলে গেল চন্দননগর।

ভগিনী নিবেদিতা! হ্যাঁ, লোকমাতা নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা। হ্যাঁ, সে ভারতবর্ষের পূজারিণী। সুতরাং সে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূজারিণী। আর যারা সর্বস্ব তুচ্ছ করে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে ছুটেছে সেই সব মরণপণ যুবকদের গুপ্ত সমিতির সে সমর্থক। সমর্থক বললে কম বলা হয়, সে সক্রিয় সহায়ক। সেও স্বামীজির অভী-মন্ত্রের উদ্গাত্রী। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় সাদা পাথরে গড়া একটি তপস্বিনীর মূর্তি।

কলেজ স্ট্রিটে অরবিন্দের বাসায় কতবার গিয়েছে নিবেদিতা। নিবেদিতার জন্যে অরবিন্দের বরং ভয়। বলেছে, 'পুলিস তো আপনাকেই ধরবে।'

নিবেদিতা স্নিগ্ধমুখে হাসল, 'আইরিশ বিপ্লবের কোলে আমি মানুষ হয়েছি, কারাগার

বা নির্বাসনে আমার ভয় নেই!'

'না, সত্যি ভয় নেই। আপনাকে আপনার গায়ের চামড়া বাঁচাবে। আপনি যে মেমসাহেব।'

নিবেদিতা প্রশান্তস্বরে বললে, 'না আমাকে বাঁচাবে আমার গুরু, স্বামী বিবেকানন্দ। শ্মশান আর গৃহ যাঁর কাছে সমান। যিনি সর্বনিশ্চিন্ত, সর্বনির্ভয়।'

সুভাষের জীবনে এই স্বামীজির বাণী পৌঁছে দিল কৃষ্ণ সেন—প্রফেসর কৃষ্ণ সেন। সব কথার সার কথা, একটি মাত্র কথা, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ যে আত্মা তা দুর্বলের লভ্য নয়। যে দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও মেধাবী সেই এই বিত্তের অধিকারী। সমস্ত অজ্ঞানপুঞ্জের উপর ব্রহ্মাস্ত্রের মত কাজ করে উপনিষদের একটি মাত্র শব্দ—অভয়। মঙ্গলপথের নায়কই হচ্ছে এই অভয় আর হীনতা দুর্বলতা কাপুরুষতাই পাপ। তাই একমাত্র ধর্মই হচ্ছে বলসাধনা, শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠাই ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠা।

সুভাষ তার প্রাণে যেন এক নতুন তাপ নতুন দীপ্তি খুঁজে পেল। নতুন বিশ্বাস। কী বলেছেন স্বামীজি? বলেছেন, 'বিশ্বাস—বিশ্বাসই মানুষকে সিংহ করে। যদি জড়জগতে বড় হতে চাও, বিশ্বাস করো তুমি বড়। আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, তুমি হয়তো পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জেনো, অনন্ত সমুদ্র আমাদের উভয়েরই পশ্চাদ্দেশে রয়েছে, সেই অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেই ভাণ্ডার থেকে যত ইচ্ছে শক্তি সংগ্রহ করতে পারি। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস করো।

মূল কথা হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না হলে বিশ্বাস আসবে কী করে? নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শেখ—তোমার মাঝেই রয়েছে সেই অনন্তের আয়তন। আর ঈশ্বর কে? তুমিই ঈশ্বর। তাই আত্মবিশ্বাসই ঈশ্বরবিশ্বাস।

আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে তা একান্ত অনস্তি-ভাবপূর্ণ—স্কুলবালক কিছুই শেখে না, তার সমস্ত কেবল ভেঙে-চুরে যায়—ফল শ্রদ্ধাহীনত্ব। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে সাহসী করেছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলছে, সেই শ্রদ্ধারই বিলুপ্তি। অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানঃ বিনশ্যতি। তাই আমরা বিনাশের এত কাছাকাছি চলে এসেছি।'

'ধর্ম আর কী!' আবার বলছেন স্বামীজি, 'ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান তারই প্রকাশ। তুমি হচ্ছ অনন্তেরই অংশ, এই হচ্ছে তোমার স্বরূপ। তুমি তোমার স্বরূপে উদ্‌ঘাটিত হও। সেই উদ্‌ঘাটনের আগে তোমার ছুটি নেই। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত। ওঠো জাগো তোমার সেই পরমতমকে না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়ো না।'

কৃষ্ণ সেন সুভাষ আর তার সন্নিহিততম বন্ধু চারুকে স্বামীজির গ্রন্থাবলী দিয়ে গেল পড়তে। বললে, 'আস্তে আস্তে একটু একটু করে পড়ো, যেখানটায় শক্ত ঠেকে, আমাকে বোলো, আমি চেষ্টা করব বুঝিয়ে দিতে। পড়তে-পড়তে দেখবে একটা অনির্বচনীয় উপলব্ধির সমুদ্রে—রসের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েছ।'

'আর এ এমন এক সাগর, অমৃতের সাগর, যেখানে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়।'

'তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলুন।' সুভাষ আর চারু একসঙ্গে অনুরোধ জানায়।

কৃষ্ণ সেন শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নমস্কার করে বললে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। কর্ম তো আদিকাণ্ড, জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তবে কর্ম, নিষ্কাম কর্ম একটা উপায় মাত্র।'

'নিষ্কাম কর্ম!'

'হ্যাঁ, ফলের আশা না রেখে কাজ করে যাওয়া। শুধু কাজের জন্যে কাজ করে যাওয়া। খেলার জন্যেই খেলে যাওয়া! এই যে দেশে কতগুলো যুবক স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতি দিচ্ছে,' কৃষ্ণ সেনের দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'তারাই নিষ্কাম কর্মী। তাদের এ উদ্দেশ্য নয় দেশ স্বাধীন করবার পর তারা মন্ত্রী হবে কি লাট-বেলাট হবে, কি অন্তত বড়লোক হবে। তাদের আত্মাহুতির জন্যেই আত্মাহুতি। এই দেখ স্বামীজি কী বলছেন।' কৃষ্ণ সেন বইয়ের পৃষ্ঠা ওলটালো: 'ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখ—মানুষ চাই, পশু নয়। নিরাশ হয়ো না, স্মরণ রেখো, ভগবান গীতায় বলছেন, কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়। আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। আমাদের আবার ভয় কী, নৈরাশ্য কী। উঠে পড়ে লাগো! নাম যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্যে পিছনে তাকিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কর্ম করো। মনে রেখো, তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ—অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করে রজ্জু প্রস্তুত হলে তাতে মত্ত হাতিকেও বাঁধা যায়। সাহসী হও, তোপের মুখে যাও—মানুষ একবার মাত্রই মরে। আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই যা কিছুতেই কম্পিত হয় না। দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো। এমনি কত শত কথা—'

বালগঙ্গাধর তিলকের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ অতিথি হয়ে কাটিয়েছিলেন কয়েকদিন। কে জানে সেই সংস্পর্শ থেকে কোনো অনুপ্রাণনা তিলকে সঞ্চারিত হয়েছিল কিনা। বম্বে থেকে পুনা যাচ্ছে তিলক, স্টেশনে, তার ট্রেনের কামরায় একজন সন্ন্যাসী উঠল। কজন গুজরাটি ভদ্রলোক সন্ন্যাসীকে তুলে দিতে এসেছিল, তিলকের সঙ্গে মামুলি পরিচয় করিয়ে দিল। সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে বললে, 'ইনি পুনা যাচ্ছেন। পুনাতে আপনার বাড়িতেই তো থাকতে পারেন।'

'অনায়াসে।' তিলক আতিথেয়তায় প্রসারিত হল।

নিভৃত হবার পর তিলক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার নাম কী?'

সন্ন্যাসী মৃদু হাসল। বললে, 'সন্ন্যাসীর কোনো নাম নেই।'

ন দশ দিন সন্ন্যাসী থাকল তিলকের বাড়িতে, কিন্তু তিলেকের জন্যেও ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছাড়া কথা নেই। বেদান্ত আর অদ্বৈতবোদ। সোঽহং আর তত্ত্বমসি। আমিও ঈশ্বর তুমিও ঈশ্বর। তিলেকের জন্যেও অহঙ্কার নেই, আত্মপ্রচার নেই। কে তিনি ধূসরতম ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। এমন নির্লিপ্ত এমন নিরাসক্ত।

'আচ্ছা মহারাজ, গীতা কী শেখায়, সংসারত্যাগ, না, নিষ্কাম কর্ম?'

সন্ন্যাসী বললে, 'নিষ্কাম কর্ম।'

'আমারও সেই মত।' বললে তিলক, 'ত্যাগ যদি কিছু থাকেও সে কর্মত্যাগ নয় সে ফলত্যাগ।'

'হ্যাঁ,' বললে সন্ন্যাসী, 'সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ববুদ্ধি। কর্তৃত্বাভিমানত্যাগ আর ঈশ্বরে সর্বকর্মসমর্পণ।'

সন্ন্যাসী চলে গেল—কোথায় গেল কে জানে। সঙ্গে একটা কপর্দকও নেই, আসনের জন্যে অজিন আর পরিধানের জন্যে একখানি কি দুখানি গেরুয়া। আর হাতে কমণ্ডলু। এই সন্ন্যাসীর সমস্ত বিত্ত।

'কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল তিলক।

'জানি না।' বললে সন্ন্যাসী, 'শুধু এইটুকু জানি পথই আমাকে পথ দেখাবে। আমার গুরুমহারাজ শুধু বলতেন এগিয়ে চলো—'

কোথায় গেল কে বলবে? দু-তিন বছর বাদে খবর এল স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক ভারতীয় সন্ন্যাসী শিকাগো ধর্মসভায় দিগ্বিজয় করে দেশে ফিরেছে। ভারতবর্ষের যে শহরেই যাচ্ছে দিচ্ছে রোমাঞ্চকর বক্তৃতা, মানুষের প্রকৃত সত্তাই যে ঈশ্বরত্ব এই রোমাঞ্চ। এই তো কাগজে-কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে। এ কী আশ্চর্য, এ তো সেই সন্ন্যাসী যে পুনায় তার বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিল ন-দশ দিন—সেই ঈশ্বরতন্ময় বেদান্তসিংহ।

স্বামীজিকে তখুনি চিঠি লিখল তিলক। আপনিই কি সেই সন্ন্যাসী?

স্বামীজি উত্তর দিলেন: আমিই সেই।

সেই তিলকের ছয় বছর জেল হল। কেন? ক্ষুদিরামের কাজ পরোক্ষে সমর্থন করে তার কাগজ কেশরীতে প্রবন্ধ লিখেছিল বলে। লিখেছিল, বোমা ছুঁড়ে মারাটা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু কী করবে ক্ষুদিরাম? ব্রিটিশের এত লাঞ্ছনা ও অপমানের উত্তরে সে আর কী করতে পারে? হত্যাকে নিন্দা করতে চাও করো, কিন্তু আত্মাহুতিকে বন্দনা করো।

আট

'চারু! চারু!' চারুর বাড়ির দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে সুভাষ ডাকছে বন্ধুকে।

চারু বেরিয়ে এল।

'মঠে রামদাসবাবাজী এসেছেন, যাবে?'

মঠ মানে চরণদাস বাবাজীর মঠ, বুঝতে পারল চারু। বললে, 'যাব।'

'চলো না দেখি কী বলেন?'

'চলো।'

দুই বন্ধু হাঁটতে লাগল।

'স্বামী বিবেকানন্দ পড়ছ?' চারু জিজ্ঞেস করলে।

'পড়ছি। বুঝছি। ভীষণ ভালো লাগছে।'

'অদ্ভুত ভালো।'

সুভাষ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললে, 'আমিই সেই, সোহহং। কত বড় আশা। বীজের

মধ্যে যেমন বনস্পতি তেমনি আমার মধ্যেই ব্রহ্ম। একটা স্ফুলিঙ্গের মধ্যে প্রকাণ্ড দাবানল।'

'কত বড় সম্ভাবনা।' চারুও প্রতিধ্বনিত হল: 'আমরা সবাই মেঘে ঢাকা সূর্য, শুধু মেঘটা সরিয়ে দেওয়া।'

'অদ্বৈতই একমাত্র মতবাদ, স্বামীজি বলছেন,' বললে সুভাষ, 'যা মানুষকে তার স্বাধিকার দেয়, যা তার সমস্ত পরাধীনতা, সমস্ত কুসংস্কার দূর করে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা ও কাজ করবার সাহস যোগায়। সেই শেষকালে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম করে তোলে।'

'ম্যাক্সমুলারও তাই বলেছেন, অদ্বৈতবাদই ধর্মজগতে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার!'

'অদ্বৈতবাদ এত সোজা, স্বামীজি বলছেন, একটা শিশুকেও আমি এই জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে পারি।' সুভাষ বললে।

চারু প্রতিধ্বনিত হল: 'হ্যাঁ, আরো বলেছেন, উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যগুলোর শিক্ষা একেবারে প্রথম থেকেই দেওয়া উচিত।'

দু বন্ধু মঠে এসে উপস্থিত হল।

দেখল বাবাজি মঠের বাইরে গাছের নিচে বসে আছেন, তাঁর মনের প্রশান্তিই যেন গাছের ছায়া হয়ে বিস্তীর্ণ। দু বন্ধু প্রণাম করে মাটিতে বসল আসনপিঁড়ি হয়ে।

সশ্রদ্ধ বিনীত কণ্ঠে সুভাষ বললে, 'আমরা আপনার কাছে এসেছি, আমাদের কিছু উপদেশ করুন।'

বাবাজি বিস্মিত হলেন। বললেন, 'আহা এমন কথা তো কেউ বলে না। সবাই তো শুধু বক্তৃতা ঝাড়ে, উপদেশ শুনতে চায় কজন? সকলে শুধু নেতা হতে চায়, সেবক হতে চায় না। সেবক হতে না শিখলে নেতা হবে কী করে?'

'স্বামী বিবেকানন্দও সেই কথা বলেন,' সুভাষ বললে, 'বলেন, যদি নেতৃত্ব চাও সকলের গোলাম হয়ে যাও।'

চারুও যোগ করে দিল: 'আরো বলেন, নেতৃত্ব করবার সময় দাসভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও, আর একজন বন্ধু অপর বন্ধুকে গোপনে নিন্দা করছে সে নিন্দা শুনো না।'

'বাঃ, খুব ভালো কথা।' বাবাজি বুঝি স্বামীজি সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল, বললেন, 'নেতৃত্বের লোভ একটা পাশব প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। আমি তোমাদের, তোমাদেরি লোক, এ যে শুধু বলতে পারে নয় করে দেখাতে পারে, সে-ই নেতা হবার উপযুক্ত। তারই জন্যে প্রথম কথা হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, চরিত্রগঠন। স্বামী বিবেকানন্দের তপস্যা আর কী! শুধু ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য না থাকলে শরীরে বল থাকবে না, আর শরীরে বল না থাকলে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবে কী করে?'

সুভাষ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'স্বামী বিবেকানন্দও ঐ কথা বলেন। চাই লৌহদৃঢ় মাংসপেশী, ইস্পাতকঠিন স্নায়ু, বজ্রভীষণ মনোবল।'

বাবাজি প্রসন্নমুখে বললেন, 'বলবেনই তো। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণেরও এই কথা। তাঁদেরও আগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ সুর। কী সব শক্তিশালী পুরুষ! তাঁদের পৌরুষের

ভিত্তিই ঐ ব্রহ্মচর্য। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার।'

'আমার স্বামী বিবেকানন্দকে খুব ভালো লাগে।' সুভাষ পরিপূর্ণ কণ্ঠে বললে।

বাবাজি উদার স্বরে অকুণ্ঠ সায় দিলেন: 'লাগবেই তো, সকলকেই ভালো লাগবে। বিবেকানন্দের জ্ঞান, রামকৃষ্ণের ত্যাগ আর মহাপ্রভুর ভক্তি। আবার সকলের মধ্যেই সমস্ত।'

সুভাষ আনন্দে উথলে উঠল: 'বিবেকানন্দ দেশকে, দেশের প্রতি ধূলিকণাকে কী রকম ভালোবাসেন! দেশমাতাই তাঁর জগন্মাতা। কী রকম বলছেন, আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হোন, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের কিছু দিন ভুলে থাকলে ক্ষতি নেই। আর-আর দেবতারা ঘুমুচ্ছেন। তোমার স্বজাতি দেশবাসী এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত। বলুন ঠিক বলেন নি?'

'নিশ্চয়, সুন্দর বলেছেন।'

'আর ওঁর শিবজ্ঞানে জীবসেবা—খুব ভালো লাগে আমার। শিব ভাবলেই সেবা আর সেবা থাকবে না, পূজা হয়ে উঠবে।'

বাবাজি সমর্থনে মাথা নাড়লেন: 'মহাপ্রভুরও সেই কথা—জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।'

চারু বন্ধুপ্রীতিতে কোমলার্দ্র হয়ে বললে, 'আবার এদিকে যখন কৃষ্ণকীর্তন হবে তখন ইনি কান্নায় ভেসে যাবেন।'

বাবাজি গদগদভাবে বললেন, 'আহা, সব একসঙ্গে এসে মিলেছে। কিন্তু সব টিকিয়ে রাখতে হলে চাই চরিত্র, ব্রহ্মচর্য। যে নৌকোয় হাল নেই সে ঝড়তুফানে টিকবে কী করে? তেমনি যার চরিত্র নেই সে অতল পাতালে ডুববে।'

'আপনার উপদেশ আমরা পালন করব। আপনি আশীর্বাদ করুন।'

দু বন্ধু আবার আভূমি প্রণত হল, বাবাজি ওদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ। যে ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত সেই বীর্যবান হতে পারে। তারই রক্তবিন্দু তেজকণিকায় পরিণত হয়। আর কোনো তপস্যা নয়, ব্রহ্মচর্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। যে ব্রহ্মচারী তারই অন্তর আনন্দময়, মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ, শরীর দৃঢ়, মুখশ্রী লাবণ্যপূর্ণ। জীবনের এতগুলি সম্পদ কে বিসর্জন দেবে?

'আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তচিন্তয়া। দদ্যান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি॥' যে পর্যন্ত নিদ্রায় না আচ্ছন্ন হও, যে পর্যন্ত না কালগ্রাসে পতিত হও, সে পর্যন্ত বেদান্তচিন্তায় সময় ব্যয় করো, কামকে কিছুমাত্র অবসর দিও না।

বেদান্তচিন্তা কী? 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা'—সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্তই ব্রহ্ম। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' আমিও ব্রহ্মাত্মক আর এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চও ব্রহ্মাত্মক। কিছুই ব্রহ্মবিরহিত, ব্রহ্মাতিরিক্ত নয়। সুতরাং বেদান্তচিন্তা অর্থ সর্বক্ষণ ঈশ্বরমননে অধিষ্ঠিত থাকা।

আবার যখন দ্বৈতবাদে আসবে, ভক্তিতে আসবে, তখন তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি মা আমি সন্তান, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। তখন ঈশ্বরকে শুধু জানা নয়, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে জানা। 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।'

আর এই ঈশ্বরে আশ্রিত হতে না পারলে কী করে নির্ভয় হতে পারব? আর নির্ভয় হতে না পারলে কী করে উচ্চারণ করতে পারব বন্দেমাতরম্? দেশমাতাকে জগন্মাতারূপে চিনব কী করে?

দু বন্ধু ফিরে যাচ্ছে আশ্রম থেকে। যেতে-যেতে কথায়-কথায় সুভাষ বললে চারুকে, 'বুঝলে চারু দেশকে শুধু ভালোবাসলেই চলবে না, তার বন্ধনমোচন করে তাকে স্বাধীন করতে হবে।'

চারু বললে, 'নিশ্চয়ই, একশোবার। দেশ যদি আমাদের মা হয় তবে তাঁর পায়ের বেড়ি আমাদের খুলে ফেলতেই হবে।'

'তার জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয় তাতেও আমরা পেছপা হব না।'

দেশমুক্তির আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, আগুন জ্বলেছে মহারাষ্ট্রে, মাদ্রাজে, পাঞ্জাবে, উত্তরপ্রদেশে। বাংলা যা দেখায় তাই আর সকলে শেখে। বিদায় সংবর্ধনা সভায় নাসিকের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা গুলি ছোঁড়ে। এ গুলি ফসকাল না, জ্যাকসন নিহত হল। অনন্তলক্ষ্মণ কানাইয়ে, বিনায়ক দেশপাণ্ডে আর কৃষ্ণজি কোপাল কার্ভের ফাঁসি হল। বিনায়ক দামোদর সাভারকার পিস্তল পাঠিয়েছে বিলেত থেকে এই অজুহাতে তাকে বিলেতে গ্রেপ্তার করে। জাহাজে করে যখন তাকে দেশে আনা হচ্ছে তখন সে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে। সেটা মার্সাই বন্দরের কাছাকাছি, বাথরুমে যাবার নাম করেই সে পুলিসের দৃষ্টির অগোচরে আসে। ইংরেজ পুলিস কল্পনাও করতে পারেনি কেউ মত্ততরঙ্গ সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে পারে। সে কী করে বুঝবে পরাধীনতার কী জ্বালা! আর সে বন্ধন মোচনের জন্যে দেশমাতৃকার বৃহৎব্রতধর বীর পুত্র এত অক্লেশে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে।

সাভারকার সাঁতরে তীর পেল বটে কিন্তু মুক্তির তীরে পৌঁছুতে পারল না। ফরাসী পুলিস তাকে ধরে মাসতুতো ভাই ইংরেজ পুলিসের কাছে গছিয়ে দিল। ভারতবর্ষে চালান হল সাভারকার। ইংরেজের বিচারে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

তার আগে মদনলাল ধিঙড়ার কথা মনে করো। ভারতসচিব মর্লির এ.ডি.সি. স্যার কার্জন ওয়াইলিকে গুলি করে মারলে। মারলে লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে। ওয়াইলিকে বাঁচাতে গেল ডাঃ লাল কাকা কিন্তু সেও বাঁচলে না। পাঞ্জাবি যুবক ধিঙড়ার কী আনন্দ! সারা ইংলণ্ডে এ বিশ্বাস জেগেছিল কালা আদমির গুলি খালি ফসকায়, নিজের দেশের লোকদের মারতে পারলেও শাদা আদমিকে স্পর্শও করতে পারে না। কী করে পারবে? শাদা আদমিরা যে স্বর্গপ্রসূত! বিধাতার বরপুত্র। এ শুধু শাদা আদমিকে মারা নয়, একেবারে খোদ লণ্ডনে দাঁড়িয়ে মারা! বিচারে ধিঙড়ার ফাঁসি হবে এ আর বেশি কথা কী। ফাঁসির আদেশ শুনে ধিঙড়া ইংরেজ জজকে সম্বোধন করে বললে, আমাকে আমার দেশের জন্যে মরবার সম্মান দিচ্ছেন বলে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

তারপরে মাদ্রাজে, তিনিভেলির ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট র‍্যাশকে একটা রেলের কামরার মধ্যে খুন করা হল। আততায়ী যুবক ভিঞ্চি আয়ার আত্মহত্যা করে গ্রেপ্তার এড়াল। তার পকেটে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল, তাতে লেখা: ম্লেচ্ছনিবহ-নিধনে ভিঞ্চি

তার কর্তব্য করেছে মাত্র। তার কদিন আগেই সে এক পুস্তিকা প্রচার করে, তার মূল কথা: ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াও। রামদাস স্বামী আর শিবাজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করো।

সুভাষ বললে, 'ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারলে একসঙ্গে কত শত্রু মারা যেত।'

'কিন্তু যুদ্ধ করবার মত হাতিয়ার কই?'

'সেই হচ্ছে কথা। কিন্তু এমনি খুচরো হত্যা করে কী করে ওদের ঝাড়েবাঁশে তাড়াবে?'

সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। তার মানে শুধু ইংল্যাণ্ডস ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া পড়ো। ইংরেজ যা দয়া করে বলে দেবে তাই তোমার দেশের ইতিহাস।

'তা আমরা মানি না।' চারু আর সুভাষ দুই বন্ধুই স্কুলের এক বিতর্ক সভায় উচ্চনাদ আপত্তি জানাল। ইতিহাস পাঠের উপকারিতা কী এই নিয়ে বিতর্ক। উপকারিতার কথা পরে হবে, ইতিহাসটা কী বস্তু তাই আগে সাব্যস্ত হোক। ইতিহাসটা অন্তত সত্যবস্তু হবে এ দাবি প্রাথমিক। তাই সমস্ত সত্য ইংরেজের লেখা ইতিহাসে পাওয়া যাবে না, ভারতীয় ঐতিহাসিকের রচনাও পড়তে হবে। ইংল্যাণ্ডস ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া আমরা পড়ব, সঙ্গে সঙ্গে পড়ব দেউস্করের 'দেশের কথা।'

'দেশের কথা!' হেডমাস্টার খেপে গেল।

রিপোর্ট পাঠাল উপরে। এই দুটো দেশদ্রোহী ছেলেকে অন্তরীন করা যায় কি না।

এই কথা? সব ছেলে লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়তে লাগল দেশের কথা। সুভাষ বাঙালি ছেলেদের নিয়ে দল পাবাল। যদি হেডমাস্টার কোন শাস্তি দিতে চায় তা হলে সব বাঙালি ছেলে একজোট হয়ে ট্রান্সফার নিয়ে বসবে। হ্যাঁ, একজোট হয়ে। সুভাষের গঠনশক্তির জোর দেখে হেডমাস্টার ঘাবড়ে গেল। বাঙালি ছেলেরা চলে গেলে তার স্কুলের আর থাকল কী। বাঙালি ছেলেরাই তো ভালো ছেলে, স্কুলের-নাম রাখা ছেলে!

কিন্তু এ সব বোধহয় রাজনীতি হচ্ছে। সুভাষের বাড়িতে রাজনীতি অচল। দাদারা মাঝে মাঝে যা বলাবলি করে তাই সুভাষ শোনে। কিন্তু প্রত্যক্ষ আন্দোলনে কেউ এখনো নামে নি, নামবার কথা ভাববারও কারু অবকাশ নেই।

নানা বিশুদ্ধ চিন্তায় শুধু ধমনীতে রক্ত নির্মল হতে থাকে। দু বন্ধু, সুভাষ আর চারু, কাঠজুড়ি নদীর ধারে বেড়ায় আর গান গায়:

'আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই॥
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়—
সময় সময় করে পাঁজি পুঁথি ধরে

সময় কোথা পাবি বল ভাই
আগে চল আগে চল ভাই॥'

নয়

সন্ধ্যায় নিয়মিত বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছে সুভাষ আর চারু, হঠাৎ দেখল একটা বাড়ির সামনে কতগুলি লোকের ভিড় জমেছে। এ কী, কে, কারা কাঁদছে? ব্যাপার কী?

'কী হয়েছে?' সুভাষ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'বাড়ির কর্তা মারা গিয়েছে।'

এটুকু খবরই তো যথেষ্ট। এর বেশি কে মাথা গলায়! এটুকু খবর নিয়ে কেটে পড়াই তো যথেষ্ট ভদ্রতা।

না, আরো একটু জানা দরকার।

'কে বাড়ির কর্তা?'

'একজন বাঙালি মুহুরি।'

'কখন মারা গেছেন?'

'সকালের দিকে।'

'সকালের দিকে!' সুভাষ বিস্ময় মানল: 'তা এখনো মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়নি কেন?'

'সেই নিয়েই তো কান্না। মৃতের জন্যে তত নয় যত মৃতদেহের সৎকার হচ্ছে না তার জন্যে।'

'সৎকার হচ্ছে না কেন?'

'ভদ্রলোক বসন্ত হয়ে মারা গেছেন, তাই তাঁর মৃতদেহ কেউ ছুঁতে চাচ্ছে না।'

'ছুঁতে চাচ্ছে না আর তাই আপনারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছেন? এত ভয়, এত কুসংস্কার!' সুভাষ বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল: 'বেশ, আর কেউ না যায়, আমি একাই এই মৃতদেহ কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যাব।'

চারু এগিয়ে এসে সুভাষের হাত ধরে টেনে বাধা দিল। বললে, 'সে কি, তুমি—'

'হ্যাঁ, তুমি আমার বাড়ি গিয়ে খবর দাও, আমি শ্মশানে যাচ্ছি, কখন ফিরব তার ঠিক নেই।'

ভিড় সরিয়ে এগুতে চাইল সুভাষ।

একজন চারুকে জিজ্ঞেস করলে, 'কে ও?'

চারু বললে, 'সরকারী উকিল রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসুর ছেলে।'

'বলো কী! এত বড় ভদ্রলোক—'

সুভাষ জনতাকে লক্ষ্য করে অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'পথ দিন, বাড়ির ভেতরে যাই—'

একটি যুবক এগিয়ে এসে সুভাষকে বললে, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

আরো একটি ছেলে এগিয়ে এল। কোঁচা খুলে কোমরে জড়াল, বললে, 'আমিও যাব।'

'হ্যাঁ, কিসের ভয়, কিসের প্রাণের মায়া!' সুভাষ বললে উদ্বেল কণ্ঠে, 'পরসেবাই ঈশ্বরপূজা।'

স্বামীজির কথাটা কাজ করল মন্ত্রের মত। ভিড়ের মধ্যে তখন রোল উঠল: আমিও যাব, আমিও যাব।

কী বলছেন স্বামীজি? বলছেন, তারাই যথার্থ জীবিত যারা অপরের জন্যে জীবনধারণ করে। পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। কাজ করো, পরের হিতের জন্যে কাজ করাই জীবনের লক্ষণ। পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। পরোপকারের জন্যেই সাধুদের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্যে সমুদয় ত্যাগ করবে। তোমার ভালো করলেই আমার ভালো হয়, দোসরা আর উপায় নেই, একেবারেই নেই। সমস্ত শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুটি বাক্য শুধুই আছে—পরোপকারবস্তু পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম, মানে, পরোপকার করলেই পুণ্য আর পরপীড়ন করলেই পাপ।

পরোপকারও করতে চাইলেই করা যায় না। গাঁয়ের লোকদের লেখাপড়া শেখাবার উদ্দেশ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে এক গাঁয়ে ঢুকল সুভাষ। ওরে ওরা লেখাপড়া শেখাতে এসেছে বলছে, পালা, ওদের আসল মতলব কে জানে। ভদ্রলোকদের পোশাকে আচ্ছাদিত সুভাষ ও তার বন্ধুদের গাঁয়ের লোক কিছুতেই আপন জন বলে মনে করতে পারল না, দূর থেকে দেখেই তারা ছুট দিল।

পরোপকার পরে হবে, আগে কিছু আত্মোপলব্ধি হোক। সুভাষ যোগে মন দিল। মনকে ধ্যানে সমাহিত করে বসল ঘরের কোণে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো তাই বলেছেন, ধ্যান করবে মনে, বনে, বা কোণে। সেই কোণেই বসেছে সুভাষ। ধ্যানে মনে শান্তি জাগবে, পবিত্রতার শান্তি আর শরীরে প্রসন্নতা, স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রসন্নতা।

কিন্তু শুধু বই পড়ে কি যোগ শেখা যায়? যোগ তো শুধু চোখ বুজে বুক টান করে চুপচাপ বসে থাকা নয়, যোগ হচ্ছে ভগবৎ-সত্তায় নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেওয়া, বাইরে নিষ্কাম কর্ম করা আর অন্তরে ভগবৎ-তন্ময় হয়ে থাকা, যুদ্ধেও যোগের বিক্ষেপ নেই, সেই যোগ শিখতে কি একজন গুরুর দরকার হবে না? কখন গুরু আসে ঠিক নেই, ইতিমধ্যে নিজের চেষ্টায়ই যথাসাধ্য করা যাক। যোগ না করলে অভি-নিবেশ গাঢ় হবে না, মেধা তীক্ষ্ণ হবে না, ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হবে না। তাই মেঝেতে আসন করে সুভাষ বসেছে তদ্গত হয়ে। কতক্ষণ বসেছে তার খেয়াল নেই।

মা প্রভাবতী ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী রে সুবি, তোর হল? আমাকে আজ কথামৃত পড়ে শোনাবিনে?'

মার ডাক শুনে সুভাষ উঠে পড়ল। উঠেই মাকে প্রণাম করল।

প্রভাবতী এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, 'এ কী!'

সুভাষ লজ্জিত মুখে বললে, 'এখন থেকে ভেবেছি ভোরে উঠে রোজ তোমাকে আর বাবাকে প্রণাম করব।'

ছেলের কখন কী খেয়াল হয় কে বলবে। সস্নেহ প্রশ্রয়ে তাকিয়ে রইলেন প্রভাবতী। মাকে যখনই চিঠি লিখেছে সুভাষ, ঠিকানায় লিখেছে: শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী। পরম-পূজনীয়া বা শ্রীচরণকমলেষু এ সব ঠিকই আছে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাকে শ্রীযুক্তা না বলে

শ্রীমতী বলা। শ্রীযুক্তা ও শ্রীমতীর একই অর্থ, তবু শ্রীযুক্তা যেন দূরস্থিতা আর শ্রীমতী যেন সর্ববান্ধবরূপিণী অন্তরঙ্গা। শ্রীযুক্তা যেন পূজার ঘরে সিংহাসনে বসে আছে আর শ্রীমতী যেন ঘরের কাজকর্ম করছে, ক্ষুধায় খেতে দিচ্ছে, রোগে সেবা করছে, শাসনে দৃঢ় হয়েও সহস্র আবদার পালন করছে হাসিমুখে। 'গৃহলক্ষ্মীশ্চ গেহিন্যাং গেহে চ গৃহদেবতা।' 'যা শ্রী স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষু।'

সুভাষ বইয়ের সেলফ থেমে কথামৃত নিয়ে বসল মেঝেতে। মা-ও বসলেন।

পড়তে-পড়তে এক জায়গায় হঠাৎ থেমে পড়ল সুভাষ। বললে, 'মা, দেখ শ্রীরামকৃষ্ণের কী অপূর্ব ত্যাগ! খড়গহস্তা আনন্দময়ী কালীকে সব দিচ্ছেন আর বলছেন—' বইয়ের সে জায়গাটা বার করল: 'মা, এই নাও তোমার ভালো, এই নাও তোমার মন্দ, এই নাও তোমার পূণ্য, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার শুচি এই নাও তোমার অশুচি—' মুখ তুলল সুভাষ: 'জানো মা, করালবদনা কালী অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সমস্ত গ্রাস করতে চায়, সমস্ত গ্রাস না করে সে ছাড়বে না আর রামকৃষ্ণেরও সমস্ত না দিয়ে দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। কিন্তু মা, জানো, রামকৃষ্ণ সব দিল কিন্তু একটা জিনিস—সত্য দিতে পারল না।'

প্রভাবতী বললেন, 'সত্য দেবেন কী করে? সত্যই তো মা কালী।'

'হ্যাঁ মা, বিবেকানন্দেরও সেই কথা। স্বয়ং ঈশ্বরই সত্য। জীবনে মহতের আর বৃহতের শেষ সীমাই ঈশ্বর। আর একমাত্র মানুষই ঈশ্বর হতে পারে। মানুষই ঈশ্বরের প্রতিভাস।'

ঘরের বাইরে থেকে জানকীনাথ ডাকলেন: 'সুবি!'

সুভাষ উঠে পড়ল। অনেক সাহস সঞ্চয় করে কাছে গিয়ে ধপ করে প্রণাম করে বসল।

জানকীনাথ থমকে গেলেন। 'এ আবার কী!'

মৃদু হেসে প্রভাবতী বললেন, 'ওকে কোন সাধু বলে দিয়েছে নিত্য প্রভাতে বাবা-মাকে প্রণাম করবে।'

জানকীনাথ ছেলের দিকে তাকালেন। সুভাষ লজ্জিত মুখে একপাশে সরে দাঁড়াল।

'বাপ-মায়ের উপর ভক্তি তো ভালো, কিন্তু' জানকীনাথের স্বরে ঈষৎ অসন্তোষ ফুটল : 'হঠাৎ সাধুসন্ধানে মন কেন?'

সুভাষ বিনীত ভঙ্গিতে চুপ করে রইল।

'জিজ্ঞেস করি পড়ার বইয়ে ভক্তি কেমন?' জানকীনাথ স্পষ্টতর হলেন : 'কেমন হচ্ছে পড়াশুনো?'

'ভালো হচ্ছে।'

'সামনেই তো ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা, কী রকম বুঝছ? কে ফার্স্ট হবে? তুমি না চারু?'

সুভাষের উত্তর দেবার আগেই বাইরে থেকে কে ডেকে উঠল : সুভাষ!

এ কণ্ঠস্বর এ বাড়ির সকলের পরিচিত। প্রভাবতী বলে উঠলেন : 'এ যে চারুর গলা। এস এস চারু।'

চারু ঘরে ঢুকতেই জানকীনাথ প্রসন্নমনে বলে উঠলেন : 'আরে নাম করতেই যে চারু এসে উপস্থিত। কী ব্যাপার ?'

চারু বললে, 'কৃষ্ণনগর থেকে হেড মাস্টারমশাই একটি ছেলের হাত দিয়ে সুভাষকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন।'

'কে বেণীমাধববাবু ? কি লিখেছেন ?'

সুভাষ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে কপালে ঠেকাল। পড়ল চিঠি। পড়া সাঙ্গ করে বললে, 'মাস্টারমশাই লিখেছেন তাঁর স্কুলের ফার্স্ট ক্লাসের ছেলে হেমন্তকুমার সরকার চেঞ্জের জন্যে কটক যাচ্ছে। পুরীর সমুদ্রের ধারে তার জন্য যেন কোথাও একটা জায়গা ঠিক করে দিই। আরো লিখেছেন এক মিনিট আলাপ করলেই বুঝতে পারবে ছেলেটির চরিত্র।' বলেই চারুর প্রতি উৎসুক হল সুভাষ : 'কই হেমন্ত কোথায় ?'

'আমাদের বাড়িতে উঠেছে।' চারু ব্যস্ত হয়ে বললে, 'চলো দেখা করে আসবে।'

'আমি এখুনি আসছি বাবা। মা, আমি ফিরে এসে তোমায় কথামৃত শোনাব।' বলে সুভাষ বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

কথামৃতই বটে! এমন কথা কে কবে বলেছে! এত সহজ করে এত হৃদয়হরণ করে!

সব মাকে দিতে পারলুম, সত্য মাকে দিতে পারলুম না। বলছেন, 'এই রকম আছে যে সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে রাখলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায়।'

নিবৃত্তিই ভালো, প্রবৃত্তি ভালো নয়। এই অবস্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল— যেমন সবাই খাজাঞ্চির কাছে সই করে। আমি বললাম, তা আমি পারব না। আমি তো চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছে হয় আর কারুকে দাও।

বদ্ধজীব হরিনাম শুনতে চায় না, বলে হরিনাম মরবার দিন হবে। এখন কেন ? আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছেলেমেয়েদের বলে, 'প্রদীপে অত সলতে কেন ? একটি সলতে দাও, তেল কম পুড়বে।'

কত দিক দিয়ে কত রকমের কথা।

মণিলাল মল্লিক আর ভবনাথ একজিবিশনের কথা বলছিল। বলছিল, কত রাজারা কত বহুমূল্য জিনিস পাঠিয়েছে, সোনার খাট সোনার টেবিল-চেয়ার— সে সব একটা দেখবার জিনিস—

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, গেলে একটা বেশ লাভ হয়। ঐ সব সোনার জিনিস, রাজারাজড়ার জিনিস দেখে সব ছ্যা হয়ে যায়। সেটাও অনেক লাভ। কলকাতায় আমি যখন আসতাম হৃদে আমাকে লাটসাহেবের বাড়ি দেখাত— মামা, ঐ দেখ লাটসাহেবের বাড়ি, বড় বড় থাম! মা দেখিয়ে দিলেন কতগুলি মাটির ইঁট উঁচু করে সাজানো।'

আর কর্ম করার কথা কী সুন্দর বুঝিয়েছেন।

'পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না— কর্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বরদর্শন হয় না। কর্ম চাই, ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। যো-সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো। দেখা দাও বলে

ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। তাঁর জন্যে একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্যে অমুক পাগল হয়ে গেছে।'

চারু সুভাষকে নিয়ে এল তার বাড়িতে। বাইরের ঘরে একটি শ্যামবর্ণ দীর্ঘায়ত দীপ্তচক্ষু কিশোর বসে আছে। পরিচয় করিয়ে দিতে হল না, যেন কত দিনের চেনা মানুষ, এমনি উত্তপ্ত সৌহার্দ্যে তার হাত ধরল সুভাষ।

'তুমিই হেমন্ত সরকার?'

'আর তুমিই মাস্টারমশায়ের সুভাষচন্দ্র?'

'আমাদের বাড়ি ওঠ নি কেন?'

হেমন্ত আতঙ্কিত হবার ভাব করলে : 'ওরে বাবাঃ, তোমাদের হচ্ছে বড়লোকের বাড়ি, সেখানে আমার মত গরিব কি উঠতে পারে?'

'বড়লোকের ঘরে জন্মেছি সেটা কি আমার অপরাধ?' সুভাষের চোখ প্রায় ছলছল করে উঠল : 'আমি কি বড়লোক?'

হেমন্ত একেবারে সুভাষের কাঁধের উপর হাত রাখল। বললে, 'না, না, তুমি বড়লোক হতে যাবে কেন? তুমি বড় মানুষ। কত বড় তোমার বুক, বুকের পাটা— তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, অনেক পরামর্শ।'

সে যে কী কথা হেমন্তের চোখের দিকে চেয়েই যেন সুভাষ টের পেল। বললে, 'তোমার পুরীর বাসা আগে ঠিক হোক।'

'সে হয়ে যাবে ঠিক, তার জন্যে ভাবি না।' হেমন্তর কণ্ঠ তপ্ততর হল : 'কিন্তু এ এমন কথা যার আর তর সয় না।'

'শুধু কথা?' সুভাষ একটু হাসল।

'না,না, কাজ। কাজের জন্যেই কথা।'

দশ

কাঠজুড়ি নদীর বাঁধের উপর সুভাষ আর হেমন্ত বেড়াচ্ছে।

হেমন্ত বললে, 'এস বসি। কথাটা গোপনীয়।'

নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে দুজনে বসল। হেমন্ত বললে, 'বিপ্লবের পথ ছাড়া দেশকে স্বাধীন করা যাবে না। তোমার কী মত?'

'এ আবার গোপনীয় কী! এ তো জাজ্বল্যমান সত্য।' সুভাষ তার উপলব্ধিতে গম্ভীর হল : 'আমারও সেই মত। স্বাধীনতা কেউ দেয় না, স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হয়।'

হেমন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল : 'আর তা গায়ের জোরে।'

'নিশ্চয়ই। শারীরিক দৌর্বল্যই আমাদের সকল অনিষ্টের মূল। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা ভালো। অনিষ্টের মূল কারণ, আর কিছু নয়, আমরা দুর্বল। আমাদের শরীর দুর্বল মন দুর্বল আত্মবিশ্বাস দুর্বল।'

'গায়ের জোরে মানে কিন্তু অস্ত্রের জোরে।'

'নিশ্চয়ই। গায়ে জোর না থাকলে তুমি অস্ত্র ছুঁড়বে কী করে, কী করে সমস্ত

বিপদ-বাধা তুচ্ছ করবে, মৃত্যুর মুখে বীরদর্পে দাঁড়াবে? বেদান্তে বিশ্বাসী হবে? ভাবতে পারবে তুমি অচ্ছেদ্য অদাহ্য সর্বপ্রকার বিকারশূন্য?'

হেমন্ত সুভাষের হাত চেপে ধরল। নিম্ন গাঢ়স্বরে বলল, 'তুমি আমাদের গুপ্ত সমিতিতে আসবে?'

'কী হয় তোমাদের সমিতিতে?'

'অনেক কিছু হয়।' হেমন্তর স্বর গাঢ়তর হল : 'রিভলভার প্র্যাকটিস হয়। তুমি আমাদের দলে যোগ দেবে?'

'দেব।' এক বাক্যে রাজী হয়ে গেল সুভাষ। পরে স্বচ্ছ বাস্তববুদ্ধিতে বললে, 'কিন্তু আগে পরীক্ষাটা হয়ে যাক।'

হেমন্ত সায় দিল : 'নিশ্চয়ই। পরীক্ষার পরেই তো আসবে।'

সুভাষ বললে, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না বিপ্লবী হবার আগে মানুষ হওয়া দরকার। ত্যাগী, পরোপকারী, আদর্শনিষ্ঠ—'

'একশোবার।' হেমন্ত জ্বলে উঠল : 'ভাবো তো এ সব বীর বঙ্গ সন্তানদের কথা— কী তাদের ত্যাগ, তাদের দেশপ্রেম, পরের জন্যে আমাদের সকলের জন্যে, স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে গেল— ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন বোস, প্রফুল্ল চাকী—'

আরেকটি নাম সুভাষ যোগ করে দিল : 'অরবিন্দ।'

'হ্যাঁ, সবার আগে অরবিন্দ।' হেমন্ত সমস্ত ধমনীতে চঞ্চল হয়ে উঠল : 'বলো এদের আরব্ধ ব্রত কি আমরা সাঙ্গ করব না? সিদ্ধ করব না?'

সবার আগে অরবিন্দ। অরবিন্দ শুধু বিপ্লবী ভাবের নয়, বিপ্লবী কর্মেরও প্রবর্তক। বঙ্গ-ভঙ্গের পর বলেছিল এ মহত্তম আশীর্বাদ কেননা এই বেদনা এই লাঞ্ছনাই দেশমুক্তিকে এগিয়ে আনবে, সৃষ্টি করবে মহাবিপ্লব, মহাজাগরণ। সমস্ত মায়া ও মরীচিকাকে এক নিমেষে উড়িয়ে নেবে। দেশ চিনতে পারবে তার নিজের স্বরূপ।

অরবিন্দ তখন বরোদায়, গাইকোয়াড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি, নিবেদিতা গাইকোয়াড়ের নিমন্ত্রণে বরোদায় আসছে। স্টেশনে আরো অনেক রাজকর্মচারীর সঙ্গে অরবিন্দও গিয়েছে। একটা বড় গাড়ি করে শহরে ঢুকছে, মিনারগম্বুজওয়ালা কলেজ দেখে নিবেদিতা বললে, 'একটা কদর্য স্তূপ', অথচ ভারতীয় রীতিতে তৈরী ছোট একটা গৃহস্থ কুটির দেখে বললে, 'আহা কী সুন্দর!'

একজন হোমরাচোমরা রাজকর্মচারী অরবিন্দের কানে-কানে বললে, 'উনি পাগল নাকি?'

অরবিন্দ-নিবেদিতায় যখন প্রথম সাক্ষাৎ হল, দুজনেই পরস্পরকে চিনল। চিনল, তারা একই মহৎ শিল্পের দুই কারিগর। সেই মহৎ শিল্প বিপ্লব। আর সেই বিপ্লবের মন্ত্র বন্দেমাতরম্।

'কলকাতা আপনাকে চায়।' অরবিন্দকে বললে নিবেদিতা, 'বাংলাই আপনার উপযুক্ত জায়গা।'

অরবিন্দ বললে, 'না। আমার জায়গা পশ্চাতে, নেপথ্যে। আমার কাজ মানুষ

তৈরী করা।'

'আমার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।' নিবেদিতা সরল বন্ধুতায় তার পবিত্র হাতখানি অরবিন্দের দিকে প্রসারিত করে দিল : 'আমি আপনার দলের মানুষ। আপনার

অরবিন্দই গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষা দিল বারীন্দ্রকে, যতীন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামীকে, হেমচন্দ্র কানুনগোকে। হেমচন্দ্র বলছে, 'সেদিন সন্ধেবেলা আমার দীক্ষা আরম্ভ হল। আমি তলোয়ার ও গীতা হাতে নিলাম। অরবিন্দ-রচিত সংস্কৃত মন্ত্র বা সত্যপাঠ পড়বার হুকুম হল। সংস্কৃত লেখাটি না পড়ে, আমি যা বলেছিলাম, যতদূর মনে পড়ে, তা হচ্ছে, ভারতের অধীনতা মোচনের জন্যে সব করব। অরবিন্দ কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে যা বলেছিলাম তাতে বুঝি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমায় সংস্কৃত মন্ত্র পড়বার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন—'

অরবিন্দই হেমচন্দ্র আর বারীনকে পাঠিয়েছিলেন ফুলারকে মারতে। ব্যারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুটি যুবক দেখা করতে এসেছিল রাত্রে। তোমরা কে? যুবক দুটি উত্তর দিল, আমরা ফুলারকে গুলি করতে চলেছি। সুরেন্দ্রনাথ চমকে উঠলেন। বললেন, তাকে মেরে লাভ কী? সে তো চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। একটা মরা লোককে মেরে কী হবে?

স্ত্রীকে চিঠি লিখছে অরবিন্দ : 'প্রিয়তমা মৃণালিনী, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলে জানে। আমি স্বদেশকে মা বলে জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসে যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তা হলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করতে বসে না, মাকে উদ্ধার করতে ছুটে যায়?'

বগলা মূর্তির পূজা করল অরবিন্দ। শত্রুনিধনমানসেই বগলা পূজা। সুধাসাগরমধ্যে মণিময় মণ্ডপ, তার মাঝে রত্ন নির্মিত বেদী, তার উপরে সিংহাসন। তার উপরে বসে আছে বগলামুখী। এর বর্ণ পীত, আভরণ পীত, গলার মালাও পীত। এক হাতে মুদ্গর, অন্য হাতে শত্রুর জিভ। বাঁ হাতে শত্রুর জিভ টেনে ধরে ডান হাতে গদার আঘাতে শত্রুকে প্রহার করছে।

কে অরবিন্দের শত্রু? তার দেশের যে শত্রু সেই তার শত্রু। তার দেশের শত্রু কে? তাও কি বলে দিতে হবে? না বললে হৃদয়ঙ্গম হয় না? শত্রু ঐ সেই রাক্ষস, ইংরেজ, যে শোষণ করে শাসন করছে।

তারপর অরবিন্দ 'ভবানী-মন্দির' লেখে। মর্মকথা আর কিছুই নয়, বিপ্লবের ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে মা ভবানীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে। সেই আত্মসমর্পণই চরম দীক্ষা। মায়ের কাছে শরণ নিলেই আর মৃত্যুভয় থাকবে না। মৃত্যুভয়কে পর্যুদস্ত করে দেবার জন্যেই ভবানীমন্ত্র। এই মন্ত্রের আদি উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র। সে মন্ত্র, আমি আমার মাকে বন্দনা করি। বন্দেমাতরম্। 'আমি অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি, আর কী যমের ভয় করেছি।' বঙ্কিমের মন্ত্রকেই অরবিন্দ মূর্তি দিল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, 'মাতা কে?'

উত্তর না করে ভবানন্দ গাইতে লাগল :

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম
সুখদাং বরদাং মাতরম।।

মহেন্দ্র বললে, 'এ তো দেশ, এ তো মা নয়।'

ভবানন্দ বললেন, 'আমরা অন্য মা মানি না— জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নেই বাবা নেই ভাই নেই বন্ধু নেই স্ত্রী নেই পুত্র নেই ঘর নেই বাড়ি নেই, আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়সমীরণ-শীতলা শস্যশ্যামলা—'

তখন বুঝে মহেন্দ্র বললেন, 'তবে আবার গাও।'

ভবানন্দ গাইল।

মহেন্দ্র দেখল দস্যু গাইতে গাইতে কাঁদছে। মহেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কারা?'

'আমরা সন্তান।'

'সন্তান কি? কার সন্তান?'

'মায়ের সন্তান।'

'ভালো— সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করে মায়ের পূজো করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?'

'আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।'

'এই তো গাড়ি লুটলে।'

'সে কি চুরি-ডাকাতি? কার টাকা লুটলাম?'

মহেন্দ্র অবাক হবার ভাব করল। বললে, 'কেন, রাজার টাকা লুটলে?'

'রাজার টাকা! এই টাকাগুলো যে রাজা নেবে তার কী অধিকার?'

'রাজার রাজভোগ।'

ভবানন্দ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'যে রাজা রাজ্য পালন করে না সে রাজা কী।'

মহেন্দ্র সেপাইয়ের ভয় দেখাল। ভবানন্দ গ্রাহ্য করলেন না, সেপাইয়ের তোপের মুখে পড়তে তাঁর ভয় নেই। বললেন, 'একবার বই তো আর দুবার মরব না। কিন্তু ওদের না তাড়িয়ে মরতেও সাধ নেই।'

'কিন্তু ওদের তাড়াবে কেমন করে?'

'মেরে।'

'তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?'

দস্যু-সন্ন্যাসী আবার গান ধরল :

'সপ্তকোটীকণ্ঠকলকল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।'

এই বন্দেমাতরম্ মন্ত্রই সমস্ত আন্দোলনের নান্দীপাঠ। সর্বাসুরবিনাশা সর্বদানবঘাতিনী

অনেকশস্ত্রহস্তা মাকে প্রণাম করি। এই বন্দেমাতরম্ মুখে নিয়েই তো বিপ্লবীরা ফাঁসিকাঠে উঠেছে, এই মন্ত্রের জোরেই সহ্য করেছে সমস্ত নির্যাতন। এই মন্ত্রই অন্ধের আলো, মৃতের প্রাণ, জড়ের চৈতন্য। শত্রুর উৎপাটন।

বরিশাল কনফারেন্সের কথা ভাবো। অশ্বিনী দত্তের বরিশাল। অরবিন্দ বললে, আমি সেই পূণ্য পীঠস্থলে এসেছি যেখানে অশ্বিনীকুমারের জন্ম ও কর্মযোগের আয়োজন। সম্মিলনের দুই শাখা, রাজনৈতিক আর সাহিত্যিক। রাজনৈতিক শাখার সভাপতি ব্যারিস্টার আবদুল রসুল, সাহিত্যিক শাখার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশ্য স্থানে বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করা যাবে না এই মর্মে ফুলার সার্কুলার জারি করেছে। আর, তারও চেয়ে নির্মম, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন ফতোয়া দিয়েছে কলকাতা থেকে যে সমস্ত নেতা এসেছে তাদের অভ্যর্থনা করবার সময়ও বলা যাবে না ঐ মন্ত্র।

এ কী অপমানকর প্রস্তাব! সুরেন্দ্রনাথ বললে, 'অভ্যর্থনার সময় নাই বা হল, পরে দেখা যাবে।'

নেতারা নামল স্টিমার থেকে। অরবিন্দও নামল। রসুলের গাড়ি আগে চলল, পিছনে আর সকলের। পদব্রজে আপামর সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকের বাহিনী। দু ধারে কাতার-দেওয়া লাঠিয়াল পুলিশ— একটি মাত্র উচ্চারণকে বিধ্বস্ত করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু কার সাধ্য সেই ধ্বনিকে বিধ্বস্ত করে। শ্রুতে রুদ্ধ করলেও অশ্রুতে সে ধ্বনি তরঙ্গিত হবে অন্তরীক্ষে, সন্তানের অন্তরে অন্তরে। বাণী হয়ে বেঁচে থাকবে। ধ্বনি মরলেও বাণী মরে না। বন্দেমাতরম্। শোভাযাত্রার শেষের দিক থেকে উঠল আনন্দ-ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে এলোপাথাড়ি লাঠি পড়ল। বহু লোকের মাথা ফাটল, রক্তে লাল হয়ে গেল রাজপথ।

পুলিশ-সুপার কেম্পকে সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

'আর চালাকি করবেন না, আপনাকে আমি য়্যারেস্ট করলাম।'

ম্যাজিস্ট্রেট তার বাড়িতে বসেই তক্ষুনি সরাসরি বিচারে সুরেন্দ্রনাথকে দুশো টাকা জরিমানা করলে। জরিমানার টাকা তক্ষুনি যোগাড় করে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ চলে এল সভাস্থলে।

বন্দেমাতরম্।

এই তো প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ। একটা নিরুপদ্রব শান্ত জনতা একটা নির্দোষ স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে আর তারই জন্যে ইংরেজের পুলিশ লাঠি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরাচ্ছে অথচ প্রত্যুত্তরে কেউ প্রতিহিংসায় দুর্মদ হয়ে উঠছে না, ছাড়ছেও না তার মুখের মন্ত্র— এ দৃশ্য দুই চোখ বিস্ময়ে বিশাল করে দেখবার মত দৃশ্য। অরবিন্দ দেখল।

সবচেয়ে বেশি করে দেখল চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে। বিজয়কৃষ্ণ-শিষ্য মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার ছেলে। পুলিস সার্জেন্ট যত তাকে লাঠি মারে তত সে বন্দেমাতরম্ বলে। যতবার লাঠি ততবার বন্দেমাতরম্। আবার লাঠি আবার বন্দেমাতরম্। শেষে কী হল? রাস্তার আশে-পাশে ছাদে-বারান্দায় জানলায়-দরজায় বন্দেমাতরম্, বালক-বালিকার মুখেও বন্দেমাতরম্। দাঁড়ের পাখিও বুঝি এতক্ষণে শিখে নিল বন্দেমাতরম্।

পুলিশ মারতে-মারতে চিত্তরঞ্জনকে একটা বড় পুকুরে, হাভেলি দিঘিতে, ফেলে দিল। পুকুরে পড়েও চিত্তরঞ্জন বলছে, বন্দেমাতরম্। লাঠি-হাতে পুলিশও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুকুরের জল রক্তে লাল হয়ে গেলেও চিত্তরঞ্জন বন্দেমাতরম্ ছাড়ল না। যদি এখন শেষ নিশ্বাসও পড়ে সেই নিশ্বাসের সঙ্গেও ধ্বনিত হবে বন্দেমাতরম্। খবর পেয়ে অশ্বিনী দত্ত ছুটে এল আর তার পদশব্দ শুনেই পালিয়ে গেল পুলিশ। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় চিত্তরঞ্জনকে সভাস্থলে আনা হল। সমগ্র সভা একটি একক কণ্ঠে নিনাদিত হয়ে উঠল, বন্দেমাতরম্। বিগাঢ় ধ্যানীর চোখে দেখল অরবিন্দ। এও কি তার বাসুদেব দর্শন নয়?

বন্দেমাতরম্ তো দুর্গার স্তুতি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে বাসুদেব কৃষ্ণ অর্জুনকে বললে, হে মহাবাহু, শত্রুজয়ের জন্যে তুমি শুচি হয়ে দুর্গাস্তোত্র পাঠ করো। অর্জুন রথ থেকে নেমে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তোত্র পাঠ করল :

নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্যে মন্দরবাসিনি!

কুমারী কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে!

বিপ্লবের ছবি দেখল অরবিন্দ। শত্রু-নিসূদনের ছবি। শত্রুর উৎসাদন ছাড়া প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব। ধূলিজালকে কর্দমে পরিণত না করলে জল দাঁড়াবে কোথায়? জয় হোক জয় হোক হরের, যিনি বিষধরকে বলয় করেছেন, চন্দ্রকে তিলক করেছেন, যিনি ভুবনের মূল, যিনি বৃষে ভ্রমণ করেন, যিনি ত্রিশূল-ডমরু ধরেন, যিনি কটাক্ষে মদন দহন করেন, যাঁর শিরে গঙ্গা অর্ধাঙ্গ গৌরী। জয় হোক জয় হোক হরির, যিনি ভুজদ্বয়ে গিরি ধরেন, যিনি দশানন ও কংসকে বিনাশ করেন, যিনি অসুরকে বিলোপ করেন, যিনি মুনিজনের মানসসরোবরের হংস, যার বাণী মধুর, বাঁশি মধুর। কিন্তু এখন আর বাঁশি নয়, এখন অসি। এখন 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারি।' এখন আর বৃন্দাবনের বাঁশি-বাজানো কৃষ্ণ নয়, কুরুক্ষেত্রের গীতারূপ সিংহনাদকারী কৃষ্ণ।

পুলিস বরিশাল কনফারেন্স ভেঙে দিল। সমস্ত নেতা ফিরে চলল কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথও। তাঁর অভিভাষণ দেওয়া হল না। কিন্তু অরবিন্দের কাছে সে যেন কিছু 'হল না' নয়, সে যেন কিছু একটা 'হল'। যেন অর্জুনের গাণ্ডীবে অজরা জ্যা যোজনা হল। দেশকণ্টক ইংরেজকে উন্মূলিত করার জন্যে তরবারে শান পড়ল।

'বরিশাল হল পুণ্যে বিশাল লাঠির ঘায়ে।' উজ্জ্বল চোখে কোনো বিপ্লবী মরণপণ প্রতিজ্ঞা করলেই অরবিন্দ বলত : দেখ দেখ ওর বরিশাল চোখ!

উল্লাসকর দত্তও তাই বলে। বরিশাল কনফারেন্সে পুলিসের অকথ্য অত্যাচার থেকেই আমার বিপ্লব সাধনা। হেমকানুনগোরও সেই কথা। বিপ্লব কী আগে ভালো বুঝতাম না, বরিশালের পর মাথাটা ঠাণ্ডা হল। আর রবীন্দ্রনাথ গান বাঁধলেন :

ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে
গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা
ততই যে ঢেউ উঠবে।

হ্যাঁ, বাঙলায় যে বিক্ষোভের বারুদ জমেছিল অরবিন্দই তাতে বিপ্লবের মন্ত্রবহ্নি

সঞ্চার করে দিল।' বললে হেমন্ত, 'তাই বলছিলাম সবার আগে অরবিন্দ।'

'কিন্তু তারো আগে একজন আছে।' স্মিতমুখে সুভাষ বললে।

'আরো একজন? কে?'

'স্বামী বিবেকানন্দ।'

কী বলছেন স্বামীজি? এবং কবে বলেছেন?

বলছেন : 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। যুবকগণ, ওঠো, জাগো, শুভ মুহূর্ত এসে পৌঁছেছে। সাহস অবলম্বন করো, ভয় পেও না। ওঠো জাগো, তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে ধনবল আছে, কিন্তু আমার বাংলাতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রকাশিত করতে হবে। লোকে বলে বাঙালি জাতির কল্পনাশক্তি প্রখর। আমি তা বিশ্বাস করি। আমাদের লোকে ভাবুক জাতি বলে উপহাস করে থাকে। কিন্তু তোমাদের বলছি এ উপহাসের বিষয় নয়, কারণ হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফূরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তি খুব ভালো জিনিস হতে পারে, কিন্তু তা বেশিদূর যেতে পারে না। ভাবের মধ্যে দিয়েই গভীরতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। অতএব, বাঙালি দ্বারাই—ভাবুক বাঙালি দ্বারাই এ কার্য সাধিত হবে।'

এ উক্তি করা হয়, ১৮৯৭ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি। সুভাষের জন্মের এক মাস পাঁচ দিন পরে। সুভাষের জন্ম ১৮৯৭-র ২৩ শে জানুয়ারি।

আরো অনেক বলেছেন স্বামীজি। বলছেন, 'এবার ভালো হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজো করব। রঘুনন্দন বলছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্—' এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মার ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহালয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।'

আবার বলেছেন : 'শত্রুগণকে বীর্য প্রকাশ করে শাসন করতে হবে, এ গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। গৃহস্থকে ঘরের এক কোণে বসে কাঁদলে আর অহিংসা পরমো ধর্মঃ বলে বাজে বকলে চলবে না। যদি তিনি শত্রুদের নিকট শৌর্য প্রদর্শন না করেন তা হলে তাঁর কর্তব্যের অবহেলা করা হয়।'

স্বামীজি যখন ঢাকা সফরে যান, সেটা ১৯০১ সাল, তাঁর বক্তৃতা শুনতে অনেক যুবকের সমাবেশ হত। তার মধ্যে থাকত ঢাকার বিপ্লবী নেতা হেম ঘোষ আর তার সহযোগী শ্রীশ পাল। স্বামীজি বিপ্লবীদের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে সম্বোধন করেন, আর বলেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈকে আদর্শ করো। 'মেরি ঝাঁসি নেহি দেউঙ্গি।' যে নাগপাশে বিদেশী ভারতকে বেঁধে রেখেছে তা ছিন্ন করো। দেশভক্তি ও সন্তান ধর্মকে মাথায় করে রাখো।

শ্রীশ পালকে জানো? কে? পুলিস ইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জিকে যে কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে গুলি করে মারে। তবেই দেখ সবার আগে বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দই বিপ্লবীর বিপ্লবী—মহাবিপ্লবী।

এগারো

'দেয়ালে এসব কাদের ছবি টাঙিয়েছিস রে সুবি?' সম্পর্কে মামা একজন শাঁসালো পুলিশ-অফিসর সুভাষকে জিজ্ঞেস করলে।

'ছবিগুলো দেখে চেনা যাচ্ছে না?' সুভাষ বললে স্বচ্ছমুখে, 'একটু কাছে গিয়ে দেখুন।'

'কাছে যাবার সাহস নেই। যদি মাথার খুলিটা উড়ে যায়।' মাথায় একবার হাত বুলালো অফিসার।

'এরা তো কেউ নেই সশরীরে।' ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই তবু সুভাষ বললে, 'ক্ষুদিরাম কানাইলাল আর সত্যেন এই তিনজনের তো ফাঁসিই হয়ে গেছে আর প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে প্রথম শহীদ হলেন—'

'সবাই সমান, মরেও মরতে চায় না—কিন্তু তোমার পড়ার ঘরের দেয়ালে এসব কেন?'

সুভাষ যেন অন্য চিন্তায় বিভোর, প্রশ্নটা মাথায় ঢুকল না। বললে, 'প্রফুল্ল চাকীর সে প্রশ্নটা কী মর্মান্তিক!'

'কোন প্রশ্ন?'

'যেটা নন্দলাল ব্যানার্জিকে করেছিল—আপনি বাঙালি হয়ে বাঙালিকে ধরবেন?'

নন্দলাল! নামটা শুনে অফিসর আত্মীয়ের অস্বস্তিকর ভাব হল। ধমকের সুরে বললে, 'সে কি, নন্দলাল তার কর্তব্য করবে না? তুমি তোমার কর্তব্য করবে না?'

'নিশ্চয় করব।'

'তোমার কর্তব্য কী?'

'আমার কর্তব্য ভালো করে পড়ে ভালো ভাবে পরীক্ষা পাস করা।'

'তবে এসব রাজনীতিতে মন দিয়েছ কেন?'

এক পাশে অরবিন্দের ছবি, তার দিকে তাকাল সুভাষ। এই তো সেই মহামানব যিনি বললেন, ঈশ্বর আর জাতীয়তাবাদ এক বস্তু। নতুন ভগবদ্গীতা প্রচার করলেন—জাতীয়তাবাদই ধর্ম।

আর ও প্রান্তের ছবি স্বামী বিবেকানন্দের।

'এঁকেও রেখেছ দেখছি।' অফিসর-আত্মীয় বুঝি চমকে উঠল।

'ইনি তো সন্ন্যাসী।' সুভাষ সবিনয়ে বললে।

'সন্ন্যাসী! ইনি বিপ্লবীর রাজা। যাকে ধরি তারই সুটকেসে বিবেকানন্দ। কিন্তু এ সব ভালো নয়। এ সব তুলে ফেল। তোমার বাবা কোথায়?' আত্মীয়-অফিসর জানকীনাথকে বলতে গেল।

দেয়ালের কাছে সরে এসে তীক্ষ্ণ চোখে দেখল আবার ছবিগুলি।

আলিপুর বোমার মামলায় নরেন গোঁসাই বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজসাক্ষী হল। রাজসাক্ষীর কাজ কী? রাজসাক্ষীর কাজ আদালতে দাঁড়িয়ে দলের সমস্ত ফাঁস করে দেওয়া আর সেই কৃতঘ্নতার মূল্যে সরকারের কাছ থেকে নিজের মুক্তি কিনে নেওয়া। যারা এক দলের মানুষ, এক পথের সহযাত্রী, তাদের কাছে এর চেয়ে জঘন্যতর আচরণ

আর কী হতে পারে? তখন একটা ইংরেজ মারার চেয়ে এই স্বদেশী কুলাঙ্গারকে মারা বেশি আনন্দের। কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মামলার দুই আসামী, ঠিক করল নরেন গোঁসাইকে সাবাড় করে দিতে হবে। জেলের মধ্যে হত্যাকাণ্ড! তাঁর জন্যে নিখুঁত নিশ্ছিদ্র ষড়যন্ত্র। এ পরিকল্পনা শুধু বাঙালির মস্তিষ্কে, এর রূপায়ন শুধু বাঙালির মণিবন্ধে।

খাবারের হাঁড়ির মধ্যে করে বাইরে থেকে দু-দুটো রিভলভার আনা হল। একটা নিল সত্যেন, আরেকটা কানাই। চন্দননগরের কানাই, মেদিনীপুরের সত্যেন। সত্যেন তার রিভলভারটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিল কোমরে। যেন ধস্তাধস্তি হলেও কেউ সহজে সেটা তার থেকে কেড়ে নিতে না পারে। আর কানাই? তার মনোভাব উদাসীন। থাক না ওটা পকেটে। কেউ কেড়ে নিতে পারে তো নিক। কিন্তু তার আগে শেষ গুলিটি পর্যন্ত নরেন গোঁসাইয়ের উপর খরচ হয়ে গেছে জানবে। ও কলঙ্ক যদি যায়, তারপর আমি যাব কি আমার রিভলভারটা যাবে তাতে কিছুই এসে যাবে না।

তখনও রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য চলছে কোর্টে। সত্যেন ধুয়ো তুলল, আমিও রাজসাক্ষী হব। সেই কারণে নরেন গোঁসাইয়ের সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ দরকার।

পুলিস টোপ গিলল। নরেনকে আগেই আলাদা করে সরিয়ে রাখা হয়েছিল জেল-হাসপাতালের দোতলায়, দুজন ইউরেশিয়ান কয়েদী-ওয়ার্ডারের রক্ষণাবেক্ষণে। সত্যেন যদি ভাব জমাতে চায়, আসুক না। আরেকজন রাজসাক্ষী পাওয়া গেলে তো সরকারের পোয়া বারো।

কিন্তু কানাই, কানাইলাল কী করবে? তার কী কৌশল? কী সাধনা? তার শবসাধনা। সে রিভলভারটা পকেটে নিয়ে একটা কাপড় মুড়ি দিয়ে টান হয়ে শুয়ে রইল।

'তোমার কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ওয়ার্ডার।

'বিরক্ত করো না।' কানাই বললে, 'শবসাধনায় নিযুক্ত আছি।'

শবসাধনা কঠিনতম সাধনা এমনি যন্ত্রণাকাতর মুখ নিয়ে কানাই উঠে বসল।

'তোমার কী হয়েছে?'

'পেটে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। শিগগির ডাক্তারবাবুকে ডাকো। নয়তো হাসপাতালে নিয়ে চলো।'

কানাই সাধনায় সিদ্ধ হল। চলে এল হাসপাতালে।

উনিশো আট সালের পয়লা সেপ্টেম্বর। সকালবেলা সত্যেন এসেছে নরেনের সঙ্গে ভাব জমাতে। হাসপাতালের দোতলায় সিঁড়ির পাশে ডিসপেনসারিতে মুখোমুখি বসেছে দুজন। দু-চারটে কথা হতে না হতেই সত্যেন তার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে পকেটের ভিতর থেকেই তাক করে গুলি ছুঁড়ল। একটা শব্দ হল শুধু, কার্তুজ আগুন ছাড়ল না। না, পকেটের ভিতর থেকে নয়, খোলা হাতে রিভলভার বার করে আনলে সত্যেন, নরেনকে সোজাসুজি তাক করলে। গুলি নরেনের উরু ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। ইউরেশিয়ান ওয়ার্ডরদের একজন, নাম হিগেনবোথাম, সত্যেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার রিভলভার ধরে টানাটানি করতে লাগল। লাভের মধ্যে হল এই, রিভলভারের বাঁটের ঘায়ে তার কব্জি ভেঙে গেল। কব্জি ভেঙে যেতেই সে ছেড়ে দিল সত্যেনকে।

এই ফাঁকে নরেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে হাসপাতালের ফটক পার হয়ে সোজা ছুট দিল। দাঁত মাজার ভান করে কানাই ডিসপেনসারির সিঁড়ির সামনে পায়চারি করছিল, এবার সে ছুটন্ত নরেনের পিছু নিলে। তার গুলি নরেনের শিরদাঁড়া ভেদ করে বুকে গিয়ে বসল। দু-পাশে দেয়াল এমনি একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল নরেন। দু-এক পা যেতে না যেতেই পড়ে গেল মাটিতে।

সত্যেন ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, কেউ কোথাও নেই। হাতে রিভলভার, সামনে একটা কয়েদীকে জিজ্ঞেস করলে, নরেন কোথায়?

কয়েদী ইশারা করে দেখিয়ে দিল পাশের গলিতে। গলিতে ঢুকে দেখল কানাই তার শেষ গুলিটিও খরচ করে সমস্ত নিঃসংশয় করে দিয়েছে। নরেন গোঁসাই মৃত। বিশ্বাসঘাতকতার পাপ আপন রক্তে ধুয়ে যাচ্ছে। আর কানাই দাঁড়িয়ে আছে যেন কিছুই ঘটে নি। কিংবা এ যেন হামেসাই ঘটছে। এ আবার এমন কী নতুন! যেন আত্মবান পুরুষ নির্লিপ্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে, নির্দ্বন্দ্ব, নিরাসক্ত, সমস্ত রাগদ্বেষবিমুক্ত। ধরতে হয় ধরো, মারতে হয় মারো, কত বড় আনন্দের মুহূর্ত আস্বাদ করছি নীরবে।

তারপর হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড, পাগলা ঘণ্টি, ভোম্বা, ছোটাছুটি, লুটোপুটি শুরু হয়ে গেল। গ্রেপ্তার হল সত্যেন, গ্রেপ্তার হল কানাই। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তালাবন্ধ হল। শুরু হল মারধোর, শুরু হল খানাতল্লাসি। আর কিসে কী হবে! সত্যেন মাথা, কানাই ডান হাত, যে বলবতী আশালতা রোপণ করেছিলাম তা ফলবতী হয়েছে—আর কী চাই। সারা ভারতবর্ষে সাড়া পড়ে গেল, বাঙালি বিপ্লববাদ বৈফল্যের পঙ্ককুণ্ডে সাফল্যের শতদল ফুটিয়েছে। কানাই আর সত্যেন দুজনেরই ফাঁসির হুকুম হল।

সত্যেন ব্রাহ্ম। একদিন শিবনাথ শাস্ত্রী এল তাকে আশীর্বাদ করতে। কাছে বসিয়ে বললে, ভগবানে আত্মসমর্পণ করে থাকো। বিরাটের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছ মনে এমনি একটি সুস্থির প্রশান্তি আনো। পার্থিব চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও।

শিবনাথ ফিরে এলে সবাই তাকে ঘিরে ধরল। বলুন কী হল, কেমন দেখলেন।

শিবনাথ বললে আশীর্বাদ করে এসেছেন সত্যেনকে।

'সে কী, শুধু সত্যেনকে? কানাইকে আশীর্বাদ করেন নি?'

'কানাইকে দেখলাম পাইচারি করছে। যেন খাঁচায় পোরা সিংহ। বহুযুগ তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।'

কখনো বা সে যতচিত্ত যোগীর মত অচঞ্চল, যেন নির্বাত প্রদেশে স্থিত দীপশিখা। যেন পরমসুখকর আত্মানন্দেই সে নিমগ্ন। ফাঁসির আদেশ পাবার পর তার ওজন বেড়ে গেল প্রায় ষোল পাউণ্ড। অনির্বিঘ্ন চিত্তে ব্রহ্মসংস্পর্শসুখের এই ফলশ্রুতি।

ফাঁসির দিন ভোর চারটের সময় জেলর তার সেলে এল। এসে দেখল কানাই ঘুমুচ্ছে। ওঠো হে, সময় হল। কানাই তবুও নিদ্রাচ্ছন্ন। সে কী, ট্রেন যে সিটি দিয়েছে, সে ট্রেনে করে যাবে না আরেক ঘুমের দেশে?

ও, হ্যাঁ, চলুন। নিজে এতটুকু উদ্বিগ্ন হল না, অন্যকেও এতটুকু উদ্বিগ্ন করল না। নির্বিকল্প চিত্তে মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল।

গলায় দড়িটা বুঝি ঠিক করে পরানো হয় নি। বললে সেই কথা। কে একজন

সংশোধন করে দিল।

মৃত্যুর মঞ্চে শাশ্বত জীবনের জয়গান গেয়ে কানাই অপসৃত হল।

হে মৃত্যু, তোমার ভয়াল ভ্রুকুটিকে আমি ভয় করি না। যতক্ষণ তুমি আমাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলে ততক্ষণ পর্যন্ত ভেবেছিলাম তুমি আমার চেয়ে বড়, তুমিই আমার চরম, আমার নিয়ন্তা। এখন তোমার আঘাত পেয়ে বুঝলাম তুমি আমার চরমও নও নিয়ন্তাও নও। তুমি তো আঘাত করছ আমার জড়দেহকে কিন্তু আমার জড়দেহের মধ্যে যে পরমাত্মা বসে আছেন তাকে তুমি স্পর্শও করতে পারছ না। অতএব আমিই তোমার চেয়ে বড়, তোমার ক্রান্তকারী। আমার একটা বুদ্বুদাকার ক্ষুদ্র জীবন তুমি নিলে কিন্তু আমার এই আকাশাকার মহাজীবন তুমি নেবে কী করে?'

একটা ইংরেজ পুলিস সার্জেন্ট বারীন ঘোষকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের হাতে এরকম ছেলে আর কতগুলি আছে?'

দেখে এস গে কালীঘাটের শ্মশানে, কত যুবক কানাইয়ের চিতার উপর ফুল দিচ্ছে। শুনে এস গে বন্দেমাতরম্ কাকে বলে। বন্দেমাতরম্ কেমন করে বলতে হয়।

ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখলেন :

'গোঁসাই হল গুলিখোর কানাই নিল ফাঁসি।
কোন চোখে বা কাঁদি বল কোন চোখে বা হাসি॥'

কানাইয়ের ফাঁসি হল ১০ই নভেম্বর, সত্যেনের ফাঁসি হল তেরো দিন পর, তেইশে। ফাঁসির পর আলিপুর জেলের বাইরের অপেক্ষমান জনতাকে এক ইংরেজ পুলিশ-অফিসর বললে, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, সব শেষ হয়ে গেছে। কানাই নির্ভীক, সত্যেন মনে হয় নির্ভীকতর। যখন আমি ওকে সেল থেকে ডেকে আনতে গেলাম, দেখলাম দুই চোখ মেলে সেলে বসে আছে। বললাম, সত্যেন তৈরি হও। সত্যেন বললে, আমি তৈরি। বলে হেসে উঠে দাঁড়াল। যেন জানে যে কাণ্ডটা এখুনি ঘটবে সেটা একটা মজার কাণ্ড। নিজেই ধীর পায়ে ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে চলল।'

তা হলে কথাটা কী দাঁড়াল? কথাটা দাঁড়াল এই : এগিয়ে চলো। মৃত্যু নেই। ভয়ের যে বিচিত্র চলচ্ছবি দেখছ, সেটা ভ্রান্তিকর। শুধু এগিয়ে চলো। শুধু অতিক্রম করো। যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে উর্ধ্বে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, আর যে চলতে থাকে তার ভাগ্যও চলতে থাকে। পথে চলো এগিয়ে চলো। অতিক্রম করে চলো। যে শুয়ে আছে তার কলিযুগ, যে জেগে উঠেছে তার দ্বাপর যুগ, যে উঠে দাঁড়িয়েছে তার ত্রেতা যুগ আর যে চলছে তার সত্য যুগ আরম্ভ হয়েছে, সুতরাং পথে চলো এগিয়ে চলো। অতিক্রম করে চলো। যে চলেছে সেই মধু অর্জন করছে, যে চলছে সেই অমৃত ফল লাভ করছে—ঐ দেখ সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব, সে চলতে-চলতে কখনো তন্দ্রালু হয় না, তাই শুধু পথে চলো এগিয়ে চলো। পার হয়ে চলো। পথ কখনো সমতল নয়, কুসুমাস্তৃত নয়। পথ বন্ধুর, কুটিল, কণ্টকাকীর্ণ। তাই ভীত হলে চলবে না, কারণ জগতে আর যারই স্থান থাক ভীতের স্থান নেই।

হে ইন্দ্র, আমরা যেন তোমার দ্বারা রক্ষিত হই। আমরা যেন তোমার বজ্রকে

দৃঢ়ভাবে ধারণ করে শত্রুকে আঘাত করতে পারি। যেন পরাজিত করতে পারি সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

আলিপুর বোমার মামলা প্রথম রুজু হয় বার্লির কোর্টে। বার্লি আসামীদের দায়রায় সোপার্দ করেন আর সে দায়রার বিচারে বসে বিচক্রফট। মুখ্য আসামী অরবিন্দ, আর বিচক্রফট কেমব্রিজে তার সহপাঠী ছিল। ক্লাসিকসে অরবিন্দ বিচক্রফটের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিল। সে প্রায় পনেরো ষোল বছরের আগেকার কথা, বিচক্রফটের মনে আছে কিনা কে জানে।

প্রায় এক বছর নির্জন কারাবাসে কাটাতে হল অরবিন্দকে।

দুর্বহ দিন কী করে ব্যয় করা যায়! শুধু অসংলগ্ন চিন্তা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, সমস্তই কেমন ভিত্তিহীন, অরবিন্দের মন হাহাকার করতে লাগল। কী করে দিন কাটাই, কোন চিন্তা নিয়ে? কোনো চিন্তাই যে মনকে বিশ্রাম দেয় না, আয়তন দেয় না, আনন্দে মাতিয়ে রাখে না। কেবলই ক্লান্ত করে, শুষ্ক করে, রুগ্ন করে, দগ্ধ করে। যেন এক গুরুভার পাষাণ বুকের উপর বসে থাকে সর্বক্ষণ। তবে কি সে পাগল হয়ে যাবে? নইলে সমস্ত চিন্তা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে কেন? যে বুদ্ধি চিন্তাকে চালনা করে সে পর্যন্ত শিথিল! হঠাৎ অরবিন্দের মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটি জ্যোতির্বাক্য, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সেই মন্ত্র অহর্নিশ জপ করতে বসল, নির্জন কারাবাসের বিভীষিকা সরে গেল চকিতে।

অরবিন্দ লিখছে : 'সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম এই উপলব্ধি বৃক্ষে গৃহে প্রাচীরে মানুষে পশুতে পক্ষীতে ধাতুতে মৃত্তিকায় সর্বভূতে আরোপ করতে লাগলাম। করতে করতে এমন ভাব হয়ে যেত যে কারাগারকে আর কারাগারই বোধ হত না। সেই উঁচু প্রাচীর, লোহার গরাদ, সেই সাদা দেয়াল, সেই সূর্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ কিছুই যেন আর অচেতন নয়, সমস্তই সর্বব্যাপী চৈতন্যে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। এক-একবার এমন মনে হত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বাঁশি বাজাতে দাঁড়িয়েছেন আর সেই মাধুর্যে আমার হৃদয় টেনে বের করে নিচ্ছেন। সর্বদা এই অনুভব হতে লাগল যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করছে, আমাকে কোলে করে রয়েছে।'

কারাগারে সর্বত্র অরবিন্দ বাসুদেব দেখল। প্রাচীর কোথায়, বাসুদেব দাঁড়িয়ে আছে। একটা গাছ ছিল, দেখল সেও বাসুদেব। কয়েদী কোথায়, প্রহরী কোথায়, পুলিশ কোথায়, সবাই বাসুদেব। ঘরের মর্চেপড়া জানলার শিকগুলোও বাসুদেব। কোথাও নিস্তার নেই, সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় হয়ে উঠেছে। 'যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম। সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম॥'

বারো

সেই অফিসর ভদ্রলোক জানকীনাথের বৈঠকখানায় এসে বসল।

চিন্তিত মুখে বললে, 'আপনার বাড়িতে দেখি রাজনীতি ঢুকেছে।'

'রাজনীতি?' জানকীনাথ টেবিলের থেকে মুখ তুললেন : 'তার মানে'

'শুধু রাজনীতি নয়, বলতে পারেন রাজদ্রোহ।'

'আপনি কি বলছেন?' খাড়া হয়ে বসলেন জানকীনাথ।

'বলছি এখন থেকে সাবধান হওয়া দরকার।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'সুবি—সুভাষের পড়ার ঘরে যত সব রাজদ্রোহীদের ছবি টাঙানো। ঐ সব আলিপুর বোমার মামলার খুনে আসামীরা—' অফিসর-আত্মীয় আতঙ্কিত মুখে নামোচ্চারণ করতে লাগল: 'অরবিন্দ ক্ষুদিরাম কানাইলাল প্রফুল্ল চাকী—'

জানকীনাথ চমকে উঠলেন: 'ও সব ছবি ও পেল কোথায়?'

'খবরের কাগজ থেকে কেটে পিসবোর্ডে আঠা দিয়ে আটকে টাঙিয়ে রেখেছে।'

জানকীনাথ বুঝি একটু প্রশ্রয়ের প্রলেপ দিতে চাইলেন। বললেন, 'ছেলেমানুষ। বুদ্ধি এখনও পাকে নি। ছবি মনের মধ্যে আছে তাই থাক না, কেটে বাইয়ে এনে টাঙাবার দরকার কী। ছেলেমানুষ আর কাকে বলে!'

'সে যাই হোক,' অফিসর আত্মীয় গম্ভীর হল: 'ছবিগুলো সরিয়ে ফেলা দরকার।'

'না, না, ছবি-টবি রাখা চলবে না, সমস্ত সরিয়ে ফেলতে হবে।' জানকীনাথ উঠে পড়লেন।

সন্ধের আগে বাড়ি ফিরে তার ঘরে ঢুকেই সুভাষ একটা ধাক্কা খেল। দেখল দেয়ালটা শাদা। ছবিশূন্য।

সারদা ঝি কাজ করছে তাকে লক্ষ্য করে সুভাষ জিজ্ঞেস করলে, 'এ কি, দেয়ালের সব ছবি কী হল?'

সারদা বললে, 'কর্তাবাবু সরিয়ে ফেলেছেন।'

'বাবা সরিয়ে ফেলেছেন!' সুভাষ স্তব্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ নজরে পড়ল, বিবেকানন্দের ছবিটা নিটুট রয়ে গেছে। কী ভাবে বাবা সেটা সরিয়ে নেন নি।

'যাক, তুমি আছ। তুমি থাকো। তুমি থাকলেই হল।' স্বামীজির ছবির কাছে এসে দাঁড়াল সুভাষ: 'তুমিই বিপ্লব-মহেশ্বর। আমি আর কিছু জানিনা, আমি শুধু তোমাকে জানি। তোমাকে জানলে কোথায় পাপ, কোথায় দৌর্বল্য, কোথায় ভীরুতা! তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ শুধু নিজের মুক্তি-র জন্যে নয়, দেশের মুক্তির জন্যে, মানুষের মুক্তির জন্যে। তুমি আমাকে শক্তি দাও, আমাকে আশীর্বাদ করো।'

'আমাদের প্রয়োজন শুধু শক্তি, শক্তি কেবল শক্তি।' বলছেন বিবেকানন্দ: 'উপনিষৎসমূহই শক্তির বৃহৎ আকারস্বরূপ। সে শক্তিসঞ্চারে উপনিষৎ সমর্থ তা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করতে পারে। উপনিষদই সকল জাতির সকল মতের সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দুঃখী পদদলিতদের ঈশ্বরকে আহ্বান করে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে মুক্ত হতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।'

'সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্রে আসে যায় না, কায়মনবাক্যে যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে—এই বিশ্বাসটি ভুলো না।' আবার বলেছেন স্বামীজি : বাধা যতই হবে ততই ভালো। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ

হয়? যে জিনিস যত নতুন হবে যত ভালো হবে সে জিনিস প্রথম তত বেশি বাধা পাবে। বাধাই তো সিদ্ধির পূর্বলক্ষণ। বাধাও নেই সিদ্ধিও নেই।'

অরবিন্দের নির্জনবাসের কারাগৃহে স্বামী বিবেকানন্দ দেখা দিলেন। গ্রেপ্তারের সময় অরবিন্দের ঘরে যে দক্ষিণেশ্বরের মাটি পাওয়া গিয়েছিল তা নিয়ে পুলিশের কম হয়রানি হয় নি। নিশ্চয়ই এ মাটি নয়, এ ভয়ঙ্কর তেজী কোনো বিস্ফোরক পদার্থ! সাধারণ মাটি কৌটোয় ভরে রাখবে অরবিন্দ তেমন ছেলেই নয়। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে পাঠাও। দেখ কী সাংঘাতিক ফল না জানি বেরোয়। ফল সাংঘাতিকই বটে। মাটি মাটি বলেই প্রতিপন্ন হল বটে কিন্তু কারাগারে অরবিন্দ বাসুদেব দর্শন করলে। 'সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝলমল।' 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'

'বিবেকানন্দ তেমনি একটা ভাব', বলেছেন অরবিন্দ, 'যা সিংহপ্রতিম, বিরাট সম্বোধিদীপ্ত, যা সমুদ্রের জোয়ারের মত প্রবেশ করছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে, যা এখনো জেগে আছে মাতৃমর্মে, মায়ের সন্তানদের মর্মলোকে।'

'কে মা? মৃত্যুরূপিনী কালীই আমার মা।' বলেছেন স্বামীজি, 'মৃত্যু বা কালীকে পূজা করতে সাহস পায় কজন? এস, ভয় কী, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জেনেই আলিঙ্গন করি, দুঃখকে দুঃখ জেনেই বুকে তুলে নিই। ভয় কী, ঐ ভীষণা ঐ কঠিনা যে আমাদেরই মা।'

কারাকক্ষে অরবিন্দকে বিবেকানন্দ পনেরো দিন দেখা দিলেন। দেখা দিলেন অতিমানসতত্ত্বের সন্ধান দিতে। বলছেন অরবিন্দ, 'বিবেকানন্দই আমাকে অতিমানসতত্ত্বের সন্ধান দেন—এই এই ঐ ঐ—এমনি নির্দেশ দিয়ে নানা ভাবে। আলিপুর জেলে পনেরো দিন ধরে আমাকে শেখান ও বোঝান।'

'বিলেত থেকে ফিরে যখন বরোদায় ছিলাম তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বই পড়ি।' বলছেন অরবিন্দ : 'সমস্ত ভারতেই তাঁদের প্রভাব সক্রিয় ছিল। হঠযোগ অভ্যেস করার সময় আমি আরেকবার বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। মনে হল তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে আমার উপর নজর রাখছেন।'

'শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিবেকানন্দের বশ্যতা স্বীকার প্রাচ্যের কাছে প্রতীচ্যের বশ্যতা স্বীকার।' এও অরবিন্দের কথা।

আর বিবেকানন্দ কী বলছেন দেশপ্রেম সম্পর্কে?

'ওরা দেশপ্রেমের কথা বলে। আমি দেশপ্রেম নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি কিন্তু আমার দেশপ্রেমের আদর্শ আলাদা। তার জন্যে তিনটে জিনিস দরকার। প্রথম হৃদয়, আন্তরিক অনুভূতি—বুদ্ধি-যুক্তির সাধ্য আর কতটুকু? দ্বিতীয়, প্রেরণা—হৃদয়ের থেকেই আসবে এই প্রেরণা। আর তৃতীয়, ভালোবাসা। ভালোবাসাই অসম্ভবের দুয়ার খুলে দিতে পারে, বিশ্বের সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠিই ভালোবাসার হাতে। সুতরাং যারা দেশপ্রেমিক হতে চাও, আগে অনুভব করতে শেখ। তোমাদের কি অনুভূতি আছে? দেবতা ও ঋষিদের কোটি কোটি বংশধর আজ ভারতে অনাহারে আছে এ কি তোমার হৃদয়ের গভীরে একবারও অনুভব করো? একবারও কি অনুভব করো যে কালো মেঘের মত ঘোর অজ্ঞান সারা দেশ আচ্ছন্ন করে আছে? এ সব অনুভব কি তোমাকে অস্থির করে

তোলে? রাতের ঘুম কেড়ে নেয়? এ ব্যথা কি তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার হৃৎস্পন্দনের তালে-তালে আছড়ে পড়ে?

শুধু—এটুকুই নয়। পর্বত প্রমাণ বাধা এলে তাকে অতিক্রম করার সাহস আছে তো? যদি সমস্ত পৃথিবী তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবুও তুমি, তরবারি হাতে নিয়ে, তোমার কর্তব্যসাধনে এগিয়ে যাবে, তোমার আছে তো সেই প্রতিজ্ঞা? তোমার নির্বিচল নিষ্ঠা আছে তো? যদি তোমার এ সব থেকে থাকে, তুমি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারবে। যদি তুমি গুহাতেও থাকো, তোমার চিন্তা পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, শত শত বৎসর ধরে জগন্ময় স্পন্দিত হবে—হয়তো কোনোদিন কোনো এক আধারে মূর্ত হয়ে পরিপূর্ণ সিদ্ধিতে বিকশিত হয়ে উঠবে। চিন্তা, আন্তরিকতা ও পুণ্য সঙ্কল্পের মাঝে এমনি দিব্যশক্তি।'

'তোমার এই অভীপ্সা আমার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠুক—আমিই তোমার সেই স্বপ্নকে ফলান্বিত করে তুলি—' সেদিন স্বামীজির দিকে তাকিয়ে সুভাষের মনের গহনে কি এমনি এক নীরব প্রার্থনা চেয়েছিল উচ্চারিত হতে?

ছেলেকে নিয়ে বাবা-মা যেন ভাবনায় পড়লেন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর কেবল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ করে। শুধু তাই নয়, কোথায় কোন সাধুর খোঁজ পাওয়া গেছে তার সঙ্গ করতে ছোটে। ছেলেটা শেষে সন্ন্যেসী হয়ে যাবে নাকি? সন্ন্যেসী হওয়াটা অবশ্যি চণ্ডনীতি নয় কিন্তু স্রেফ পণ্ডনীতি। ছেলে কোথায় বিদ্যার গৌরবে জগজ্জয়ী হবে, তা নয়, কৌপীনকন্থা সম্বল করে বাউণ্ডুলে ভবঘুরে হতে চলেছে। বলে কিনা, আত্মানং মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। নিজের মুক্তি আর জগতের হিত—এর বাইরে আর কিছু নেই। বলে কিনা, রামকৃষ্ণের মত কামকাঞ্চন ত্যাগই আমার আদর্শ, বিবেকানন্দের মত অভী-মন্ত্রের শরীরী স্তোত্র হয়ে ওঠা।

অভিভাবকরা অনেক বোঝান কিন্তু সুভাষ শুনেও শোনে না। প্রভাবতীর কাকুতি-মিনতী নিষ্ফল, এমন কি জানকীনাথের তিরস্কারও। ছেলেটা এমন তো কখনো ছিল না। আগে পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ বলত, এখন বলছে কি না, ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু ন ভ্রাতা—গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী। কখনো বা বলছে ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা না মে জাতিভেদঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। আজকাল যেন বাধাবন্ধন বিশেষ মানতে চায় না, বলতেই বলে, নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।

কটকে নানারকম সাধুর আমদানি। খবর পেলেই সুভাষ দেখতে ছোটে, ঘন হয়ে ঘেঁষতে চায়। যে সব সাধু মঠধারী বা আশ্রমবাসী তাদের সুভাষের তত পছন্দ হয় না—যদি মঠে ঢুকলি বা কুটিরই বাঁধলি, তবে মিছিমিছি ঘর ছাড়তে গেলি কেন? যদি ভিক্ষাবৃত্তিই নিলি তবে তোর চাকরি ছাড়বার কী হয়েছিল? পুত্র ত্যাগ করে এসে শিষ্য বানাবার বাহাদুরি কী? তার চেয়ে যে সাধু নির্গ্রন্থ, সর্ববন্ধনবিরহিত, যার আসন-শয়ন উন্মুক্ত আকাশের নিচে, বৃক্ষতলে, সেই কাম্যতর। সুভাষ তারই কাছে গিয়ে ঘনতর হয়।

তাদের কুলগুরু একদিন গৃহে এসে উপস্থিত। তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনে সুভাষ অবিশ্যি খুব আনন্দিত কিন্তু যেহেতু কুলগুরু সন্ন্যাসী নন সেহেতু সুভাষ যেন তাঁর

প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধান্বিত হতে পারছে না। যে গুরুর গৃহে ও শ্মশানে সমবুদ্ধি আছে ও যে গুরু স্বয়ং আচরণ করে উপদেশ দেবার সৎসাহস দেখাতে পারে সুভাষ বুঝি তারই প্রতি সশ্রদ্ধ।

তার ব্যবহারে ও অবাধ্যতায় বাবা-মা কষ্ট পাচ্ছেন এও সুভাষের কাছে এক গভীর যাতনা। সে তো বাবা-মাকে কষ্ট দিতে, তাঁদের অবাধ্য হতে, মোটেই অভ্যস্ত নয়, কিন্তু তার মধ্যে যে এক ঐশ্বরিক উন্মাদনা এসেছে সে যে কোনো বাধ্যতা কোনো বশ্যতা মানতে চায় না। আর শ্রীরামকৃষ্ণই তো বলেছেন ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু যার জন্যে বাবা-মার আদেশকে অমান্য করা যায়। প্রহ্লাদ কৃষ্ণের জন্যে শোনে নি তার বাপের শাসন। ভরত রামের জন্যে মানে নি তার মায়ের মিনতি। তাই ঈশ্বরের জন্যে যদি বাবা-মাকে কষ্ট দিতে হয় তা হলে সেটা ঈশ্বরই বুঝবেন।

কিন্তু কই, সেই সাধু কই, সেই গুরু কই? যে তাকে এই সঙ্কীর্ণ অহং-এর কারাগার থেকে ছিন্ন করে নিয়ে যাবে নির্মুক্ত নিখিল জীবনের মাঝখানে, সেই পুণ্যপীযূষপূর্ণ মহাজন কোথায়? শুধু অভীপ্সা, শুধু অন্বেষণ। পথপ্রদর্শক কই?

কোথাও কিছু না পেয়ে সুভাষ যোগ নিয়ে বসল। শুধু বই পড়ে কি যোগ শেখা যায়, শুধু ছাপানো ছবি দেখে? আর বেশি আর এখন কই? এখন নিজে নিজেই যথাসাধ্য চেষ্টা করা ভালো। শুধু মনকে একাগ্র করা, সমস্ত বিষয় থেকে বিমুক্ত করে নেওয়া—এই একটা ব্যায়াম তো মাত্র। কোনো একটা বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে থাকা, সে অসীম নীলাকাশই হোক বা দেয়ালে কয়লা দিয়ে আঁকা একটা গোল চিহ্নমাত্রই হোক। শুধু মনকে আর চালক নয়, মনকে আজ্ঞাবহ ভৃত্য করে তোলা। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন মনের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব অর্জন করতে পারলেই মানুষ দেবত্বে গিয়ে পৌঁছোয়।

আবার এক-এক সময় মনে হয়, দূর, শুধু নিজের মুক্তি দিয়ে কী হবে? আর-সকলকে মুক্ত করতে হবে না? আমি কি একা? আমি কি সকলকে নিয়ে নই? আমি আমার কাজ গুছিয়ে একা-একা সরে পড়ব আর আমার চারপাশের সকলে বন্ধনে-শৃঙ্খলে জর্জর হয়ে থাকবে? পথ খুঁজে পায় না সুভাষ।

স্বামীজির কথা আবার মনে পড়ে : 'গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যা, পরের মুক্তি হোক, আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ। নিজের ভাবনা যখন ভাববে, তখনি মনে অশান্তি। সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও। আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।'

সুভাষচন্দ্র তার দানের হাত বড় করে বসল। দরিদ্র বা দুঃস্থ দেখলেই ঢেলে দিত অকাতরে। হৃদয়ে স্বাভাবিক অনুভবটুকু ছিল বলেই বিচার করে দেখতে চাইত না বেশি হয়ে গেল নাকি। আমি দিচ্ছি না, ও নিয়ে আমাকে কৃতার্থ করছে, এমনি ভাবের থেকেই দিত। স্বামীজির কাছে বলা রামকৃষ্ণের কথা সুভাষ ভোলে নি—জীবে দয়া নয়, জীবে প্রেম। শুধু ভালোবাসায়ই বা কী হবে যদি ওদের না দুঃখ-দারিদ্র্য

দূর করতে পারি। শিকাগোর জগজ্জয় বক্তৃতার পর স্বামীজি তাঁর হোটেলে ফিরে গিয়ে কাঁদতে বসলেন, আমার দেশের লোক যখন অনাহারে আছে তখন মূল্যহীন এই সংবর্ধনা।

'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' বলছেন স্বামীজি, 'ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে তাদের কারণ মূর্খতা। আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু পা দিয়ে দলেছি। যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? কিন্তু কালকে অতিক্রম করা কঠিন! 'কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ।' আর সকলে ঘুমিয়ে থাকলে কী হবে, কাল ঠিক জেগে আছে। অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ভারতের লক্ষ-লক্ষ দীন হীন সন্তানের জন্যে কাঁদো। ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাচ্ছ? দরিদ্র দুঃখী দুর্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? আগে তার উপাসনা করো না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করে কূপ খনন করার অর্থ কী।'

এ সব পড়তে-পড়তে সুভাষের মন ভারতের জনগণের জন্যে আরো বেশি কাতর, আরো বেশি উন্মুখ হয়ে উঠল। সত্যিই তো, আমি স্বার্থপরের মত শুধু নিজের তল্পি বাঁধব? আর এরা ভারতের অগণন জনগণ, যারা আমার প্রতিবেশী, যারা আমাকে ঘিরে আছে ধরে আছে, দিনে দিনে গড়ে-পিটে বড় করে তুলেছে, তারাই আমার কেউ নয়?

বলছেন আবার স্বামীজি, 'যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন বা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরো রুটি দিতে পারে না, আমি সে ধর্ম সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যতদিন ভারতের কোটি-কোটি লোক দারিদ্র্যে, অজ্ঞানে ও অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরকম প্রত্যেক লোককে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মত থাকবে ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্যে কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগ্য বলব। তাদেরই আমি মহাত্মা বলি যাদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তা না হলে তারা দুরাত্মা।'

দুরাত্মা! দেশদ্রোহী! আমিও কি আমার গরিব দেশবাসীদের প্রতি উদাসীন হয়ে শুধু নিজ স্বার্থসাধনে ধ্যানাসীন থাকব? ঐ শোনো ডাক পাঠিয়েছেন স্বামীজি :

'ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র-শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? তোমরা শূন্যে বিলীন হও নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে—তাতে পেয়েচে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েচে অদ্ভুত সদাচারবল যা ত্রৈলোক্যে নেই। এত শান্তি এত প্রীতি এত ভালোবাসা, এত মুখটি চুপ করে

দিন রাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম। অতীতের কঙ্কালচয়, এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো। তোমার যেই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি, 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে।'

অরবিন্দও স্বীকার করেছে বিবেকানন্দের মধ্যেই প্রথম বেজে উঠেছিল দেশের প্রোলেটেরিয়েটের উদ্ধারণ মন্ত্র। 'নিজের মুক্তি নিয়ে কী হবে? মুক্তিকামনাও তো মহাস্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি। দেখছিস না নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে? আর তোরা নিজের দেশের লোকের জন্যে তা করতে পারবি নে? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে—চলে যা সেই দিকে। নয় মরেই যাবি। তোর-আমার মত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কী আসছে যাচ্ছে? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভালো।'

সখারাম গণেশ দেউস্কর এক পাঞ্জাবি বন্ধু নিয়ে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আশা ছিল বেদান্ত নিয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু স্বামীজি শুধু দরিদ্রের উদ্ধারের কথাই বলতে লাগলেন, কী করে তাদের এই পাপপাশ মোচন করা যায়!

পাঞ্জাবি বন্ধু ভারি হতাশ হল। বেদান্তের কথা কিছুই হল না। বিরস মুখে বললে, 'আজকের দিনটা বৃথাই গেল।'

স্বামীজি গর্জে উঠলেন : 'যতদিন আমার জন্মভূমির একটা কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে ততদিন তাকে আহার দানই আমার একমাত্র ধর্ম। তা ছাড়া বাকি আর যা কিছু—সব অধর্ম।'

আর অরবিন্দের মুখেই তো সেদিন প্রথম 'কুইট ইণ্ডিয়া'-মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল। সহজ সাধারণ কথা, একটি বিনম্র ন্যায্য অনুরোধ—দয়া করে সরে পড়ো—কিন্তু ইংরেজের বুকে গিয়ে বাজছে একটা বুলেটের মত। কুইট ইণ্ডিয়া। লিখছে অরবিন্দ: 'যদি কোনো ইংরেজ লেখে যে ইংল্যাণ্ড ফর ইংলিশমেন, অর্থাৎ ইংরেজদের জন্যই ইংল্যাণ্ড, তবে কি তা অপরাধ হবে, না রাজদ্রোহ হবে, না, বে-আইনি হবে? কিছুই হবে না। প্রত্যেক ইংরেজ বলবে, ইংরেজদের জন্যই তো ইংল্যাণ্ড—এ তো খুবই ঠিক কথা। আবার প্রত্যেক ইংরেজই বলবে, ভারতবাসীর জন্যে ভারতবর্ষ—এ অতি ভয়ঙ্কর রাজদ্রোহসূচক বেআইনি কথা। এটা কোন যুক্তি? এটাও ন্যায্য বৈধ কথা, ভারতবাসীর জন্যেই ভারতবর্ষ, আর এ কথার সঙ্গে চলে আসে আরেক কথা—ইংরেজদের জন্যে ভারতবর্ষ নয়। নয়, কদাচ নয়।'

এই বাংলাদেশেই 'কুইট ইণ্ডিয়ার' প্রথম উদ্ঘোষ। আর তাকে উদ্দেশ্য করেই রবীন্দ্রনাথের বিজয়বন্দনা :

'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার

বাণীমূর্তি তুমি।...

বিধাতার

শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার

চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়

সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়

অখণ্ড বিশ্বাসে।'

সেই অরবিন্দও চলে গেল ঈশ্বরসন্ধানে। কবে স্ত্রী মৃণালিনীকে লিখেছিল : 'পাগল তো পাগলামির পথে ছুটবেই ছুটবে, তুমি তাকে ধরে রাখতে পারবে না, তোমার চেয়ে তার স্বভাব অনেক বেশি বলবান। তবে তুমি কি শুধু কোণে বসে কাঁদবে, না, তার সঙ্গে ছুটবে? পাগলের উপযুক্ত পাগলী হবার চেষ্টা কোরো, যেমন অন্ধরাজমহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বেঁধে নিজেই অন্ধ সাজলেন। হাজার ব্রাহ্ম স্কুলে পড়ে থাকো, তবু তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে। আমার সন্দেহ নেই তুমি গান্ধারীরই পথ ধরবে।'

আবার সেই অরবিন্দই লিখলে : 'প্রিয়তমা মৃণালিনী, হিন্দুধর্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে ভগবান সাক্ষাৎ করবার পথ আছে। সেই সব নিয়ম পালন করতে আরম্ভ করেছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করতে পেরেছি হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যে নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলেছে সমস্ত উপলব্ধি করছি।'

আরো লিখলে : 'যে কোনোমতে ভগবানের সাক্ষাৎদর্শন লাভ করতে হবে। ঈশ্বর যদি থাকেন তবে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কোনো না কোনো পথ থাকবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক সে পথে যাবার দৃঢ়সঙ্কল্প করে বসেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়ে যাই।'

আর মৃণালিনীকে এই বুঝি অরবিন্দের শেষপত্র :

'প্রিয় মৃণালিনী, আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই। যেখানে ভগবান আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে পুতুলের মত আমাকে যেতে হবে। যা করাবেন তা পুতুলের মত করতে হবে। তোমার স্বামী।'

চন্দননগরে যাবার আগে অরবিন্দ সস্ত্রীক এসেছিল 'উদ্বোধনে' শ্রীশ্রীমা সারদামণির সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর আশীর্বাদ নিতে। দুজনেই মাকে প্রণাম করল। মা অরবিন্দের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, বললেন, 'আমার বীর ছেলে। এইটুকু মানুষ, একেই গভর্নমেন্টের এত ভয়।'

তখন সেখানে গৌরীমা ছিলেন, তিনিও অরবিন্দের চিবুক ধরে আশীর্বাদ করলেন, স্বামীজির কবিতার দুটি ছত্র আবৃত্তি করলেন :

'যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়।

হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক, এ জগতে নাহি তব স্থান।।'

শশীভূষণ দে সি-আই-ডির কর্মচারী, যোগীন-মার নাতি। সে খবর পেয়েছে শামসুল আলমের খুনের মামলায় অরবিন্দকে জড়িয়ে ওয়ারেন্ট বেরুবে। শশী সে খবরটা যোগীন-মার কানে দিল। যোগীন-মা জানাল স্বামী সারদানন্দকে। সারদানন্দ বললে গণেন মহারাজকে,

যাও, অরবিন্দকে খবর দাও। গণেন মহারাজ যখন খবর দিতে গেল অরবিন্দ লিখছে। শুনুন, আপনাকে পুলিশ ধরতে আসছে, আপনি পালান। অরবিন্দ লেখার থেকে মাথা তুলে বললে, 'আগে কাজ—পরে আর সব।' সে কী, পুলিশ যে পিছু নিয়েছে। তা নিক। অরবিন্দ হাসল, বললে, তুমি নিবেদিতার কাছে যাও, তাকে জিজ্ঞেস করো সে আমার হয়ে 'কর্মযোগিন'-এ লিখবে কিনা। যদি নিবেদিতা রাজি হয়, আমার কাজের ভার নেয়, তা হলেই আমি পালাব। গণেন মহারাজ ছুটল নিবেদিতার বাড়ি। নিবেদিতা বলতে না বলতেই রাজি হয়ে গেল। বললে, অরবিন্দকে লুকোতে বলো, এবং প্রচ্ছন্ন থেকেই সে অন্যান্যের মাধ্যমে অনেক কাজ করবে। নিবেদিতার সম্মতি পেয়েও সারাদিন ধরে লিখল অরবিন্দ, তারপর, কোথায় আর যাবে, নিবেদিতারই বাসায় গেল, পর দিন, প্রায় সমস্ত দিন কাটাল নিবেদিতার সঙ্গে। রাত্রে বাগবাজারের ঘাটে নৌকো এসে লাগল। বোস পাড়ায় নিবেদিতার বাড়ী থেকে বেরিয়ে অরবিন্দ সেই নৌকোয় উঠল। নৌকো চলল চন্দননগর।

অরবিন্দ বললে, 'নিবেদিতার ভিতর থেকে মা কালী আমাকে বললেন, আত্মগোপন করো।'

সুভাষ জানে এ অরবিন্দের পলায়ন নয়, এ অরবিন্দের মহৎ-যোগসাধন। তপস্যা প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে বিপুল শক্তি সঞ্চার।

কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ইংরেজকে তাড়াবে কে? কে চীরবাসা রুক্ষকেশী বন্ধনবেদনাহতা মায়ের দুঃখ ঘোচাবে? কে বলবে বন্দেমাতরম্, লিখবে বন্দেমাতরম্, গাইবে বন্দেমাতরম্?

'মা গো যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দেমাতরম্ বলে।
বেত মেরে কি মা ভোলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে?
যায় যেন জীবন চলে।।'

না, সন্ন্যাসে পলায়ন নয়, আত্মগোপনও নয়, সুভাষের মনে হল, দেশমুক্তির জন্যে প্রকাশ্য সংগ্রামই বুঝি তার জন্যে নির্ধারিত তপস্যা। তারই আয়োজনে, যজ্ঞের সমিধ-সংগ্রহে এই প্রারম্ভ থেকেই ব্যাপৃত হওয়া যাক। সাধুসন্ত ছেড়ে দিয়ে সুভাষ আবার পড়ার টেবিলে মন দিল। ডুব দিল বইয়ের সাগরে। সামনেই ম্যাট্রিকুলেশন।

জানকীনাথ ও প্রভাবতী আশ্বস্ত হলেন। ছেলে এবার পড়ার বইয়ে মনঃসংযোগ করেছে। বিপুলবিভবদাত্রী সৌভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন।

তেরো

উনিশ শো এগারো সালে মোহনবাগান শিল্ড পেল। বঙ্গভঙ্গ রদের পর এ যেন আরেক জয়। যেন শুধু খেলার মাঠের জয় নয়, রাজনৈতিক জয়। মোহনবাগানের এগারো

জন খেলোয়াড়ের ছবি ছাপিয়ে বিক্রি হতে লাগল—ছবির নিচে লেখা : অমর এগারোজন। আখ্যান দেওয়া হল—'পলাশীর প্রতিশোধ।' যেন মোহনবাগানের মোহন স্বয়ং সেই মোহনলাল। 'গর্জিলা মোহনলাল নিকট শমন।'

উনিশ শো বারো সালে তেইশে ডিসেম্বর দিল্লিতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা পড়ল। হাতিতে চড়ে শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিল, তখন এই কাণ্ড। মাহুত মারা গেল, বড়লাট ও তার স্ত্রী আহত হল। পরে বড়লাট সামলেছিল বটে কিন্তু তার স্ত্রী আর ফিরল না। কৃতকৃত্য কে? রাসবিহারী বসু। তার ডান হাত বসন্ত বিশ্বাস।

দেরাদুনে ফরেস্ট অফিসের হেডক্লার্ক রাসবিহারী। বোমা ফেলেই রাসবিহারী দেরাদুনে ফিরল। ফিরেই বড়লাটের উপর বোমা ফেলার ব্যাপার নিয়ে সভা ডাকল আর সেই সভায় সে তীব্র ভাষায় বোমা ফেলার নিন্দা করল। অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হোক এমন দাবি করতেও তার বাধল না। পুলিস ধাপ্পায় ভুলল। রাসবিহারীকে স্পর্শও করল না।

যতীন মুখুজ্জে, বাঘা যতীনও, সরকারী চাকুরে ছিল। তার বস ছিল হুইলার। যতীনকে খুব ভালোবাসত হুইলার। যখন হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় যতীনকে ধরল তখন পুলিস কমিশনার ঠাট্টা করে বলেছিল হুইলারকে, তোমার যতীন-হুইলারও গ্যাং কেসে পাকড়াও হয়েছে। হুইলার খেপে উঠল, টেবল চাপড়ে বললে, 'ননসেন্স! যতীন নির্দোষ। আমি বলছি সে ঠিক বেরিয়ে আসবে।'

যতীন ঠিক ছাড়া পেল। উনিশ শো ছয় সালে প্রায় খালি হাতে বাঘ মেরেছিল সে। সেই থেকে সেই শূরশার্দুলের নাম বাঘা যতীন।

আরেক যতীন ছিল যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে সন্ন্যাসী হয়ে যায়, নাম নেয় নিরালম্ব স্বামী। নিরালম্ব ডাকাতির বিরুদ্ধে, তার কথা ছিল সশস্ত্র বিপ্লব। লম্বা-চওড়া শরীরের এক বাঙালি, এক হাতে লাঠি আরেক হাতে লোটা, একদিন বরোদায় অরবিন্দের বাসায় এসে উপস্থিত হল। কী নাম?

'যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যস, এর বেশি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। বাড়ি কোথায়, সংসারে কে কে আছে, কী উদ্দেশ্যে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি জানতে চাইবেন না। জিজ্ঞেস করলেও কিছুই বলতে পারব না।'

'আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি?' স্থির চোখে তাকাল অরবিন্দ।

'বরোদার ফৌজে যদি আমাকে ঢুকিয়ে দেন। আমার বড় সৈন্য হবার ইচ্ছে।'

যতীনের চোখের মধ্যে অরবিন্দ কী এক আগ্নেয় ইঙ্গিত টের পেল। প্রথমে গোয়েন্দা ভেবেছিল—না, গোয়েন্দা নয়, এ যেন কোন এক তীব্রবিষ দীপ্তজিহ্ব ভুজঙ্গ, পরার্থলুব্ধ ইংরেজের ঠিক মর্মমূলে দংশন করতে উন্মুখ। বাঙালি শুনলে ফৌজে নেবে না তাই যতীন তার উপাধির 'বন্দ্য' ছেড়ে দিল। সাজল যতীন্দ্র উপাধ্যায়। যেমন দেখাচ্ছে তেমনি শোনাচ্ছেও কাঠখোট্টা।

লেফটেনান্ট মাধবরাও যাদবের শরণ নিল অরবিন্দ। বন্ধুস্থানীয় লোক, অরবিন্দের কথা মাধবরাও ফেলতে পারল না। আর ফেলবেই বা কী করে? দৃশ্য-শ্রুত সমস্ত পরীক্ষাতেই তো যতীন্দ্র সসম্মানে উত্তীর্ণ।

যতীন্দ্রের কাজ হল সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়ানো। অরবিন্দ তাকে পাঠিয়ে দিল সরলা দেবীর কাছে। অভিসন্ধি গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা করা। যতীন্দ্র সরলা দেবীর লাঠি-তলোয়ারের আখড়ায় এসে ঢুকল। যুবকদের দলভুক্ত করার কৌশলই হচ্ছে লাঠি-তলোয়ার শেখানোর আখড়া খোলা। চলে এস সাজোয়ানের দল। কুস্তি শেখ, বক্সিং শেখ, জুজুৎসু শেখ। গীতা আর তলোয়ার ছুঁয়ে দীক্ষা নাও। অনলসঙ্কাশ হয়ে ওঠো।

'সমস্ত ভারত ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে তৈরি।' দলভুক্ত যুবকদের কাছে বলত উপাধ্যায় : 'সমস্ত প্রদেশ তো বটেই এমন কি করদ রাজ্যগুলোও। লক্ষ লক্ষ সৈন্য তলোয়ার শানাচ্ছে। এমন কি গারো নাগা ভীল কোল অসভ্য জাতিদেরও হাজার হাজার লোক পাঁয়তারা কষছে। খালি বাংলাদেশেই তৈরি নয় বলে সমস্ত অভ্যুত্থান আটকে বসে আছে। কামান বন্দুক প্রভৃতি হাতিয়ারের কোনো ভাবনা নেই। জেনারেল ক্যাপ্টেনও তৈরি কিন্তু বাঙালি কই। কই বাঙালি জেনারেল, বাঙালি ক্যাপ্টেন? তোমরা দলে দলে এগিয়ে এস। যে আগে যোগ দেবে সেই ক্যাপ্টেন-কমাণ্ডার হতে পারবে।'

কৌশল যাই হোক, কত বড় কথা, কত বড় স্বপ্ন। শুধু ডাল-পালা কাটলে কি গাছকে নিষ্ক্রিয় করা যায়? একেবারে ওটার মূলে সসমারোহ আঘাত করো। শুধু খুচরো খুনে আর ডাকাতিতে ঐ মহীরুহের অঙ্গচ্ছেদ করে কিছু হবে না। একেবারে সামগ্রিক সশস্ত্রতায় তুমুল আক্রমণ করো, ও সমূলে উৎপাটিত হবে।

সেই যতীন্দ্র ব্যানার্জীও সন্ন্যাসী হয়ে গেল। সমস্ত দেশকে নিরালম্ব করে হয়ে দাঁড়াল নিরালম্ব স্বামী। প্রত্যক্ষে আরেকবার হুঙ্কার দিয়েছিল যখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'সন্ধ্যা' যায়-যায় হয়েছিল। নিরালম্ব স্বামী 'সন্ধ্যার' সম্পাদক হয়ে বসল, বসেই লিখল : 'মরি নাই, আমি আসিয়াছি।'

ব্রহ্মবান্ধব খৃস্টান। আবার সন্ন্যাসী। আবার অমিততেজা ব্রাহ্মণ। স্বদেশ প্রেমে জ্বলিতবজ্র। আকুমার ব্রহ্মচারী আবার উপবীতধারী হিন্দু। ব্রহ্মবান্ধবের আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গোড়ায় কেশব সেনকে ধরে ব্রাহ্ম হয়েছিল। সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে গিয়ে খৃস্টান। প্রথমে রোমান ক্যাথলিক, পরে প্রোটেস্টান্ট, শেষে বেদান্তে অনুরাগ হল। মৃত্যুর মাত্র দু বছর আগে হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করে গলায় উপবীত ধারণ করে ব্রাহ্মণ হয়ে গেল।

উনিশ শো দুই সালের পাঁচুই জুলাই সকালে হাওড়া স্টেশনে খবর পেল গত রাত্রে স্বামীজি দেহ রেখেছেন। তখুনি ছুটল বেলুড় মঠে। স্বামীজির নশ্বর দেহের দিকে তাকিয়ে ব্রহ্মবান্ধব অন্তরে একটা প্রেরণা পেল ইংরেজ-বিতাড়নের ব্রত উদযাপন করো। ব্রহ্মবান্ধব ঠিক করল বিলেত যাবে। মুখের কথা যা শপথও তাই। তিন মাসের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব বিলেত রওনা হল। কে বিশ্বাস করবে, পকেটে সম্বল মাত্র সাতাশ টাকা। বিলেতে কতগুলি বক্তৃতা দিয়ে দেশে ফিরল।

কোনোদিন বোমা ছোঁড়ে নি বটে কিন্তু 'সন্ধ্যায়' যে সব প্রবন্ধ তা প্রত্যেকটাই পুলিশের উপর অশনিসম্পাত। শুধু পরিহাসের প্রহার বা, বলা যায়, চাবুকের চাতুরি। এ জ্বালা হৃদয়ভেদী।

শেষ পর্যন্ত ধরল উপাধ্যায়কে। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ তার পক্ষে এসে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়েই বললে, এ মামলায় আমার মক্কেল কোনো অংশ নেবে না যেহেতু এটা বিদেশীর আদালত। আমার মক্কেল ইংরেজের আদালত, বিদেশের আদালত মানে না, তাই সে সম্পূর্ণ নীরব থাকবে।

'আপনার মক্কেল দোষ স্বীকার করবে?'

'দোষ স্বীকার করবে না, কেননা দেশের স্বাধীনতার জন্যে লেখনীচালনা অপরাধ নয়। তবে আমার মক্কেল পত্রিকার ও তাতে এই লেখা ছাপানোর দায়িত্ব তার একলার নিজের বলে মেনে নিচ্ছে। এর বেশী আর কিছু সে বলতে চাইছে না। কেননা একটা বিদেশী আদালতের কাছে সে জবাবদিহি করতে প্রস্তুত নয়।'

আদালতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত এই নতুন, এই প্রথম। সাক্ষীদের একতরফা জবানবন্দি হল, আসামী পক্ষ থেকে তার কোনো জেরা নেই।

চিত্তরঞ্জনকে উপাধ্যায় বললে, 'তুমি আমার জন্যে ভেবো না, ইংরেজের সাধ্য নেই আমাকে জেলে দেয়।'

কত দিন কোর্টের পর চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে চলে এসেছে উপাধ্যায়। বাড়ি ফেরার সুবিধে করে উঠতে পারে নি। কী কতটুকু খেয়েছে কি না খেয়েছে, এখন শুতে চাইছে ভূমিশয্যায়। সে কী, বাড়িতে খাট আছে, বিছানা আছে, সেখানে আরাম করে শোন। না, ভূমিতল থাকতে আমার শয্যায় কী দরকার? বালিশ লাগবে না, বাহুই আমার স্বাভাবিক উপাধান, মাটিতে শুয়েই ঘুমুল উপাধ্যায়। উপাধ্যায়ের কথাই ঠিক হল। মোকদ্দমা শেষ হবার আগেই ক্যাম্বেল হাসপাতালে সে মারা গেল। ইংরেজের জেলখানায় তাকে ঢুকতে হল না।

'সে সুখের দিন কবে বা হবে, টিকটিকির পূর্ণ লাহিড়ি ওয়ারেণ্টো হাতে দেবে?' এ উপাধ্যায়ের গান। কিংবা 'কারাগার স্বর্গ মানি, মা বলে টানব ঘানি।'

আর ছিল লিয়াকত হোসেন আর তার বালকসেনার দল। রাস্তায় রাস্তায় তুলল বন্দেমাতরম্-এর উচ্চনাদ। 'যাদের ভয় আছে তারা গোড়াতেই সরে পড়ো। এর পর যারা ভাগবে তাদের মানুষ বলে স্বীকার করব না, তাদের কুকুর-বেড়াল মনে করব।'

জেলে যাওয়াটা লিয়াকতের কাছে জল-ভাত, তাই কোনো কিছুতে তার দুঃখও নেই ভয়ও নেই। দুঃখ করলেই দুঃখ, ভয় করলেই ভয়। লিয়াকত ভয়শূন্য তো বটেই, লিয়াকত ভয়ত্রাতা।

ভূপেন বোস সরকারকে মুচলেকা দিয়ে এসেছিল রাখীবন্ধনের দিন সভায় কেউ লাঠি নিয়ে যাবে না আর রাজদ্রোহের বক্তৃতা দেবে না। কে কার কথা শোনে। প্রায় ত্রিশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকের হাতে লাঠি। ওরা আছে থাক, লিয়াকত এক দঙ্গল বালকবাহিনী নিয়ে সভায় ঢুকল, তাদের হাতে লাঠি, মাথায় লাল ফেজ। মুখে বন্দেমারতম্।

এবার ধরল লিয়াকতকে। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অমান্য করার দরুন তার জেল হল ছ মাস। হাসিমুখে দণ্ড ভোগ করল লিয়াকত, আইন-ভঙ্গকে মহিমান্বিত করে তুলল। যে আইন স্বেচ্ছাচারী তাকে ভঙ্গ করে যে দণ্ড সে তো বিষ নয় সে

আরো কত কাণ্ড ঘটে গেল।

ডিটেকটিভের কনস্টেবল শ্রীশ চক্রবর্তীকে সিকদার বাগান স্ট্রিটে তার বাড়ির কাছে গুলি করা হল। অন্ধকার গলি, কে মেরেছে, কারুর কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। মেডিকেল কলেজে যেতে না যেতেই শ্রীশ শেষ নিশ্বাস ছাড়ল।

মরল রাজকুমার রায়, ডিটেকটিভের সাব ইন্‌স্পেক্টর, ময়মনসিংহে প্রায় তার থানার কাছাকাছি। মেরে কে যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার নিশ্বাসের চিহ্নটুকুও কেউ খুঁজে পেল না।

না, না, এসব ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই—সুভাষ একান্ত-চিত্ত হয়ে পড়ায় মন দিয়েছে, তাই সে এখন সাধন করুক।

নইলে এমন খবর তো আরও আছে।

গোয়েন্দা মনোমোহন দে খুন হল রাত্রে, তার বাড়িতে, তার বিছানায়। ঢাকা ষড়যন্ত্র ও ময়মনসিং বোমার মামলায় সরকার পক্ষের জাঁদরেল সাক্ষী মনোমোহন। বিপ্লবী আসামীদের কৃতান্ত। সর্ব চেষ্টায় অযাত্রা, ওকে না সরালে বাঞ্ছিতার্থ লাভ হচ্ছে না। সুতরাং হাতে হারিকেন লণ্ঠন, পথ চিনে চিনে তার বাড়ি এসে পৌঁছেছে বিপ্লবীরা। মনোমোহনের নাম ধরে ডেকেছে বাইরে থেকে। ডাক শুনেও মনোমোহন বিছানা ছাড়ে নি, কে কী জানে, নিশির ডাক হয়তো। কিন্তু না, বাইরে থেকে ডেকে ওকে বার করা যাবে না। দরজা ভেঙে বিপ্লবীরা ঘরে ঢুকল। কী, আপন জনের বিরুদ্ধে আর সাক্ষ্য দেবে, তাদের বাঁচবার পথে, বাড়বার পথে কাঁটা দেবে? তুমি তো ব্রিটিশের মনোমোহন, কই, তোমার শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের ডাকো। তিন-তিনটে গুলি সরাসরি বিদ্ধ করলো মনোমোহনকে। তিন-তিনটে হ্যারিকেন নিবে গেল অন্ধকারে। কে যে সেই ত্রিমূর্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কেউ খোঁজ পেল না।

নোয়াখালির সারদা চক্রবর্তী দল ছেড়েছে। শুধু দল ছেড়েই ক্ষান্ত হয় নি, দলের বিরুদ্ধে বলাবলি শুরু করেছে। অতএব এ বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করা যায় না। ফলে সারদা চক্রবর্তীর মাথা তার ধড়ের থেকে আলাদা হয়ে গেল। মাথাটা হাতে করে বয়ে নিয়ে যাবার মত এমন কিছু মূল্যবান নয়, সোজা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল পুকুরে। ধরো কাকে ধরবে। কোথাও এতটুকু চিহ্ন রেখে যায় নি। বিপ্লবীদের হাত পাকছে ক্রমশ।

তারপর এক রাত্রে তিন শত্রু সাবাড়। বিপ্লবীদের আনন্দ দেখে কে! এ আনন্দ তো প্রকাশ্যে জানানো যাবে না, এ শুধু প্রচ্ছন্নে সম্ভোগ করতে হবে।

রসুল দেওয়ান আর আমির দেওয়ান বিক্রমপুর সোনারং গ্রামের দুই দফাদার। আর ওদের সাকরেদ কালীবিনোদ। তিনজনে মিলে সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বিপ্লবীদের জেলে পাঠিয়েছে। জেলের বাইরে আছে আরো বিপ্লবী—দাঁড়াও, কৃতকার্যের ফল খাওয়াই।

সন্ধের পর রসুলকে কে ডাকল বাড়ির বাইরে। রসুল বাইরে বেরুতেই তাকে গুলি করা হল। গুলি মেরেই আততায়ী ছুটে চলল। কী কুমতি হল রসুলের, বলে উঠল, 'দাঁড়াও, তোমাকে আমি চিনে ফেলেছি।' আততায়ী দাঁড়াল, ফিরে এল, কাছে এসে আরো কটা গুলি পর-পর উপহার দিল রসুলকে। কবে আর চিনবে, কাকে বা চেনাবে, রসুল লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আমির দেওয়ানও গুলি খেল।

কিন্তু কালীবিনোদের কী হবে? ও তো এককালে দলে ছিল, এখন পুলিসের কোলে গিয়ে বসেছে, ওর অপরাধ তো আরো জঘন্য। কিন্তু ওদিকে রিভলভারে যে আর গুলি নেই। না থাক, ছুরি আছে। ছুরিই কালীবিনোদের যোগ্য উত্তর।

এ সব হচ্ছে হোক, যদি এতে ব্রিটিশ রাজত্বের বনেদ নড়ে তো নড়ুক, এসবে এখনো মন দেবার সময় আসে নি সুভাষের।

কিন্তু আন্দামান জেলে কয়েদী ইন্দুভূষণের মৃত্যুর কাহিনী বড় করুণ। এ কি করে ভুলে থাকা যায়?

আঠারো বছরের ছেলে, আলিপুর বোমার মামলায় সাজা পেয়ে আন্দামানে এসেছে। নির্দয় জেলর তাকে জেলের বাইরে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়েছে। কী একটা আন্দামানি গাছ আছে, তার থেকে ছাল ছাড়িয়ে আঁশ বের করার কাজ। বিশ্রী কাজ! গাছের আঠার বিষে হাতের আঙুলে ঘা হয়ে গেছে, তবু তার রেহাই নেই। একদিন ইন্দু রুক্ষ কণ্ঠে জমাদারকে বললে, সবার মতন আমাকে জেলের মধ্যে কাজ দাও না! এই কথা! কাজের প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি? ইন্দুর হাতে-পায়ে বেড়ি পরানো হল। যাও জেলের মধ্যেই কাজ কর গে।

তাই ভালো। তবু জেলের মধ্যে চেনা মানুষের মুখ আছে, চোখে কাছে সমবেদনার স্নিগ্ধতা, তাই যথেষ্ট শান্তি। কিন্তু না, দুদিন পরেই আবার হুকুম হল, জঙ্গলে যাও। যাব না। রোক করে ঘাড় বাঁকালো ইন্দু। লাভ হল এই, জেল-শৃঙ্খলা ভাঙার অপরাধে উলটে শাস্তি হল। জঙ্গলে তো যাবেই, আগে যা করছিলে তার চেয়ে আরো বেশি খাটতে হবে।

দু হাতে বিষাক্ত ঘা হয়ে গেল ইন্দুর। জেলরকে গিয়ে বললে, 'আমাকে অন্য কাজ দিন।'

জেলর বললে, 'অসম্ভব।'

'এই দেখুন আমার হাত।'

জেলর তাকিয়েও দেখল না।

'ঘায়ের জন্য আমি ভাত পর্যন্ত খেতে পারছি না।'

'বাঁ হাত দিয়ে খাও।'

'দুই হাতেই ঘা। আমাকে অন্য-কোনো কাজ দিন স্যার। অন্তত যদ্দিন ঘা না সারে—'

'বেশ, অন্য কাজ দিচ্ছি। কাল থেকে তুমি ঘানি টানবে।' জেলর উঠল গর্জন করে।

'ঘানি!' ইন্দুর চোখে জল দাঁড়িয়ে গেল: 'এই হাতে ঘানি টানব? যন্ত্রণায় দু হাত টনটন করছে।'

ও সব বাজে আবেদনে কান দিতে রাজি নয় জেলর। হুকুম হুকুম

'এ হাতে ঘানি টানতে গেলে মরে যাব স্যার।'

গেলে যাবে—এমনি একটা নিঃসাড় ভঙ্গি করল জেলর।

সেল-এ গিয়ে ইন্দু তার গায়ের কুর্তাটা ছিঁড়ল। ফালি-ফালি করল। তাই দিয়ে দড়ি পাকাল। সেই দড়ি গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করল।

এত অত্যাচার এত বর্বরতা এত হৃদয়হীনতা এ বুঝি সহ্যের বাইরে।

উপরালারা তদন্তে এল। জেলর বললে, 'সব সময়ে একটা আতঙ্কের ছবি দেখত অন্য কয়েদীরা তাকে খুন করবার চক্রান্ত করছে। সেই অশরীরী আতঙ্কেই আত্মহত্যা করেছে।'

না, ইন্দু রায়ের আত্মহত্যা নিয়ে মাথা ঘামানোরও এখন সময় নেই। যা হয় পরে হবে। ঐ যে গান হচ্ছে না জানি কোথাও:

'ঐ যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার তো নয় একটি ছড়া।
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয়?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠী
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক গ্রাসের মালিক নয়
স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? এ দেশ তোদের নয়॥'

এও পরে শুনব। কিন্তু পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে একটু দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' পড়তে দোষ কি? বন্ধুদের সঙ্গে বসে পড়ছে সুভাষ:

'রাণা অমর সিংহ। কিন্তু আমি দেখছি যে আর একটি যুদ্ধ করলেই হবে না, এ সংগ্রামের অন্ত নেই। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশ্বজয়ী দিল্লির সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অবিমিশ্র উন্মত্ততা।'

সত্যবতী। উন্মত্ততা রাণা? উন্মত্ত না হয়ে কেউ কোনো কালে কোনো মহৎ কাজ করতে পেরেছে?

রাণা। কিন্তু যে যুদ্ধের শেষ ফল নিশ্চিত মৃত্যু—

সত্যবতী। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের কাছে কি বেছে নেওয়া এত শক্ত যে কোনটি শ্রেয়—অধীনতা কি মৃত্যু! মরবার ভয়ে আমার রত্ন দস্যুর হাতে সঁপে দেব? আর এ যে সে রত্ন নয়, আমার যথাসর্বস্ব, আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত, বহু শতাব্দীর স্মৃতি-স্নাত মেবারকে প্রাণভয়ে বিনামূল্যে শত্রুকরে সঁপে দেব? নিশ্চিত মৃত্যু? সে কি একদিন সকলের নাই? মান দিয়ে ক্রয় করে প্রাণটা কি চিরকাল রাখতে পারবেন?

'সেই রাণাই আবার বলছে সত্যবতীকে,' সুভাষ পড়তে লাগল: 'সত্যবতী, বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্বনাশ করবে তার নিজের সন্তান। মনে কর তক্ষশীলা। মনে কর জয়চাঁদ। মনে কর মানসিংহ আর শক্তসিংহ। তার সঙ্গে-সঙ্গে দেখ এই মহাবৎ খাঁ আর গজসিংহ। ঠিক মিলেছে কিনা? একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে কিনা? বিধাতার লিখন ব্যর্থ হয় না। যাও সত্যবতী, আমি সৈন্য সাজাই।'

কিন্তু এ জায়গাটা কী সুন্দর বলছে! সুভাষ পিছনের পৃষ্ঠায় সরে গেল। পড়লে: 'বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে। দুঃখ সে দেশের নয় যে দেশের বীর মরে। দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।'

তারপর 'আনন্দমঠ'ও একটু আধটু নাড়তে-চাড়তে হয়।

'শোনো, মা কী ছিলেন! সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী। কী হয়েছেন? অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্যে নগ্নিকা। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পায়ের তলায় পিষছেন। তার পর মা কী হবেন তাই দেখ। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগভুজা নানাপ্রহরণধারিণী বিমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। এস আমরা মাকে প্রণাম করি।' সুভাষ যুক্তকরে প্রণাম করল।

কাকে প্রণাম করল? দুর্গাকে না দেশমাতাকে? যে দেশমাতা সমস্ত দুঃখদুর্গবিঘাতিনী সেই দেশমাতাকে।

'যাও যাও সমরক্ষেত্রে—নাও উচ্চে রণজয়গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে—শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা॥'

চোদ্দ

উনিশ শো তেরো সাল, জুলাই মাস। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে জানকীনাথ বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। ঢুকেই হাঁক দিলেন: 'ওগো শুনছ কলকাতা থেকে শরৎ টেলিগ্রাম করেছে। সুবি পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছে।' কাছেই সারদা-ঝিকে পেয়ে বললেন, 'যাও তোমার মাকে ডাকো।'

পরীক্ষা, টেলিগ্রাম, সুবি, সব মিলে একটা আনন্দের খবর, বুঝতে দেরি হল না সারদার। স্নেহে আর সুখে বিগলিত মুখে সলজ্জ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'আমার সুবি পাস করেছে?'

'হ্যাঁ গো সেকেণ্ড হয়েছে।'
'কী বলছ, ফাস্টো হয় নি?'
'না।'

'কী বলছ', প্রভাবতী ঘরে ঢুকলেন। আতঙ্কিত মুখে বললেন, 'ফার্স্ট ডিভিশন হয় নি?'

'ডিভিশন ফার্স্ট বই কি—' হাসলেন জানকীনাথ।

'তবে তখন যে বললে ফাস্টো নয়?' সারদা আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে পড়ল: 'আমার সুবি ছাড়া আর কে ফাস্টো হবে? তাকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি।'

প্রভাবতী বুঝলেন ব্যাপার কী। সুভাষের খোঁজ করতে বেরুলেন।

প্রথম হয়েছে কলকাতা মিত্র ইনস্টিটিউশান থেকে প্রমথনাথ সরকার আর তৃতীয় হয়েছে চাইবাসা স্কুল থেকে প্রিয়রঞ্জন সেন।

এখন সুভাষ কী করে, কোথায় পড়ে?

মাকে জিজ্ঞেস করে, 'মা, আমাকে কোন কাজে নিযুক্ত দেখলে তুমি সুখী হবে?

জজ, ম্যাজিস্ট্রেট না ব্যারিস্টার? যদি খুব ধনী হই, লোকের মান্য-গণ্য হই, অনেক গাড়ি বাড়ি করি, অনেক চাকর-চাকরানী খাটাই, তা হলেই কি তুমি সুখী হও? কিংবা যদি গরিব হওয়া সত্ত্বেও খাঁটি মানুষ বলে গুণিজনের কাছে স্বীকৃতি পাই তা হলে কি তুমি সুখী হও না? তোমার কী ইচ্ছে বলো না মা?'

মা বলেন, 'আমি তো বুঝি ঠিক-ঠিক শিক্ষা পেয়ে তুমি মানুষ হয়ে ওঠো।'

আমার তো মনে হয় মা, আসল শিক্ষাই হচ্ছে ভগবানে ভক্তি। যে শিক্ষায় ঈশ্বরের নাম নেই সে শিক্ষা অসার। আর বর্তমান শিক্ষায় আমরা কি মানুষ হচ্ছি, আমরা একেকটি বাবু বনছি। সবল দেহ থাকা সত্ত্বেও পরিশ্রমের কাজকে ছোটোলোকের কাজ বলে ভাবছি, আমাদের গতি কী হবে! পাশ্চাত্য শিক্ষাই আমাদের নাস্তিক আর বিধর্মী করে ফেলেছে।'

কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হল সুভাষ। অঙ্ক লজিক আর সংস্কৃত নিয়ে। ম্যাট্রিকে অঙ্কে পেয়েছে একশোতে একশো আর সংস্কৃতে পঁচানব্বুই। প্রেসিডেন্সি কলেজ তখন সরগরম। অধ্যাপকদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু, মনোমোহন ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষ ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা পি. সি. রায়। কানাই দত্তের ফাঁসির পর প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিল, 'কানাই শিখিয়ে গেল হে। এবার থেকে ইংরিজি shall আর will-এর ব্যবহার করতে আর কারু ভুল হবে না।'

ছোট মফস্বল শহর ছেড়ে বিরাট রাজধানীতে এসে পড়েছে সুভাষ, প্রকাণ্ড জনজাগরণের হাওয়া তার গায়ে লেগেছে, সে নিদারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল। কলেজের প্রথম ছুটি হতেই ছুটল সে কৃষ্ণনগর, বন্ধু হেমন্ত সরকারের উদ্দেশে।

'আমি এলাম।' হেমন্তের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল সুভাষ।

'ভালো করেছ! আমদের গুপ্ত সমিতির সুরেশদা যুগলদাও আছেন।'

সুরেশদা অর্থ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর যুগলদা অর্থ ডাক্তার যুগোল-কিশোর আঢ্য।

'আর কে আছেন?'
'অমূল্য আছে, গুরুদাসও আছে।'
'সবাই যাবেন তো একসঙ্গে?'
'সবাই যাবেন।'
'প্রথমেই কিন্তু পলাশী। তারপরে মুর্শিদাবাদ।'

'তাই তো সুবিধে।' হেমন্ত হাসল: 'যদি সুবিধে হয় পলাশীতে আমরা বন্দুক ছোঁড়া প্র্যাকটিস করব।'

'হ্যাঁ, চলো সেই যুদ্ধক্ষেত্র দেখব।' সুভাষ বললে, 'সেই আম্রবন।'

হেমন্ত বললে, 'সেই আম্রবন আর নেই। এখন সেখানে আখের খেত।'

'তবু সেই যুদ্ধক্ষেত্রই আমাদের তীর্থ। সেখানেই তো মোহনলাল আর মিরমদনের সৈন্যেরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়েছিল—'

'আর আছে ইংরেজের তৈরি বিশ্বাসঘাতকতার স্মৃতিস্তম্ভ।'

'চলো।'

সবাই মিলে পায়ে হেঁটে এল সেই পলাশীর মাঠে।

'বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।।'

হেমন্ত বললে, 'এই সেই যুদ্ধক্ষেত্র।'

'আর এই সেই স্মৃতিস্তম্ভ।' সুরেশ হেমন্তকে লক্ষ্য করল, 'এই, খড়ি এনেছিস?'

'এনেছি। এই যে—' পকেট থেকে খড়ি বের করল হেমন্ত।

সুরেশ খড়ি নিল, বললে, 'দাঁড়া, স্তম্ভের গায়ে লিখে দি—মনমেণ্ট অফ গ্রেয়ারিং ট্রেচারি। জ্বলন্ত বিশ্বাসঘাতকতার স্তম্ভ।'

জগৎশেঠের বাড়িতে পঞ্চবীর বসেছে ষড়যন্ত্রে—রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ, মিরজাফর, রাজবল্লভ আর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। সিরাজ দুর্দান্ত, নিষ্ঠুর কামকূট, অকে সিংহাসনচ্যুত না করলে দেশের মঙ্গল নেই। সিরাজের রক্ত ছাড়া দেশময় কলঙ্কের কালিমা কিছুতে ধুয়ে যাবে না। কিন্তু কী করে তার পতন ঘটাবে? ইংরেজ সৈন্য দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের ডেকে আনি, তাদের সাহায্য কিনে নি। তারাই আমাদের হয়ে সিরাজকে অপসারিত করবে। কিন্তু তাদের সৈন্য তো মুষ্টিমেয়। হোক মুষ্টিমেয়, কিন্তু আমি মিরজাফর, সিরাজের সেনাপতি, কথা দিচ্ছি, সিরাজ আক্রান্ত হলে আমি আমার অধীনস্থ সেনাবল নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকব, ইংরেজকে বাধা দেব না, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব না। দুর্দান্তকে ভ্রষ্টরাজ্য করা নিয়েই কথা, কী উপায়ে সেটা করা হচ্ছে সেই জিজ্ঞাসা অবান্তর। সকলে একবাক্যে মিরজাফরকে সমর্থন করল।

'রানীর কী মত?' রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাটোরের রানীভবানীকে জিজ্ঞেস করলে।

'রানীর কী মত!' রানীভবানী গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে ঋজু হয়ে বসল। ঋজু কণ্ঠে বললে, 'আমার মত হচ্ছে আপনারা নিজেরা বিদ্রোহী হয়ে সম্মুখ সমরে আহ্বান করুন নবাবকে। এভাবে ইংরেজকে ডাকতে যাবেন না। ওরা বাণিজ্য করতে এসে রাজ্য বিস্তার করতে বসেছে। দেখা যাচ্ছে ওদের রাজ্যই বাণিজ্য। ওদের প্রশ্রয় দেবেন না। ওদের বিশ্বাস করবেন না। ওরা সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করেই শান্ত হবে না, বরং রাজ্যপিপাসায় উন্মত্ত হবে। রক্তের স্বাদ পেয়ে বাঘ যেমন ক্ষিপ্ত হয় তেমনি দুর্বার হয়ে উঠবে ওরা। বঙ্গের সিংহাসনে ওরাই রাজা হয়ে বসবে, কেউ আর সহজে পারবে না ওদের হটাতে।'

রানীর মত, রমণীর মত কে আর গ্রহণ করে? কিন্তু, প্রশ্ন করি, সিরাজ দূর হয়ে যাবার পর কে বসবে মসনদে? কে আবার! মিরজাফর বসবে। সকলে এক কণ্ঠে রব তুলল।

মিরজাফর! মিরজাফরও বুঝি সেই স্বপ্নেই রঙিন ছিল। কিন্তু পরপিণ্ডপ্রত্যাশী ইংরেজ যে কত বড় প্রবঞ্চক তা তার তখন জানা ছিল না।

'আরেকটা মিথ্যার স্তম্ভ ড্যালহৌসি স্কোয়ারের হলওয়েল মনুমেণ্ট।' সুভাষ বললে দৃঢ় কণ্ঠে: 'বলে কিনা অন্ধকূপ হত্যা। দাসত্বের পঙ্কে ফেলে সমস্ত দেশকে অন্ধকূপ করে তিল-তিল করে যারা হত্যা করছে তাদের কলঙ্কের ইতিহাসটা তো মিথ্যে নয়,

সেটা তো একেবারে চোখের উপর প্রত্যক্ষ। সুরেশদা, তুমি দেখো,' সুভাষ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'আমি এই হলওয়েল মনুমেণ্ট তুলে দেব।'

সুরেশ হেমন্তকে ডাকল: 'নে, পলাশীর যুদ্ধ থেকে আবৃত্তি কর।'

হেমন্ত উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল:

দাঁড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে! দাঁড়া রে যবন!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ
যদি ভঙ্গ দেও রণ'—
গর্জিলা মোহনলাল—'নিকট শমন॥'
সেনাপতি! ছি ছি এ কি। হা ধিক তোমারে
কেমনে বল না হায়
কাঠের পুতুল প্রায়
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে?
ভেবেছ কি শুধু রণে করি পরাজয়
রণমত্ত শত্রুগণ
ফিরে যাবে ত্যজি রণ
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয়?
মূর্খ তুমি, মাটি কাটি লভি কহিনুর
ফেলিয়া সে রত্ন হায়
কে ঘরে ফিরিয়া যায়
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর॥'

সুভাষের চোখে জল দাঁড়িয়ে গেল।

সবাই মিলে চলে এল মুর্শিদাবাদ।

'এই খোসবাগ।' বললে হেমন্ত, 'এই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সমাধি!'

'যিনি একদিন বাংলা বিহার উড়িষ্যার সম্রাট ছিলেন, ইংরেজ বেনেদের উচ্ছেদ করবার জন্যে প্রাণপণে লড়েছিলেন এই তাঁরই ধূলিশয্যা।' সুভাষ মমতানিবিড় চোখে তাকিয়ে রইল।

মিরজাফর বলো, ইয়ার লতিফ বলো, রাজবল্লভ বলো, সবাই নবাবীর জন্যে ব্যস্ত—রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে নয়, দুর্দান্ত নবাবকে দমন করবার জন্যে নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়, স্বার্থের জন্যে।

সিরাজ বলছে তার মন্ত্রীদের, 'আমাকে শত্রু বিবেচনা করবেন না। কিন্তু যদি শত্রুই হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাংলার শত্রু নই। যদি আপনাদের বিসর্জন দেওয়া আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্তে আমি আর কোনো বাঙালিকেই রাজকার্য প্রদান করব। অর্থাৎ আপনাদের কোনো আত্মীয়স্বজন স্বদেশীই নির্বাচিত হবে। বাঙালির পরিবর্তে বাঙালিই রাজকার্য পাবে।'

মিরমদনকে বলছে সিরাজ, 'মিরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো হিন্দু-মুসলমান জন্মভূমির অনুরাগে ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পরস্পর মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হয়ে সাধারণের মঙ্গলের সঙ্গে নিজের মঙ্গল বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা বিদ্বেষ নীচ প্রবৃত্তি দলিত করে স্বদেশবাসীর অপমান নিজের অপমান জ্ঞান করে, তবেই আশা, নতুবা সব নিষ্ফল!'

সুরেশ বললে, 'আর এই লুৎফার সমাধি। সেই লুৎফা—যে প্রতি সন্ধ্যায় সিরাজের সমাধির উপর দীপ জ্বেলে দিত, দুটি ফুল এনে রাখত।'

'দাঁড়ান, আমি ফুল এনে দিচ্ছি।' সুভাষ গেল ফুলের অন্বেষণে।

হেমন্তকে 'পলাশীর যুদ্ধ' আচ্ছন্ন করে রেখেছে। থেকে-থেকে টুকরো-টুকরো লাইন সে আবৃত্তি করে চলেছে:

'আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন
স্বাধীনতা শেষ-আশা গেল পরিহরি।'

কটি বনফুল তুলে এনেছে সুভাষ! ফুল কটি রাখল সে সিরাজ আর লুৎফার সমাধির উপর।

বেলা ঢলে পড়েছে। সূর্য যাই-যাই করছে।

হেমন্ত আবার আবৃত্তি শুরু করল:

'কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি।
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রজনী।
এ বিষাদ অন্ধকারে নির্মম অন্তরে
ডুবায়ে ভারতভূমি যেও না তপন।'

সুরেশকে লক্ষ্য করে বললে, 'ফেরবার সময় কিন্তু নৌকো নেব সুরেশদা।'

সুভাষ হেমন্তকে জিজ্ঞেস করলে, 'এ সমস্তর প্রতিকার কী?'

হেমন্ত তখনো পলাশীর যুদ্ধ থেকেই আবৃত্তি করছে:

'প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাই আর।'

কিন্তু আসলে বোধহয় সুভাষকে অপোগণ্ড মনে করেছে। তাই নৌকো করে ফেরবার সময় সে সুরেশকে বললে, 'সুরেশদা, কিছু খেয়ে গেলে হত, সুভাষের খিদে পেয়েছে।'

সুভাষ লজ্জিত মুখে তাড়াতাড়ি বললে, 'মোটেই খিদে পায় নি।'

'জানেন সুরেশদা, ছেলেবেলায় খিদে পেলে সুভাষ মুখ ফুটে কখনো তা বলত না, হাতের বুড়ো আঙুল চুষত। সারদা-ঝি বুঝতে পেরে তখুনি খাবার নিয়ে আসত। দেখুন ও এখন আঙুল চুষছে। ওর খিদে পেয়েছে।' হেমন্ত হাসতে লাগল।

'মোটেই আঙুল চুষি নি। খিদে পায় নি।' সুভাষ করুণ মুখে বললে।

'খিদে পায় নি তো একটা গান গাও।'

'এই কথা? বেশ গাইছি, কিন্তু তুমি?'

'আমি পরে গাইব।'

গঙ্গার উপরে প্রাণ-ঢালা জ্যোৎস্না পড়েছে। কী বিরাট শান্তি— স্তব্ধতা। ছপ ছপ করে দাঁড় পড়ছে। নৌকো চলেছে। যেন কোন এক উদার উদয়-পথে যাত্রা করেছে তারা।

সুভাষ গান ধরল :

'দূরে হের চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত গঙ্গা
ধায় মত্ত হরষে সাগর পদ পরশে
কূলে কূলে করি পরিবেশন কল্যানীময়ী বরষা
শ্যাম ধরণী সরসা॥'

এ যেন জীবনের আরেক দিক, আরেক সুর। পার্থিবের নয় আকাশের। সমস্ত দ্বন্দ্ব দ্বেষ শোষণ শাসন অপমান অত্যাচারের বাইরে এ যেন গভীর কোনো প্রসাদ বা প্রশান্তির আশ্রয়। জীবনে যখন কিছুই পাওয়া যায় না, কিছুই হয়ে ওঠে না, তখন একমাত্র আকাশই বলে আমি আছি! আকাশই তো এক মূর্ত মহান অস্তিত্ব। যদি বিশ্বে ধ্রুব বলে কিছু থেকে থাকে তবে তা আকাশ। সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে আছে বলেই এত অপরূপ! সমস্ত দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে ক্ষমা, সমস্ত যন্ত্রণার উর্দ্ধে শান্তি, সমস্ত সংগ্রামের উর্দ্ধে নির্বেদ, বৈরাগ্য। কী হবে এসব হানাহানির মধ্যে গিয়ে? সমস্ত অসার, অনিত্য। জীবনের আসল বৈভব বৈরাগ্য।

গান গাইতে গাইতে নিজেই কেমন উদাসীন হয়ে পড়ল সুভাষ। কোথায় পলাশী, কে বা সিরাজ! আকাশ বলছে উদয়-বিলয়ের উর্দ্ধে শাশ্বত হয়ে যে প্রকাশিত তারই সন্ধান করো। সমস্ত ইতিহাসের চেয়েও বড় সেই মহাকাল, সেই মহাকবি। কিন্তু দেশের এই ডাক এই কান্নার কাছেও বা কী করে বধির হয়ে থাকি?

উনিশ শো তেরো সালে আরো কতগুলো বিপ্লবকাণ্ড ঘটে গেল। মৌলভী বাজারের এস.ডি.ও. গর্ডন আই.সি.এস. ভীষণ অত্যাচার চালাচ্ছিল। সিলেটের যোগেন চক্রবর্তী ঠিক করল ওকে শেষ করবে। সন্ধেয় সার্কিট হাউসে ডিনার আছে, সেখানে নিশ্চয়ই গর্ডন আসছে এই ভেবে যোগেন গেল সার্কিট হাউসে। তার জামার এক পকেটে বোমা আরেক পকেটে রিভালবার। গিয়ে শুনল গর্ডন সেখানে নেই, এখনো পৌঁছয় নি। তবে, যোগেন বিবেচনা করল, তাড়াতাড়ি তার বাংলোতে পৌঁছুতে পারলেই কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। একা গর্ডনকেই তো সে মারতে চায়, ডিনার টেবিলে বোমা ছুঁড়লে দু-চারজন নিরীহও অকারণে জখম হতে পারে। নিরীহকে মেরে আনন্দ নেই। তাড়াতাড়ি চলল যোগেন। তাড়াতাড়িই চাইল গর্ডনের বাংলোর বেড়া টপকাতে। আর বেড়া টপকাতে গিয়েই পড়ে গেল মাটিতে। আর পড়ে যেতেই পকেটের বোমা দারুণ শব্দে ফেটে গেল। প্রাণ হারাল যোগেন।

নিরীহকে মারতে নিয়তির এতটুকু বাধল না।

অত্যাচারী কি কেবলই ফসকে যাবে? না, পুলিস ইনস্পেক্টর নৃপেন ঘোষের সহচর হেড কনস্টেবল হরিপদ দে খুন হল। কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে যেখানে-যেখানে যুবকদের জটলা সেখানে-সেখানে সে ঘোরাফেরা করছিল আর নজর রাখছিল। তাকে

দিতে হল তার নজর রাখার নজরানা। হঠাৎ তিনটি ছেলে একেবারে তার গায়ের উপর এসে পড়ল, আর তার উপর তিন-তিনটে গুলি মারল। এক জনই তিনটে মারল, না, তিন জনেই একটা করে, তা কে বলবে। যাও তোমার নৃপেন ঘোষকে খবর দাও গে। আর খবর! হরিপদ চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। আততায়ী ধরা পড়ল না!

ময়মনসিঙে পুলিশ ইনস্পেক্টর বঙ্কিম চৌধুরির উপর বোমা ফেলা হল। অনেক যুবককে গয়া পাঠাবার বন্দোবস্ত করে সন্ধ্যান্তে বাড়ি ফিরে বৈঠকখানায় বসে হুঁকো টানছিল— তামাকের আরামে চোখ স্তিমিত হয়ে এসেছিল বোধহয়— দুর্দান্ত বোমা ফাটল পায়ের কাছে। উড়ে গেল বঙ্কিম। আততায়ী নিরুদ্দেশ। হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা বৃথা গেল।

কিন্তু নৃপেন ঘোষের বেলায় ধরা পড়ল নির্মলকান্ত রায়। হ্যাঁ, দুর্ধর্ষ নৃপেন ঘোষও লোকান্তরিত। উনিশ শো চোদ্দর উনিশে জানুয়ারি। রাত আটটা বেজে আট মিনিট। চিৎপুর আর গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে পুলিসপুঙ্গব নৃপেন ঘোষকে কে গুলি করলে। সি.আই.ডি. দের খাস আস্তানা স্বর্গ-বীথিতে, অর্থাৎ ইলিসিয়াম রো-তে। সেখান থেকে কর্তব্যশেষে বাড়ি ফিরছিল নৃপেন, ট্রাম থেকে নামতেই একেবারে তার খুলির উপর গুলি পড়ল, এক গুলিতেই সমাপ্ত। পুলিসের লালবাজার বিষাদে কালো হয়ে গেল আর বিপ্লবীদের নৈরাশ্যপাণ্ডুর মুখ উৎসাহে লাল হয়ে উঠল। লোকে লোকারণ্য জায়গা, গাড়িঘোড়ায় ছয়লাপ, তবু পুলিস আততায়ী বলে ধরল একজনকে। তার নাম নির্মলকান্ত রায়। হাতেনোতে আততায়ী ধরা পড়েছে, পুলিসের তখন এই গর্ব। বিচারের আগেই দরবার হয়ে গেল গড়ের মাঠে। যে পুলিসের লোক ধরেছে ও পথচারী যারা পুলিসকে ধরতে সাহায্য করেছে, দরবারে তাদের সবাইকে সরকার পুরস্কার দিলে। পুরস্কার বিতরণ করলেন স্বয়ং লাটসাহেব, লর্ড কারমাইকেল।

এ শুধু পরোক্ষে জুরিকে উচ্চনাদে জানিয়ে দেওয়া, দেখ, চিনে রাখো কে সত্যি আততায়ী।

কিন্তু বিচারে কী হল? হ্যাঁ, হাইকোর্টে দায়রা-বিচার, জুরির বিচার। জুরি নির্মলকান্তকে নির্দোষ বললে। নির্মলকান্তের পক্ষে সি.আর.দাশ, জে.এন.রায়, লোকেন পালিত— সর্বোপরি নর্টন। আলিপুর বোমার মামলায় যে নর্টন সরকারপক্ষে কৌঁসুলি ছিল সে এ মামলায় আসামীর পক্ষে। উকিলের যখন যেমন তখন তেমন। আইনের ভেজালে বার করে আনলে আসামীকে।

জুরি নির্দোষ বললেও জজের গোসা যায় না। জুরি বাতিল করে দিয়ে সে অন্য জুরি নিয়ে পুনর্বিচারে বসল। পুনর্বিচারেও নির্দোষ। হৈ-হৈ ব্যাপার। পরুস্কৃত পুলিস কাঁদতে বসল বিজনে। শেষকালে সরকার মামলা তুলে নিলে। নির্মলকান্ত অমলকান্তই রইল।

আলিপুর বোমার মামলার পর নর্টন দিবারাত্র পুলিস-পাহারায় থাকত। কিন্তু এ মামলায় কোথায় পুলিস, কিসের পাহারা, নর্টন জনগনের চক্ষের মণি বক্ষের হার হয়ে উঠল। কালকের ফকির আজকে একেবারে আমির হয়ে বসল মনের সিংহাসনে।

রাসবিহারী বোস কী বলছে— এই বোমার আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য

হচ্ছে বারে বারে দেশের জনগনকে বুঝিয়ে দেওয়া কী মর্মান্তিক পরাধীনতায় তারা বাস করছে, কী লজ্জাকর অপমানের মধ্যে, কী অসহায় পঙ্কিলতায়! যত বোমা তত পীড়ন তত লাঞ্ছনা! আগুন দেখে-দেখে তারাও নিশ্চয়ই একদিন আগুন হয়ে উঠবে। জ্বলতে জ্বলতে উন্মুক্ত বিদ্রোহে তারাও নিশ্চয় লেলিহান হয়ে উঠবে।

ধর্মের ভরা ভেসে ওঠে, পাপের ভরা তল যায়। সুভাষ ভাবে ব্রিটিশের এ পাপের ভরা তল যাবে কবে?

পনেরো

প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে সুভাষ এক নতুন বন্ধু পেল। দেখতে রাজপুত্রের মত। লেখা-পড়ায়ও কৃতী। আর কত বড় বাপের ছেলে! ছেলের সঙ্গে আলাপ হবার আগেই তাঁর কত গান সুভাষের মুখস্থ—কণ্ঠধৃত।

'দিলীপ! দিলীপ।' দিলীপের থিয়েটার রোডের বাড়িতে বন্ধ ঘরের দরজায় ঘা মারছে সুভাষ।

দিলীপ তো দরজা খুলে অবাক। 'এ কী, তুমি, সুভাষ? এই সকালে? বোসো, বোসো। কিসে এলে?'

'দিব্যি পায়ে হেঁটে।' চেয়ারে বসে মিষ্টি করে হাসল সুভাষ: 'আমাদের এলগিন রোডের বাড়ি থেকে তোমার এই থিয়েটার রোডের বাড়ি আর কতদূর?'

'উঃ, তা হলে কোন সকালে উঠেছ। তা মতলব কী? আজ কলেজে যাবে না?'

'কলেজে যাব বলেই তো সাত-তাড়াতাড়ি এসেছি, আর সেটা কলেজের প্রয়োজনে। অর্থাৎ কিনা কলেজের প্রয়োজনেই তোমাকে আমার দরকার।'

'বলেই ফেল কী দরকার!' দিলীপ আশ্বাসের হাসি হাসল।

'কলেজে যে ডিবেটিং সোসাইটি বা বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠিত করেছি তাতে তোমাকে আসতে হবে।'

'তোমার বিতর্ক সভার কথা শুনেছি,' এবার দিলীপ হাসল মিষ্টি করে: 'কিন্তু ভাই, ওসব তর্কাতর্কির মধ্যে আমি নেই।'

সুভাষ দৃপ্ত কণ্ঠে বললে, 'কী বলছ, আমাদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে, তর্কবিতর্কের অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে। দেশে এখন বড়-বড় বক্তা আর তর্কযোদ্ধার বিশেষ দরকার। ভালো বক্তা থেকেই বড় নেতার আবির্ভাব হয়। বক্তৃতা থেকেই ব্যক্তিত্ব আসে। এখন আমাদের নেতার দরকার যারা সত্যিকার মুখপাত্র হবে, মুখর মুখপাত্র।'

দিলীপ স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'আমার জন্যে তর্ক নয়, আমার জন্যে বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস, এই বিশ্বাস আনাবার জন্যেই তো তর্ক, বাকযুদ্ধ। অযুক্তির খণ্ডন আর সুযুক্তির প্রতিষ্ঠা।

'কিন্তু যাই বলো কথায় কিছু হবার নয়, কাজ চাই।'

'একশোবার কাজ চাই আর এই কাজের জন্যেই হাজারবার কথা চাই।' সুভাষ

দৃপ্ততর হল: 'শুধু কথায় শুধু ভাবুকতায় আগুন জ্বালানো যায় না, আগুন জ্বালানো যায় কাজ দিয়ে আর সেই কাজের মধ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। সবচেয়ে বড় দান হৃদয়দান। নইলে তুমি কি মনে করো শুধু কথায়, শুধু বক্তৃতায়, শুধু প্রার্থনায় দেশ স্বাধীন হবে?'

'দেশ তবে স্বাধীন হবে কিসে?' দিলীপ উৎসুক হয়ে উঠল।

'সশস্ত্র বিপ্লবে।' বিধূম পাবকের মত জ্বলে উঠল সুভাষ।

হৃদ্যতার আন্তরিক সুরে দিলীপ জিজ্ঞেস করলে, 'কিন্তু তুমি অস্ত্র পাবে কোথায়?'

সুভাষ এতটুকুও দ্বিধা করল না, যেন তার উত্তর বহুদিন থেকে তৈরি হয়ে আছে, তেমনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে, 'এদেশে না পাই বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।'

স্বপ্ন—স্বপ্ন দেখছে সুভাষ। কিন্তু যে সত্য চোখের সামনে স্বপ্রকাশ হয়ে রয়েছে তার কথা সে বলছে না কেন? যিনি সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি সেই জগজ্জ্যোতি জগৎপতির দিকে তার চোখ পড়ছে না?

'ও আকাশকুসুমের স্বপ্ন ছাড়ো।' দিলীপ বললে স্বচ্ছমুখে, সানন্দস্বরে, 'যা তোমার সাধ্য, তোমার হাতের কাছে, তাই অর্জন করো।'

'কী সেটা?'

দিলীপ দৃঢ় স্বরে বললে, 'সন্ন্যাস।'

'সন্ন্যাস?' সুভাষ চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হয়ে লোকালয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো।' দিলীপও বুঝি স্বপ্নের ছবি আঁকল: 'কত দিন মনে মনে ছবি এঁকেছি আমি আর তুমি পথে ভিখিরি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি—পরনে কৌপীন, গায়ে গেরুয়া, আমরা সন্ন্যাসী, গান গেয়ে পথে চলেছি—কৌপীনবন্তৌ খলু ভাগ্যবন্তৌ—'

সুভাষ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল: 'গেরুয়া? রাজনীতি নয়, সন্ন্যাস? দেশের মুক্তি নয়, শুধু নিজের মুক্তি?'

দিলীপ গম্ভীর হয়ে বললে, 'ঈশ্বরপ্রেমে কোনো বাজারদর চলে না।'

'ঈশ্বরপ্রেম?' সুভাষ থমকে দাঁড়াল: 'কিন্তু মানুষকে ভালো না বেসে ঈশ্বরকে ভালোবাসব কী করে?'

দিলীপ মধুরতর কণ্ঠে বললে, 'ঈশ্বরকে ভালো না বাসলে মানুষকে ভালোবাসব কী করে?'

'আচ্ছা সে দেখা যাবে! তুমি এস তো কলেজে।' সুভাষ বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

রাজনীতি না সন্ন্যাস? দেশের মুক্তি না নিজের মোক্ষ? থিয়েটার রোড থেকে এলগিন রোড শুধু এই চিন্তাই মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। কী করি! কী করি! কী করা উচিত!

শুধু রাস্তাটুকু নয়, বাড়ি, কলেজ, অবসর অনবসর, সর্বক্ষণই এই চিন্তা—দেশের মুক্তি না নিজের মোক্ষ? কতবার সে মাকে বলেছে, মা, মানুষের জীবন

হলেও অমূল্য কেননা এই জীবনেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব, কিন্তু আমি কত সময় অকারণে অপসয় করে ফেলেছি, আর বাকি সময়টুকুতে যদি না কুলোয়! শ্রীরামকৃষ্ণও তো বলছেন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরলাভ। এ তো আমিও বিশ্বাস করি। তোমাকে মা, কতবার বলেছি, লিখেছি, ঈশ্বরকে না পেলে সব বৃথা—সব বৃথা, মানুষের জীবনই একটা বৃহৎ বিড়ম্বনা, অসহ্য ভার। আর তাঁকে পেতে হলে সাধনা চাই। সন্ন্যাসই ওই সাধনা।

দিলীপ ঠিকই বলেছে, ঈশ্বরপ্রেমে কোনো বাজারদর চলে না। ঈশ্বরের কাছে কোনো দেশ নেই, কাল নেই, বাবা-মা নেই, গৃহ, দেহ, বিত্ত, বিদ্যা কিছু নেই—সে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। তার কোনো বিকল্প নেই, তার বিরহ পূরণ করতে পারে এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। এই তো শ্রীঅরবিন্দ ঈশ্বরপ্রাপ্তির আনন্দে চলে গিয়েছেন পণ্ডিচেরি—আর যা পেলে মানুষের আর কিছু পাবার থাকে না, কোনো আঘাতই বিচলিত করতে পারে না সেই উপলব্ধির আসন থেকে—সেই অমৃতফল আমার কাছে অনাস্বাদিত থাকবে? রবীন্দ্রনাথও তো রয়েছেন সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে, ব্রহ্মভূমিতে, সেই ভূমি কি আমিও স্পর্শ করতে পারব না? যার প্রাণ চায় সে দেশের জন্যে লড়ুক, মরুক, আমি চলে যাই ঈশ্বরসাজুয্যে—আমার স্বদেশ ত্রিভুবন এই কথা বলতে।

হঠাৎ বিবেকানন্দের ছবির উপর দৃষ্টি পড়ল সুভাষের। ভারতবর্ষই একমাত্র আরাধ্য দেবতা—দেশমাতাই জগন্মাতা—এই আগ্নেয় মন্ত্র জ্বলে উঠল দিব্য চোখে। সত্যি তো এত যেখানে মানুষের দুঃখ, নিরন্নতা, সেখানে আমার একা-একা রাজভোগ—অমৃতভোগ খাবার কেন এত লালসা? এই যে রোজ বাড়ির সামনে ঐ ভিখিরিনিটাকে দেখি, পরনের ছেঁড়া সামান্য শাড়িটুকু গায়ে জড়াবার নিষ্ফল চেষ্টায় কুঁকড়ে-সুঁকড়ে ফুটপাথের ধারে পড়ে আছে, তখন মনে হয় ওর এই দুঃসহ দারিদ্র্যের সামনে ঈশ্বরনামক অবাস্তব অমৃত-আস্বাদে আমার অধিকার কোথায়? আমি যে আমার প্রাসাদোপম বাড়িতে বাস করি, শুধু আমি কেন, যে সব সন্ন্যাসী তাদের আরামরমণীয় মঠে বা শীততাপনিয়ন্ত্রিত সজ্জিত-ভবনে দিন কাটায়—আমরা সবাই ওই ভিখিরিনির বিচারালয়ে ঘৃণ্যতম অপরাধী! ঐ দারিদ্র্য মোচনের আগে কিসের আমাদের মোহমোচন। সমস্ত দারিদ্র্যের মূল কারণই হচ্ছে পরাধীনতা। এই পরাধীনতা উৎখাত করবার আগে আমার আবার ঈশ্বর কী, কিসের সাধনভজন!

স্বামীজি, পথ দেখাও। ডাক পাঠাও। আলো জ্বালো। বলো আমি সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে যাব? নিজেকে একটা স্পর্ধিত আত্মতৃপ্তির বিবরে গুটিয়ে ফেলব? মেটারনিটি হোম খুলে প্রসূতি ভর্তির তদারক করব? রাত্রে উঠে শুনব শুধু মাতৃযন্ত্রণার চিৎকার? সরকারের দালাল হয়ে স্কুল আর হাসপাতাল চালাব, এদিক-ওদিক কম-বেশি করে হিসেব লিখব? বলো এই কি তোমার 'আত্মনাং মোক্ষার্থং'-এর চেহারা, না কি এই 'জগদ্ধিতায়'-এর রূপ? আমাকে কি শুধু দীক্ষিত করেই ছেড়ে দেবে, শিক্ষিত করবে না? স্বামীজি, আমাকে এই অশিক্ষিত সাধুত্ব থেকে ত্রাণ করো, আমাকে পথ দেখাও।

কিন্তু দেশের জন্যে সংগ্রাম করেও বা কী করতে পারব আমি? যে সমাজব্যবস্থায় ঐ ভিখিরিনি ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে আর আমি আমার অট্টালিকায় আর সন্ন্যাসী

তার বিলাসভবনে, সে সমাজব্যবস্থা পালটাতে পারব আমি? দেশময় যে এত জাতিভেদ, দলাদলি, প্রাদেশিকতা, মতানৈক্য, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা—আমি পারব সংশোধন করতে? পরাধীনতার বোঝা টেনে-টেনে যে মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েছে, আমার কী সাধ্য তাকে সোজা করি? আমার কী স্পর্ধা যে অন্যের চরিত্রশোধনের ভার নিই?

না, দিলীপ ঠিকই বলেছে, ঈশ্বর দুর্লভ হয়েও সুলভ, সমস্ত নাগালের ঊর্ধ্বে থেকেও আমার হাতের মধ্যে। ঠিকই বলেছে ঈশ্বরে কোনো বাজারদর চলে না, আর ত্যাগ না করলে সেই অমৃতে অধিকার নেই। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা,' 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ত্ব-মানশুঃ। পিঞ্জর থেকে যেমন কেশরী পালায় তেমনি এই পরিব্যাপ্ত জগৎ-জাল থেকে বেরিয়ে যাব। ঈশ্বর পেয়েছি, সেই সর্বতো-নিরাবরণ প্রশান্ত সুধাব্ধিকল্প পরমানন্দময় মহদাত্মভাবে লীন আছি এ জানলে কেউ কিছু বলতে আসবে না, সমস্ত ন্যূনতার পূরণ হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হব।

কৃষ্ণনগরে হেমন্ত সরকারের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল সুভাষ। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই, হেমন্তকে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেবার আগেই, বলে উঠল, 'আমি সন্ন্যাসী হব ঠিক করেছি। চলো বেরিয়ে পড়ি।

উদার বন্ধুতায় সুভাষের হাত ধরল হেমন্ত। সহাস্য মুখে বললে, 'আমি তো তৈরি। কিন্তু তোমার বাড়ির লোক জানে?'

'আন্দাজ করবে হয়তো কিন্তু আমাকে পাবে কোথায়? ধরবে কী করে?' সুভাষ নির্মুক্তির আনন্দে বললে, 'আমি মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছি। আর ফিরব না।'

'তা হলে আর দেরি কেন? হেমন্ত যেন একমাঠ খোলা হাওয়ার সুর আনল: 'চলো বেরিয়ে পড়ি।'

'প্রথমে কোথায় যাব বলো? সুভাষ জিজ্ঞেস করলে, 'হরিদ্বার?

'আগে ইন্দ্রদাস বাবাজির কাছে চলো।'

'তিনি কে?'

'উদাসী সম্প্রদায়ের শিখ সন্ন্যাসী।' হেমন্ত প্রশংসামুখর হয়ে উঠল: 'চলো দেখবে কেমন নিরাসক্তভাবে আছেন। শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বাইরে আকাশের নিচে থাকেন। ভিক্ষেয় বেরোন না কোনোদিন। যদি কেউ কিছু ফল-মূল এনে দেয় তো খান, না দেয় তো উপোস করে থাকেন।'

'চলো সন্ন্যাসীর শিষ্য হই গে।' সুভাষের যেন তর সইছে না, বললে, 'কিছু একটা না ধরতে পারা পর্যন্ত স্থির হতে পারছিনে।'

হেমন্ত বললে, 'এই তো ট্রেন থেকে নামলে, এখুনি যাবার কী হয়েছে? পরে, স্নানাহার করে—'

'না, না, এখুনি নিয়ে চলো।'

দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল। নদীর ধারে একটা গাছের কাছে এসে থামল হেমন্ত। বললে, 'ঐ দেখ।'

সুভাষ দেখল একজন সন্ন্যাসী মাটিতে শুয়ে আছেন আর একটা সাপ তাঁর গায়ের

উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। সাধুর তিলমাত্র চাঞ্চল্য নেই। কী যেন বিস্ময় গুণ আছে সাধুর যাতে দুষ্টমুখ সাপও নিরীহ হয়ে যেতে পারে।

ক্ষণকালের জন্যে দুই বন্ধু বুঝি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সাধু তাদের ইশারায় ডাকল। কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই? কোনো বিমারের ওষুধ?'

হেমন্ত বললে, 'না, ওষুধ দিয়ে আমাদের কী হবে? আমরা আপনার শিষ্য হতে চাই।'

'শিষ্য হতে চাও?' ইন্দ্রদাস হেসে উঠল: 'শিষ্য হয়ে কী হবে? কী শিখবে?'

এবার সুভাষ এগিয়ে এল। প্রণাম করে বললে, 'আমাদের আপনার মত ভয়বর্জিত হতে শেখান। বিপদেও যেন বিচলিত না হই। আর আপনার মত সমস্ত পার্থিব ভোগাকাঙ্ক্ষাকে যেন তুচ্ছ করতে পারি।'

সাধু স্নিগ্ধ চোখে তাকাল। কী প্রশান্ত সদয় চক্ষু! যেন শুধু পরহিতের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ভরা। বললে, 'তা প্রথম দর্শনেই কি শিষ্য হওয়া চলে? কদিন আসা-যাওয়া করো, আমার সঙ্গ করো, আমাকে দেখ, আমিও তোমাদের দেখি, বুঝি—পরে শিষ্য হতে চাও, শিষ্য করে নেব।'

'সেই ভালো কথা।'

তবু কতক্ষণ সাধুর সান্নিধ্যে দু বন্ধু বসে রইল নীরবে।

শুক্লারাত্রির স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না কী আনন্দদায়ক, লোকালয়ের উপকণ্ঠে বনানীসংলগ্ন প্রান্তরগুলি যখন সবুজ ঘাসে ঢাকা পড়ে তখন কী তাদের নয়নরুচিকর শোভা। বিদ্যুৎ-সমাগমে চিত্তে যে নির্মল সুখ পাওয়া যায়, কাব্যে-সাহিত্যে যে কথারস অনুভব করা যায় তাও কত অভিনন্দনীয়। আর কৃত্রিম কোপে অশ্রুবিন্দুশোভিত প্রিয়ামুখচ্ছবিও কত দর্শনসুভগ! জীবনের বিচিত্র গতি-পথে ধরিত্রীর দিকে-দিকে কত রূপ কত রস কত আনন্দ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু, তবুও, এখনও সময় আসে যখন এই সব কিছু সম্পর্কেই এক অলঙ্ঘ্য অনিত্যতাবোধ চিত্তকে আচ্ছন্ন করে। তখন মনে হয় কোনো কিছুরই যেন মূল্য নেই, আকর্ষণ নেই।

রম্য হর্ম্যতলে বাস করা সুখকর নিশ্চয়, নিভৃতে অবসর-সময়ে নিশ্চিন্ত মনে প্রিয়জনসঙ্গে গীতবাদ্য-উপভোগও তৃপ্তিপ্রদ। প্রাণসমা প্রিয়ার সমাগমসুখ যে অতিকাম্য তা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু, তবুও এমনও সময় আসে যখন মনে হয় সব কিছুই অস্থির—যেন রূপমুগ্ধ পতঙ্গের পাখার বাতাসে আন্দোলিত দীপশিখারই একটি ক্ষণিক ছায়া! তাই তো এই অনুভূতির ফলে জীবনের সব আকর্ষণ পিছে রেখে সন্তগণ অতি-জীবনের অনশ্বর সত্য ও পূর্ণতা লাভ করতে গৃহ ছেড়ে অরণ্যের কৃচ্ছ্রকেই বরণ করে নিয়েছেন।

এদিকে সুভাষের তিরোধানে এলগিন রোডের বাড়ি তোলপাড়। সারাদিন আত্মীয়স্বজনদের ব্যস্ত চলাফেরা—সুভাষের খবর নেই। সুভাষ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে গিয়েছে।

প্রভাবতী কাঁদ-কাঁদ মুখে বললেন, 'আমাকে একবার দেওঘরের রামানন্দস্বামীর কথা বলেছিল। তুমি সেখানে টেলিগ্রাম করো।'

জানকীনাথ বললেন, 'আগে তো একবার হরিদ্বারের কথা বললে।'

'সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন আছে—হ্যাঁ, সেখানে টেলিগ্রাম করো।'

'রামকৃষ্ণ মিশন তো কত জায়গায়ই আছে।'

'সব জায়গায়ই টেলিগ্রাম করো। সুবি যে রামকৃষ্ণের খুব ভক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে তার নিষ্ঠা।'

'তা তো জানি।' জানকীনাথ বিচক্ষণের বুদ্ধিতে বললেন, 'কিন্তু টেলিগ্রাম করে লাভ হবে না। ও জানতে পেরে আবার সেখান থেকে পালাবে। এক, যদি লোক পাঠানো যায়, সে যদি ধরে-বেঁধে নিয়ে আসতে পারে।'

'তবে তাই পাঠাও।' প্রভাবতী আকুল হয়ে উঠলেন।

'সব জায়গায় কি লোক পাঠানো সম্ভব?'

কাঁদতে-কাঁদতে সারদা ঝি এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। তাকে দেখে প্রভাবতী চেঁচিয়ে উঠলেন: 'এ কী, কী হল? তুই কাঁদছিস কেন?'

'আমি রাস্তাঘাট খুঁজে এলাম—সেই গড়ের মাঠ পর্যন্ত—কোথাও সুবিকে দেখতে পেলাম না।'

প্রভাবতী বিমূঢ় হয়ে গেলেন: 'ওমা কী সর্বনাশ! তুই খুঁজতে বেরিয়েছিলি কী! তুই কলকাতার রাস্তাঘাটের কী জানিস?'

'কিন্তু সুবি বাড়ি নেই,' সারদা ঝি আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকল: 'আমি যে টিকতে পাচ্ছি না। তাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম—'

'শেযে তুই হারিয়ে যা, তোকে আবার তখন খুঁজতে বেরোক।'

সারদার বুঝি তাতেও আপত্তি নেই, বললে, 'সুবি থেকে আমি হারিয়ে গেলে তো ভালো ছিল।'

বাইরে যারা জটলা করছিল তাদের লক্ষ্য করে জানকীনাথ ডাকলেন: 'শরৎ!' আর শরৎ আসতেই জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি কী করতে বলো?'

শরৎ বললে, 'বেলুড় মঠে খোঁজ করতে পাঠিয়েছি, মামা দেওঘর রওনা হয়ে গিয়েছেন, বলেন তো হরিদ্বারে কাশীতে টেলিগ্রাম করি। কিন্তু আমার মনে হয় খোঁজাখুঁজিতে কিছুই হবে না, যদি ফিরতে হয়, ও নিজের থেকেই ফিরবে।'

'আমিও তাই বলি।' জানকীনাথ তাকালেন প্রভাবতীর দিকে: 'কিন্তু তোমাদের মা যে মানেন না।'

ওদিকে ইন্দ্রদাস বাবাজিও মানতে রাজি নন।

কতদিন কত বার তাঁর কাছে সুভাষ আর হেমন্ত যাওয়া-আসা করছে অথচ বাবাজী কিছুতেই ধরা দিচ্ছেন না। আজ দুই বন্ধুতে ঠিক করেছে একেবারে সাধুর চরণ চেপে ধরবে, আর ছাড়ানছোড়ান নেই, শিষ্যত্বে দীক্ষা নিতেই হবে জোর করে।

দুইবন্ধু দ্রুতক্ষেপে পা চালাল। নদীর ধারে সেই গাছের তলায় এসে দেখল বাবাজী তাঁর বিরাট কমণ্ডলু আর সামান্য একটি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন।

'এ কী, আপনি এভাবে বসে আছেন?' সুভাষ জিজ্ঞেস করলে।

'আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছেন—সে কী?'

'তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে বলে অপেক্ষা করছি।' বাবাজীর স্বর আর্ত।

'কিন্তু চলে যাবার কারণ কী? কিছু হয়েছে?' হেমন্ত এগিয়ে এল।

'কিছু হয় নি।' বাবাজী উঠে দাঁড়ালেন: 'শুধু তোমাদের উপর আমার মায়া পড়ে গেছে! এমন মায়া, দেখ, তোমাদের শেষ দেখা না দেখে যেতে পাচ্ছি না। মায়া ভালো না। মায়ার বন্ধন কাটবার জন্যে ঘর ছেড়েছি, আবার পথে বেরিয়ে এই মায়া! আমি তো সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর আবার মায়া কী। এক বৃক্ষের ছায়ায় তিন দিনের বেশি থাকবার নিয়ম নেই। শেষকালে ঐ ছায়ায় মায়ায় মন মজে—'

সুভাষের চোখ ঠেলে অশ্রু আসতে চাইল। বললে, 'আপনি আমাদের শিষ্য করবেন বলেছিলেন—'

ইন্দ্রদাস ম্লান রেখায় একটু হাসলেন: 'দেখলাম আমি গুরু হবার উপযুক্ত নই। তোমাদের গুরু অন্যত্র আছেন—'

কোথায় গুরু? কে তার খবর এনে দেবে?

'সুবির কোনো খবর পেলি?' প্রভাবতী শরতের ঘরে এসে ঢুকলেন।

'কই কিছু পাচ্ছি না তো—'

'আর কোনো খবর চাই না। শুধু সে বেঁচে আছে এই খবরটুকু এনে দে।'

শরৎ বিস্ময়াবিষ্ট মুখে বললে, 'শুধু বেঁচে থাকার খবর?'

'হ্যাঁ, তাই। ও বেঁচে আছে শুধু এই খবরেই সকলে বেঁচে থাকবে। ও না ফিরতে চায়, না ফিরুক, শুধু ও বেঁচে থাক।'

সুদীর্ঘ স্বপ্নে আচ্ছন্ন ছিলাম। মায়াকৃত জন্মজরামৃত্যুতে পরিবেষ্টিত হয়ে সংসারারণ্যে কত না ঘুরে বেড়িয়েছি, দিনের পর দিন কত না সন্তাপে ক্লিষ্ট হয়েছি, অহঙ্কার-ব্যাঘ্র কত না আমাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, হে গুরুদেব, আজ তুমি তোমার অপার কৃপায় আমার সেই গাঢ় মোহনিদ্রা ভেঙে দিলে, বাঁচালে আমাকে।

সুভাষের গুরু কোথায়? কে সে হৃদয়রঞ্জন?

ষোল

হরিদ্বারে এসেছে দুই বন্ধু, সুভাষ আর হেমন্ত। তাদের দুজনের পরনেই গেরুয়া। অনেক হেঁটেছে দুজনে, যা দেখবার সব দেখেছে। কিন্তু যা পাবার তা এখনো পায় নি। মাঝের থেকে দারুণ খিদে পেয়ে গেছে।

হেমন্ত থামল। বললে, 'এবার খাবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

সুভাষ আয়াসলেশহীন মুখে সুন্দর হাসল।

'তোমার তো শুধু সাধু খুঁজে বেড়ানো, গুরু পাওয়া যায় কিনা।' হেমন্ত টিটকিরি দিল: 'কিন্তু যাই বলো খালি পেটে ধর্ম হয় না।'

'না, না, চলো, ঐ—ঐ বুঝি একটা হোটেল দেখা যাচ্ছে।' সুভাষ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

হোটেলের প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়াল দুজন।

বৃহদ্বপু ম্যানেজার বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে : 'আপনারা সন্ন্যাসী?'

হেমন্ত বললে, 'হ্যাঁ, দেখছেন না পোশাক?'

'তা তো দেখছি। কিন্তু সন্ন্যাসীরা কি হোটেলে খায়?'

'কেন খাবে না? বাধা কী?' হেমন্ত উদার গলায় বললে, 'তাদের তো কোনো সংস্কার নেই।'

'আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে মানি।' বললে সুভাষ, 'তিনি সমস্ত সংস্কারের উর্ধ্বে ছিলেন।'

'আপনারা তো বাঙালি!' ম্যানেজারের কটাক্ষে যেন একটু বিদ্বেষের রেখা পড়ল।

'হ্যাঁ, বাঙালি।'

'আপনারা মাছ খান?'

'খাই।'

'আপনাদের এখানে খাওয়া চলবে না।' ম্যানেজারের স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল।

'চলবে না! কেন?' সুভাষের স্বরও কঠোর শোনাল।

'মাছখেকো বাঙালিদের এখানে খেতে দেওয়া হয় না।'

'আমরা তো আর এখানে মাছ খাচ্ছি না, খেতে চাইও না—'

'তা হলেও না। মাছখেকোদের স্থান নেই এ হোটেলে।'

হেমন্ত রফা করতে চাইল। জিজ্ঞেস করল, 'যদি এখান থেকে খাবার কিনে নিয়ে খাই?'

'হ্যাঁ, তা কিনে নিতে পারেন কিন্তু এখানে বসে খেতে পাবেন না।' ম্যানেজার বললে নির্দয়ের মত : 'আপনাদের নিজের বাসনে করে নিয়ে খাবেন, আমাদের বাসন ব্যবহার করতে পারবেন না।'

হেমন্ত পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল। বললে, 'কী আর করা, শালপাতার ঠোঙায় করে কিনেই নিই তবে—'

সুভাষ বাধা দিল। দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'না, এ হোটেলের ভাত খাব না।'

আবার রাস্তায় নামল দুজন!

'ভাত তো খেলে না, এখন থাকবে কোথায়?' হেমন্তর রাগ হল।

'চলো, আশ্রম একটা মিলে যাবে কোথাও।' সুভাষ বললে গাঢ় স্বরে, 'সেখানে সাধুসঙ্গও হবে আর ভগবান যদি দয়া করেন গুরুও পেয়ে যেতে পারি।'

'আর গুরু!' হেমন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'খুব হোটেল পেয়েছ, এবার একটা আশ্রম পাও— তবে তো!'

চলতে-চলতে দু'বন্ধু পেয়ে গেল আশ্রম। অনেক সাধুর আস্তানা। এখানেই মিলে যেতে পারে সেই মানুষরত্ন।

'আমরা এখানে থাকতে পাব?' জিজ্ঞেস করল হেমন্ত।

সাধুদের মধ্যে যিনি বর্ষিষ্ঠ, প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা বাঙালি?'

'হ্যাঁ' বলতে যেন কত গর্ব এমনি করেই সুভাষ বললে, 'আমরা বাঙালি।'

'ওরে ব্বাবাঃ।' শুধু বর্ষিষ্ঠ নন কনিষ্ঠ সাধু পর্যন্ত ভয়স্তব্ধ।

'কেন বাঙালিদের ভয় কিসের? তারা মাছখেকো?'

'না, তারা বোমা ছোঁড়ে। তারা বিপ্লবী। ইংরেজকে তাড়াতে চায়।'

'কিন্তু আমরা তো বিপ্লবী নই'। হেমন্ত সাধু সাজল: 'আমরা সন্ন্যাসী।'

'অনেক বিপ্লবী গুলি-গোলা ছুঁড়ে পুলিসকে এড়াবার জন্যে সন্ন্যাসী সাজে।' মঠের সাধু বিরূপ হয়ে রইল : 'তোমরা সেরকম ছদ্মবেশী বিপ্লবী কিনা তা কে জানে।'

'আমরা বলছি আমরা ওরকম নই।' সুভাষের পক্ষে ধৈর্য রাখা কঠিন।

'তবু কে জানে বাপু পুলিস হাঙ্গামা হতে পারে— তোমরা অন্যত্র দেখ।' সাধু নিস্পৃহের মত বললে, 'আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও।'

হেমন্ত হাঁক দিল : 'চলে এস সুভাষ।'

আবার দুই বন্ধু রাস্তা ধরল।

হেমন্ত বললে, 'আমাদের সেই ইন্দ্রদাস বাবাজীর দশা হল। আকাশ ছাদ, ঘাসের বিছানা শয়ন আর যদি জোটে তো আহার, না জোটে তো হরিমটর।'

'কিন্তু দেখলে', সুভাষের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল : 'সন্ন্যাস করতে এসেও বিপ্লববাদের কথা শুনছি।'

'উঃ, এই সমস্ত সন্ন্যাসী যদি সৈন্য হত!'

'আর সমস্ত সৈন্য যদি সাধু হত! ভগবান যাকে যে পথে নেবেন যে পথে ডাকবেন তাকে সেই পথেই যেতে হবে।'

হরির দ্বারে যে নিয়ে যাবে হরিদ্বারে সেই গুরু মিলল না। দুই বন্ধু মথুরায় এসে উপস্থিত হল। উঠল পাণ্ডার বাড়ি। দু'বন্ধুর আর কিছু জোটে নি, ঘরে বসে তরমুজ খাচ্ছে।

হেমন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'মথুরায় এসেও এই দশা!'

'নিরুপায়।' সুভাষও হতাশ মুখে বলল, 'পকেট গড়ের মাঠ।'

হঠাৎ একটা বানর ঘরে ঢুকে সুভাষের ক্যাম্বিসের জুতোর এক পাটি নিয়ে গেল!

'নিল, নিল, জুতো নিয়ে গেল।' চেঁচিয়ে উঠল সুভাষ। জানলায় দাঁড়িয়ে দেখল পাশের ছাদে জুতো সমেত বসে আছে বানর। যেন সংসারে কিছুই জানে না অমনি সদাশিবের চেহারা। ঘুরে দাঁড়াল সুভাষ। বললে, 'হেমন্ত, আর নয়, এবার ফিরে চল।'

'দাঁড়াও, এখুনি কী।' হেমন্ত মজা-দেখার মতো করে বললে, 'আগে দিল্লি যাই।'

'তাই চলো দিল্লি চলো।'

গোলমাল শুনে পাণ্ডা এসে উপস্থিত। 'কী হয়েছে?'

হেমন্ত পাশের ছাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'ঐ দেখ না তোমাদের পুষ্যিপুত্তুর ঐ বানর আমাদের জুতো নিয়ে গেছে।'

পাণ্ডা বললে, 'ওকে একটু তরমুজ খেতে দিন, এখুনি জুতো ফেরত দিয়ে যাবে!'

'মানে যা সামান্য তরমুজ জুটেছিল তাও তোমাদের পোষ্য-পুত্তুররা কেড়ে খাবে!' হেমন্ত বিদ্রূপ করে উঠল : 'সুন্দর ব্যবস্থা!'

সুভাষ কথা বাড়াতে চাইল না, হেমন্তকে বললে, 'মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই, বাকি তরমুজটা দিয়ে দাও বানরকে।'

পাণ্ডাই হেমন্তর হাত থেকে তরমুজ কেড়ে নিয়ে পাশের বাড়ির ছাদে ছুঁড়ে মারল। বানর তরমুজ পেয়ে তক্ষুনি জুতো ফেরত দিয়ে গেল।

'জুতো তো পেলে', হেমন্ত শুকনো মুখে বললে, 'কিন্তু খাবে কী? জুতো তো আর খাওয়া যায় না।'

'দেশের লোক তা বোঝে কই?' সুভাষ এগোতে চাইল: 'চলো বৃন্দাবনেই যাই।'

তারপর দুবন্ধু বৃন্দাবনে গেল।

স্টেশনে নামতেই ছেঁকে ধরল পাণ্ডারা। কোথায় যাবেন? আমার কাছে আসুন। আমার সঙ্গে চলুন। ভালো ঘর দেব। খাওয়া ফার্স্ট ক্লাস।

সুভাষ স্পষ্টস্বরে বললে, 'আমরা গুরুকুল যাব।'

পাণ্ডারা সকলে কানে আঙুল দিল। বললে, 'ও নাম শোনাও পাপ। কোনো হিন্দুর সেখানে যাওয়া উচিত নয়।'

'কেন?' দু'বন্ধু তো অবাক।

'ওটা আর্যসমাজীরা করেছে।'

'তাতে কী?'

'আর্যসমাজীরা হিন্দু নয়। ওরা প্রতিমাপূজা মানে না।'

'তাতে কী?' সুভাষের কণ্ঠস্বর এবার রুক্ষ হয়ে উঠল।

'তাতে কি!' পাণ্ডার দল তো বিমূঢ়।

'আমাদের ছেড়ে দাও।' সুভাষ জোর গলায় বললে, 'আমরা গুরুকুলেই যাব।'

পাণ্ডার দল বিড়বিড় করতে করতে সরে পড়ল। তাদের অস্ফুট তর্জনের মধ্যে শোনা গেল প্রতিরোধের সংকল্প।

'কী, বৃন্দাবনের সাধ মিটল?' হেমন্ত সুভাষের গায়ে মৃদু ঠেলা মারল।

'পাণ্ডারা যেরকম চটেছে, মনে হচ্ছে মন্দিরে ঢোকা যাবে না।' সুভাষ বললে, 'কিন্তু চলো কুসুমসরোবর দেখে আসি।'

দু'বন্ধু চলেছে কুসুমসরোবরের পথে এক্কা চড়ে। এক্কাওয়ালা গান গাইছে।

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্ধন
মধুর মধুর বংশী বাজে এই তো বৃন্দাবন।

মুগ্ধ স্বরে সুভাষ বললে, 'হিন্দুস্থানী এক্কাওয়ালার গলায় বাঙলা গান— কী মিষ্টি লাগছে!'

হেমন্ত বললে, 'বাঙলার মতো কি ভাষা আছে!' বলেই সেও গান ধরল। আর সুভাষও কণ্ঠ মেলাল সেই সঙ্গে :

'বাঙালির প্রাণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক
হে ভগবান।'

বৃন্দাবন থেকে আগ্রা, পরে কাশী, মাঝে গয়া আর গয়ার মঠে এসে পৌঁছুল দুজন। ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছে, দলে-দলে পাত পেতে সকলে বসে গেছে খেতে।

তাদের দেখে মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী এগিয়ে এলেন : 'আপনারা কাশী থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ, কী করে বুঝলেন?' হেমন্ত বিস্ময় প্রকাশ করলে।

'সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ চিঠি লিখেছেন আমাকে। আপনারাই তো?'

'হ্যাঁ, আমরাই। আমরা ছাড়া আর কে?' হাসল হেমন্ত।

'তা আপনারা এখানেই থাকুন।' আতিথেয়তায় প্রসারিত হলেন অধ্যক্ষ: 'খাবার জায়গা হয়েছে, আপনারা একেবারে বসে পড়ুন। আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত।'

সুভাষ আর হেমন্ত চোখ চাওয়াচাওয়ি করলে। হ্যাঁ, মন্দ কী।

আরেকজন সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনারা কী জাত?'

'জাত?' সুভাষ থ হয়ে গেল : 'কেন, তাতে কী দরকার?'

সন্ন্যাসী বললে, 'তার মানে যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা এই দিকে আর যাঁরা ব্রাহ্মণ নন তাঁরা ঐ দিকে।'

হেমন্ত আঁতকে উঠল : 'এ্যাঁ! সন্ন্যাসীদের মধ্যেও জাতিভেদ?'

সুভাষ গম্ভীরমুখে বললে, 'আপনারা তো শঙ্করপন্থী। শঙ্করাচার্য তো সমস্ত ভেদজ্ঞান বর্জন করতে বলেছেন। শঙ্করমতে সমস্ত মানুষই ঈশ্বর, সর্বত্র সমানাধিকার। তবে আপনাদের এখানে শ্রেণীবিভাগ কেন?'

'তা কী করা যাবে!'

'চলে এস।' হেমন্ত সুভাষের হাত ধরে টান মারল।

'আশ্চর্য!' সুভাষ মর্মান্তিক ঘা খেল : 'সন্ন্যাসীদের মধ্যেও ভেদবুদ্ধি!'

'আর এ ভেদবুদ্ধি শুধু জাত নিয়ে নয়, কাঞ্চন নিয়েও। দেখলে না এরা কাঞ্চন ত্যাগ করলেও, যারা বড়লোক, যাদের বেশি টাকা, তাদের প্রতিই এদের বেশি খাতির। টাকাওয়ালা লোককে বেশি খাতির করা মানেই পরোক্ষে কাঞ্চনকেই প্রশ্রয় দেওয়া।'

'তাই তো দেখলাম। তুমি পায়ে হেঁটে যাও, তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু তুমি একটা মোটর হাঁকিয়ে যাও—'

'একেবারে গাড়ির দরজা খুলে সবিনয়ে নিবেদনের ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াবে।'

'খুব হয়েছে, চলো। দারুণ তেষ্টা পেয়েছে। কোথাও জল মেলে কিনা দেখি।' সুভাষ পা বাড়াল।

'অয় তো খুব জুটল এখন জল!'

হাঁটতে-হাঁটতে রাস্তার ধারে কুয়ো পাওয়া গেল। কুয়ো তো নয়, কূপ।

বালতি-বাঁধা দড়িটা ধরতে যাচ্ছে সুভাষ, একটা গার্ড-মতন লোক ছুটে এল। জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কোন জাত?'

সুভাষ পাথর হয়ে গেল। 'কেন?'

'যদি বামুন হোন এ দড়ি ছুঁতে পাবেন—'

'আর যদি না হই—'

'পাবেন না।'

হেমন্ত বললে, 'যারা বামুন তাদেরই শুধু তেষ্টা পায়?'

'তা জানি না।' পাহারাদার রুক্ষ কণ্ঠে বললে, 'আপনারা যখন নন আপনারা সরে দাঁড়ান—'

সুভাষ সরে দাঁড়াল। বললে, 'ভাই আর নয়, বাড়ি চলো।'

'বাড়ি!'

'এ সন্ন্যাস পোষাবে না। এখানেও ছুঁৎমার্গ! এখানেও জাতি-ভেদ! এখানেও বড়লোক-গরিব, ব্রাহ্মণ-শূদ্র। এখানেও ষোল আনা পটোয়ারি—' সুভাষ তাকাল শূন্য চোখে: 'এখানে আর গুরু কোথায়?'

দুজনেই ফিরে চলল। হেমন্ত কৃষ্ণনগর আর সুভাষ কলকাতা, এলগিন রোড।

না, আমাদের অন্যপথ, অন্যতীর্থ। আমরা হতোদ্যম রণবিমুখ সৈন্য নই, নই আমরা ক্ষুদ্রচেতা বিরামানন্দ সন্ন্যাসী, স্বাধীনতার পুণ্যযজ্ঞে ঈশ্বর আমাদের ডেকেছেন। আমরা ভারতবর্ষের জন্যেই বলিপ্রদত্ত।

'হেমন্ত, সেই গানটা গাও—' বললে সুভাষ, 'অবনত ভারত চাহে তোমারে—'

হেমন্ত গান ধরল :

'অবনত ভারত চাহে তোমারে এস সুদর্শনধারী মুরারী!
নবীন তন্ত্রে নবীন মন্ত্রে কর দীক্ষিত ভারত-নর-নারী।
মঙ্গলভৈরব শঙ্খনিনাদে
বিচূর্ণ কর সব ভেদ-বিবাদে
সম্মান-শৌর্যে পৌরুষ-বীর্যে
কর পূরিত, নিপীড়িত ভারত তোমারি॥'

এলগিন রোডের মোড়ে ট্রাম থেকে নামল সুভাষ। রাস্তাটুকু হেঁটে গিয়ে বুক টান করে বাড়ি ঢুকল। যেন কোথাও কিছু হয় নি, এমনি ফিরে এসেছে ভাবখানা এই রকম।

আরে, এ কে? সুবি না?

সুবি কোত্থেকে এল?

সত্যিই তো— সুবি, সুভাষই তো এসেছে।

সুভাষ— সুভাষ এসেছে! নানা কণ্ঠের কোলাহল উঠল।

ধীরস্থিরমূর্তি, প্রভাবতী এসে দাঁড়ালেন। সুভাষ প্রণাম করতে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'তোমার জন্ম হয়েছে আমার মৃত্যুর জন্যে। আমি এতক্ষণ থাকতাম না, গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিতাম। শুধু মেয়েদের জন্যে পারি নি।'

সুভাষ হাসিমুখে বললে, 'এখন আর তবে কাঁদছ কেন?'

'আবার যদি যাস', প্রভাবতী বললেন, 'আমি বলে রাখছি, আমিও তোর সঙ্গে যাব।'

জানকীনাথ এসে দাঁড়ালেন। শান্ত, স্তব্ধ, গম্ভীর অথচ স্নেহময়। সুভাষ তাঁকে প্রণাম করে উঠতেই তিনি তাকে দু বাহু বাড়িয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন ও কাঁদবেন না ভেবেও কেঁদে ফেললেন। পরে আলিঙ্গন শ্লথ করে দিয়ে বললেন, 'আমার ঘরে আয়।'

জানকীনাথ তাঁর ঘরে খাটে শুয়ে আছেন, সুভাষ পাশে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'সংসারে থেকে কি ধর্ম হয় না?' জানকীনাথ তাকালেন ছেলের দিকে।

সুভাষ স্নিগ্ধ-সরল কণ্ঠে বললে, 'কারু কারু হতে পারে, কারু কারু পক্ষে সংসারই আবার বাধা। সকলের তো এক রোগ নয়, তাই ওষুধও এক হতে পারে না। তা ছাড়া রুগীর সামর্থ্যও তো সমান নয়।'

'কিন্তু কর্তব্যত্যাগটা কি ঠিক?'

'বাবা, কর্তব্যটা কি রিলেটিভ—আপেক্ষিক নয়? বড়-র ডাক এলে ছোট কি ভেসে যায় না? ভগবানের ডাক এলে সংসারটা কি আর কর্তব্য থাকে?'

'কিন্তু ত্যাগ যে করবে তার জন্য কিছু অর্জন, কিছু প্রস্তুতি দরকার হবে না?'

'সব সময়ে তা নাও হতে পারে।' বিনয়ে-মাখা অথচ কী রকম ব্যাকুল শোনাল সুভাষের স্বর : 'পারের নৌকোকে প্রস্তুত হতে না দিয়েই ঝড় তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তা ছাড়া বাবা, আসল ত্যাগ তো মনে। গেরুয়া কি শুধু বসনে, না, মনে?'

জানকীনাথ নড়ে-চড়ে উঠলেন : 'কিন্তু তোমার অদ্বৈতজ্ঞানটা কি শুধু একটা থিওরি নয়?'

'যতক্ষণ মুখে বলছি ততক্ষণ থিওরি, মনে-প্রাণে উপলব্ধি করলেই সত্য।'

'তেমন করে কি কেউ উপলব্ধি করেছেন? কী প্রমাণ?'

'প্রমাণ পুরাণপুরুষ ঋষিরা, যাঁরা বলেছিলেন বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আর প্রমাণ এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ। আত্মার মধ্যেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।'

জানকীনাথ বালিশে আবার ঢলে পড়লেন। বললেন, 'কিন্তু এত দিনের মধ্যে ছোট্ট একটা পোস্টকার্ড লিখলিনে কেন? কোথায় আছিস, টাকা পয়সার দরকার কিনা—'

বাবার স্নেহের স্পর্শে করুণমুখে সুভাষ একটু হাসল : 'ফিরেই তো এলাম, পোস্টকার্ড লেখবার দরকার কী! তা ছাড়া, বাবা, তেমন ডাক এলে চিঠির কি আর অবকাশ থাকবে?'

'তেমন ডাক এলে আমরাও তোমাকে আটকাব না।'

দরজা খুলে বাইরে বেরুতেই সুভাষ দেখল সারদা-ঝি বসে আছে।

'ওমা, তুমি?' সুভাষ চমকে উঠল।

সারদা অশ্রুভরভর চোখে চেয়ে রইল সুভাষের দিকে। বললে, 'সেই কখন থেকে বসে আছি। রোজ বসে থাকি—আমার সুবি কখন ফিরে আসবে।'

'এই তো ফিরে এসেছি।' সুভাষ বললে, 'এবার ওঠো। আর বসে আছ কেন?'

সারদা উঠল। সুভাষের গায়ে সস্নেহ হাত রেখে বললে, 'এর পর আবার যখন যাবি শুধু তোর মাকে নয়, আমাকেও সঙ্গে নিবি।'

সতেরো

উনিশশো চোদ্দ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল। দেশের বিপ্লবীরা ভাবল এর কোনো সুযোগ নেওয়া যায় কিনা অর্থাৎ জার্মানি থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনা যায় কিনা। অস্ত্রের প্রাচুর্য না থাকলে বিপ্লবে অবতীর্ণ হবে কী করে? কিন্তু এই তো সময়। শুধু দিশি সৈন্য ভারতে রেখে ইংলণ্ড তার ইংরেজি সৈন্য ঘরে নিয়ে গেছে। আর দিশি সৈন্যদের একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললে তারা কোন না অস্ত্র ফেলে ভালোমানুষ সাজবে! কিন্তু, অস্ত্র পেলেও, সেই

ধুরন্ধর বিপ্লবী কই, সেই লোককান্ত সত্তমপুরুষ, কোথায় সে উপায়নিপুণ নেতা যে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে আপন দায়িত্বে চালনা করবে? বিপ্লবীরা কি প্রস্তুত? সারা দেশময় তুলে দিতে পারবে কি প্রাণযজ্ঞের লেলিহান হোমানল?

রডা কোম্পানির কটা 'মশার' পিস্তলে তাদের কী হবে?

তবু ভাগ্যিস পঞ্চাশটা পিস্তল আর প্রায় পঞ্চাশ হাজার গুলি যে অসীম সাহসে সরানো গেছে তার জন্যে শ্রীশ মিত্র ওরফে হাবুকে পুজো করা উচিত। হাবু ছিল বউবাজারের বড়লাট। দুর্দান্তপনায় একচ্ছত্র। পাড়ার লোক তাকে হাবু-লাট বলে। কী সূত্রে রডা কোম্পানিতে জেটি-সরকার হয়ে ঢোকে। আপিসে ভাবখানা এমন, তার মত সৎ, দক্ষ, আর ভদ্র কর্মচারী দুটি নেই। মাইনে তিরিশ টাকা, তাতে কী, কোম্পানি তো বড়— আর সে যদি ভালো হয়, কোম্পানিই তাকে বড় করে দেবে।

কোম্পানি হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানির কোম্পানি। সে নেপালকে বেচে, কাশ্মীরকে বেচে, আরো নানা করদ রাজ্যে সরবরাহ করে। শুধু জাহাজ থেকে মাল খালাস করে এনে কোম্পানির গুদামে জমা করার ভার হাবুর উপর। ভাবো কত দীর্ঘ দিনের একনিষ্ঠতার ফলে হাবু এত বড় বিশ্বাসের অধিকারী হয়েছে। নইলে কলকাতার রাস্তার উপর দিয়ে এক গাড়ি মাল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া কি সোজা কথা?

বিপ্লবীদের অস্ত্রসংগ্রহের প্রধান উপায় জাহাজী নাবিক আর লাইসেন্স লাগত না বলে এংলো ইণ্ডিয়ান। কিন্তু ওরা বিষম দাম হাঁকত আর সে খরচ মেটাতে গিয়ে ডাকাতি না করে পথ ছিল না। কিন্তু এ একেবারে পঞ্চাশ নম্বর 'মশার' পিস্তল আর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টোটা মুফত হাতে এসে যাচ্ছে।

এ ছাড়া আরো অনেক-অনেক মাল এসেছে, তা দিয়ে ছ-ছটা গরুর গাড়ি বোঝাই হয়েছে। আসল মাল কায়দা করে বোঝাই করা হয়েছে শেষ বা সাত নম্বর গাড়িতে। গাড়োয়ান আবদুল দোসাদ। তাকে হাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে এ গাড়িটা কোম্পানির গুদামের গেটের মধ্যে না ঢুকে সোজা এগিয়ে যাবে, এ রাস্তা ও রাস্তা করে শেষে পৌঁছুবে মলঙ্গা লেনে, বিপ্লবী অনুকূল মুখুজ্জের আস্তানায়।

আবদুল দোসাদকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি শ্রীশ। তাই হরিদাস দত্তকে গাড়ির সঙ্গে পাঠিয়েছে গাড়োয়ানের সহযোগী করে। ঠিক গাড়োয়ানদের মত চুল ছাঁটা, গায়ে গোল গলার গেঞ্জি, গলায় কার বেঁধে তক্তি ঝুলানো, খালি পা, পরনে দোভাঁজ ময়লা কাপড়, কোমরে গামছা— কে বলবে হরিদাস গাড়োয়ানের সাকরেদ নয়? কিন্তু তার গামছায় বাঁধা লোডেড রিভলভার, বলা আছে, যদি দোসাদ ঠিকমত গাড়ি না চালায় তবে তাকে সরিয়ে দিয়ে হরিদাসই যেন মাল নিয়ে আস্তানায় পৌঁছয়। সরিয়ে দিয়ে, মানে, দরকার হলে গুলিতে সাবাড় করে।

শেড থেকে বার হয়ে সাত-সাতটা গাড়ি পর-পর চলছে। ভ্যান্সিটার্ট স্ট্রিটে কোম্পানির গুদামে ছ-ছটা গাড়ি ঢুকল, সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীশও ঢুকল। সব মাল মিলিয়ে তুলে গাড়োয়ানের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সহসা শ্রীশ চিৎকার করে উঠল : 'আরেকটা গাড়ি? মোট সাতটা গাড়ি ছিল তো! বাকিটা কোথায় গেল? কী সর্বনাশ! ওটার মধ্যে যে—'

যেন বাকি গাড়িটার সন্ধান করতে যাচ্ছে এমনি উন্মত্ত ভাব করে ছুটে বেরিয়ে

গেল শ্রীশ। হরিদাসের ইঙ্গিতে গাড়ি মিশন রো, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রিট হয়ে, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট পেরিয়ে চাঁদনি চকের ধার ঘেঁষে তখনকার ওয়াটার ওয়ার্কসকে পাশে ফেলে চলে এল মলঙ্গা লেন। মাল পৌঁছেছে এ খবরটুকু নিয়ে শ্রীশ সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল আসামে। কোথায় কবে ও কী ভাবে তার জীবনের অবসান হল কেউ জানে না, ইংরেজের টিকটিকিরাও না।

'মশার' পিস্তলের সুবিধে এই, তাকে ভেঙে রিভলভার ও বাড়িয়ে রাইফেল করা যায়। আর এই 'মশার' পিস্তলেই তো চলেছিল বুড়িবালামের যুদ্ধ।

গোয়েন্দাদের বড় কর্তা বসন্ত চাটুজ্জে! কবে থেকে তার অন্ত ঘটাবার চেষ্টা করছে বিপ্লবীরা, নিয়তি নির্ভুল ভাবে প্রতিবারেই বাঁচিয়ে দিচ্ছে। প্রথম চেষ্টা হয়েছিল সেই ১৯১২-তে, ঢাকায়, যখন বুড়িগঙ্গার পারে বাকল্যাণ্ড বাঁধের উপর সে এসে পড়েছিল। তাকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীর গুলি ছোঁড়া হল, বুদ্ধিমান বসন্ত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচালে।

দ্বিতীয় চেষ্টা হল ১৯১৪-র ২৫শে নভেম্বর। মুসলমানপাড়া লেনে বসন্তর বাড়িতেই বোমা পড়ল। তার বাইরের ঘরে বসন্ত কয়েকজন পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিল, কী কাজে হঠাৎ উঠে পড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল, আর তক্ষুনি ঘরের মধ্যে বোমার দারুণ বিদারণ। নিয়তি আবার বাঁচিয়ে দিল বসন্তকে। অল্পবিস্তর জখম হল পুলিসি মানুষগুলি। শুধু বসন্তর আর্দালি রামভজন সিং সরাসরি মার খেয়ে প্রাণ হারাল।

আহত অবস্থায় অদূরে ধরা পড়ল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, নগেন সেনগুপ্ত। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার ঘরের তদারকির ভার পড়ল ডাক্তার যাদুগোপাল মুখার্জির উপর। যাদুগোপাল আরেক বিপ্লবী, আরেক বিষবৈদ্য। নগেনকে ড্রেস করে আর গোপনে উৎসাহ দেয়, পুলিসকে যেন কিছু না বলে, দেয় তার মন্ত্রচেতনা।

হাইকোর্টের বিচারে নগেন বেকসুর খালাস হয়ে গেল। বিচারকদের মধ্যে একজন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু এবার— এবার তোমাকে কে বাঁচাবে? বার বার তিন বার। উনিশ শো ষোল সালের ৩০শে জুন বিপ্লবীরা বসন্তকে পেয়ে গেল সামনাসামনি। বসন্ত তখন সরকারি মোটর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সাইকেল করে যাতায়াত করে, গাড়ির চেয়ে সাইকেল নিরাপদ ভেবে। সেদিনও সে সাইকেলেই ফিরছিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট দিয়ে, পেছনে আরেক সাইকেলে তার বডি-গার্ড বিলাস ঘোষ। রাস্তার পাশে ছোট একটা পোড়ো জমিতে ফুটবল খেলছিল ছেলেরা, কে জানত তাদেরই আশেপাশে বিপ্লবীরা অনন্যলক্ষ্য হয়ে ঘোরাফেরা করছে। বসন্ত নজরের মধ্যে এসে পড়তেই অকাতরে গুলির পর গুলি ছুঁড়ল বিপ্লবীরা, চক্ষের নিমেষে বসন্ত ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। বিলাসকে বেশিক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে থাকতে হল না, তাকেও বিপ্লবীর গুলি মাটিতে ফেললে। বসন্ত আর বিলাস কেউই বাঁচল না, আর, আবার নিয়তির পরিহাস, বিপ্লবীরা পাঁচ-পাঁচজন হলেও একজনও ধরা পড়ল না। এলগিন রোড দিয়ে পিপুলপটি লেনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সি.আই.ডি. ইনস্পেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্যও গুলি খেল ১৯১৫-র জানুয়ারি মাসে,

কলুটোলা-কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে। ট্র্যাম থেকে নেমেছে অমনি দুটি যুবক রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়াল, একজনের হাতে একটা মশার, আরেকজনের ওয়েবলি। সঙ্কটে নিজের নামটা উচ্চারণ করতেও ভুলে গেল মধুসূদন, খসে পড়ল মাটিতে। প্রতাপ চ্যাটার্জি স্ট্রিট দিয়ে পালিয়ে গেল বিপ্লবীরা।

স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের সুরেশ মুখুজ্জেকে খুন করাটা খুবই রোমাঞ্চকর। দলপতি যতীন মুখুজ্জে হুকুম করেছে সুরেশের রক্ত চাই, তাই দুই সহচর চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী আর নীরেন দাশগুপ্ত তৈরী হয়ে রয়েছে। ১৯১৫-র ২৮শে ফেব্রুয়ারি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেবে বড়লাট, তাই পুলিসি ব্যবস্থা দক্ষিণে-উত্তরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। হেদোর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কটা ছেলে কী সব সলা-পরামর্শ করছে দেখতে গেল সুরেশ মুখুজ্জে। দলের মধ্যে একজন চিত্তপ্রিয়, স্পষ্ট চিনতেও পারল। সহকর্মী বনবিহারী মুখুজ্জেকে বললে, চলো ধরবার চেষ্টা করি। বনবিহারী বারণ করলে, এখন কাজ নেই। কিন্তু টাটকা শিকারের লোভ ছাড়তে পারল না সুরেশ। আর্দালি শিউপ্রসাদকে বললে, ঐ ছোঁড়াটাকে ধরো। চিত্তপ্রিয় নিজে থেকেই ধরা দিচ্ছে এমনি ভাব করে এগোতে লাগল। এই নিরীহ ছলনাটুকু না করলে বুঝি সুরেশের কাছাকাছি আসা যায় না। নাগালের মধ্যে এসে পড়তেই সুরেশ অতি আদরে চিত্তপ্রিয়কে আলিঙ্গন করবার জন্য হাত বাড়াল। আর সেই মুহূর্তেই চিত্তপ্রিয় রিভলভার বের করে অসন্দিগ্ধ সুরেশের বুকের উপর গুলি ছুঁড়ল। শিউপ্রসাদ ধরতে চাইল চিত্তপ্রিয়কে, ততক্ষণে নীরেন এসে উদয় হয়েছে। বনবিহারী দে দৌড়। সুরেশ আর শিউপ্রসাদ দুজনেই খতম হয়ে গেল। বনবিহারী হেদোর কোণে এক পানের দোকানের মাচার নিচে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

সুরেশের রক্তে রুমাল ভিজিয়ে নিল বিপ্লবীরা, এ রক্ত দিতে হবে তাদের গুরুকে, পুরুষর্ষভ যতীন্দ্রনাথকে।

সাব-ইনস্পেক্টর গিরীন ব্যানার্জী খুন হল রাত্রে, মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে এক পুলিস অফিসারের বাড়িতে, ১৯১৫-র ২১শে অক্টোবরে। পুলিসবাবুরা পাশা খেলছিলেন, রাত সাড়ে দশটা হয়ে গেলেও উঠি-উঠি করেও উঠতে পারছিল না গিরীন। কী দুর্জয় সাহস, বিদ্যুজ্জিহ্ব রিভলভার নিয়ে, সেই রাতে পুলিসি গৃহের মধ্যে ঢুকে পড়ল বিপ্লবীরা। লণ্ঠনের আলোতে খেলছিল বাবুরা, প্রথম গুলিতেই চিমনি ফেটে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। আপনিই কি গিরীন ব্যানার্জী? আমরা গিরীন ব্যানার্জীকে চাই। পুলিসবাবুরা, কে জানে, অন্ধকারে গিরীন ব্যানার্জীকে গুলির মুখে ঠেলে দিয়ে, সরে পড়তে চাইল। ভুল হল না, যখন ফের আলো জ্বালানো হল দেখা গেল গিরীনই পড়ে মরে আছে আর বিপ্লবীরা নিরুদ্দেশ।

এবার শুরু হল মোটর-ডাকাতি। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে এ এক নতুন আঙ্গিক। প্রথম ডাকাতি হল গার্ডেনরিচে, দিনে-দুপুরে। বার্ড কোম্পানির আঠারো হাজার টাকা কেড়ে নিল। দ্বিতীয় ডাকাতি বেলেঘাটায়, এক চালের আড়তে, আদায় হল কুড়ি হাজার টাকা। তারপর আরেক ডাকাতি কর্পোরেশান স্ট্রিটে, সেই চালের আড়তে, আর এবারের ফসল পঁচিশ হাজার।

ইংরেজ সরকারের সম্ভ্রম খর্ব হতে চলেছে— যতীন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের

মাথা চাই।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি করতে করতে যতীন তার সঙ্গীদের নিয়ে পথুরিয়া ঘাটা স্ট্রিটের এক বাড়িতে গিয়ে উঠল। এক কাল্পনিক নামে ভাড়া নিলে। কিন্তু সেখানেও একদিন, ১৯১৫-র ২৪শে ফেব্রুয়ারির সকালে পুলিসের টিকটিকি নীরদ হালদার এসে হাজির। চর তো নয় অপসর্প। সর্বত্র গূঢ়গতি।

'আরে যতীন, তুমি এখানে?' যেন কতদিনের বন্ধু এমনি সহাস্য প্রীতিতে অভিনন্দন করলে।

সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তপ্রিয় লাফিয়ে উঠল রিভলভার নিয়ে। নাও তোমার অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর। নির্মেঘে বিদ্যুৎ দেখল নীরদ। পালাবার জন্য পিছন ফিরল। সঙ্গে-সঙ্গেই গুলি। সঙ্গে-সঙ্গেই নিধন।

আরেকবার নিজের দলের লোককেই মারতে উঠেছিল চিত্তপ্রিয়। তখন দলবল আছে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের মেসে। শীতের সাত সকালে দলেরই যাদুগোপাল বাইরে থেকে নানা খবর যোগাড় করে এনেছে, এক্ষুনি তা দলনেতাকে জানানো দরকার। ঘরে ঢুকে যাদুগোপাল দেখল সবাই র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। কোনজন যতীন মুখুজ্জে? এই জনই হবেন বোধহয়—চিত্তপ্রিয়র মুখের ঢাকা সরিয়ে ফেলল যাদুগোপাল। সঙ্গে-সঙ্গেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে যাদুগোপালের দিকে রিভলবার লক্ষ্য করল।

একটি স্তম্ভিত মুহূর্ত। যাদুগোপালের নিজের নাম প্রায় ভুলে যাবার অবস্থা। তবু কোনোরকমে নিজের নামটা সে উচ্চারণ করলে। তবে সেই তীক্ষ্ণদংষ্ট্রের থেকে সে রেহাই পেল।

কলকাতা ছেড়ে দিয়ে যতীন তার সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেল উড়িষ্যার কপ্তিপদায়, সেখান থেকে নীরেন আর মনোরঞ্জনকে পাঠিয়ে দিল আরেক আস্তানায়, তালদিহিতে। কলকাতা আর এই দুই বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ রাখবার জন্যে বালেশ্বরে একটা সাইকেল মেরামতির দোকান খোলা হল, নাম ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম। কত স্বপ্ন আর সঙ্কল্প, উদ্যম আর উন্মাদনা—কিন্তু প্রয়োজন এক. ভারতকণ্টক ইংরেজের উচ্ছেদ। বালেশ্বরের সাইকেলের দোকানে বাঙালি যুবকদের আনাগোনায় পুলিসের সন্দেহ এল। যথাকালে উপরালাদের কানে গেল, ভারত সরকারের গোয়েন্দাধিপতি ডেনহাম বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট কিলবিকে নিয়ে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে হানা দিল। খানাতল্লাসিতে পেল ছোট একটি কাগজের টুকরো, তাতে নিয়তির হাতে ছোট্ট একটি শব্দ লেখা—কপ্তিপদা। সেটা কী? একটা গ্রাম। সে কোথায়? নীলগিরিতে, ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলের কোলে।

সন্ধের দিকে ডেনহাম বাহিনী নিয়ে চলল কপ্তিপদার দিকে। সঙ্গে কিলবি আর বাংলার স্বনামখ্যাত টেগার্ট। কর্তারা যাচ্ছিল হাতির পিঠে চেপে, হাতির গলার ঘণ্টায় গ্রামের লোক সচকিত হয়ে উঠল। অন্ধকার হয়ে এলে কী হবে একজন ছুটল 'সাধুবাবা'কে খবর দিতে। যতীনই এই সাধুবাবা। গ্রামবাসীরা নাম দিতে ভুল করে নি। পরনে শুধু গেরুয়া বলে নয়, সাধুর মতই সে শোভনহৃদয়, পরোপকারী, ভগবৎ-ভক্ত। বাবা এসে দেখুক কী এলাহিকাণ্ড, হাতির পিঠে চড়ে সাহেব এসেছে!

যতীন তো পলকে বুঝে নিয়েছে কী ব্যাপার। সে পালাল না, কুড়ি মাইল দূরে

তালদিহির দিকে চলল সঙ্গীদের খবর দিতে। সেখানে আবার জ্যোতিষ পাল এসে গিয়েছে।

কপ্তিপদার মণীন্দ্র চৌধুরীই যতীনের আশ্রয়দাতা। রাত্রে তার ঘরের জানলায় টোকা মারল যতীন: 'দাদা, একটা কথা শুনুন।'

চেনা গলার আওয়াজ শুনে মণীন্দ্র জানলা খুলে হতভম্ব হয়ে গেল: 'একি, এখনো পালাও নি?'

'না, পালাব না, যুদ্ধ করব।' দীপ্ততেজ নিরাতঙ্ক যতীন বললে, 'আপনার বন্দুকটা আমাকে দিন।'

কী ভেবে মণীন্দ্র বন্দুক দিয়ে দিল। যতীন কিছু চাইবে আর তাকে তা কেউ দেবে না এ যেন ভাবনাতীত।

অন্ধকারে হানা দিতে সুবিধে হবে না, তাই কর্তারা কপ্তিপদার ডাকবাংলোয় রাত কাটাল। সকালে সাধুবাবার ডেরায় গিয়ে দেখল কিছু ছাই-ভস্ম ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু ডাকাতরা পালাবে কোথায়? চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ফেল। যেখানে যত বেরুবার ফাঁক আছে সব অবরুদ্ধ করে দাও। হ্যাঁ, ডাকাত—গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র করে দাও, জার্মান ডাকাত, বাঙালি ডাকাত ঢুকেছে উড়িষ্যায়। ওদের যারা ধরিয়ে দিতে পারবে তাদের প্রত্যেককে দুশো করে টাকা দেওয়া হবে।

তালদিহি থেকে সঙ্গীদের নিয়ে যতীন চলল বালেশ্বরের দিকে, স্টেশন পেরিয়ে চলে গেল হরিপুর। হরিপুর পেরিয়ে গোবিন্দপুর। গোবিন্দপুরেই নদী আর সেই নদীর নামই বুড়িবালাম।

পঞ্চজন—যতীন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন আর জ্যোতিষ এসে দাঁড়াল নদীর পারে। অনেক কষ্টে একটা নৌকো পাওয়া গেল। ঝুলিঝোলা নিয়ে সকলে পার হয়ে গেল নিরাপদে। কিন্তু ওরা পার হয়ে সিধে না গিয়ে জঙ্গলের দিকে যায় কেন? তাতে গ্রামবাসীরা বলাবলি শুরু করল এরাই সেই বাঙালি ডাকাত নয় তো? একজন যাও, দফাদারকে গিয়ে খবর দাও।

লোক যেন পিছু নিয়েছে মনে হচ্ছে। মনোরঞ্জন ফাঁকা আওয়াজ করল। লোকগুলো হটল বটে চম্পট দিল না। আবার দানা বাঁধল। তখন পঞ্চজন চলে এসেছে দামুদ্রায়। গ্রামের মাতব্বর রাজু মহান্তি সাহস করে ধরতে গেল একজনকে। মনোরঞ্জন এবার জ্যান্ত গুলি ছুঁড়ল। রাজু পড়ে গেল মাটিতে। আর যায় কোথা। গ্রামের লোক জড়ো হল, দল বেঁধে লাগল অনুসরণ করতে। একজনের এত সাহস, একেবারে যতীনকেই জাপটে ধরল। পলক ফেলতে হল না, লোকটা গুলিতে খতম হয়ে গেল। আর বুঝি গ্রামবাসীদের সাহসে কুলোল না। যা করতে হয় এখন পুলিসে করুক। গুলির খবর তো দফাদারকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আমরা আর মরি কেন? আমাদের পুরস্কার পাওয়া বরাতে নেই।

চলতে চলতে পঞ্চজন এসে পড়ল চাষখন্দের সীমানায়। সেখানে আবার নদী। পারঘাটে নৌকো নেই। ঝুলিঝোলা মাথায় বেঁধে নদী পার হয়ে গেল পঞ্চজন। একটা উই-টিবির পাশে গিয়ে বসল। এবার বোধহয় খানিক্ষণ বিশ্রাম করা যাবে। দিনেরাতে কম হাঁটে নি, কম লড়ে নি মূল্য-না-বোঝা জনতার বিরুদ্ধে। সেই কখন একটা ময়রার

দোকান থেকে কিছু কিনে খেয়েছিলাম। তার পর আর কিছু পেটে পড়ে নি। জননী জন্মভূমি, তুমি আমাদের শক্তি দাও, আমাদের শত্রুঞ্জয় করো।

ঢিবির আড়ালে বসাটা মন্দ হল না। আমাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না অথচ আমরা চারদিক সব দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ দূর পাল্লা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। যতীন বুঝল শত্রুপক্ষ এবার একেবারে ফৌজ নিয়ে এসেছে। আসুক, আসতে দাও। আমরা প্রস্তুত। আমরা প্রজ্বলিত। প্রতিপক্ষ বোঝাতে চাইল, তোমাদের যখন দূরপাল্লার বন্দুক নেই তখন রঙ্গ রেখে বেরিয়ে এস আড়াল থেকে। আত্মসমর্পণ কর। যতীন তার সঙ্গীদের বললে, চুপ করে থাকো। ওদের এগিয়ে আসতে দাও। প্রতিপক্ষ এগিয়ে এল। এল মশার পিস্তলের এলাকার মধ্যে। তবে আর কথা কী। ফায়ার! এ যে রঙ্গ নয়, এ যে রণ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে প্রথম সম্মুখযুদ্ধ। ফৌজদাররা ভেবেছিল ওরা বুঝি আতঙ্কেই স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এ যে দেখি দুর্মদ বীরত্ব। এ যে দেখি ইংরেজ সৈন্যই ভূপতিত। এ যে দেখি ইংরেজ সৈন্যই আহত হয়ে পলায়ন করে। স্বয়ং রদারফোর্ডই ঘরমুখো।

আরো ফৌজ আনো, আরো অস্ত্রসম্ভার। দেখি উইয়ের ঢিবি কত বড় দুর্গ! দুর্গ আমাদের বিশাল বক্ষতট। গীতার পরমগৃহে আমরা বাস করি, যেখানে পীড়া নেই পাপ নেই ভয় নেই পরাভব নেই। দু ঘণ্টার উপর যুদ্ধ চলল। শেষকালে বীরদলের গুলি ফুরিয়ে গেল। চিত্তপ্রিয় সমরাঙ্গনেই নিহত হল। যতীন আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়ে দেহ ছাড়ল। ধরা পড়ল জ্যোতিষ, নীরেন আর মনোরঞ্জন।

বিচারে নীরেন আর মনোরঞ্জনের ফাঁসি হল, জ্যোতিষের চোদ্দ বছরের দ্বীপান্তর।

'আয় আজি তোরা মরিবি কে?
পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির নিশীথ শ্মশানে পিশাচ অধীর
থাকিতে তন্ত্র সাধনমন্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে?
মরার মতন না লভি মরণ সাধকের মত মরিবি কে?
আয় আজি আয় মরিবি কে?
অসুরনিধনে কিসের তরাস পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস?
না গনি বিজন কানন ভীষণ বিষম বিপদ তরিবি কে?
নিঠুর অরি সংহার করি বীরের মতন মরিবি কে?
আয় আজি আয় মরিবি কে?

কং ঘাতয়তি হন্তি কম? ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ন মে কর্মফলে স্পৃহা। তৎ কুরুষ মদর্পণং।

আত্মবান পুরুষ, সাধক পুরুষ, গীতা-পুরুষ যতীন্দ্রনাথ। শরীরে মনে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমান বলবান। ঈশ্বরস্থিত, ঈশ্বরসমর্পিত। সর্বাবস্থায় তাই সমত্ববুদ্ধি। জীবন-মৃত্যু একই বাদ্যকরের করতাল।

কৃষ্ণনগরেই সুভাষ হেমন্তর কাছে শুনেছিল যতীন্দ্রনাথের কথা। বলেছিল, 'মুক্ত পুরুষ না হলে বিপ্লবনেতা হওয়া যায় না। যিনি গীতার বিগ্রহ তিনি মুক্তপুরুষ নন তো কী।'

সাত্ত্বিক কর্তাই মুক্তপুরুষ। তিনি নিরাসক্ত, তিনি অনহংবাদী, তিনি ধৈর্য ও উৎসাহসমন্বিত, তিনি সিদ্ধিতে-অসিদ্ধিতে নির্বিকার, হর্ষবিষাদশূন্য।

সুভাষ মনে মনে যতীন্দ্রনাথকে প্রণাম করল।

'শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা অভয়াচরণে নম্রশির,
ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর।
শুধু মায়ের চরণে নম্রশির॥'

আঠারো

ইণ্টারমিডিয়েটে সুভাষের ফল ভালো হল না। প্রথম বিভাগে পাস করলেও গুণানুসারে স্থান হল একশো চব্বিশজনের নিচে। যাক, বিগতকে নিয়ে শোক করে লাভ নেই, বি-এতে দেখে নেব। শান্ত মনে পড়াশুনো করব। দর্শনে প্রথম হয়ে মুছে ফেলব এ কালিমা। কিন্তু তাকে শান্তিতে পড়তে দিচ্ছে কে? হিন্দু হস্টেলের ঘরে ছাত্রদের সভা বসেছে। কোলাহল উঠল: সুভাষ এসেছে। সুভাষকে ডেকে আনি।

একজন ছাত্র বলে উঠল: 'এ আমাদের হিন্দু হস্টেলের ছেলেদের সভা, এতে সুভাষকে ডাকবার কী দরকার! সুভাষ তো আর এই হস্টেলে থাকে না।'

'তাতে কী!' আরেক ছাত্র বললে, 'সুভাষ তো আমাদের ক্লাস রিপ্রেজেণ্টেটিভ।'

'আর এ এমন একটা ব্যাপার প্রত্যেক ছাত্রেরই এতে যোগ দেওয়া উচিত।'

কাউকে ডাকতে হল না, সুভাষ নিজের থেকেই চলে এল। কী ব্যাপার?

'এই যে সুভাষ। এই যে নিজের থেকেই এসে গেছে।'

'কেন, ব্যাপারখানা কী?'

'শুনেছ নিশ্চয়ই গভর্নমেণ্ট বঙ্গ-আমার-জননী-আমার গানটা বন্ধ করে দিচ্ছে। ওতে নাকি রাজদ্রোহের গন্ধ আছে। আমাদের হস্টেলে যে বার্ষিক অনুষ্ঠান হচ্ছে তাতে ও গান আমরা গাইব।'

'নিশ্চয়ই গাইবে।' সুভাষ বললে শান্ত স্বরে, 'ওই তো একমাত্র গান।'

'আমাদের সাইকোলজির প্রফেসার খগেন মিত্তির মশাইকে বলব আমাদের লিড করতে। উনি তো খুব ভালো গাইয়ে।'

'সভাপতি কে হবে?'

'আমাদের হিস্ট্রির প্রফেসর মিস্টার ওটেন।'

'খুব ভালো হবে। আরো সব প্রফেসররা আসবেন তো?'

'ইংরেজির প্রফেসর প্রফুল্ল ঘোষ, সায়েন্সের মিস্টার পিক—আরো কেউ কেউ নিশ্চয়ই আসবেন।'

সভা ঠিকমতই হল। খগেন মিত্র লিড করলেন ও ছেলেরা তারস্বরে গান ধরল: 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।'

ওটেন অস্বস্তি প্রকাশ করছিল, কিন্তু বক্তৃতায় সে শোধ তুললে। বক্তৃতা আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করার পরই বলে উঠল: 'ইউ বেঙ্গলিজ আর বার্বেরিয়ান্স—'

ছাত্রদের মধ্যে চাপা বিক্ষোভ শুরু হল। খগেন মিত্র বেরিয়ে গেলেন সভা ছেড়ে,

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও। ছেলেদের বিক্ষোভটা চাপা না থেকে মুক্ত শিখায় জ্বলে উঠল। আবার ডাকো সুভাষকে।

'ক্লাসে তো ছেলেদের অপমান করছেই, এ একেবারে বাঙালি জাতি ধরে অপমান।'

'অসহ্য!' সুভাষ বললে, 'এর প্রতিবিধান হওয়া দরকার।'

'যেন চিরকাল নীরবে সমস্ত অপমান সহ্য করে থাকতে হবে! অসম্ভব।'

'কিন্তু কী করা!' আরেকজন ছাত্র এগিয়ে এল।

আমি বলি, আগে প্রিন্সিপ্যাল জেমসের সঙ্গে দেখা করি। তাকে জানাই আমাদের মনস্তাপ। তিনি কী বলেন। তারপর দেখা যাবে।'

'তবে তাই।'

সুভাষকে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে পাঠিয়ে বাইরে ছেলেরা ভিড় করে আছে! কী খবর নিয়ে আসে তারই প্রতীক্ষায়। কতক্ষণ পরে সুভাষ বেরিয়ে এল। মুখ মেঘাচ্ছন্ন।

'কী হল? কী হল?'

'কিছু হল না। প্রিন্সিপ্যাল উলটো কথা বলছেন। বলছেন, আমাদেরই নাকি ওটেনের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

'দোষ করল ওটেন আর ক্ষমা চাইব আমরা?' এক ছাত্র বলে উঠল।

'ওটেন যে সাহেব, সাহেবের চোখে সাহেবের দোষ নেই।' আরেক ছাত্র টিপ্পনী মারল।

'এর এখন প্রতিকার কী? রোখা ছাত্র মুখিয়ে এল।

সুভাষ প্রশান্ত মুখে বললে, 'ধর্মঘট।'

ছাত্রদল উত্তেজিত কণ্ঠে আওয়াজ তুলল: 'ধর্মঘট।'

সুভাষ গম্ভীরস্বরে বললে, 'শোনো, এভাবে উত্তেজিত হওয়া নয়। বেশ ধীরে সুস্থে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সমস্ত আঁটঘাঁট বেঁধে কাজে নামতে হবে। একটা প্ল্যানড য়্যাকশান চাই। এলোমেলো হয়ে কাজ করা নয়। প্রথমে একতা চাই, দল বাঁধা চাই, চাই সংগঠন—সঙ্ঘশক্তি।'

'তুমি যদি নেতৃত্ব নাও আমরা দেখাব সঙ্ঘশক্তি।'

অনেক চেষ্টা হল সুভাষকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু সুভাষ টলল না, একবার যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তখন আর বিরতি নয়, পশ্চাদপসরণ নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করছে সুভাষ। সঙ্গে আরো কজন ছাত্র। কলেজ করতে আসা ছাত্ররা বই-খাতা হাতে গেটের কাছে এগুচ্ছে কিন্তু সুভাষকে দেখে ভিতরে যেতে আর সাহস পাচ্ছে না।

একটি ফিটফাট করে সাজা খুঁটির জোরওয়ালা বড়লোক ছেলে আকাশ-থেকে-পড়ার মতন মুখ করে বললে, 'এ কি, পিকেটিং? প্রেসিডেন্সি কলেজে পিকেটিং?'

সুভাষকে উদ্দেশ করেই বলা তাই সে উত্তর দিল: 'কেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে মানুষ নেই? মানুষ হয়ে তারা তাদের মনুষ্যত্বের অপমান সহ্য করবে?'

যেন কথাটা নতুন শুনছে বড়লোক ছাত্র এমনিধারা মুখ করল: 'মনুষ্যত্বের অপমান!'

'সমস্ত বাঙালি জাতকে বর্বর বলা আমাদের মনুষ্যত্বের অপমান করা নয়?'

বড়লোক ছাত্র ঢোঁক গিলল। বললে, 'কিন্তু ওদের সঙ্গে কি পারবে?'

সুভাষ হেসে বললে, 'চেষ্টা করে দেখা যাক না। তুমিও এ চেষ্টায় সাহায্য কর না আমাদের।'

'মিছিমিছি পরকালটা ঝর্ঝরে করবে।'

'আগে ইহকালটা সামলাই, পরে পরকাল ভাবা যাবে।'

একটি ছাত্র ব্যস্তসমস্ত হয়ে কলেজের ভিতর থেকে এল। আতঙ্কিত স্বরে বললে, 'এই স্যার জে সি বোস তোমাকে ডাকছেন।'

'আমাকে?' একটু কি ঘাবড়াল সুভাষ? জিজ্ঞেস করলে, 'কেন ডাকছেন?'

'তা তো জানি না।'

ধীর পায়ে একটু বা চিন্তিত মনে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর কক্ষপ্রান্তে এসে দাঁড়াল সুভাষ। বাইরে কোনো চাপরাশি নেই। নিজেই ঢুকে পড়ল সাহস করে। দু হাত তুলে নমস্কার করল। নম্র স্বরে জিজ্ঞেস করল: 'আমাকে ডেকেছেন?'

জগদীশচন্দ্র কী পড়ছিলেন, চোখ তুলে সস্নেহে তাকালেন। 'তুমি—'

'আমি সুভাষচন্দ্র বসু।'

'ও তুমি—তোমরা ধর্মঘট করেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'শোনো। এগিয়ে এস।'

সুভাষ মুগ্ধের মত এগিয়ে গেল।

গলা নামিয়ে গাঢ়স্বরে জগদীশচন্দ্র বললেন, 'তোমরা ঠিক করেছ।'

চকিতে সুভাষের ম্লান চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জগদীশচন্দ্র বললেন, 'চালিয়ে যাও ধর্মঘট। যতদিন না দুঃখ প্রকাশ করে। তোমাদের কাজে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।'

হ্যাঁ, চালিয়ে যাও ধর্মঘট। অগত্যা প্রিন্সিপ্যাল দলনেতা সুভাষকে ডেকে পাঠাল। ওটেনের সঙ্গে মোকাবিলা হোক।

প্রিন্সিপ্যালের ঘর থেকে আসতেই ছাত্রদল সুভাষকে ঘিরে ধরল: 'কী হল?'

সুভাষ হাসল। বললে, 'ওটেন দুঃখ প্রকাশ করেছে।'

ছাত্রদল উল্লসিত হয়ে উঠল: 'করেছে? করেছে? তবে আর কথা কী!'

সুভাষ বললে, 'হ্যাঁ, আর তবে ধর্মঘট নয়। চলো ক্লাসে যাই।'

একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলে, 'কিন্তু ওটেন কথাটা কী বলল?'

'বলল, 'সরি'।'

'শুধু—'সরি'? আর কিছু নয়?'

'তাই যথেষ্ট।' বললে সুভাষ, 'ওটুকু যে বলাতে পেরেছি, উদ্ধত ভঙ্গিটাকে যে নত করতে পেরেছি তাতেই আমাদের জয়।'

'চলো ক্লাসে চলো।' হৈ-হৈ করতে করতে ক্লাসের দিকে চলল ছাত্রেরা।

সর্বশেষ ছাত্র কাঁধ ঝাঁকিয়ে দুহাত চিৎ করে বললে, 'সরি!'

কিন্তু স্বভাব যায় ম'লে, ইল্লৎ যায় না ধুলে। নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা। কদিন

পরেই ওটেন আবার এক কাণ্ড করে বসল।

ক্লাসে ওটেন পড়াচ্ছে, পাশের বারান্দা দিয়ে চটি ফটফট করতে করতে একটি ছাত্র, কমল বসু, চলে গেল। একে চটি তায় ফটফট। ওটেন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল একবার চটির দিকে। শব্দটা অস্পষ্ট হয়ে এল। পড়ানোয় আবার মন দিল ওটেন। কমল যেন কাকে খুঁজছে। তাই আবার সে ফিরল বারান্দা দিয়েই। আবার চটি, আবার ফটফট। ওটেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে দুহাতে কমলকে প্রবল ধাক্কা দিল। কমল পড়ে গেল ছিটকে। আরো একটি ছাত্র আসছিল কমলের সাহায্যে, কমলকে তুলতে, তাকেও ওটেন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কী হল, কী হল, বলতে বলতে ছেলেরা বেরিয়ে এল ক্লাস থেকে। কমলকে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ কেউ বা দ্বিতীয় ছাত্রটিকে।

সুভাষ বললে, 'এবার আর ধর্মঘট নয়। এবার অন্য ব্যবস্থা।'

প্রেসিডেন্সি কলেজের সিঁড়ির নিচে ছেলেদের জটলা চলেছে। এই চুপ! ওটেনের চাপরাশি। ওটেনের চাপরাশি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

সুভাষ জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি একা? তোমার সাহেব কোথায়?'

'ঘরে।'

'বাড়ি যাবে না?'

'এইবার যাবে।' চাপরাশি চলে গেল।

আবার উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

সুভাষ বললে, 'তোমার সাহেবকে পাঠিয়ে দাও।'

চাপরাশি শুনেও শুনল না। একটু পরেই সিঁড়ির মুখে দেখা গেল ওটেনকে। ছাত্রের দল চকিতে সিঁড়ির কাছ থেকে দুভাগে আলাদা হয়ে গেল যাতে ওটেন যাবার পথ পায়। আর যেই ওটেন নেমেছে ছেলেরা দুদিক থেকে ঘন হয়ে এসে তাকে ঘিরে ধরল। কোলাহল উঠল—এই যে—'হিয়ার হি কামস।' সঙ্গে সঙ্গেই তার উপরে বেদম মার শুরু হল। কে বা কারা যে মারল স্পষ্ট বোঝা গেল না। ওটেন মাটিতে পড়ে গেল। ছেলেরা হাওয়া হয়ে গেল নিমেষে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টলে উঠল!

প্রিন্সিপ্যাল জেমস ওটেনের চাপরাশিকে ডেকে পাঠাল। তার ঘরে আরো অনেক প্রফেসর।

'তুমি মারের সময় ছিলে?'

'না, হুজুর।' চাপরাশির মুখ প্রায় কাঁদো-কাঁদো।

'তুমি মার দেখ নি?'

'না, হুজুর।'

'কে মেরেছে বলতে পারো না?'

'কী করে বলব?'

'তুমি কিছুই জানো না?'

'এই শুধু জানি একজন জিজ্ঞেস করেছিল তোমার সাহেব কখন বাড়ি যাবে—তোমার

সাহেবকে পাঠিয়ে দাও।'

জেমস যেন সমুদ্রে কুটো ধরতে গেল: 'তাকে তুমি সনাক্ত করতে পারবে?'

'পারব।'

'আমি থার্ড ইয়ারের ছাত্রদের আইডেণ্টিফিকেশান প্যারেড করাচ্ছি তুমি সেই ছাত্রটাকে চিনিয়ে দেবে? প্রফেসর নিবারণ ভটচাজের দিকে তাকাল জেমস: 'দয়া করে আপনি প্যারেডটা করান আর চাপরাশি দোষী ছাত্রটাকে চিনিয়ে দিক।'

জেমসের আশা পূর্ণ হল না। চাপরাশি চেনাতে পারল না। না ইচ্ছে করেই চেনাল না? ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। কেউ মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর করে রেখেছে, কেউ বা ক্রুদ্ধ, কারু বা মুখে বিকৃতি বা ভ্রূকুটি, কারু কারু বা স্পষ্ট ভয়। এই ছেলেটা কি সুভাষের মত দেখতে, না কি সুভাষ দাঁড়ায় নি প্যারেডে? চাপরাশি ই-ই করে কাউকে ছুঁল না!

নিবারণ ভটচাজ .াপরাশিকে জিজ্ঞেস করলে, 'কী, চিনতে পারলে?'

'না, হুজুর।'

'আরেকবার দেখ।'

চাপরাশি আরেকবার দেখল। আরো একবার ধরি-ধরি করে কাউকে ধরল না।

'কী, পারলে চিনতে?' নিবারণ মিহিস্বরে প্রশ্ন করল।

চাপরাশি মুখ হতাশ করে ঘাড় নেড়ে বোঝালে, পারে নি। কিন্তু দলনেতা, আন্দোলনের অধিপতি বলে সুভাষকে চিহ্নিত করতে বাধা কী। অন্তত সে তো থার্ড ইয়ার আর্টসের ক্লাস-রিপ্রেজেণ্টেটিভ। তাই জেমস সুভাষকে ডেকে পাঠাল।

'তুমি তো থার্ড ইয়ার আর্টসের ক্লাস-রিপ্রেজিণ্টেটিভ?' বাঁকা চোখে তাকাল জেমস।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তুমি মিস্টার ওটেনকে মেরেছ?'

'না, স্যার।'

'মারের সময় তুমি উপস্থিত ছিলে?'

'ছিলাম।'

জেমস বোধহয় আশান্বিত হল। রুক্ষ ভঙ্গিটা একটু মোলায়েম করে আনল। বললে, 'তা হলে বলো তো কে মেরেছে, তাদের নাম কী?'

সুভাষ দৃঢ়তর হল। বললে, 'মাপ করবেন, পরের নাম বলে বেড়ানো আমার অভ্যেস নয়।'

এ বুঝি জেমস মার খেল। মুহূর্তে রূঢ় হয়ে উঠল: 'তা হলে বলো ক্লাস-রিপ্রেজেণ্টেটিভ হিসেবে তুমি দোষী না নির্দোষ?'

'তা আমি কী করে বলি?'

'আমি বলছি তুমি দোষী।' জেমস প্রায় গর্জন করে উঠল: 'আমি তোমাকে সাসপেণ্ড করলাম।'

'ধন্যবাদ।' সুভাষ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছেলেদের কেন সংঘর্ষ এ নিয়ে

গভর্নমেণ্ট এক কমিশন বসিয়েছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার সভাপতি আর দুই সভ্য ডি-পি-আই হর্নেল আর প্রফেসর সুবোধ মহলানবিশ। এখন প্রশ্ন উঠেছে যখন একবার কমিশন বসেছে তখন তার সিদ্ধান্তের আগে প্রিন্সিপ্যাল জেমস সুভাষকে দোষী সাব্যস্ত করে সাসপেণ্ড করতে পারে কি না।

মেজদা শরৎচন্দ্র বললে, 'আমার মতে পারে না। আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটা সবিস্তারে দেখবার জন্যে কমিশনকে ভার দেওয়া হয়েছে, সে অবস্থায় প্রিন্সিপ্যালের সাসপেণ্ড করার এক্তিয়ার কোথায়?'

'আমারও তাই মনে হয়।' সুভাষ উৎসুক কণ্ঠে বললে, 'আচ্ছা একবার ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের সঙ্গে দেখা করতে যাব? দেখি না তিনি কী বলেন।'

'আমার তো মনে হয় আমি যা বললাম তাই বলবেন।'

প্রভাবতী ঘরে ঢুকে সুভাষকে লক্ষ্য করে সস্নেহে তিরস্কারে বলে উঠলেন: 'তোর শাস্তি তো শুধু মোড়লি করবার জন্যে। কী দরকার ছিল মোড়লি করার?'

সুভাষ বললে, 'না মা, এ মোড়লি নয়, এ হচ্ছে আত্মসম্মানের জন্যে লড়া। আত্মসম্মানের জন্যে যদি স্বার্থত্যাগ করতে হয় তাতে মহৎ আনন্দ আছে। ত্যাগ ছাড়া আবার জীবন কী!'

মাকে আশ্বাস দেবার জন্যে শরৎ বললে, 'বিচার এখন কমিশনের হাতে। দেখি কমিশন কী রায় দেয়!'

সুভাষ বললে, 'যদি কলেজ থেকে তাড়িয়েই দেয় অন্য কাজে লাগা যাবে। কাজের অভাব হবে না। সাফল্য শুধু কলেজে পড়ে পরীক্ষা পাস করে বড় চাকরি করার মধ্যেই নয়, মা, আরো অনেক তার রূপ আছে।'

'না বাপু, ভালোয়-ভালোয় বিপদ কেটে যায়, সব দিক উদ্ধার হয় তবেই বাঁচি।' আশিস-মাখানো দৃষ্টিতে প্রভাবতী তাকালেন ছেলের দিকে: 'কী এক সর্দার ছেলে হয়েছে আমার!'

সুভাষ হেসে বললে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ কী বলেছেন জানো মা? যে শিরদার সেই সর্দার।'

ফাঁসি হবার আগে নীরেন দাশগুপ্ত তার মাকে চিঠি লিখল: 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ বিষণ্ন হয়ো না। আমরা হিন্দু, শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মৃত্যু ঘটে না।'

আর চিত্তপ্রিয় লিখল: 'মৃত্যু আমার শিয়রে বসে আছে, আমার তাতে ভয় নেই। দেশ স্বাধীন হবার আগে যদি মরি আমি আবার জন্মাব, আবার ইংরেজকে উচ্ছেদ করবার জন্যে যুদ্ধ করব।'

সবাই সেই গীতা-পুরুষ যতীন্দ্রনাথের শিষ্য। আর যতীন্দ্রনাথ লিখল তার দিদিকে: 'ভগবান যাই করেন তাই আমি তাঁর আশীর্বাদ বলে নতমস্তকে মেনে নেব। তিনি যা করেন সমস্ত শুভপ্রদ। আমাদের অজ্ঞানের জন্যেই বিপরীত দেখি। মৃত্যুর মাঝে অন্ধকার নেই, আছে তাঁর অমৃতের স্পর্শ।'

যে শিরদার সেই সরদার।

উনিশ

চিত্তরঞ্জন দাশ রাত্রে ডিনার খাচ্ছেন স্ত্রী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে, বেয়ারা এসে সাহেবের হাতে একটা চিরকুট দিলে। বললে, 'কে এক সুভাষ বোস নামে ছোকরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'সুভাষ বোস!' দাশসাহেব চিরকুটটা হাতে নিয়ে পড়লেন: 'থার্ড ইয়ার, প্রেসিডেন্সি কলেজ।' খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়লেন।

বাসন্তী দেবী অবাক মানলেন: 'সে কি, উঠলে কেন? খাওয়াটা শেষ করে যাও। ছেলেটা ততক্ষণ বসুক।'

'না, কেন এসেছে জেনে আসি।'

'এত কী জরুরি?'

'জানো না এ সেই আশ্চর্য তেজী ছেলে যে কলেজের প্রফেসর উদ্ধত ওটেনকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে।'

'কেন ওটেন কী করেছিল?'

'কী করেছিল! ছাত্রদের সঙ্গে বন্য ব্যবহার করেছিল, তাদের দেশবাসীদের অপমান করেছিল—'

বাসন্তী দেবী বুঝলেন ব্যাপারটা নিঃসংশয় জরুরি।

দাশসাহেব বৈঠকখানায় এসে দেখলেন একটি গৌরতনু সবল সুন্দর যুবক দাঁড়িয়ে আছে—পবিত্রতার বিধূম পাবকশিখা। ক্ষণকাল তিনি যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তারই মধ্যে সেই যুবক নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে নিয়েছে।

'তুমি সুভাষ?' দাশসাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশ্ন করলেন: 'তুমিই ওটেনকে শিক্ষা দিয়েছ?'

সুভাষ একটু বুঝি কুণ্ঠিত হল। বললে, 'আমি দলে ছিলাম, আমি কিন্তু তাই বলে—'

'তুমি সত্যি-সত্যি মেরেছ কিনা তাই আমি জিজ্ঞেস করেছি? তুমি দলে ছিলে তার মানেই তুমি দলপতি ছিলে। এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ যার চেহারা সে দলপতি না হয়েই যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল কী?'

'প্রিন্সিপ্যাল আমাকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।' নির্মল মুখে সুভাষ বললে।

'তাড়িয়ে দিয়েছে!'

'হ্যাঁ, এই নিয়ে আইনের একটা প্রশ্ন আছে বলে মনে হচ্ছে, তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'কী প্রশ্ন?'

'প্রিন্সিপ্যালের অর্ডার হবার আগেই গভর্নমেন্ট একটা কমিশন বসিয়েছে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বিচার করবার জন্যে। প্রশ্ন হচ্ছে কমিশন যখন বসে গেছে তখন প্রিন্সিপ্যালের কি অর্ডার দেবার আর অধিকার আছে? প্রিন্সিপ্যালই যদি অর্ডার দিল তা হলে আর কমিশন কেন?'

'তোমার পয়েণ্টটা ভালো।' দাশসাহেবের স্বরে যেন আত্মীয়তা ফুটে উঠল: 'আগে দেখা যাক কমিশন কী রায় দেয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত যদি তোমার অনুকূলে হয় তখন প্রিন্সিপ্যালের অর্ডার নাকচ করা যায় কিনা দেখব। আর কমিশনের সিদ্ধান্ত যদি—'

সলজ্জ মুখে হাসল সুভাষ। বললে, 'তা তো ঠিকই। আচ্ছা, আজ তবে আসি।' বলে আবার প্রণাম করল।

'আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।'

সুভাষ চলে যাচ্ছিল ফিরে তাকাল। বুকভরা আশা নিয়ে ফিরে তাকাল। হ্যাঁ, ভগবান করুন আবার যেন দেখা হয়।

এই সেই চিত্তরঞ্জন দাশ যে আলিপুর বোমার মামলায় দায়রা কোর্টে অরবিন্দের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। খালাস করে নিয়েছিল অরবিন্দকে।

এই সম্পর্কে কী বলছে অরবিন্দ? বলছে:

'দায়রা আদালতে মামলা এলে আমি আমার কৌঁসুলিকে লিখে-লিখে উপদেশ পাঠাচ্ছিলাম, আমার বিরুদ্ধে কোন-কোন উক্তি নির্জলা মিথ্যে আর কোন-কোন উক্তি সম্পর্কে কী জেরা করতে হবে। সহসা একদিন দেখলাম আমার সেই পুরোনো কৌঁসুলি আর নেই, তার পরিবর্তে এক নতুন কৌঁসুলি এসে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে যারা আমার পক্ষ সমর্থনে উকিল ব্যারিস্টার নিয়োগে ভারপ্রাপ্ত ছিল বুঝলাম এ তাদেরই মনোনয়ন। দেখে মন-প্রাণ ভরে উঠল। ভাবলাম একেও লিখিত উপদেশ পাঠাই। তক্ষুনি অন্তর থেকে আদেশ হল এই সেই লোক যে তোমাকে চক্রান্তপাশ থেকে মুক্ত করবে। তাকে আর তোমাকে উপদেশ পাঠাতে হবে না, তোমার ও সব চিরকুট ছিঁড়ে ফেল। তাকে যা উপদেশ দেবার আমি দেব, তুমি নয়। সেই থেকে আমি আর একটিও কথা বলিনি, পাঠাইনি একচ্ছত্র উপদেশ। পরে দেখেছি আমি যা উপদেশ দেব বলে ভাবতাম তা কত ভঙ্গুর কত অসার। আমি আমার সর্বস্ব আমার সেই কৌঁসুলি চিত্তরঞ্জন দাশের হাতে সমপর্ণ করে দিলাম। আর কী একান্তচিত্ততায়, সমস্ত প্র্যাকটিসে জলাঞ্জলি দিয়ে চিত্তরঞ্জন, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস খালি ভেবেছে আর লড়েছে আমি কী করে বাঁচব, জেলের বাইরে থাকব। আর ভাবতে-ভাবতে, লড়তে-লড়তে, কী বলব, তার স্বাস্থ্য ভেঙে গেল।'

অরবিন্দের হয়ে আদালতকে বলছে চিত্তরঞ্জন : 'যদি এ দেশের আইন এই হয়, যে স্বদেশের স্বাধীনতা-প্রচার অপরাধ, তবে আমি স্বীকার করছি আমি অপরাধী, আমাকে শাস্তি দেওয়া হোক। তার জন্যে সাক্ষ্য সাজাবার প্রয়োজন নেই। এর জন্যেই আমি আমার জীবনের সমস্ত পার্থিব আশা বিসর্জন দিয়েছি, এই আদর্শ নিয়ে বাঁচবার ও খাটবার জন্যেই চলে এসেছি কলকাতায়। আমি জানি আমার দায়িত্ব—সে আর কিছুই নয়, আমার দেশবাসীকে সচেতন করে দেওয়া জগৎসভায় তারও এক মহৎ ব্রত উদযাপন করবার আছে—'

'কিন্তু বোমা ছোঁড়া?' বিচারক বিচক্রফট জিজ্ঞেস করলে চিত্তরঞ্জনকে : 'ইংরেজের উপর বোমা ছোঁড়া? সমর্থন করে আসামী?'

চিত্তরঞ্জন বললে, 'যদি কেউ বোমা নিয়ে এসে অরবিন্দকে বলে যে-ইংরেজটাকে

প্রথম দেখব তারই উপর ছুঁড়ব এটা, তা হলে অরবিন্দ প্রশ্ন করবে, তাতে কি দেশ স্বাধীন হবে? সুনিশ্চিত উত্তর হবে, না, তা হবে না। সেই উত্তর শুনে অরবিন্দ বলবে, তবে ছুঁড়ো না।'

'কিন্তু যদি উত্তর হয়', বিচক্রফট সুচতুর প্রশ্ন করলে, 'হ্যাঁ, ছুঁড়লে দেশ স্বাধীন হবে, তা হলে অরবিন্দ কী বলবে?'

'বলবে ছোঁড়ো।'

সমস্ত আদালত বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে রইল।

'কিন্তু মনে রাখবেন—'ছুঁড়লে দেশ স্বাধীন হবে' এ প্রত্যয়টা অকপট হওয়া দরকার।' চিত্তরঞ্জন বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন : 'যদি গভর্নমেণ্টের ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের ফলে দেশের লোক একতাবদ্ধ হয়ে ওঠে আর তাদের আয়ত্তে এমন রণসম্ভার থাকে যে তা দিয়ে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে লড়তে পারে, তা হলে অরবিন্দ নিশ্চয়ই সে যুদ্ধের সমর্থন করবে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় নয়—'

চিত্তরঞ্জন কি সেদিন সুভাষের আজাদহিন্দ ফৌজের পূর্বাভাস পেয়েছিল?

তারপর বক্তৃতার শেষভাগে চিত্তরঞ্জন কী চমৎকার বললে। বললে : 'আদালতের কাছে আমার এই নিবেদন যে এই আসামী, শুধু এই আদালতের বিচারের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, এ ইতিহাসের উচ্চতম আদালতের কাছে বিচারপ্রার্থী। এসব তর্কবিতর্ক ও কলকোলাহল স্তব্ধ হয়ে যাবার অনেক পর, হয়তো বা এই আসামীর তিরোধানেরও পর, এই ব্যক্তিই দেশপ্রেমের জীবনকবি বলে অভিনন্দিত হবে। অভিনন্দিত হবে জাতীয়তার মহাপুরুষ ও মানবপ্রেমিক বলে। এর তিরোধানের বহুদিন পর এর বাণী শুধু ভারতবর্ষে নয় সমস্ত পৃথিবীতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। তাই বলছি এ শুধু এ আদালতে বিচারের জন্য দাঁড়ায় নি, এ দাঁড়িয়েছে ইতিহাসের বিচারালয়ে।'

> 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়?
> দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়?
> সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে বাহুবল তার।
> আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে দেশের উদ্ধার।'

কিন্তু এখন সুভাষকে কে উদ্ধার করে? কমিশন তলব করল সুভাষকে। কমিশন বলতে মাঝখানে স্যার আশুতোষ আর দুপাশে হর্নেল আর মহলানবিশ। সুভাষ কাঠগড়ায় দাঁড়াল। কমিশন কি তাকে নির্দোষ বলবে? যেরকম সব গম্ভীর চেহারা, মনে হয় না। আশুতোষের কি মনে আছে তিনিও একদিন ছাত্র-আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন?

হাইকোর্টের জজ নর্টন শালগ্রামশিলাকে কোর্টে হাজির করার হুকুম দিল। এই আদেশ চরম বর্বরতার দৃষ্টান্ত—এই কথা ঘোষণা করল সুরেন্দ্রনাথ। ফলে সুরেন্দ্রনাথের আদালত অবমাননার দায়ে দু মাসের জেল হয়ে গেল। আর সেই অবিচারের বিরুদ্ধেই ছাত্রবিক্ষোভের নেতৃত্ব করেছিল আশুতোষ।

প্রেসিডেন্সি কলেজেও তো এ একটা ছাত্রবিক্ষোভ। কিন্তু বিচারসমাসীন আশুতোষের প্রাণে কি দয়াদাক্ষিণ্য আছে?

'তোমাকে একটা সরাসরি প্রশ্ন করি, মিস্টার ওটেনকে যে ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে

মার দিল তা তুমি সমর্থনযোগ্য বলে মনে করো?'

সুভাষ বললে, 'সমর্থনযোগ্য হয়তো নয় কিন্তু ছাত্ররা কী রকম প্ররোচিত হয়েছিল তা বিচার করে দেখা দরকার। প্রেসিডেন্সি কলেজে গত কয়েক বছর ধরে ইংরেজ প্রফেসররা কী অনাচার অত্যাচার করেছে তা যদি আমাকে বলতে দেন দেখবেন ছাত্ররা নিরুপায় ছিল কি না—'

কমিশন শুনল, লিখল, রায় দিল।

'অই যে জগৎ জাগে, স্বদেশ অনুরাগে
কে আর ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গ ভিন্ন, নিদ্রামগ্ন দিবাভাগে।
ভাঙবে নাকি এ কাল নিদ্রা রইবে এ ভাব যুগে যুগে।
পেয়ে পরের প্রসাদ যায় কি বিষাদ
এ অবসাদ কোন বিরাগে।
থাকতে অঙ্গ পঙ্গু বঙ্গ, দাগা বুলায় পরের দাগে।
করে গৃহশূন্য পরের জন্য লক্ষ্মীর পুত্র ভিক্ষা মাগে॥
সমুন্নত সর্বজাতি আমরা কেবল অধোভাগে,
এবার মন্ত্রসাধন করেছি পণ ছাড়ব না তা প্রাণবিয়োগে।
প্রাণে যখন আবেগ আসে শত্রু ভাষে হুজুগ চাগে।
বিশারদ কয় সেই ত সময় কার্য সারো সেই সুযোগে॥'

এলগিন রোডের বাড়িতে সুভাষের দাদারা আলাপ-আলোচনা করছে। অদূরে সুভাষ বসে আছে। শরৎচন্দ্রের হাতে কমিশনের রিপোর্ট।

শরৎ বললে, 'ছাত্রদের সম্পর্কে একটাও ভালো কথা লেখে নি।'

বড়দা সুরেশ জিজ্ঞেস করলে, 'আর সুভাষ?'

'নাম ধরে একমাত্র ওর কথাই তো পাঁচ কাহন বলা হয়েছে।'

'ওর সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা কী?'

শরৎ বললে, 'প্রিন্সিপ্যাল যে অর্ডার দিয়েছে তারই সমর্থন। অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কার।'

সুভাষ উঠে পড়ল। ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, 'তার মানেই রাস্টিকেশন।'

'হয়তো ওরকম কিছু নয়, দেখি—' শরৎ আশ্বাস দিতে চাইল।

'আমি এখন তবে কী করব?' উপদেশ চাইল সুভাষ।

'আমি বলি কী, কটক চলে যা।' বললে শরৎ, 'বাবার অসুখ শুনে মা চলে গিয়েছেন, এখন তাঁরা দুজনেই তোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছেন, তোকে কাছে পেলে অনেকটা সামলে উঠতে পারবেন। তা ছাড়া—'

সুরেশ গম্ভীর মুখে বললে, 'সেইটেই আসল কারণ।'

'তা ছাড়া দেখতে পাচ্ছিস না পুলিশ কেমন কলকাতায় ধরপাকড় শুরু করে দিয়েছে।' শরৎ বললে বুঝিয়ে, 'তোর উপর তাদের আক্রোশ। যখন দেখবে কলেজ থেকে নামকাটা হয়ে চুপচাপ বসে আছিস তোকে ঠিক অ্যারেস্ট করবে। তুই যা বাবা-মার কাছে কটক চলে যা।'

সুভাষ বিনীতস্বরে বললে, 'তাই যাব।'

পুলিশ আর পুলিশ! পুলিশ কেন ধরিয়ে দেয় বিপ্লবীদের? পুলিশ কি ভারতবাসী নয়? পুলিশ কি চায় না ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক, ইংরেজ চলে যাক তড়িঘড়ি? তবে তারা বিপ্লবকে কেন বিধ্বস্ত করতে ব্যস্ত? তারা কি চায় তাদের গোলামি বংশানুক্রমিক অব্যাহত থাকুক? চাকরি—চাকরির কথা বলো তো, দু কড়ি সাত ফোঁটা বজায় রেখে খেলা রাখতে পারে না? কেন অমানুষিক উৎসাহে মারধোর করে, অপমান করে? এটাও চাকরি? পুলিশ হলে কি মায়াদয়া থাকতে নেই?

তারপরে সৈন্যদল? পরশাসনকে বাঁচিয়ে রাখতেই তাদের জীবনধারণ? দেশের মুক্তির জন্যে তারা একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতে পারে না?

বিপ্লবী মোহনলাল বর্মায় এসেছে বর্মা থেকে ভারত-আক্রমণের তোড়জোড় করতে। সৈন্যদলে সে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করল। গোপনে তাদের সঙ্গে দেখা করে বক্তৃতা দিল, বোঝাল : 'কে তোমাদের ইংরেজ? ইংরেজ তো বিধর্মী, বিদেশী, তোমাদের দেশকে শুধু পশুবলে পদতলে রেখেছে? এ যন্ত্রণা তোমরা তোমাদের শরীরের রক্ত চলাচলে অহর্নিশ অনুভব কর না? সেই পরলোভী ইংরেজের জন্যে প্রাণ দেবে? মাতৃভূমির জন্যে প্রাণ দেওয়াই কি বীরের কর্তব্য নয়?'

বেশি দিন পারল না বক্তৃতা দিতে। সৈন্যবিভাগের এক জমাদার মোহনলালকে ধরিয়ে দিল। মোহনলাল সে বিশ্বাসঘাতকতায় বিমূঢ় হয়ে গেল। জমাদারকে গুলি করবার জন্যে রিভলভার তুলল না, নিজেও চেষ্টা করল না পালাতে। শুধু বললে, 'ভাই হয়ে ভাইকে ধরিয়ে দিলে!'

মনে করো প্রফুল্ল চাকীর কথা। নন্দলালকে বললে, 'আপনি বাঙালি হয়ে বাঙালিকে ধরলেন?'

'সরকার সেলাম!' কী বর্বর নিয়ম! সরকারী কোনো কর্মচারী জেলে পরিদর্শনে এলেই কয়েদীকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, সরকার সেলাম!

বলব না, বলতে পারব না। মোহনলাল ঘাড় সোজা করে রইল। যতই অত্যাচার চালাও না, আমি তোমাদের কাউকে নয়, শুধু আমার নিজের বীর্যবান মানুষসত্ত্বাকে নমস্কার করব।

মৃত্যুদণ্ডে ভূষিত হল মোহনলাল। জেলে বর্মার লাটসাহেব এল তাকে বোঝাতে, ক্ষমা চেয়ে একটা প্রার্থনাপত্র পাঠাও।

মোহনলাল বললে, 'আপনি আপনার কাজ করুন, আমাকেও আমার অন্তিম কর্তব্য সম্পাদন করতে দিন।'

রাজপুত বিপ্লবীদের নেতা প্রতাপ সিং রাসবিহারী বসুর ডান হাত। একুশ বাইশ বছরের যুবক, তেজে-গরিমায় মনে হয় যেন সেই ঐতিহাসিক প্রতাপ সিং। দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করে পুলিশ তাকে জেলে পুরল। তারপর শুরু করল অকথনীয় অত্যাচার। দিল নানা দুর্মন্ত্রণা। অর্থের বিপুল প্রলোভন দেখাল। শুধু দলের লোকদের নামগুলো বলে দাও। অসম্ভব। আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ, আমাকে তিল-তিল করে দগ্ধ করলেও আমি ভ্রষ্ট হব না। আমি অধৃষ্য, অপরাজেয়। আমি অখণ্ডনিশ্চিন্ত।

শঠশিরোমণি পুলিশ তাকে ছেলেভুলুতে চাইল। 'তোমার মা কত কাঁদছেন তোমার জন্যে। তুমি যদি বলে দাও, কথা দিচ্ছি, এক্ষুনি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে পৌঁছে দেব।'

প্রতাপ সিং বললে, 'আমার মা, শুধু একটি মা-ই কাঁদুন। এক মার কান্না থামাতে গিয়ে আরো অনেক মাকে আমি কাঁদাতে পারব না।'

পুলিশের অত্যাচারে প্রতাপ সিং জেলের মধ্যেই মারা গেল।

ট্রেনে করে কটক চলেছে সুভাষ। বাঙ্কে শুয়ে আছে আর গুনগুন করে গাইছে:

'কত কাল পরে বল ভারতরে, দুখসাগর সাঁতারে পার হবে।
অবসাদহিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, এ কি শেষ-নিবেশ রসাতল রে।
নিজবাসভূমে পরবাসী হলে, পর দাসখতে সমুদায় দিলে
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে, বহ লৌহবিনির্মিত হার বুকে।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে, পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে
তুমি অন্ধ হয়ে পরস্বর্গসুখে, তুমি আজও দুখে তুমি কালও দুখে।
পর ভাষণ আসন আনন রে, পর পণ্যে ভরা তনু আপণ রে
পর দীপশিখা নগরে-নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে॥'

বাড়িতে ঢুকেই বৈঠকখানায় জানকীনাথকে দেখে প্রণাম করল সুভাষ।

'তুই? কী খবর?' জানকীনাথ উদ্বেল হয়ে উঠলেন।

সুভাষ স্থির স্বরে বললে, 'কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ রইলেন জানকীনাথ। জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্য কলেজে ভর্তি হওয়া যায় না?'

'অন্য কলেজে ভর্তি হবার অনুমতি চেয়ে ইউনিভার্সিটিতে দরখাস্ত করেছিলাম, সে দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নি।'

'আমি জানতাম তাই হবে।' জানকীনাথ হতাশ মুখে বললেন, 'নেতৃত্ব করতে গেলে এই পুরস্কার।'

সুভাষ বললে বিনম্র কণ্ঠে, 'একজনকে তো নেতা হতেই হবে।'

'এখন তবে কী করবে?'

প্রভাবতী ছেলের সাড়া পেয়ে ব্যাকুল হয়ে চলে এলেন। 'ওরে সুবি এলি? কখন এলি? কী হল?'

জানকীনাথ কঠিন মুখে বললেন, 'ওকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তা ও কী করবে!' প্রভাবতী ছেলেকে আড়াল করে দাঁড়ালেন : 'সকলের হয়ে লড়তে গিয়েছে আগ বাড়িয়ে তাই ওরই উপরে কোপ পড়েছে। এখন কদিন আর বাড়ি থেকে কোথাও বেরুনো নয়। শুধু বিশ্রাম।'

'তোমার এ ছেলে বিশ্রাম বলে কিছু জানে নাকি?' জানকীনাথও ছেলের প্রতি স্নেহপ্রশ্রয়ান্বিত হয়ে উঠলেন : 'দেখবে কোথাও বসন্ত বা কলেরা লেগেছে, অমনি সেবায় বেরিয়ে পড়েছে। তারপর যোগযাগ আছে না? সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়া?'

সুভাষ দু পা কাছে এগিয়ে এল। বললে, 'বাবা, আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দিন

না, সেখানে গিয়ে পড়ি।'

'তার আগে এই রাস্টিকেশনের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হও।' জানকীনাথ সুভাষের মুখের দিকে তাকালেন : 'একটা রাস্টিকেটেড ছেলে বিদেশের কলেজে গিয়ে মুখ দেখাবে কী করে?'

সুভাষের মুখ বেদনার্ত হয়ে এল।

জানকীনাথ পরমুহূর্তেই কথায় স্নেহ ঢাললেন : 'আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ডিগ্রি আদায় করো, তারপর বিলেত।'

সুভাষ ভাবলে, এখন উপায় কী! ভাবলে সরাসবি একবার গিয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করি। স্যার আশুতোষের সঙ্গে নয় শুধু আশুতোষের সঙ্গে। যে আশুতোষ বাঙালি, যে আশুতোষ বদান্য, শিবভদ্র, বিশালস্নেহ, এবং উদারধী। দেখি না কী হয়। কী বলেন! মহতের কাছে যেতে ভয় কিসের? যাজ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।

সরাসরি ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল সুভাষ। ঘরে ঢুকে আশুতোষকে প্রণাম করে দাঁড়াল। বললে, 'আমি আপনার কাছে এলাম।'

আশুতোষ চমকে তাকালেন আগন্তুকের দিকে। 'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ, আমি ইউনিভার্সিটির কাছে আসি নি, হাইকোর্টের কাছেও আসি নি, আমি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এসেছি।'

আশুতোষ যেন চিনতে পারলেন। 'তুমি—তুমি সুভাষ না?'

সুভাষ নীরবে সম্মতি দিল।

আশুতোষ জিজ্ঞেস করলেন : 'এতদিন কী করছিলে?'

'বসেছিলাম। ইউনিভার্সিটি বাধাটা সরিয়ে না নিলে কোনো কলেজে ভর্তি করছে না।'

'তুমি ম্যাট্রিকুলেশানে স্ট্যাণ্ড করেছিলে?'

'সেকেণ্ড হয়েছিলাম।'

'আই-এতে?'

'আই-এতে রেজাল্ট খারাপ হয়েছিল। কিন্তু বি-এটা দিতে দিন ফিলসফি অনার্স নিয়ে, ঠিক ফার্স্ট ক্লাস পাব।'

আশুতোষ তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন : 'কী করে জানলে পাবে?'

সুভাষ অপ্রতিভ হল না। বললে, 'আমার অন্তরপুরুষ বলছে, আমি ঠিক বেরিয়ে যাব, আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

আশুতোষ স্বর গম্ভীর করলেন : 'বাধা তুলে নিলে কোন কলেজ তোমাকে নেবে?'

'স্কটিশচার্চ নেবে আর স্বয়ং আর্কুহার্ট সেখানে ফিলসফি পড়ান।'

'ফের গোলমাল বাধাবে না তো?'

কথায় বুঝি একটু স্নেহের টান পেল সুভাষ, তাই সাহস করে বললে, 'আমি বুঝি মিছিমিছি গোলমাল বাধাই!'

আশুতোষ প্রসন্ন মুখে বললেন 'বেশ, আমি বাধাটা সরিয়ে নেব। কিন্তু—তাই

তো জিজ্ঞেস করেছিলাম এত দিন কী করছিলে?'

'এত দিন!'

'হ্যাঁ, প্রায় দুবছর তো পিছিয়ে পড়লে! বলছিলাম আরো আগে আস নি কেন?'

সুভাষ আরো একটু এগিয়ে এল, বললে, 'বললামই তো আমি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারকে দেখেছিলাম, তার ভেতরের আশুতোষকে চিনতেই দেরি হয়ে গেল।'

'এমন সুন্দর একটা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তুমি নষ্ট করে দিতে বসেছিলে?' আশুতোষ অশীর্বাদ ভরা চোখে তাকালেন : 'কিন্তু মনে থাকে যেন শুধু ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট নয়, সত্যিকারের মানুষ হওয়া চাই।'

'মেবার পতনে'র সেই শেষ গান সুভাষের মনে পড়ল :

'কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ॥'

কুড়ি

স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হল সুভাষ আর পড়াশোনায় মন দিল।

কিন্তু শুধু কলেজী জীবনের একঘেয়েমি নিয়ে তার মন পরিতৃপ্ত হতে চায় না। আগে আগে জনসেবার উদ্দেশ্যে অনাথ ভাণ্ডারের জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষে করেছে, কত প্রত্যক্ষ সেবা করেছে কলেরা আর বসন্ত রুগীদের। লজ্জা নেই ভয় নেই ঘৃণা নেই—মানুষকে সেবা করতে পারছে এই তার আনন্দ—আত্মোৎসর্গের আনন্দ। বাড়ির লোকদের জানতেও দেয় নি সে ভিক্ষে করে, জানতেও দেয় নি কলেরার ইনজেকশান বা বসন্তের টিকে না নিয়েই সে ঐ দুই ভয়াবহ রোগের সম্মুখীন হয়। রুগীর ঘর থেকে ফিরে এসে কাপড় চোপড় বদলাবার কথাও সে মনে রাখে না, হাতও ঠিক মত ধোয় কিনা তার ঠিক নেই। সেবার এমন উন্মাদনা যে নিজের স্বাস্থ্যই বিপন্ন হচ্ছে কিনা গ্রাহ্য করে না। দেশ তো মাটি নয়, দেশ মানুষ। মাটি পেলাম অথচ মানুষ মরে গেল সে স্বাধীনতার দাম কী? স্বাধীনতা মানে শুধু রাজনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তি নয়, ক্ষুধার থেকে মুক্তি, রোগের থেকে মুক্তি, অজ্ঞানের থেকে মুক্তি, সংশয়ের থেকে মুক্তি। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে সর্বাগ্রে চাই পরাধীনতা থেকে মুক্তি, কিন্তু সেইখানেই তপস্যার শেষ নয়। তপস্যার আরম্ভও মানুষে, শেষও মানুষে, মানুষের মহত্তম মঙ্গলে। আদ্য-অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নেই।

রবীন্দ্রনাথকে মনে করো।

'হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ কর। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল থেকে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর। যে চাষী চাষ করে এতক্ষণে ঘরে ফিরেছে, তাকে সম্ভাষণ কর, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরিয়ে এনেছে তাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হয়েছে তাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে যে মুসলমান নমাজ পড়ে উঠেছে তাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বেয়ে ব্রহ্মপুত্রের কূলউপকূল দিয়ে একবার বাংলাদেশের

পূর্ব-পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করে দাও—আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢেলে দিয়েছে, সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকালে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম' গীতধ্বনি এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পরিব্যপ্ত হয়ে থাকে—একবার করজোড় করে নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর :

'বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক
হে ভগবান।'

কলেজে ঢুকে সুভাষ খবর পেল ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ফোর্সে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা ছাত্রবাহিনী গড়ে তুলতে গভর্নমেন্ট অনুমতি দিয়েছে। সুভাষ ঠিক করল এই বাহিনীতে ঢুকবে। আগে একবার খোদ বেঙ্গলী রেজিমেন্টে ঢোকবার জন্যেই সে দরখাস্ত করেছিল। শরীরের আর সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও চোখের দোষের জন্যে সে বাতিল হয়ে গেল। এবার স্বাস্থ্যপরীক্ষায় বোধহয় তত কড়াকড়ি হবে না। তার আগে ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা করি। উনি ইচ্ছে করলে চোখ বুজেই আমাকে নিয়ে নিতে পারেন।

'কাকে চাই?' ঘরে আগন্তুক ঢুকতেই সর্বাধিকারী উৎসুক হয়ে উঠলেন।

'আমি ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারীকে চাই।'

'আমিই ডাক্তার সর্বাধিকারী। কেন, কী দরকার?'

ভেবেছিলেন কোনো অস্ত্রোপচারের কেশ হয়তো, কিন্তু এ ছেলের মুখে একেবারে নতুন কথা।

'নমস্কার।' সুভাষ বললে স্নিগ্ধকণ্ঠে, 'আমি স্কটিশচার্চ কলেজে বি-এ পড়ি। আমি ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ফোর্সের ইউনিভার্সিটি ইউনিটে যোগ দিতে চাই।'

সর্বাধিকারী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন : 'বা, বেশ ভালো কথা। আমি তো বরাবর বাঙালি ছেলেদের বলছি মিলিটারি ট্রেনিং নিতে। সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া দেশের সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না।'

'আমারো সেই মত।'

সর্বাধিকারী পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন সুভাষকে। কী রকম দৃঢ় দৃপ্ত বীর্যবন্ত চেহারা। আর কেমন তেজস্বী কণ্ঠস্বর। এতটুকুও দ্বিধা বা জড়িমা নেই।

'বেশ তো তা হলে ভর্তি হয়ে যাও।'

'আমার স্বাস্থ্যটা পরীক্ষা করে দেখুন।' সুভাষ এগিয়ে এল দুপা : 'যদি ফিট সার্টিফিকেট দেন, তা হলে আমি ইউনিটে ঢুকে পড়ি।'

'তোমাকে তো বেশ সুস্থ-সবলই দেখাচ্ছে । আর জানো, সর্বাধিকারী মৃদু হাসলেন : 'শরীরে যা কিছু রোগ আছে মিলিটারি পোশাক পরলেই তা দূর হয়ে যায়।' এক মিনিটে মন স্থির করে ফেললেন : 'দেখতে হবে না আমি দিচ্ছি তোমাকে ফিট সার্টিফিকেট। ইংরেজই আমাদের আনফিট করে রেখেছে। আমার মনে হয় যে ছেলে কাঁধের উপর

বন্দুক তুলতে পারবে সেই ফিট।'

সুভাষ ভর্তি হয়ে গেল ইউনিটে।

ইউনিফর্ম পরে প্যারেড করছে। কী মুক্তচ্ছন্দ আনন্দ এই পদক্ষেপে—শুধু এগিয়ে চলা, পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে চলা, যত দৈন্য আর ভীরুতা, জাড্য আর জড়তাকে নিষ্পেষিত করে, যত ব্যথা বাধা আর ব্যাঘাতকে বিচূর্ণ করে, যত স্তূপীভূত অশিব জঞ্জালকে ভস্মীভূত করে—শুধু এগিয়ে চলা—আমি অগ্রগ, আমি অযোধ্য, আমি অবার্য। দুঃখের খন্তায় জীবনের কঠিন পাথর কেটে সোনার খনি আবিষ্কার করতে চলেছি। সেই সোনার খনির নাম স্বাধীনতা। দেশের স্বাধীনতা, মানুষের স্বাধীনতা।

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না॥
তরীখানা বইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না
কান্নাকাটি করব না॥
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না
ঘরের কোণে সরব না॥

বেলঘরিয়ায় গিয়ে চাঁদমারি অভ্যেস করছে, মক-ফাইট করছে, শিরায়-শিরায় অনুভব করছে রাজসিক উত্তেজনা, তেজের বহ্নিপ্রবাহ। সেই যে বন্ধু হেমন্তকে লিখেছিল একবার, 'চাই শিরায় শিরায় রজোগুণ, চাই লম্ফের দ্বারা পর্বত উল্লঙ্ঘন'—সেই কথা মনে পড়ছে। শ্রীতে ও শক্তিতে সমন্বিত কী সুন্দর দেখাচ্ছে সুভাষকে। সমস্ত রূপ ছাপিয়ে চরিত্রের বিমলজ্যোতি দিব্য লাবণ্য এঁকে দিয়েছে।

সেই কথাই সেদিন বললে এক সতীর্থ, 'তোকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে সুভাষ।'

লোকমনোহর হাসি হাসল সুভাষ। বললে, 'কোথায় আগে একদিন সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলাম, আজ আবার সৈন্য হতে চলেছি। সন্ন্যাসী আর সৈনিক দুজনকেই মেলাব একসঙ্গে। শুধু সন্ন্যাসী হয়ে আত্মসুখ আত্মমোক্ষ চাইব না, আবার শুধু সৈনিক হয়ে পার্থিব ভোগেই আবদ্ধ থাকব না। যোগ আর যুদ্ধকে একসঙ্গে মেলাব। চাই সন্ন্যাসীর ত্যাগ সৈনিকের কর্মিষ্ঠতা। চাই সন্ন্যাসীর নির্বেদ সৈনিকের দুঃসাহস। আমি সন্ন্যাসী, সৈনিক-সন্ন্যাসী।'

বন্ধু হেমন্তকে লিখেছিল : একদিকে ভগবৎ-তন্ময়তা অন্য দিকে পাশ্চাত্য আদর্শ—কর্মময়তাই জীবন। একদিকে শান্ত ও সমাহিত আত্মদর্শন, আরেকদিকে পাশ্চাত্যদের প্রকাণ্ড লেবোরেটরিতে আবিস্কৃত ও উদ্ভাবিত বিজ্ঞান দর্শন। ইচ্ছে করে ওদের দেশে গিয়ে জ্ঞানার্জনে মজে যাই, জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দেবার আগে জগৎটাকে একবার দেখি—যে কিছু দেখে নি সে মায়া বলে কী করে? যে কিছু অর্জন করে নি সে ত্যাগ করবে কী! দান যে করব সঞ্চয় কোথায়? তখন মনে হয় একবার ওদের কর্মের স্রোতে ঝাঁপ দিই, তারপর দেখি—সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে সেই স্রোতকে চালিত করতে পারি কিনা।

না, পরীক্ষার পড়ায় অবহেলা করে নি সুভাষ, বি-এতে দর্শনে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে। ফার্স্ট হয়েছে প্রেসিডেন্সির সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুবছর দেরি হয়ে গেল সুভাষের। কোথায় ১৯২৭তে বি-এ পাস করবে, তা নয়, ১৯১৯ হয়ে গেল।

কিন্তু বাবা—বাবা ডাকছেন কেন?

'আমাকে ডেকেছেন বাবা?' ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল সুভাষ।

'খবরটা শুনেছ?' জানকীনাথ স্মিতপ্রসন্ন চোখে তাকালেন ছেলের দিকে।

'শুনেছি। পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছি।'

ভেবেছিল বাবা বুঝি এবার ফার্স্ট না হওয়ার জন্যে অনুযোগ দেবেন, কিন্তু একী অভিনব প্রস্তাব! জানকীনাথ প্রশ্ন করলেন : 'বিলেত যেতে চেয়েছিলে না? যাবে?'

সারা শরীরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল সুভাষ : 'যাব।'

'আই.সি.এস পড়ে পাস করে ফিরতে হবে।'

সুভাষ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে গেল : 'আই.সি.এস! ইংরেজদের অধীনে চাকরি।'

'হ্যাঁ, চাকরির মধ্যে শ্রেষ্ঠ চাকরি।' জানকীনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন : 'সমস্ত বাঙালি সমাজের সুখস্বপ্ন! দেখ ভেবে দেখ।'

সুভাষ নতনেত্রে চুপ করে রইল।

'চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি।' বসে ছিলেন উঠে পড়লেন জানকীনাথ। বললেন, 'যদি পড়তে রাজি থাকো, যত শিগগির সম্ভব বেরিয়ে পড়তে হবে। হাতে বেশি সময় নেই। বিলেতে পৌঁছে পড়ে পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে মাস আষ্টেকের মত সময় পাবে। তাই শুভস্য শীঘ্রং। দেখে ভেবে দেখ।' জানকীনাথ চলে গেলেন।

শরৎচন্দ্র এক ধারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল, তাকে উদ্দেশ করে সুভাষ জিজ্ঞেস করল : 'মেজদা, যাব?'

'বা, যাবি বই কি।' শরৎ মুখের থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে নিল : 'এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে?'

'আট মাসের মধ্যে পারব?'

'না পারলে না পারবি।' বিষয়টা সহজ করে দিল শরৎ : 'তোর বিষয় মেণ্টাল মর‍্যাল সায়েন্সে ট্রাইপস নিয়ে আসবি।'

'আর যদি পারি?'

'তখনকার কথা তখন।' আরো সহজ করে দিল শরৎ।

'মেজদা,' আরো যেন একটু সন্নিহিত হবার চেষ্টা করল সুভাষ : 'জালিয়ানওয়ালাবাগে কী সব কাণ্ড ঘটে গেছে শুনছি।'

'ভাসা-ভাসা খবর আসছে।' শরৎ খবরের কাগজটা একটু নাড়ল চাড়ল : 'পাঞ্জাবে মার্শ্যাল ল জারি হয়েছে তাই খবর ঠিক মত আসছে না।'

'ভাসা-ভাসা কী শুনছ?'

'একটা পাঁচিল ঘেরা জায়গার মধ্যে সমবেত স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর উপর উদ্দাম গুলি চালিয়েছে। সভায় লোক যখন আসে তখন বাধা দেওয়া হয় নি, এসে জমায়েত হবার

পরও বলা হয় নি যে চলে যাও, চলে না গেলে গুলি চালাব। কাউকে সতর্ক না করেই সোজাসুজি গুলি বর্ষণ শুরু করে দিল। অ—' শরৎ মধ্য পথে সংযত হল : 'তোমার এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তুমি ছাত্র, তোমার এখন অধ্যয়নই তপস্যা।'

'ঠিক।' সুভাষ চকিতে মন স্থির করে ফেলল। বললে, 'যাই বাবাকে বলি গে। আই.সি.এস. পড়তে বিলেত যাব।'

উনিশশো আঠারো সালের নভেম্বরে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল আর পরের বছর মার্চ মাসেই পাস হয়ে গেল রাউলাট য়্যাক্ট। যুদ্ধবিজয়ের কী পরম পারিতোষিকই ইংরেজ গভর্নমেণ্ট উপহার দিল ভারতবর্ষকে। কী-সব প্রাণারাম বিধান! সন্দেহ হলেই পুলিশ যে কাউকে গ্রেপ্তার করে ইচ্ছামত নির্বাসনে পাঠাতে পারে। সন্দেহের ভিত্তি কী, তা প্রকাশ করবারও তার দায় থাকবে না। আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো উকিল দিতে পারবে না আসামী। আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলবে না। চলবে না সমালোচনা। ক্রূরকর্মা পুলিশেরই ইন্দ্রত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাউলাট কে? এক হাইকোর্টের জজ যে সিডিশন কমিটির চেয়ারম্যান ছিল। জজের নাম দিয়েই আইন প্রণয়ন হল, যেন কত সুবিচারের সৌরভ ছড়িয়ে আছে এর ছত্রে-পত্রে। বিচারের নামে বর্বরতার চূড়ান্ত। গভর্নমেণ্টকে সদবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে সমালোচনা করলেও রাউলাট, কোনো ধর্মীয় কলহ হলেও রাউলাট। যখন যেমন সুবিধে, মুখর কণ্ঠকে স্তব্ধ করো, উদ্যত আয়োজনকে বিধ্বস্ত করে দাও। অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়ো।

'শাসন-সংযত কণ্ঠ, জননি, গাহিতে পারি না গান
তাই মরম-বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ।
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার
কোটি পদাঘাত কোটি অবিচার।
তবু হাসিমুখে বলি বার বার
'সুখী কেবা আর মোদের সমান।
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর
তবু আশে পাশে শত গুপ্তচর
হায় হায় এ কী কঠোর বিধান॥'

না, এই কঠোর বিধানকে প্রতিরোধ করতে হবে। তারই জন্যে তৈরি হল মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ। ছয়ুই এপ্রিল সমস্ত ভারতময় হরতাল ঘোষিত হল।

কিন্তু কদিন আগেই, ৩০শে মার্চ, হরতাল এসে গেল দিল্লিতে। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে একটা ভেণ্ডরকে খাবার বিক্রি করতে বারণ করার থেকেই বেধে গেল হাঙ্গামা। তিল থেকে তাল, শুরু হয়ে গেল পুলিশে জনতায় সংঘর্ষ। পুলিশ গুলি চালাল, জনতার আট জন মারা গেল, আর আহত হল অনেকে।

আন্দোলনে এই প্রথম জনতা জাগ্রত হল। আর কে না বোঝে সার্থক বিপ্লব

জাগ্রত জনতার দ্বারাই সম্ভব। আর এই জনতাকে জাগাবার জন্যেই তিল তিল করে জনে-জনে দিতে হয়েছে রক্তবীজ। জন ছাড়া জনতা কোথায়?

কী আশ্চর্য, এই দিন জেনারেল ডায়ার সস্ত্রীক দিল্লিতে ছিল। জনতার চিৎকার শুনে ভেবেছিল কোনো উৎসব বোধ হয়। ভিড়ের জন্যে গাড়ি থেমে পড়েছিল, থামতেই দুটো লোক গাড়ির পিছন দিকে উঠে পড়ল, বললে, নেমে এস, আজকের দিনে সাহেবদের গাড়ি চড়া নেই। একটা ঘোড়সওয়ার পুলিস এসে তাড়া করল লোক দুটোকে, তারা পালাতেই ডায়ার ড্রাইভারকে বললে, ছোটো। যথাসম্ভব বেগে গাড়ি ছোটাল ড্রাইভার। জলন্ধরে তার গাড়িতে ঢিল পড়ল, পথে আবার কে কাঠ পেতে রেখেছে যদি গাড়িটা ওলটায়। ডায়ার বোধ হয় মনে মনে হাসছিল আর বলছিল, প্রভু, এদের ক্ষমা করো, এরা জানে না এরা কী করছে, কাকে খোঁচাচ্ছে।

ছয়ুই এপ্রিল লাহোরের হরতাল নিদারুণ সফল হল, সব দোকানপাট বন্ধ, সমস্ত অফিস-আদালত পক্ষাহত। কালো নিশানধারী মিছিল চলল সারাদিন। মুখে শুধু এক বুলি, 'কিং জর্জ মরে গেছে।' আর সাহেব দেখলেই গালাগাল। গুলিগোলা নেই, গালাগালই গুলিগোলা।

গান্ধী তখন বম্বেতে, দিল্লি কেন তাঁর নির্দেশ অমান্য করে হিংসাত্মক কাজ করল, কেন নিষ্ক্রিয় থাকল না, তলিয়ে দেখবার জন্যে বম্বে থেকে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করলেন। গান্ধীকে যেতে দিলে গভর্নমেন্টের ভালোই হত, দিল্লির বিক্ষুব্ধ জনতাকে তিনি অনায়াসে শান্ত করতে পারতেন, কিন্তু ইংরেজের কী দুর্মতি হল, পাঞ্জাবের ছোট লাট মাইকেল ওডায়ার গান্ধীর গতিরোধ করলে। পালওয়াল স্টেশনে তাঁর পর হুকুমজারি হল, দিল্লিতে যেতে পারবে না, অবিলম্বে বম্বে ফেরত যাও। সত্যাগ্রহী গান্ধীকে ফেরত যেতে হল।

এটাও একরকম গ্রেপ্তার ছাড়া আর কী। সারা ভারতে রাষ্ট্র হয়ে গেল গান্ধীজি গ্রেপ্তার হয়েছেন। খবর পেয়ে আমেদাবাদ খেপে গেল, খেপে গেল লাহোর, কসুর, অমৃতসর। আর অমৃতসরই তীর্থোত্তম।

অমৃতসরে ৬ই এপ্রিল নিরুপদ্রবে কাটল। কাটল ৭ই, ৮ই। নয়ুই হিন্দুদের রামনবমী, মুসলমানের দেওয়া জল হিন্দু তৃষ্ণার্তরা অঞ্জলি ভরে পান করছে, দেখে ইংরেজ শাসকদের চক্ষু ছানাবড়া। এ যে 'ডিভাইড য়্যাণ্ড রুল'-এর কাটান মন্ত্র প্রয়োগ করা হল। হিন্দু-মুসলমান যদি পৃথক না রাখা যায় তবে ইংরেজের থাবা জোরদার হয় কী করে? এ কাটান মন্ত্র কাদের? কিচলু আর সত্যপালের। দুজনেই ডাক্তার। তাই অভিনব দাওয়াই বের করেছে দুজনে। ভারতবর্ষে এ ওষুধ ধরলে একদিনেই ইংরেজ রাজত্বের অবসান।

সুতরাং ও দুজনকে বন্দী করো। এমনি সাড়ম্বর উদ্যোগ করে প্রকাশ্যে ওদের গ্রেপ্তার করলে জনসাধারণ খেপে যাবে। তার চেয়ে ওদেরকে নেমন্তন্ন করে ফুসলিয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয় নিয়ে এস, তারপর গাড়ি করে ওদের পাঠিয়ে দাও দূর অন্তরীন আবাসে।

ডেপুটি [illegible] আরভিং সাকাল আটটায় নেমন্তন্ন পাঠাল যেন বেলা দশটায় ররা তার বাংলোয় আসে, স্বার্থে কী এক জরুরি কথা আছে। ছলনা না বুঝে সরল বিশ্বাসে সত্যপাল আর [illegible]সময়ে বাংলোয় এসে পৌঁছুল, আরভিং

ওদের বললে, গাড়ি প্রস্তুত, এই মুহূর্তে ওদের অমৃতসর ত্যাগ করতে হবে। হ্যাঁ, এই দেখুন পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের হুকুম।

সত্যপাল আর কিচলুকে আলাদা গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে গেল পুলিশ।

খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। অমৃতসর আগুনের সরোবর হয়ে উঠল। সকলের মুখে এক বুলি: বেইমান কোথাকার! বাড়িতে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে গ্রেপ্তার করে! চলো ডেপুটি কমিশনারের বাড়ি চলো। আমাদের নেতাদের ফিরিয়ে দিক। নইলে, চলো, ওটাকে আমরা কচুকাটা করব।

মুসলমানের জন্যে হিন্দু বলছে, হিন্দুর জন্যে মুসলমান। জনতা চলল বাংলোর দিকে। চিৎকার ছাড়া যাদের এখনো কোনো অস্ত্র নেই, সেই নিরীহ জনতার উপর গুলি চালাল পুলিশ। আর দেখতে হল না, আগুনের সরোবর আগুনের সমুদ্র হয়ে উঠল। জনতা পুড়িয়ে দিল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, ম্যানেজার আর এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, যথাক্রমে স্টুয়ার্ট আর স্কটকে খুন করলে। ফার্নিচারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ওদের দেহ দুটোকেও পুড়িয়ে মারল। এলায়েন্স ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জি.এস. টম্পসন রিভলভার খুলে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল, তাকে দোতলার বারান্দা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল নিচে, আর কেরাসিন ঢেলে আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে সুন্দর সৎকার করলে। ব্যাঙ্কের দালানটা পোড়াল না কেননা ওটার মালিক ভারতীয়। চাটার্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জে. ডবলিউ. টম্পসনের খোঁজ পেল না জনতা, কেননা তাকে তার ব্যাঙ্কের কেরানিরা সরিয়ে দিয়েছে।

'গুলি খেয়েছে ঠিক হয়েছে।' জনতাকে উদ্দেশ করে এ কথা, আর কেউ নয়, একজন ইংরেজ মহিলা বললে। জেনানা হাসপাতালের ডাক্তার, মেরি ইসডন, ভয়ে কোথায় ইঁদুরের গর্ত খুঁজবে, তা নয়, দোতালার বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলছে, 'ঠিক করেছে গুলি মেরেছে।' আর যায় কোথা! জনতা দাবি করে বসল, ওকে ফেলে দাও নিচে, ঠিক করা কাকে বলে ওকে দেখিয়ে দি। ইসডন তখন ভয় পেল, আরেক মেয়ে-ডাক্তারের ঘরে গিয়ে লুকোল। এদিকে হাসপাতালের গেট ভেঙে জনতা উঠে এল দোতালায়—ইসডন কোথায়? নেলি বেঞ্জামিন, আরেক মেয়ে-ডাক্তার, যার ঘরে ইসডন লুকিয়েছিল, কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, বললে, বিশ্বাস করো ইসডন হাসপাতালে নেই! জনতা বিশ্বাস করল, ছেড়ে দিল বেঞ্জামিনকে, ইসডনের জন্যে বসে থাকল না।

কিন্তু কতগুলো দুর্বৃত্ত মার্সেলা শেরউডকে মারলে। সিটি মিন স্কুলের লেডি সুপারইণ্টেণ্ডেণ্ট, সাইকেল করে যাচ্ছিল স্কুলের দিকে, কতগুলো লোক তাকে তাড়া করল। তাকে ফেলে দিল সাইকেল থেকে। ছুটে ঢুকতে যাচ্ছিল একটা বাড়িতে, সেই বাড়ির দরজা তার মুখের পর বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তায় মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল শেরউড। তারই এক পাঞ্জাবি ছাত্রীর বাবা রাতের অন্ধকারে তাকে তুলে নিয়ে গেল বাড়িতে ও লুকিয়ে রাখলে।

আর এ সমস্তেরই নির্দয়তম প্রতিশোধ জালিয়ানওয়ালাবাগ।

আরো আছে ইংরেজের কলঙ্ক। যেখানে শেরউডকে আক্রমণ করা হয়েছিল সেখানে মোতায়েন হল। আদেশ হল যে এখান দিয়ে যাবে তাকে পশুর মত চার

পায়ে মানে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। সাহেব দেখলেই সেলাম করতে হবে। আদেশ অমান্য করলেই বেত।

শেরউডকে মেরেছে সন্দেহ করে কত লোককে ধরে এনে যে এ প্রকাশ্য স্থানে বেত মেরেছে তার লেখাজোখা নেই। বিচারের একটা আবরণ পর্যন্ত নেই, সন্দেহের উপরেই খোলাখুলি বেত। আর কখনো-কখনো সে বেত উলঙ্গ করে। এর কোনো উপায় নেই? কোনো প্রতিকার নেই? কেউ কিছুই করতে পারবে না? কোনো উত্তর দিতে পারবে না?

উত্তর দিলেন, দিতে পারলেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশশো উনিশের তিরিশে মে তিনি তাঁর নাইটহুড ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বড় লাটকে লিখলেন:

'কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করবার উপলক্ষে পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করেছেন তার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পেয়ে ভারতীয় প্রজার নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছে। হতভাগ্য পাঞ্জাবিদের যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে তার অপরিমিত কঠোরতা ও দণ্ডপ্রয়োগবিধির বিশেষত্ব সমস্ত সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনারহিত। যখন চিন্তা করা যায়, যে-প্রজাদের উপর এরূপ বিধান করা হয়েছে, তারা কত নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল ও যাঁরা এরূপ বিধান করেছেন তাঁদের লোকহননব্যবস্থা কী নিদারুণ নৈপুণ্যশালী, তখন এ কথা আমাদের জোর করেই বলতে হবে যে এমন বিধান পোলিটিক্যাল প্রয়োজন বা ধর্মবিচারের দোহাই দিয়ে নিজের সাফাই গাইতে পারে না। পাঞ্জাবি নেতারা যে অপমান ও দুঃখ ভোগ করেছেন, নিষেধরুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করেও তার খবর ভারতের দূর দূরান্তে ব্যাপ্ত হয়েছে। সর্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনাময় ধিক্কার জেগেছে আমাদের কর্তৃপক্ষ তাকে উপেক্ষা করেছেন এবং সম্ভবতঃ এই কল্পনা করে তাঁরা আত্মশ্লাঘা বোধ করছেন যে এতে আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হল।...যখন দেখা গেল আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হয়েছে, যখন দেখা গেল প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আমাদের গর্ভনমেণ্টের রাজধর্মদৃষ্টি অন্ধ করেছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্মনিয়মের অনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গভর্নমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কাজ ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণকামনায়, আমি এইটুকু মাত্র করবার সঙ্কল্প করেছি যে, আমাদের বহু কোটি যে ভারতীয় প্রজা আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হয়ে গিয়েছে তাদের আপত্তিকে বাণীদান করবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করব। আজকের দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলো চারদিকের জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করে প্রকাশ করেছে। অন্তত আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলতে পারি, আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাদের অকিঞ্চিৎকরতার জন্যে লাঞ্ছিত হয়ে মানুষের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করবার অধিকারী বলে গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মানচিহ্ন বর্জন করে আমি তাদেরই পাশে নেমে দাঁড়াতে ইচ্ছে করি।'

'আজি এ ভারত লজ্জিত হে
হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে,
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা

কঠিন তপস্যা সত্য সাধনা
অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে
সকলি ব্রহ্ম-বর্জিত হে।
পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে
জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে
পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে
হইবে পলকে সজ্জিত হে॥'

একুশ

শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে এসে পৌঁছুল সুভাষ: একে মন্থর জাহাজ, তাতে ইংলণ্ডে কয়লা-ধর্মঘটের জন্যে সুয়েজ-এ পৌঁছে জাহাজ বন্ধ হয়ে গেল। লঙ্কায় রাবণ মরলে বেহুলার কী আসে যায়? ইংলণ্ডে ধর্মঘট হলে সুয়েজ খালের স্রোত বন্ধ হতেই হবে, জাহাজে কয়লা নেই।

লণ্ডনে পৌঁছেই সুভাষ কেমব্রিজে ছুটল, সেখানে ভর্তি হবার আশা আছে শুনে। ফিটজ উইলিয়ম হলে জায়গা পেল। আর ঘরে ঢুকল কিনা সব চেয়ে প্রত্যাশিত বন্ধু দিলীপকুমার।

'আরে দিলীপ, এস এস।' সুভাষ লাফিয়ে উঠল।

'তারপরে সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল?' দিলীপ বসল একটা চেয়ারে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, 'যাক, ভর্তিও হতে পারলে আর থাকবার জায়গাও মিলে গেল।'

'উঃ, কটা দিন কী ধকল গেল!' সুভাষ প্রীতিস্নাত মুখে বললে, 'তোমার সাহায্যে থাকবার জায়গা পেলাম আর সত্যেন ধর—আমাদের কটকের সত্যেন ধর—সেই আমাকে ভর্তি হতে সাহায্য করল। নিয়ে গিয়েছিল প্রভোস্ট রেডএওয়ের কাছে।'

'রেডএওয়ে কী বললে?'

'ভর্তি করতে চায় না। বললে, তোমার দেরি হয়ে গেছে। চলতি টার্ম দুসপ্তাহ আগেই শুরু হয়ে গেছে। তুমি এখন তা ধরবে কী করে?'

'তুমি কী বললে?'

'বললাম, আমার দেরির জন্যে আমি দায়ী নই,' হাসল সুভাষ: 'তোমরা দায়ী, তোমাদের দেশ দায়ী।'

'সে কী? কী করে?'

'রেডএওয়েও এমনি প্রশ্ন করেছিল। বললাম, 'আমাদের জাহাজ সুয়েজে এসে আটকে রইল, কয়লা নেই। কয়লা নেই কেন? ইংলণ্ডে কয়লাখনিতে স্ট্রাইক হয়েছে। তাই তো আমার জাহাজ আসতে দেরি করল। তাই এই দেরির দোষ আমার নয়, তোমাদের।'

'রেডএওয়ে কী বলল?'

'হাসল বটে কিন্তু নরম হল না।'

'তবে নরম হল কিসে?' দিলীপ কৌতূহলী হল।

'নরম হল যখন বললাম আমার মিলিটারি ট্রেনিং আছে। বললে, 'বটে! তুমি

মিলিটারি ট্রেনিং নিয়েছ? তা হলে আর কথা নেই।' বিজয়ীর হাসি হাসল সুভাষ: 'ভর্তি করে নিল।'

'ও কী ভাবল?'

'ভাবল বোধহয় ওদের হয়ে যুদ্ধ করব। ওদের জন্যে ভারতবর্ষের পরাধীনতা চিরস্থায়ী করে রাখব।'

দিলীপ স্বরে একটু পরিহাস মেশাল: 'আই. সি. এসদের আর ব্রত কী। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন অবিনশ্বর করে রাখা!'

'কে হবে আই.সি.এস?' সুভাষ বৈরাগ্যের ছবি আঁকল মুখে।

'তার মানে?'

'মানে, পরীক্ষাই পাশ করতে পারব না।' ক্লিষ্টস্বরে সুভাষ বললে, 'একরাজ্যের বিষয়, এত পড়বই বা কখন! পরীক্ষা হতে আর মোটে আট মাস বাকি।'

দিলীপ সুভাষের পিঠ চাপড়ে দিল: 'তা তুমি একবার কাজ হাতে নিলে উদ্ধার করে ছাড়বেই।'

'পড়ব বলে যখন এসেছি তখন ফাঁকি দেব না।' গম্ভীর মুখে সুভাষ বললে, 'আপ্রাণ চেষ্টা করব। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে এই অল্প সময়ের মধ্যে পারব কিনা।'

'কিন্তু যদি পারো?' দিলীপের চোখ গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'যদি আই.সি.এস চাকরিটা পাও?'

'চাকরি করব না।' পিঠ-পিঠ উত্তর দিল সুভাষ: 'চাকরি ছেড়ে দেব।'

হো-হো করে হেসে উঠল দিলীপ। বললে, 'পাবার আগে বলা সোজা। পাবার পর—'

'ঠিক বলেছ।' সুভাষ নম্রস্বরে বললে, 'যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ এ কথার কোনো দাম নেই।'

'চলো বেড়িয়ে আসি।' দিলীপ টানল সুভাষকে।

'চলো।'

দুবন্ধুতে শহরের রাস্তায় ঘুরছে। হঠাৎ থেমে একটা সু-বয়-এর কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল সুভাষ। তার ডান পা-টা বাড়িয়ে ধরল। সু-বয় জুতো বুরুশ করতে লাগল।

'দেখতে কী রকম লাগছে,' সুভাষ বললে দিলীপকে, 'একটা সাহেব আমার জুতো বুরুশ করছে!'

দিলীপ উত্তর দিল: 'বিলেত দেশটা মাটির আর সাহেবগুলো নিতান্তই মানুষ।'

'কিন্তু ওকে তুমি আই.সি.এস নমিনেশান দিয়ে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দাও, দেখবে ও হাতে মাথা কাটবে।'

'কিংবা আরেকটা জালিয়ানওয়ালাবাগ করে তুলবে।'

'দিলীপ, মনে করিয়ে দিও না।' সুভাষের মুখে-চোখে আর্তি ফুটে উঠল, বললে, 'ভারতবাসীর জীবন ওদের কাছে ধুলোর চেয়েও তুচ্ছ। নিজেরা হয়তো একটা জুতো-বুরুশের চেয়ে বেশি নয়, কিন্তু কী স্পর্ধা, কী ঔদ্ধত্য! লেবর-লিডাররা ঠিক বলেছেন যে যে-দেশ অমৃতসরের হত্যালীলা সহ্য করে সে-দেশ ঐ হত্যালীলারই উপযুক্ত।' ডান পা-টা হয়ে যাবার পর বাঁ পা-টা বাড়িয়ে দিল সুভাষ: 'কিন্তু এর প্রতিকার কী? যাই বলো,

খুব করে পড়ে আই.সি.এস-টা পাশ করে ফেলি—'

'কিন্তু প্রতিকার কী তা তো বললে না। বিপ্লব?'

'সে তো তুমিও জানো আমিও জানি।' সুভাষ বললে দৃপ্তকণ্ঠে, 'কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব। বিপ্লব তো শুধু দেশের মুক্তির জন্যে নয়, মানুষের মুক্তির জন্যে। দারিদ্র্যের থেকে মুক্তি, ক্ষুধার থেকে, অজ্ঞানের থেকে, অস্বাস্থ্যের থেকে মুক্তি।'

দিলীপ বললে, 'কিন্তু মুক্তির আরেকটা বড় অর্থও তো আছে—মানুষের পার্থিব জন্মের নিহিতার্থকে প্রকাশ করা, অর্থাৎ কিনা, মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেবতার উদ্ঘাটন ঘটানো—'

'নিশ্চয়ই।' মেনে নিল সুভাষ, 'কিন্তু ভাই প্রথম জিনিস প্রথম, কিংবা দুটো জিনিসই একসঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দ যে বলতেন ভারতের উন্নতি চাষা ধোপা মুচি মেথরদের দ্বারা হবে, ঠিকই বলতেন। 'পাওয়ার অফ দি পিপল' কী করতে পারে দেখাল রাশিয়া। ভারতের উন্নতি যদি কোনোদিন হয় সেটা আসবে ঐ 'পাওয়ার অফ দি পিপল'-এর মধ্য দিয়ে।'

ও দিকে দেশে বিপ্লবীদের খবর কী? খবর আর যাই হোক, রংপুরের শচীন দাশগুপ্তের মৃত্যুর কথা ভোলা যায় না। আঠারো বছরের ছেলে, কলকাতায় বি-এ পড়ছে, পুলিশ তাকে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার করল। আছে ভারতরক্ষা আইন, সুদূর এক গ্রামে তাকে অন্তরীন করা হল। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে তার বাবা পুলিশের কাছে মুচলেকা সই করে নিয়ে এল তাকে বাড়িতে। অর্থাৎ পুলিশ তাকে গৃহবন্দী থাকতে অনুমতি দিল। বাড়ির চার দিকে একটা গণ্ডি টেনে দিল, তার বাইরে পদার্পণ করতে পারবে না। কলেজে পড়া? না। লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়া? না। লাইব্রেরি থেকে বই আনা? না। বিকেলবেলা মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা? না। বাড়ির সংলগ্ন জমিটুকুতে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অন্য কিছু খেলা? না। বাইরের কারু সঙ্গে কথা বলা? কদাচ না।

অপরাধ? অপরাধ জানা থাকলে তো জেলেই পুরতাম, জানা নেই বলেই তো গৃহবাসী থাকবার সুবিধে করে দিয়েছি। সুবিধে? দিনে দিনে তিলে তিলে এ জীবনভার কি বহনদুষ্কর হয়ে উঠছে না? এভাবে কোনো মানুষ বাঁচতে পারে? কোনো যুবক বাঁচতে পারে? খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠত শচীন। কিন্তু সেদিন উঠল না। বাইরে থেকে মা দরজায় ধাক্কা দিলেন। কোনো সাড়া নেই। শচীন, শচীন, দরজা খোল। দরজা নিষ্ঠুর নীরব। দরজা ভেঙে ফেলা হল, দেখা গেল দুধের সঙ্গে আফিং গুলে খেয়ে শচীন সমস্ত খাঁচার বাইরে চলে গিয়েছে।

পুলিশের কাছে লিখে গিয়েছে চিঠি : 'এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে আর আমাকে কেউ খুঁজবে না, জ্বালাবে না, পিছু নেবে না।'

কী মর্মস্পর্শী সেই মৃত্যু, সেই চিঠি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ চঞ্চল হলেন। লেখনী ধরলেন ব্রিটিশ শাসনের বর্বরতার বিরুদ্ধে। 'ছোট ও বড়'-ই তো সেই প্রবন্ধ।

রাধানাথ প্রামানিককে মনে আছে? গার্ডেনরিচ ডাকাতি মামলায় সাত বছর জেল হয়েছিল। জেলে দুবছর থাকবার পর তার চোখে অসুখ করল। জেল-সুপারকে বললে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিন। সুপার বললে, ওরকম ডাকাত আর খুনেদের অন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত।

রাধানাথ প্রতিজ্ঞা করল জেলের মধ্যে গভর্নমেন্টের কোনো চিকিৎসাই সে নেবে না। শুধু চোখের অসুখের নয়, যে কোনো অসুখের। তাই কদিন পরে আর যখন রক্ত-আমাশা হল সে সকল চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করলে। ফলে কদিন পরেই সে মারা গেল। বাইশ বছরের ছেলে রাধানাথ আত্মসম্মানের বেদীতে প্রাণ উৎসর্গ করল।

ভবানীপুর কাঁসারিপাড়ার এক বাড়িতে বিপ্লবী তারিণী মজুমদারকে ঘিরেছিল পুলিশ। পালাবার রন্ধ্র পর্যন্ত খোলা রাখেনি, তারিণী একতলার ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল। বেকাদায় পড়ার দরুন ডান পা-টা ভেঙে গেল। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা, তবু মাথা ঠিক বুদ্ধি বাতলাল। একটা খোঁড়া ভিখিরি সাজলে কেমন হয়? পরনের জামা-কাপড় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ভিখিরির পোশাক বানাল তারিণী। আর পায়ের পঙ্গুত্ব তো অমোঘ সত্য। দিব্যি খোঁড়া ভিখিরি সেজে পুলিশের ব্যূহ পার হয়ে গেল, কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করল না।

কিন্তু ধরা পড়ল ঢাকায়, কলতাবাজারে, তার বন্ধু নলিনীকান্ত বাগচির সঙ্গে! ধরা পড়ল মানে ওদের মৃতদেহ ধরা পড়ল। যে বাড়িতে দুবন্ধু আশ্রয় নিয়েছিল ভোররাত্রি থেকে পুলিশ তাকে ঘিরল। বহির্গমনের সূচ্যগ্র পথ নেই। এভাবে আচ্ছাদিত হয়ে ধরা পড়তে রাজি নই, এস আমরা যুদ্ধ করি। দুবন্ধু পুলিশের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল, পুলিশও জবাব দিল। কতক্ষণ গুলি চালাবে তোমরা, কত তোমাদের গুলি, কত তোমাদের সৈন্য? সংখ্যায় আমরা দুজন কিন্তু আমাদের দেহের প্রতি রক্তকণিকাই অগ্নিবর্ষী গুলিগোলা, আর আমাদের উৎসর্গীকৃত প্রাণই আমাদের জয়কেতন। আমাদের এই তপ্ত উৎসর্গই আমাদের মাকে জাগাবে, অসুরনাশিনী তামসী মহাকালী। দেরি নেই শুনতে পাবে সেই অট্টহাস, সেই উচ্চনাদ, তোমাদের ঘনীভূত জড়ত্ববোধ দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে যাবে। মহতী জনশক্তিই সেই মহাকালী।

পুলিশের দিকে কনস্টেবল পতিরাম সিং মারা গেল, আহত হল সাব-ইনস্পেক্টর আর এদিকে বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দিলে অপরাভূত দুই বন্ধু, নলিনী আর তারিণী। সমগ্র অসুরশাসনকে উৎখাত করতে পারেনি বটে কিন্তু একটা করাল অসুর, যার নাম ভয়, তাকে নিধন করেছে।

বিপিন পালের গানটা মনে করো :

'আর সহে না, সহে না, জননী, এ যাতনা আর সহে না,
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন পড়ে থাকি প্রাণ চাহে না।
তুমি মা অভয়া জননী যাহার
কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার
দানবদলনী ত্রিদিবনাশিনী করাল-কৃপাণী তুমি মা।
উর মা আজিকে সেরূপে পরাণে
ডাকি মা কালীকে ডাকি মা সঘনে
শোণিততরঙ্গে মাতি রণরঙ্গে মাভৈঃ বাণী আজি শোনা মা,
বিনে তোর কৃপা, বিনে তোর কৃপাণ, ভারত-বন্ধন ঘোচে না॥'

বিপক্ষপক্ষ ক্ষয়ের কোনো ঘটনা নেই? আছে। বগুড়া ডিটেকটিভের হরিদাস মৈত্র বুকের উপর সরল গুলি খেয়ে মারা গেছে। একটা বাড়িতে এক বিপ্লবী যুবক লুকিয়ে আছে খবর পেয়ে হরিদাস তাকে গিয়েছিল ধরতে। কোনো গৌরচন্দ্রিকা না করেই

গুলি ছুঁড়ল যুবক। সত্যিকার কার সে দাস হরিদাসকে স্মরণ করতেও সময় দিল না, গুলি করে মেরে সেই অজানা বিপ্লবী অজানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কেউ তার ছায়া পর্যন্ত খুঁজে পেল না।

এ সব কোনো দিকে চোখ ফেরাবার সময় নেই সুভাষের। সে ঘরে বসে একমনে পড়ছে— পরীক্ষা যখন দেবেই ফেল করা কোনো কাজের কথা নয়। ফেল তো চেষ্টা না করেও করা যায়। যখন চেষ্টা করছিস, পাস না করার কোনো মানে হয় না। ঘরে বসে পড়েছে সুভাষ, টেবিলের চারদিকে বই-খাতা ছড়ানো, একটি পাঞ্জাবি ছাত্র ঘরে ঢুকল।

'আসতে পারি ?'

'আরে এস এস।' সুভাষ বন্ধুতায় প্রসারিত হল।

'বাই জোভ! এখন সবে সন্ধে, এক্ষুনি পড়তে বসেছ কী।' পাঞ্জাবি ছাত্র টেবিলের দিকে এগিয়ে এল।

সুভাষ ক্লিষ্টমুখে বললে, 'না ভাই, হাতে বেশি সময় নেই।'

'সমস্ত জীবনভোরই তো সময় নেই।' পাঞ্জাবি ছাত্র হালকা সুরে হেসে উঠল: 'তাই তো যতটুকু সময় আছে ফুর্তি করে নাও।'

সুভাষ ছোট্ট একটি শব্দে কঠিন উত্তর দিলে : 'না।'

পাঞ্জাবি ছাত্র সুভাষের হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল : 'চলো চলো কত নাচ কত গান কত মেয়ে—'

সুভাষ হাত শক্ত করল। বললে, 'না, ছাড়ো, আমাকে পড়তে দাও।'

গীতায় অর্জুনকে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ, নিশ্চয়ই মন দুর্নিগ্রহ এবং স্বভাবতই চপল, কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা এ মনকে নিগৃহীত করা যায়। সুভাষ তাই অচঞ্চল, অনন্যনিষ্ঠ।

একটা ঘরে সেই পাঞ্জাবি ছাত্রটি কজন বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে হৈ-হুল্লোর করছে। পাঞ্জাবি ছাত্র নাচছে ও হাল্কা ধরনের গান গাইছে, বাঙালি ছাত্ররা উচ্চরবে তার তারিফ করছে। হঠাৎ দূরে বারান্দায় সুভাষকে দেখা গেল।

দিলীপ এক কোণে বসেছিল, বলে উঠল : 'এই, সুভাষ আসছে।'

পাঞ্জাবি ছেলে আতঙ্কগ্রস্তের মত বললে, 'সুভাষ ? ওরে বাবা!'

অন্যান্য ছাত্রের কণ্ঠস্বর ধীরে-ধীরে স্তিমিত হয়ে এল : 'সুভাষ! সুভাষ!' এবং এক সময়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

সুভাষ এ দিকে আসেনি, অন্যদিক দিয়ে চলে গেছে।

দিলীপ বললে, 'কী পবিত্র গম্ভীর মূর্তি! যেখান দিয়ে যায়, আলো করে যায়।'

পাঞ্জাবি ছেলে শুকনো মুখে বললে, 'ওকে দেখলেই আমি যেন কেন নিস্তেজ হয়ে পড়ি।'

'তার মানেই তোমার মধ্যে পাপ আছে' বললে দিলীপ, 'আর ওর মধ্যে আছে জ্বলন্ত আগুন।'

চরিত্রবলই বল। পবিত্রতাই অভেদ্য দুর্গ। আর উচিত্যসারিতাই রণকৌশল। আর আমি যে সুখে-দুঃখে সমচিত্ত সেইটেই আমার জয়পত্র।

কেমব্রিজে বইয়ের দোকানে দিলীপের সঙ্গে ঘুরছে সুভাষ, বই দেখছে, ঘাঁটছে, পড়ছে। কতক্ষণ পরে তার মনোনীত বইটা দেখা দিয়ে বসল।

'এই যে এই বইটা—' সুভাষ উৎসাহিত হয়ে উঠল: 'আচ্ছা এ বইটার দাম কত?'

'আঠারো শিলিং।'

পকেট থেকে দাম বার করে সুভাষ হঠাৎ থমকে গেল, বললে, 'কিছু কম আছে, বাকিটা কাল দিয়ে গেলে হবে?'

'বেশ তো নিয়ে যান।' দোকানী সময় আরো দীর্ঘ করে দিল : 'দাম পরে সুবিধেমত দিয়ে গেলেই হবে।' দোকানী সানন্দে বই প্যাক করে দিল।

দিলীপ একটু দূরে সরে গিয়েছিল, আবার দুজনে একত্র হয়ে পথ চলতে লাগল।

সুভাষ বললে, 'জানো এমনি অবস্থায় আমার দেশের দোকান আমাকে বিশ্বাস করে বই ছাড়েনি।'

'কেন, কী হয়েছিল?'

'কলেজ স্ট্রিটের এক বইয়ের দোকানে এমনি বই কিনতে গিয়ে দাম কম পড়েছিল। বললাম, বইটা দিন, বাকি দাম কাল দিয়ে যাব। দিলে না। বললে, কাল পুরো দাম দিয়েই বইটা কিনে নেবেন। বিশ্বাস করলে না।'

'আত্মবিশ্বাস নেই বলে পরকেও আমরা বিশ্বাস করতে শিখিনি। এই বিশ্বাস আসে স্বাধীনতার শক্তি থেকে।' দিলীপ দীপ্তস্বরে বললে, 'আমরা যখন স্বাধীন হব, শক্তিমান হব, মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে শিখব তখন আমাদের চরিত্রেও এই বিশ্বাসের ভাবটা আসবে।'

'স্বাধীনতা!' কথাটা একবার মন্ত্রের মত উচ্চারণ করল সুভাষ, তারপর স্বাভাবিক সুরে বললে, 'কিন্তু যাই বলো, ওদের ভারতীয়কে বিশ্বাস ঐ বই পর্যন্তই—'

'তার মানে?'

'ওরা আমাদের বই দিয়ে বিশ্বাস করতে পারে কিন্তু বন্দুক দিয়ে বিশ্বাস করতে রাজি নয়।'

'কেন, কী হল?' দিলীপ যেন নতুন খবর শুনছে এমনি তাকাল সবিস্ময়ে।

'কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ট্রেনিং কোর-এ ভর্তি হতে চেয়েছিলাম, অনুমতি দিলে না।' সুভাষের কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে উঠল : 'যেহেতু সেটা ইংরেজ ছাত্রদের পছন্দ নয়। ঐ ট্রেনিং-এ যারা পাস করবে তারা ব্রিটিশ সেনাদলে অফিসারের পদের যোগ্য হবে। পাছে পাস করে আমরা সেই পদ চেয়ে বসি তাই তাদের দুশ্চিন্তা।'

'ওদের সেনাদলে কে চাকরি করছে!' দিলীপও তপ্ত হল।

'বললাম লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ব্রিটিশ আর্মিতে চাকরি নেব না, শুধু আমাদের ট্রেনিংটা দেওয়া হোক।' বললে সুভাষ, 'ওরা রাজি হল না কিছুতেই। সেক্রেটারি অফ স্টেট মণ্টেগুর সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করলাম, কোনো ফল হল না। পাছে যুদ্ধ করতে শিখে ফেলি তাই ওদের ভয়।'

'রবীন্দ্রনাথ কী সুন্দর বলেছেন', দিলীপ হঠাৎ কবিতা আবৃত্তি করে উঠল : 'অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু—'

'ভারতবর্ষের রণগুরু কে?' সুভাষ আপন মনে বলে উঠল : 'কোথায়?'

দিলীপ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : 'এই আমার চোখের সামনে।'

সুভাষ হাসল। বললে, 'আপাতত সংগ্রাম তো দেখছি শুধু পরীক্ষার সঙ্গে। পরীক্ষা পাস করেই বা কী! স্বাধীনতা কোথায়? তুমি তো আবার ধর্মের কথা বল। পরাধীনের আবার ধর্ম কী! পরাধীনের পক্ষে স্বাধীনতা-অর্জনই একমাত্র ধর্ম।'

'ধর্ম তো তুমিও মানো। তুমি তো সন্ন্যাসী হয়েছিলে—'

'হয়েছিলাম!'

'হয়েছিলাম কী, এখনো আছ।'

'বলো, এতে আমি চটি না। সন্ন্যাসী হতে পারা তো গৌরবের কথা', সুভাষ গম্ভীর হল : 'আমার কথা হচ্ছে আগে সৈনিক পরে সন্ন্যাসী। কী বলছেন, বিবেকানন্দ? বলছেন, আগে রাজঃশক্তির উদ্দীপন কর, তারপর পরজীবনে মুক্তিলাভের কথা তাদের বল। আগে ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করা, উত্তম অশন বসন, উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কী করে মুক্ত হতে পারবে তা বলে দে।'

দিলীপ আনন্দিত হয়ে উঠল। বললে, 'বিবেকানন্দ চোখের সামনে জাজ্বল্যমান থাকলেই যথেষ্ট; তিনি বাইরেরও প্রেরণা, ভিতরেরও প্রেরণা।'

'তাই এমন দীক্ষা চাই যাতে ভারতশ্মশানের শবেরাও জেগে ওঠে।'

অশ্বিনী দত্তের গানটা মনে আছে?

'শ্মশান তো ভালোবাসিস মাগো
তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি?
দেখ্ সে হেথা কী হয়েছে
ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে
কত ভূত-বেতাল নাচে, রঙ্গে-ভঙ্গে করে কেলি।
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি ওটা ফেলি।
আয় না হেথা নাচবি শ্যামা
শব হব শিব পা ছুঁয়ে মা
জগৎ জুড়ে বাজবে দামা দেখবে জগৎ নয়ন মেলি॥'

বাইশ

হাতে বিলেত থেকে পাঠানো কেব্‌ল, শরৎচন্দ্র জানকীনাথের ঘরে ঢুকল। 'বাবা, সুভাষ আই.সি.এস. পাস করেছে।' আনন্দের স্রোত ঢেলে দিল শরৎ।

'পাস করেছে?' জানকীনাথ চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, বিলেত থেকে কেব্‌ল এসেছে সুভাষ ফোর্থ হয়েছে।'

'ফোর্থ হয়েছে?' জানকীনাথ আনন্দে অভিভূত হলেন : 'তোর মাকে ডাক। তোর মাকে খবর দে।'

বাড়িতে এত উৎসবের ঘটা, ওদিকে কেমব্রিজে সুভাষের ঘরে বিষাদ আর দুশ্চিন্তার মালিন্য। পাস করেছে, ভালো ভাবে পাস করা মানেই সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাওয়া,

বাঞ্ছিতার্থ লাভ করা, তবে আবার দ্বিধা কেন, দ্বিপ্রকার কেন? চাকরি পেয়ে আবার ছেড়ে দেয় কে? এই তো চেয়েছিলে, এরই জন্যে তো এসেছিলে, এরই জন্যে তো বিদ্যার পরিচর্যা করেছিলে, করেছিলে নিষ্ঠার শুশ্রূষা, তবে এখন আবার বৈমুখ্য কেন? হাতের লক্ষ্মীকে কে আবার পায়ে ঠেলে? সম্পৎস্বরূপাকে, সুখদৃশ্যা সুস্থিরযৌবনাকে কে ফিরিয়ে দেয়?

কিন্তু না, ইংরেজের গোলামি করব না।

গোলামি বলছ কী! শহরে-গ্রামে সদরে-মফস্বলে মহকুমা-জেলায় তুমিই তো একপতি হবে, সে কী মহিমা, কী মর্যাদা! সবাই তোমাকে ঊর্ধ্বনেত্রে দেখবে আর তুমি অনুভব করবে সবাই তোমার চেয়ে দরিদ্র, অভাজন। তুমিই একমাত্র স্বর্গপ্রসৃত, ঈশ্বরপ্রেরিত। জীবনের এই গরিমাময় আস্বাদ কটা লোকের ভোগে আসে? এই অমৃতফলের জন্যে লোকে কত জন্ম তপস্যা করে আর তুমি তা অর্জন করে ত্যাগ করবে? মানুষে বলবে কী।

মানুষের বলায় কী আসে যায়? আমার বিবেক কী বলছে সেইটেই শোনবার মত। আমার বিবেক বলছে যাতে আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হবে, দেশের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হবে, তা আমি গ্রহণ করতে পারি না। একটা বিদেশী শাসনের প্রতি যে অপ্রতিবাদ আনুগত্য দেখাতে হবে তাতে আমার জীবনের আদর্শ অক্ষুন্ন থাকবে কী করে? আমার চাকরি বড় না আদর্শ বড়?

ছেলেমানুষি কোরো না। এ চাকরিতে শুধু প্রতাপের প্রদীপই জ্বলে না, আছে আবার আরামের শীতলতা। মোটা মাইনে মোটা পেনসন, গাড়ি বাড়ি নারী, যা মানুষের কাম্য। অবিচ্ছিন্ন স্বাচ্ছন্দ্য, রমণীয় নিশ্চিন্ততা।

আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই না। সংগ্রাম ছাড়া বিপদ ছাড়া জীবনের আবার স্বাদ কী। আমি বিপন্নয় হয়ে বাঁচতে চাই। নিশ্চিন্ততার স্রোতে গা ভাসিয়ে একটি স্ফীতকায় আলস্য হয়ে আমি বাঁচতে চাই না।

তুমি কী বলছ মাথামুণ্ডু কারু বোঝবার সাধ্য নেই। এ চাকরি নিয়ে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে কত মেয়ে তোমার কণ্ঠে বরমাল্য দিতে আসবে। সুহাসা সুবেশা সুশোভার বাহিনী। যৌবনের মাধবীমদিরা।

আমি বিয়ে করব না।

সংসারী হবে না?

না।

তবে কী করবে?

দেশের কাজ করব। দেশের সত্যিকার কাজ।

এমন উদ্ভট কথা কে কবে শুনেছে?

আমি তো চিরকাল এই উদ্ভটেরই উপাসনা করে এসেছি।

কেন, আই.সি.এস-এ থেকে দেশের কাজ করা যায় না?

যায়, কিন্তু সে ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র সেঁচার কাজ। উপর-উপর, ভাসা-ভাসা।

কেন, রমেশ দত্ত আই.সি.এস. হয়ে দেশের কাজ করেন নি?

করেছেন, কিন্তু তিনি আমলাতন্ত্রের বাইরে থাকলে তাঁর কাজ আরো অর্থবহ

আরো মঙ্গলপ্রদ হত। সিভিল সার্ভিসের আইন-কানুন এমন কদর্য যে তার আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক আকাঙক্ষাকে মেলানো চলে না। সে চেষ্টা এক নিদারুণ ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।

বেশ তো, চাকরিতে ঢুকে তার পাপের স্খালন করা যায় না?

তার মানেই তো কয়েক বছর পরে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া। তখন আমি যাব কোথায়? তখন আমার একূলও গেল ওকূলও গেল। চাকরির প্রশস্ত কোলে একবার ঠাঁই করে নিলে আমার সমস্ত তেজ উবে যাবে। এমনি কালান্তক সে চাকরি। না, তার ক্ষয়ঙ্কর প্রভাব আমার উপর পড়তে দেব না, কিছুতেই না।

কিন্তু তোমার মেজদা কী মনে করবেন?

তিনি আমাকে বুঝবেন। সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে তাঁর কোনো মোহ নেই। তাঁর আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে।

কিন্তু তোমার বাবা?

হ্যাঁ, বাবা যে খড়্গহস্ত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি চান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জীবনে আমি সুপ্রতিষ্ঠিত হই।

তবে, বাবাকে কী বলবে?

সানুনয়ে তাঁর কাছে সম্মতি ভিক্ষা করব। আজ মেজদা যদি আমার পক্ষে থাকেন তিনিই পারবেন বোঝাতে। আর বাবা বুঝলে মাও শান্ত হবেন।

অন্যান্য আত্মীয়?

তারা তুমুল সোরগোল তুলবে। কিন্তু তাদের নিন্দা-প্রশংসায় আমার কিছু আসে যায় না। আমার আদর্শকে আমি অম্লান রাখব।

কী তোমার আদর্শ?

অনহংবাদী হয়ে দেশসেবা। বলতে পারো অরবিন্দ ঘোষই আমার আদর্শ।

সেও আই.সি.এস. পরীক্ষায় ফোর্থ হয়েছিল— তাই? সে তো ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষা পাস করতে পারেনি বলে নাকচ হয়ে গেল।

মোটেই না। সে ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষায় হাজির হয়নি— ইচ্ছে করেই হয়নি, কেননা আই.সি.এস. চাকরি করা তার অভিপ্রেত ছিল না। শুধু বাবার ইচ্ছাতেই সে আসল পরীক্ষায় বসেছিল। তার পথই আমার কাছে মহৎ ও নিঃস্বার্থ অনুপ্রেরণার পথ, যদিও তা রমেশ দত্তের পথের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

তুমি সারাজীবন দারিদ্র্যের ব্রত নিয়ে দেশসেবা করতে পারবে?

কেন পারব না? চিত্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে যদি সংসারের সব কিছু ছেড়ে জীবনের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারেন, তবে আমি এক তরুণ, যার কোনো সাংসারিক সমস্যা নেই, আমি কেন পারব না?

কিন্তু সে তো লাঞ্ছনার পথ, দুঃখক্লেশের পথ, তোমার ভয়-ডর নেই?

না, কিসের ভয়? লাঞ্ছনা আর দুঃখক্লেশ তো সে পথের ধুলো-মাটি।

এমনি হ্যাঁ কি না, না কি হ্যাঁ, চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হচ্ছে সুভাষ। সুবিধাবাদ না আদর্শবাদ। দাসত্বসেবা না স্বদেশসেবা। রমেশ দত্ত না অরবিন্দ।

বাড়িতে জানিয়েছে তার সিদ্ধান্তের কথা। মেজদাকে লিখেছে, বাবাকে লিখেছে।

এখানে-ওখানে বহু লোকের সঙ্গে দেখা করছে। মতামত নিচ্ছে। যাচাই করে দেখছে তার সিদ্ধান্তটা টলিয়ে দেবার মত কোনো যুক্তি আছে নাকি পৃথিবীতে।

ঘরে সুভাষ পাইচারি করছে তার বন্ধু মিত্র এসে উপস্থিত।

'এস, এস', সুভাষ নিজেই হাত বাড়াল : 'তোমাকে আর অভিনন্দন জানাতে হবে না, আমি চাকরি ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।'

'ছেড়ে দেবে?' মিত্র থ হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল : 'আই.সি.এস. চাকরি তুমি ছেড়ে দেবে? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?'

সুভাষ হাসিমুখে বললে, 'না, মাথা ঠাণ্ডা আছে। এক মাস অনেক ভেবেছি, বিবেচনা করেছি, তারপর সিদ্ধান্ত স্থির করেছি ছেড়ে দেব।'

'লোকে পায় না আর তুমি পেয়ে ছেড়ে দেবে?'

'ছেড়ে দেবার চিঠিটা লেখা পর্যন্ত হয়ে গেছে। শুধু সই করে ডাকে ফেলে দেওয়াটুকু বাকি।'

'এমনি চাকরি পেয়ে কেউ কোনোদিন ছেড়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার নজির আছে?'

'না থাক, আমিই না হয় প্রথম নজির হব।'

'চাকরির শ্রেষ্ঠ চাকরি, ভারতীয় যুবকের কাছে যা স্বর্গের সুখস্বপ্ন তা পেয়ে ছেড়ে দেবে, কেউ দেয় ছেড়ে? তুমি সুস্থতার ভান করলেও লোকে তোমাকে উন্মাদ বলবে।'

'উন্মাদ না হলে দেশের কাজ করব কী করে?'

'দেশের কাজ!' মিত্র তো আকাশ থেকে পড়ল : 'দেশের আবার কী কাজ?'

মঞ্জুবাক সুভাষ ঋজুকণ্ঠে বললে, 'স্বাধীনতা অর্জনই দেশের একমাত্র কাজ।'

'রাখো! তাতে তোমার কী মাথাব্যাথা? দেশে তো আরো অনেক লোক আছে। তারা ও সব নিয়ে মাতামাতি করুক।'

'না, শুধু মাতামাতি নয়, স্পষ্ট শক্ত মজবুত কাজ।' হাতের মুঠ দৃঢ় করল সুভাষ: 'দেশ আমার কাছে তাই দাবি করছে। আমি সেই দাবি অগ্রাহ্য করতে পারব না।'

এ যেন কী রকম সুভাষ। দ্রব নম্র কান্তপুরুষ নয়। এ যেন তেজস্বী তপস্বী সুব্রতী ব্রহ্মচারী। পবিত্র পাবক।

'তোমার বাড়িতে জানিয়েছ?' মিত্র কণ্ঠস্বর থেকে পরিহাসের রেশটুকু সরিয়ে নিল।

'জানিয়েছি।'

'তাঁরা কী বলছেন?'

'কী বলবেন! মর্মাহত হয়েছেন। বলছেন চাকরিতে থেকেও তো দেশের কাজ করা যায়। রমেশ দত্ত করেন নি? করেছেন কিন্তু চাকরিতে থাকার দরুন সামান্যই করতে পেরেছেন। যদি প্রথম বয়সেই চাকরির বাইরে চলে আসতে পারতেন, ঢের বেশি করতে পারতেন। গোলামি আর দেশসেবা একসঙ্গে সম্ভব নয়।'

'গোলামি কী বলছ!' মিত্র মুহূর্তে আবার বিপক্ষে চলে গেল : 'একচ্ছত্র প্রভুত্ব, মহকুমায় এস.ডি.ও., জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, ডিভিসনে কমিশনার। শেষে কোনো প্রদেশের চীফ সেক্রেটারি—'

'জানি। সব জানা আছে।'

'উঃ, কোথায় লাগে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব! ঢালাও সুখ, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, কার্পেটবিছানো জীবন, প্রতাপ ঐশ্বর্য আলস্য আরাম, সংসারে যা মানুষের কামনীয় সব তোমার হাতের মুঠোয়—'

'কিন্তু আমি তো বিয়ে করব না, আমার আবার সংসার কী।'

'কিন্তু তোমার মা-বাবা তো আছেন, তাঁদের মুখ উজ্জ্বল করা তোমার কাজ নয়?'

সুভাষ ফিরে দাঁড়াল। কোথা থেকে একটা রক্তাভ জ্যোতি তার মুখে এসে পড়ল। বললে, 'একটা আই.সি.এস. পাশ ব্রিটিশের গোলাম কতটুকু তাঁদের মুখোজ্জ্বল করবে? দেশের কাজে বলি হতে পারলে কি তাঁদের মুখ সমস্ত দেশের মুখ, আরো উজ্জ্বল হবে না।'

'না, না, সুভাষ, তুমি বুঝছ না তুমি কী করতে যাচ্ছ— আরো আরো ভাবো, সকলের পরামর্শ নাও—' মিত্র উঠে পড়ল।

'হ্যাঁ, বিবেচনা-আলোচনার ত্রুটি রাখছি না।' বললে সুভাষ, 'দেখাশোনার কাজ যা বাকি আছে সেরে ফেলব শিগগির। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার সিদ্ধান্ত টলবে না।'

'না, টলবে, টলা উচিত। আমি আবার আসছি। তুমি চিঠিটা এখুনি পোস্ট কোরো না—'

কদিন পরে সুভাষের ঘরে আবার সেই মিত্রের আবির্ভাব।

খানিকক্ষণ আগে একটা ঝড় উঠেছিল, দরজা, জানলা খোলা, সুভাষ বসেছিল স্থির হয়ে। ঝড়টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, থেমে গেল। বোধহয় সুভাষের স্থিরতাতেই সে প্রতিহত হয়ে নিজেকে সংবৃত করলে। এখন ঝড় নেই, ক্ষণিক অন্ধকারটাও সরে গেছে।

'কী হে, সব দেখাশোনা করলে?' মিত্র সুসংবাদের আশায় সুপ্রসন্ন মুখে বললে, 'কার কী মত?'

'তার আগে শোনো আই.সি.এস. দের জন্যে ইণ্ডিয়া-অফিস কী সব নির্দেশ তৈরি করেছে।' সুভাষ একটা চটি বই টেনে নিয়ে পৃষ্ঠাটা বার করলে : 'এ সব আই.সি.এসদের অবশ্য জ্ঞাতব্য। বিষয়— ভারতবর্ষে ঘোড়ার যত্ন। দেখ কী নির্লজ্জ, লিখছে, ভারতবর্ষে ঘোড়া আর সহিসেরা একই খাদ্য খায়।'

'তা কী বলো, চানা খায় না?'

'খায় বলে লিখতে হবে? এটা একটা শেখবার মত জানবার মত বিষয়?' সুভাষ জ্বলে উঠল : 'ইংলণ্ডে গরু আর তার গাড়োয়ান একই ঘাস খায়, সেটা কি একটা জ্ঞাতব্য বিষয় হবে? তারপরে আরো দেখ, লিখেছে— ভারতবর্ষে ব্যবসায়ীমাত্রই অসাধু—'

মিত্র সহ্য করতে পারল না। বললে, 'এ অন্যায়।'

'আমি তখুনি ছুটলাম ইণ্ডিয়া অফিসে। সিভিল সার্ভিস বোর্ডের সেক্রেটারি রবার্টসের সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, এ সব ভুল নির্দেশ ছাপানো হয়েছে কেন? এসব বাতিল করে দেওয়া উচিত। রবার্টস চোখ রাঙাল, বললে, এটাই হচ্ছে সরকারি মত, তুমি

যদি তা না মানো, তোমাকে চাকরি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

মিত্র উচ্চকিত হয়ে উঠল: 'তুমি কী বললে?'

সুভাষ স্বচ্ছ মুখে বললে, 'বললাম, চাকরি থেকে আমি বেরিয়ে তো যাচ্ছিই, তোমাকেও এ ভুল এ অন্যায় সংশোধন করতে হবে। চোখ রাঙিয়ে আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না। তখন রবার্টস ধাতে এল। কথা দিল সংশোধন করবে।'

মিত্রর মুখ মেঘলা করে এল : 'তা হলে চাকরি থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ঠিক করলে?'

'হ্যাঁ, অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়াই ঠিক করলাম।' সুভাষ উঠে দাঁড়াল, তার স্বরে আজ আর এতটুকুও দ্বিধা নেই। বললে, 'বড়দা লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ছেন, তিনি এসেছিলেন, তাঁর হাতে স্যার উইলিয়ম ডিউকের চিঠি।'

'কে উইলিয়ম ডিউক?'

'এককালে উড়িষ্যার ডিভিশানাল কমিশনার ছিলেন, সেই সূত্রে বাবার সঙ্গে জানাশোনা। এখন এখানে আণ্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট—'

'কী লিখেছেন চিঠিতে?'

'অনুরোধ করেছেন যেন চাকরি না ছাড়ি।'

'কী উত্তর দিলে?'

'সবিনয়ে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলাম।'

'সুভাষ!' মিত্র একটা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'কলেজের প্রফেসররাও ধরল, দেশবিদেশের সমস্ত আত্মীয় হিতৈষী একজোট হল— সকলের মুখে এক কথা, চাকরি ছেড়ো না। এ চাকরি ছাড়া মানে স্বর্গ হতে নির্বাসন— শেষকালে পস্তাবে, ছন্নছাড়া হয়ে যাবে— কিন্তু জানো, সে বিরাট ডাকের কাছে এসব কথা এ সব কান্না তুচ্ছ মনে হচ্ছে।'

'বিরাট ডাক!' মিত্র বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, দেশের ডাক, দেশসেবার ডাক।' সুভাষ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। বললে, 'আমাদের হল-এর প্রভোস্ট রেডএওয়ে কী বললে জানো? বললে, আমি দু কারণে বিচলিত বোধ করছি। এক কারণ, একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ— দেশসেবাটা ওদের কাছে সামান্য ব্যাপার— ওরা তো পরাধীন নয়— আর এক কারণ, একজন ভারতবাসী এত বড় একটা চাকরি এমন অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারে। শেষকালটায় আমার হ্যাণ্ডসেক করে কী বললে জানো? বললে, বোস, আমি আনন্দিত, তুমি দাসত্বের শৃঙ্খলে ধরা দিলে না।'

'কিন্তু এখন কী করবে?'

'জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী যে আন্দোলন সুরু করেছেন তাতে যোগ দেব। জানো', সুভাষের দুচোখ জ্বলে উঠল : 'চিত্তরঞ্জন আমাকে ডেকেছেন।'

'কে, সি.আর.দাশ?'

'হ্যাঁ, চিত্তরঞ্জন।' সুভাষের স্বর গাঢ় হয়ে উঠল : 'আমি তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম, তিনি আমাকে, আমার সিদ্ধান্তকে আশীর্বাদ করেছেন। তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বলেছেন। তিনি যদি প্রৌঢ় বয়সে সমস্ত সুখ-সম্পদ ছেড়ে দিয়ে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়াতে

পারেন, আমি—আমি এক তরুণ যুবক, আমি পারব না? কিন্তু আমি তাঁকে কী দিতে পারব? আমি তাঁকে লিখেছি, আমার বিদ্যেবুদ্ধি কিছু নেই, শুধু আছে বহ্নিময় উৎসাহ, মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করবার মত শুধু মন আর তুচ্ছ দেহ— তিনি তাতেই তৃপ্ত, ডাক দিয়েছেন আমাকে। হ্যাঁ, আমি যাব।' সুভাষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল : 'চলো চিঠিটা পোস্ট করে দিই গে—'

'চিঠি? কোন চিঠি?'

'চূড়ান্ত চিঠি। পদত্যাগপত্র। লেটার অফ রেজিগনেশন।'

'এখনো তাহলে ছাড়নি চাকরি?' মিত্রও উঠে পড়ল।

'না। এতদিন তো সকলের মত নিলাম, সকলের বিরুদ্ধতাকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করলাম। সময় নিয়ে-নিয়ে এটাই প্রমাণ করলাম যে আমি ভাবের ঘোরে ছাড়ছি না, বেশ সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে-চিন্তে ছাড়ছি।'

'যখন এখনো চিঠিটা পোস্ট করনি, নাই করলে।' মিত্র শেষ অনুনয় করল।

'না, আর দেরি নয়।' সুভাষ মিত্রর হাত ধরে টানল: 'চলো।'

দুজনে রাস্তায় একটা লেটার-বক্সের কাছে দাঁড়িয়েছে।

সুভাষ চিঠি ফেলছে। লেটার-বক্সের মুখে সুভাষের হাত, হাতে চিঠি।

মিত্র বললে, 'সুভাষ, ফেলো না—জানো না তুমি কী করছ।'

সুভাষের হাত গর্তের দিকে আরো একটু এগোল, চিঠির লম্বা খামটা আরো একটু ঢুকল।

'এখনো সময় আছে, এখনো হাত গুটিয়ে নাও।' মিত্রর স্বরে কাতরতা ফুটে উঠল।

চিঠিসহ সুভাষের হাত আরো একটু ঢুকল।

'এখনো, এখনো সময় আছে।' মিত্র প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: 'ভেবে দেখ তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—শক্তি, প্রতাপ, অর্থ, ঐশ্বর্য, আরাম, বিলাস, সফল জীবন—'

সুভাষের হাত চিঠিটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল।

গোবিন্দ রায়ের 'কত কাল পরে' গানটা মনে পড়ছে:

'শিখিলে যত জ্ঞান নিশীথে জেগে, উপযুক্ত হল পরসেবা লেগে।
হল চাকরি সার যথায় তথায়, অপমান সদায় কথায় কথায়।
নয়নে কি সহে এ কলঙ্ক দুখ, পর-রঞ্জন অঞ্জনে কালমুখ!
পর বেশ নিলে পর দেশ গেলে, তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস ব'লে।
খুইয়ে নিজদেশ মলিনমুখে, ভজনায় কি পৌরুষ স্বার্থ সুখে।
যদি মানুষ, মানুষনাহি হলে, ফললাভ কি মানুষ নাম নিলে॥'

এ সব কি আর সুভাষ সম্বন্ধে খাটে?

তেইশ

জাহাজে করে সুভাষ ফিরছে ভারতে। যেন সমস্ত জাহাজে আর কোন লোক নেই। সে একেবারে একা। অনিঃশেষ পরিপূর্ণ। ফেরবার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে যে সে ঝাঁপ

দিয়েছে সেই অবন্ধন আনন্দ তার আননে অবয়বে উচ্ছলিত। একজন ভারতীয় সহযাত্রী তার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কী ভাবছ?'

'জালিয়ানওয়ালাবাগ!'

'আর কিছু নয়?'

'হ্যাঁ, আরো ভাবছি তিনটি মানুষের কথা—গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, আর—আর রবীন্দ্রনাথ।'

কিন্তু মনে শুধু এই জ্বালাময় জিজ্ঞাসা: জেনারেল ডায়ার যে গুলি চালিয়েছিল আর মাইকেল ওডায়ার যার সঙ্কেতে গুলি চালনা, তাদের উপর কেউ প্রতিশোধ নেবে না? কই সেই মানুষ, সেই স্বদেশী?

'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? এ দেশ তোদের নয়
দেখতে যারা কাঁপে ডরে, মারবার আগে আপনি মরে
ঘুষির বদল খুসি করে—'সেলাম মহাশয়।'
সোনা, যাদু, মিষ্টি ভাষে ছেলে মেয়ে কোলে আসে।
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়।
কোথায় বা সে ব্রহ্মচর্য, অসীম স্থৈর্য অসীম ধৈর্য
কই বা উগ্র সে তপস্যা—ইন্দ্রে লাগে ভয়?
কোথায় অসীম শৌর্যে বীর্যে অসুর-পরাজয়?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি চমকে উঠিস ভেড়াগুলি
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয়।
প্রতিজনের প্রতি বক্ষে কোটি-কোটি লক্ষে লক্ষে
কই সে তাদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়?'

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রায় আট বছর পরে ১৯২৭ এ জেনারেল ডায়ারকে যমে নিলে। আরো তেরো বছর বাঁচল ওডায়ার, পাঞ্জাবের ছোটলাট, যার আমলে এই হত্যাকাণ্ড, আর যে কিনা ডায়ারের প্রধান সমর্থক। তাকে ১৯৪০এর ১৩ই মার্চ উধম সিং গুলি করে বধ করলে লণ্ডনে, ক্যাক্সটন হল এ। একুশ বছর ধরে এ প্রতিহিংসার লালসা পোষণ করে এসেছে উধম। ওডায়ার বুঝি যমেরও অরুচি ছিল, তাই নিয়তি কিন্তু দেশের বুকের উপর পরাধীনতার এই যে জগদ্দল পাষাণ ভার তা কি অহিংসায় সরে যাবে? জানি না কী হবে এবং কেমন করে হবে? ব্রিটিশের হাত থেকে কেমন করে অধিকার ছিনিয়ে নেব? ছিনিয়ে নিতে হবে না, ওরা ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবে? অহিংসায় পালাবে কেন? বড় জোর একটা হাই তুলে পাশ ফিরে শোবে।

যদি পালাতে হয় ভয়ে পালাবে, উদারতায় পালাবে না। যখন বুঝবে জলে-স্থলে ভারতের সৈন্য বিদ্রোহী হয়েছে, অস্ত্র ভারতের দিকে না উঁচিয়ে ব্রিটিশের দিকে উঁচিয়েছে তখনই বেনের দল পাততাড়ি গুটোবে। সেই জনগণের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর জন্যেই অহিংসার প্রয়োজন, আপাতত প্রয়োজন। অহিংসা একটা রাজনৈতিক উপায়, একটা কৌশলমাত্র। অহিংসা কোনো রাজনীতি নয়, রাজনৈতিকের ধর্মও নয়। দণ্ডধর ছাড়া আবার রাজা কী। হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে হলে যুদ্ধ ছাড়া পথ কোথায়। দেখা যাক হোমিওপ্যাথিতে

ব্যাধি সারে কিনা, না সারে তো সার্জারি আছে।

শুধু জনগণকে বিপ্লবে উত্থিত করবার ভূমিকাই এই অহিংসা।

বম্বেতে নেমেই সুভাষ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। ষোলই জুলাই, উনিশ শো একুশ। নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, 'আমি আপনার আন্দোলনে নামতে চাই।'

হাস্যমণ্ডিত মুখে গান্ধী আশীর্বাদ করলেন সুভাষকে।

'আপনাকে কতগুলো প্রশ্ন করতে চাই।'

'কী প্রশ্ন?'

'অহিংস আন্দোলনের প্রত্যাশিত ধাপগুলি আপনার কল্পনায় কী ভাবে আছে জানতে চাই। অর্থাৎ পরে কীভাবে আন্দোলন এগোবে এবং শেষ পর্যন্ত কী ভাবে ইংরেজের হাত থেকে আমরা রাজশক্তি তুলে নেব।'

গান্ধী বললেন যা বলতে চান। কিন্তু সুভাষের মনে হল সমস্ত পরিকল্পনাটা যেন খুব স্বচ্ছ নয়। সমস্ত বিচ্ছিন্ন কার্যক্রমকে যেন একটা যুক্তির সূত্র দিয়ে আগাগোড়া বাঁধা হয়নি। অহিংসা ভজনা করলেই ব্রিটিশের হৃদয় বিগলিত হবে স্বেচ্ছায় লুটের মাল ফেলে দিয়ে বাড়ি পালাবে এ যেন বিশ্বাস করা যায় না, বিশ্বাস করতে আনন্দ হয় না।

শেষ পর্যন্ত গান্ধী বললেন, 'তুমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে যাও।'

কলকাতায় পৌঁছেই সুভাষ চিত্তরঞ্জনের বাড়ি গিয়ে হাজির হল। ভাস্বর ভাস্করের মতই সুভাষের নয়নপথে উদিত হলেন চিত্তরঞ্জন। দেশের জন্যে যিনি সর্বস্ব দান করেছেন তিনিই যেন দেশের জন্যে আবার সর্বস্ব আদায় করে নিতে পারেন তাঁর আকৃতিতে ও অবয়বে যেন সেই অপরাজেয় পৌরুষই প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছে। স্বাধীনতা কুড়িয়ে পাওয়া ধন নয়, বললব্ধ জয়ার্জিত বিত্ত।

'আমি এসেছি।' সুভাষ উদ্বেল কণ্ঠে বললে। মনে হল আমি পেয়েছি বললেই বুঝি ঠিক হত।

চিত্তরঞ্জনও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'তুমি, সুভাষ, এসেছ? আর আমার ভয় নেই।' বাসন্তী দেবী কাছেই বসেছিলেন, তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমার সেনাপতি, আমার ডান হাত পেয়ে গেছি। হ্যাঁ, এই তেজস্বী পবিত্রমূর্তিই তো আমার কাম্য।'

সুভাষ নত হয়ে চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তী দেবীকে প্রণাম করল।

বাসন্তী দেবী সুভাষকে বললেন, 'তুমি সমস্ত সংগ্রামের ভার নাও।'

'মা, আপনি শক্তিস্বরূপিনী, আপনি শক্তি দিলে সমস্ত সংগ্রামে জয়ী হব। কখনো পরাভূত হব না।'

'স্বরাজ চাই কার জন্যে?' চিত্তরঞ্জন বলে উঠলেন: 'মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের জন্যে নয়, স্বরাজ চাই অগণন জনগণের জন্যে, যাতে তাদের সুখসমৃদ্ধি আসে, তাদের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য দুঃখ দারিদ্র্য দূরে যায়, তাই তাদেরকে ডাকো, তাদেরকে একত্র করো, তাদের ন্যায্য স্বত্ব অধিকার করতে বলো—তারা যদি ওঠে কার সাধ্য তাদের দাবায়, তাদের বঞ্চিত রাখে।'

'স্বরাজ উদ্দেশ্য নয় উপায় মাত্র।' সুভাষ সেই কথার প্রতিধ্বনি করল: 'আসল

উদ্দেশ্য মানুষের মুক্তি, তাই আসল শক্তি জনশক্তি। সংহতি-শক্তি। সেই শক্তিকেই দিকে দিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।'

'তুমি তোলো জাগিয়ে।' বললেন চিত্তরঞ্জন।

'আপনি আমার গুরু, রণগুরু, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

চিত্তরঞ্জন কর্মপদ্ধতি ঠিক করে দিলেন। বললেন, 'প্রথমেই বিলিতি বর্জন। সুভাষ,' আনন্দে অলোকিত হয়ে উঠলেন: 'প্রথমেই আমার বাড়িতে বিলিতি কাপড়ের বনফায়ার। অগ্নিমহোৎসব।'

সুভাষ তাকিয়ে দেখল চিত্তরঞ্জনের পরনে মোটা খাটো খদ্দরের ধুতি, গায়ে মোটা খদ্দরের ফতুয়া। বাসন্তী দেবীর পরনেও মোটা বিছানার চাদরের মত খদ্দরের শাড়ি, লাল পাড় ছাপানো। সুভাষের নিজের গায়ের বিলিতি পোশাকে লজ্জা বোধ করছিল। মহাত্মার সামনে যেতেও সে কম অপ্রতিভ হয়নি। কতক্ষণে এই বন্য জঞ্জাল ফেলে দিয়ে সে ভদ্র হবে শুদ্ধ হবে তারই ফাঁক খুঁজছে।

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীনদুখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সূতার সঙ্গে
মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই,
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।'

বিলিতি বস্ত্র পোড়াবেন তো আগে নিজের বাড়িতে। 'আপনি আচরি জীব পরেরে শিখায়।' এমনি ত্যাগের আদর্শ অগ্নি-অক্ষরে সকলের সামনে না রাখলে জনগণ আকৃষ্ট হবে কেন?

দেশবন্ধুর রসা রোডের বাড়ির টেনিস কোর্টে বাড়ির লোকের যার যত বিদেশী বস্ত্র ছিল স্তূপাকৃত হল। তার মধ্যে দেশবন্ধুর নিজেরই দামী সুট বেশি। সুভাষই নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

আজ সুভাষ খদ্দর পরেছে। আর এই পোশাকে তাকে কী অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে, অপার্থিব সুন্দর।

হ্যাঁ, আগুন সমস্ত পাপকালিমা ভস্ম করে দিক। সমস্ত বন্ধন থেকে মোচন করুক। অগ্নির পুণ্যাবগাহনে সমস্ত দেশ শুদ্ধ হোক, নিরাময় হোক, উদ্দীপিত হয়ে উঠুক।

'তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব
মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চেলে কাজ নাই সে বড় অপমান
মোটা হোক সে সোনা মোদের—
মায়ের ক্ষেতের ধান,
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।

মিহি কাপড় পরব না আর
যেচে পরের কাছে
মায়ের ঘরের মোটা কাপড়
পরলে কেমন সাজে
দ্যাখ তো পরলে কেমন সাজে।
ও ভাই চাষী ও ভাই তাঁতি
আজকে সুপ্রভাত
ক'সে লাঙ্গল ধর ভাই রে
ক'সে চালাও তাঁত
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত॥'

সতেরোই নভেম্বর বোম্বেতে ইংলণ্ডের যুবরাজ এসে পৌঁছল। সেদিন কংগ্রেসের নির্দেশে সমস্ত ভারতব্যাপী হরতাল। কলকাতাকে দেখাল একটা মরুভূমির মত। পথে একটাও লোক নেই ট্রাম নেই ট্যাক্সি নেই গাড়ি ঘোড়া নেই। এ মরুভূমির সার্থক শিল্পী সুভাষচন্দ্র। তারই নিয়ন্ত্রণে সমস্ত কিছু চলছে-থামছে, তারই প্রীতিস্পর্শে শত শত স্বেচ্ছাসেবক মুগ্ধের মত কাজ করে যাচ্ছে। স্টেশন থেকে গাড়ি করে যে সব স্ত্রীলোক ও শিশুকে তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিচ্ছে তার উপর প্ল্যাকার্ড মেরে দিচ্ছে 'অন ন্যাশনাল সার্ভিস'। ঐ প্ল্যাকার্ড দেখলে কেউ আর বাধা দিচ্ছে না। এ জাতীয় প্রয়োজনের যানবাহন। এমন সফল সুশৃঙ্খল হরতাল কেউ কোনোদিন দেখেনি। তার নির্মাতা সুভাষ। দুর্জয় গঠনশক্তির কারিগর।

গভর্নমেণ্ট খেপে গেল। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করলে।

সুভাষ বললে, 'এ ঘোষণা মানব না। স্বেচ্ছাসেবকরা পাঁচজন করে দল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় খদ্দর বিক্রি করবে। অগ্রগামী দলে আমি থাকব।'

'পাঁচজন করে। এমনি হাজার হাজার দল। আমি লক্ষ ভলাণ্টিয়ার চাই বলে প্রচার পত্র ছাপিয়েছি।' বললেন দেশবন্ধু, 'কী বলো পাব না ভলাণ্টিয়ার?'

'লক্ষাধিক ছেলে ছুটে আসবে।'

'আমাদের লক্ষ্য মহান। আমাদের কর্মনীতি শান্ত, অপ্রমত্ত। আর দেশসেবা ভাগবত ব্রত।'

দেশবন্ধুর বাড়িতে দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষ খেতে বসেছে।

দেশবন্ধু রাঁধুনে বামুনকে বলছেন, 'আর দুদিন পরেই তো জেলের ভাত খেতে হবে, তুমি এখন থেকেই ভাতে কাঁকর মেশাতে আরম্ভ করো। অভ্যেস করা থাকলে জেলের ভাতে কষ্ট হবে না।'

'বা, তা কেন?' সুভাষ বাসন্তী দেবীর দিকে তাকাল: 'যে দুঃখ এখনো আসেনি তা আগে থেকেই সাধ করে ভোগ করি কেন?'

'আচ্ছা শরীরটাকে একটু কষ্টসহিষ্ণু করে নিলে মন্দ কী।' দেশবন্ধু হাসলেন: 'জেলে গিয়ে ঘানি টানতে তখন বেগ পেতে হবে না।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সুভাষকে নিভৃতে ডেকে নিলেন চিত্তরঞ্জন। গম্ভীরমুখে বললেন,

'পুলিশ কখন এসে গ্রেপ্তার করে ঠিক নেই। তার আগে তুমি আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে?'

সুভাষ বললে, 'পারব। বলুন কী কাজ?'

'আমাকে লাখ টাকা জোগাড় করে দিতে পারবে?'

'পারব। বলুন কত দিনের মধ্যে চাই?'

'কত দিনের মধ্যে নয়, এক্ষুনি এই মুহূর্তে চাই।'

'এই মুহূর্তে!' সুভাষ এবার বোধহয় দ্বিধায় পড়ল।

'তুমি ইচ্ছে করলেই পারো। হ্যাঁ, এখুনি, এই মুহূর্তে।' দেশবন্ধু ধীর স্বরে বললেন, 'তুমি মুখে একবার হ্যাঁ বললেই হয়ে যায়।'

'আমি? সুভাষ একেবারে আকাশ থেকে পড়ল: 'লাখ টাকা?'

'পাত্রী তৈরি, তুমি বিয়ে করবে বললেই এখুনি লাখ টাকা আমার হাতে আসে।' দেশবন্ধু গাম্ভীর্যে অব্যাহত রইলেন।

সুভাষ এক মুহূর্ত স্তব্ধ রইল। পরে বললে, 'আপনি আমাকে পরীক্ষা করছেন। কিন্তু আপনি জানেন আমি সংসারের জন্যে নই, আমি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের জন্যে। আমি মাতৃভূমির চরণে প্রদত্ত বলি—টাকা কোথায় পাব—এই তুচ্ছ দেহ আর প্রাণই শুধু দিতে পারি আপনাকে। আপনি তাই নিন।'

'তাই মাতৃভূমির শাশ্বত সম্পদ। দেহ আর প্রাণ।' দাতার রাজরাজেশ্বর চিত্তরঞ্জন আশীর্বাদে বদান্য হলেন।

'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমার গাহিবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল
তোমারি কার্য সাধিবে
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবি শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না—
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিবাতে তোমার যাতনা।
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান॥'

কত সন্তান জেগে উঠেছে দিকে-দিকে, দুর্গম পর্বতে নির্ঝরের মত অজানিতের পথে নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, নির্মল জ্যোতির নির্মল গতির জয়ে চলেছে মৃত্যুতোরণ

উত্তীর্ণ হয়ে।

'ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা
বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা
নিষ্ঠুর সংকট দিক সম্মান
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।'

চলো পথে চলো, সার বেঁধে চলো, খদ্দর বেচবে চল, এই খদ্দরই সুধাপূর্ণিমার প্রথম চন্দ্রকলা। চলো আগে পথে চলো, পরে যাব ব্রিটিশ শাসনের হৃদয়পিণ্ডে, সৌধস্পর্ধিত রাজধানীতে।

'আমরা পথে যাব সারে সারে
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।।
বলব, জননীকে কে দিবি দান
কে দিবি ধন, তোরা কে দিবি প্রাণ—
তোদের মা ডেকেছে, কব বারে বারে।।'

চিত্তরঞ্জন তাঁর বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে বিকেলে চা খাচ্ছেন, ছোট মেয়ে এসে বললে, 'বাবা, সার্জেন্ট এসেছে।'

চিত্তরঞ্জন বললেন, 'নিয়ে এস।'

পুলিশ কমিশনার কীড নিজে এসেছে গ্রেপ্তার করতে। বললে, 'আপনাকে য়্যারেস্ট করতে এসেছি।'

চায়ের কাপ সরিয়ে রাখলেন চিত্তরঞ্জন। বললেন, 'আমি প্রস্তুত। কিন্তু সুভাষ—সুভাষ কোথায়?'

'তাকেও পুলিশ য়্যারেস্ট করতে গেছে।'

সুভাষ তার বাড়ির নিচের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে, কে যেন বলে উঠল: পুলিশ এসেছে।

চায়ের কাপ ঠেলে দিয়ে সুভাষ উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আসুন কি, য়্যারেস্ট করতে তো?'

'হ্যাঁ, ওয়ারেন্টে তাই অর্ডার।' সার্জেন্ট বললে।

'কিন্তু দেশবন্ধুর খবর কী?'

'তাঁকেও গেছে য়্যারেস্ট করতে।'

সুভাষ উল্লসিত হল: 'একসঙ্গেই তাহলে জেলে থাকতে পারব আমরা। দুঃখের মধ্যে এইটুকুই শান্তি, প্রাণ ভরে দেশগুরু দেশবন্ধুর সেবা করতে পারব। চলুন, নিয়ে চলুন—কোথায় নিয়ে যাবেন? যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই জেলখানা। সমস্ত দেশটাই একটা বিরাট জেলখানা। এই জেলখানার বাইরে, দেশের বাইরে চলে যেতে হবে। বাইরে থেকেই আঘাত হানতে হবে—সশস্ত্র আঘাত। হ্যাঁ, বাইরে থেকেই আনতে হবে সমরসম্ভার। দিল্লির লাল কেল্লা দখল করব। তখন আপনারা কী করবেন? আবার আমাদের হুকুম তামিল করবেন।'

পুলিশ অফিসর বললে, 'আগে এ জেলখানা থেকে বেরিয়ে যান তো! পরে অন্য কথা।'

'হ্যাঁ, যাব, নিশ্চয়ই যাব, যাব অনেকদূর। তারপর সেখান থেকে আওয়াজ তুলব: দিল্লি চলো। আওয়াজ তুলব: জয় হিন্দ।'

ছ মাসের জেল হয়ে গেল সুভাষের। চিত্তরঞ্জনেরও ছ মাস।

এই প্রথম কারাবরণ!

তারপর—শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম।

তারপরে ১৯৩৯এর মে-তে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন এসে পৌঁছল: 'সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাঙলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।...বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি, তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি। তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চারিত্রশক্তিই বাঙলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।...

তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাঙলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে, সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালি আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত।...আমি আজ তোমাকে বাঙলা দেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।'

'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন, হবেই হবে॥'

উদ্যতখড়্গ সুভাষ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

এই গ্রন্থ প্রণয়নে নিম্নলিখিত বইগুলির থেকে সাহায্য নিয়েছি:

The Indian Struggle by	Subbas Chandra Bose
History of the Indian National Congress by	B Pattabhi Sitaramayya
Subhas Chandra by	Dr. Hemendra Nath Dass Gupta
The Roll of Honour by	Kalicharan Ghosh

সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী	
শ্রীমতী অর্পণা দেবীরচিত	মানুষ চিত্তরঞ্জন
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকৃত	দেশবন্ধুস্মৃতি
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীলিখিত	নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ
শ্রীভূপেন্দ্র রক্ষিত রায়প্রণীত	সবার অলক্ষ্যে
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়বর্ণিত	ভারতে জাতীয় আন্দোলন
শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীলিখিত	জেলে ত্রিশ বছর

নিবেদিতা নিবেদিতার
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
এ গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত

'তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাঙলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে, সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালি আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত।...আমি আজ তোমাকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।'

—রবীন্দ্রনাথ

এক

এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেব। উনিশ শো কুড়ি সালে বলেছিলেন মহাত্মা। উনিশ শো একুশের নভেম্বর এসে গেল, কিন্তু, কই স্বরাজ কই? বরং বিজয়দর্পে আসছে রাজপুরুষ। ইংলণ্ডের যুবরাজ।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাহোলির পর অনেক জল বয়ে গিয়েছে গঙ্গা দিয়ে। কিংবা অনেক রক্তস্রোত। ন্যায়ধ্বজী ব্রিটিশ সরকার করুণাকম্পিত হয়ে তদন্ত কমিশন বসিয়েছে, নাম হাণ্টার কমিশন। কমিশনের রিপোর্ট বেরোবার আগেই পাশ হয়েছে ইনডেমনিটি য়্যাক্ট, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে যে সব সরকারী কর্মচারী অনিতাচার করবে তার বিরুদ্ধে আদালতে কেউ নালি করতে পারবে না। তুমি যদি একটা ঢিল ছোঁড়ো প্রত্যুত্তরে গুলি খাবে বুকের উপর। যদি জলের ছিটেও দাও তোমার ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সাত খুন মাপ শুনেছ, এ সাতশো খুন মাপ।

তা কী করা যাবে! অ্যানি বেশান্ত, যে কিনা এতকাল ভারতবর্ষের পক্ষে ছিল সেও উলটো সুর ধরল। জনতা যদি সৈন্যদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে সৈন্যরা তো বিনিময়ে গুলি ছুঁড়বেই। তারা যে শুধু গুলিই ছুঁড়ছে এ তো তাদের অপার অনুগ্রহ। বুলেট ফর ব্রিকব্যাট। ঢিলের বদলে গুলি। বেশান্তের সঙ্গে যুক্ত হল এই ধ্বনি। বেশান্ত আর ভারতবাসীর চোখে মাননীয় রইল না। অত্যাচারের উদ্দণ্ড নৃত্য শুধু অমৃতসরেই আবদ্ধ ছিল না, ছড়িয়ে পড়ল লাহোরে, গুজরানওয়ালায়, কাসুরে সেখুপুরায়।

লাহোরে কর্নেল জনসন, গুজরানওয়ালায় কর্নেল ওব্রায়েন, কাসুরে ক্যাপটেন ডোভটন, সেখুপুরায় মিস্টার বসওয়ার্থ স্মিথ। চারে চতুষ্পদ। লাহোরে রাত আটটার পর থেকে কার্ফু। রাত আটটার পর বাইরে বেরুলেই হয় গুলি খাবে, নয়তো ভাগ্য প্রসন্ন হলে বেত খাবে। এক বৃদ্ধ তার দোকানের পাশের ফালি জমিতে তার গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছিল, দেখতে পেল মিলিটারি। মিলিটারির ঘড়িতে আটটা বেজে পাঁচ মিনিট, ধরল সেই বুড়োকে। আদেশ অমান্য করেছে এই অভিযোগে তার শাস্তি হল। শাস্তি আর কী, চাবকে অজ্ঞান করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া শুধু। সন্দেহ কী, শাস্তি মৃদুতম। কিন্তু গ্রামের মণ্ডলকে রাস্তার পাশে গাছে বেঁধে চাবকাবার কী দরকার ছিল? জনসন হাসল, বললে, শুধু ওকে শাস্তি দিলেই তো হবে না, আর সকলকে শিক্ষা দিতে হবে।

বাছা-বাছা বাড়ির দেয়ালে সামরিক আইনের নোটিশ টাঙানো হল, আর বাড়ির যারা মালিক তাদের উপর হুকুম জারি হল, খবরদার, দেখো, নোটিশ যেন আস্ত থাকে অক্ষত থাকে, যদি ছেঁড়া যায় বা খোয়া যায়, ফলগুলি নয় কশা। রাত আটটার পর কার্ফুতে রাস্তা ঘাট যখন ফাঁকা তখন চুপি চুপি পুলিশের লোক এসে নোটিশ ছিঁড়ে দেয়, তারপর সকাল হলেই শাস্তির আয়োজন, চলো গাছে চলো, দশ ঘা বেত খাবে চলো। আমরা ছিঁড়িনি, কে ছিঁড়েছে জানিনা, এই সব সাকাই গাইবার সুযোগ পর্যন্ত নেই, কেননা বিচার বলে তো কিছু নেই, একেবারেই শাস্তি। সরাসরি বিচার শুনেছ,

এ হচ্ছে সরাসরি দণ্ড।

তখন নোটিশ-টাঙানো বাড়ির মালিকেরা তাদের চাকরদের জন্যে পারমিটের দরখাস্ত করল, চাকরেরা রাত জেগে নোটিশের পাহারা দেবে, যাতে কেউ না নোটিশ ছিঁড়ে নেয়। কার্ফুর মধ্যে বাড়ির বাইরে বসে পাহারা দিতে হবে বলেই পারমিটের আবেদন। মিলিটারি সরকার মজা পেল। বললে, পারমিট দিতে পারি কিন্তু চাকরকে নয়, স্বয়ং গৃহকর্তাকে। তার মানে খোদ মালিককে ঘরের বাইরে বসে পাহারা দিতে হবে, হ্যাঁ, নোটিশ-পাহারা, যাতে কেউ না তাদের বাড়ির দেয়ালের নোটিশে হাত দেয়। যদি ঝড়ে বৃষ্টিতে নষ্ট হয়? তা হলেও গৃহস্বামীর শাস্তি হবে। গৃহস্বামীকে দেখতে হবে যাতে ঝড় না ওঠে বৃষ্টি না পড়ে। আর ঝড়বৃষ্টি হলেও সে ছাতা আড়াল করে নিজেকে না বাঁচাক, তার নোটিশকে বাঁচাতে হবে।

শুধু উচ্চতর অস্ত্রের জোরের পর দাঁড়িয়ে একটা অসহায় ও অসমর্থ জনতাকে হীনাতিহীন লাঞ্ছনা করার মধ্যে একটা বিকৃতমনস্ক উন্মাদ আনন্দ আছে বোধ হয়। নইলে একজন যখন চাবুকে জর্জর হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় তখন অত্যাচারীর দল সমস্বরে উত্তাল হেসে ওঠে কী করে?

একটা কলেজের দেয়ালে সাঁটা সামরিক আইনের নোটিশ কে বা কারা ছিঁড়ে ফেলেছে। এর জন্যে শাস্তি কার প্রাপ্য? নিশ্চয়ই অধ্যক্ষের, যেহেতু সে-ই কলেজের প্রধান। একজন অধ্যক্ষকে শুধু দায়ী করলে ব্যাপারটায় সমারোহ আসে কী করে? না, অধ্যক্ষের সঙ্গে অধ্যাপকেরাও দায়ী। জনসন ঝেঁটিয়ে সকলকেই গ্রেপ্তার করল। তিন দিন, দুর্গের এক কোণে, মিলিটারি হাজতে রেখে দিল তাদের। এটা কি নিছক বর্বরতা নয়? রাখো! তিন দিন পোড়া-ঝোড়া যাহোক ওদের খেতে দিয়েছি, রাতে ছাতে দিয়েছি ঘুমুতে। চাবকে যে ছাল ছিঁড়ে নিইনি ওদের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি।

বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ইলেকট্রিক ফ্যান খুলে নিয়ে গেল, তোমরা মস্তিষ্কহীন, তোমরা এ নিয়ে করবে কী, বরং ব্রিটিশ সৈন্যরা কত মাথা ঘামিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, ফ্যান তো তাদের দরকার। শুধু পাখা নয়, যেখানে যত বাইসিকেল ছিল সব বাজেয়াপ্ত করল। তোমরা ভগ্নপদ, তোমরা হামাগুড়ি দাও, সৈন্যরাই তো দ্রুত ছুটোছুটি করবে, সুতরাং বাইসিকেল তো তাদের ব্যবহার্য। যোগ্যকে যোগ্যবস্তু ব্যবহার করতে দেখে তৃপ্ত হও সকলে।

টাঙাওয়ালারা হরতাল করেছিল, সুতরাং তাদের সর্বসমেত প্রায় তিনশো টাঙা ধরে নিয়ে গেল। পরে যারা বা ভাড়া খাটবার ছাড় পেল তাদের উপর হুকুম হল প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে তাদের হাজিরা দিতে হবে। স্থানগুলি এমন যা শহরের ব্যস্ততম এলেকা থেকে বহু দূরে, আর সময়গুলি এমন যখন টাঙাওয়ালাদের বেশি কেরায়া পাবার সম্ভাবনা। তার মানে টাঙাওয়ালারা ফতুর হয়ে যাক! যাব কোথায়, খাব কী! প্রত্যেক মুখে বুকে এই স্তব্ধ হাহাকার। কোনো কোনো বদান্য ধনী লঙরখানা খুলেছিল, জনসন তা বন্ধ করে দিল। লঙরখানা মানেই জনসমাবেশ আর জনসমাবেশ মানেই রাজদ্রোহ। তবু লাহোরে ইউরোপীয়ানরা জনসনকে ভোজে-পানে আপ্যায়িত করল, 'প্রটেক্টার অফ দি পুয়োর' বলে, দরিদ্র-রক্ষক, গরিবের মা-বাপ বলে।

কাসুরে রেলস্টেশনের কাছে ডোভটন বিরাট একটা খাঁচা তৈরি করল। আন্দাজ দেড়শো লোক সেই খাঁচার মধ্যে বন্দী। যাদের শাস্তি হয়েছে শুধু তারা নয়, যাদের দোষী বলে সন্দেহ করা হয়েছে তারাও। কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে এমনি খাঁচা করে রাখার অর্থ কী? অর্থ পরিষ্কার। বাইরের লোক সব দেখুক অপরাধীরা কেমন অধোমুখে বসে আছে। যারা ভিতরে আছে তারা যাতে লজ্জা পেতে পারে আর যারা বাইরে আছে তারা পেতে পারে শিক্ষা, তারই জন্যে এই আয়োজন। চিড়িয়াখানায় খাঁচায়-পোরা জানোয়ার দেখনি? এ আরেক চিড়িয়াখানা দেখে যাও, খাঁচায়-পোরা আজব জানোয়ার।

শুধু তাই নয়, পাশেই একটা ফাঁসিকাঠ খাড়া করা হয়েছে। জেলের মধ্যেই ফাঁসি হবে এমন কী কথা আছে? নন্দনকুমারের ফাঁসি মাঠে হয়নি, হাজার লোকের চোখের সামনে? হাজার লোক কী করতে পেরেছিল? নন্দকুমারকে পেরেছিল ছিনিয়ে নিতে? তোমরাও তেমনি দেখবে বিমূঢ় চোখে। দেখতে আসবে না বলতে চাও? লাঠির ঠেলায় খেদিয়ে নিয়ে আসব। সহস্র লোকের সামনে ফাঁসি দিতে না পারলে ফাঁসি দিয়ে সুখ কী!

ডোভটনের এ বর্বর মনোভাবকে প্রশ্রয় দিল না উপরওয়ালা। প্রকাশ্য স্থান থেকে ফাঁসিমঞ্চ তুলে নাও। ফাঁসি জেলের মধ্যে হওয়াই সমীচীন। জনসাধারণ দেখবে না বটে কিন্তু কটা ফাঁসি হল গণনার মধ্যেও রাখতে পারবে না। তবে চাবুক মারাটা প্রকাশ্যে হওয়াই সঙ্গত। হাঁটু পর্যন্ত উলঙ্গ করে টেলিগ্রাফ-পোস্টের সঙ্গে বেঁধে তারপরে কশাঘাত। ভদ্রলোক দর্শক না পাও, পুলিশের খাতায় যত বদমাস গুণ্ডার নাম আছে তাদের এনে জড়ো করো! তারা দেখুক, শিখুক। সায়েস্তা হোক।

'একটা শুধু দুঃখজনক ব্যাপার ঘটেছিল আমার আমলে।' কর্নেল জনসন বলল কমিশনকে।

'মোটে একটা?'

'হ্যাঁ, একটাই।'

'সেটা কী?'

'একটা বিয়ের বরযাত্রীর দলকে অবৈধ জনতা মনে করে চাবকানো হয়েছিল।'

জনসন আর কোনো দুঃখজনক ঘটনা মনে করতে পারল না।

'আমার আমলেও একটা লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছিল।' বললে ডোভটন।

দুঃখজনক নয়, লজ্জাজনক! কমিশন তাকাল কৌতূহলী হয়ে।

'চাবকানো দেখবার জন্যে পুলিশ-ইনস্পেক্টরকে বললাম গুণ্ডা-বদমাস ধরে নিয়ে এস, পুলিশ একপাল বেশ্যা এনে হাজির করল। ওদের দেখে তো আমার চক্ষুস্থির!"

'ওদের তবে ফিরিয়ে দিলে না কেন?' জিজ্ঞেস করল কমিশন।

'ওদের নিয়ে যাবার জন্যে একটা এস্কর্ট পেলাম না।'

'তা হলে—'

'তা হলে, আর উপায় ছিল না, ওরা দেখল সেই চাবকানো।'

এ সব তো তবু লঘু, গুজরানওয়ালায় এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলা হল। দেখা গেল গোটা কুড়ি চাষী মাঠে কাজ করছে, অমনি তাদের লক্ষ্য করে মেশিনগান চালানো

হল যতক্ষণ না ওরা নিশ্চিহ্ন হয়, হয় মরে নয় পালিয়ে। জনতা দেখলেই গুলি, এই হল কর্নেল ওব্রায়েনের বুলি। যদি মনে হল এটা বরযাত্রীর দল বা শবযাত্রীর দল নয়, তখন আর কথা নেই, সুরু করো গুলিবৃষ্টি। কে দোষী কে নির্দোষ অত সূক্ষ্ম বাছবিচারের মেজাজ নেই তখন। বরং এই অবিচ্ছিন্ন গুলিবর্ষণে দেশবাসীদের উপকারই হচ্ছে, সাক্ষ্যে বলেছে ওব্রায়েন, যেহেতু ওদের বোধগম্য হচ্ছে দেশদ্রোহীর পরিণাম কী।

আরো বোঝানো হচ্ছে, এখন ওদের নতুন প্রভু, নতুন গুরু। তাই ওব্রায়েন হুকুম দিয়েছে, সাহেব দেখলেই ভারতবাসীকে সেলাম করতে হবে, গাড়িতে থাকলে নেমে দাঁড়াতে হবে, ছাতা খোলা থাকলে বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় বেত, জরিমানা, জেল। তারপর আছে ছাত্রদের মার্চ করানো। বয়েস যাই হোক, ছাত্র হলেই তাকে দিনে দুবার থেকে চারবার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে নাম লিখিয়ে আসতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে জায়গাটা স্কুল বা কলেজ থেকে চার মাইল দূরে, সে আর বেশি কথা কী। হোক না কাঠফাটা রোদ, আদেশও পাথরফাটা।

'ইনফ্যাণ্ট ক্লাশের ছেলেদের সম্পর্কেও এ আদেশ?' কমিশনের ভারতীয় সদস্য চিমনলাল শীতলবাদে জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।' উত্তর দিল ওব্রায়েন। 'ওয়াজিরবাদে দেখেছিলাম একটা ছেলে মার্চ করে যেতে-যেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করলাম।'

'ছেলেটাকে বাদ দেবার জন্যে?'

ওব্রায়েন হাসল।

'তোমার রিপোর্ট করার ফলে ছেলেটার হাঁটার কিস্তি দুগুণ তিনগুণ বেড়ে গেল, কী বলো?'

'হতে পারে। মনে নেই।'

'ধরো যদি হয়ে থাকে তবে ঐ দুর্বল শ্রান্ত অসুস্থ ছেলের পক্ষে সেটা অসহ্য হবে না?'

ওব্রায়েন উত্তর দিল : 'না।'

সেখুপুরায় বসওয়ার্থ স্মিথ আবার ছেলেদের শিখিয়ে দিল, মার্চ করে যাবার সময় ছেলেদের সমস্বরে বলতে হবে, আমি কোনো অপরাধ করিনি, আমি কোনো অপরাধ করিনি, আমি অনুতপ্ত, আমি অনুতপ্ত।

অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত, কোন অপরাধের সঙ্গেই সংশ্লেষ নেই, তবু অকলঙ্ক শিশুগুলো অনুতাপের বিলাপ ধ্বনি করতে করতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে এ পরিকল্পনায় বাহাদুরি আছে নিশ্চয়ই।

'আমার একটা হাউস অফ রিপেণ্টেন্স বা অনুতাপ-ভবন গড়ে তোলার ইচ্ছে ছিল', বললে বসওয়ার্থ স্মিথ, 'কিন্তু তা আর হল না।'

'সেই ভবনের জন্যে দশ হাজার টাকা তুলতে চেয়েছিলে, সে টাকাটা যোগাড় হল না বলে, কী, তাই না?' জিজ্ঞেস করল কমিটি।

'কেন, তা কেন?' প্রশ্ন এড়িয়ে গেল বসওয়ার্থ স্মিথ।

সন্দেহ কী, সে টাকাটা যোগাড় হল না বলেই অর অনুতাপ। সে টাকাটা পকেটস্থ করতে পারল না বলেই অর নিজের বাড়িটাই নীরব অনুতাপ-ভবন।

টাকা? লাহোরের সেই বৃদ্ধ দানবীর, রাজার নামে কলেজের প্রতিষ্ঠায় লক্ষ টাকা দান করেনি? ওয়ার ফণ্ডে তার দানও তো অতিকায়। কিন্তু হল কী? দেখ না কেমন তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি জড়িয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। তার অপরাধ? তার যে টাকা আছে, সে যে পরদুঃখকাতর, সে যে মহানুভব। সে মুক্ত থাকলে সে যে মুক্তহস্তে দরিদ্র-আতুরদের জন্যে নির্যাতিতদের জন্যে দান করে বসবে। না, তাকে দান করতে দেওয়া নয়, সেবা করতে দেওয়া নয়। তাকে ধরে নিয়ে চলো। রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেই লোকে বুঝবে তলে-তলে না জানি কত কী সে কেলেঙ্কারি করেছে!

ঐ বুড়ো কী, লালা হরিকিষনলালের চল্লিশ লাখ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। কেন, কী করছে সে? কী আবার করবে! সে যে কংগ্রেসী। সামরিক আদালতে তাই সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। শাস্তি শুধু ঐ বাজেয়াপ্তি? না, সেই সঙ্গে যাবজ্জীবন কারাবাস।

হিন্দু-মুসলমান-একতার ধুয়ো তুলেছে কংগ্রেস। তারা এক মায়ের দুই সন্তান, দুয়ে মিলে এক পক্ষ। এই একতার ডাকে ইংরেজ ভারি বিচলিত। তাদের নীতিই হচ্ছে ভিন্ন করে ছিন্ন করা। ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। আগে পৃথক করো। তারপর একে পালন করে ওকে দমন করো, ওকে পালন করে একে পীড়ন করো। শেষে তেমন ঢেউ যদি দেখ, নাও ডুবিয়ে দিয়ে সরে পোড়ো।

অপরাধী বলে যাদের বেঁধে নিয়ে চলেছে, জোড়ায় জোড়ায় বেঁধে নিয়ে চলেছে। বেছে-বেছে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু। কিছু বলবার নেই, তোমরা যে সব একত্ববাদী, তোমরা যে বলো, এক মন হলে সমুদ্র শুকোয়। কেমন লাগছে এখন এই এক হওয়া? একদেহে না হলে একাত্ম হবে কী করে?

কর্নেল ওব্রায়েন এক বুড়ো চাষীকে ধরেছে। অপরাধ তার নয়, অপরাধ তার দুই ছেলের। তবে ছেলেদের না ধরে বাবাকে ধরেছে কেন বাপকে ধরেছে যেহেতু ছেলেদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলেদের খুঁজে-পেতে বার করে দিক, ছেড়ে দিচ্ছি বাপকে। এমনও তো হতে পারে, বাপকে না জানিয়েই ছেলেরা পালিয়েছে, কিংবা সত্যি-সত্যিই বাপ তাদের ঠিকানা জানে না, সেক্ষেত্রে বাপের কী দোষ? বাপের দোষ সে অমন ছেলের বাপ হয়েছে কেন? তাই সে শুধু আটকাই পড়ে থাকবে না, তার বিষয়-সম্পত্তি সরকারের খাস হবে আর কেউ যদি তার চাষবাসে সাহায্য করো, সাবধান করে দিচ্ছি, তার ভবলীলা একটি মাত্র গুলির খরচেই ফুরিয়ে যাবে।

হঠাৎ একদিন রব উঠল আগামী কাল সামরিক আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। দুর্লীলার জন্যে হাতে আর মোটে চল্লিশ ঘণ্টা, ওব্রায়েন মরীয়া হয়ে উঠল। এর মধ্যে যত বিচার বাকি আছে সমাধা করে ফেল, যেন একজনও না সামরিক আইন রহিত হওয়ার সুযোগে ছাড়া পায়। সেই সামরিক আইন রদ হতে-হতে জুন মাসের মাঝামাঝি। তাও ষোল আনা নয়, রেলের লাইন ও জমি ছাড় পেল না। এ পৈশাচিক আইন

এত দীর্ঘ দিন ধরে চালু রাখার কোনো যুক্তিবিচার নেই এই ঘোষণায় বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য স্যার শঙ্করন নায়ার পদত্যাগ করল।

রেভারেণ্ড এণ্ডরুজকে পাঞ্জাবে ঢুকতে দেওয়া হল না, অমৃতসরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। আদালতে অভিযুক্তদের পক্ষে ব্যারিস্টার নর্টনকে নিযুক্ত করা হল, কিন্তু সামরিক সরকার তাকে এগোতে দিল না। বম্বে ক্রনিকল-এর সম্পাদক হর্নিম্যানকে সরকার-নিন্দার জন্যে ভারতের বাইরে নির্বাসিত করা হল। চলল সর্বন্যায়নাশন দুঃশাসন। শুধু ক্রোধস্তব্ধ নেত্রে তাকিয়ে রইল মহাকাল। ইঙ্গিত লিখে রাখল আকাশে। তোমাকে মারিবে যে বঙ্গেতে বাড়িছে সে।

হাণ্টার কমিটির পাশাপাশি বসল এক স্বদেশী কমিশন। কিন্তু দেশী কথা সত্য ও সঙ্গত হলেও পরশাসনগর্বিত ইংরেজ তাতে কর্ণপাত করতে প্রস্তুত নয়। প্রার্থনা করা হল তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আদালতের দেওয়া শাস্তি স্থগিত রাখা হোক। তখন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ রায়পুরের লর্ড সিনহা নাম নিয়ে ব্রিটিশহাউস অফ লর্ডস-এর সদস্য এবং সহকারী ভারত-সচিব। তা হলেও কোনো আবেদনই গ্রাহ্য হল না। শুধু ১৯১৯-এর গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার য়্যাক্ট পাশ হল।

সত্যপথাশ্রিত মহাত্মা পিছু হাটতে চাইলেন। তিনিও তো রাওলাট য়্যাক্টের বিরুদ্ধে দেশকে ডেকেছিলেন সত্যাগ্রহ করতে। সত্যাগ্রহেরই বাস্তবরূপ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, অহিংসা যার প্রাণবীজ। নিজে হিংসিত হয়েও অহিংসক থাকা— সে কত উচ্চ তপস্যার কথা। সবাই সেই আদর্শে অটুট থাকতে পারেনি, উত্তেজনার মুখোমুখি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে আর তারই ফলে শাসকেরা পর্বতকায় লাঞ্ছনার সুযোগ পেয়েছে। মহাত্মা স্বীকার করলেন, আমার ভুলও পর্বতকায়— 'হিমালয়্যান ব্লাণ্ডার'— দেশবাসীকে আত্মশুদ্ধিতে দীক্ষিত না করেই সত্যাগ্রহে ডাক দিয়েছি। যারা অস্থির, অসংযত, প্রতিহিংসুক, তাদের সত্যাগ্রহী বলি কি করে?

'হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ, শক্তির উদ্বোধন।'

মহাত্মা তাই সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। কাল বুঝি এখনো পরিপক্ক হয়নি। দিগদেশ হয়নি অনুকূল। যুদ্ধে সাময়িক পিছু হটতে বা স্তব্ধ থাকতে বাধা নেই। সত্যে ঋজু না থাকাটাই বাধা। কিন্তু গান্ধী ক্ষান্ত হলেও চেমসফোর্ডের ক্ষান্তি নেই। ব্রিটিশ শাসনের স্টিমরোলার জনমঙ্গলের বুকের উপর দিয়ে যেমন-কে-তেমন চেপে চেপে পিষে-পিষেই চলেছে।

'তুমিই তো একটা জ্বলন্ত দেশলাই ছুড়ে দিয়েছ।' ইংরেজ সরকার গান্ধীর উপর মুখিয়ে উঠল : 'কী দরকার ছিল তোমার রাওলাট য়্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে?'

মহাত্মা হাসলেন। বললেন, 'তোমরা যে সেই কালা-কানুনটাকে বাঁচিয়ে রাখছ তার মানেই তো সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছ, একটা দুটো নয়, হাজার-হাজার জ্বলন্ত দেশলাই। একটাতেই এই দেখছ, হাজার কাঠি যখন একসঙ্গে জ্বলে উঠবে তখন বুঝবে।'

কিন্তু এখনো লগ্ন প্রশস্ত হয়নি। মহাত্মা তাই সংবৃত হলেন। বললেন, 'যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধী সে সরকারকে বিব্রত করতে চায় না। তাই আমি মনে করছি আপাতত আন্দোলন গুটিয়ে নিয়েই আমি স্বদেশ ও সরকারকে সার্থকতর সেবা করতে পারব।

এখন আমাদের কাজ হবে স্বদেশী ব্রত গ্রহণ ও হিন্দু-মুসলমানের একতাসাধন।'

যখন যেমন তখন তেমন। যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা। উনিশশো উনিশের ডিসেম্বরে কংগ্রেস বসল— আর কোথায়— বসল খোদ অমৃতসরে। আর সেখানে প্রদীপ্ত মহিমায় দেখা দিলেন চিত্তরঞ্জন। তার আগে মে মাসে ময়মনসিংহের প্রাদেশিক সম্মিলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। হয়তো যেতেন না, কিন্তু যেই শুনলেন জালিয়ানওয়ালার কথা, উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'অসম্ভব। ব্রিটিশ শাসনের স্পর্ধা ক্রমশই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর একটা কিছু প্রতিকার না করলেই নয়।'

কিন্তু প্রতিকারের পথ কোথায়, যদি সেদিন কেউ জিজ্ঞেস করত চিত্তরঞ্জনকে, তিনি বলতেন, 'সত্যাগ্রহে। সত্যাগ্রহ করে জেলে যাওয়ায়।'

ছয়ুই এপ্রিল কলকাতায় গড়ের মাঠে মনুমেন্টের নিচে প্রতিবাদ-সভায় চিত্তরঞ্জন সত্যাগ্রহ-শপথ গ্রহণ করেছিলেন এবং সমবেত সহস্র কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি উঠেছিল। সত্যের ডাক ধর্মের ডাক মহাত্মার ডাক, নির্দ্বিধায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বাংলাদেশ। ভারতমাতাই একমাত্র আরাধ্যা, তার শৃঙ্খলমোচনই একমাত্র ব্রত, একমাত্র কাম্যকর্ম।

'সত্যাগ্রহ-শপথ নিয়ে এলাম।' প্রাণভরা আনন্দে ঘোষণা করলেন চিত্তরঞ্জন।

'সে আবার কী শপথ?' কে একজন জিজ্ঞেস করল।

'জীবনে যা সত্য বলে বুঝব প্রাণপণে তাকে আঁকড়ে থাকব এই সঙ্কল্পের নামই সত্যাগ্রহ।'

সেই প্রাদেশিক সম্মিলনেই চিত্তরঞ্জন প্রথম অসহযোগের কথা তুললেন। যদি আমরা ওদের সংসর্গে না যাই, আমাদের সহযোগিতার হাত সরিয়ে নিই, তা হলে কী করে ওরা পরের রাজ্যে বসে মোড়লি করে দেখি। যদি ওদের ট্রেন না চলে, আদালত না বসে, ডাক-তার বিলি না হয়, তা হলে কোথায় যাবে বাছাধনরা? বাবুর্চি-খানসামা নেই, মোটরগাড়ির ড্রাইভার নেই, মাল বইবার মুটে-মজুর নেই। খাবে কী, শোবে কোথায়? যাবে কোন পথে?

অসহযোগ এক দুর্বার শক্তি। কিন্তু সুসম্পূর্ণ নয়। তবু নিরস্ত্র নিঃসহায় দেশের পক্ষে সেই একমাত্র ন্যায়ানুগত পথ। আগে পঙ্গু করো, পরে উৎখাত করার কথা ভাবা যাবে। মূলে-শাখায় বহু জট মেলে মূর্তিমান অভিশাপের মত দাঁড়িয়ে আছে, গাছ মরে গেলেও তাকে উচ্ছিন্ন করতে কুঠারের প্রয়োজন হবে। পরে দেখা যাবে কুঠার কী করে জোটে, আগে এই বিষবৃক্ষের গর্ব তো খর্ব করি।

হান্টার কমিশনে চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল নেহরু আসামীদের হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন যেমন ওডায়ার ডায়ার জনসন ডোভটনের জবানবন্দি নেওয়া হচ্ছে তেমনি ডাক্তার কিচলু ও হরকিষনলালেরও বক্তব্য শোনা যাক আর সেই উপলক্ষে তাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হোক। গভর্নমেন্ট তাদের ছাড়তে রাজি হল না। বেশ, তবে জেলেই ওদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হোক। ন্যায়তৎপর সরকার তাতেও অস্বীকৃত। চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল বর্জন করলেন কমিশন। কংগ্রেস থেকে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তারও সদস্য চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল। তা ছাড়া আরো তিন জন, মহাত্মা গান্ধী, আব্বাস তায়েবজি আর জয়াকর।

ময়মনসিং থেকে ফিরেই চিত্তরঞ্জন চলে গেলেন অমৃতসর। অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধী একেবারে পূর্ণ সহযোগিতার সুর ধরলেন আর চিত্তরঞ্জন ধরলেন পূর্ণ প্রতিরোধের। পূর্ণ প্রতিরোধের কমে কিছুতেই যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না চিত্তরঞ্জন। সর্বস্ব দিয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলে যেন সুখ নেই। অমৃতসর কংগ্রেসে জাতীয় সম্মানের জয়ঘোষণা হল। আর সে অভ্যুদয়ের নান্দীকার চিত্তরঞ্জন।

ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনভার গ্রহণ করতে উপযুক্ত এবং এই ঘোষণার বিরুদ্ধে সমস্ত অনুমান ও উক্তি অসার হতেও অসার— চিত্তরঞ্জন এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব নিয়েই গোলমাল বাধল। দ্বিতীয় প্রস্তাবে চিত্তরঞ্জন বললেন, যে রিফর্মস বা শাসনসংস্কার ভারতবর্ষকে পাঠিয়েছে পার্লামেন্ট, তা অপর্যাপ্ত অসন্তোষকর ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক। গান্ধী চাইলেন 'নৈরাশ্যব্যঞ্জক' কথাটা তুলে দিতে। শুধু তাই নয়, তিনি চাইলেন যা এসেছে যতটুকু এসেছে তাই নিয়ে কাজ করতে, বাজারে বেরিয়ে তাই বাজিয়ে দেখতে। উপযুক্ত হয়েছি শুধু মুখে বললেই তো আর হল না।

পাঞ্জাবে এত দৌরাত্ম্যের পরও ইংরেজের প্রতি মহাত্মার এই পূর্ণ সহযোগিতার ভাব দেখে অনেকেই বিমূঢ় হয়ে গেল। শুধু হাতে-কলমে সহযোগিতাই নয়, গান্ধী আরো প্রস্তাব করলেন, নতুন শাসনসংস্কার সাধনে মণ্টেগু যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তার জন্যে তাকে প্রগাঢ় ধন্যবাদ জানানো হোক।

মহাত্মার এই সংশোধন মানতে পারলেন না চিত্তরঞ্জন। টোট্যাল কো-অপারেশনের বদলে টোট্যাল অবস্ট্রাকশান, অর্থাৎ পূর্ণ সহযোগিতা নয়, পূর্ণ প্রতিরোধ, পূর্ণ প্রাতিকূল্য। যখন এ নিয়ে দু দলে লড়াই চলছে তখন এসে পৌঁছুল লোকমান্য তিলকের টেলিগ্রাম, তাতে একটি মীমাংসার সূত্র লেখা-রেসপনসিভ কো-অপারেশান, সমানুপাতিক সহযোগিতা, অর্থাৎ তুমি যদি বন্ধুতায় হাত বাড়াও আমিও বন্ধুতায় প্রসারিত হব, আর তুমি যদি মুষ্টি বদ্ধ করো জানবে আমিও প্রত্যাঘাতে প্রস্তুত। বাস্তবতর করে বলা যাক, যে সব ব্যবস্থা আমাদের স্বরাজলাভের অনুকূল বলে মনে হবে তার সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করব আর যা তা হবে না তার সঙ্গে আমাদের নিষ্কুণ্ঠ অসহযোগ।

'সোজাসুজি', বললেন চিত্তরঞ্জন, 'স্বরাজের স্বার্থে যখনই দরকার বুঝব সরকারের সঙ্গে মিতালি করব আর স্বরাজের স্বার্থেই যখন দরকার বুঝব করব বিরুদ্ধতা।'

সন্দেহ কী, অমৃতসরে চিত্তরঞ্জনেরই জয় হল। তিনি রুখে না দাঁড়ালে তিলকের সূত্রও হয়তো গৃহীত হত না। তবে রিফর্মস নৈরাশ্যব্যঞ্জক এ কথাটা শুধু বাদ গেল। আর মণ্টেগুর জন্যে ধন্যবাদ থাক, কিন্তু তা প্রগাঢ় নয়, তা এমনি ধন্যবাদ।

মহাত্মা কেন নরম হলেন তার আভাস দিলেন। তাঁর কাছে প্রাপ্তি যেমন মহৎ তেমনি পদ্ধতিও মহৎ। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র কি মহৎ নয়? নিশ্চয়ই মহৎ। কিন্তু তোমার উপযুক্ত অস্ত্র কই? বিপ্লব মহৎ নয়? নিশ্চয়ই মহৎ। কিন্তু তোমার জনগণের সেই জাগৃতি কই, প্রস্তুতি কই? এক্ষেত্রে তুমি ছিলে সত্যাগ্রহী, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধী, অহিংসায় ব্রতবদ্ধ। তুমি কেন ন্যায়ানুগত থাকবে না? তুমি কেন পথভ্রষ্ট হবে?

'সংশয় নেই আমরাও ধ্বংস ও হিংসার দৃষ্টান্ত রেখেছি, এখানে-সেখানে, বোম্বাইয়ে, আহমেদাবাদে।' বললেন মহাত্মা, 'জানি কিচলু আর সত্যপালের গ্রেপ্তার, আমার গ্রেপ্তার

যথেষ্ট উত্তেজনা জুগিয়েছিল। এ সব গ্রেপ্তার না হলে হয়তো কোনো অশান্তি হত না। কিন্তু গভর্নমেণ্ট উন্মাদ হয়ে গেল, দেখাদেখি আমরাও উন্মাদ হলাম। কিন্তু আমি বলি উন্মত্ততার বিনিময়ে উন্মত্ততা ফিরিয়ে দিও না, উন্মত্ততার বিনিময়ে প্রকৃতিস্থতা ফিরিয়ে দাও। সত্যই সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ।'

প্রশ্ন এই, সাধারণ মানুষ, নির্যাতিত উত্তেজিত মানুষ এ সব কথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠিক বুঝতে পারবে কি না। কিন্তু সর্বস্বপণ প্রতিরোধ বুঝতে পারবে। বললেন চিত্তরঞ্জন। প্রতিরোধ প্রতি পদে, প্রতি পথে, এমন কি আইনসভায়। পরাধীন জনতার ভাষাই প্রতিরোধের ভাষা।

'তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে
হয়তো দুয়ার টলবে না
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।'

রাজনৈতিক বন্দীরা ছাড়া পেল। ছাড়া পেল আলি-ভাইয়েরা, সওকত আলি আর মহম্মদ আলি। প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনির মধ্যে কংগ্রেসমঞ্চে হাজির হল দু ভাই। মহম্মদ আলি বললে, 'ছিন্দওয়ারা জেল থেকে আমি এসেছি কিন্তু এসেছি রিটার্ন টিকিট করে।'

তার মানে আবার শিগগিরই আমাকে জেলে ফিরে যেতে হবে। 'রিটার্ন টিকিট'-এ যেন এক নতুন সম্পদ, নতুন অধিকার।

দু মাস পরে বেসরকারী পাঞ্জাব-তদন্তের রায় বেরুল। বিচারকেরা জাতির পক্ষে এই দাবী করলেন চেমসফোর্ডের ও ওডায়ারের পদচ্যুতি হোক, জেনারেল ডায়ারের শাস্তি হোক ও যত জরিমানা আদায় হয়েছে, ফিরিয়ে দেওয়া হোক। প্রত্যাহৃত হোক ঐ কালা-কানুন রাওলাট য়্যাক্ট।

কা কস্য পরিবেদনা! জাতীয় দাবী অগ্রাহ্য হল, গৃহীত হল হাণ্টার কমিটির মেজরিটি রিপোর্ট। তাতে বলা হল জেনারেল ডায়ার কিছুমাত্র অন্যায় করেনি, তবে কোথাও-কোথাও উচ্চতর কর্তব্যবোধের খাতিরে বিচারে ভ্রম করেছে, সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। বিচারভ্রম মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তার জন্যে ডায়ারকে মন্দ না বলে তার উদ্দেশ্যের সততা ও কর্তব্যবোধের দৃঢ়তার জন্যে তাকে প্রশংসা করা উচিত। অনেক কষ্টে এটুকু শুধু বিরুদ্ধ কথা লেখা হল যে ডায়ারকে ভারতবর্ষের চাকরিতে আর না রাখাই সঙ্গত। এটুকু বিরুদ্ধ কথাও হাউস অফ লর্ডস অনুমোদন করল না। ডায়ার কলঙ্কলেশশূন্য হয়ে গেল।

মেজরিটি রিপোর্ট ওডায়ারের কেশাগ্রও স্পর্শ করল না। আর চেমসফোর্ড তো চূড়ারও চূড়ার উপরে। শুধু নিষ্কলঙ্ক বলা নয় দুই ডায়ারের গলায় টাকার মালা পরিয়ে দিল ইংরেজ। ইংলণ্ড জুড়ে সে কী আন্দোলন, দুই ডায়ারের জন্যে অকুণ্ঠ হয়ে চাঁদা দাও। যে মহৎ কীর্তি তারা ভারতবর্ষে স্থাপন করেছে, নির্বিচল কর্তব্যসাধনের কীর্তি, তা প্রচুর হাতে পুরস্কৃত হবার উপযুক্ত। ইংরেজ ছাড়া এই কর্তব্যের মর্যাদা কে বুঝবে? সুতরাং দরাজ হাতে টাকা দাও। বিশ্বাস হয় না এমনি একটি বিপুল অঙ্ক তুলে ফেলল ইংরেজ। দুই 'ডায়ার', না দুই 'কিলারের' ব্যাঙ্কে বোঝাই করে দিল। আর মণ্টেগু, যাকে কিনা রিফর্মসের গুঁড়োগাঁড়ার জন্যে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছিল সে জেনারেল ডায়ারের

পিঠ চাপড়ে দিল। এই বুঝি উটের পিঠে শেষ খড়।

প্রতিবাদে উনিশ শো কুড়ি সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার স্পেশাল কংগ্রেস গর্জে উঠল। এবং সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, মহাত্মা গান্ধী, যিনি এক বছর আগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন তিনি এবছর হয়ে দাঁড়ালেন অসহযোগী। তিনি তিন বর্জনের পথ বাতলালেন। আইনসভা বর্জন, আদালত বর্জন, স্কুল-কলেজ বর্জন। শুধু বর্জনে চিত্তরঞ্জন তৃপ্ত নন, কিছু একটা গ্রহণ প্রয়োজন। শুধু বর্জনে যেন চরিত্রকে নির্জীব করে ফেলবে, বরং গ্রহণেই আছে সক্রিয় রণোন্মুখতা। শুধু নেতি নয়, প্রেতি। শুধু ছাড়া নয়, কিছু একটা ধরা, কাড়া আর তার জন্যে লড়া। শুধু না করে মরা নয়, কিছু একটা করে মরা।

চিত্তরঞ্জন বললেন, অন্তত আইন-সভাটা খোলা থাক। ওখানে গিয়ে আমরা বিস্তৃততর প্রতিরোধের ক্ষেত্র রচনা করতে পারব।

এ প্রস্তাব গান্ধীজির মনঃপূত হল না। সভাপতি লাজপত রায়ও গান্ধীর বিরুদ্ধে। ইংরেজ তাঁকে যুদ্ধের চার বছর ভারতের বাইরে নির্বাসিত রেখেছিল, তা সত্ত্বেও তিনি বুঝেছিলেন সর্বাংশে সরকার-বর্জন কোনো কাজের কথা নয়। আর চিত্তরঞ্জন বললেন, 'রিফর্মস ইংরেজদের ভিক্ষার দান নয়, আমাদের কষ্টার্জিত সম্পত্তি। এ আমরা ছেড়ে দেব না। আমার তো মনে হয় বাইরে থেকে যত নয় কাউন্সিলের ভিতর থেকেই আমরা গভর্নমেণ্টকে তার চেয়েও বেশি ঘায়েল করতে পারব।'

কে জানে বর্জনের মধ্য দিয়েই হয়তো বৃহত্তর অর্জন করা যাবে, উৎখাত করা যাবে এই শয়তান গভর্নমেণ্টকে, মহাত্মার মূল অসহযোগ প্রস্তাব বেশি ভোটে পাশ হয়ে গেল। গভর্নমেণ্টকে গান্ধী 'স্যাটানিক' বললেন। ভূতরাজ গভর্নমেণ্ট।

খিলাফত আন্দোলন মহাত্মার সহায়তা করল। আসলে খিলাফত ব্যাপারটা কী? গত যুদ্ধে তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানির হয়ে লড়েছে। ভারতীয় মুসলমান তুরস্কের বিপক্ষে আনুকূল্য করেছে এই আশ্বাসে যে যুদ্ধান্তে তুরস্কের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। ইংরেজ বললে, 'না, কথা দিচ্ছি, যুদ্ধজয়েও তুরস্ককে অব্যাহত রাখব। ইংরেজ কবে তার কথার সম্মান রেখেছে? বিপদ দেখলে মানুষ সাজে, আবার বিপদ কাটলেই বনমানুষ হয়ে যায়। যুদ্ধে তুরস্কের সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং মুসলমানদের অনেক পুণ্যস্থান খ্রীস্টানি আধিপত্যে চলে আসে। মুসলমান সমাজ আন্দোলিত হয়ে ওঠে আর সেই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ায় দুই আলি ভাই, সওকত আলি আর মহম্মদ আলি, দুজনেই অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট, আর তাদের পাশে জায়গা নেয় আবুল কালাম আজাদ আর হাকিম আজমল খাঁ। তারা ঘোষণা করল অসহযোগ।

গান্ধীজি ভাবলেন এই সুযোগ ছাড়া নয়, এই সম্মিলিত জনমত। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করলেন। সবাই একবাক্যে মেনে নিল স্বরাজই দেশের সমস্ত দাহ-জ্বর তাপ-জ্বালার একমাত্র ধন্বন্তরি। কলকাতা কংগ্রেসে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত কিছু হল না, শুধু কংগ্রেসের মূল সূত্রটা উচ্চারিত হল। পরিপূর্ণ ঘোষণা হবে নাগপুর কংগ্রেসে, ডিসেম্বরে, বিজয়রাঘবাচারিয়ারের সভাপতিত্বে।

এদিকে লোকমান্য তিলক মারা গেলেন। তিলক বোধহয় একমাত্র নেতা যিনি প্রভাববিস্তারে গান্ধীর সমকক্ষতা করতে পারতেন। গান্ধীর একচ্ছত্রতার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী অপসৃত হল।

কিন্তু গান্ধীজি বুঝলেন চিত্তরঞ্জনকে তাঁর চাই। এত দীপ্ত এত আবেগ এত প্রাণময়তা আর কোথায় মিলবে? তা ছাড়া চিত্তরঞ্জন বাংলা দেশ থেকে প্রায় আড়াই শো ডেলিগেট নিয়ে এসেছেন, তাদের যাওয়া-আসা-থাকার সমস্ত খরচ, ছত্রিশ হাজার টাকা, নিজে একলা বহন করেছেন। তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে চাইলেন গান্ধীজি। চিত্তরঞ্জনকে কাছে ডেকে নিলেন। 'এখন আর কাউন্সিলে ঢোকা নিয়ে প্রতিবাদ করে কী হবে? এবারের ইলেকশন তো হয়ে গিয়েছে।'

'তাইতো দেখতে পাচ্ছি।' গম্ভীর হলেন চিত্তরঞ্জন।

উনিশ শো কুড়ির অক্টোবরেই প্রথম ইলেকশান হয়ে গিয়েছে। জাতীয়তাবাদীরা দাঁড়ায়নি বলে মডারেটরা মনের সুখে গদিতে গিয়ে বসল। 'এইখানেই তো বিষম ভুল হল। এই সব খয়ের খাঁ মডারেটরা জনগণের প্রতিনিধি সাজল। ইংলণ্ড বলে বেড়াবে দেখ, ভারতবর্ষ তার নিজের নির্বাচনে প্রদেশে-প্রদেশে কেমন সব দেশী সরকার স্থাপন করেছে। আর কত চাই, তাদের আমরা স্বায়ত্তশাসনের দিকে অনেকদূরে এগিয়ে দিয়েছি। বলতে পারবে না আমরা ভারতহিতৈষী নই। 'তার মানে' বললেন চিত্তরঞ্জন, 'চারিদিকেই শুধু ধোঁকার টাটি ফেলা হল, শুধু ছদ্মবেশে রণসজ্জা।'

কিন্তু কী করা যাবে, ডিসেম্বরে অক্টোবর নেই। নির্বাচন যখন হয়ে গিয়েছে তখন আর সে প্রসঙ্গ ওঠে না। সে প্রসঙ্গ মৃত, নিরর্থক।

আবার উল্টো ঘরে গিয়ে বসলেন দুজনে, গান্ধী আর চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জন গান্ধীর আগের বছরের কথা ধরলেন, দেশ এখনো অহিংস অসহযোগের জন্যে প্রস্তুত হয়নি, অন্তত পাঁচটি বছর সে প্রস্তুতিসাধনে ব্যয় করা হোক। আর গান্ধী ধরলেন চিত্তরঞ্জনের আগের বছরের সুর, এখুনি, এই স্বর্ণমুহূর্তেই আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। দুই নেতায় আবার বিভেদ দেখা দিল। আর তাঁদের দুয়ের মধ্যে সওকত আলি শাটলককের মত ছুটোছুটি করতে লাগল। অবশেষে মিল হল দুজনে। কংগ্রেসের কনস্টিটিউশন সংশোধিত হল। আগে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বরাজলাভ, এখন হল যে কোন ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজলাভ। 'যদি সম্ভব হয়', গান্ধী বললেন, 'সাম্রাজ্যের মধ্যে, আর যদি প্রয়োজনীয় হয়, সাম্রাজ্যের বাইরে।'

ত্রিন-বর্জন অসহযোগ গৃহীত হল সোল্লাসে। শনৈঃ শনৈঃ কিছু নয়, একেবারে একসঙ্গে, সব কিছু নিয়ে, অতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়া।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে শঙ্খনির্ঘোষে বলে উঠলেন চিত্তরঞ্জন : 'আমি আমার প্র্যাকটিস ছেড়ে দেব।'

সে কী প্রচণ্ড উল্লাস, বিপুল করধ্বনি! ভোগের রাজা ত্যাগের ফকির হয়ে যাবেন। ত্যাগের ফকির নয়, ত্যাগের বাদশা হয়ে যাবেন। এমনটি হবেন যেমনটি আর কেউ দেখেনি দুনিয়ায়।

অসহযোগের যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে বলা হল অহিংসা শুধু কর্মে নয় বাক্যেও পালন করতে হবে। যদি মনেও অহিংসা লালন করা না হয় তা হলে সত্যিকারের গণতন্ত্রের বনেদ তৈরি হবে না, এক পদের অহিংসা অন্য পদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। কংগ্রেসের মধ্যে যারা চরমপন্থী, যারা লেফট-উইঙ্গার বা বামপক্ষীয়, তারা এই

ধার্মিক অসহযোগে খুশি হতে পারল না। তারা বললে প্রাপ্তিই প্রশ্ন, পথ প্রশ্ন নয়। যে কোনো উপায়ে, তা অহিংস হোক কি সহিংস হোক, মৃদু হোক কি রুদ্র হোক, পূর্ণ স্বাধীনতা কেড়ে নিতে হবে, আর স্বাধীনতায় কোনো রফা নেই আপোস নেই বিকল্প নেই।

অহিংসা ছাড়া এই অসহযোগ নতুন আর কী দিতে পারল? উনিশ শো পাঁচ সালের বাংলা আগে থেকেই সব গেয়ে রেখেছে। বিদেশী-বর্জন? তারও অগ্রদূত বাংলা। জাতীয় শিল্প জাতীয় শিক্ষা জাতীয় সাহিত্য— তারও প্রথম প্রবর্তন বাংলায়। ইংরেজের আদালতের বিচার বর্জন করারও প্রথম নেতা বাংলা— বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল। আর ট্যাক্স না দেওয়ার নীতিও এই বাংলাতেই প্রথম সুরু, যখন নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যশোর ও নদীয়ার চাষীরা একজোট হয়ে চাষ বন্ধ করে দিয়েছিল, অস্বীকার করেছিল খাজনা দিতে। দেখিয়েছিল কী করে মার খেয়ে খেয়ে মরীয়া হয়ে অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরতে হয়। অস্পৃশ্যতাবর্জন? তারও প্রথম নেতৃত্ব বাংলায়, স্বামী বিবেকানন্দ। স্বদেশী-বিদেশী এমন কোনো আন্দোলন নেই যা প্রথম বাংলার মাটি থেকে না সার সংগ্রহ করেছে।

বাংলা আজ যাই ভাবছে কাল তাই ভারতবর্ষের ভাবনা। বলতে গেলে, বাংলাদেশই ভারতবর্ষের মর্মের কামনা।

গান্ধীজি নতুন এক আঙ্গিক যোজনা করলেন। অহিংসা। অহিংসাই গণমানসের দুর্ভেদ্য দুর্গ। সেখানেই তার সমস্ত রণসম্ভার। তার দৃঢ়তা তার বলবীর্য তার অপ্রকম্প পৌরুষ। নিরস্ত্র দেশের অহিংসা ছাড়া বৃহত্তর কৌশল নেই। হয়তো বা মহত্তর কৌশল। সমস্ত দেশ অহিংসায় বদ্ধপরিকর হল।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লেবার-মেম্বার বেন স্পুর ও কর্নেল ওয়েজউড নাগপুর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিল। তারা ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন থাকলেও অসহযোগকে অভ্যর্থনা করতে পারল না! ওয়েজউড স্পষ্ট বললে, 'এতে তোমরা তোমাদের ইংলণ্ডের বন্ধুদের হারাবে। তোমাদের আসল কাজে বারে বারে বাধা পাবে। পুলিশ সব সময়ে তোমাদের পিছনে লেগে থাকবে। উকিলেরা তাদের সনদে সর্ত করে এসেছে যে তারা ব্রিটিশ ক্রাউনের অনুগত থাকবে, কথার খেলাপ করে উকিলেরা কী করে অসহযোগ করবে? এ তোমরা মরুভূমির দিকে চলেছ। এ পথ ছাড়ো, গঠনমূলক কার্যসূচী স্থির করো।'

'ভারতবর্ষের বাইরে আমাদের কেউ বন্ধু নেই।' জনতার মধ্য থেকে কে একজন গর্জে উঠল : 'এ সম্বন্ধে কোথাও যেন বিন্দুমাত্র মোহ না থাকে, পৃথিবীতে আমরা বন্ধুহীন। আমরাই আমাদের একমাত্র বন্ধু, আমরাই আমাদের একমাত্র উদ্ধারকর্তা। আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা আমাদেরই হাতে। করলে আমরাই সৌধনির্মাণ করব, নইলে আমরাই করে তুলব ভগ্নস্তূপ। বিদেশীদের ছেঁদো কথায় আমরা আর ভুলছি না। পুলিশ? ও তো আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, মৃত্যুর ছায়ার মত প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গী। গত পনেরো বছরে আমরা যদি একটা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করে থাকি, জানবে এর জন্যে প্রতিটি টাকা আমরা লাল-পাগড়ির আতঙ্ককে আড়াল করে তিল-তিল করে সংগ্রহ করেছি। ওকালতি করতে হলে ব্রিটিশ শাসনের আনুগত্য করতে হবে সনদে এই চুক্তি

আছে জানি, তাই তো উকিলদের আজ বলা হচ্ছে সে অবমাননাকর সনদ ছিঁড়ে ফেলুন। মরুভূমির দিকে না এগিয়ে উপায় নেই, যেহেতু আমাদের সেই প্রাচুর্যের দেশ সেই দুধ-মধুর দেশ ঐ মরুভূমিরই ওপারে। এই বন্ধনবেদনার রাজ্য থেকে বেরিয়ে আলো-হাওয়ার অবাধ দেশে, স্বাধীনতার দেশে যেতে হলে ঐ মরুভূমির মধ্য দিয়েই তো যেতে হবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ঐ ক্লেশ-কণ্টকের পথ দিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের একজন নেতা চাই, সে শুধু বন্ধন থেকে মুক্তিতেই নিয়ে যাবে না, অসত্য থেকে সত্যে, তমসা থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতেও আমাদের নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে আদর্শহীনতা থেকে এক চরম চারিত্রিক উৎকর্ষে। তোমরা বোসো, চুপ করো। আমরা পেয়েছি আমাদের সেই নেতা, সেই মহান পথপ্রবণতা। শুনেছি তাঁর পাঞ্চজন্যের ডাক।'

আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্যে ম্যাকসুইনি পঁয়ষট্টি দিন উপোস করে থেকে প্রাণত্যাগ করেছে সেই আত্মোৎসর্গকে অভ্যর্থনা জানাল কংগ্রেস।

ছাড়ো, বেরিয়ে এস, বন্ধ করো, হাত তুলে নাও, গুটিয়ে নাও, ওদের দিকে ফিরেও চেয়ো না— দিকে-দিকে বেজে উঠল অসহযোগের ডাক। ওদের পঙ্গু করে দাও, নিশ্চল পাথর করে ছাড়ো। চিত্তরঞ্জন তাঁর রাজকীয় প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গেই হয়ে দাঁড়ালেন দেশবন্ধু।

বাংলার স্কুল-কলেজ থেকে দলে-দলে ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসতে লাগল। সমস্ত ভারতবর্ষে অসহযোগী ছাত্র-ছাত্রী বাংলাতেই বেশি, সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। মহাত্মার ডাকে যা সম্ভব হয়নি তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র চিত্তরঞ্জনের ত্যাগে। শুধু ত্যাগ নয়, অপরিমেয় ত্যাগ। এক তন্তু নিজের জন্যে না রেখে সর্বস্ব দেশমাতৃকাকে উৎসর্গ করে দেওয়া। এমন ত্যাগ যাতে আপস নেই হিসেব নেই দোকানদারি নেই। এতেই তো মানুষ অভিভূত হয়ে যাবে। যে দেখবে সেই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠবে। সমস্ত প্রাণমনকে বাঁধবে এক নতুন চেতনার সুরে।

ছাত্রদের বললেন, তোমাদের লেখাপড়া দু এক বছর বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম বন্ধ থাকতে পারে না। কিন্তু এই সংগ্রামে আমার সেনাপতি কই? কই আমার দক্ষিণ হস্ত? উদ্যতায়ুধ দক্ষিণ হস্ত? সে কবে আসবে?

হাতের সমস্ত ব্রিফ ফিরিয়ে দিলেন মক্কেলদের, অন্য ব্যারিস্টার দেখ, আইনের চোখে আমি এখন অস্তিত্বহীন। আষাঢ়ে গল্পের মত শোনাবে এমন প্রকাণ্ড ফি দিয়েও কেউ তাঁকে আটকাতে পারল না। আপনাকে কোর্টে যেতে হবে না, আপনি আপনার বাড়িতে বসেই দুটো আইনের পরামর্শ দিন, যেমন চান তেমনি ফি দেব, আকাশছোঁয়া টাকা। না, আইনের পরামর্শ নয়, দেশ স্বাধীন করার পরামর্শ দিতে পারি, আর তা কোন ফি নিয়ে নয়, প্রাণের বিনিময়ে। এখন স্বরাজই একমাত্র ধ্যান, একমাত্র উপাসনা। নিয়ত সংগ্রামই সেই আরাধনার রূপ। দু দণ্ড স্থির হয়ে বসবার সময় নেই, বাড়িতে সন্ধ্যায় যে কীর্তন বসাতাম তা পর্যন্ত বন্ধ।

কত লোক মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে বসল। তোমরা কাঁদছ কেন? আমরা যে দুঃস্থ দুর্গত দুরদৃষ্টের দল। আর উনি তো দেশবন্ধু নন, উনি দীনবন্ধু। আমাদের যে উনি মাস-মাস টাকা দিতেন, আঁজলা ভরা টাকা, বাঁচিয়ে রাখতেন অভাব ও অনাহারে

গ্রাস থেকে। উনি তো শুধু দেশবীর নন, দানবীর। উনি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন, রোজগার বন্ধ, আমরা তবে কার কাছে যাব? কে আমাদের দেবে? কে দেখবে?

দেশবন্ধু বললেন, ভগবান দেখছেন ভগবানই দেখবেন। আর দেনেওয়ালাও ভগবান। আমি কে? আমি কিছু না।

শুধু প্র্যাকটিসই ছাড়লেন না, সমস্ত বিলাসিতা ছাড়লেন। একটু-একটু করে রয়েসয়ে ছাড়া নয়, একেবারে একসঙ্গে একটানে সর্বস্ব ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। পারের সমস্ত দড়াদড়ি রশারশি ছিঁড়ে দিয়ে, কান্না-কোলাহলে কান না দিয়ে, কোন মহাজীবনের ডাকে সমুদ্রে পাল তুলে দেওয়া। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে সযত্নে পুঁটলি বাঁধা হয়েছিল, সেই বস্ত্রখণ্ডকেই মুক্ত করে নিয়ে পাল খাটানো। নিজের মাঝে উন্মোচন না ঘটিয়ে বন্ধনমোচনব্রতে লাগি কী করে?

ষাট ইঞ্চি বহরের মিহি ঢাকাই ধুতি পরতেন, তাতে কত রকমের কুঞ্চনের কারুকার্য, কিন্তু এখন? এখন পরছেন কর্কশ কদ্দর, যেমন মোটা তেমনি খাটো। গায়ে দিতেন গিলে-করা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, কিন্তু এখন? এখন গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। তাঁর এসব পরতে কোনো কষ্ট নেই কিন্তু যারা তাঁকে দেখছে এ পোশাকে, তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। এ যেন কাষায় পরে রাজ্য ছেড়ে চলেছে সিদ্ধার্থ।

আর দেবী বাসন্তী? তিনি শিবের পাশে শিবানী হয়ে দাঁড়ালেন। অগ্নির ধর্ম উত্তাপ ও ঔজ্জ্বল্য, স্ত্রী ধর্ম সমতা, সহযোগিতা। বাসন্তী দেবীও মিহি শান্তিপুরি শাড়ি ছেড়ে বিছানার চাদরের মত মোটা খদ্দর ধরলেন, তাও মাঝখানে জোড়া দেওয়া আর যেমন ভারি তেমনি স্থূল। পাড় হয় ঢালা লাল নয় ঢালা কালো, কালো যদি বা পরাধীনতার বেদনা হয়, লাল স্বাধীন হবার স্বপ্ন। মূর্তিমান ত্যাগের পাশে মূর্তিমতী প্রশান্তি। যার কিছু নেই সে ত্যাগ করবে কী? ত্যাগ করবে গৌতমবুদ্ধ। ত্যাগ করবে চিত্তরঞ্জন।

উনিশশো একুশের ফেব্রুয়ারিতে মহাত্মা কলকাতা এলেন আর খুললেন জাতীয় কলেজ। নাম হল গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন।

ছেলেরা গোলামখানা ছেড়ে দিয়ে শুধু ফুটপাতে বসে থাকবে না, তারা তাদের জাতীয় কলেজে ঢুকবে, তাদের বিদ্যার মন্দিরে, আয়তনের আরেক অর্থ মন্দির। সে মন্দিরেই তারা ঠিক-ঠিক জানবে তাদেব ইতিহাস, তাদের সংস্কৃতি, তাদের সূচনার মধ্যে কী মহৎ ভবিষ্যৎ, কী সুদূর সম্ভাবনা। তারা ইংরেজের গোলাম হতে জন্মায়নি, তারা জন্মেছে দেশের সেবক হতে। নিজে যদি বলী না হও তবে দেশমাতার কাছে বলি হবে কী করে?

গান্ধীজি চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে আছেন। তাঁর প্রাত্যহিক সুতো কাটায় ডাকলেন চিত্তরঞ্জনকে। অনেক তোড়জোড় করে চিত্তরঞ্জন বসলেন চরকা নিয়ে। কিন্তু চাকাই শুধু ঘোরে, ছুঁচের মুখে পাঁজের তুলো শুধু জট পাকায়, এক গাছি সুতোও বের হয় না।

মহাত্মাজি হাসলেন। বললেন, 'তুমি এ কাজের যোগ্য নও।'

উঠে পড়লেন চিত্তরঞ্জন। না, এ আমার যোগ্য নয়। আমি বোধ হয় আর কোনো চক্রের পক্ষপাতী, চিত্তরঞ্জন পূর্ববঙ্গ সফরে বেরুলেন। আগে নারায়ণগঞ্জে, পরে ঢাকা

থেকে ময়মনসিং। ময়মনসিং রেলস্টেশনে দেশবন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে বিরাট জনতার সমাবেশ হল। সেই জনসংঘট্ট দেখে ঘাবড়ে গেল ম্যাজিস্ট্রেট। চিত্তরঞ্জনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসল। যেহেতু তোমার পদার্পণে ময়মনসিং শহরের শান্তিভঙ্গ হবার সম্ভাবনা এতদ্দ্বারা তোমাকে আদেশ করা যাচ্ছে যে তুমি এই শহরে না ঢোকো।

চিত্তরঞ্জন বললেন, 'আমি আইন অমান্য করব।'

তাঁর সহচর সহকর্মীরা বললে, আপনি এখন আইন অমান্য করে জেলে গেলে সমস্ত আন্দোলন ব্যাহত হবে, সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ নিষেধটা আন্দোলনেরই সহায়ক। তা ছাড়া কংগ্রেস এখনো আইন অমান্য করার নির্দেশ দেয়নি।

দেশবন্ধু নিরস্ত হলেন। জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, 'তবেই দেখুন রিফর্মস আমাদের কী দিয়েছে? না দিয়েছে চলবার স্বাধীনতা, না বা বলবার, যদিও আমরা অহিংসায় প্রতিশ্রুত। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আজ এ বেআইনি আদেশ মেনে নিচ্ছি কিন্তু আমি চাই বেআইনি আইন অমান্য করবার জন্যে দেশবাসীকে আহ্বান করুক কংগ্রেস। স্বরাজ ছাড়া জীবন অসহ্য।'

ময়মনসিঙে বিনা-নোটিশে সর্বব্যাপক হরতাল হয়ে গেল। কেউ-কেউ বললে, সাত দিন চালাব, যতদিন না দেশবন্ধু আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান।

শোনা গেল রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ঢুকতে দেয়া হয়নি আরাতে, লাজপত রায়কে পেশোয়ারে। কোথাও আইন অমান্য হয়নি।

চিত্তরঞ্জনকে গান্ধীজি তার পাঠালেন, আইন অমান্যের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যেই আমাদের সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় বাধ্য থাকতে হবে।

এই অমান্য আন্দোলনের ভূমিকাও বাংলাদেশে, নিমাইয়ের নদীয়ায়। নগরকীর্তন বন্ধ করার আদেশ দিয়েছে কাজি। সবাই ভাবছে, এবার তবে নবদ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই, কীর্তনই যদি বন্ধ হল তবে বিরস জীবনে সুখ কী! নিমাই রুদ্র মূর্তি ধরল। বললে, আমি নিজে কীর্তন নিয়ে বেরুব নগরে, দেখি কে আমাকে বন্ধ করে! তোমরা তিলার্ধও ভয় কোরো না। মৃদঙ্গ মন্দিরা নিয়ে দলে-দলে চলো আমার সঙ্গে। লোকসমুদ্র দেখে কাজি পালাল অন্তঃপুরে। দণ্ড নিল বুক পেতে। আদেশ প্রত্যাহার করল। কাজি-দমন হল। নদীয়ার পথে পথে চলল আবার নগরকীর্তন।

ময়মনসিং থেকে চিত্তরঞ্জন গেলেন টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল থেকে চাঁদপুর, চাঁদপুর থেকে চলেছেন মৌলবিবাজার। চাঁদপুরে জেলেরা এসেছিল দেখা করতে। জেলে নৌকোয় সমস্ত নদী ভরে গেল। নৌকোর ভিড়ে চলতি স্টিমারগুলো দাঁড়িয়ে রইল। জেলেরা দেশবন্ধুর জন্যে দর্শনী নিয়ে এসেছে। দর্শনী আর কী, সদ্যধরা মাছ, ডোল-ভরতি মাছ, মাছের পাহাড় হয়ে উঠল। মৌলবিবাজারের পথে প্রতি রেল স্টেশনে মানুষের স্তূপ। দেশবন্ধুকে দেখবে। একবার তিনি দাঁড়ান দরজার সামনে। একবার তাঁকে দেখি। শুনি তাঁর সৌম্যস্বর। রাত প্রায় চারটে, দেশবন্ধু তাঁর কামরায় অপার বার্থে ঘুমুচ্ছেন, সঙ্গে আছেন বাসন্তী দেবী আর হেমন্ত সরকার। হঠাৎ দরজা ঠেলে এক উন্নতকায় বলিষ্ঠ শিখ ভদ্রলোক কামরাতে ঢুকে পড়ল!

'কী চাই?' হেমন্ত বাধা দিল।

'দেশবন্ধু কোথায়?'

'কেন, তাঁকে কেন? তিনি ঘুমুচ্ছেন।' আপার বার্থের দিকে ইঙ্গিত করল হেমন্ত।

'হ্যাঁ, এই তো।' শিখ ভদ্রলোক আনন্দে বিভোর হয়ে গেল: 'তাঁকে দেখবার জন্যে এই দূরাঞ্চলে আসতে আমি সাত দিন ধরে হেঁটেছি আর দু দিন ধরে ঠায় বসে আছি প্ল্যাটফর্মে। পেটে দু দিন কিছু পড়েনি। না পড়ুক, তবু দেখা যে পেয়েছি এই আমার ভাগ্য।' বলে বিরাট বাহু মেলে দেশবন্ধুকে সে জড়িয়ে ধরল, প্রায় বুকে করেই নামিয়ে আনল নিচে।

দেশবন্ধু ভীষণ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন ট্রেনদুর্ঘটনা বোধ হয়। পরে বুঝলেন এ হচ্ছে তাঁর মাধ্যমে ভক্তের দেশবন্দনা। বহুদিনের নিরুদ্ধ আবেগ যেন আজ মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে।

এলেন বরিশাল। সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল।

বিপিন পাল বললেন, ম্যাজিকে বিশ্বাস করি না, লজিকে বিশ্বাস করি। স্বরাজকে নির্বিশেষ রাখলে চলবে না, স্বরাজকে হতে হবে গণতান্ত্রিক স্বরাজ।

চিত্তরঞ্জন মানতে চাইলেন না। তিনি বললেন, কোনো বিশেষণ দিয়ে স্বরাজকে চিহ্নিত বা খণ্ডিত করা নয়। স্বরাজ একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা। জীবনের সার্বিক ও আগ্রিক অভ্যুদয়। আর, লজিক ভালো বটে কিন্তু মাঝে মাঝে লজিকের বাইরেও কিছু ঘটে যাকে নিছক ম্যাজিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিপিনচন্দ্র ভিন্ন হয়ে গেলেন। তিনি গান্ধীবাদ মেনে নিতে পারলেন না। চিত্তরঞ্জন দুঃখিত হলেন কিন্তু হতাশ হলেন না। একজন যাবে আরেকজন আসবে, একজন পড়বে আরেক জন উঠবে, স্বাধীনতার জয়যাত্রা পথভ্রষ্ট হবে না। সব পথই স্বাধীনতার পথ। যে বিমুখ হয়ে চলে যাচ্ছে তার দিকে না তাকিয়ে যে আসছে তার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকাই ভালো।

খবর এল চাঁদপুরে-চট্টগ্রামে রেল-স্টিমারের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছে। মেদিনীপুরে সুরু হয়েছে ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে ট্যাক্সবন্ধের আন্দোলন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বুঝতে পারছে সঙ্ঘশক্তির সঙ্ঘর্ষ। শ্রমিক আন্দোলনের নায়ক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, না-ট্যাক্স আন্দোলনের নায়ক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। একজন দেশপ্রিয় আরেকজন দেশপ্রাণ।

শ্রমিক ধর্মঘট দীর্ঘদিনব্যাপী হল বলে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল, কিন্তু মেদিনীপুর অবাঞ্ছিত আইন উঠিয়ে দিয়ে তবে ছাড়লে। কোনো পীড়ন-নির্যাতনেও সে কাতর হল না, মিলিটারি পুলিশের বুটের ঠোক্করেও বাঁকা করল না মেরুদণ্ড। ক্ষুদিরামের মেদিনীপুর, সংগ্রামে সব সময়েই অনন্য ও অগ্রগণ্য। দেয়ালে লেখা কালো অক্ষরের মলিন আইন মুছে দিল দেয়াল থেকে।

উনিশ শো একুশের মে-তে সুভাষ আই-সি-এস এ ইস্তফা দিয়ে ষোলই জুলাই বোম্বাই পৌঁছুল। বোম্বাইয়ে প্রথম ও একমাত্র কাজই হচ্ছে মহাত্মার সঙ্গে দেখা করা। পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য কী। কোথা থেকে সুরু করে কী ভাবে কোথায় গিয়ে পৌঁছুতে হবে।

মণিভবনে সুভাষের ডাক পড়ল। সেখানেই আছেন গান্ধীজি। সুভাষ ঢুকেই অপ্রতিভ

হয়ে গেল, মহাত্মা ও তাঁর আশেপাশের সহকর্মীরা সবাই শুভ্র খদ্দর পরে বসে আছেন আর তার গায়ে কিনা বিলিতি পোশাক। গান্ধীজি তাঁর মনোহর হাসিতে সুভাষের এই বিড়ম্বিত ভাবটা কাটিয়ে দিলেন, সদ্য সদ্য এসেই তার নব বেশ পরিধানের অবকাশ কোথায়?

হয়তো বা দেখতে পেলেন শাদা খদ্দরে সুভাষকে একদিন কত সুন্দর ও শুচিভাস্বর দেখাবে! হৃদ্যতার পরিবেশে প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল। সুভাষ যদিও বা কখনো উত্তেজিত হয়, গান্ধীর ধৈর্যে আঁচড় পড়ে না।

শুধু ট্যাক্স বন্ধ করে ও আইন অমান্য করেই কি ব্রিটিশকে হটানো যাবে? আপনি যে নাগপুর কংগ্রেসে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে বলেছেন, সেই এক বছরে?

শান্ত স্বরে গান্ধী বললেন, এক কোটি লোক কংগ্রেসের সভ্য হয়েছে, আদায় হয়েছে এক কোটি টাকা। এখন প্রধান আন্দোলন হবে বিদেশী বস্ত্রবর্জন আর খদ্দরের প্রসার।

তাতে কি আপনি আশা করেন যে ল্যাঙ্কাশায়ার বিপন্ন হবে আর তাতেই কি ব্রিটিশ ক্যাবিনেট নত হবে অনুগ্রহে?

তা হয়তো নয়। গান্ধী চিন্তিত মুখে বললেন।

তবে?

কথার সুরে তপ্ত আন্তরিকতা, গান্ধী উত্তর না দিয়ে পারলেন না। বললেন, দেশব্যাপী খদ্দরের আন্দোলন সফল হতে সুরু হলেই গভর্নমেণ্টের টনক নড়বে। যখন দেখবে কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক আন্দোলন কার্যকর হচ্ছে তখনই অস্থির হয়ে গভর্নমেণ্ট আঘাত হানবে। আমরা তখন আইন-অমান্য সুরু করব। জেলখানা ভরে ফেলব। সরকারকে তখন জেলখানার পর জেলখানাই শুধু স্থাপন করতে হবে। আর ঐ শেষ পর্যায়েই দেখা দেবে ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন—গণ-উত্থান।

তারপর?

গান্ধী স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

সুভাষের মনে হল, হয় পরের কথাটা গান্ধীর জানা নেই নয়তো তার কাছে তা পুরোপুরি ভাঙছেন না।

ভাঙছেনই বা না কেন? গণ-উত্থানের পরিণামে ব্রিটিশকে কী শক্তিতে বিতাড়িত করতে হবে এ সম্বন্ধে ধারণায় তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতা থাকা তো বেশি দরকার, প্রথম থেকেই দরকার।

কে জানে মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে পরমবিশ্বাসী মহাত্মা আশা করছেন ইংরেজের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে। শ্বেত হৃদয় অনুরাগে রক্তিম হবে। স্বদেশে স্বরাজ পাবার দাবি যে অত্যন্ত ন্যায্য এ বুঝে হৃত ধন ফিরিয়ে দিয়ে ইংরেজ সরে পড়বে গুটিগুটি। স্পর্শমণির ছোঁয়ায় লোহা সোনা হতে পারে কিন্তু শত ধর্ম কথায়ও সাম্রাজ্যবাদীর মনের চেহারার বদল হয় না।

বাংলদেশের পাঁচালি গানের কথা স্মরণ করো। 'জোর বিনে সই চোর কখনো

ধর্মশাস্ত্র মানে?'

সুভাষের মন ভরল না। স্বর্গের সিঁড়ির শেষ ধাপগুলি যেন ধোঁয়াটে হয়ে রইল। এখন কী করি, কোথায় যাই? সব ছেড়ে দিয়ে ভারতবর্ষে ফিরলাম সে কি শুধু এই ধোঁয়ায় পথ হাতড়ে বেড়াবার জন্যে?

গান্ধীজিই বলে দিলেন, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। তিনিই বলে দেবেন, দেখিয়ে দেবেন।

মুহূর্তের জন্যে ঐ মনোমোহন নাম কি সুভাষ ভুলে গিয়েছিল? নইলে আই-সি-এস ছাড়বার সঙ্কল্প করে সে তো চিত্তরঞ্জনকেই চিঠি লিখেছিল, জানতে চেয়েছিল দেশের কোন কাজে তিনি তাকে লাগাতে পারেন। তার তো নেতা নির্বাচনে ভুল হয়নি। তবে আর দ্বিধা কেন, কেন অকারণ নৈরাশ্য?

কত বড় ভার সুভাষ দিয়েছিল চিত্তরঞ্জনকে। যদি কোনো ইংরিজি পত্রিকা চালাতে চান আমি তার সম্পাদনা বিভাগে থাকতে পারি। আর যদি মনে করেন সেই কারণে শিক্ষানবিশি করতে আমায় ইংলণ্ডে থাকা দরকার, আমি থেকে যাব। নতুবা আমার ইচ্ছে সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়ে জুন মাসেই আমি দেশে ফিরি। তখন আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আপনার ইচ্ছার কাছে আমার ইচ্ছা সব সময়েই নত থাকবে।

আর কথা নেই। সুভাষ ছুটল কলকাতা। হাওড়া স্টেশন থেকেই সোজা চিত্তরঞ্জনের বাড়ি। সেখানে আবার হতাশার সঙ্গে দেখা। চিত্তরঞ্জন কলকাতায় নেই। পূর্ববঙ্গ সফর করতে বেরিয়েছেন। ফিরবেন কবে? কে জানে। দিন তারিখ ঠিক নেই।

উপায় নেই, প্রতীক্ষা করতে হবে। এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে এই অবাস্তব অতিব্যস্ততায় সুভাষ বিশ্বাসী নয়। মহার্ঘতমের জন্যে কঠিনতম তপস্যায় সে প্রস্তুত। এবং সুদীর্ঘতম তপস্যায়। কোনো দামি বস্তু দ্রুত নিতে গেলেই বোধহয় তার স্থির মূল্যের অপলাপ ঘটে।

দেশবন্ধু যেদিন ফিরলেন সেদিনই ফের দেখা করতে গেল সুভাষ। গিয়ে শুনল তিনি বাড়ি নেই। কিন্তু সুভাষকে এবার ফিরে যেতে দেওয়া হল না। বাসন্তী দেবী তাকে ডেকে নিলেন। সগৌরবে, বিপুল সন্তানস্নেহে। সুভাষ বাসন্তী দেবীকে প্রণাম করল। ডাকল মা বলে।

'কই আমার সোনার চাঁদ ছেলে।' দেশবন্ধু কাছে এসে দাঁড়ালেন।

এই সেই চিত্তরঞ্জন? ওটেনের ব্যাপারে যাঁকে প্রথম দেখেছিল, যাঁর কাছ থেকে এসেছিল পরামর্শ নিতে সেই সহস্ররশ্মি ব্যারিস্টার? এক মাসের রোজগার যিনি এক দিনে এক বেলায় এক মুষ্টিতে দিয়ে ফেলতে পারেন এ সেই দাতার রাজরাজেশ্বর? এ তিনি কেমন হয়ে গিয়েছেন। শরীর সেই রকমই আছে বটে, সেই বিস্তৃতবক্ষ বিশালবাহু দীর্ঘায়ত, কিন্তু এ তাঁর কী বেশ, দীনবেশ না রাজবেশ! সর্বাঙ্গে শুদ্ধশুভ্র খদ্দর, স্বল্প ও স্থূল, কিন্তু তাঁকে দেখাচ্ছে মহাযোগী মহেশ্বরের মত। সন্দেহ কী, এই তো লোকগুরু লোকেশ, নিজের দৃষ্টান্তের ঔজ্জ্বল্যেই উন্মুখর। কিছুই বলতে হয় না মুখ ফুটে, শুধু আমায় দেখ, আমায় দেখে এক পলকে বুঝে নাও আমি কী চাই, কী আমার বক্তব্য! যিনি সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারেন তিনিই বুঝি চেয়ে নিতে পারেন সর্বস্ব! 'আপনি না

কেঁদে কিছু বুঝান না যায়!' নিজে সব খুইয়ে পথে ভেসে পড়তে পারলেই বুঝি ভাসিয়ে নেওয়া যায় অন্যকে। 'আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়। আমি তারি লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।' শেষে সর্বনাশকই সর্বভাসকের পদ নেয়।

সুভাষ দেখল এ শুধু নেতৃত্বের সাজসজ্জা নয়, এ এক আধ্যাত্মিক শক্তির বিভূতি!

দেশবন্ধুও দেখলেন সুভাষকে। যৌবনের শিখরে প্রথমোদিত পবিত্রদীপ্ত বিবস্বানকে। বাঙালি ছাত্রের যা বৃহত্তম স্বপ্ন আই-সি-এস তাই পেয়ে যে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে এসেছে, দেশের সেবায় দুঃখে দারিদ্র্যে ক্লেশে কৃচ্ছে কাঠিন্যে উৎসর্গীকৃত হবে বলে। বৃহৎব্রতধর বিদ্যুদবিদ্বান বিশ্বজেতা। দেশবন্ধু বুঝলেন এ শুধু ক্ষণিক উত্তেজনার রাগরঙ্গ নয়, এ এক গহনচর আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা।

সুভাষ চিনল তার নেতাকে। দেশবন্ধুও বুঝলেন এতদিনে এল তাঁর সেনাপতি, তাঁর সমানানুরাগ বন্ধু। দুজনে নিভৃতে আলাপ করতে বসলেন। আলাপান্তে লোকালোকনমস্কৃত নেতাকে আবার প্রণাম করল সুভাষ। বললে, আমাকে আদেশ করুন।

শুভ্রশোভন খদ্দরে কী অপরূপ দেখাচ্ছে সুভাষকে। চতুর্দিকে যেন দীপ্তি ও নির্মলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। কী হবে রূপে কী হবে বিদ্যায় যশে অর্থে প্রতিপত্তিতে যদি না অম্লান চরিত্র থাকে, যদি না থাকে প্রত্যয়ের পবিত্রতা। দুই দিকেই সুভাষ জ্যোতির্ময়, গুরুগুণগরিষ্ঠ। দেশবন্ধু বললেন, 'জাতীয় বিদ্যায়তনে তুমি অধ্যক্ষ হও।'

তথাস্তু। তারপর?

কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের ভার নাও।

তারপর?

বস্ত্রদহনযজ্ঞ সুরু করো।

পার্কে পার্কে বিদেশী বস্ত্র ভস্মীভূত হতে লাগল। মহাত্মা গান্ধী এসে গেছেন কলকাতায়, সঙ্গে মহম্মদ আলি। হরিশ পার্কের সভায় গান্ধী জনতার কাছে বস্ত্র ভিক্ষা করলেন, তখন অখদ্দর বস্ত্র অর্থই বিদেশী বস্ত্র। প্রথমে কেউ সাড়া দিল না কিন্তু যেই দেশবন্ধু দাঁড়িয়ে উঠে আবেদন জানালেন, দেখতে দেখতে কাপড়-জামা-চাদরের এক বিরাট পাহাড় গড়ে উঠল। মহাত্মা স্বহস্তে তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। শত শিখায় লেলিহান ধ্বনি উঠল—বন্দেমাতরম।

পরদিনই নিজের বাড়িতে বস্ত্রযজ্ঞের আয়োজন করলেন দেশবন্ধু। তাঁর বাইরের উঠোনে, যেখানে আগে টেনিসকোর্ট ছিল, বিদেশী কাপড় স্তূপীকৃত হল। দাশ-সাহেবের যত স্যুট কোট ছিল মেয়েদের যত আচ্ছাদন, সমস্ত অগ্নয়ে স্বাহা হয়ে গেল। চিতাশয্যায় মুখাগ্নি করল স্বয়ং সুভাষ যে বিদেশী ডিগ্রির সনদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হে বিভাবসু অগ্নি, হে অমল করালাক্ষ, আমাদের পরাধীনতার দুঃখ উন্মূলন করো, তোমার শুচিশুভ্র আলোকে আমাদের স্বাধীনতা লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত হোক।

বন্দেমাতরম্। উঠল আবার সেই বৃহৎ জয়ধ্বনি। স্বর্গ হতেও গরীয়সী আমাদের মাতা জন্মভূমিকে বন্দনা করি। অনেকশস্ত্রহস্তা সর্বদানবঘাতিনী শ্রীধরী মা আমাদের।

প্রত্যক্ষ আইন অমান্য নয় তবু গভর্নমেন্ট খেপে গেল। গ্রেপ্তার করল যতীন্দ্রমোহন

সেনগুপ্তকে, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে, পীর বাদশা মিঞাকে, যুক্ত প্রদেশের প্রভুদয়ালকে, ডাক্তার আবদুল করিমকে। ওয়ালটারে গ্রেপ্তার হল মহম্মদ আলি আর সওকত আলি গ্রেপ্তার হল বোম্বাইয়ে।

এদিকে চেমসফোর্ড সরেছে, তার জায়গায় লাটগিরি করতে এসেছে লর্ড রেডিং। এসেই মহাত্মার সঙ্গে মিলেছে সাক্ষাৎকারে। আশ্বাস দিয়েছে যতক্ষণ অসহযোগ আন্দোলন অহিংস থাকবে ততক্ষণ বড়লাট কংগ্রেসের গায়ে হাত তুলবে না। বেশ, তাই, স্বীকৃত হলেন মহাত্মা। কিন্তু, এ কী? বড়লাট দেখাল মহম্মদ আলি কোথায় বক্তৃতা দিয়েছে যার প্রচ্ছন্ন সার কথাই হচ্ছে হিংসাত্মক বিদ্রোহ। মহাত্মা নীরবে পড়লেন বক্তৃতাটা। হ্যাঁ, এমনি ধারা অর্থ একটা করা যায় বটে। মহাত্মা অপ্রসন্ন হলেন।

এ সম্বন্ধে কী করতে চাও? জিজ্ঞেস করল লর্ড রেডিং।

মহাত্মা বললেন, আমি মহম্মদ আলিকে দিয়ে উলটো কথাটা বলিয়ে নিচ্ছি। সে জনতাকে হিংসার পথ পরিহার করতে বলছে, সে হিংসায় স্বীকৃত নয়, এমনি ধরনের কথা।

মহাত্মার এই ভঙ্গিটা অনেকেরই মনঃপুত হল না। এ তো প্রায় ক্ষমা চাওয়া, দুঃখ প্রকাশ করা, বক্তৃতা প্রত্যাহার করে নেওয়া। দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহরু আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখলেন। কিন্তু গান্ধী টললেন না। অসহযোগ তো অহিংসই সুতরাং যে অসহযোগী সে যদি বলে, হিংসার পথ আমার নয়, হিংসায় আমি বিশ্বাসী নই, তা হলে সেটা তার পক্ষে অবমাননাকর হয় না।

মহম্মদ আলি মহাত্মার কথা রাখল। তুলে নিল বক্তৃতা। বিবৃতি দিল, জনতাকে হিংসায় প্ররোচনা দেবার মত তার কোনো অভিসন্ধি ছিল না। লর্ড রেডিং খুশি হল। মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত অভিযোগ খারিজ করে দিল।

কিন্তু এখন হল কী? সেবার ছাড়লেও এবার ছাড়ল না। জুলাই মাসে করাচিতে খিলাফত কনফারেন্সে সভাপতির আসন থেকে মহম্মদ আলি খুব একটা ক্রুদ্ধ-তপ্ত বক্তৃতা দিল। সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করাল, সরকারি চাকরিতে যে কেউ মুসলমান নিযুক্ত আছ, সৈন্যবাহিনীতেই হোক বা পুলিশবাহিনীতেই হোক, চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এস। শুধু কেরানি উকিল নয়, পুলিশ ও সৈন্য—এতটা যেন গভর্নমেণ্ট হজম করতে পারল না। জুলাইয়ের অপরাধে সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার হল দু ভাই। বিচারে দু বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।

গান্ধীজির কাছে সরকারি ধূর্ততা অসহ্য মনে হল। করাচি প্রস্তাবে এমন কী আছে যা অসহযোগের সারসন্দর্ভ নয়? অসহযোগের কথাটাই তো সরকারি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা। তার মধ্যে পুলিশ আর সৈন্য শব্দ দুটো আলাদা উচ্চারণ করে বললে মহাভারত কী এমন অশুদ্ধ হয়ে যায়!

করাচিতে পাশ-করা প্রস্তাবটা যেটার উপর আলি-ভাইদের দণ্ড, চল্লিশজনেরও বেশি কংগ্রেসনেতা দস্তখৎ করলেন, সেটা দিকে-দিকে প্রকাশিত হল, মুখরিত হল, হাজার সভামঞ্চ থেকে সেটা ঘোষিত ও গৃহীত হল, কিন্তু গভর্নমেণ্ট এসব নির্বিষ পুনরুক্তিতে কোনো মূল্য দিল না, উপেক্ষায় নির্বিকার হয়ে রইল। অনেকে ভেবেছিল স্বাক্ষরদাতা

সব কয় নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হবে, এক অপরাধে এক শাস্তিই বিধেয়, কিন্তু লর্ড রেডিং ফিরেও তাকাল না, যেন ঐ প্রস্তাবটা, যে কাগজের উপর লেখা তার চেয়েও কম দামি।

ইচ্ছে হলেই বিধি, আবার ইচ্ছে হলেই সুবিধে।

দেশবাসীর বিক্ষত অন্তরে সান্ত্বনার একটু প্রলেপ বুলুতে চাইল গভর্নমেণ্ট। ইংলণ্ডের যুববরাজকে নিয়ে আসা যাক। সে উপলক্ষে অনেক আলো জ্বলবে, বাজি পুড়বে, অনেক ভোজ-পান গীত-নৃত্যের আয়োজন হবে, কিছু না হয় নীতিগর্ভ মোলায়েম কথা বলানো যাবে যুবরাজকে দিয়ে, তাতেই বিক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হবে আশা করি। ঘোষণা করা হল সতেরোই নভেম্বর যুবরাজ বোম্বাইয়ে পদার্পণ করবে।

তখনো যুবরাজ। পরে অবশ্যি কিছুকাল রাজত্ব করেছিল অষ্টম এডওয়ার্ড হয়ে। শেষকালে মিসেস সিম্পসনের জন্যে সিংহাসন ছেড়ে দেয়। পরিচিত হয় সামান্য ডিউক বলে। ডিউক অফ উইণ্ডসর রূপে। তারই ছোট ভাই ষষ্ঠ জর্জ নাম নিয়ে বসে রাজা হয়ে। কিন্তু এখন শুধু যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস। বিস্তারী ব্রিটিশ শাসনের স্পর্ধিত প্রতীক।

ভারতবর্ষ একে মনোহত, তায় তার কাটা ঘায়ে আবার এই নুনের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ফতোয়া দিল, যুবরাজের আসার দিন, সতেরোই নভেম্বর, সারা দেশময় হরতাল পালন করো।

দেশবন্ধু ডাকলেন সুভাষকে। সুভাষ শুধু প্রচারেই নেই, আছে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনে। তাকেই তো দেশবন্ধুর সবচেয়ে বেশি দরকার।

জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন বুঝছ?'

'কী বলব!' বিনীত প্রশান্ত মুখে সুভাষ বললে, 'কালকেই দেখতে পাবেন।'

'যারা স্টেশনে হঠাৎ এসে পড়বে তাদের কী হবে?'

'কিছু ভাববেন না। শিশু নারী ও রুগ্নের জন্যে গাড়ি থাকবে। যারা দুর্বল ও অসহায় তাদেরকে অযথা বিপন্ন হতে দেব না।'

উনিশ শো একুশের সতেরোই নভেম্বর কলকাতা দেখাল কাকে বলে হরতাল। সেই প্রথম হরতাল। একটিও দোকানপাট খোলেনি, বাজার বসেনি, যানবাহনের চিহ্নও কোথাও নেই। আদালতে উকিল-মক্কেল আসেনি, শুধু আমলা-ফয়লা দিয়ে কী হবে? স্কুল-কলেজ তালা দেওয়া। সরকারি অফিসে জোহুকুমরা এসেছে বটে কিন্তু তাদের কলম চলছে না। বাবুর্চি-খানসামারাও একদিনের ছুটি নিয়েছে। কসাইয়ের দোকানে মাংস নেই।

এমন দৃশ্য আর দেখেনি কলকাতা। এমন ইটপাথর লোহালক্কড়ের মরুভূমি। শোনেনি এমন শ্মশানস্তব্ধতার অট্টহাসি।

কোথাও এতটুকু জোরজুলুম নেই। সবাই প্রাণের টানে পাঠিয়ে দিয়েছে প্রতিবাদ। বিরতি আর নীরবতার প্রতিবাদ। শুধু সুভাষ শেয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনে ছুটোছুটি করছে। শিশু নারী আর রুগ্নদের পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ির তদারক করছে। সে সব গাড়িতে প্ল্যাকার্ড লাগানো: 'অন ন্যাশন্যাল সার্ভিস বা জাতির সেবায় নিয়োজিত। এ চিত্রের পরিকল্পক দেশবন্ধু, শিল্পী সুভাষ। এ এক বিশ্ববিমোহন চিত্র। যে দেখল সেই ধন্য-ধন্য করল। শুধু ইংরেজের সইল না, তার চক্ষুর শূল মর্মের শেল হয়ে

রইল।

সরকারি চাতুরি বোম্বাইয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে তুলেছিল কিন্তু কলকাতায় নিটুট শান্তি, নিখুঁত মৌন। বোম্বাইয়ের দাঙ্গায় প্রায় পঞ্চাশ জন মারা পড়ল, আহতের সংখ্যা প্রায় আটগুণ। দাঙ্গায় লিপ্ত জনতার মধ্যে বুক দিয়ে পড়লেন গান্ধী, শোনালেন কত শান্তির ললিত বাণী, কত ধর্মকাব্য, কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল হল। সরোজিনী নাইডুর মর্মস্পর্শী আবেদনেও কেউ সাড়া দিল না। জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গান্ধী পাঁচ দিন অনশন করলেন, বললেন, নাকে স্বরাজের দুর্গন্ধ টের পাচ্ছি।

কিন্তু কলকাতার খবরে খুশি হলেন। কলকাতা শান্তির ছবি। এর জন্যে কৃতিত্ব দাবি করবে সুভাষের নেতৃত্বে গঠিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী আর তার সঙ্গে খিলাফত কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা। তা দাঙ্গাই হোক আর নিশ্ছিদ্র শান্তিই হোক এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হল যুবরাজকে কেউ চায় না। ভারতবর্ষে তার আবির্ভাব শোকাবহ।

যুবরাজ, ফিরে যাও। সংগ্রাম, তুমি এস। সঙ্গে করে নিয়ে এস স্বাধীনতাকে।

দুই

এই অসম্মান ইংরেজরাজ সহ্য করল না। তারা তাদের তলোয়ারে নতুন শান চড়াল। বুটের ফিতে বাঁধল আরো আঁট করে। ফিরিঙ্গিদের কাগজ স্টেটসম্যান আর ইংলিশম্যান কান্নার রোল তুলল। এ কী দৃশ্য দেখতে হল আমাদের! গোটা কলকাতা শহর কতগুলো কংগ্রেসী ভলানটিয়ার দখল করে নিয়েছে আর সরকার ভয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে বনবাসে। সরকারের এমন পঙ্গুতা এমন অকর্মণ্যতা আর কখনো দেখিনি। কতগুলো ভলানটিয়ার, তারাই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য পাবে? সঙ্গে সঙ্গেই গভর্নমেন্ট কাজে লেগে গেল। কংগ্রেস আর খিলাফত আফিসে পুলিশ হানা দিল, নিয়ে গেল কাগজপত্র, আর পর দিনই কংগ্রেস আর খিলাফতের অধীন যত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ছিল সব বেআইনি বলে ঘোষণা বেরুল। আর সমস্ত সভাসমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

সুভাষের আনন্দ দেখে কে। সে ঘ্রাণে সংগ্রামের সুগন্ধ টের পাচ্ছে। দেশবন্ধু তখন সুরাট যাচ্ছেন ওয়াকিং কমিটির সভায় যোগ দিতে। বললেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত দিনকতক চুপচাপ থাকো। দেখি মহাত্মা কী বলেন। আমার ভয় হচ্ছে শিগগিরই তোমাদের তিনজনকে ধরে নিয়ে যাবে, শাসমলকে সুভাষকে আর মজিবরকে।

বীরেন শাসমল আর মজিবর রহমান যথাক্রমে কংগ্রেস ও খিলাফতের সেক্রেটারি বা সম্পাদক আর সুভাষ পাবলিসিটি অফিসার বা প্রচারকর্তা।

'ধরলে তো বাঁচি।' সুভাষ বললে হাসিমুখে।

ওয়ার্কিং কমিটির সভা সুরাটে না বসে বোম্বাইয়ে বসল। সেখান থেকে দেশবন্ধু নির্দেশ নিয়ে এলেন প্রত্যেক প্রদেশ নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন চালাতে পারবে, কিন্তু এক সর্তে, একমাত্র সর্তে যে, বাক্যে ও আচরণে থাকতে হবে অহিংস। নির্বিষ ও নির্বিদ্বেষ।

এদিকে ঘোষণা হল যুবরাজ চব্বিশে ডিসেম্বর কলকাতা আসছে। আবার অন্য দিকে প্রতিঘোষণা বেরুল সেদিন কলকাতায় হরতাল, আবার হরতাল।

দেশবন্ধু ফিরে এলেন। তাঁকে বাংলা দেশের আইন অমান্য আন্দোলনের ডিকটেটর বা একনায়ক করা হল। ঠিক হল পাঁচজন করে ভলানটিয়ার একসঙ্গে শোভাযাত্রা করে খদ্দর বেচতে বেরুবে ও তাদের থেকে একটু দূরে বিচ্ছিন্ন ভাবে যাবে একজন কংগ্রেসী গুপ্তচর, যে কংগ্রেস অফিসে এসে খবর দেবে অগ্রগামীরা গ্রেপ্তার হল কিনা। যদি গ্রেপ্তার হয় তবে পরের দলকে তৈরি করবে।

ঠিক হল এই ছ জনের মধ্যে দু জন হবে বাঙালি হিন্দু, দু জন মাড়োয়ারি আর দু জন মুসলমান। হিন্দু দলের মাথা হবে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মাড়োয়ারি দলের পদ্মরাজ জৈন আর মুসলমান দলের ওয়াহেদ হোসেন। আর সর্বদলের প্রধানকর্তা সুভাষচন্দ্র।

তেসরা ডিসেম্বর থেকে সুরু হয়েছে শোভাযাত্রা। যাত্রীদের কাজ শুধু খদ্দর বেচা নয়, দোকানদারদের মনে করিয়ে দেওয়া চব্বিশের হরতালের জন্যে তৈরি হোন ।

কিন্তু কী আশ্চর্য, কই কেউ গ্রেপ্তার হল না তো! সুভাষ তাই মনমরা। দেশবন্ধুর কাছে এসে নালিশ করল, 'একটা পুলিশও দেখা গেল না রাস্তায়।'

'ব্যস্ত হয়োনা, দেখা দেবে।' দেশবন্ধু রসিক মানুষ, পরিহাস করলেন, 'এখন সবে লাঠিতে তেল মাখাচ্ছে।'

আবার পরদিন বেরুল শোভাযাত্রা। প্রথম দিন ছিল পাঁচ দল, আজ বেরুল দশ দল। দশ দলে যাট জন।

'আজ কজন গ্রেপ্তার হল?' জিজ্ঞেস করলেন দেশবন্ধু।

'একজনও না।' সুভাষ বললে বিষণ্ণমুখে।

'ভেবোনা।' দেশবন্ধু আশ্বস্ত করলেন: 'সময় হয়ে এল বলে।'

পরদিনও একই হতাশা। আজও কাউকে গ্রেপ্তার করল না।

বাইরের ঘরে বসে আছেন দেশবন্ধু, ম্লানমুখে সুভাষ এসে ঢুকল। পরিহাস-স্নিগ্ধ স্বরে দেশবন্দু বললেন, 'এই যে আমাদের বিষণ্ণ ক্যাপটেন আসছেন। কী, খবর ভালো নয়?'

'একেবারেই না, স্যার। পুলিশ আজও কিছু করল না।'

খবর এসে পৌঁছল লাহোরে লাজপত রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দেশবন্ধু বাংলার তরুণদের আবার ডাক দিলেন। আমি এখন উন্মুক্ত আক্রমণ চাই। তোমরা কি এগিয়ে আসবে না? তোমাদের বন্দিনী মায়ের ডাকে সাড়া দেবে না? মায়ের বন্ধনের ভার লাঘব করবে না তোমরা? এত বিরাট শহর কলকাতা, তার মধ্যে মার মোটে পাঁচ হাজার সন্তান?

দেশবন্ধুর ছেলে চিররঞ্জন, ডাক নাম ভোম্বল, এগিয়ে এল। বললে, 'বাবা, আমি যাব।'

'তুমি, তুমি যাবে?' গৌরবে আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন দেশবন্ধু।

'হ্যাঁ, আমি খদ্দর-ফিরির শোভাযাত্রা নিয়ে বেরুব।' বললে চিররঞ্জন, 'দেখি আমাকে ধরে কিনা।'

'ঠিকই তো,' দেশবন্ধু বললেন তন্ময়ের মত, 'পরের ছেলেকে ডাকবার আগে নিজের ছেলেকেই পাঠানো উচিত। এবার পরের ছেলেকে ডাকতে আর আমার সঙ্কোচ

থাকবে না। কণ্ঠস্বর অবাধ হতে পারবে।'

এ আপনি করছেন কী! চিরদিন সুখের কোলে লালিত প্রিয়তম পুত্রকে আপনি পাঠাচ্ছেন বিপদের মুখে? এতদিন পুলিশ কিছু করেনি, আজ হয়তো করবে, ধরবে ভোম্বলকে। নিয়ে যাবে জেলে। কঠিন লাঞ্ছনার মধ্যে।

'নেবেই তো, নিক না, ঠেকাব কী করে?' অনুদ্বিগ্ন মুখে হাসলেন দেশবন্ধু: 'নিজের ছেলেকে বারণ করে পরের ছেলেকে ঠেলে দিতে পারব না। আপনি আচরি জীব পরেরে শিখায়।'

'তবু—'

'তা ভোম্বলকে বলে দেখ না।'

চিররঞ্জনকে কে রোখে! সে কাঁধে তুলে নিয়েছে খদ্দরের বোঝা। দক্ষিণ কলকাতা থেকে যোগ্য ভলানটিয়ার বেছে দিয়েছে সুভাষ।

দেশবন্ধু রাঁধুনে বামুনকে ডেকে বললেন, 'ভাতের সঙ্গে কাঁকর মেশাতে সুরু করে দাও।'

বামুন তো স্তম্ভিত।

'দুদিন বাদেই তো জেলের ভাত খেতে হবে,' দেশবন্ধু স্বভাব-সরস কণ্ঠে বললেন, 'এখন থেকেই অভ্যেস করে রাখা ভালো।'

চিররঞ্জনের দল, কলেজ স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে ফিরি করতে গিয়েছিল। বিকেলবেলা দেশবন্ধুর কাছে খবর এসে পৌঁছুল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, ভোম্বল ও আরো একুশজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়েছে। 'বিষণ্ন ক্যাপটেনের' দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকালেন দোশবন্ধু।

সুভাষ প্রসন্ন মুখে বললে, 'এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল।' বলেই কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেল।

'কী করছ?'

'কালকের দিনের লিষ্ট তৈরি করছি।'

'কাল? কাল তোমার মা যাবেন?'

'মা?'

'হ্যাঁ, বাসন্তী দেবী।'

সন্ধেয় সত্যেন মিত্র এল। হাইকোর্টের প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসে ঢুকেছে। কংগ্রেসের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে জাতীয় সেবা-বিভাগের ভার পেয়েছে। সঙ্গে হেমেন দাশগুপ্ত। কী ব্যাপার? লালবাজারে ভোম্বলের জন্যে খাবার নিয়ে যাব।

বাসন্তী দেবী এগিয়ে এলেন। বললেন, 'শুধু ভোম্বলের জন্যে নয়, আমার আরো একুশটি ছেলে তার সঙ্গে আছে, তাদের সবার জন্যে খাবার নিয়ে যান।'

রাত্রে পুলিশ সার্জেন্টরা চিররঞ্জনকে অবাধ্যতার ওজুহাতে প্রহার দিলে। কী করে কে জানে খবর বেরিয়ে এল বাইরে, আর রাষ্ট্র হয়ে গেল পুলিশি প্রহারের ফলে চিররঞ্জন মারা গেছে। খবর পেয়ে নির্বিচল হয়ে রইলেন দেশবন্ধু। তাঁর পাশে নিষ্কম্পশিখা বাসন্তী দেবী। কিন্তু হেমপ্রভা মজুমদার চুপ করে থাকতে রাজি হলেন না। তিনি ছুটলেন

আলিপুর জেলে।

হ্যাঁ, এক দিনেই বিচার সারা হয়ে গিয়েছে। অসহযোগী কংগ্রেসীদের বিচার করা তখন ভারি সোজা। তারা ব্রিটিশ-আদালত মানে না, বিচার-পদ্ধতির সঙ্গেও তাদের অসহযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনেও তাদের হাঁ-না কোনো বক্তব্য নেই। পুলিশেরও হয়রানি কমে গেল, শুধু ধরো আর একবার আদালতে দাঁড় করিয়েই জেলে ঠেলে দাও। চিররঞ্জনও তেমনি আলিপুর জেলে এসে উঠেছে।

হেমপ্রভা দেবী জেলফটকে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, চিররঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

জেলর তাঁকে পাত্তাই দিতে চাইল না। এমন কোনো আইন নেই আপনি দেখা করতে পারেন।

আইনের কথা ছাড়ুন। আমি দেখা করবই করব। শুনুন, জেলের বাইরে হাজার হাজার মানুষ তীব্র আগ্রহে অপেক্ষা করছে। যদি আমাকে দেখা করতে না দেন তারা ঠিক ধরে নেবে চিররঞ্জন মারা গেছে, তা হলে সারা কলকাতায় আগুন জ্বলে উঠবে, সে আগুনে আপনারা সবাই পুড়ে মরবেন। বরং আমি দেখা করতে পারলেই সকলকে আশ্বস্ত করতে পারব, চিররঞ্জন ভালো আছে।

জেলকর্তৃপক্ষ কী ভেবে অনুমতি দিল। হেমপ্রভা দেবী দেখা করে এসে দেশবন্ধুকে জানালেন কী নির্মমভাবে চিররঞ্জনকে ওরা মেরেছে।

দেশবন্ধু স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কিন্তু বাসন্তী দেবী স্তব্ধ থাকতে পারলেন না। বললেন, 'কাল আমি যাব।'

পর দিন, আটুই ডিসেম্বর, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নিয়ে বেরুলেন বাসন্তী দেবী। সঙ্গে দেশবন্ধুর বোন ঊর্মিলা দেবী আর নারীকর্মমন্দিরের সম্পাদিকা সুনীতি দেবী। বার্তাবহরূপে সুভাষের বন্ধু, হেমন্ত সরকার, কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢুকেছে কংগ্রেসে।

তাঁরা চলেছেন বড়বাজারের দিকে। উদ্দেশ্য খদ্দর বিক্রি করবেন আর ঘোষণা করবেন চব্বিশে ডিসেম্বর হরতাল।

'আপনারা কী করছেন জিজ্ঞেস করতে পারি?' পুলিশ সার্জন্ট পথরোধ করে দাঁড়াল।

'খদ্দের বিক্রি করছি আর সবাইকে বলছি চব্বিশে ডিসেম্বর যেন হরতাল পালন করে।' বললেন বাসন্তী দেবী।

'আপনি দয়া করে একবার থানায় যাবেন?'

'কেন যাবনা? নিশ্চয়ই যাব।'

থানায় এলে সার্জেণ্ট বললে, 'আপনাদের গ্রেপ্তার করা হল।'

'খুব ভালো কথা।'

হেমন্ত বার্তাবহের ভূমিকায় দূরে দূরে থাকতে পারল না। সেও আসামী হয়ে গেল। তাই বলে খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। রাগে দুঃখে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল কলকাতা। ছেলে-বুড়ো হিন্দু-মুসলমান দলে দলে ভিড় করতে লাগল থানায়। আমাকে ধরো, আমাকে জেলে নিয়ে যাও। আমিও কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক। আমিও উচ্চস্বরে

ঘোষণা করছি, হরতাল, হরতাল, সকলে চব্বিশে ডিসেম্বর হরতাল পালন করুন। কোথা থেকে যেন এক ভাগবতী শক্তির স্পর্শ লাগল, চকিতে মরা প্রাণ বিদ্যুৎস্পন্দিত হয়ে উঠল। শুষ্ককাষ্ঠে জাগল নবমঞ্জুরী।

সেদিন সন্ধ্যায় গভর্নরের বাড়ির ডিনারে সুরেন মল্লিক উপস্থিত ছিলেন, খবর এসে পৌঁছুল বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার হয়েছেন। রাজনীতিতে উদারপন্থী, গভর্নমেণ্টের অনুরাগী হলেও এতটা যেন সহ্য হল না, প্রতিবাদে ভোজসভা ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন সুরেন মল্লিক।

কয়েদির গাড়িতে করে বাসন্তী দেবীকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাবে, পুলিশ কনস্টেবলরা বললে, আমরা আজই চাকরি ছেড়ে দেব। গভর্নমেণ্ট তক্ষুনি কনস্টেবলদের মাইনে বাড়িয়ে দিলে। সেই তো ব্রিটিশ চাতুরী। শাসিত দেশকে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত করে রাখো। দেশকে দুঃসহ দুরবস্থায় না রাখলে অত অল্প মাইনেয় সৈন্য পাবে কী করে, পুলিশ পাবে কী করে? দেশ যদি সচ্ছল থাকে তবে সামান্য মাইনেয় ওরা ওসব কাজে রাজি হবে কেন? নিদারুণ দরিদ্র বলেই না হবে! তাই শাসন করবার জন্যে সুবিধেমত লোক পাবার উদ্দেশ্যেই দেশকে শোষণ করা, শুষে-শুষে নিঃসার করে দেওয়া, যাতে অনায়াসেই ইংরেজের স্বার্থে দাসত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব হয়।

ব্যারিস্টার বিজয় চাটুজ্জে, বি-সি চ্যাটার্জি, সম্পর্কে বাসন্তী দেবীর ভাই। কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেল লালবাজার। জামিনে বাসন্তী দেবীকে ছাড়িয়ে আনতে চাইল। তোমাকে কে এখানে আসতে বলেছে? বাসন্তী দেবী জামিনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দিলেন। জেলে নিয়ে চলেছে, জেলে যাব।

বিজয় সটান বাংলার লাট লর্ড রোনালডসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। বাসন্তী দেবী ও তাঁর সঙ্গীদের মুক্তির জন্যে প্রার্থনা জানাল। রোনালডসে ভেবে চিন্তে বললে, আচ্ছা, তাই হবে।

আনন্দ-উজ্জ্বল মুখে বিজয় চিত্তরঞ্জনকে বললে, 'যাক ভাবনা নেই, সব ব্যবস্থা করে এসেছি।'

'কিসের ব্যবস্থা?'

'গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছি। কথা দিয়েছে বাসন্তীকে ছেড়ে দেবে।'

চিত্তরঞ্জন একমুহূর্তে হতবাক হয়ে রইলেন। পরমুহূর্তেই গর্জে উঠলেন: 'কে তোমাকে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে বলেছে?'

'কে আবার বলবে!' বিজয় পাংশু হয়ে গেল: 'আমি নিজের দায়িত্বে গিয়েছি।'

'বাসন্তীর জন্যে মুক্তি চাইতে? ছি ছি ছি, আহত স্বরে চিত্তরঞ্জন আবার গর্জন করলেন: তুমি আমার সমস্ত রণকৌশল মাটি করে দিলে। কী দরকার ছিল তোমার সর্দারি করবার!'

'বাসন্তী আমার বোন।' বিজয় বললে গম্ভীর মুখে, 'সে জেলে যাবে এ অপমান আমার কাছে অসহ্য।'

'অপমান?' চিত্তরঞ্জন হুমকে উঠলেন: 'দেশের জন্যে তোমার বোন জেলে যাবে সেটা তোমার অপমান?'

বিজয় চুপ করে রইল।

'কিন্তু বাসন্তী যদি তোমার বোন না হয়ে আর কারু বোন হত তা হলে সেটা অপমান মনে হত না, কী বলো, তাই না?'

মাঝরাতে জেলর বাসন্তী দেবীকে বললেন, 'আপনারা খালাস। বাড়ি চলে যান।'

'সে কী, বাড়ি যাব কী!' বাসন্তী দেবী বিমর্ষ হয়ে গেলেন: 'বাড়ি যাবার জন্যে জেলে এসেছি নাকি? না, না, আমরা কেউ বাড়ি যাব না, এখানেই থাকব।'

জেলর সসম্ভ্রমে বললে, 'খালাস হবার পর আসামীকে জেলে রাখবার নিয়ম নেই। সুতরাং জেলে আর আপনাদের স্থান হতে পারে না।'

অগত্যা বাড়ি ফিরে আসতে হল হতাশ হয়ে। না, হতাশ হবার কিছু নেই। পর দিন বাসন্তী দেবী আবার খদ্দর ফিরি করতে বেরুলেন। সেদিন আর তাঁকে ধরল না। তার মানে ধরতে সাহস পেল না। কী করে সাহস পাবে? ত্রিপথগা গঙ্গা জনজলতরঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠেছে। কলকাতার দুই জাঁদরেল জেলখানা ভলানটিয়ারে ভরে উঠেছে। কত ধরবে, কত পুরবে? কয়েদি ক্যাম্প খুলেছে, তাও উপচে গেল। প্রমাদ গুনল গভর্নমেন্ট। কত ধরবে, কত পুরবে! শীতের হাওয়ায় লেগেছে বাসন্তী স্পর্শ।

মহারাজ প্রদ্যোত ঠাকুরের মারফত রোনালডসে চিত্তরঞ্জনকে সাক্ষাৎকারের জন্যে আমন্ত্রণ করে পাঠাল। চব্বিশে ডিসেম্বর যুবরাজ কলকাতায় পৌঁছুচ্ছে, সারা শহর শ্রীহীন বেশববাসে তার সামনে এসে দাঁড়াবে, সেটা তো মুখে কালি মাখার সমান। আলোয়-বাজিতে উজ্জ্বল-মুখর না হলে লাটসাহেবকে দেশের লোক কী বলবে! চিত্তরঞ্জন গেলেন দেখা করতে কিন্তু আন্দোলন প্রত্যাহার করতে রাজি হলেন না। ফল কী হল? দশই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেনাপতি, তাঁর দক্ষিণহস্ত সুভাষকেও পুলিশে ধরল। ধরল বীরেন শাসমলকে, আকরাম খাঁকে আবুল কালাম আজাদকে, পদ্মরাজকে।

চিত্তরঞ্জন আগেই বুঝেছিলেন তাঁর বাইরে থাকার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাঁর অবর্তমানে কে এই আন্দোলনের নিয়ামক হবে, কে বা সম্পাদক? তিনি নির্দেশনামা জারি করলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী নিয়ামক আর সাতকড়িপতি রায় সম্পাদক। এখন থেকে সংগ্রামের চালক-নায়ক তারা। তারা গেলে তাদের জায়গায় আবার দুজন।

হাওয়ায়-হাওয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ল, দাশ-সাহেবকে ধরেছে। জনতা জমে গিয়েছে গেটের সামনে, রাস্তায়, এমন কি অঙ্গনের মধ্যে। সবাই তাদের মনোরঞ্জনকে দেখবার জন্যে উৎসুক, সর্বত্যাগশুভ্র সন্ন্যাসীকে। পুলিশের গাড়িতে ওঠবার আগে চিত্তরঞ্জন জনতার দিকে তাকালেন, তাদের সম্বোধন করে বললেন, 'জীবনে স্বাধীনতার মত মহত্তম আর কী আছে? আমাদের উদ্দেশ্য যখন মহত্তম তখন সিদ্ধি হবেই, এ ধ্রুবতম সত্য। যে আগুন জ্বলেছে তার নির্বাপণ নেই। ফল শুধু ঈশ্বরের হাতে। তোমরা তোমাদের সমস্ত কর্মে অহিংস হও, সাফল্য অনিবার্য। যদি দুঃখে কষ্টে নির্যাতনভোগে স্বীকৃত থাকো, কে তোমাদের প্রাপ্য ধন থেকে বঞ্চিত করে?'

পুলিশের গাড়িতে উঠছেন, দিকে-দিকে শাঁখ বেজে উঠল, উঠল হুলুধ্বনি। আর জনসমুদ্র তুলল রণহুঙ্কার: বন্দেমাতরম্।

তিন

দিনের কাজ সেরে সুভাষ বাড়ি ফিরে শুনল পুলিশ তার খোঁজ করে গেছে।

'আপনারা আমাকে খুঁজছেন?' লালবাজারে ফোন করল সুভাষ।

'হ্যাঁ, আপনি এখন কোথায়?' পুলিশ কমিশনার জিজ্ঞেস করল।

'বাড়িতে। কি, এরেস্ট করবেন? আসুন। আমি তৈরি।' স্থিতধী সুভাষ বললে নিষ্কম্প কণ্ঠে।

পুলিশ এসে সুভাষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

'কোথায় নিয়ে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল সুভাষ।

'আপাতত প্রেসিডেন্সি জেলে।' পুলিশের কর্তা বললে গর্বিতের মত।

'সেখানে দেশবন্ধু আছেন?'

'আছে।'

'আর হেমন্তও আছে?'

'কে হেমন্ত?'

'হেমন্ত সরকার। প্রোফেসর ছিল, চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।'

'আছে।' পুলিশের কর্তা বললে সংক্ষেপে।

'তবে আর কী!' আনন্দিত মুখ করল সুভাষ।

জেলে সুভাষ দেশবন্ধুর বাবুর্চি হল আর হেমন্ত হল খিদমতগার ।

একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর স্যার আবদুর রহিম চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এসে বললে, 'দাস, তুমি ভারি দামি কয়েদি। একজন আই-সি-এস তোমার বাবুর্চি, আর একজন প্রোফেসর তোমার চাকর।'

'যেহেতু আমি খুব দামি কয়েদি।' চিত্তরঞ্জন বললেন গম্ভীরস্বরে।

সেই কবে দশুই ডিসেম্বর সুভাষকে গ্রেপ্তার করেছে, কিন্তু তার বিচার হতে হতে সাতুই ফেব্রুয়ারি। যদিও পুলিশের এটা জানা যে আসামী মামলা লড়বে না—লড়বে না কী, হাঁ-না কিছুই বলবে না, বিচারে কোনোই অংশ নেবে না। তবু যত দূর পারো ঝুলিয়ে রাখো। দণ্ড দিলেই তো শেষ হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে আবার গোলমাল পাকাবে। তাই যত পারো দীর্ঘ করো হাজতবাস। সুভাষ কাঠগড়ায় মৌনাবলম্বন করে রইল। দোষী না নির্দোষ, টুঁ শব্দও করল না। জেরা করল না, সাফাই দিল না। ব্রিটিশ আদালতকে মানি না। গায়ের জোরে পরের দেশের দলিত বুকের উপর সিংহাসন চাপিয়ে বসেছে শাসক হয়ে, তার নীতিই বা কী, ন্যায়ই বা কোথায়?

ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো সুভাষকে লক্ষ্য করে বললে, 'অন্যায়ভাবে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করার অপরাধে তোমার ছমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।'

'মোটে ছমাস?' সুভাষ যেন হতাশের সুরে বলল।

বক্রোক্তির মতন লাগল সুইনহোর কানে। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে উপস্থিত সার্জেন্টকে বললে, 'ডক থেকে একে নামিয়ে নিয়ে যাও।'

সুভাষ এই কথাই বলতে চেয়েছিল, দেশের জন্য এটুকু ক্লেশ কী, আরো কত কঠোর দুঃখসহনে সে প্রস্তুত।

দেশবন্ধুরও ছমাস। অথচ যেদিন তাঁকে কোর্টে, ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আসামী করে আনা হল, সেদিন কী প্রচণ্ড ভিড়! ম্যাজিস্ট্রেটকে কে দেখে, সবাই দেখছে আসামীকে।

এ এক অদ্ভুত আসামী! কত আসামীকে তিনি কাঠগোড়ার কলঙ্ক থেকে খালাস করে এনেছেন, আজ তিনি নিজেই কাঠগড়ায়। আর কলঙ্ক কোথায়? দেশমাতার মুক্তির জন্যে তিনি আজ জেলে যাচ্ছেন, সেটা তো তাঁর পবিত্রতম গৌরব, প্রদীপ্ততম সম্মান।

জনতার আয়তন দেখে ম্যাজিস্ট্রেট ভড়কে গেল। মামলা বিশে জানুয়ারি পর্যন্ত মুলতুবি রাখল। সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিল জেলে বিচার হবে যেহেতু খোলা আদালতে উচ্ছৃঙ্খল জনসমাবেশ বিপজ্জনক।

বিশে জানুয়ারি জেলের বিচারকক্ষে দেশবন্ধু এসে দেখলেন ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া আর কেউ নেই। বাইরের মানুষ তো কেউ নেইই, প্রেস-রিপোর্টার নেই, এমন কি উকিল পর্যন্ত নেই। আসামী বিচারে অংশ নেবে না বলে তার পক্ষে উকিল উপস্থিত থাকতে পারবে না এমন কী কথা! আসামী যদি নীরব থাকতে পারে, তার উকিলও নীরব থাকবে। বিচারপদ্ধতিটা তাদের পর্যবেক্ষণ করতে দোষ কী! অনেক ধস্তাধস্তির পর ব্যারিস্টার নিশীথ সেনকে ঢুকতে দেওয়া হল। সেদিন শুধু চার্জ রচিত হল, দিন পড়ল সাতুই ফেব্রুয়ারি।

মাঝখানে জ্বর হল চিত্তরঞ্জনের। একে তো জেলের খাওয়া, লোহার থালায় করে লাল মোটা চালের ভাত, আর কালো কলাইয়ের ডাল, তার উপরে ইনফ্লুয়েঞ্জা, চিত্তরঞ্জন দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে গেলেন। সাতুই ফেব্রুয়ারি খোলা আদালতে তাঁরও বিচার হল।

প্রথম থেকেই চিত্তরঞ্জন চুপ। যেদিন চার্জ তৈরি হয় সেদিনও ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল : দোষী, না, নির্দোষ?

চিত্তরঞ্জন চুপ।

আজও ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করল : সাক্ষীকে জেরা করবেন?

চিত্তরঞ্জন চুপ।

কোনো সাফাই সাক্ষ্য দেবেন?

চিত্তরঞ্জন চুপ।

এবার বলুন আপনার কী বক্তব্য? দেবেন কোনো বিবৃতি? ম্যাজিস্ট্রেট ভুরু কুঁচকোলো।

মুখ খুললেন না চিত্তরঞ্জন।

আর্গুমেণ্ট করবেন?

মুখ ফিরিয়ে রইলেন চিত্তরঞ্জন।

ম্যাজিস্ট্রেট, সেই সুইনহো, আবার রায় দিল। আপনি চার্জ অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আপনার ছমাস সশ্রম কারাভোগের আদেশ হল।

এবারও চিত্তরঞ্জন চুপ।

আদালত-ভর্তি লোকের চোখ আর্দ্র হয়ে এল। কিন্তু দেশবন্ধু এতটুকু স্খলিত হলেন না। স্বর্ণমেরুর মত বিশাল ছন্দে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এখন কোথায় যাব?' শুধু জিজ্ঞেস করলেন সার্জেণ্টকে।

'আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে।'

'সুভাষ কোথায়?'

'সেখানে।'

'চিত্তরঞ্জন কোথায়?'

'সেও সেখানে।'

তৃপ্তির হাসি হাসলেন দেশবন্ধু। চলুন নিয়ে চলুন। কানাইলালের ফাঁসির জায়গাটা দেখে আসি।

জেলে প্রথম যখন দেখা করতে এলেন, বাসন্তী দেবীকে গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হল। দেশবন্ধু বললেন, এরকম ভাবে দেখা করতে হলে সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়ে দরকার নেই। আর গেলেন না বাসন্তী দেবী। পরে জেলকর্তাদের কী সুমতি হল, বাসন্তী দেবীকে জানালেন জেলের অফিস-ঘরে বসে সাক্ষাৎকার হতে পারে।

সেদিন তাই হচ্ছে। হঠাৎ মাতব্বর পুলিশ-অফিসর বাসন্তী দেবীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কথা একটু জোরে-জোরে বলুন যাতে আমরা শুনতে পাই।'

'এ কী অন্যায় কথা!' বাসন্তী দেবী ঝলসে উঠলেন।

দেশবন্ধু বললেন, 'এর চেয়ে একেবারে দেখা করতে না আসাই ভালো। তুমি আর এসো না।'

এমনি করেই ওরা ওদের রাজ্য রাখবে! সূর্য আর নিজে কবে মেরেছে, বাতাস আর বালি তাতিয়েই মেরেছে। কে না জানে সূর্যের চেয়ে বালির তাত বেশি।

জ্বরের পর দেশবন্ধুর শরীর দুর্বল, অফিস-ঘরে এসে দেখা দিতে হলে সেল থেকে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়, সেটাও প্রাণে বাজে বাসন্তী দেবীর। বললেন, 'যদি সেলে গিয়ে দেখা করতে দেয় তবেই যাব, নইলে ওঁকে হাঁটিয়ে এনে কষ্ট দিতে পারব না।'

গভর্নরের কানে উঠল বোধহয় কথাটা। বাসন্তী দেবীকে সেলে গিয়ে দেখা করবার অনুমতি দিল। তার সঙ্গে আরো একটু বদান্যতা দেখিয়ে বললে, ইচ্ছে করলে মিস্টার দাসের খাবার বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া চলবে।

দেশবন্ধু রাজি হলেন না। নিজে একা বাড়ি থেকে খাবার আনিয়ে খাবেন এ অসম্ভব। 'তবে', হাসিমুখে বললেন বাসন্তী দেবীকে, 'তবে এদের সকলের জন্যে আনতে পারো, সকলে মিলে খেতে পারি একসঙ্গে।'

সকল বলতে সুভাষ, হেমন্ত, হেমেন্দ্র, কিরণশঙ্কর, সুকুমার, বীরেন্দ্র আর ভোম্বল। বাসন্তী দেবী সানন্দে রাজি হলেন। তাই আনব। মাতব্বর জেলর আপত্তি করল। সকলের জন্যে আনা চলবে না। শুধু মিস্টার দাসের জন্যেই বিশেষ অনুমতি আছে।

'তাহলে দরকার নেই। উনি একা একা খাবেন না কখনো।'

কদিন পরে এই ভেদনীতিটা শিথিল হল। বাসন্তী দেবী সবার জন্যেই খাবার আনতে লাগলেন। আনন্দ করে খাচ্ছেন বটে সকলে কিন্তু এর আগে একটা বিরাট কাণ্ড ঘটে গেছে যেটা দেশবন্ধুর কাছে এক বিরাট আশাভঙ্গের বেদনা ছাড়া কিছু নয়। শুধু দেশবন্ধুর কাছে নয়, সুভাষেরও কাছে। চব্বিশে ডিসেম্বর যুবরাজ আসছে, তার সপ্তাহখানেক আগে বড় লাট লর্ড রেডিং কলকাতায় এসে পৌঁছুল। উদ্দেশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মিটমাট করা যায় কিনা যাতে চব্বিশে ডিসেম্বরটা অ-হরতাল কাটে। কার

সঙ্গে কথা বলবে? যাঁর সঙ্গে কথা বলবে সে জননায়ক তো তাঁর সেনাপতি-সহ তোমাদের কারাগারে বন্দী। আর ব্রিটিশের যে-বিচারে তিনি বন্দী তার বহরটাও একবার বিচার করো।

তিনটে কংগ্রেসী ইস্তাহারে স্বহস্তে দস্তখৎ করেছেন, চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে এই ছিল অভিযোগ। সরকার হস্তলিপি-বিশারদকে নিয়ে এসেছে, সে দস্তখৎ পরীক্ষা করে হলফ নিয়ে সাক্ষ্য দিল, হ্যাঁ, ইস্তাহারের সই চিত্তরঞ্জনের নিজের হাতের। অথচ চিত্তরঞ্জন নিজের হাতে কোনো ইস্তাহারই সই করেন নি। ধন্য বিশারদ, ধন্য তার এক্সপার্ট ওপিনিয়ন, তার বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত। বিচারে কোনো অংশ নেবেন না বা আত্মপক্ষসমর্থনে কোনো সওয়াল করবেন না কংগ্রেসের এই নীতি বলে চিত্তরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কিন্তু বিচার সারা হয়ে যাবার পর, তিনি আদালতে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করলেন, এ বিচার আদন্ত্য এক প্রহসন। আমাকে যে গ্রেপ্তার করল তার ওয়ারেণ্ট ছিল না আর যে দস্তখতের ভিত্তিতে আমি অপরাধী প্রমাণিত হলাম সে দস্তখত আমার নয়। কাজে কাজেই বোঝা যাচ্ছে সরকার যদি ইচ্ছে করে তা হলে ছলে বলে কৌশলে যে কোনো উপায়ে যে কোনো ব্যক্তিকে সে জেলে পাঠাতে পারে, ঝোলাতে পারে ফাঁসিকাঠে। আইন আর আদালত শুধু একটা ধোঁকা, ধোঁকার টাটি। সরকারই অন্ধ, অবিবেকী।

'ওখানটায় কানাইলালের ফাঁসি হয়েছিল না?' চিত্তরঞ্জনের সেল থেকে দেখা যায় জায়গাটা। কখনো-কখনো উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। দেখেন সুভাষ কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চিত্তরঞ্জনের চোখে জল কিন্তু সুভাষের চোখে জ্বালা। পাথরে ঘুন ধরে না। সুভাষের সঙ্কল্পেও এতটুকু চিড় নেই। লর্ড রেডিং কী করল? পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে দূত করে পাঠাল চিত্তরঞ্জনের কাছে। মীমাংসার সর্ত কী? কংগ্রেস তার আইন-অমান্য আন্দোলন তুলে নেবে আর চব্বিশে ডিসেম্বর কলকাতায় হরতাল হবে না এবং তার বিনিময়ে কংগ্রেস ভলানটিয়র বেআইনি বলে যে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল তা প্রত্যাহৃত হবে আর তার ভিত্তিতে হাজার-হাজার যারা জেলে গেছে সব ছাড়া পাবে।

'শুধু এইটুকু?' সুভাষ রুখে উঠল।

না, আরো আছে। আর সেইটেই দামি। শিগগিরই গভর্নমেণ্ট এক রাউণ্ডটেবিল কনফারেন্স বসাবে যাতে থাকবে সরকারের আর কংগ্রেসের বাছাই-করা প্রতিনিধি, তাঁরা একত্র বসে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান নির্ণয় করবেন।

'শুধু এইটুকু?' সুভাষ আবার ফুঁসে উঠল : 'শুধু এইটুকুর বিনিময়ে আমরা আমাদের রণোদ্যম পণ্ড করে দেব?'

'আমার তো মনে হয় এইটুকু অনেকখানি।' দেশবন্ধু প্রশান্তস্বরে বললেন, 'মহাত্মাজী দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন। আর কদিন পরেই সেই এক বছর শেষ হয়ে যাবে। মহাত্মার সেই কথার সম্মান কী করে রাখা যাবে? যদি একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত ভলানটিয়র আমরা জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারি তা হলে দেশবাসীর কাছে কংগ্রেসের শক্তি ও মর্যাদা আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠা পাবে।'

'কিন্তু ঐ রাউণ্ডটেবল কনফারেন্স?'

'সেটায় কাজ হতেও পারে নাও হতে পারে। যদি কনফারেন্সে বেশ বেশি কিছু না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের আন্দোলন তো আছেই।'

'হ্যাঁ, আমি আন্দোলন বুঝি, আপস বুঝি না। সভা করে স্বাধীনতায় আমি বিশ্বাসী নই।'

'কিন্তু এ সভায়ও যদি আমরা নিষ্ফল হই, তবে আমরা ব্রিটিশ ভণ্ডামি প্রমাণিত করে দেশবাসীকে আরো উদ্বুদ্ধ করতে পারব। সুতরাং', দেশবন্ধু বললেন, 'রেডিং এর প্রস্তাবে রাজি হওয়াই সমীচীন হবে।'

দেশবন্ধুর যুক্তির মধ্যে শক্তি আছে বুদ্ধি আছে। সুভাষ সম্মত হল। আবুল কালাম আজাদও সমর্থন করলে। এখন তবে সবরমতিতে মহাত্মাকে জানানো হোক তার করে। মহাত্মার কাছে দীর্ঘ তার গেল। দয়া করে সম্মতি দিন। এমন সুবর্ণসুযোগ আর আসবে না। মহাত্মাজী পালটা তার করে জানালেন, ঐ সঙ্গে দুই আলি-ভাই আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদেরও ছেড়ে দেওয়া হোক। শুধু আইনআমন্যকারী ভলানটিয়ারদের ছাড়িয়ে এনে কী হবে? গান্ধীর প্রস্তাবে লর্ড রেডিং সম্মত হল না। সে বললে, আলিভাইদের অপরাধ অন্য জাতের, তারা তাদের নির্দিষ্ট দিনেই ছাড়া পাবে, তবে এ পর্যন্ত বলতে পারি তাদেরকে অন্য আইনের আওতায় এনে আটক রাখা হবে না। তাদের চেলাচামুণ্ডাদের সম্পর্কেও সেই কথা।

গান্ধী আরো বললেন, কনফারেন্স কবে হবে ও কারা কারা বসবে গোল হয়ে তাও জেনে নাও।

সে সম্বন্ধে একটা আভাসও দেওয়া হল তাঁকে। তবু তিনি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হবার আশায় বেশি সময় নিয়ে ফেললেন। লোহা গরম থাকতে থাকতে হাতুড়ির ঘা মারতে পারলেন না।

তারপর তিনি সম্মত হলেন। কিন্তু তাঁর সম্মতি যখন এসে পৌঁছুল তখন লর্ড রেডিং কলকাতা ত্যাগ করে দিল্লি চলে গিয়েছে আর যুবরাজ এসে দাঁড়িয়েছে হরতালের মুখোমুখি। রৌদ্রময়ী অমানিশা কী সুন্দর! কী সুন্দর শ্মশানায়িত শূন্যতা! হরতালের সাফল্যে খুশি হলেন দেশবন্ধু। কিন্তু মহাত্মার গড়িমসির জন্যে একটা অপূর্ব সুযোগ নষ্ট হল এই অনুভবে কাতর হয়ে রইলেন। তার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ভলনটিয়ররা তার গঠনশক্তির মান রেখেছে এই ভেবে সুভাষও কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল কিন্তু দেশবন্ধুর বিমর্ষতা তাকেও স্পর্শ করল। মহাত্মাজী ভুল করেছেন, নিদারুণ ভুল করেছেন, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরই সেই এক ধারণা। কখনো কখনো দেরি করাও ভুল করা। কিন্তু না, যা যাবার তা গিয়েছে। হারানো খেই আবার খুঁজে নিতে হবে। কিছুতেই অবসন্ন হওয়া নয়।

উনিশশো একুশের কংগ্রেস আমেদাবাদে, আর এবারের সভাপতি দেশবন্ধু। কিন্তু তিনি যখন জেলে তখন তাঁর স্থলে আর কাউকে অভিষিক্ত করতে হয়। হাকিম আজমল খান সেই পদে নির্বাচিত হলেন। দেশবন্ধুর ভাষণ— অর্ধসমাপ্ত ভাষণ— সরোজিনী নাইডু পড়লে। সে ভাষণ ভাবে কী মহৎ, যুক্তিতে কী বাস্তবদৃঢ়, তা বোঝা গেল সরোজিনী নাইডুর মধুর কণ্ঠস্বরে, প্রদীপ্ত উচ্চারণে। ভাবে গভীর অর্থে স্পষ্ট আবেদনে

তীক্ষ্ণ— এ হলেই তো ভাষণ হৃদয়কে জাগায়, বুদ্ধিকে জাগায়, দুই হাতকে কর্মে উদ্দীপ্ত করে তোলে। সরোজিনী নাইডুর কণ্ঠে সোনালি আলোর ঝরনা ছড়িয়ে পড়ল।

'আগেই অতিথি নয়, আগে গৃহ। গৃহই তৈরি নেই, অতিথিকে অভ্যর্থনা করব কোথায়? আগে ভারতীয় সংস্কৃতি আবিষ্কার করো, পরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পরিপাক করা যাবে।'

তারপরে : 'গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া য়্যাক্টের সঙ্গে যে সহযোগিতা করব, তাতে কোথাও বলা আছে যে ভারতবর্ষকে ইংলণ্ড তার সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার বলে স্বীকার করবে? দেবে আমাদের সমান সম্মানের অধিকার? আমি ইংলণ্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি শুধু একটিমাত্র সর্তে। সেই সর্ত আর কিছু নয়, একটি মাত্র স্বীকৃতি, ইংলণ্ডের স্বীকৃতি। ইংলণ্ড স্বীকার করুক, ভারতবর্ষের আছে স্বাধীন হবার অধিকার, তার জন্মার্জিত স্বত্ব। আমরা আমাদের কাজকর্ম চালাব, আমাদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করব, আমাদের ভাগ্যবিধাতাও আমরা। শুধু এইটুকু স্বীকৃতিতেই আমি সহযোগী। নচেৎ নয়। যতদিন আন্তরিকতার সুরে এই স্বীকৃতি না উচ্চারিত হবে ততদিন আমার কাছে শান্তির কথা বোলো না, আপসের কথা বোলো না। ততদিন আমার সংগ্রামে ক্ষান্তি নেই, নিবৃত্তি নেই।'

এ বুঝি সুভাষেরও মর্মকথা। আমেদাবাদ কংগ্রেসে সমস্ত দেশকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আইন-অমান্য আন্দোলনে আহ্বান করা হল। সশস্ত্র বিদ্রোহের সভ্যতম বিকল্পই আইন-অমান্য। তাছাড়া এই নিষ্ঠুর দায়িত্ববোধহীন অত্যাচারী শত্রু-সরকারকে উৎখাত করবার আর কোনো শোভনতর উপায় নেই। একমাত্র ত্যাগ ও দুঃখভোগের পথই প্রতিকারের পথ।

প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করতে হল : 'ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি সসম্ভ্রমে ঘোষণা করছি, আমি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সৈন্য হব, আমি কথায় ও কর্মে অহিংস হব এবং অন্তরেও এই অহিংসা লালন করব। আমি বিশ্বাস করব, বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে অহিংসাই একমাত্র অস্ত্র আর এই অস্ত্র-বলেই স্বরাজ অর্জন করা যাবে। আমি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আমার উপরিস্থ নেতার সর্ববিধ আদেশ পালন করব। আমি হাসিমুখে আমার ধর্মের জন্যে আমার দেশের জন্যে কারাবরণ প্রহার এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করব। যদি আমাকে জেলে যেতে হয় আমি আমার পরিবার-পরিজনদের খোরপোষের জন্যে কংগ্রেসের কাছে হাত পাতবো না।'

এই কংগ্রেসেই স্বরাজের নতুন সংজ্ঞা দিলেন হজরৎ মোহানি। সে সংজ্ঞা হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা। এতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বয়ংকর্তৃত্বই কামনা করা হয়েছে, এবার একটা নতুন সুর এসে লাগল, ব্রিটিশের বা বিদেশের সম্পর্কের বাইরে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ। কিন্তু মহাত্মা এ ভাবটাকে তক্ষুনি প্রশ্রয় দিতে পারলেন না। বললেন, 'আমাদের জলের গভীরতার পরিমাপ আগে করা হোক, তারপর যেন দলবল নিয়ে সেই জলে নামি। অজানা জলে নেমে অতলে তলিয়ে যাবার মধ্যে মহত্ত্ব নেই।'

স্বাধীনতা তাই স্বপ্নের সামগ্রী হয়েই থাকল, কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ হল না।

'হ্যাঁ, সামগ্রিক ডমিনিয়ন স্টেটাসই আমি চাই।' স্পষ্ট হলেন গান্ধীজি : 'তা যদি

পাই, আমি বলছি আমি আমার শবরমতি আশ্রমে ইউনিয়ন জ্যাক ওড়াব।'

উনিশশো একুশের একত্রিশ ডিসেম্বরের রাত্রিও প্রভাত হল। কিন্তু সেই প্রার্থিত, প্রতীক্ষিত স্বরাজের দেখা নেই।

চার

স্বরাজ কি ঠুনকো জিনিস, শিশুর খেলনা? চাইলেই, শুধু হৈ-চৈ করলেই কি পাওয়া যায়? স্বরাজ না আসুক এই এক বছরে দেশ অনেক এগিয়েছে, অনেক জেগেছে, অনেক শক্ত হয়েছে। আর সন্দেহ কী, এই গঙ্গাবতরণের ভগীরথ মহাত্মা গান্ধী। তিনিই ঘুম-ভাঙানিয়া বাঁশিওয়ালা। কিন্তু শুধু বাঁশিতেই কি হবে? অসি লাগবে না।

উনিশশো বাইশের পয়লা ফেব্রুয়ারি তিনি বড়লাটকে চিঠি লিখলেন। তার নির্যাস হচ্ছে এই : 'গত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ঠিক করেছিল বারদৌলিতে প্রথম গণ-অমান্য-আন্দোলন সুরু করা হবে। বারদৌলি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সুরাট জেলার ছোট একটা তহশিল, লোকসংখ্যা প্রায় সাতাশি হাজার। কিন্তু সতেরোই নভেম্বর বোম্বাই শহরে অবাঞ্ছনীয় দাঙ্গা হবার পর সেই আন্দোলন স্থগিত থাকে। বলা বাহুল্য সে আন্দোলন প্রত্যাহারের মূল দায়িত্ব আমার। তারপর কী হল, তারপর আপনার গভর্নমেণ্ট প্রদেশে-প্রদেশে প্রবল দমন-পীড়ন চালাতে লাগল। সুরু হল প্রজাদের সম্পত্তিলুট, নির্দোষ লোককে প্রহার, জেলে কয়েদিদের প্রতি বর্বর ব্যবহার, এমনকি নির্মম কশাঘাত— যা না সভ্য, না বা আইনসম্মত, না বা প্রয়োজনীয়। সরকারী আচরণ এক আইনবিরুদ্ধ নির্যাতনের নামান্তর।

দেশের তিন মৌল স্বাধীনতা এখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কথা বলবার স্বাধীনতা, মেলামেশা করবার স্বাধীনতা, খবরের কাগজের স্বাধীনতা। এই তিন স্বাধীনতাকে পক্ষাঘাত থেকে মুক্ত করাই আমাদের এখন প্রথম কাজ। তাই আমরা স্থির করেছি সেই বারদৌলিতে আমরা সকর্মক আইন-অমান্য-আন্দোলন আরম্ভ করব। মাদ্রাজে গুণ্টুরেও একশো গ্রাম নিয়ে এ আন্দোলন চালু হতে পারে যদি অবশ্য সর্বগত অহিংসা কঠোরভাবে পালিত হয়। কিন্তু আমি আপনাকে সাত দিন সময় দিচ্ছি। আমি অনুরোধ করছি খবরের কাগজ থেকে সমস্ত নিষেধ শাসন তুলে নিন আর সম্প্রতি যে সমস্ত জরিমানা আদায় করেছেন ও যে সমস্ত জামানত জব্দ করেছেন তা ফিরিয়ে দিন। আর যে সব লোক অহিংস থেকেও অসহযোগ আন্দোলনে লিপ্ত হওয়ার দরুন কারাগারে আছে, তা স্বরাজের জন্যে হোক খিলাফতের জন্যে হোক বা পাঞ্জাবের বীভৎসতার জন্যেই হোক, তাদের মুক্তি দিয়ে দিন। যদি সাত দিনের মধ্যে আপনি উপরোক্ত ঘোষণা করেন, আমি বারদৌলির আন্দোলনে বিরত হব। ভাবব দেশের জনমতকে কার্যকর করার সদিচ্ছা সরকারের আছে। আর যদি সাত দিনের মধ্যে ঐ ঘোষণা প্রচারিত না হয়, তা হলে আমরা আমাদের আন্দোলনে অগ্রসর হব।'

সমগ্র দেশ প্রতীক্ষায় উদগ্র হয়ে উঠল। জেলখানায় দেশবন্ধু ও সুভাষ আকুল উৎকণ্ঠায় মুহূর্ত গুনতে লাগল। সাত দিন!

'সাত দিনে ক ঘণ্টা?' জিজ্ঞেস করলেন দেশবন্ধু।

'আমি ভাবছি ক মিনিট?' সুভাষ হিসেব করতে বসল সাত দিনের ক

আর বাকি।

সাত দিনের মধ্যে বড়লাট গান্ধীর অনুরোধ না রাখলে কী হবে? রাস্তার লোক বলাবলি করে। গান্ধী তখন বারদৌলিতে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করবে। যা দেশপ্রাণ শাসমল করেছিল মেদিনীপুরে, কাঁথিতে। এ আন্দোলনের অগ্রদূতও বাংলা।

সাত দিনের মেয়াদ ফুরোতে নয়ুই ফেব্রুয়ারি। কিন্তু পাঁচুই ফেব্রুয়ারি নিদারুণ এক কাণ্ড ঘটে গেল। উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুরের কাছে চৌরিচৌরা নামে এক গ্রামের উপর দিয়ে একটা কংগ্রেসী শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। সে শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করতে এসেছিল পুলিশ, একজন সাব-ইনস্পেক্টর আর কতগুলি কনস্টেবল। জনতা অহিংসার ব্রত ভুলে পুলিশ-দলকে তাড়া করল। পুলিশ-দল থানায় গিয়ে আশ্রয় নিল, বন্ধ করে দিল দরজা। মত্ত উল্লাসে জনতা থানায় আগুন ধরিয়ে দিল। জীবন্ত দগ্ধ হল পুলিশ-দল, একুশ জন কনস্টেবল আর একজন সাব-ইনস্পেক্টর।

গান্ধীজির কাছে খবর পৌঁছুল। তিনি শুধু বিমূঢ় নন, অভিভূত হয়ে পড়লেন।

বারুই ফেব্রুয়ারি বারদৌলিতে আবার ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বসল। সে মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হল, সমস্ত আইন-অমান্য আন্দোলন, শুধু বারদৌলিতে নয়, সারা ভারতবর্ষে, এই দণ্ডে এই মুহূর্তে অনির্দেশ্য কালের মত তুলে নেওয়া হোক। তার বদলে দেশ এখন চরকা কাটুক খদ্দর পরুক জাতীয় স্কুল চালাক আর মদ খাওয়া বন্ধ করুক।

ধনুকে জ্যা আরোপ করার আগেই ধনুক ভেঙে গেল। সমস্ত দেশ হতাশার সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ল। লর্ড রেডিংকে সাত দিনের মেয়াদ কাবার করবার দুর্ভাবনার মধ্যে পড়তে হল না।

জেলে খবর পেয়ে দেশবন্ধু ক্ষোভে দুঃখে রোষে ভেঙে পড়লেন। বললেন, 'মহাত্মাজী আবার ভুল করলেন, আবার সব বানচাল করে দিলেন। ভুলের পরে ভুল। ডিসেম্বরে একবার ভুল করলেন, আবার ভুল ফেব্রুয়ারিতে!'

সুভাষও ক্ষুব্ধ। চৌরিচৌরার একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্যে সমস্ত দেশকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন? চৌরিচৌরার কটা লোক অহিংস থাকতে পারেনি বলে বারদৌলির লোকও সহিংস হবে? মতিলাল নেহরুও তখন জেলে। তিনিও জেল থেকে প্রতিবাদ পাঠালেন : 'কন্যাকুমারিকার এক গ্রাম অহিংস থাকেনি বলে হিমালয়ের প্রান্তে আর এক শহরকে শাস্তি দিতে হবে? বেশ তো, চৌরিচৌরা দোষ করে থাকে, চৌরিচৌরাকে বাদ দাও, গোটা গোরক্ষপুর জেলাকেই বাদ দাও, বাকি দেশে আন্দোলন চালাতে বাধা কী! বাকি দেশ তো আর আদর্শস্খলিত হয়নি।'

জেল থেকে লাজপত রায়ও ঐ একই যুক্তিতে প্রতিবাদ জানালেন। চব্বিশে ফেব্রুয়ারী আবার ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বসল। বাংলা আর মহারাষ্ট্র গান্ধীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল। এই দৌর্বল্য এই ক্লৈব্য বলজীবী যোদ্ধার ধর্ম নয়। এই ভঙ্গিটাকে সার্থক রণকৌশলও বলা চলে না। সমস্ত দেশ যখন উদ্যত, বদ্ধপরিকর, তখন তাকে নিস্তেজ করে দেওয়ার অর্থই তার জীবিকা হরণ করে নেওয়া। মুঞ্জে মহাত্মাজীর সম্পর্কে ভৎর্সনার প্রস্তাব আনল। যারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাদেরকে মহাত্মাজী তাঁর নিজের পক্ষে বক্তৃতা করতে অনুমতি দিলেন না। যদি হেরে যাই তো যাব, বক্তৃতা দিয়ে সে দোষের স্খালন

চাই না। মুঞ্জের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। দেখা গেল যারা মহাত্মাজীর নিন্দায় মুখর ছিল তারাই গোপনে মহাত্মাজীর পক্ষে ভোট দিয়ে বসেছে। গান্ধীর এমনই মাদকতা। তিনি ভুল করছেন করুন, তাঁর আদর্শের দিক থেকে দেখলে হয়তো ভুল নেই।

কিন্তু গণ-আন্দোলন না হোক ব্যক্তিগত আইন অমান্য হবে না কেন? বিশেষ ব্যক্তি স্বশক্তিতেই অহিংসায় নির্বিচল থাকতে পারে। তার বেলায় আন্দোলন কেন প্রত্যাহৃত হবে?

'বাংলাদেশ চৌকিদার ট্যাক্স দেবে না।' বাংলার হরদয়াল নাগ গর্জন করে উঠলেন: 'তোমরা যাই বলো আমরা মানব না প্রত্যাহার। আমরা একবার জাগলে ঘুমিয়ে পড়তে জানি না, আমরা এগিয়ে যাব। খদ্দর পরে কেই বা চরকা কাটবে? আইন যে অমান্য করবে তার খদ্দর পরবার দরকার কী? যে কোনো পোশাকেই আইন অমান্য সম্ভব।'

আন্দোলন পণ্ড হয়ে গেলেও গভর্নমেণ্ট পঙ্গু হল না। তার ক্রূর কূটনীতি যেমন সজাগ তেমনি সজাগ রইল। তার মানে, এবার ঝোপ বুঝে কোপ মারল। দেখল আন্দোলনের জাল গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। লোকমতের খানিক অংশ গান্ধীর বিপরীতে মুখ ফিরিয়েছে। এই তো শুভলগ্ন, চোরের অমাবস্যা।

তেরোই মার্চ, ১৯২২, গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন।

দেশ থেকে আন্দোলন তুলে নিয়েছে, তার জন্যে কোথায় গান্ধীকে গভর্নমেণ্ট অভিনন্দন করবে, তা নয়, গান্ধীর উপর আহত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যতক্ষণ শিকারি মাচার উপর ব'সে ততক্ষণ বাঘ দূরে থাকে। যেই মাচার থেকে নেমে আসার ভুল করে তখুনি বাঘ অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে।

গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?

সেই মান্ধাতার আমলের অভিযোগ। রাজদ্রোহ। রাজদ্রোহ কোথায়? কোথায় নয়? প্রতিটি বাক্যে কর্মে চিন্তায় নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে। বলদর্পিত পরশাসনের অবসান কামনাই তো রাজদ্রোহ। পক্ষাঘাত থেকে স্বাধীনতাকে যে নিরাময় করতে চায় সে রাজদ্রোহী নয় তো কী?

কিন্তু আদালতে যখন নিচ্ছে তখন অভিযোগের প্রত্যক্ষ ভিত্তি তো একটা দরকার। ভিত্তি গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার তিনটি প্রবন্ধ। সমস্ত পৃষ্ঠা সমস্ত ছত্রই তো রাজদ্রোহে ঠাসা। তবু বিশেষ তিনটি প্রবন্ধ বাছাই করা হল। তার মধ্যে একটির নাম সিংহের কেশর আস্ফালন। সেই ঐতিহাসিক বিচার সুরু হল আঠারোই মার্চ, আমেদাবাদে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বললেন, যেন পণ্টিয়াস পাইলেটের সম্মুখে যীশুখ্রীষ্টের বিচার হচ্ছে।

সরোজিনী নাইডু বলছে : 'আইনের চোখে অপরাধী আসামী, মহাত্মা গান্ধী যখন আদালতে এসে ঢুকলেন, কৃশ, শান্ত অথচ দুর্দমনীয় কঠিন শরীর, পরনে খাটো ও মোটা কটিবস্ত্র, সঙ্গে তাঁর বন্ধু ও সহচর শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, তখন তাঁকে সম্মান দেখাতে সমস্ত কোর্ট উঠে দাঁড়াল।

জজ ব্রুমফিল্ড জিজ্ঞেস করল : আপনি দোষী না নির্দোষ?

আমি দোষী। বললেন মহাত্মা, কিন্তু আমার কিছু বলবার আছে। বলে এক দীর্ঘ

বিবৃতি পেশ করলেন।

'ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার করছি এই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু এই প্রচার সুরু হয়েছে ১৮৯৩ সালে যখন আমি আফ্রিকায়। সেখানেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার প্রথম সংঘর্ষ। সেখানে আমি আবিষ্কার করলাম যে ভারতীয় মানুষ হিসেবে আমার কোনো অধিকার নেই। আর আমার মানুষ হিসেবেও যে অধিকার নেই তার কারণ আমি ভারতীয়।

তবু আমি ভগ্নোৎসাহ হইনি। সুফল পাবার আশায় আমি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। বুয়র যুদ্ধে এম্বুলেন্স বাহিনীর লোক সংগ্রহ করে দিয়েছি। জুলু বিদ্রোহের সময়ও স্ট্রেচার-বেয়ারার পার্টি গড়ে তুলেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কাজের জন্যে লর্ড হার্ডিঞ্জ আমাকে কাইজারই-ই-হিন্দ সোনার মেডেল পর্যন্ত দিয়েছেন। যখন ১৯১৪ সালে প্রথম জার্মান যুদ্ধ সুরু হল, তখন আমি লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন তৈরি করেছি। তিন বছর পর ১৯১৭ সালে দিল্লিতে ওয়ার-কনফারেন্সে লর্ড চেমসফোর্ডের আহ্বানে আমি সৈন্য জোগাড় করে ফিরেছি। এই প্রচেষ্টায় আমার স্বাস্থ্য বিপন্ন হলেও আমি তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি। এইসব প্রাণপাত সেবায় আমার কী আশা ছিল? কোন বিশ্বাস আমাকে এই নির্বিরাম প্রচেষ্টায় প্রাণোদিত করেছে? তা শুধু এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আমার দেশের জন্যে একটি সমান মর্যাদার আসন আমি অধিকার করে নিতে পারব।

কিন্তু প্রথম আঘাত এল রাউলাট য়্যাক্ট, দেশজোড়া মানুষের প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকুও হরণ করার অভিসন্ধি নিয়ে। তার বিরুদ্ধে সুতীব্র আন্দোলন না করে আমার উপায়ান্তর ছিল না। তারপর এল পাঞ্জাব-বিভীষিকা, জালিয়ানওয়ালাবাগের হননযজ্ঞ, যার পরিণতি হল হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটানো, প্রকাশ্য রাজপথে বেত মারা— এবং আরো সব অবর্ণনীয় অবমাননার কাহিনী। তারপর প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় মুসলমানদের যে আশ্বাস দিয়েছিল যুদ্ধের পর ধর্মস্থানগুলি তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে সে প্রতিশ্রুতিও রাখা হল না।

তবু, এ সমস্ত সত্ত্বেও, আমি ১৯১৯-এ অমৃতসর কংগ্রেসে সহযোগিতার কথাই বলেছিলাম, আর মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মস যতই অল্প ও অসম্পূর্ণ হোক, বলেছিলাম এতেই হয়তো ভারতবর্ষের আশার অরুণোদয় ঘটবে।

আমার সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হল। খিলাফত প্রতিজ্ঞার পরিপূরণ হল না। পাঞ্জাবের অপরাধের উপর সমর্থনের চুনকাম করা হল। আর অর্ধাশনী ভারতীয় জনতা জীবনহীনতার দিকে চলল ধীরে ধীরে। তাদের কে বলবে কে বোঝাবে যে বিদেশী শোষকের জন্যে তারা উদয়াস্ত খাটছে তাদের এ দশা সেই খাটনিরই মজুরি। তারা কি জানে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে যে ব্রিটিশ শাসনের এত গর্ব তা আসলে তাদেরই শোষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। কোনো তত্ত্ব বা সংখ্যার কারসাজি দিয়ে ভারতবর্ষের গ্রামীন মানুষের কঙ্কালায়িত শীর্ণতার ব্যাখ্যা করা যাবে না। মানবিকতার বিরুদ্ধে এত বড় অপরাধের জুড়ি নেই পৃথিবীতে। যদি উপরে ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন তার কাছে ইংলণ্ডের জবাবদিহি দিতে হবে। হ্যাঁ, ভারতবর্ষের শহরে বাস করে যারা গ্রামকে ভুলেছে তাদেরও ডাক পড়বে প্রায়শ্চিত্তে।

আর আইন? এদেশের আইন তৈরি হয়েছে শুধু বিদেশী শোষককে সেবা করবার জন্যে। পাঞ্জাব সামরিক আইনে দণ্ডিত মানুষের মামলা আমি নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি শতকরা পঁচানব্বুইটা দণ্ড অসিদ্ধ। দশ জনের মধ্যে ন জনই নির্দোষ। তাদের একমাত্র দোষ তারা দেশপ্রেমিক। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মামলা হলে আদালতে ভারতীয়রা শতকরা নিরানব্বুই ক্ষেত্রেই বিচারবঞ্চিত। বিচারের ফল একমাত্র ইংরেজের অনকূলে। আমার এ চিত্র একটুও অতিরঞ্জিত নয়। সজ্ঞানেই হোক বা অজ্ঞানেই হোক এ দেশের আইনপ্রয়োগ শুধু শোষকের স্বার্থে এ চোখ-কান খোলা রাখলেই যে কেউই বুঝে নিতে পারে।

সব চেয়ে আশ্চর্য অনেক ইংরেজ ও তাদের অনেক ভারতীয় সহকর্মী জেনেও জানে না তাদের শাসন পরিচালনায় কী ঘোরতর অন্যায় তারা প্রশ্রয় দিচ্ছে। যে অপরাধে তারা অন্যকে দণ্ড দিচ্ছে সে অপরাধে তারা নিজেরাই লিপ্ত। তারা আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করছে যে তারা পৃথিবীর এক উন্নততর বিচারপদ্ধতি পরিচালনা করছে আর তারই মধ্য দিয়ে ভারত ধীরে ধীরে সৌভাগ্যের পথে এগিয়ে চলেছে। তারা জানে না বাস্তবক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার এক দিকে রেখেছে ত্রাসের ভাব ও বলের নির্লজ্জ ব্যবহার, অন্য দিকে কেড়ে নিয়েছে প্রত্যাঘাতের বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা। ফলে একটা গোটা জাতিকে পুরুষত্বহীন করে দিয়েছে আর তাদের এই নিবীর্যতাই শাসকবর্গকে বুঝিয়েছে, আহা, কী সুখে-শান্তিতেই ওদের দিন যাচ্ছে। এই অজ্ঞান আর আত্মবঞ্চনা থেকে শাসকবর্গের মুক্তি নেই।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ১২৪-ক ধারাটা কী? নাগরিকের ন্যূনতম স্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নেওয়া। আইনের কারখানায় স্নেহের জন্ম হয় না, যেচে মান বা কেঁদে সোহাগ অসম্ভব। যদি কারু প্রতি কারুর স্নেহ না থাকে তাহলে তার অস্নেহ বা অসন্তোষ জানাবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত তা না বলপ্রয়োগে কলুষিত হয়। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার আর আমি এই অস্নেহের অপরাধেই অভিযুক্ত। ভারতের প্রিয়তম দেশপ্রেমিকদের অনেকেই এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। কেন আমার এই অস্নেহ তার কারণ সংক্ষেপে কিছু বলেছি। কোনো শাসক বা ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে আমার কোনো বিদ্বেষ নেই, রাজার বিরুদ্ধে তো আরো নয়। কিন্তু যে গভর্নমেন্ট ভারতের বিস্তৃততম ক্ষতি করেছে তার প্রতি অস্নেহ পোষণ করা আমি পূণ্য বলে বিবেচনা করি। ইংরেজশাসনের আগে আর কোনো শাসনেই ভারতের মানুষ এত নিবীর্য ছিল না। ইংরেজশাসনকে আমি যখন এই নিবীর্যতার কারণ বলে মনে করি তখন তার প্রতি আমার স্নেহ থাকে কী করে? আমি যে বিভিন্ন প্রবন্ধে আমার এই মনোভাব বিশদ করে বলতে পেরেছি তাতেই আমি সম্মানিত।

বস্তুত আমি অসহযোগের মধ্য দিয়ে ভারত ও ইংলণ্ড উভয় দেশের সেবা করেছি, দেখাতে চেয়েছি কী অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের বসবাস করতে হচ্ছে। অন্যায়ের সঙ্গে অসত্যের সঙ্গে অসহযোগ, ন্যায়ের সঙ্গে সত্যের সঙ্গে সহযোগের মতই অবশ্য কর্তব্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসহযোগ করতে গিয়ে অন্যায়কারীকে পীড়ন করা হয়েছে। আমি বলতে চাইছি সহিংস অসহযোগ শুধু অন্যায়ই সৃষ্টি করে চলে, আর অন্যায়কে

বাঁচিয়ে রাখতে গেলে যেমন বলের প্রয়োজন হয় তেমনি অন্যায়কে দূর করে দিতে হলে বলের থেকে বিরতির প্রয়োজন। অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগের জন্যে যে শাস্তি তাতে সজ্ঞান সম্মতির অর্থই অহিংসা। তাই আইনের বিচারে যা গর্হিত অপরাধ আর আমার বিচারে যা মহত্তম কর্তব্য, তার জন্যে দীর্ঘতম শাস্তি আমি সানন্দে বরণ করে নেব।'

তারপর বিচারক ও এসেসরদের সম্বোধন করে মহাত্মা বললেন, 'আপনাদের কাছে দুটো পথ খোলা আছে, এক চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এই অন্যায় থেকে সরে আসা, যদি অবশ্য মনে করেন যে আইন আপনারা প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন সেটা অন্যায় ও সেই অর্থে আমি নির্দোষ—নচেৎ আমাকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া, যদি বিশ্বাস করেন যে আইন আপনারা প্রয়োগ করছেন তা এই দেশবাসীদের পক্ষে হিতকর ও সেই অর্থে আমার প্রবন্ধগুলি ক্ষতিসাধক।'

ব্রুমফিল্ড গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করে ছ বছরের জেলের আদেশ দিল।

'আমি যদি গ্রেপ্তার হই' এ নামে এক প্রবন্ধ লিখে গান্ধী আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যেন তাঁর গ্রেপ্তারের পর কোথাও কোনো হরতাল না হয়, না বা কোনো সভা বসে বা মিছিল বেরোয়। যেন সর্বত্র সম্পূর্ণ শান্তি বজায় থাকে।

মহাত্মার নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা হল। সর্বত্র নেমে এল বিষাদ আর বিরতি। আর স্তব্ধতা দৃঢ়ীভূত স্তব্ধতা।

পাঁচ

ততঃ কিম্?

দেশবন্ধু বললেন, 'এখন একমাত্র পথ কাউন্সিলে ঢুকে গভর্নমেন্টকে আঘাত করা।'

জেলের মধ্যে দু দল হয়ে গেল। একদল গান্ধীর, আরেক দল দেশবন্ধুর। সুভাষ দেশবন্ধুর দলে।

'নির্বাচিত মেম্বাররা তো কোনো দিনই মেজরিটি হবে না।' বিরোধীদল তর্ক তুলল।

'না হোক। তবু কাউন্সিলে প্রতিনিয়ত গভর্নমেন্টকে আক্রমণ করবার মনোভাবটা বাইরের প্রত্যক্ষ আন্দোলনকে জোরদার করবে।' বললেন দেশবন্ধু, 'তখন কাউন্সিলে শুধু দুটো যুধ্যমান দল থাকবে, গভর্নমেন্ট আর পিপল। বাইরেও এই বিভেদটা উচ্চারিত হবে: সরকার আর জনগণ। এর মধ্যে আর কোনো দল নেই, আর কোনো গোষ্ঠী নেই, আর কোনো উপসর্গ নেই। তা ছাড়া কোনো বিষয়েই মেজরিটি হব না তা কী করে বলছ?' দেশবন্ধু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: 'এমন বিষয়ও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে যাতে তর্ককৌশলে হয়ে যাব মেজরিটি।'

'মেজরিটি হলেই বা লাভ কী?' বিরোধী দল আবার আপত্তি তুলল: 'আপনাদের পাশ-করা প্রস্তাব গভর্নর ভিটো করে দেবে।'

'ভিটো করে দেবে! তাই দিক না! বাইরের লোক তখন বুঝবে রিফর্মসের স্বরূপ কী।' বললেন দেশবন্ধু, 'জনগণের সামনে গভর্নমেন্ট ভণ্ড বলে প্রতিপন্ন হবে। ঐ ভিটোই জনগণকে রুষ্ট করবে, উত্তেজিত করবে, তাদের আন্দোলনে ধার জোগাবে।

আমার বক্তব্য তো একমাত্র তাই। কাউন্সিলে ঢুকে সরাসরি কিছু না হোক পরোক্ষে লাভ হবে। আসল তো হচ্ছে আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা, তাকে ক্ষিপ্রতর করা। কাউন্সিলের লড়াই-ই আন্দোলনে আবেগ সঞ্চার করবে। আবেগ না থাকলে বেগ আসবে কী করে? বাক্য যে কত বড় অস্ত্র কাউন্সিলে ঢুকেই তা বোঝানো যাবে। আর সব সিদ্ধান্তই গভর্নর ভিটো করবে য়্যাক্টে এমন এক্তিয়ার নেই। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রস্তাব পাশ করানো যায় তা হলে তাতে গভর্নর হাত দেবে না। ফলে মন্ত্রীরা গদি ছাড়তে বাধ্য হবে। পরিণামে এই প্রমাণিত হবে ডায়ার্কি অচল, রিফর্মস অসার আর ইংরেজ গভর্নমেণ্ট কাপট্যের অবতার।

গান্ধীর দলের নাম হল নো-চেঞ্জার আর দেশবন্ধুর দলের নাম হল স্বরাজিস্ট, যদিও স্বরাজ্য পার্টির জন্ম আরো কিছু পরে। সুভাষ নিঃসন্দেহে স্বরাজিস্ট।

অগ্রণী নেতারা সবাই প্রায় জেলে, আন্দোলন স্তিমিত থাকলেও উত্তেজনার অভাব ছিল না। ধরপাকড় সমানেই চলছে, চলছে নির্যাতনের অট্টহাস। আইন এসে দাঁড়িয়েছে পিনাল কোডের দুটি ধারায়, ১০৮ আর ১৪৪—জনতা হলেই অবৈধ জনতা আর স্বেচ্ছাসেবক হলেই ঘৃণ্যজীবী ভবঘুরে। উচ্চ আদালতে আপিল তো করবে না কেউ, তাই নিম্ন আদালতগুলি মনের সুখে যথেচ্ছাচারের মুক্ত অঙ্গনে খাড়া হয়ে রইল।

খবর এল পাঞ্জাবে লরেন্সের মূর্তি আক্রান্ত হয়েছে। অন্ধ্রে গোদাবরীতে পোঁতা হয়েছে জাতীয় নিশান। গুরুকাবাগে আকালিদের উপর পুলিশ লাঠি-চার্জ করেছে। বরিশাল ও ফরিদপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের বেত মারা হয়েছে। এমনি নানা দিক থেকে আসছে উত্তেজনার উত্তাপ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা জোগাল ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের বিষাক্ত উক্তি: 'ভারতবর্ষের শাসনসৌধের ইস্পাতের কাঠামোই হচ্ছে আই-সি-এস।'

ইস্পাতের কাঠামো। এই একটি আলপিনের খোঁচায় সারাদেশ যন্ত্রণাবিদ্ধ হল। আশা ছিল ক্রমে-ক্রমে আই-সি-এসদের উত্তুঙ্গতাকে হ্রস্ব করে আনা হবে, ক্রমে বা সমতল করে আনা হবে দেশের সাধারণ মানুষের পর্যায়ে, আর তাদের টাকা ও ক্ষমতার অত ঝলমলানি থাকবে না। কিন্তু, না, সে আশায় বাজ হানল লয়েড জর্জ। সে আরো বললে, 'আমি তো এমন কোনো সময়ের কথা ভাবতেও পাচ্ছি না যখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ আই-সি-এসদের পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারবে। ভারতবর্ষে ব্রিটেনের যে গুরুভার দায়িত্ব আছে তা পরিপূর্ণরূপে পালন করবার জন্যেই আই-সি-এসদের প্রয়োজন। সে দায়িত্বকে বিসর্জন দেওয়া নয়, সে দায়িত্বপালনে আই-সি-এসরা যাতে দেশবাসীর সার্থক অংশীদার হতে পারে তারি জন্যে রিফর্মসের অবতারণা।'

সুভাষ ভাবল আমিও তো এমনি ইস্পাতের কড়ি-বরগা হতে পারতাম। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে অন্য কাজে ডেকেছেন। ডেকেছেন ঐ ইস্পাতের স্পর্ধিত সৌধকে ভূমিসাৎ করে দিতে। ধুলো করে দিতে ঐ গর্বের পর্বতভার। কিন্তু উপায় কী? পথ কোথায়?

লয়েড জর্জের উক্তিতে দেশ এত ক্ষুব্ধ হল যে লর্ড রেডিংকে একটা স্তোকবাক্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হল। না, না, তোমরা গোসা কোরো না, প্রধানমন্ত্রী যাই বলুন, আগে-আগে তোমাদের যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার নড়চড় হবে না। আর

অপেক্ষা করা যায় না। দেশবন্ধু ছাড়া পাবেন কবে?

'যদি তিনি গান্ধীর বারদৌলি প্রস্তাব মেনে নেন তো এখুনি ছেড়ে দিতে পারি।' সে তো কবেই বলা হয়েছিল তাঁকে, তিনি স্বীকৃত হন নি। আবার একবার এখন বলে দেখব নাকি? দেখুন না।

বলা বৃথা। ও সব কথা তিনি কানেও তুলতে চান না। আন্দোলন কখনো বন্ধ হবার নয়। লোক থেমে যেতে পারে কিন্তু আন্দোলন থামবে না। মহাত্মাজী সরে যেতে পারেন কিন্তু দেশবন্ধু সরবেন না।

'আপনি যদি কাউন্সিলে যেতে চান, গেলে রাজার নামে শপথ নেবেন?' নো-চেঞ্জারদের একজন জিজ্ঞেস করলে।

'কে রাজা? ও তো একটা ফর্ম মাত্র।' বললেন দেশবন্ধু, আসল উদ্দেশ্যটা দেখ।'

'তা হলেও যে অসহযোগী তার পক্ষে কি রাজার নামে শপথ করা শোভা পায়?'

'অসহযোগী হয়েও তো রাজার মাথাওয়ালা ডাকটিকিট ব্যবহার করছ। নিচ্ছ রাজার দেওয়া আরো অনেক সুবিধে। কথাটা তা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বুরোক্রেটিক গভর্নমেণ্টকে ধ্বংস করা, আমরা তো আর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছি না। সুতরাং শপথে আপত্তি করবার কিছু নেই।'

পনেরো-ষোলো এপ্রিলে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মিলন বসল। সভানেত্রী বাসন্তী দেবী। তিনি নতুন কথা বললেন। বললেন, 'কাউন্সিলে প্রবেশ করা তো মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরোধিতা নয়, কাউন্সিলে প্রবেশ করে প্রতি পদে বুরোক্রেসিকে বাধা দেওয়াও তো বিরাট অসহযোগিতা। বাইরে থেকে অসহযোগের চেয়ে ভিতরে থেকে অসহযোগ ঢের বেশি কার্যকর হবে। হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া হবে যে রিফর্মস এসেছে তা ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। আমরা তো কাউন্সিল চালাতে যাব না, আমরা কাউন্সিল অচল করতে যাব। সুতরাং কাউন্সিলে ঢোকা অসহযোগেরই এক অধ্যায়।'

কারু বুঝতে বাকি রইল না এ কার কথা? দেবী বাসন্তী কার মূর্তিমতী মর্মবাণী?

নো-চেঞ্জাররা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। মহাত্মা যে ছক কেটে দিয়ে গেছেন তার বাইরে যাওয়া যাবে না, তাঁর দেখানো পথই আঁকড়ে থাকতে হবে। বোঝা যাচ্ছে জেল থেকে বেরুবার পরেই এ নিয়ে বাধবে একটা সঙ্ঘর্ষ। সঙ্ঘর্ষের আশায় সুভাষ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

দেশবন্ধু বললেন, 'একটা ইংরিজি দৈনিক পত্রিকা বের করতে হবে। নাম হবে ফরোয়ার্ড।'

হ্যাঁ, এগিয়ে চলা, নির্বিশ্রাম এগিয়ে চলা। কোথাও থামা নয়, বসে পড়া নয়, ফিরে যাওয়া নয়, শুধু এগিয়ে চলা। আদর্শকে ধ্রুবতারা রেখে উত্তরঙ্গ সমুদ্রে পাড়ি জমানো।

'তুমি তো আমার কদিন আগে ছাড়া পাবে, তাই না?' সুভাষকে জিজ্ঞেস করলেন দেশবন্ধু।

'হ্যাঁ, পাঁচ দিন আগে।' সুভাষের চোখ ছলছল করে উঠল।

এই কদিন জেলের মধ্যে কী আনন্দে কেটেছে তাদের, গুরু-শিষ্যের রাজ্য ও

তার সেনাপতির। আন্দোলনের ফলে জেলবন্দীদের মধ্যে কোনো হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন ছিল না, সকলের এক জাতি, এক ভারতীয়তা। তাদের এক উৎসব তা হিন্দুর সরস্বতী পুজো হোক কি মুসলমানের ঈদ হোক। সকলের একসঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে খাওয়া-দাওয়া। আর এ সমস্ত আয়োজনের সম্পাদক সুভাষ। তার চোখে হিন্দু-মুসলমান দুটো মানুষ নয়, দুটো নাম মাত্র। এক মানুষের দুই নাম। সেই এক মানুষের এক সুখ—সম্মানে বাস করা, এক যন্ত্রণা—দাসত্ববন্ধনে ক্লিষ্ট হওয়া। নিশ্চয়ই কোথাও এদের মেলানো যাবে। নিশ্চয়ই এমন কোনো একটা অনুভূতির স্তর আছে যেখানে এরা অস্তিত্বের সহজ উদ্দীপনায় একত্র হতে পারবে। তারা একত্র হতে পারবে মানবিকতায়, ভারতীয়তায়, একই সমান শত্রুর সম্মুখীনতায়। যে ছলে-বলে দু ভাইকে আলাদা করে রেখেছে, নিজের অন্ন উঠে যাবে বলে মিলতে দিচ্ছে না প্রাণে ধরে, তার মত আর শত্রু কে? শুধু একবার অন্তরের ইচ্ছাটাকে জাগ্রত করা। তা হলেই মুক্তি। আর কত সহজেই, ঘরের বাইরে আকাশের দিকে তাকালেই, এ ইচ্ছাকে জাগানো যায়।

'কেমন আছ?' জেলে সাক্ষাৎকারের সময় বাসন্তী দেবী জিজ্ঞেস করলেন দেশবন্ধুকে।

'ভালো আছি।' প্রফুল্ল মুখে বললেন দেশবন্ধু, 'সুভাষ আমাকে খুব সেবা করছে। ও যে এত ভালো নার্স তা কে জানত।'

জেল থেকে বেরোবার পর সুভাষের ডাক পড়ল এই সেবাতেই। উত্তরবঙ্গে দেখা দিয়েছে ভয়াল বন্যা। পাঁচ-পাঁচটা জেলা ভেসে গিয়েছে। শুধু ভেসে গিয়েছে বললে কিছু বোঝানো যাবে না, জল দাঁড়িয়ে গেছে প্রায় বারো ফুট উঁচু হয়ে। শস্যের সবুজ কণাটুকুও কোথাও নেই, ঘরবাড়িও অনেক নিশ্চিহ্ন, আর গরু বাছুর তো গেছেই, মানুষও অনেক মগ্ন মৃত গৃহহীন। কংগ্রেসের কাছে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছুলো। ত্রাণের ব্যবস্থা করো। কংগ্রেস সুভাষকে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে একজন ডাক্তার গেলে ভালো হয়। গেল ডাক্তার জে এম দাশগুপ্ত। সেবার হাত মমতার হাত, করুণার হাত। সেবা ছাড়া জনগণের মনে সন্নিবিষ্ট হবে কী করে? আর সন্নিবিষ্ট হয়েই বা থাকবে কতক্ষণ? যদি তোমার চরিত্র না উজ্জ্বল হয়, তোমার আদর্শ না মহৎ হয়, যদি তুমি বিদ্বান না হও। বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। নেতা হতে চেও না, সেবক হও। সেবা করতে-করতেই পাওয়া যায় নেতৃত্ব।

কয়েকদিন আগেই 'নিখিলবঙ্গ যুবক সভার আয়োজন করেছিল সুভাষ। অধিবেশন বসেছিল আর্যসমাজ হলে, ডক্টর মেঘনাথ সাহা মূল সভাপতি আর সুভাষ অভ্যর্থনা সমিতির অধিকর্তা। প্রতিনিধি এসেছিল নানা স্কুল-কলেজ থেকে, পাঠাগার থেকে, সঙ্ঘ সমিতি থেকে এমনকি মক্তব-মাদ্রাসা থেকে। সুভাষই প্রাণ-জাগানো বক্তৃতা দিলে। বিষয় শুধু দুটো—হৃদয়-ঢালা সেবা আর ধৈর্যধরা দুঃখসহন। সকল শক্তির শ্রেষ্ঠ শক্তি আত্মশক্তি। আমরা একত্রে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করব, যে পরিমাণ কষ্ট সহ্য করব, আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসাও সেই পরিমাণে প্রবল হবে।

'সকল বলের শ্রেষ্ঠ বল, চরিত্রবল।' বলছে সুভাষ, 'চরিত্র দৃঢ় না হলে দুর্বলতাকে জয় করবে কী করে? কী বলেছেন বিবেকানন্দ? বলছেন দুর্বলতাই একমাত্র পাপ। যে সব সময় নিজেকে দুর্বল ভাবে সে কোনোকালে বলবান হবে না। যে নিজেকে

সিংহ বলে জানে সেই জগজ্জালের পিঞ্জর ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে। নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।'

তারপরেই সেবা। মানবসেবাই মাধবসেবা। সেবার থেকেই চিত্তে নির্মলতা জাগবে, জাগবে নিঃস্বার্থপরতা। রুগ্ন আর্ত পীড়িত মানুষই তখন ঈশ্বরের মন্দির হয়ে যাবে, আর তুমি সেবক, তুমি হয়ে উঠবে উপাসক।

শান্তহারকে কেন্দ্র করে সুভায সেবাত্রাণের ব্রত নিয়ে ঘুরতে লাগল উত্তরবঙ্গ—আদমদিঘি, মদনপুর, কুশুম্বি, বগুড়া। বিপন্নদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্যে এখানে-ওখানে অজস্র তাঁবু পাঠতে লাগল, পাঠাতে লাগল খাদ্য-বস্ত্র। স্যার পি সি রায়ের ডাকে ত্রাণভাণ্ডারে চাঁদা উঠল চার লক্ষ টাকা। প্রফুল্লচন্দ্র সেই ত্রাণ যজ্ঞের পুরোধা হলেন, তাঁর আবেদনে শুধু খাদ্য-বস্ত্র নয়, আসতে লাগল ওষুধ-বিষুধ, নানা প্রতিষেধ। দেশকে ভালোবাসা সার্থক কিসে? শুধু দেশের মানুষকে ভালোবেসে। দেশের মানুষই দেশ। দেশই দেশের মানুষ।

কিন্তু সরকারের মুষ্টি কী কুণ্ঠিত, কী কৃপণ! এই বিরাট ত্রাণকার্যে তাদের বদান্যতা মোটে বিশহাজার। সরকারের মুখপাত্র দেশী মন্ত্রী, রিফরর্মসের পুত্তল, কী বলছে এই কার্পণ্যের সমর্থনে? বলছে, গভর্নমেণ্ট কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। শুধু আর্তত্রাণ করে ফতুর হয়ে যাওয়াই তার একমাত্র কাজ নয়। শোনো কথা। প্রজার দুঃখনিবারণ রাজধর্ম নয়। প্রজা বানের জলে ভেসে যাবে কিন্তু রাজা তার জন্যে চোখের জলটুকুও ফেলবে না।

কংগ্রেসের সেবাত্রাণ বিরাটভাবে সফল হল। দেশবাসীর কাছে বেড়ে গেল কংগ্রেসের মর্যাদা। দুঃস্থের দুঃখমোচন একমাত্র কংগ্রেসই করতে পারে, কংগ্রেসই নিরাশ্রয় জনকে গৃহ তৈরি করে দিতে পারে, কংগ্রেসই ম্লান মুখে হাসি ফোটাতে পারে, বদ্ধ ঘরে বওয়াতে পারে হাওয়া। কংগ্রেসই দিতে পারে সংগ্রামের নির্দেশ। আনতে পারে সর্বসুখা স্বাধীনতা।

কিন্তু কংগ্রেস এখন কী করবে? গান্ধী জেলে, দেশবন্ধুও বেরোননি এখনো। এখন আন্দোলন কোন ঢেউ তুলবে? গান্ধীকথিত গঠনমূলক কাজ করেই তৃপ্ত থাকবে, চরকা কেটে তাঁত বুনে স্বদেশী পাঠশালায় মাস্টারি করে, না, চিত্তরঞ্জন যা বলছেন, কাউন্সিলে ঢুকে সরকারের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে? হোক বাক্যুদ্ধ, বাক্যই ব্রহ্ম। একেকটা বাক্যই শতসঙ্কল্পের বারুদ পোরা। একটি বাক্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তির বীজাঙ্কুর। যেমন ধরো, বন্দেমাতরম, আরো পরে কুইট ইণ্ডিয়া, আরো একটু পরে জয় হিন্দ। একটা কথার মধ্যেই সমস্ত উদ্বোধন। সমস্ত দেশের প্রাণশুদ্ধি।

এদিকে আইন অমান্য তদন্ত কমিটি বসিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সারা দেশ ঘুরে ঘুরে সাক্ষী সাবুদ শুনে বিচার করে দেখছে আবার আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু করা সঙ্গত হবে কিনা। দেশের মনোবল ঠিক দৃঢ় আছে, শুধু নেতৃত্বের অভাবে মাঝে মাঝে এসে যেতে পারে অসংযম। তাই কমিটি সুপারিশ করল, প্রদেশগুলি নিজের-নিজের দায়িত্বে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আইন-অমান্য চালাতে পারে, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শাসনের মুষ্টি রাখতে হবে যেন আন্দোলন না হিংসায় আবিল হয়ে ওঠে। তদন্ত কমিটির সদস্য

ছয় জন। হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, ডাক্তার আনসারি, রাজাগোপালাচারী আর কস্তুরি রঙ্গ আয়াঙ্গার।

সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানবর্জনে ওরা একমত হল। জাতীয় স্কুল শুধু স্থাপন করলে চলবে না, সরকারি স্কুল থেকে তারা ভালো এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর সেই আকর্ষণেই সরকারি স্কুল ছেড়ে ছেলে আসবে জাতীয় স্কুলে, কোনো পিকেটিং-এর প্ররোচনায় নয়।

আদালতবর্জনেও তারা একমত হল। মামলা যারা করছে আর যারা চালাচ্ছে, মক্কেল আর উকিল সবাই আদালত পরিহার করবে। বিচার্য বিষয়কে নিয়ে যাবে গ্রাম-পঞ্চায়েতে—সেই বিচারই যে ঠিক বিচার তার সপক্ষে গড়ে তুলতে হবে জনমত।

কাউন্সিলে প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে কমিটি একমত হতে পারল না। আনসারি, রাজাগোপালাচারী আর আয়াঙ্গার বললে, কাউন্সিলবর্জন সম্পর্কে কংগ্রেসের আগের যা সিদ্ধান্ত আছে তাই বহাল থাকবে, অর্থাৎ কাউন্সিল বর্জিত হবে কিন্তু আজমল খাঁ, মতিলাল নেহরু আর প্যাটেল দেশবন্ধুর অনুকূলে মত দিলে—একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক না কেমন চেহারা নেয়।

এবং এই বিভেদকে কেন্দ্র করেই গয়া-কংগ্রেসে দেশবন্ধু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে স্বরাজ্য পার্টির পত্তন করলেন। নতুন কিছু ভাবো, নতুন কিছু করো। শুধু গতানুগতিককে আঁকড়ে থেকো না।

ছয়

উনিশশো বাইশের নয়ুই আগস্ট রাত্রিতে দেশবন্ধু জেল থেকে ছাড়া পেলেন।

'আপনি মুক্ত।' মেজর সেলিসবারি এসে বললে, 'আপনার ছেলে চিররঞ্জন দাস বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে, আপনি বাড়ি যান।'

যারা পড়ে রইল তাদের কাছে এ দুঃসহ বিরহ। তাদের মনে হল দেশবন্ধুকে যেন পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাদের মধ্য থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকলের চোখ ছলছল করে উঠল। কিন্তু অনেক কাজ পড়ে আছে। দেশকে স্বাধীন করার কাজ। এই ভেবেই সব শোক দুঃখ মনোবেদনা ভুলতে হবে আমাদের। যাবার আগে ডাকলেন মথুরকে। মথুরও কাঁদছে।

'আমি তো ছাড়া পেয়ে বাড়ি চললাম। তোরও তো ছাড়া পেতে বেশি দেরি নেই।' তার মাথায় হাত রাখলেন দেশবন্ধু: 'তুই খালাস পেলেই সটান আমার বাড়ি যাবি, আমার কাছে! বুঝলি?'

বুঝেও বুঝে উঠতে পারছে না মথুর। সে ডাকাত, জেল খাটতে এসেছে, তার উপর দেশবন্ধুর এত বিশ্বাস এত মায়া! আর সে এই নতুন জেল খাটছে না, এর আগে আরো কয়েকবার সে খেটে গেছে। সে যাকে বলে, দাগী ডাকাত। কী শুভক্ষণে কে জানে সে দেশবন্ধুদের ওয়ার্ডে কাজ করতে আসে। আর সবার সঙ্গে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে যায়।

কিন্তু দেশবন্ধু ছাড়া কে আছেন আশ্রয়দাতা?

'বাবা, আমি কি তোমার বাড়ি চিনি যে যাব?' মথুর বললে করুণমুখে।

'সে তোকে ভাবতে হবে না। তোর ছাড়া পাবার দিন আমি ঠিক সময়ে লোক পাঠিয়ে দেব, সে এসে তোকে নিয়ে যাবে।'

নিজের কানে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে সাহস পাচ্ছে না মথুর। যদি এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়তে পারত! এই মুহূর্তেই! দুপুরে নয় রাত্রে দেশবন্ধুর পা টিপে দিত মথুর আর বলত তার জীবনের কাহিনী। জীবনের কাহিনী মানে ডাকাতির কাহিনী। সে সৎ হবার সুস্থ হবার সময় পেল কই? ডাকাতি করে ধরা পড়ে, লম্বা জেল হয়ে যায়, বেরিয়ে এসেই তৈরি কোনো বিশ্রাম পায় না, আবার তড়িঘড়ি ডাকাতি করে বসে। আবার লম্বা জেল। এমনি ভাবে আট-দশবার হল। জীবনের অর্ধেকেরও বেশি কাটল এই জেলখানায়। আর বাঁচব কদিন। তবু ভাগ্য বলব এই শেষবার যে জেলে এসেছিলাম। জেলে এসেই না 'বাবা'র দেখা পেলাম। হ্যাঁ, শেষবার। বাবার চরণ যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়ব না। আর কোনোদিন হব না এমুখো। বাড়ির সকলের কাছেও দেশবন্ধু তাঁর প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কিন্তু সবাই কেমন একটু সন্ত্রস্ত হল। একটা খুনে ডাকাতকে বাড়িতে এনে আশ্রয় দেওয়া কি ঠিক হবে?

খুনে ডাকাত! কি রে, খুন করেছিস নাকি?

মথুর মাথা চুলকে সলজ্জ মুখে বললে, 'তা দু একটা খুন না করতে হয়েচে।'

সবাই শিউরে উঠল।

'দেখলে কেমন শাদা সত্য কথাটা বললে। হোক না খুনে ডাকাত,' দেশবন্ধু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'ওর কি একটা সুস্থ সমর্থ মানুষ হবার সুযোগ মিলবে না? একবার ডাকাতি করেছে বলে আবারও ওকে ডাকাতিই করতে হবে এমন কী কথা আছে?'

'তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো,' বললেন বাসন্তী দেবী, 'কিন্তু আমি ভাবছি, ওর স্বভাব কি ও ছাড়তে পারবে?'

'খুব পারবে। আমার সঙ্গে থাকবে, আমার সেবা করবে, চুরি-ডাকাতি করবার সময়ও পাবে না। কিরে মথুর,' মথুরের দিকে তাকালেন দেশবন্ধু: 'আবার চুরি-ডাকাতিতে মন দিবি নাকি?'

'বাবার শ্রীচরণ ছাড়া আর কিছুতে মন দেব না।'

দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য ভেঙে গেলেও মন ভাঙেনি, অবসন্ন হয়নি তাঁর প্রাণের সজীবতা। নিজের মধ্যে নিজের বেগবান প্রাণের আনন্দে তিনি ভরপুর। এই ছাত্রসমিতি যখন তাঁকে ডাকল অভিনন্দন জানাতে তিনি পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে সাড়া দিয়ে উঠলেন। যৌবনের ত্যাগ দুঃসাহস পবিত্রতা ক্লেশ সহ্য করবার ক্ষমতা শত বৈফল্যেও বিচলিত না হওয়া—এই মহাজীবনকে তিনিও অভ্যর্থনা জানালেন। তোমরা জীবনে সত্যের পূজা বহন করে চলেছ, তোমাদের রথ সমস্ত পর্বত লঙ্ঘন করে যাবে, তোমাদের তরণী পার হয়ে যাবে সমস্ত সমুদ্র।

স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে দেশবন্ধু দার্জিলিঙ গেলেন। সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে ফিরে এলেন কলকাতা। আবার বেরুলেন কাশ্মীরের পথে। সঙ্গে আরো অনেকের মধ্যে মথুর।

ঠিক দিনে জেল-গেটে লোক পাঠিয়ে দেশবন্ধু তাকে বাড়ি আনিয়েছেন। কী রে, দেখলি তো, ভুলিনি তোর খালাস পাবার দিনটির কথা।

মথুর দেশবন্ধুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। এত দয়া এত ভালোবাসাও কোথাও আছে, তার মত মানুষের জন্যেও আছে, এ সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

সুভাষ লিখছে তার 'তরুণের স্বপ্নে': 'মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠিয়ে তাকে জেলখানা থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর প্রায় তিন বছর মথুর তাঁর কাছে ছিল। তাঁর পরিচারক হয়ে সে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেছে।'

কিন্তু দেশবন্ধুকে কাশ্মীরে ঢুকতে দেওয়া হল না। প্রবেশপথে, বারমুলায়, পুলিশ তাঁর পথ আটকালো। বললে, 'যদি প্রতিশ্রুতি দেন তবেই ঢুকতে পাবেন।'

'কিসের প্রতিশ্রুতি?'

'যে, কাশ্মীরে আপনি কোনো রাজনৈতিক কাজে ও কথায় লিপ্ত হবেন না। এই মর্মে, এই নিন,' পুলিশ-সুপার একখানা কাগজ মেলে ধরল: 'প্রতিজ্ঞা-পত্রে দস্তখৎ করে দিন।'

দেশবন্ধু তখন অত্যন্ত অসুস্থ, প্রায় একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর—প্রতিজ্ঞা-পত্রে দস্তখৎ করতে অস্বীকৃত হলেন। যা হবার হবে—প্রাণের চেয়েও সম্মান বড়, স্বাধীনতা বড়—ফিরে চলো এখান থেকে। এক মুহূর্তও দেরি কোরো না। সুভাষের ঠিক মনের মতন হল। তার গুরুকরণ যথার্থ হয়েছে।

কী বলছেন বিবেকানন্দ? বলছেন, 'আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি—কেবল শক্তি। আর আমাদের উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ যে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ তাতে তা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করতে পারে। উপনিষদ কী বলে? সকল জাতির সকল মতের সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দুঃখী পদদলিতদের উচ্চরবে আহ্বান করে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে মুক্ত হতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা—এই উপনিষদের মূলমন্ত্র।'

দেশবন্ধু মারীতে এসে বিশ্রাম নিলেন। জ্বর নেমে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। এবার তবে চলো দেরাদুন। সেখানে যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক সম্মেলন বসেছে। মন খুলে দুটো কথা বলে আসি।

আর দেরাদুনে সেই রাজনৈতিক সম্মেলনেই দেশবন্ধু সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন: 'আমি সাধারণ মানুষের জন্যে স্বরাজ চাই, উচ্চশ্রেণীদের জন্যে নয়। বুর্জোয়াদের আমি গ্রাহ্য করি না। তারা সংখ্যায় কজন? জনগণের জন্যেই স্বরাজ আর এই স্বরাজ জনগণই অর্জন করবে।'

রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই প্রথম উদাত্ত উচ্চারণ: অগণন সাধারণ মানুষের জন্যে স্বরাজ, মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীদের জন্যে নয়। আর এই স্বরাজের কর্মযজ্ঞেই কংগ্রেসের আহ্বান।

তারপর পাঞ্জাবে উত্তরপ্রদেশে বহু জায়গায় ঘুরলেন দেশবন্ধু। সংগ্রাম, সংগ্রাম, এখন শুধু মুখোস খুলে দেওয়ার সংগ্রাম। রিফর্মড কাউন্সিল যে একটা ছলনা, মুখোসমাত্র,

সেটাই সপ্রমাণ করবার জন্যে কংগ্রেসের ঐ কাউন্সিলে ঢোকা উচিত। ওদের শিল ওদের নোড়া দিয়েই ওদের দাঁতের গোড়া ভেঙে দেওয়া দরকার। আর বর্জন—বর্জন মানে কী? মুখোসটাকে খুলে ফেলে দেওয়াই কি মুখোসের সত্যিকার বর্জন নয়? কংগ্রেস যদি ইলেকশানে দাঁড়ায় নিশ্চয়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া যাবে কতদূর কপট এই ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসি। কপটকে শুধু এড়িয়ে যাওয়া নয়, তার কাপট্যকে চোখের সামনে খুলে ধরাই আসল বীরত্ব।

অবশেষে নভেম্বরে কলকাতায় ফিরে এসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সভাপতি হয়ে বসলেন। সেখানে গান্ধীর মতবাদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের মতবাদের সঙ্ঘর্ষ বাধল। অর্থাৎ কাউন্সিল বর্জন করা না কাউন্সিল অচল করা। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে ইচ্ছে করেই পৌঁছুনো হল না—ডিসেম্বরেই যখন গয়ায় কংগ্রেস বসছে তখন সেখানেই এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি হবে। আর গয়া-কংগ্রেসের সভাপতিও দেশবন্ধু।

দেশবন্ধু বুঝলেন হাওয়া তাঁর প্রতিকূলে। তবু শেষ পর্যন্ত বলা যায় না কী হয়। বুকভরা নিশ্বাস নিয়ে তিনি চললেন গয়া। সুভাষকে সঙ্গে নিলেন। বলতে চাও বলো সেক্রেটারি, বলো মন্ত্রী-যন্ত্রী, কিংবা বলো তাঁর উত্তরসূরী। তাঁর সমস্ত স্বপ্নের প্রকাশমূর্তি। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি রাজনৈতিক মনীষা ও রাজনৈতিক বাস্তববোধে অসীম আস্থা সুভাষের। আর যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামাত্মক মনোভঙ্গিটাকে জাগিয়ে রাখতে হয় তাহলে আপাতত কাউন্সিল-আক্রমণটাই মুখ্য উপায়। নিয়তসংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা কোথায়?

গয়া-কংগ্রেসে দেশবন্ধুর ভাষণ অপূর্ব হল। এক কথায় বলতে হয়, মহিমান্বিত। যেমন বিশদ তেমনি গভীর, যেমন ওজস্বী তেমনি যুক্তিপূর্ণ। ভাবে আবেগে তত্ত্বে তর্কে বাস্তববুদ্ধিতে যুদ্ধনীতিতে—সব দিক থেকে সুনিপুণ। কিন্তু হলে কী হবে, তাঁর মূলপ্রস্তাব, কাউন্সিলে ঢুকে গভর্নমেন্টকে আঘাত হানা, গৃহীত হল না। নো-চেঞ্জাররা দলে ভারি হল। তাদের ভাবখানা এই, মহাত্মাজি বারণ করে গেছেন, আইন অমান্য করতে হলেও কি তাঁকে অমান্য করা চলে? যেই উনি জেলে, চোখের অন্তরালে চলে গিয়েছেন, অমনি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা কিছুতেই শোভন হতে পারে না। কেউ কেউ এমন কথাও বললে, যে-নীতি তিনি সমর্থন করেননি তাঁর অনুপস্থিতিতে সে-নীতি মেনে নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলেন। অসহযোগের ডাকে এডভোকেট জেনারেলের চাকরি ও সি-আই-ই যিনি ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, কংগ্রেস কাউন্সিলে ঢুকুক, কিন্তু সে আসনও নেবে না, শপথও নেবে না আর এই ভাবেই সে সরকারকে ঘায়েল করবে। নিরুপদ্রব অসহযোগের এ এক রাজসংস্করণ। না, এতটুকুও নয়, গান্ধীবাদের প্রধানতম বাহক-ধারক রাজাগোপালাচারী বললেন, মহাত্মা যে নিষেধ আরোপ করে গেছেন কিছুতেই তার অন্যথা হতে পারে না। কাউন্সিলে কংগ্রেসের ঢোকা অর্থই অসহযোগের মূল নীতিকে পথভ্রষ্ট করে দেওয়া।

খিলাফতীরা কিন্তু দেশবন্ধুর দলে। তাঁর দলে আরো অনেক দেশনেতা, মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, কেলকার, জয়াকর, মুঞ্জে, অভ্যঙ্কর, আলাম, শেরওয়ানি, সত্যমূর্তি, রঙ্গস্বামী, সেনগুপ্ত, শাসমল ও আরো অনেকে। তবু

এত সব সত্ত্বেও দেশবন্ধু পরাজিত হলেন। গান্ধীভক্তিই জয়যুক্ত হল। দেশবন্ধুর পক্ষে ভোট ৮৯০, বিরোধী পক্ষে ১৭৪৮। বিরোধীপক্ষের মহারথীদের মধ্যে রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল,সরোজিনী নাইডু, আনস্যারি আব্বাস তায়েবজি, প্রকাশম, দুনিচাঁদ, দেশপাণ্ডে, জগদগুরু শঙ্করাচার্য। পট্টভি সীতারামায়া আরো বেশি উদগ্র। তার মতে কাউন্সিলে ঢোকা শুধু অশোভন নয়, দস্তুরমত অসাধু। একতা ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধুতা আরো ভালো।

কিন্তু দেশবন্ধু অপরাভূয়। তিনি বললেন, আমার প্রস্তাব আজ পরিত্যক্ত হল বটে কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি, শিগগিরই একদিন আসবে যে দিন কংগ্রেস বেশি ভোটে আমারই পক্ষে রায় দেবে। বলে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন, কিন্তু কংগ্রেস ত্যাগ করলেন না। তাঁর নীতি নিষ্ক্রিয়তা নয়, সংগ্রামশীলতা। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ কিছু গঠন করে তুললেন, তার নাম হল স্বরাজ্যদল। মতিলাল নেহেরুও তাঁর কংগ্রেসের সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করে দেশবন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'আমাদের কাজ হবে দেশকে বোঝানো কাউন্সিলে ঢুকে সম্মুখ সংগ্রাম করাই স্বাধীনতার স্বার্থে প্রশস্ত। শুধু দেশকে বোঝানো নয়, কংগ্রেসকেও বোঝানো। কাউন্সিলে না ঢোকাটা নিছক গোঁড়ামি, নিছক অর্বাচীনতা, বরং কাউন্সিলে ঢুকে মুখোস ছিঁড়ে ফেলাটাই সুস্থ রণকৌশল। ভয় নেই', দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন দেশবন্ধু, 'এক বছরের মধ্যে কংগ্রেসের ভোটের বোঝা আমার দিকে এনে ফেলব। ফেলবই ফেলব।'

দেশবন্ধু কলকাতা ফিরলেন। পরাস্ত হয়েছেন তার জন্যে দুঃখ নেই বরং অদূর ভবিষ্যতেই যে আবার জয়ী হবেন সেই আনন্দের স্বপ্নে ভরপুর। কিন্তু তাঁর পথে জনমতকে আনতে হলে প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার। সমস্ত দেশি পত্রিকা গান্ধীরই স্তুতিকার, নতুন স্বরাজ্যদলকে তারা সহ্য করতে চাইছে না। দেশবন্ধু সুভাষকে ডাকলেন। বললেন, 'একটা বাংলা দৈনিক বার করো।'

'সম্পাদক কে হবে?'

'কে আবার হবে! তুমি হবে।'

চার পৃষ্ঠার দৈনিক কাগজ বেরুল, নাম 'বাংলার কথা'। সম্পাদক সুভাষচন্দ্র।

'শুধু ছাপানো কথায় হবে না, সামনাসামনি মুখের কথাও শোনাতে হবে।' আরো বললেন দেশবন্ধু, 'নানা জায়গায় সভার আয়োজন করো। এমনি জনসভা তো বটেই, যেখানে যেখানে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে সেখানে তাদেরই আওতায় কংগ্রেসি সভা বসাও। সর্বত্র এই আমাদের বক্তব্য হবে, গয়ার সিদ্ধান্ত ভুল, তাকে উল্টে দেওয়াই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর।'

সুভাষ সহস্রবাহুতে কাজে লাগল। ঘন ঘন সভা ডাকতে লাগল আজ এখানে, কাল ওখানে, কখনো সাধারণ সভা, কখনো কংগ্রেসি। হ্যাঁ, যদি আমরা একটা রাজনৈতিক বিপদের অবস্থা গড়ে তুলতে পারি তবেই আমাদের স্বরাজ্যলাভের পথ উন্মোচিত হবে। আর কাউন্সিলে ঢুকে যদি আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারি তবে অচিরেই যে বিপন্ন অবস্থার উদ্ভব হবে। রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় দেশবন্ধুর কোনো ভুল হবার কথা নয়।

নো-চেঞ্জাররা লাগল বিরুদ্ধ প্রচারে। দুদলে শত্রুতার ভাব প্রবল হয়ে উঠল।

অথচ দুই দলই স্বরাজ চায়, দুই দলেরই ব্রিটিশ শাসন নিশ্চল করার সাধনা। একদল বলছে কাউন্সিলে ঢুকে, আরেকদল বলছে কাউন্সিলের বাইরে চুপ করে বসে থেকে। শত্রুপক্ষের লোক এমন কথাও রটাল যে সি-আর-দাস মন্ত্রী হতে চায় বলেই তার এই কাউন্সিলে ঢোকার পক্ষে এত ওকালতি। মন্ত্রীত্বের লালসা টাকার জন্যে? তারা জানে না কী রাজকীয় আয়ের ব্যারিস্টারি তিনি জীর্ণবাসের মত ছেড়ে দিয়ে এসেছেন? সুতরাং, ওরা যা বলে বলুক, শুধু যা সত্য বলে বুঝেছ তা নির্ভয়ে প্রচার করে যাও। সুভাষকে বাংলার ভার দিয়ে দেশবন্ধু চললেন দক্ষিণ ভারতে। উত্তর প্রদেশের ভার মতিলাল নেহেরুর উপর আর বিঠলভাই প্যাটেল ভার নিলেন বোম্বাই অঞ্চলের। বাংলায় যেমন 'বাংলার কথা', তামিলে তেমনি 'স্বদেশমিত্রম' ও মারাঠিতে 'কেশরী'।

সুভাষকে সাহায্য করতে রইল বাংলার স্বরাজ্যপার্টির অন্যান্য সদস্য, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, কিরণশঙ্কর রায়, সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, বসন্ত কুমার মজুমদার, সাতকড়িপতি রায় ও প্রতাপচন্দ্র গুহরায়।

দক্ষিণ ভারত গান্ধীবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ, ওই বলে যুক্তিবাদকে সে কী করে হটাবে? দেশবন্ধু অসহযোগের নতুন মন্ত্র নিয়ে ঘুরতে লাগলেন ত্রিসনোপলি তাঞ্জোর মাদুরা সালেম, আরো কত কাছে-দূরে শহরে-নগরে, আর প্রাঞ্জল যুক্তিতে বোঝাতে লাগলেন তাঁর প্রস্তাবের যথার্থতা। দক্ষিণ ভারত দ্রবীভূত হয়ে গেল।

'আমাকে বলা হয় বিদ্রোহী।' বলছেন দেশবন্ধু, 'তবে বিদ্রোহকে যে আমি সমর্থন করি না তা নয়। সমস্ত অসহযোগ প্রক্রিয়াটাই তো বিদ্রোহ। সেটা একটা নীরব অহিংস বিদ্রোহ, আর আমার অন্তরতম অন্তরে আমি কারু বিদ্রোহী নই। যে কোনো প্রকারেরই হোক, সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহই। সেই সংজ্ঞায় যদি ধরা হয় আমি কংগ্রেসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, আমার সম্পর্কে সেই সংজ্ঞা নির্ভুল বলে আমি মেনে নেব। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি কংগ্রেসের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছি তা আমি মানতে প্রস্তুত নই। আমি কংগ্রেসকে ছাড়িনি, তার থেকে সরে পড়েনি, শুধু তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি। আসলে আমি কোনো বিদ্রোহীই নই, স্বরাজের গন্তব্যে পৌঁছবার জন্যে যে উপায় প্রয়োজনীয় মনে করছি সেই উপায়ই চাইছি অবলম্বন করতে।'

আবার আরেক সভায় বলছেন: 'শুধু কংগ্রেস কেন, ভারতীয় যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করব যদি আমি বুঝি আমার সে বিদ্রোহ স্বরাজের পথ সুগম করবে। আমি স্বরাজ চাই। স্বাধীনতা চাই। তার জন্যে আমি সংগ্রামে সমুদ্যত। জীবনে কাপুরুষতা কাকে বলে তা জানি না। আমি আমার প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত। আজই আরম্ভ করুন, আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন, আমি আপনাদের অভিলাষের শেষ পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি কিনা।'

ওদিকে নো-চেঞ্জাররাও কাউন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে বিপরীত প্রচার করতে লাগল। দু দলে একটা রফানিষ্পত্তির কথা উঠল। মৌলানা আজাদের চেষ্টায় এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভাতে ঠিক হল চলতি ১৯২৩ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত দুদলেরই পালটা প্রচার বন্ধ থাকবে। ততদিন দুদলের অন্যান্য যা করণীয় আছে তাই সাঙ্গ করুক।

এ মীমাংসায় কোনো পক্ষই তৃপ্ত হল না। তাই এপ্রিলে আবার সভা বসল দিল্লিতে। দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহরু একদিকে, রাজাগোপালাচারী, হাকিম আজমল খাঁ ও সরোজিনী নাইডু আরেক দিকে— সমবেত চেষ্টা হল যদি সম্মিলিত কর্মপ্রকরণ ধার্য করা যায়। অসম্ভব। নো-চেঞ্জাররা কিছুতেই টলল না। দেশবন্ধুও সরলেন না এক ইঞ্চি।

বৃথা কালক্ষেপে দরকার নেই। তোমরা সব চলে এস। স্বরাজ্যপার্টির সদস্যদের ডাক দিলেন দেশবন্ধু। ইলেকশান কাছিয়ে আসছে, আমাদের পক্ষে প্রচার এখনো অনেক বাকি।

কলকাতায় ফিরে দেশবন্ধু চললেন পূর্ববঙ্গে।

'কি রে, কেমন আছিস?' পুলিশের জমাদার মথুরকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন মুখে সম্ভাষণ করলে।

আজ আর মথুরের পাশ কাটাবার দরকার হল না। কোথাও কোনো একটা চুরি-ডাকাতি হলেই এই জমাদার-প্রভুরা মথুরকে দাগী আসামী বলে ধরে নিয়ে যেত, অপরাধের ছায়া পর্যন্ত নেই তবু আসামীর খোঁয়াড়ে দিত ভিড়িয়ে। এখন কী বিশাল সুরক্ষিত আশ্রয়ে সে আছে, তাকে পাপ-হাতে ছোঁয় এমন কার সাধ্যি? তাই সহজেই সে জমাদারের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। স্বচ্ছ মুখে বললে, 'ভালো আছি।'

'তা আর ভালো থাকবিনে? মহাপুরুষের ঘরে ঠাঁই পেয়েছিস।' জমাদারের গলায় যেন প্রায় ঈর্ষার সুর : 'যা, তুইও মানুষ হয়ে গেলি।'

মথুর নির্ভয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে গেল। একবার পিছন ফিরেও তাকিয়ে দেখল না। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে? দেশবন্ধু সফর থেকে ফিরেই মথুরকে ডাকলেন। মথুর কোথায়? সেই তো সকলের আগে এগিয়ে আসবে, প্রণাম করবে, প্রাথমিক সেবাশুশ্রূষাগুলো সাঙ্গ করবে, তৈরি করে দেবে স্নানের জল। কী আশ্চর্য, মথুর— মথুর গেল কোথায়?

'সে নেই। সে চলে গিয়েছে।' বললেন বাসন্তী দেবী।

'চলে গিয়েছে মানে?' দেশবন্ধু এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'কে তাড়াল তাকে?' দেশবন্ধু অস্থির হয়ে উঠলেন।

'কেউ তাড়ায়নি, সে নিজেই পালিয়েছে। এক বাক্স রুপোর বাসন চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

'চুরি! চুরি করেছে মথুর? এ হতেই পারে না।'

এর পরে আর কথা কী! নিজেই আবার কথা বললেন দেশবন্ধু। জিজ্ঞেস করলেন, 'ও যে চুরি করেছে তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ আবার কী! বাক্সভর্তি রুপোর বাসন একটাও নেই আর সঙ্গে-সঙ্গে মথুরও উধাও। তারপর আজ দু'দিন চলে গেল সে ফিরল না।'

'এতেই প্রমাণ হল সে চোর?' দেশবন্ধু যেন বিরক্ত হলেন। বললেন, 'হয়তো রাস্তায় বেড়িয়ে গাড়ি-চাপা পড়েছে, মরেছে না হাসপাতালে আছে তা কে জানে। যেহেতু সে বাড়ি ফেরেনি, ফিরতে পারেনি, তাই সে চোর বনে গেল!'

'আমি তখনই বলেছিলাম, স্বভাব যায় না ম'লে। আমার কথাই ঠিক হল।'

শ্রান্তের মতন একটা চেয়ারে বসে পড়লেন দেশবন্ধু। এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস

করলেন, 'এ নিয়ে থানায় কোনো খবর দেওয়া হয়নি তো?'

'না, না, এ নিয়ে নালিশ কে করতে যাবে?'

দেশবন্ধু আপন মনে বলে উঠলেন, একটু বা অনুশোচনার সুরে, 'ওকে তখন আমার সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারতাম। যেই আমার থেকে আলাদা থেকেছে— না, এ আমি বিশ্বাস করি না।' দেশবন্ধু উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে : 'ও নিশ্চয়ই গাড়ি-চাপা পড়েছে, ঠিকানাটা বলে যেতে পারেনি। বেচারার চোর নাম আর ঘুচল না।'

সাত

কংগ্রেসের মধ্যে দুদলে, শোধনবাদী ও সনাতনবাদী, চেঞ্জার আর নো-চেঞ্জারের মধ্যে বিভেদ তুমুল হয়ে উঠল। তখন নতুন ওয়ার্কিং কমিটির ভাবনা ধরল কোনো মীমাংসায় আসা যায় কিনা। ঠিক হল এই লক্ষ্যে কংগ্রেসের একটা বিশেষ অধিবেশন ডাকা যাক দিল্লিতে। আবুল কালাম আজাদকে করা যাক সভাপতি।

'কাউন্সিল বর্জন করা নিরর্থক।' আজাদ সভাপতির আসন থেকে ঘোষণা করল : 'গত ইলেকশানে আমরা বর্জন-নীতি গ্রহণ করেছিলাম, এখন আগামী ইলেকশানে পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের বিপরীত পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আমরা দাঁড়াব, জয়ী হব, যত বেশি সম্ভব আসন নিয়ে ভিড় করব আমরা। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নীতিকেও পালটাতে হবে। এটা শুধু রাজনীতি নয়, কাণ্ডনীতি উপসর্গ বুঝে চিকিৎসার ব্যবস্থা।'

এদিকে মহম্মদ আলি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চলে এসেছে দিল্লি। সে আজাদের প্রস্তাব সমর্থন করলে। 'তা ছাড়া', মঞ্চে দাঁড়িয়ে মহম্মদ আলি রহস্যের হাসি হাসল : 'তা ছাড়া স্বয়ং মহাত্মাজি আমাকে খবর পাঠিয়েছেন, দেশের স্বার্থে যদি সঙ্গত হয় তবে কাউন্সিলে ঢোকার ভিত্তিতেই বিভেদ মিটিয়ে ফেলতে হবে।'

'মহাত্মাজির খবর!' সমস্ত সভা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল : 'আপনি পেলেন কী করে?'

'বলতে পারেন কোনো অলৌকিক উপায়ে, বেতারে।' হাসল মহম্মদ আলি : 'কিন্তু খবরটা খাঁটি।'

তখন সহজ হল মীমাংসা। কংগ্রেস তার বর্জন-নীতিতে নিশ্চল থাকল, তবে কংগ্রেস সভ্যদের ব্যক্তিগতভাবে অনুমতি দেওয়া হল তারা ইচ্ছে করলে কাউন্সিলে ঢুকতে পারবে আর ঢুকে ভিতর থেকে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে চালাতে পারবে সংগ্রাম।

'আর সেইটেই সাংঘাতিক সংগ্রাম।' উল্লাস-উজ্জ্বলকণ্ঠে দেশবন্ধু বলে উঠলেন : 'আমরা আইনসভার টেবিল থেকে কটা রুটির টুকরো কুড়িয়ে নেবার জন্যে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি রিফর্মসকে চিতায় তুলতে। রিফর্মস শুধু একটা মিথ্যার বেসাতি। ইংরেজ যে ভণ্ড, তার যে মুখে এক মনে আর, সেটাই প্রমাণিত করে দেব। যারা চাকরি চাও, সুখসুবিধের ফিকির চাও, তারা আমার সঙ্গে এস না, যারা লড়তে চাও, যারা শত্রুকে তার নিজের অস্ত্রে পরাস্ত করতে চাও, তারা আমার সঙ্গী হও। যে রিফর্মস, যে অরাতি-অসুর আমাদের জীবনের রক্ত শুষে নিচ্ছে তাকে ধ্বংস করাই আমাদের কাজ। আমি কাউন্সিল-প্রবেশটা কংগ্রেসের মূলনীতি হিসেবেই গৃহীত করাতে পারলাম

না বটে, কিন্তু যে মীমাংসায় আমরা পৌঁচেছি তাই এখনকার মত যথেষ্ট। আমার জয়ের চেয়েও কংগ্রেসের ঐক্য বেশি দামি।'

'কিন্তু কাউন্সিলে কংগ্রেস যদি মাইনরিটি হয়?'

'যদি আমরা সংখ্যালঘু হই, তাহলে আমি বলে রাখছি', বললেন দেশবন্ধু, 'কাউন্সিলে আমাদের সিটগুলো খালি থাকবে। আর সে সব শূন্য আসন জ্বলবে অসহযোগের প্রদীপ হয়ে।'

ওদিকে নাগপুরে সুরু হয়েছে পতাকা-সত্যাগ্রহ। জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিল করে সিভিল লাইনের দিকে যাওয়া যাবে না এই মর্মে পুলিশ এত্তেলা দিয়েছে। যথারীতি জারি করেছে একশো চুয়াল্লিশ ধারার নোটিশ। হাতে-কাঁধে জাতীয় পতাকা নিয়ে আমরা যেখানে খুশি সেখানে যাব, এ আমাদের মৌলিক অধিকার, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরাও দৃঢ়সংকল্প হল। শেঠ যমুনালাল বাজাজ দাঁড়াল সেই আন্দোলনের পুরোবর্তী হয়ে। গ্রেপ্তার হল যমুনালাল, বিচারে তার তিন হাজার টাকা জরিমানা হল। জরিমানার টাকা আদায় করতে গভর্নমেণ্ট তার মোটরগাড়ি ক্রোক করলে। নিলামে চড়ালে সে গাড়ি নাগপুরবাসী কেউ কিনতে এল না। তখন সে-গাড়ি বিক্রির জন্যে নিয়ে যাওয়া হল কাথিয়াওয়াড়ে।

পতাকা-সত্যাগ্রহ নাগপুরেই অবদ্ধ রইল না, সর্বভারতীয় আন্দোলনে প্রসারিত হল। অগ্রগ হয়ে দাঁড়ালেন দুই প্যাটেলভাই, বিঠলভাই আর বল্লবভাই, সমস্ত প্রদেশ থেকে আসতে লাগল স্বেচ্ছাসেবী। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গোড়া থেকেই এই আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছে, এখন জোগাল উদযাপনের শক্তি— লোক আর অর্থ, আর পতাকাকে নত না করার প্রতিজ্ঞা।

গভর্নমেণ্ট নরম হতে চাইল। বললে, মিছিল করে যাচ্ছ তো যাও, শুধু একটু অনুমতি নিয়ে যাও। কিসের অনুমতি? কংগ্রেস যেমন দৃঢ় ছিল তেমনি দৃঢ় রইল। রাজপথ দিয়ে যাব, একা হোক কি মিছিল করে হোক, এ আমার জন্মের অধিকার। হাত আমার রিক্ত কি হাতে আমার পূজার অর্ঘ্য না জাতীয় পতাকা সে আমি বুঝব। অনুমতির জন্যে শুধু একটা মামুলি আবেদন। গভর্নমেণ্ট বুঝিয়ে বললে, শুধু একটা লেপাফা।

কংগ্রেস বললে, আমি বাতাসে নিশ্বাস নেব এর জন্যে কোনো অনুমতি লাগে না। নিরুপদ্রবে পথ চলা আমার তেমনি অধিকার। আর জাতীয় পতাকা আমার বুকের নিশ্বাসের চেয়েও প্রিয়তর।

বিঠলভাই দিন ঠিক করে দিলেন। ছকে দিলেন মিছিলের রাস্তা। একেবারে প্রধানতম রাজপথ। প্রশস্ততম শোভাযাত্রা। কিন্তু কী আশ্চর্য, পুলিশ বাধা দিল না। পতাকাবাহী শোভাযাত্রা চলে গেল সিভিল লাইন পার হয়ে।

অসহযোগের জয় হল। অসহযোগের উজ্জ্বলতর জয় দেখাল আকালি শিখেরা, গুরুকাবাগে। সনাতনপন্থী শিখেরা হচ্ছে উদাসী আর শোধনপন্থী শিখেরা হচ্ছে আকালি। শিখ-মন্দির বা গুরুদ্বারগুলি উদাসীপুষ্ট মোহন্তদের হাতে। সেখানে অনেক অনাচার জমে উঠেছে, ওদের সংস্কার-শোধন দরকার, আকালিদের এই দাবি। আকালিরা চাইছে মন্দিরগুলির তত্ত্বাবধান করতে। এই নিয়ে দুই সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ। আর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধলেই

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মজা। এক্ষেত্রে, বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মোহন্তদের পক্ষে। আকালিরা যেকালে মৌরসিপাট্টাদারদের বিরুদ্ধে, সেকালে আকালিদেরই দমন করো। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও তো এই মৌরসিরই দাবিদার।

বছর দুই আগে নানকানায় কী ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। রাজভক্ত মোহন্ত তার বাড়িতে একগাদা রিভলভার আর গুলি মজুত করে রেখেছিল। কী হল কে জানে, গুরুদ্বারে সম্মিলিত নিরীহ তীর্থযাত্রীদের উপর গুলিবর্ষণ সুরু হল। প্রায় জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকেই পাঠ নেওয়া। অভিযোগ হল মোহন্তর লোকেরাই আকালি তৈর্থিকদের হত্যা করেছে। কিন্তু পুলিশ কই, পুলিশ কী করছে? কর্তাব্যক্তিরা চোখ টিপল আর ঢোঁক গিলল। এই হত্যাকাণ্ড তো পুলিশের মাতব্বরিতে।

গুরুকাবাদের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকাটা আরো স্পষ্ট হল। গুরুকাবাদের মন্দিরপ্রাঙ্গণের একটা গাছ আকালিরা কেটেছে এই অভিযোগে মোহন্ত পুলিশের রক্ষণাবেক্ষণ চাইল। পুলিশের তো কাজই এই, ত্রাণ ও পালন করা, তারা লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়াল পথরোধ করে। আকালিরা সত্যাগ্রহ সুরু করল, তাদের মন্দিরে তাদের রয়েছে পূর্ণ অধিকার, শুধু প্রবেশের নয়, পরিচালনার। দরকার হলে তারা নেবে গাছ কেটে।

পুলিশ লাঠি চালাল। আর বীরবিক্রান্ত আকালি শিখেরা, যারা রণরুদ্র ও প্রাণদুর্মদ, দেখাল কাকে বলে অহিংসা। শত লাঠির ঘায়েও একটি আঙুল তুলল না। দেখাল কাকে বলে ধৈর্যের মাধুর্য, সহিষ্ণুতার শান্তি। ইচ্ছে করলে এই আকালির দল পুলিশের গর্বিত লাঠিকে খর্ব করে দিতে পারত, অন্তত বাধাতে পারত একটা খুনোখুনি। কিন্তু না, যেহেতু আকালিরা অহিংসায় প্রতিশ্রুত, তারা আঁচড় পর্যন্ত কাটল না, স্তব্ধতায় সংহত হয়ে রইল। পুলিশ যে পুলিশ, সে পর্যন্ত ভেবড়ে গেল। এত লাঠি অথচ পালটা একটা কেউ ঢিল পর্যন্ত ছুঁড়ল না।

মহাত্মা বললেন, 'লাঠির নিচে মাথা পেতে দেওয়ার চেয়ে গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়া সোজা। যে অসীম বীরত্বে এই আকালি 'জাঠা' লাঠির বাড়ি সহ্য করেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন এক গৌরবের পরিচ্ছেদ হয়ে থাকবে। কিসের গৌরব? শিখের বীর্যসুন্দর মহত্ত্বের গৌরব।'

গুরুকাবাদেই পুলিশ তার লাঠিচার্জের কারুকার্য সম্পূর্ণ করে নিল। সমস্ত দেশ জুড়েই তারা এখন এই আঙ্গিকে শাসন রচনা করবে। করুক। কিন্তু আকালি শিখদের কাছে পুলিশের লাঠি পরাস্ত হল। মারতে মারতেই তারা হার মানল। শত মারেও যে ওদের স্রোত কমে না, পুলিশের হাতেই শুধু ব্যথা ধরে। পুলিশ তখন মার ছেড়ে ধরপাকড় করে জেলে পুরতে লাগল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জেল হয়ে গেল আঠারো মাস।

সামরিক বিভাগে কাজ করে এমন কজনকে সত্যাগ্রহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সামরিক বিচারে তাদের শাস্তিও হয়েছে। খবর পৌঁছুল গুরুকাবাদ থেকে কোথাও তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রেনে করে। বিরাট এক 'জাঠা' রওনা হল সেই সব সত্যাগ্রহীদের সংবর্ধনা করতে, মালা দিতে, খাবার দিতে।

পাঞ্জাসাহেব স্টেশনে তারা এসে জড়ো হল। এখানে ট্রেন থামাও। আমাদের দেখতে দাও। আমরা তাদের জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি, তাদের হাতে তা পৌঁছিয়ে

দিতে দাও। পাঞ্জাসাহেব স্টেশনে ট্রেন থামবে না। না, থামবে। থামাতে হবে। আমরা এই বসে পড়লাম লাইনের উপর। আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা নয়। দস্তুরমত দেখেশুনে বুঝে হিসেব করে ট্রেন আসতে লাগল হু হু শব্দে। না, পাঞ্জাসাহেবে থামল না। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে তাকে থামতে হল। তার আগেই কতগুলো লোককে ট্রেন রক্তমাংসের পিণ্ড করে ছেড়েছে।

তবু কিছুতেই দমল না আকালিরা। আইন পাশ করিয়ে ছাড়ল। গুরুদ্বার পরিচালনার আইন। জনমতের জয় হল। ক্ষান্ত হল আন্দোলন।

তবু শান্তি নেই। নাভার মহারাজকে গদিচ্যুত করা হল। গভর্নমেণ্ট অবশ্যি কতগুলি কারণ দেখাল কিন্তু প্রবন্ধক-সমিতি তা মানতে চাইল না। সমিতির মতে মহারাজা শিখ ও স্বদেশপ্রেমিক বলেই গভর্নমেণ্টের বিরাগভাজন হয়েছেন, অতএব মহারাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নতুন আন্দোলন চালাও। হ্যাঁ, সভা করো, বক্তৃতা দাও। 'অখণ্ড পন্থ' পাঠ করো। বক্তৃতা দিলেই রাজদ্রোহ। 'অখণ্ড পন্থ' পড়লেও তাই। সুতরাং যারাই মহারাজের পক্ষে বক্তৃতা দেবে বা পাঠ করবে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবে।

প্রত্যহ পঁচিশ জনের 'জাঠা' যেতে লাগল নাভায়, নির্দেশ অমান্য করে যেতে লাগল জেলে। শেষে যেতে লাগল পাঁচ শো জনের 'জাঠা', শহিদি-জাঠা'। এবার আর পুলিশ গুলি না ছুঁড়ে পারল না। ডাক্তার কিচলু ও আচার্য গিদোয়ানি গ্রেপ্তার হল। কিচলুকে কদিন পরে ছেড়ে দিলেও গিদোয়ানিকে ধরে রাখল একবছর। হাজার হাজার আকালির শোভাযাত্রা অব্যহত রইল। এ শোভাযাত্রার সমাপ্তি কারাবাসে।

ভারতের সর্বত্রই গান্ধীবাদ অভ্যর্থিত হল না। ডাঙ্গে বোম্বাইয়ে কজন বন্ধু ও সহচর নিয়ে একটা ক্লাব খুললে, একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলে, যার বিষয় ও বক্তব্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এই থেকেই কম্যুনিজম বা সাম্যবাদের গোড়াপত্তন হল।

আর বাংলা— বাংলাও যেন পুরোপুরি অহিংস ও নিষ্ক্রিয় থাকতে রাজি নয়। তার যুদ্ধ চাই। সাহসী বলে বীর বলে আত্মোৎসর্গকারী অগ্নিহোত্রী বলে চিহ্নিত হওয়া চাই। বিপ্লব ছাড়া তার মন ভরে না। দেশবন্ধুর ভূমিকাও এই যুধ্যমানতার ভূমিকা, যদিও তা অহিংসার ক্ষেত্রে। কলকাতায় ফিরেই দেশবন্ধু তাড়াতাড়ি বাংলার মফস্বলে ঘুরে এলেন যাতে আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকেই পাঠানো হয় কাউন্সিলে।

ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজালে অঘটনকে ঘটিয়ে তুললেন। কোথায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, কোথায় নবীন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। একজন ভারতীয় রাজনীতিতে রাজস্বরূপ, আরেকজন রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অর্বাচীন। কিন্তু যা কেউ ভাবেনি তাই সত্য হল। ভোটে বিধান রায়ের কাছে সুরেন্দ্রনাথ হেরে গেলেন।

হেরে গেলেন এস আর দাশ, বাংলার এডভোকেট জেনারেল, সাতকড়িপতি রায়ের কাছে। এস আর দাশ স্বনামধন্য রাজপুরুষ, কত তাঁর সমারোহ, হেরে গেলেন এক ত্যাগব্রতী দেশসেবকের কাছে। আর স্যার নীলরতন সরকার, অগ্রগণ্য চিকিৎসক, তাঁকে হারিয়ে দিল অল্পখ্যাত বিজয়কৃষ্ণ বসু।

দিকে দিকে স্বরাজ্য পার্টির জয় হতে লাগল। স্বরাজ্য পার্টির সভ্যেরাই হয়ে গেল সংখ্যাগুরু। সুতরাং বাংলার লাট, লর্ড লিটন, মন্ত্রীসভা গঠন করবার জন্যে দেশবন্ধুকে

আহ্বান করলেন। সে আহ্বান সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন দেশবন্ধু। লিখলেন, স্বরাজ্যপার্টির সভ্যদের সংকল্পই হচ্ছে রিফর্মস অ্যাক্ট তাদের যে অধিকার দিয়েছে সে অধিকারের বলে ডায়ার্কি বা দ্বৈতশাসন অচল করে দেওয়া। যদি তারা মন্ত্রীত্ব নেয় তাহলে এই সংকল্পের উদ্‌যাপন হয় না। অবশ্য মন্ত্রীত্ব নিয়ে ভিতর থেকে বাধা সৃষ্টি করে শাসনব্যবস্থা যে বানচাল করে দেওয়া যায় তারা সেটা জানে কিন্তু সে আচরণ সদাচরণ হবে না। যে মন্ত্রীত্ব আপনার হাতের দান তা একবার গ্রহণ করে পরে তাকেই প্রতিরোধের অস্ত্র করে তোলা অসঙ্গত হবে। সুতরাং আপনার অনুরোধ রাখতে পারছি না। দেশের জাগ্রত চেতনা এই শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন চায়, অন্তত শাসকবর্গের হৃদয়ের কিছু পরিবর্তন, যার ফলে তারা সহযোগিতার অকুণ্ঠ হাত স্বচ্ছন্দে বাড়িয়ে দিতে পারে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন আপনার অনুরোধ রাখা অসম্ভব হচ্ছে। তবু সংবিধান অনুযায়ী আপনার এই আহ্বানের জন্যে ধন্যবাদ।

কোকনাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি সরকারি ভাবে সমর্থিত হল। নো-চেঞ্জারদের বেশি হৈ চৈ করতে দেখা গেল না। রাজেন্দ্র প্রসাদ অনুপস্থিত, রাজাগোপালাচারী ও বল্লভভাই প্যাটেল দুজনই মৌনে অবস্থান করলেন। একমাত্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বজ্রকণ্ঠে বিরোধিতা করলেন। কিন্তু কিছু ফল হল না। সভাপতি মহম্মদ আলির সেই মন্ত্রই কার্যকর হল— মহাত্মাজি আমার কানে কানে বলে দিয়েছিলেন, যদি মনে করো কাউন্সিলে ঢুকেই বিরোধিতা ফলপ্রসূ হবে, আমি সম্মত আছি।

দেশবন্ধু তাঁর কথা রাখলেন। বলেছিলেন এক বছরের মধ্যে কংগ্রেসকে দিয়ে কাউন্সিলে প্রবেশ-নীতি গ্রহণ করাব, তাই করলেন।

এদিকে ইংরেজের যা কূটকৌশল, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বারুদে আগুন ধরাল। জায়গায় জায়গায় দাঙ্গা বেধে গেল, মুলতানে, অমৃতসরে, দিল্লিতে। মুসলমানেরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান জোরদার করতে চাইল, হিন্দুরা চালাল 'সংগঠন' আর 'শুদ্ধি' যার পুরোধা হলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। হিন্দুসমাজে যারা অবনত তাদেরকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হবে,— তাই সংগঠন, আর যারা নানা বিপর্যয়ে পড়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে তাদের ফের হিন্দুত্বে প্রতিষ্ঠিত করা— তাই শুদ্ধি।

বাংলাতেও এই সাম্প্রদায়িক কলহ করাল ছায়া ফেলেছে। যাতে এই ছায়া না সর্বস্তরে বিস্তীর্ণ হয় তারি জন্যে দেশবন্ধু সতর্ক হতে চাইলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা চুক্তি ঘটালেন যার নাম হল বেঙ্গল প্যাক্ট। চাইলেন কোকনদের কংগ্রেস এই প্যাক্টের উপর তার সমর্থনের স্বাক্ষর রাখুক। দেখা গেল এই প্যাক্টে মুসলমানদের সুবিধে কিছু বেশি দেওয়া হয়েছে। সেটা কংগ্রেসের মতে জাতীয়তার পরিপন্থী। সুতরাং ঐ প্যাক্ট বাতিল করো।

'ডিলিট দি বেঙ্গল প্যাক্ট, ডিলিট দি বেঙ্গল প্যাক্ট—' কংগ্রেস উচ্চ ঘোষে কোলাহল করে উঠল।

'কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি ছাড়া ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করা অসম্ভব। আর মুসলমানকে যদি আশ্বস্ত না রাখা যায় সে কিসের আকর্ষণে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে? মুসলমানের সন্তোষই আন্দোলনের সাফল্য।'

অরণ্যে রোদন মাত্র হল। বেঙ্গল প্যাক্ট ছুঁড়ে ফেলে দিল কংগ্রেস। পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের উপায় হিসেবে লাজপত রায় ও আনসারি অনুরূপ প্যাক্ট তৈরি করেছিল, তাও সরাসরি অগ্রাহ্য হল। কে জানে তখন থেকেই কংগ্রেস এ ব্যাপারে সক্রিয় মনোযোগ দিলে আত্মীয়-কলহের বিষ বহুদূর সঞ্চারিত হত কিনা। হত কিনা দেশবিভাগ। কে জানে হয়তো চিরকালের জন্যে দুই ভাই ঐক্যবদ্ধই থেকে যেত ।

দেশবন্ধু গর্জে উঠলেন : 'বাংলাকে বাংলার মতই ভাবতে দেওয়া হোক। তার সমাধানের চাবি তার নিজের হাতে।'

আট

উনিশ শো চব্বিশের বারো জানুয়ারি গোপীনাথ সাহা আর্নেস্ট ডে-কে খুন করল। ডে সকালবেলা বেড়াচ্ছিল চৌরঙ্গি ধরে। পার্ক স্ট্রিট আর চৌরঙ্গির মোড়ে একটা দোকানের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে প্রদর্শিত জিনিসগুলি দেখছিল, তার পাঁচ-ছ হাত দূরে দাঁড়াল গোপীনাথ। পরনে ধুতি, গায়ে খাকি শার্ট, পায়ে কালো জুতো, একটি নিরীহ যুবক। ডে ভাবল সেও বুঝি তারই মত প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছে।

আর গোপীনাথ দেখল এই সেই দুর্ধর্ষ পুলিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্ট। গুলি ছুঁড়ল গোপীনাথ। প্রথম গুলি ভ্রষ্ট হল। চমকে পাশ ফিরে তাকাল ডে। দ্বিতীয় গুলিতে ভুল হল না, ডে ফুটপাতে লুটিয়ে পড়ল। সন্দেহের অতীত করে রাখবার জন্যে শায়িত দেহে আরো কটা গুলি ছুঁড়ল গোপীনাথ।

ভাবেনি যে পালাবার জন্যে তাকে ছুটতে হবে। ঐ ভোরে কটা লোকই বা রাস্তায় চলাচল করছে। তাই হাওয়া-খাওয়া ভঙ্গিতেই হাঁটতে সুরু করল। কিন্তু না, একটা ট্যাক্সি তার পিছু নিয়েছে। ট্যাক্সিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল গোপীনাথ, ট্যাক্সিকে নিরস্ত করল। ঢুকল রাসেল স্ট্রিটে। তারপর খানিকটা এলোমেলো ঘুরে আবার এল পার্ক স্ট্রিটে। দেখল একটা প্রাইভেট মোটর দাঁড়িয়ে আছে। বললে, আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে এস না। ড্রাইভার অস্বীকার করলে। তখন ড্রাইভারকে গুলি করল গোপীনাথ। ড্রাইভারের কোমরের বেল্টে সে গুলি লাগল। ড্রাইভার অক্ষত রইল।

তখন গোপীনাথ ছুটল। তার পিছনে একটা জনতাও উদ্ধাবিত হয়েছে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড়ে একটা লোকের হাতে প্রায় ধরা পড়ছিল গোপীনাথ, তার বাহুতে গুলি বিঁধিয়ে আবার ছুটল রয়েড স্ট্রিটের দিকে। ককবার্ন লেন হয়ে রিপন স্ট্রিটে পৌঁছুল। সেখান থেকে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে। দেখল একটা ফিটন দাঁড়িয়ে আছে। ফিটনের পাদানিতে পা রাখতে যাচ্ছে, ফিটনওয়ালা বললে, গাড়ি ভাড়া যাবে না। বাড়তি ভাড়া দেব, তবুও না।

একটু বচসা মতন করতে গিয়েই হয়তো মনযোগ শিথিল হয়েছিল, একটা লোক পিছন থেকে এসে জাপটে ধরল, মাটিতে পড়ে গেল গোপীনাথ। কোত্থেকে একটা কনস্টেবল এসে জুটল, দৃঢ় হাতে গোপীনাথকে বন্দী করলে।

চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল গোপীনাথ। পাতলা ছিপছিপে শরীর, শামলা রঙ, মুখে কৈশোর-কমনীয়তা, চোখ দুটি উদাসীন। মাথায় একটা

ব্যাণ্ডেজ। পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল হয়তো, নয়তো আর কারু প্রহারের ফল। থেকে থেকে শুধু একজনের দিকে তাকাচ্ছে গোপীনাথ। সে আর কেউ নয়, অদূরে দাঁড়ানো চার্লস টেগার্ট।

পাবলিক প্রসিকিউটর যথারীতি সাক্ষী সাজাচ্ছে। একজন গোপীনাথকে সনাক্ত করে বললে, 'হ্যাঁ, আমি এই লোকটাকে লালবাজারের সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। একদিন একটা লোকের সঙ্গে বউবাজার স্ট্রিটের একটা বাড়িতে ওকে ঢুকতে দেখলাম।'

'মিথ্যে কথা।' কাঠগড়া থেকে চেঁচিয়ে উঠল গোপীনাথ: 'আমি একাই ঘুরে বেড়াতাম, আমার কোনো দিন কোনো সঙ্গী ছিল না। টেগার্ট সাহেবকে খুন করব এ আমার একার সংকল্প। টেগার্ট সাহেবকে আমি ভালো করেই চিনতাম কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমি ভুল করে এক নিরীহ ভদ্রলোককে খুন করে বসেছি। ভদ্রলোককে ঠিক টেগার্ট সাহেবের মতই দেখতে, তাই আমার এই ভুল হয়েছে। ভগবানের দয়ায় টেগার্ট সাহেব বেঁচে গেছেন আর আমার দুর্ভাগ্য আমার দেশের শত্রুকে আমি শেষ করতে পারিনি।'

টেগার্ট বুঝি কোণে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। তার দিকে চোখ পড়তেই ঝলসে উঠল গোপীনাথ: 'টেগার্ট সাহেব নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারেন কিন্তু তিনি নিরাপদ নন। আমার অসম্পূর্ণ কাজ সাঙ্গ করবার জন্যে নিশ্চয়ই আর কেউ এগিয়ে আসবে।'

ম্যাজিস্ট্রেট গোপীনাথকে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ করলে। করবার আগে একবার জিজ্ঞেস করলে গোপীনাথকে: 'কোনো বিবৃতি দেবে?'

গোপীনাথ বললে, 'কোনো প্রয়োজন নেই।'

'সাক্ষী দেবে?'

'কোনো প্রয়োজন নেই।'

হাইকোর্টের দায়রায় বিচারপর্ব শেষ হলে, শাস্তির শেষ রায় উচ্চারিত হবার আগে গোপীনাথ বলে উঠল: 'আজ আমার জীবনে এক শুভ দিন। আমার মা আমাকে তাঁর বুকে বিশ্রাম নেবার জন্যে ডাকছেন, আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে যাব। রোজ খবরের কাগজে পড়তাম আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে টেগার্ট সাহেব কী অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। লোকের মুখেও অজস্র নির্যাতনের কাহিনী শুনতাম। ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি খেতে পারতাম না, ঘুমুতে পারতাম না, সমস্ত রাত বাড়ির ছাতে পাইচারি করে বেড়াতাম। এমনি অবস্থায় একদিন মায়ের ডাক শুনলাম, টেগার্টকে অনুসরণ করো, ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। কিন্তু আমার ভুল হল। আমি টেগার্ট মনে করে এক নির্দোষ সাহেবকে খুন করলাম। সাহেব মাত্রই তো আমার শত্রু নয়, শুধু টেগার্ট আমার শত্রু। ভুল করে এক নির্দোষ সাহেবকে খুন করেছি বলে আমি দুঃখিত কিন্তু আমি আরো দুঃখিত, টেগার্ট এখনো বেঁচে আছে বলে।'

সমস্ত আদালত স্তব্ধ হয়ে গোপীনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কে এ প্রাণবান ছেলে। নির্ভীক, আত্মবীর, এ কার মাতৃআরাধনা! একটি মাত্র মুহূর্ত। তার পরেই নেমে এল বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ। জজ ফাঁসির হুকুম দিলেন।

এতটুকু ম্লান হল না গোপীনাথ। কাঠগড়া থেকে নেমে যাবার আগে বললে দৃপ্ত স্বরে: 'আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করুক।'

মাকে শেষ চিঠি লিখল: মা, প্রতি ঘর আমার মায়ের মত মায়ের স্পর্শে পবিত্র হোক আর প্রত্যেক মায়ের কোলে আমার মত ছেলে জন্মাক।

ফাঁসির আসামীর জন্যে নির্দিষ্ট রুদ্ধশ্বাস অন্ধকূপের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে গোপীনাথ, কিন্তু মুখমণ্ডল সব সময়েই প্রসন্ন তাতে এমন একটা দিব্য দ্যুতি যেন জীবনধারণটা কত বড় গরিমার, কত বড় আনন্দের ব্যাপার। ভাগ্যিস সে জন্মগ্রহণ করেছিল, বেঁচেছিল এ কটা দিন—আবার বাঁচতে চলেছে আরেক মহাদেশে, মুক্তির মহাদেশে, আর মৃত্যু বুঝি সেই দেশে যাবারই বহির্দ্বার। ফঁসির আগের রাত খুব ভালো ঘুম হল গোপীনাথের। ভোরবেলা উঠে মনে হল, আজ না জানি কোথায় তার যাবার দিন! ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একটু পরেই তার ফাঁসি হবে, ট্রেন স্টেশনে এই এসে পড়ল বলে। তাড়াতাড়ি স্নান-টান সেরে তৈরি হয়ে নিল গোপীনাথ। ওজন নিয়ে দেখা গেল, আশ্চর্য, পাঁচ পাউণ্ড বেড়েছে। মৃত্যুভয়ে লোক শুকিয়ে যায়, গোপীনাথের উলটো, তার স্বাস্থ্যসঞ্চয় হয়েছে।

কারুর সাহায্য লাগল না, গোপীনাথ একাই এসে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মে, ফাঁসিমঞ্চে। যত দেবদেবীর নাম মনে ছিল আওড়াতে লাগল, শেষে যখন ট্রেন এসে দাঁড়াল, দড়ির ট্রেন, গার্ডের সিগন্যাল পেয়ে হেঁচকা টানে স্টার্ট দিল, তখন কণ্ঠ বিদীর্ণ করে বেরুল শেষ দেবতার নাম—বন্দেমাতরম।

বাংলার কংগ্রেস কি এই বীর বালকের বন্দনা করবে না? তার পথ বা পদ্ধতি সে সমর্থন না করতে পারে, তাই বলে তার সাহস তার বীর্য তার দীপ্তিমান চরিত্র, সর্বোপরি মহত্তম আদর্শের জন্যে প্রাণোৎসর্গের মহত্ত্বকে সে প্রশংসা করবে না? কিন্তু সে কথা পরে।

উনিশ শো তেইশে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্ট পাশ হয়েছে। এটা, সন্দেহ কী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিরই কীর্তি, দেশবাসীকে শাসন পরিচালনা করবার এই প্রথম স্বাধীন সুযোগ দেওয়া। স্বরাজ্যপার্টি ইলেকশন লড়ল ও সংখ্যায় গরীয়ান হয়ে জয়লাভ করল। তখন 'সেপারেট ইলেক্টরেট,' অর্থাৎ হিন্দুর ভোট হিন্দুর জন্যে মুসলমানের ভোট মুসলমানের জন্যে। দু দলের থেকেই স্বরাজ্যপার্টির লোকই সগৌরবে বেরিয়ে এল। প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু, ডেপুটি মেয়র শহিদ সারওয়ার্দি। আর চিফ একজিকিউটিভ অফিসর একজন সাতাশ বছরের যুবক, সুভাষচন্দ্র বসু।

সুভাষচন্দ্রকে এমন একটা শক্তিশালী পদে নির্বাচিত হতে দেখে বাংলা সরকারের বুকটা ফেটে যেতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই, নতুন আইনের মর্যাদা রাখবার জন্যে কিল খেয়েও হজম করতেই হবে।

সুভাষের পরিচালনায় বেরিয়েছে ইংরেজি দৈনিক, ফরোয়ার্ড, কর্পোরেশনের নতুন দায়িত্বের দরুন কাগজের থেকে তাকে সরে দাঁড়াতে হল। আর কেউ দেখবে ফরোয়ার্ড, দেশবন্ধু বললেন, সুভাষ এখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কলকাতাকে গড়ে তুলুক। কলকাতা

উঠলেই বাংলা দেশ উঠবে, আর বাংলা বাঁচলেই ভারতের উজ্জীবন।

কাউন্সিলে দেশবন্ধুর মন্ত্র সংহার, কর্পোরেশনে দেশবন্ধুর মন্ত্র সংগঠন। এখানে 'ভেঙে ফেল' নয়, এখানে শুধু 'গড়ে তোলো', 'বিশাল করে তোলো।'

কাউন্সিলার, অলডারম্যান, মেয়র সবাই খদ্দর পরে অফিসে আসতে লাগল। খদ্দরই তখন অফিসি পোশাক, কর্মচারীদেরও সেই পরিধেয়। সবাই যেন কলঙ্ক মোচনের ব্রতে শুভসাধনের সংকল্পে শুভ্রশুদ্ধ হয়েছে। সকলেই আমরা সেবার ব্রতে দীক্ষিত, চিত্তের সেই প্রসন্নতাই যেন বাইরে এই বিমলশ্রী ধারণ করেছে।

প্রাথমিক ভাষণে দেশবন্ধু বললেন, 'ভারতবর্ষের আদর্শ চিরকাল দরিদ্রসেবা, দরিদ্রকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা আর সেই সেবাই পূজার নামান্তর। তার চোখে ভগবানই দরিদ্রের বেশ ধরে এসেছেন পৃথিবীতে। আমিও তাই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা এই দরিদ্রসেবাতেই চালিত করব। যদি কিছু পরিমাণেও আমরা এই প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারি তবেই আমাদের কর্পোরেশনে আসা সার্থক হবে।'

তাঁর প্রধান কর্মাধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্র। আর সুভাষের কাছে কর্ম শুধু সম্পাদনার বিষয় নয়, কর্ম সাধনার বিষয়। সে কেবল কর্মী নয়, সে কর্মযোগী। তার সমস্ত কর্মপ্রেরণার পিছে অধ্যাত্মপ্রেরণা।

কী বলছেন বিবেকানন্দ? বলছেন: 'লড়াই করলুম কোমর বেঁধে—এ আমি খুব বুঝি। আর যে বলে, কুছ পরোয়া নেই, ওয়া বাহাদুর, আমি সঙ্গেই আছি—তাকে বুঝি, সে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি কোটি নমস্কার। তারাই জগৎপাবন, তারাই সংসারের উদ্ধারকর্তা। আর যেগুলো খালি 'বাবা রে এগিয়োনা, ওই ভয়, ওই ভয়'—ডিসপেপটিকগুলো—প্রায়ই ভয় তরাসে। তবে আমার মায়ের কৃপায় মনের এত জোর যে, ঘোর ডিসপেপসিয়া কখনো আমায় কাপুরুষ করতে পারবে না। কাপুরুষদের আর কি বলবো, কিছুই বলবার নেই। কিন্তু যত বীর এ জগতে বড় কাজ করতে নিষ্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখনো কোনো কাজ থেকে হটেননি, যে সকল বীর ভয় আর অহঙ্কারবশে হুকুম অগ্রাহ্য করেনি, তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিনমিনে, ভিনমিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে, 'এ বীর।' আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই—'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা'—এই ঠাকুরের দাসানুদাসের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে আমার মত, যে আমায় বুঝবে।'

আর কত ছেলেবেলা থেকেই সুভাষের এই সেবার্চনা।

'যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তা দয়া, প্রেম নয়, আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয় তা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ তা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যায়। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির কাছে আত্মা জীবাত্মা নয়, সর্বব্যাপী সর্বান্তর্যামী, সকলের আত্মারূপে অবস্থিত সর্বেশ্বর। অদ্বৈতনিষ্ঠ আমরা, আমাদের জীববুদ্ধি বন্দনের কারণ। সুতরাং আমাদের অবলম্বন—প্রেম, দয়া

নয়। আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাউকে দয়া করছি, এ অনুভব আমাদের নেই, তার পরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করে থাকি।'

কর্পোরেশনের অধীনে প্রথমেই একটা শিক্ষাবিভাগ খোলা হল, সারা শহরে স্থাপন করা হল অনেকগুলো অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল, শুধু ছেলেদের জন্যে নয়, মেয়েদের জন্যেও। নিরক্ষরতাই তো পরবশ্যতার আশ্রয়, আর গৃহের আসল যে আলো সে তো শিক্ষার আলো, বাইরের আলো নিবে গেলেও যাতে দেখা যায়। খোলা হল স্বাস্থ্যবিভাগ, পাড়ায় পাড়ায় বসানো হল ডিসপেনসারি যাতে গরিবেরা বিনামূল্যে পেতে পারে চিকিৎসা, পেতে পারে ডাক্তারি পরামর্শ। শুধু রোগের প্রতিকার নয়, রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রতিষেধ তৈরি করো। নির্ভেজাল খাদ্য জোগাও, আর তা শস্তা দরে। দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করো। সেই সঙ্গে বস্তির উন্নয়ন। উন্নয়ন যানবাহনের। আর পর্যাপ্ত জল দাও সকলকে। সব মিলিয়ে কলকাতাকে অমল-উজ্জ্বল করে তোলো। চারদিকে মঙ্গলের শঙ্খ বাজাও।

আর এ সমস্ত চারুকর্মের দক্ষ কারুকার সুভাষ। ভারতীয় মহাপুরুষদের নামে রাস্তা ও পার্কের নামকরণ করো। মিউনিসিপ্যালিটি চিরকাল লাট-বড়লাট ও সরকারি হোমরাচোমরাদের অভিনন্দন জানিয়েছে, এবার থেকে দেশবরেণ্যদের অভ্যর্থনা করো—মহাত্মা গান্ধীকে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে, বল্লভভাই প্যাটেলকে।

কিন্তু মহাত্মা—জেলে মহাত্মার সঙ্কটাপন্ন অসুখ। তাঁর এপেনডিসাইটিস হয়েছে। খবর পাওয়া গেল বারোই জানুয়ারি তাঁর অপারেশন হবে। অপারেশন করবে ইংরেজ ডাক্তার, কর্নেল ম্যাডক। সমস্ত দেশ রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল, অস্ত্রোপচারের ফল যেন শুভ হয়, মহাত্মা যেন সেরে ওঠেন। আর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভয়, ফল অশুভ হলে কর্নেল ম্যাডকের অস্ত্রাঘাতের কী-নাজানি ব্যাখ্যা করে ভারতবর্ষ। যাই হোক, অপারেশন ভালো ভাবেই হল আর উনিশ শো চব্বিশের পাঁচুই ফেব্রুয়ারি, মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার বহু আগেই, গভর্নমেণ্ট তাঁকে খালাস দিয়ে দিল।

ছাড়া পেয়ে গান্ধী বোম্বাইয়ের কাছে জুহুতে গেলেন বিশ্রাম করতে। দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহরুকে ডেকে পাঠালেন কাউন্সিল-প্রবেশের নীতিটা আরেকবার যাচাই করে দেখতে।

কাউন্সিলে স্বরাজ্যদলীদের কৌশল কৃতকার্য হয়েছে, বিশেষত বাংলায় আর মধ্যপ্রদেশে। শাসনকাণ্ডের যে বিভাগগুলো 'রিজার্ভড' বা খোদ লাটসাহেবের অধীন, তাদের ছোঁয়া যাবে না, কেননা তারা ভোটের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু যে বিভাগগুলো 'ট্রানসফারড' বা মন্ত্রীমহোদয়দের অধীন, তা ভোটে ফেলে ঐ দুই প্রদেশ একেবারে নস্যাৎ করে দিল। মধ্যপ্রদেশে তো সমস্ত বাজেটটাই বাতিল হয়ে গেল। বাংলায় স্বরাজীরা মন্ত্রীদের মাইনেই নাকচ করে দিল। এ সব নাকচ করবার পর গভর্নর অবশ্য তার বিশেষ ক্ষমতার বলে 'ভিটো' করে দিতে পারত। 'ভিটো' করলে তো এই দাঁড়ায় প্রাক-রিফর্ম দিনের মত গভর্নরই রাজ্য চালাচ্ছে, মন্ত্রীরা সব কাষ্ঠ পুত্তলী, বড়জোর নিশ্চল সঙ। বাংলার গভর্নর রিফর্মসকে সেই উপহাস্য পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইল না। মন্ত্রীরা বিদেয় হল।

তাই দেখ কাউন্সিল বর্জন করে কংগ্রেস কিছুই করতে পারেনি, শুধু বাজে মার্কা

কতগুলো লোককে মজা লোটবার সুবিধে করে দিয়েছে, আর এইবার কাউন্সিলে ঢুকে স্বরাজীরা কত বড় জয়ের মুকুট মাথায় পড়ল। সরকারের হারে জনগণের সে কী উল্লাস! আর উল্লাসই তো সংগ্রামের পরম রসায়ন। যত উল্লাস তত সংগ্রাম, যত সংগ্রাম তত উল্লাস।

সেবাও তো সংগ্রামেরই অঙ্গ। ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সংগ্রাম নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে। দেশবাসী যদি সুস্থ, শিক্ষিত ও শক্তিশালী না হয়, তা হলে স্বাধীনতার জন্যে সৈন্য হবে কী করে? পাছে স্বাধীনতার সৈন্য হয় সে ভয়েই তো বিদেশী গভর্নমেণ্ট দেশের লোককে রেখে দিয়েছে অন্ধকারে, অক্ষরহীনতায়, রেখে দিয়েছে দারিদ্র্যের পঙ্ক-পল্বলে, রোগের শোকের অভাবের তাড়নার মধ্যে।

তারই নিবাকরণের আপ্রাণ চেষ্টায় সুভাষ রাত-দিন খাটছে। সেই সকালে অফিসে ঢুকছে, বাড়ি ফিরতে-ফিরতে কখনো প্রায় মাঝরাত। কেননা কর্পোরেশনের ভিতরে-বাইরে পরিদর্শনের কাজটাও তো তারই। তাই সবাই ঠিক সময়মত অফিসে আসে, কাজে মন লাগায়, ফাঁকি দিতে কারু ইচ্ছে করে না। সুভাষ এমনই প্রিয় ও প্রীতিস্নিগ্ধ যে ওর সমস্ত কথা নির্বিরোধ পালন করতে সবাই উৎসাহ পায়। সুভাষের উপস্থিতিটাই উৎসাহ। কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়র কোটস বুঝি একটু অসতর্ক। সুভাষের সামনেই সিগারেট খাচ্ছে।

সুভাষ গম্ভীর মুখে বললে, 'ইজ ইট প্রপার, মিস্টার কোটস, টু স্মোক বিফোর এ সুপিরিয়র অফিসর?'

'সরি।' কোটস তৎক্ষণাৎ সিগারেট ফেলে দিল।

ঢিলেমির ঢালুতট দিয়ে কোনো কিছুই বয়ে দিতে দেবে না সুভাষ। সময়নিষ্ঠা, তৎপরতা, সচেষ্টতা তো নয়ই, না, সৌজন্যও নয়। শৈথিল্যই সব চেয়ে বড় পাপ। মরে থাকাই অশুচিতা। কাজ করছি এ ভাব মনে না রাখলেই অপরিমেয় কাজ করতে পারবে। না, কাজ নয়, প্রাণের আনন্দে আত্মবিকাশ করছি।

কোটস টেবিলের উপরই বসে আছে পা ঝুলিয়ে। চিফ একজিকিউটিভ অফিসর যে ঘরে ঢুকেছে বোধহয় লক্ষ্য করেনি কিংবা লক্ষ্য করলেও সহজাত ইংরিজি মেজাজে এই উপর-চড়া ভাবটাকে বিসদৃশ ঠাওরায়নি।

সুভাষ ধীরস্বরে বললে, 'সুপিরিয়র অফিসরের সামনে এ ভাবে বসাটা ঠিক নয়! চেয়ারে বসাটাই সমীচীন।'

কোটস তক্ষুনি দাঁড়িয়ে পড়ল। দোষ মেনে নিল সলজ্জ মুখে। সেই থেকে সুভাষের সামনে কোটস দাঁড়িয়ে থাকতে চাইত। কিন্তু সুভাষ তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিত না। বলত, 'সিট ডাউন প্লিজ।'

তখন সুভাষের অনুরোধ না রেখে উপায় থাকত না।

তরুণ যুবক, অথচ নম্রতার শক্তিতে প্রশান্তগম্ভীর, সর্বত্র দক্ষতা ও কর্মোৎসাহের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে, সকলেই সুভাষের প্রতি শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হচ্ছে। আর মাইনে যেখানে আড়াই হাজার টাকা, সুভাষ নিচ্ছে মোটে দেড় হাজার, হাজার টাকা অম্লান মুখে ছেড়ে দিচ্ছে। আমার অততে প্রয়োজন নেই, ও দিয়ে অনেক জরুরি অভাব মেটানো যাবে। আমি এখানে বাণিজ্য করতে আসিনি যে নিজেকে পণ্যে পরিণত করব।

এই তপঃশুচি নিরাসক্ত চরিত্রের সৌরভে কে না মুগ্ধ হবে? দেশবন্ধুর কাছে কর্পোরেশন সম্পর্কে অনেকে তবু নানা অভিযোগ এনে জড়ো করে। দেশবন্ধু বললেন, 'দাঁড়াও আমাদের একটু নিশ্বাস ফেলবার সময় দাও। জানো না এ কর্পোরেশনের উন্নতিসাধনের জন্যে আমি আবার একটা ত্যাগ স্বীকার করেছি?'

আবার কী ত্যাগ! অভিযোক্তারা চট করে বুঝতে পারে না।

'আমার স্বরাজ্যদলের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে কর্পোরেশনে দান করেছি। আমার দলের ক্ষতি হচ্ছে হোক, কর্পোরেশন পয়মন্ত হয়ে উঠুক।'

তখন লোকে বুঝতে পারে ত্যাগের তাৎপর্য। বুঝতে পারে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষটি কে।

জুহুতে মহাত্মার সঙ্গে এসে মিললেন দেশবন্ধু, সঙ্গে মতিলাল। স্বরাজ্যপার্টির সাফল্য কোথায় কতদূর হচ্ছে তারই খতিয়ান করার উদ্দেশ্যে এই মিলন। কিন্তু আবার সেখানে নীতির ক্ষেত্রে গান্ধীর সঙ্গে দেশবন্ধুদের অনৈক্য হল।

গান্ধী বললেন, 'আমি এখনও এই অভিমতে স্থির আছি যে কাউন্সিল-প্রবেশ অসহযোগ-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস নয়। শুধু অসহযোগ কথাটার ব্যাখ্যা থেকে সামঞ্জস্য খুঁজলে চলবে না, আসলে দেখতে হবে মানসিক ভঙ্গিটা কী। শুধু ফল দেখলেই চলবে না, উপায়ও দেখতে হবে।' সেই পুরোনো কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন: 'প্রাপ্তিই একমাত্র বিবেচ্য নয়, পদ্ধতিও বিবেচ্য।'

উত্তরে দেশবন্ধু আর মতিলাল যুক্ত বিবৃতি দিলেন: 'কাউন্সিল প্রবেশ যে কী করে অসহযোগের পরিপন্থী হতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে অসহযোগ যদি জীবন্ত আচরণ না হয়ে শুধু একটা মানসিক ভঙ্গিমাত্র হয়, তা হলে দেশের সত্যিকার স্বার্থের খাতিরে আমরা অসহযোগকেও বর্জন করতে বাধ্য হব। এই বাক্যদ্বন্দ্ব অনর্থক। আমরা মনে করি আমাদের কাউন্সিল-প্রবেশও অসহযোগ আন্দোলন গ্রন্থেরই একটি অবিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা।'

কিন্তু বিভেদ সত্ত্বেও কোনো বিরোধ হল না। মহাত্মা বললেন, আমি গঠন মূলক কাজে মন দিই, তোমরা দেখ শাসনযন্ত্র অচল করতে পারো কিনা।

গোলমাল বাধল গোপীনাথ সাহাকে নিয়ে। মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভা বসল সিরাজগঞ্জে, সভাপতি আক্রম খা? গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়ে গেছে কিন্তু স্বাধীনতা-যজ্ঞে তার আত্মাহুতির আগুন তখনো নিষ্প্রভ হয়নি। তাই সেই সম্মিলনে তার সম্পর্কে একটা প্রস্তাব গৃহীত হল। 'যদিও সশস্ত্র বলপ্রয়োগের নীতি কংগ্রেস সমর্থন করে না বরং হেয় বলে নিন্দিত করে, যেহেতু অহিংসাই তার ধ্রুব নীতি, তবুও গোপীনাথ সাহার আত্মবলিদানের আদর্শ দেশের সাম্প্রতিক স্বার্থের বিচারে ভ্রান্ত হলেও অভিনন্দনযোগ্য।' মোটকথা এটাই শাদা কথায় বলা হল যে গোপীনাথের মত ও পথ কংগ্রেস বরদাস্ত না করলেও তার নিঃস্বার্থ ও বীরত্বপূর্ণ আত্মবিসর্জনের ভাবটাকে সে প্রশংসা তো করেই, সম্মানও করে।

প্রস্তাব দেখে গভর্নমেন্ট তো চটে গেলই, মহাত্মা গান্ধীও ক্ষুব্ধ হলেন। আহমেদাবাদে অখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় সিরাজগঞ্জের প্রস্তাবটাকে পরোক্ষে কটাক্ষ করা হল।

আর্নেস্ট ডে-র অকাল-মৃত্যুর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা হল, তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে জানানো হল সমবেদনা। আর গোপীনাথ সম্পর্কে বলা হল, যদিও তার দেশপ্রেম সম্বন্ধে কংগ্রেস সচেতন, সে দেশপ্রেম ভ্রান্ত পথে চালিত, এবং কংগ্রেস অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী বলে তার বিচারে ঐ দেশপ্রেমজাত হত্যা নিতান্ত গর্হণীয়। আরো বলা হল, ঐ সব রাজনৈতিক হত্যা আইন-অমান্য-আন্দোলনের প্রস্তুতিকে ব্যহত করে, স্বরাজ বা স্বাধীনতার পথকে করে তোলে কণ্টকাকীর্ণ, সুতরাং তা সর্বতোভাবে শোকাবহ।

বলা বাহুল্য এ বয়ানের পক্ষে স্বয়ং গান্ধী, আর দেশবন্ধু যিনি বাংলার কংগ্রেসের সভাপতি তিনি তার বিরুদ্ধে—আর কিছুর জন্যে না হোক, মমতাহীন ভাষাটার জন্যে। এমন নয় যে দেশবন্ধু রাজনৈতিক হত্যায় বিশ্বাসী, এমন নয় যে তিনি হিংসা বা সশস্ত্রতার স্বপক্ষে, তবু কী অমানুষিক অত্যাচরের ফলে এই হত্যাস্পৃহা, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হবে না? আর্নেস্ট ডে-র মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করা ভালো কথা কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ সরল গোপীনাথের জন্যে একটুও গোপন সহানুভূতি থাকবে না?

অথচ বছর চারেক আগে দেশবন্ধুর বাড়িতে বিপ্লবপন্থীদের সঙ্গে মহাত্মার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'যদি ভারতবর্ষের তরবারি থাকত আমি তাকে তা নিষ্কাশিত করতে বলতাম। কিন্তু যখন তার তরবারি নেই আমি তাকে অহিংস অসহযোগ অবলম্বন করতে বলি। অহিংসাকে একটা কূটনীতি হিসেবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। এ শয়তান গভর্নমেন্টকে ধ্বংস করাই আমার একমাত্র ব্রত।'

বিপ্লবপন্থীদের অনেকেই গান্ধীর কথা মেনে নিল, অহিংসা শুধু একটা বিকল্প ব্যবস্থা, কার্যসিদ্ধির শুধু একটা পদ্ধতি-প্রকরণ। কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে যারা তরুণ যারা অত্যুৎসাহী তারা বশীভূত হতে চাইল না। তারা তাদের বিপ্লবের স্বপ্নকে নিক্রিয়তায় বিবর্ণ করে দিতে পারল না। গান্ধীবাদের প্রথম ব্যতিক্রম ঘটাল তারা শাঁখারিটোলা পোস্টাপিসের আক্রমণে, যার ফলে বরেন ঘোষের ফাঁসি হল। সে আক্রমণের নেতা সন্তোষ মিত্র।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এই গোপীনাথ। এমনি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে পরিচিত হলে আর্নেস্ট ডে-র খুনটাও হয়তো ফাঁকায় মিলিয়ে যেত, কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস তাতে তার সসম্মান পুষ্পহার রাখল বলেই গান্ধীজি ক্ষুণ্ণ হলেন। তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন দেশবন্ধু। আমরা তো গোপীনাথের প্রাণটাকেই বাহবা দিচ্ছি, তার প্রণালীটাকে নয়। আমরা তো এ কথা বলিনি যে হিংসার পথটা মহনীয়, আমরা বলতে চেয়েছি গোপীনাথের দেশপ্রেম মহনীয়। বিদেশী ডে-র জন্যে শোক করব এ ভালো কথা, আমরা আমাদের স্বদেশবাসী গোপীনাথের জন্যেও দু ফোঁটা ফেলি চোখের জল!

আর সুভাষের কী মত? তার বিপ্লবের স্বপ্ন তো আরো অতিকায়। সে তো এমনি বিচ্ছিন্ন হনন নয়, সে এক সামগ্রিক সামরিক অভ্যুত্থান। বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে সে অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। তাই তো আমরা সাম্প্রতিক কৌশল হিসেবেই অহিংসাকে ব্রত করেছি। কিন্তু মনে-প্রাণে-বুদ্ধিতে সব সময়েই আমাদের বিপ্লবের স্বপ্ন অক্ষুন্ন রয়েছে। বলা যাক, শৈল্য চিকিৎসায় অক্ষম হয়ে ভারতবর্ষ আপাতত হোমিওপ্যাথি ধরেছে। তরবারি থাকলে কে আর তা খাপে ঢেকে রাখত। আপনার অস্তিত্বের আনন্দে নিজেই সে বেরিয়ে আসত খাপ থেকে।

গোপীনাথের ফাঁসির পর হরিশ পার্কে যে সভা হয়েছিল তাতে বলেছিল সুভাষ: 'আর কিছু নয়, শুধু ব্রিটিশদের বণিকস্বার্থে আঘাত করো, অর্থাৎ তাদের ভাতে মারো। দুই পায়ে এদের তাড়ানো যায়, হয় হাতে মেরে, নয় ভাতে মেরে। হয় অস্ত্রের শক্তিতে নয় ওদের মুনাফার সংকোচ ঘটিয়ে। যেহেতু অস্ত্রশক্তি ভারতবর্ষের পক্ষে এখন অলভ্য বা বলতে পারো অনুপযোগী, বিকল্প পথই আমাদের বেছে নিতে হবে। হাতে মেরে নয়, ভাতে মেরে ওদের বিতাড়িত করব।'

কোনো বিপ্লবী দলের সঙ্গে সুভাষ প্রত্যক্ষে সংশ্লিষ্ট নয়, সে কংগ্রেসেরই একজন তাই বলে বিপ্লবীদের দেশপ্রেমের প্রতি তার শ্রদ্ধা ষোল আনা। আর তার আদিগুরু তো সেই ক্ষুদিরাম। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ঘাটাল মহকুমা, ঘাটাল মহকুমার মধ্যে দাসপুর থানা আর দাসপুর থানার মধ্যে গ্রাম সোনাখালি। সেই সোনাখালি গ্রামে সভা হচ্ছে। সভার উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, সভাপতি, বক্তা—সব মিলে শুধু একজন। শ্রোতা অগণন গ্রামবাসী। সভাস্থল একটা বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত মাঠ। সভার আয়োজন সামান্য। একটা টেবিল, একটা চেয়ার, পাশে একটা খুঁটি পোঁতা, খুঁটিতে টাঙানো একটি মানচিত্র—ভারতবর্ষের মানচিত্র। আর বক্তার হাতে একটা শীর্ণ লাঠি। একটা চিহ্নদণ্ড, ঋজু ও তীক্ষ্ণ। সেই দণ্ডধর কে? সুভাষচন্দ্র। সুভাষ চেয়ারে না বসে টেবিলে উঠে দাঁড়াল বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতাও অভিনব। সংক্ষিপ্ত ও তেজোদ্দৃপ্ত।

লাঠি দিয়ে মানচিত্রকে স্পর্শ করল সুভাষ। জনতাকে জিজ্ঞেস করল, 'এ কোন দেশের মানচিত্র?'

জনতা উত্তর দিল: 'ভারতবর্ষের।'

'মানচিত্রে এ দেশের রঙ লাল কেন?'

'পরাধীন বলে,' জনতার থেকে কে একজন বললে, 'যন্ত্রণায় লাল।'

আরেকজন বললে, 'রঙটা ব্রিটিশ অহঙ্কারের রঙ। অন্য দেশকে পায়ের তলায় রেখেছি, সেই জয়োল্লাসের। আমাদের সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না সেই অহমিকার।'

'এখন কী করতে হবে?' জিজ্ঞেস করল সুভাষ।

জনতা ধ্বনিত হয়ে উঠল: 'রঙটা পালটাতে হবে।'

'হ্যাঁ, পালটাতে হবে। একে সবুজ করতে হবে। সবুজই প্রাচুর্যের রঙ, যৌবনের রঙ, অগ্রগতির রঙ। কিন্তু এ রঙের বদল হবে কী করে যদি না আমরা স্বাধীনতা আনতে পারি?'

'স্বাধীনতা আসবে কিসে?'

'চলুন আমার সঙ্গে চলুন।'

সুভাষ নেমে পড়ে গ্রামের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। পিছনে-পিছনে চলল জনতা। কোথায় চলেছে কোন দিকে চলেছে কেউ প্রশ্ন করল না। পুরোবর্তী হয়ে অমনি কেউ এগিয়ে চললে তাকে বুঝি বিনাবাক্যেই অনুসরণ করতে হয়। ঐ দৃপ্ত নেতৃত্বকে মানবার জন্যে যেন নিজের থেকেই প্রেরণা আসে। একটা বাড়ির সামনে এসে থামল সুভাষ। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের জনতাও দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়ির সামনে তুলসীমঞ্চ। সেখানে সুভাষ তার একটি নীরব-নিবিড় প্রণাম নিবেদন করল। আর সকলকে বললে প্রণাম করতে।

পরে ভাবগম্ভীর স্বরে বললে, 'আমার গুরুদেবের বাড়ি। আমার—আমাদের—সকলের তীর্থ।'

গ্রামবাসী জনতা সকলেই জানত এ বিপ্লবী ক্ষুদিরামের বাড়ি। আজ আবার নতুন অর্থে জানল, সুভাষের গুরুদেবের গৃহ।

সুভাষ বললে, 'ক্ষুদিরামের পথই আমাদের পথ—বলসাধনার পথ, স্বদেশমুক্তির যজ্ঞে আত্মবিসর্জনের পথ। কথা অনেক হয়েছে এখন শুধু চলা, পথচলা। আমাদের সব পথই এগিয়ে যাবার পথ, ফিরে যাবার পথ নেই।'

গোপীনাথ সম্পর্কে সিরাজগঞ্জের প্রস্তাব গান্ধীকে ক্ষুণ্ণ করেছিল বটে কিন্তু সাত বছর পরে ১৯৩১-এ করাচি কংগ্রেসে যখন ভগৎ সিং, সুখদেও আর রাজগুরুর ফাঁসির কথা উঠল তখন মহাত্মা আর মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁরই সম্মতিতে আর সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হল, যদিও বিপ্লবীদের হিংসা কাণ্ডগুলি নিন্দনীয়, তাদের সাহস, বীরত্ব ও আত্মবলিদান নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

দেশবন্দুর পরলোকগমনের পর মহাত্মা বললেন, 'গোপীনাথ সাহা সম্বন্ধে আমার ও দেশবন্ধুর মধ্যে বাদানুবাদটা প্রেমের কলহমাত্র ছিল।'

তবে কি গোপীনাথের সাহস, বীরত্ব ও আত্মবলিদানের প্রতিও তাঁর সমর্থন ছিল? অনুচ্চারিত সমর্থন?

নয়

স্বরাজ্যদলের অগ্রগামিতায় সরকার বিচলিত হয়ে পড়ল। এদিকে তারকেশ্বর নিয়ে নতুন ধরনের এক গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে। সে আন্দোলনের পুরোধাও দেশবন্ধু। দেবস্থান কলুষিত হয়ে যাচ্ছে, মোহন্তের আচরণ সাধুজনোচিত নয়, বিরাট দেবসম্পত্তি নানা উচ্ছৃঙ্খলতায় অপচিত—বাংলা কংগ্রেস কমিটির উপর চাপ এল, পাঞ্জাবে আকালি আন্দোলনের মত তারকেশ্বরেও আন্দোলন চালাও, তীর্থকে পাপপঙ্ক থেকে উদ্ধার করো। দেশবন্ধু খবর নিয়ে জানলেন অভিযোগ ভয়াবহভাবে সত্য। স্থির করলেন আন্দোলন চালাবেন। মোহন্তের কবল থেকে মন্দির ও সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করে তাদের পরিচালনার ভার জনসাধারণের নির্বাচিত কোনো কমিটির উপর ন্যস্ত করবেন। সুরু হল সত্যাগ্রহ। স্বেচ্ছাসেবকের দল যাত্রা করল মন্দিরের দিকে। মোহন্ত সতীশ গিরি যথারীতি পুলিশকে আহ্বান করল। কুলিশ-পানি পুলিশ যথারীতি লাঠিচার্জ করল। সুরু হল শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ। বাড়তে লাগল স্বেচ্ছাসেবীর দল। দীর্ঘতর ঘনতর শোভাযাত্রা।

লর্ড লিটন শ্রীরামপুরের এক সভায় ব্যঙ্গ করে বললে, তারকেশ্বর আন্দোলন একটা অতিকায় ভাঁওতা।

ভাঁওতা না খাঁটি, দেখাচ্ছি। দেশবন্ধু চিররঞ্জনকে ডাকলেন, 'অসহযোগ আন্দোলনেও তোমাকে সর্বাগ্রে জেলে পাঠিয়েছি, এবারও পাঠাতে চাই। তোমাকে না পাঠালে যে আর সব ছেলেকে ডাকতে পারছি না। কী, যাবে?'

'এক্ষুনি।' চিররঞ্জন এক ডাকে প্রস্তুত।

পরের অভিযানে চিররঞ্জন অগ্রণী। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। সরাসরি বিচারে

তার ছ মাস জেল হয়ে গেল।

দেশবন্ধু তখন বাঙলার যুবকদের ডাকলেন। এ আর ধর্মীয় আন্দোলন নয়, এ রাজনৈতিক আন্দোলন। তোমরা এস, প্রমাণ দিয়ে যাও আমাদের স্বাধীনতাই পরম পদার্থ আর বর্বর পরশাসনই ভাঁওতা। লাঠিচার্জ গুলিবর্ষণে উন্নীত হল।

দেশবন্ধু বললেন, 'এবার তবে আমি যাব।'

মোহন্ত সতীশ গিরি তখন বেগতিক দেখে গদি ছাড়ল। শিষ্য প্রভাত গিরি স্থলাভিষিক্ত হল। তারপর আপসনিষ্পত্তি হতে দেরি হল না।

একদিকে ধর্মের নামে নগ্ন অভিচার আরেকদিকে ধর্মের নামে অন্ধ প্রতিহিংসা। দিকে-দিকে সুরু হয়ে গেল হিন্দু-মুসলমানের মারামারি কাটাকাটি, দিল্লিতে, নাগপুরে, লখনৌয়ে, এলাহাবাদে—সবচেয়ে ভয়াবহ, ভীষণের চেয়েও ভীষণ কোহাটে।

একটা স্পেশ্যাল ট্রেনে করে চার হাজার হিন্দু পথের ভিখিরি হয়ে ফিরে এল রাওলপিণ্ডিতে লাহোরে, এখানে-সেখানে। দিল্লিতে, মহম্মদ অলির বাড়িতে, গান্ধী একুশ দিনের অনশন সুরু করলেন। ভাবলেন তাঁর এই আত্মপীড়নে সাম্প্রদায়িক হিংসাবোধ বিদূরিত হবে। দিল্লিতে যথারীতি ঐক্যসম্মিলন বসল, নানা বিধি-নিষেধের নির্ঘণ্ট তৈরি হল, মন্দিরে মসজিদে উত্থিত হল নানা নীরব-সরব প্রার্থনা, কিন্তু জাতির মন থেকে হিংসা আর গেল না। যা যাবার নয় তাই নানা রন্ধ্রে ইন্ধন খুঁজতে লাগল।

বাংলায় প্যাক্টের জন্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধতে পেল না। তখন গভর্নমেন্ট স্বরাজিস্টদের দাবাবার অন্য পথ না পেয়ে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স নামে এক জরুরি অর্ডিন্যান্স জারি করে বসল। জরুরি, যেহেতু এ অর্ডিন্যান্স ছাড়া ক্রমবর্ধমান সহিংস বিপ্লববাদকে দমন করা যাচ্ছে না। এ অর্ডিন্যান্সে যথেচ্ছ গ্রেপ্তার করা যাবে ও বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা যাবে খুশিমত। সুতরাং একজালে প্রায় সত্তর জন স্বরাজীকে গ্রেপ্তার করে অন্তরীণ করা হল। এই সত্তর জনের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য সুভাষ, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা।

আর সকলকে ধরা হল বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে, সুভাষের বেলায় আনা হল সেই পুরোনো পচা আইন, সেই ১৮১৮ র রেগুলেশন থ্রি—সুভাষের সঙ্গে আরো দুজনকে জুড়ে দেওয়া হল, সত্যেন্দ্র মিত্র আর অনিলবরণ রায়কে। এই গ্রেপ্তারের কারণ, সরকার থেকে বলা হল, বিপ্লব ঘটাবার ষড়যন্ত্র। হুবহু বাজে কথা, বিক্ষুব্ধ দেশবাসী তা মেনে নিতে পারল না। রাজবন্দীরা ব্যক্তিগত ভাবে বিপ্লবে বিশ্বাসী হতে পারে কিন্তু তারা কোনো সহিংস অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করেছে এ নিদারুণ মিথ্যে। টাউন হলে, কালা কানুনের বিরুদ্ধে সভা হল, ডাকা হল হরতাল।

দেশবন্ধু তখন সিমলেয়, ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করবার চেষ্টায় বিশ্রাম করছেন। তাঁর কাছে খবর পৌঁছুতেই তিনি গর্জে উঠলেন: 'কী, সুভাষকে ধরেছে! এবার আমি গভর্নমেন্টকে কাঁপিয়ে ছাড়ব।'

আর তাঁকে বিশ্রামে কে আবদ্ধ করে রাখে! তাঁর প্রধান সহকর্মীদের তাঁর কাছ থেকে এমনি করে অপসারিত করার অর্থ তাঁকেই পঙ্গু করে ফেলা। কর্পোরেশনে সুভাষ কত কল্যাণকর কাজের পত্তন করেছে, সব এক নিমেষে ভণ্ডুল হয়ে যাবে! সুভাষ

তো এখন পুরোদস্তুর গঠনের কাজে ব্যস্ত, ওর এখন রাজনীতি ঘাঁটবার সময় কোথায়? এ আর কিছু নয়, এ হচ্ছে হীনতম প্রতিহিংসা। প্রাদেশিক কংগ্রেস কেন গোপীনাথের আত্মত্যাগকে প্রশংসা করল? কেন স্বরাজ্যদল মন্ত্রীদের গদিচ্যুত করে ডায়ার্কি বা দ্বৈরাজ্যের অবসান ঘটাল?

কলকাতায় ফিরে এসে মেয়রের আসন থেকে দেশবন্ধু দৃপ্ত ভাষণ দিলেন: 'সুভাষ যেমন বিপ্লবী আমিও তেমনি বিপ্লবী। তবে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করছে না কেন? যদি দেশপ্রেম অপরাধ হয়, আমি অপরাধী। যদি সুভাষ অপরাধী হয়, আমিও অপরাধী। এই কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ও মেয়র একই অপরাধে সমান অপরাধী। তবে একজনকে ধরলে আরেকজনকে ধরছে না কেন?

এ আইন কোনো বিপ্লববাদ দমন করবার জন্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে না—প্রয়োগ করা হচ্ছে বিধিসম্মত সংগঠনগুলিকে ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে। এ অত্যাচার আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।

শুধু পাশবিক শক্তির প্রাবল্যে সুভাষকে ধরে নিয়ে গেল। প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতে সুভাষ সকালবেলা কাজে বেরুল, কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখল পুলিশবাহিনী তার জন্যে অপেক্ষা করছে। কোনো অভিযোগ জানলে না, কোনো কৈফিয়ত চাইল না—কোনো বক্তব্য নেই ব্যাখ্যা নেই—শুধু ঘোষণা করলে, আমাদের শরীরে বন্য পাশবিকতা আছে, তার জোরে তোমাকে আমরা কারাগারে টেনে নেব। এই কি আইন? এই কি বিচার? এই কি সভ্যতা?'

টাউন হলের সভায় দেশবন্ধু বাংলার যুবকদের ডাকলেন উদারকণ্ঠে: 'বাংলার যুবক, তোমাদের বুকে স্বাধীনতার তৃষ্ণা আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক। স্বাধীনতার জন্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এস, আত্মবিসর্জন দিতে দ্বিগুণ তেজে জ্বলে ওঠো। এই জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে সর্বাগ্রে আমি সম্মুখীন হব, তোমরা পিছে এস। মা, একবার সংহারমূর্তিতে প্রকাশিত হও মা, আমরা সকলে তোমার পায়ে আত্মোৎসর্গ করে স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে রাখি।'

আরো বিশদ হলেন চিত্তরঞ্জন: 'স্বাধীনতার জন্যে আমি জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। বিপ্লববাদীদের ববর্তমান পথ বিচার করে দেখলে আমি বিপ্লববাদী নই কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে বিপ্লববাদীদের যে হৃদয়াবেগ তা আমি অনুভব করি। আমি মনে করি তাদের পথে স্বাধীনতা আসবে না, যদি বিশ্বাস হয় আসবে তা হলে আমি এখুনিই তাদের আন্দোলনে যোগ দিই। তবে একথা ঠিক, স্বাধীনতার জন্যে সমস্ত দুঃখভোগে আমি প্রস্তুত, দেহের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুপাতে আমি সম্মত।'

দেশবন্ধু মহাত্মাকে টেলিগ্রাম করলেন, কলকাতায় চলে আসুন। অনুরূপ টেলিগ্রাম গেল মতিলাল নেহরুর কাছে, মুঞ্জে কেলকার সরোজিনী নাইডুর কাছে। তাঁরা সদলবলে চলে এলেন কলকাতা। সমস্ত দেখে-শুনে মহাত্মা বুঝলেন, কাউন্সিলে ও কর্পোরেশনে স্বরাজ্যদলের অভূতপূর্ব জয়ই গভর্নমেন্টকে হিংস্র করে তুলেছে। অপদস্থতার শোধ নেবার জন্যেই এই চণ্ডনীতি। এ আরেকরকমের সন্ত্রাসবাদ।

মহাত্মা তখন নিরঙ্কুশ ঘোষণা করলেন: স্বরাজ্যপার্টির কর্মধারাই কংগ্রেসের প্রধান

কর্মপদ্ধতি বলে পরিগণিত হবে। সেই ঘোষণায় যুক্ত স্বাক্ষর দিলেন দেশবন্ধু আর মতিলাল।

রবীন্দ্রনাথ তখন আর্জেন্টিনায়, দক্ষিণ আমেরিকায়। তিনি লিখে পাঠালেন:

'প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই
জেনো মনে তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখসহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।।'

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে মাসখানেকের মত ছিল সুভাষ। সেখানে বসেই সে কর্পোরেশনের কাজ করে, ফাইল দেখে, অর্ডার লেখে। আলোচনা করতে আসে সেক্রেটারি রামায়া, ইঞ্জিনিয়র কোটস, আসে জে সি মুখার্জি। সি-আই-ডির লোকেরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তরুণ সুভাষকে ঘিরে প্রবীণ সব উচ্চপদস্থ কর্মচারী, দৃশ্যটা তাদের কাছে খুব প্রীতিপ্রদ লাগে না। ঠিক হয় তাকে বহরমপুর জেলে বদলি করবে। বদলির দুদিন আগে দেশবন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কেমন আছ?

সুভাষের মুখে সেই আশার দীপ্তি, চোখে সেই স্বপ্নের অঞ্জন, দুই হাতে সেই শক্তির লাবণ্য। প্রণাম করল সুভাষ। আশীর্বাদ করলেন দেশবন্ধু।

সুভাষ বললে, 'আমাদের আর শিগগির দেখা হচ্ছে না।'

'না, না, তা কী করে হয়?' দেশবন্ধু গর্জন করে উঠলেন: 'আমি তোমাকে যত শিগগির পারি আমার কাছে নিয়ে আসব।'

দেশবন্ধু ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় বেরুলেন জাতীয় পুনর্গঠনে দেশবাসীর কাছ থেকে চাঁদা চাই, হ্যাঁ, স্বরাজ্য ফাণ্ডে, স্বরাজ্যপার্টির কাজের জন্যে। দেশবাসী দুঃস্থ তা তিনি জানেন, কিন্তু দেশবাসী আবার সরকারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সমুদ্যত—এই তো তাদের কাছ থেকে ভিক্ষে নেবার সময়। অন্তত চাঁদা চেয়ে বোঝা যাবে তাঁর প্রতি তাঁর দলের প্রতি তাদের আস্থা আছে কিনা। ভালোবাসা আছে কিনা। যা সাড়া পাওয়া গেল, এক কথায় বলতে গেলে আশাতীত। এ সাড়া কোনো বিশুদ্ধ রাজনীতি বা বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ আনতে পারে না, এ আনতে পারে একমাত্র ভালোবাসা, ভাষাতীত হৃদয়স্পর্শ।

'মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে
সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি

রাজপুত্র পরিয়াছে জীর্ণ কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক।'

ডিসেম্বরে বেলগাঁওয়ে কংগ্রেস বসল, মহাত্মা গান্ধী সভাপতি। স্বরাজীদের কাছে হার স্বীকার করলেন মহাত্মা। আইনসভাগুলি অধিকার করাই কংগ্রেসের প্রধান কর্মনীতি হয়ে দাঁড়াল আর বয়কট বা বর্জনের মধ্যে রইল শুধু বিদেশী বস্ত্র। দেশবন্ধুর জীবনে এই শেষ কংগ্রেসে যোগদান আর এই শেষ কংগ্রেসে উত্থিত হল তাঁরই জয়পতাকা।

কলকাতায় ফিরে এসেই দেশবন্ধু নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এদিকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ উনিশ শো পঁচিশের এপ্রিলেই উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তাই তাকে আইনে পরিণত করবার জন্যে নতুন বিল এনেছে গভর্নমেন্ট। সাতুই জানুয়ারি সেই বিল পাশ করিয়ে নেবার আয়োজন হয়েছে। বিরুদ্ধতা করবার জন্যে দেশবন্ধুর দরকার। কিন্তু কী করে যাবেন? কলিকের ব্যথায় তিনি ঘোরতর কাতর।

'যে করে হোক আমি যাব।' যন্ত্রণার মধ্যেও দেশবন্ধু বলছেন আর্তকণ্ঠে, 'ঐ ব্ল্যাক বিল পাশ হতে দেব না। ডাক্তারদের বলো আমার ব্যথা সারিয়ে দিতে।'

মর্ফিয়া ইনজেকশান দেওয়া হল। তাতে যন্ত্রণার কিছু উপশম হলেও জ্বর কমল না, আর জ্বরের দরুন শরীরও ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ল।

'মরি আর বাঁচি, সাতুই আমাকে কাউন্সিলে যেতেই হবে।'

এল সেই সাতুই। সাধ্য নেই কেউ তাকে নিরস্ত করতে পারে। না, বাসন্তী দেবীও না। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় হয়ে গেলেও ওঁকে নিবৃত্ত করা যাবে না।'

'তুমি কিছু ভেবো না, শরীরের ডাকের আগে আমার দেশের ডাক।'

স্ট্রেচারে করে দেশবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে সহচর ডাক্তার রইল বিধান রায় আর জে. এম. দাশগুপ্ত। কে জানে কাউন্সিল থেকে তিনি জীবিত ফিরে আসবেন কি না।

'আমার সোনার দেশের সোনার ছেলেরা বিনাবিচারে বন্দী আর আমি আমার শরীরের কষ্টের জন্যে অনুপস্থিত থেকে সে বর্বর আইন পাশ করিয়ে নেবার সুযোগ দেব? প্রাণ থাকতে নয়।'

চিত্তরঞ্জনের উপস্থিতিতে অসাধ্যসাধন হয়ে গেল, যারা সরকারের খয়ের খাঁ তাদেরও কয়েকজন বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে। যেন তাদেরও হৃদয় অলক্ষ্যে স্বদেশপ্রেমে রঞ্জিত হল। ফলে বেশি ভোটে বিল অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

'টাউনহলের বাইরে অপেক্ষমান জনতার সে কী হর্ষধ্বনি! জয় দেশবন্ধুর জয়! বন্দেমাতরম! কিন্তু বিল অগ্রাহ্য হলে হবে কী, গভর্নরের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে সেই বিলই আইন বলে চালু হয়ে গেল। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। এমনই সংবিধান তৈরি করা হয়েছে যে সাপও মরবে লাঠিও বজায় থাকবে।

স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে পাটনায় এলেন দেশবন্ধু। পাটনায় যাবার আগে তাঁর শেষ সম্পত্তি, তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি দেশের স্ত্রীজাতির কল্যাণে দান করে দিলেন। 'আমি যখন আজ সেই বাড়িতে গেলাম', মে মাসে মির্জাপুর পার্কের এক সভায় মহাত্মা বলছেন, 'আমি শোকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। এই বাড়ি, এই সুন্দর অট্টালিকা আর দেশবন্ধুর

নয়— পৃথিবীতে তাঁর যে ধনসম্পদ ছিল তার শেষ চিহ্নটুকুও তিনি নিজের হাতে মুছে দিলেন। তাঁর কথা ভেবে আমি না কেঁদে থাকতে পারছি না। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে তবু তিনি নিজের সুখসুবিধের দিকে দৃকপাত না করে দেশের ডাকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গিয়েছেন ফরিদপুরে, প্রাদেশিক সম্মিলনে। নিজের বলে মানুষের যা কিছু রক্ষণীয় তার সমস্তটুকু এমন ভাবে কেউ বিনিঃশেষ ত্যাগ করতে পারে এ আমার কল্পনার অতীত।'

একটু সুস্থ হতেই মার্চ মাসে আবার কলকাতায় ডাক পড়ল—মন্ত্রীদের মাইনের প্রসঙ্গ আবার উঠেছে কাউন্সিলে।

'এবার আর আশা নেই।'

'মন বলছে আশা কম কিন্তু প্রাণ বলছে জয়লাভ হবে।' বললেন দেশবন্ধু, 'মাই হার্ট হুইসপার্স সাকসেস।'

কলকাতায় পৌঁছেই কাউন্সিলের সভ্যদের ডাক দিলেন : 'আপনাদের নিজের বলতে আর কী আছে? আছে শুধু এক বিবেক। সে বিবেকের কান্না শুনুন। নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থের জন্যে বিবেকের কণ্ঠরোধ করবেন না। আপনাদের স্বদেশপ্রাণ বীর ভাইয়েরা আজ জেলে শৃঙ্খলিত, জেলের বাইরেও আপনাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। দেশবাসীরা দৈন্যক্লিষ্ট ব্যাধিজর্জর নিত্যবুভুক্ষু। এই নির্লজ্জ ব্যুরোক্রেসিই সমস্ত দুঃখদারিদ্র্যের কারণ। ওদের হাত থেকে আপনাদের সহায়তা সরিয়ে নিন, ওদের নিয়োজিত মন্ত্রীর মাইনে অগ্রাহ্য করুন।'

আবারও দেশবন্ধুর জয় হল। মন্ত্রীর মাইনে নাকচ হয়ে গেল। গভর্নর লিটন তার একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্যদের দিয়ে শাসন চালাতে লাগল।

স্টেটসম্যান জ্বলতে লাগল গাত্রদাহে। দেশবন্ধুকে বললে, 'দুষ্টবুদ্ধি, ইভিল জিনিয়াস, ধ্বংসের সেবক, যার আধ্যাত্মিক বাস মস্কোয়, সেই ঘৃণার রাজধানীতে।'

পাটনায় ফিরে গেলেন দেশবন্ধু। বললেন, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বেশি মূল্যবান। জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা দরকার। দে ফিল এণ্ড গ্রোন বাট ক্যানট স্পিক। তারা শুধু অনুভব আর আর্তনাদ করে কিন্তু কথা বলতে পারে না।'

ডাক্তার সান্যাল বললে, 'অনেক টাকার দরকার। আবার প্র্যাকটিস সুরু করে দিন।'

দেশবন্ধু উদাসীন হয়ে গেলেন। বললেন, 'প্র্যাকটিস করতে গিয়ে অনেকরকম লোক দেখেছি, আবার এ অবস্থায় ভগবান সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিচ্ছেন। রাজারাজড়ার আয়ের চেয়ে এই সৎসঙ্গের আনন্দ অনেক বেশি।' তাকালেন গঙ্গার দিকে : 'এখন আমার মন কী চায় জানেন? ঐ যে মজরুল হকের আশ্রমটি আছে গঙ্গার পারে, ঐ রকম একটি আশ্রম করে থাকি।'

কিন্তু অসুখ আবার হঠাৎ মন্দের দিকে গেল। রক্তবমি হয়ে দারুণ দুর্বল হয়ে পড়লেন।

ডাক্তার বললে, 'আবার আপনাকে একটু ব্র্যাণ্ডি ধরতে হবে।'

'ও আর এ জীবনে নয়।' স্থির কণ্ঠে বললেন দেশবন্ধু, 'যে বিষ একবার ছেড়েছি তা আর নয়।'

হঠাৎ একদিন বাসন্তী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ভীষণ বিচলিত হলেন দেশবন্ধু। ডাক্তারকে বললেন, 'ওকে ভালো করে দিন। জীবনে ও একদিনের জন্যেও আমার অসুবিধে করেনি।'

দেশবন্ধুর ইচ্ছে সমুদ্রভ্রমণে যান। ডাক্তারদেরও সেই বিধান, তাতেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কিন্তু টাকা কোথায়? অন্তত কুড়ি হাজার টাকা দরকার। বাংলার বাইরে একজন সদাশয় দশ হাজার দিতে চেয়েছেন। আর বাকি দশ? একজনের কাছে চিঠি দিয়ে হেমেন দাশগুপ্তকে কলকাতায় পাঠালেন। এই ব্যক্তি একবার স্বেচ্ছায় দেশবন্ধুকে লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল, দেশবন্ধু তা নেননি। আজ যদি এই অনটনের দিনে কিছু সাহায্য করে।

'শুধু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে নয়, দেশোদ্ধারের জন্যেই বিলেত যাওয়া দরকার।' বললেন দেশবন্ধু, 'সেখানে গেলে মিটমাটের জন্যে পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করা যেত।'

কিন্তু সেই ব্যক্তি টাকা দিল না।

'এই দেখ দুনিয়া।' দেশবন্ধু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন না, হাসলেন : 'এই হচ্ছে জীবন।'

'প্র্যাকটিস সম্পূর্ণ না ছাড়লে পারতেন।' কে একজন বললে।

'সম্পূর্ণ না ছাড়লে কি কাজ করতে পারতাম?' দেশবন্ধু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : 'সম্পূর্ণ না ছাড়লে কি কেউ আমাকে মানত, এত ভালোবাসত?'

'কিন্তু এত কষ্টও তো দেখা যায় না।'

'তোমরা কি ভাবো আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি খুব দুঃখিত?' দেশবন্ধু প্রদীপ্ত মুখে বললেন, 'দুঃখ আমার জন্যে নয়, আমার জন্যে অনন্ত সুখ।' কিন্তু হঠাৎ থেমে পড়ে আহত স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা শুধু আমার কষ্ট।'

কী কষ্ট জানবার জন্যে সকলে উৎসুক হয়ে রইল।

'অভাবগ্রস্ত লোকের দুঃখ দূর করতে পারি না। কেউ আর কিছু চায় না আমার কাছে।'

কিন্তু পৃথিবীতে এসে যে লোক দুঃখ পেল না সে তো তার জীবনের থেকে সব পাওনা আদায় করে নিতে পারল না, তার পাথেয় কম পড়ে গেল।

জানুয়ারিতেই সুভাষকে মান্দালয় জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে সেখান থেকে চিঠি লিখছে বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে :

'তুমি লিখেছ মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে পৃথিবীর মাটিকে একেবারে অতলতল পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে, তাই দেখে তুমি বিষণ্ন ও গম্ভীর হচ্ছে প্রতিদিন। কিন্তু এ অশ্রুর সবটুকুই কি দুঃখের? তার মধ্যে কি ভালোবাসা ও করুণার অমৃতবিন্দু নেই? সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দের অম্বুনিধিতে পৌঁছুবার সম্ভাবনা থাকলে তুমি দুঃখকষ্টের ছোটখাটো ঢেউগুলো পার হয়ে যেতে অসম্মত হতে? আমি নিজে তো দুঃখবাদে নিরুৎসাহ হবার কোনো কারণ দেখি না, বরং আমার মনে হয় দুঃখকষ্টেই

উন্নততর কর্ম ও উজ্জ্বলতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে করো বিনা দুঃখকষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোনো মূল্য আছে?'

দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে। দুঃখই মানুষের একমাত্র শক্তি, একমাত্র স্পর্ধা।

'দুঃখ আমার ঘরের জিনিস
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস
এ মোর অহঙ্কার।'

পাটনা থেকে ফিরলেন দেশবন্ধু। উঠলেন ৫ নম্বর বিশপ লিফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে। তিরিশে এপ্রিল রওনা হলেন ফরিদপুর। পরদিন, পয়লা মে, রওনা হলেন মহাত্মা।

ব্রিটিশ শাসনের ভূগোলে বাংলাই ঝটিকার কেন্দ্র। তাই প্রাদেশিক সম্মিলনে বাংলা দেশের বক্তব্যকে গভর্নমেণ্ট মূল্য দিতে পক্ষপাতী। তাই দেশবন্ধুর ভাষণ বিশেষ করে গভর্নমেণ্টকেই লক্ষ্য করে। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের কণ্ঠে ঘোষণা করলেই বক্তব্যকে জীবন্ত মনে হবে, তাই ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়েই এসেছেন দেশবন্ধু।

'কেবল স্বাধীনতায়ই স্বরাজ লাভ হবে না।' বললেন চিত্তরঞ্জন, 'স্বরাজের আদর্শ আরো মহৎ। ইংরেজ চলে গেলে আমরা অধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারি, তবু শুধু তাতেই স্বরাজ অর্থে আমি যা বুঝি তার প্রতিষ্ঠা হবে না। পক্ষান্তরে ইংরেজ থেকেও যদি জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশলাভে কোনো বাধা না জন্মায় তবে ইংরেজ থাকুক, তাতে ক্ষতি কী। স্বায়ত্তশাসন আর স্বরাজ এক বস্তু নয়।'

এই স্বরাজলাভের পথ কী? দেশবন্ধু আবার ঘোষণা করলেন, অহিংসা। তাই বলে কাপুরুষের অহিংসা নয়, বলবানের অহিংসা। বললেন, 'যে দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল কৃতদাসের গলায় সবলে বেঁধে দেয় সে যেমন পাপ করে তেমনি পাপ করে সেই ভীরু ক্লীব যে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাধা পড়ার সময়ে বাধা দেয় না বা আবদ্ধ হয়ে থাকতেই আরাম বোধ করে।'

বিনাবিচারে কারারুদ্ধ দেশসেবকদের মুক্তির প্রসঙ্গ বাদ পড়তে পারে না কিছুতেই। দেশবন্ধু বললেন, 'সুভাষ, সত্যেন আর অনিলবরণ সম্পূর্ণ নির্দোষ, অন্তত এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

'আর বাকি সকলের?' প্রতিপক্ষ আপত্তি করল, 'বিনাবিচারে আবদ্ধ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই। প্রস্তাবে বিভেদবাদ চলবে না।'

'হিংসা যেমন নীতিবিরুদ্ধ তেমনি বিনাবিচারে নির্বাসনও নীতি-বিরুদ্ধ। সকলেরই বিচার চাই। তবে দেশে হিংসার পক্ষপাতী লোক নেই এ বলা মিথ্যে হবে। সুভাষ, সত্যেন আর অনিলবরণ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তারা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লিপ্ত নয়, তারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ।'

এ নিয়ে সভায় গোলমাল সুরু হল। প্রতিপক্ষ ভাবল দেশবন্ধু বুঝি তিনজন সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব করছেন।

'ওরা না বুঝে গোলমাল করছে।' দেশবন্ধু সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

কিন্তু পরদিন দেশবন্ধুর প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। মহাত্মা বললেন, 'দেশবন্ধুর প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত। যদি কেউ আমাকে এ আমার রচনা বলে সই করতে বলে আমি সানন্দে সই করব, কিন্তু মুশকিল এই, এমন সুযুক্তিপূর্ণ ও সুলিখিত অভিভাষণ আমার কলম থেকে বার হত না।'

স্টেটসম্যান আর ইংলিশম্যান রটাল, সুভাষই বাংলাদেশের বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের মস্তিষ্ক। কী করে তোমরা এ কথা বলো, তোমাদের হাতে প্রমাণ কী? সুভাষ বিপ্লবে বিশ্বাস করে কিনা, করলে সে কোন ধরনের বিপ্লব, সে সব প্রশ্ন উঠছে না, সাম্প্রতিক সহিংস আন্দোলনে সে লিপ্ত, এটা প্রমাণ করো। সুভাষের পক্ষ থেকে ঐ দুই পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনা হল। হয় খেসারত দাও, নয় নিজের কান মলো, ক্ষমা চাও নিঃসর্তে।

ফরিদপুর থেকে ফিরে এলেন দেশবন্ধু। বললেন, 'দেখ মহাত্মার কোনো শত্রু নেই, আমার এত শত্রু কেন? মহাত্মার মনে কোনো হিংসা নেই, তাই তাঁর শত্রুও নেই। আমার মনে নিশ্চয়ই কোথাও হিংসা আছে, তাই উঠতে-বসতে আমার এত শত্রু।'

এবার চলো দার্জিলিঙ যাই। দার্জিলিঙেই আমার শরীর সারবে।

দশ

এগারোই মে দার্জিলিঙ গেলেন দেশবন্ধু। চব্বিশে মে আনি বেশান্ত গেল তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে। তার কমনওয়েলথ বিল নিয়ে সে তখন ভারি ব্যস্ত। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সে এ বিল চালু করতে পারবে এই তার ধারণা। এ বিলের উদ্দেশ্য ভারতকে 'হোম রুল' দেওয়া, কমনওয়েলথ থেকে স্বায়ত্তশাসন। এতে কংগ্রেসের অনুমোদন থাকলে দাবি জোরদার হবে এই ভেবে বেশান্ত বেলগাঁওয়ে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস সে ছলের জালে পড়তে চায়নি। বেশান্ত ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। এখন দেখল নতুন ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড দেশবন্ধুর সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন, লর্ড রেডিংকে এই প্রসঙ্গে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন লণ্ডনে। কাজেকাজেই এখন দেশবন্ধুকে গিয়ে ধরি, যদি কমনওয়েলথ বিলে তাঁর সমর্থন পাই।

দেশবন্ধু বললেন, 'এতে আমার আপত্তি হবে না, ফরিদপুরে এই মর্মেই বলে এসেছি। কিন্তু এক কথা, যদি এ বিল পাশ না হয়, তবে আপনি আমাদের সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সে আসবেন তো?'

'সে কি, এর পরেও আপনারা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স করবেন নাকি?' বেশান্ত ঘাবড়ে গেল।

'বা, করব না? আপসে না পেলে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করব না? অহিংস আইন-অমান্যই আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।'

'তার জন্যে আপনাদের প্রস্তুতি কই?'

'প্রস্তুত হতে হতেই প্রস্তুতি। বলুন তখন আপনি আসবেন আমাদের আন্দোলনে?'

'না, মাপ করুন। ঐ আন্দোলনে আমার সহানুভূতি নেই।'

চৌঠা জুন গান্ধী এসে পৌঁছুলেন দার্জিলিঙে।

দেশবন্ধু বললেন, 'আমার খুব বিশ্বাস বার্কেনহেড জবরদস্ত লোক, আমার বিশ্বাস সে চুপচাপ বসে থাকবে না।'

গান্ধী বললেন, 'আমার ধারণা উলটো। দেশে এখন হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া, সর্বত্র দলাদলি, সর্বত্র বিসংবাদ। সংহতি না থাকলে, সবাই একতাবদ্ধ না হলে কিছু হবে না। ইংরেজ কখনো কোনো দুর্বল শত্রুর কাছে মাথা নোয়ায় না।'

ঘোষণা করা হল সাতুই জুলাই পার্লামেন্টে বার্কেনহেড ভারতবর্ষ সম্পর্কে গুরুতর কিছু ঘোষণা করবে।

ষোলই জুন মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় দেশবন্ধু মহাপ্রয়াণ করলেন।

সাতুই জুলাই কী ঘোষণা করল বার্কেনহেড? আর ঘোষণা! তাদের প্রধান শত্রু অপসৃত হয়েছে, ইংরেজ শাসকদের চাপা মুখের হাসি তখন দেখে কে? গলায় খাঁখারি দিয়ে বলতে সুরু করল বার্কেনহেড। ভারতবর্ষ— ভারতবর্ষের অগ্রগতি সম্ভব শুধু শ্রমশিল্পের উন্নতিতে। ভারতবর্ষ এখন শুধু শ্রমশিল্পের প্রসারে মনোযোগী হোক।

দেশবন্ধুর দেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হল আর কলকাতা দেখাল কাকে বলে বীরপূজা! স্বয়ং গান্ধী সে শবশোভাযাত্রায় অগ্রণী হলেন। আর রবীন্দ্রনাথ দুটি ছত্রে শাশ্বত করে রাখলেন সেই মৃত্যুমৃত্যু মহামৃত্যুকে :

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥'

মান্দালয় জেল থেকে সুভাষ তিনখানা চিঠি লিখলে— একখানা হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে, একখানা দিলীপকুমার রায়কে, আরেকখানা বাসন্তী দেবীকে।

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অলৌকিক প্রভাবের হেতু কী, প্রথম পত্রে তার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছে সুভাষ। এক কথায় সেই হেতু, নির্বিচার লোকপ্রেম। সে প্রেমের উৎপত্তি মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে— কারু দোষ না দেখা, গুণের হিসেব না করা। 'যারা তাঁর পাণ্ডিত্যের কাছে মাথা নোয়ায়নি, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়নি, বিক্রমের কাছে পরাভব স্বীকার করেনি, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়নি', লিখছে সুভাষ : 'তারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের টানে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। দেশবন্ধুর একটি কথায় তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।'

সাধারণ সাংসারিক জীবের মত দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁর বাড়ি সাধারণের সম্পত্তি হয়ে পড়েছিল। সর্বত্র, এমন কি তাঁর শোবার ঘরেও তাদের গতিবিধি ব্যাহত হয়নি। সহচরদের যে তিনি শুধু ভালোবাসতেন তাই নয়, তাদের জন্যে তিনি লাঞ্ছনা সইতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁর এক আত্মীয় তাঁর এক সহকর্মী সম্পর্কে ক্রুদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন, আমি ওকে ঘৃণা করি। দেশবন্ধু ব্যথিত মুখে বললেন, আমার মুশকিল এই, আমি ঘৃণা করতে পারি না।

'দেশবন্ধুর সঙ্গে আটমাস জেলখানায় কাটাবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল।' লিখেছে সুভাষ : 'তার মধ্যে দু মাস তো আমরা প্রেসিডেন্সি জেলের পাশাপাশি সেলে ছিলাম।

বাকি ছ মাস ছিলাম আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে, একটি বড় ঘরে, সহমর্মী বন্ধুদের সঙ্গে। এই সময় তাঁর সেবার ভার কতকটা আমার উপর ছিল। আলিপুর জেলে শেষ কয়েক মাস তাঁর একবেলার রান্না আমাদেরই করতে হত। গভর্নমেণ্টের কৃপায় আমি যে আটটি মাস তাঁর সেবা করবার সুযোগ ও অধিকার পেয়েছিলাম এ আমার পক্ষে পরম গৌরবের ব্যাপার।'

জেলখানায় দেশবন্ধু-সুভাষদের পাহারার জন্যে সঙিনদার গুর্খা সৈন্য মোতায়েন ছিল। একদিন দেখা গেল গুর্খা সৈন্যের বদলে রুলধারী সেপাই এসে দাঁড়িয়েছে।

'ব্যাপার কী হে সুভাষ?' দেশবন্ধু পরিহাস করলেন : 'শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশি? আমরা কি এতই নিরীহ?'

স্বরাজ 'পিপলের', জনসাধারণের জন্যে, পৃথিবীতে এ কথা নতুন নয়। তবে ভারতের রাজনীতিতে এ কথা নতুন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় ত্রিশ বছর আগে তাঁর 'বর্তমান ভারতে' এ কথা লিখে গিয়েছেন কিন্তু স্বামীজির সে ভবিষ্যৎবাণীর প্রতিধ্বনি রাজনীতির মঞ্চে শোনা যায়নি।' প্রথম শোনালেন দেশবন্ধু।

'তাঁর অলৌকিক প্রভাবের আরেকটি কারণ আমি বলব।' এই মর্মে লিখছে সুভাষ: 'সে কারণ হচ্ছে তাঁর ধর্মপ্রাণতা। তিনি সর্বদা অনুভব করতেন যে তিনি যা করেন তা সবই তাঁর ধর্মজীবনের অঙ্গস্বরূপ। বৈষ্ণবধর্মের সাহায্যে তিনি বাস্তবে ও আদর্শে এক মধুর সামঞ্জস্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজেকে ভগবানের অনন্তলীলার যন্ত্রস্বরূপ বলে মনে করতেন। নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটলে মানুষের অহংকর্তৃত্বজ্ঞান লোপ পায়। অহঙ্কারের লোপ হলে মানুষ দিব্য শক্তির আধারে পরিণত হয়। তখন তার শক্তির কাছে সাধারণ মানুষ দাঁড়াতে পারে না।'

সুভাষ নিজেও ছিল এই দিব্যশক্তির মহাসাধক। শুধু সাধক নয়, মহা-উদ্বোধক। কে তাকে রুখবে? কে তার সামনে দাঁড়াতে সাহস পাবে? কিন্তু সে কথা পরে।

'জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে দেশবন্ধুর ছিল এক ধ্যান এক চিন্তা— স্বদেশসেবা।' আরো লিখছে সুভাষ : 'আর সেই স্বদেশসেবাই তাঁর ধর্মজীবনের সোপানস্বরূপ।'

সুভাষেরও এক ধ্যান এক চিন্তা— সেই স্বদেশসেবা। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকাই তো মহত্তম সেবা।

বন্ধু দিলীপকুমারকে এই মর্মে চিঠি লেখে সুভাষ : 'তুমি জানো আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই সেই একই চিন্তা—সে হচ্ছে মহাত্মা দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন এই দারুণ সংবাদ দেখি তখন চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু হায়, সংবাদটা নিতান্তই সত্য, নির্মম সত্য।'

'যে সব চিন্তা আজ মনে উঠছে সেগুলো এত পবিত্র ও এত মূল্যবান যে অচেনা লোকদের কাছে তা প্রকাশ করা যায় না—আর সেন্সরদের অজানা-অচেনা না মনে করে পারি না। আমি শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে সমগ্র দেশের অপূরণীয় ক্ষতি তো হলই, সব চেয়ে বড় সর্বনাশ হল বাংলার যুবকদের। তিনি ছিলেন চিরনবীন চিরতরুণ—এক কথায়, তিনি শুধু তরুণের বন্ধুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তরুণের

রাজা।'

তারপর দার্শনিক সুভাষ দুঃখবাদের কথা তুলল। লিখলে : 'তুমি যখন আসলে এই কথাটাই বলো যে দুঃখটা কষ্ট নয়, তখন আমি তোমার সঙ্গে একমত। জীবনে অবশ্য এমন সব ট্রাজেডি আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদের উপর এসে পড়েছে—সেগুলোকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারি না। আমি এত বড় তত্ত্বজ্ঞানী বা এত বড় ভণ্ড নই যে বলব আমি সবরকম দুঃখকষ্টই সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভেবে দেখতে হয়, সংসারে এমন কতগুলো হতভাগ্যও আছে— হয়তো তারা সত্যি-সত্যি ভাগ্যবান— যারা সকলরকম দুঃখকষ্ট সহ্য করবার জন্যেই যেন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কম বেশি যাই হোক, যদি কাউকে পাত্র ভরে দুঃখ পান করতে হয় তা হলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পান করা ভালো। এতে আর যাই হোক না হোক, স্বাভাবিক সহ্যশক্তি অনেক বেড়ে যায়।'

সুভাষের আছে সেই সহ্যশক্তি। সেই আত্মশক্তি। সেই শক্তির উৎস সর্বাত্ম-সমর্পণে। কোথায়? দেশমাতার পূজার বেদীতে।

বাঙালির নিজস্ব সাধনাই মাতৃসাধনা। তারা শুধু ভগবানকেই মা বলে না, তারা দেশকেও মা বলে। তাদের প্রাণদ মন্ত্র বন্দেমাতরম্। তাদের মা অবলা নয়, বহুবলধারিণী রিপুদলবারিণী— প্রবলপ্রচণ্ডিকা রণরামা। 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ।' 'অয়ি ভুবনমোহিনী, অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী, জনক-জননী-জননী।'

'নিখিল বঙ্গের মাতা' দেবী বাসন্তীকে দেখ।

তাঁর সম্পর্কে এই মর্মে লিখছে সুভাষ : 'যে দেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে মূর্তিমতী সেবা ও শান্তির মত ছায়া হয়ে সর্বদা দেশবন্ধুর পাশে থাকতেন, তাঁকে বাদ দিলে দেশবন্ধুর জীবনে কতটুকু বাকি থাকে, তা কে বলতে পারে? ভোগের উচ্চশিখরে উঠেও যিনি হিন্দু নারীর আদর্শ— লজ্জা, নম্রতা ও সেবা কোনোদিন বিস্মৃত হননি— বিপদের ঘনান্ধকারে যা হিন্দু পতিব্রতার একমাত্র সম্বল, চিত্তস্থৈর্য ও ভগবদবিশ্বাস, হারাননি— সেই দেবীর কথা লিখতে গেলে আমি ভাষা খুঁজে পাই না। দেশবন্ধু ছিলেন তরুণদের রাজা, তাঁর পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন তরুণদের মাতা। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর তিনি আজ শুধু চিররঞ্জন-মাতা নন, শুধু তরুণদের মাতা নন, তিনি আজ নিখিল বঙ্গের মাতা। বাঙালি হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আজ তাঁর চরণে সমর্পিত।'

মাতা বাসন্তীকে চিঠি লিখল সুভাষ :

'তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় আলিপুর জেলে। তখন আমি সংবাদ পেয়েছি যে আমি বহরমপুরে বদলি হব। বিদায়ের সময় আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে বোধহয় অনেক দিন দেখা হবে না। তিনি উত্তরে হেসে বললেন, 'না, আমি তোমাদের বেশি দিন জেলে থাকতে দিচ্ছি না।' হায়, তখন কি আমি জানি আমার কথা এতখানি সত্য হয়ে দাঁড়াবে! অদৃষ্টের কি পরিহাস!'

মনে পড়ল জেলে থাকতে দেশবন্ধুর কত সে সেবা করেছে, আর সে সেবা তিনি কী অমেয় স্নেহে গ্রহণ করেছেন। সে কথা বারে বারে মনে পড়ছে সুভাষের,

মনে পড়ছে শেষ গতি শরণাগতির কথা!

লিখছে: 'আমি বাইরে থাকলে আমার সেবায় কোনো ফল হত কিনা জানি না। আমার সেবার প্রয়োজন হত কিনা তাও জানি না। কিন্তু সেবার সুযোগ যে থাকত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আজ যে আমার সেবার সুযোগমাত্র নেই এই কথা ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে। এবং ব্যর্থ বাসনা ও ততোধিক ব্যর্থ প্রয়াস যেন বারে বারে বন্ধ দুয়ারের গায়ে আঘাত খেয়ে ফিরে আসছে। যেখানে মানুষ সামর্থ্যহীন, সেখানে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই আমি আবার প্রার্থনা করি, তিনিই আপনাকে সান্ত্বনা ও শক্তি দিন। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন।'

আলিপুর জেলে বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে সুভাষের আলাপ হয়। বিপ্লবীরা থাকত 'বম্ব ইয়ার্ডে' আর সত্যাগ্রহীরা অন্য এলেকায়। সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা বিপুলায়তন হয়ে উঠলে দুই এলেকা আলাদা করে রাখা সম্ভব হল না। যুবকের দল দেয়াল টপকে যাওয়া আসা করতে লাগল। তখন সুপারইনটেণ্ডেন্ট দু দলে মেলামেশার সুযোগ করে দিল।

বিপ্লবীরা জেলে বসে কবে আর বাইরের খাবার খেয়েছে। সত্যাগ্রহীদের বন্ধুতায় বিপ্লবীরা এবার তাই খেতে লাগল— কলা, কমলালেবু, রসগোল্লা! চিড়েগুড়ের কী চমৎকার আস্বাদ তা যেন ভুলেই গিয়েছিল সকলে। একদিন তো দেশবন্ধু ত্রৈলোক্যকে পাশে বসিয়েই খাওয়ালেন। আর খাবার পরিবেশন করল সুভাষ।

ত্রৈলোক্যের ডাক নাম মহারাজ। তার সম্পর্কে সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর সে জীবনের ত্রিশবছর ব্রিটিশের জেলে কাটিয়েছে।

দেশবন্ধুর কাছে কারা গিয়ে নালিশ করলে, বোমা-ইয়ার্ডের লোকেরা হিংসার কথা বলে ছোকরা সত্যাগ্রহীদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছে। এ অভিযোগ প্রথমটা কর্ণপাত করেননি দেশবন্ধু, পরে আবার সেই অভিযোগ পেশ করা হলে তিনি বললেন, 'বিপ্লবীদের কথা যখন ভাবি তখন আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়।'

একই জাহাজে সুভাষের সঙ্গে মহারাজ চলেছে রেঙ্গুন। সঙ্গী আরো অনেকে, তার মধ্যে আছে সত্যেন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্র ঘোষ, মদন মোহন ভৌমিক, বিপিন গাঙ্গুলি, হরিকুমার চক্রবর্তী, জীবন গাঙ্গুলি। অবধায়ক স্বয়ং লোম্যান। আর আই-বির দারোগা যে কত, কত যে বন্দুকধারী প্রহরী, তার লেখাজোখা নেই। জাহাজের তিন দিন সকলের সঙ্গে কী আনন্দে কাটল! মান্দালয় জেলে পৌঁছে সুভাষ বললে, আমার পাশেই মহারাজের সিট থাকবে।

এরি মধ্যে আন্দামান ঘুরে এসেছে মহারাজ। আন্দামানে নানা বিরুদ্ধতা করে সে বিখ্যাত হয়েছে। বেত ছাড়া হেন শাস্তি নেই যা তার হয়নি। ক্রস-বার-ফেটার্স, ডাণ্ডা-বেড়ি, শিকলি বেড়ি, খাড়া হাতকড়ি, পিছনে হাতকড়ি, হাতে হাতকড়ি, পেনাল ডায়েট, সেলবাস—সমস্ত। বেড়ি পায়ে দিতে দিতে পায়ে কড়া পড়ে গিয়েছে। বেড়ি পায়ে দিয়েই ফুটবল খেলেছে। ফুটবল কোথায়? কম্বলের কুণ্ডই ফুটবল। এমন একজন বিচিত্র কাহিনীতে ভরা বীর বিপ্লবীকে পাশে পেয়ে সুভাষ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল।

জাহাজের ডেকে মহারাজ ও সত্যেন মিত্র বেড়াচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে আই-বির দারোগাবাবু। সব সময়ে তার কড়া নজর রাখবার কথা, রাজবন্দীরা হঠাৎ কিছু না করে বসে। কিন্তু সত্যেন আর মহারাজ ক্রমশ দ্রুত ছুটতে সুরু করল, দারোগাবাবু আর তাল রাখতে পারল না, ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। মহারাজ আর সত্যেন তখন দারোগাবাবুর থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে, লোম্যানের আবির্ভাব হল। লোম্যানকে দেখে দারোগাবাবুর চক্ষু স্থির। ভ্রমণরত বন্দীদের থেকে সে পিছিয়ে রয়েছে, সেই অপরাধেই দুর্ধর্ষ লোম্যান তার চাকরি খেয়ে দেবে। পই-পই করে ছুটে বন্দীদের সঙ্গ ধরল দারোগা।

'আপনাদের জন্যে আমি মারা যাব দেখছি।' হাঁপাতে-হাঁপাতে দারোগাবাবু বললে, 'আপনাদের পিছু-পিছু ছুটতে ঘোড়া দরকার, মানুষের সাধ্য নেই যে চলতে পারে। লোম্যান সাহেব দেখে ফেলেছে আমি পিছিয়ে রয়েছি।'

মহারাজ হেসে বললে, 'আপনার ভয় নেই, আমি লোম্যান সাহেবকে বলে দেব।'

'সে কী কথা!' দারোগাবাবু হাঁ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, লোম্যানের সঙ্গে আমার অনেক দিনের খাতির।' বললে মহারাজ, 'আমি আপনার হয়ে সুপারিশ করে দিলে নিশ্চয়ই তিনি আপনার চাকরি খাবেন না।'

'কী সর্বনাশ! আপনি সুপারিশ করবেন? তা হলে আমার চাকরি এই দণ্ডে চলে যাবে।'

দুর্ধর্ষ লোম্যান। টেগার্টের চেয়েও বুঝি এককাঠি সরেস।

'তোমাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে কেন জানো?' মহারাজকে ডাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল লোম্যান।

'কেন?'

'যাতে তোমরা কোনো হিংসাত্মক কাজ না করতে পারো।'

'আমি বা আমরা বন্ধুদের মধ্যে কেউ কোনোদিন হিংসাত্মক কাজ করিনি।' মহারাজ বললে স্পষ্টস্বরে।

'রাখো।' প্রায় ধমকে উঠল লোম্যান : 'করোনি কিন্তু করবার জন্যে পরামর্শ করছিলে।'

'হিংসাত্মক কাজ করবার জন্যে পরামর্শ লাগে না। তুমি কি মনে করো ইচ্ছে করলে চোখের পলকে দু-চারটে খুন করতে পারতাম না?'

'তা পারতে নিশ্চয়ই। তোমরা তেমনিধারা ভয়ঙ্কর লোক। তাই তো তোমাদের আটকে রেখেছি। কী, ভালো করিনি?' লোম্যান হঠাৎ সুর নামাল : 'আচ্ছা, একটা বিষয়ে তুমি আমাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারো?'

'বলুন।'

'দেশের যুবকেরা যে সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছে তাদের দমন করবার উপায় কী?'

'সন্ত্রাসবাদী বলবেন না, বলুন বিপ্লবী। টেররিস্ট বলবেন না, বলুন রেভলিউশনারি।'

'রাখো।' লোম্যানের স্বরে আবার ধমক এসে পড়ল : 'আচ্ছা, যুবকদের মধ্যে যে হিংসাত্মক কাজ করবার প্রবৃত্তি জাগছে তা কী করে দমন করা যায়?'

মহারাজও প্রতিবাদে দৃঢ়তর হল। বললে, 'হিংসাত্মক কাজ করবার প্রবৃত্তি নয়,

জেগেছে দেশকে স্বাধীন করবার প্রচেষ্টা।'

'বেশ, এই প্রচেষ্টাটাই বা কী করে দমন করা যায়?' লোম্যান তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে।

'যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষ না স্বাধীন হয় ততক্ষণ চলবে এই প্রচেষ্টা। তাকে দমন করা যাবে না।'

'স্বাধীন!' লোম্যান খেপে গেল। বললে, 'স্বাধীন হবার মত তোমাদের যোগ্যতা আছে?'

'সে যোগ্যতারই তো পরীক্ষা দিচ্ছি আমরা।'

'আমরা যদি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাই তোমরা তোমাদের দেশকে রক্ষা করতে পারবে?' লোম্যানের গলার স্বর আরো চড়া হল : 'আমরা চলে গেলেই তোমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি সুরু করে দেবে।'

মহারাজের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটল : 'আমাদের নিয়ে তোমাদের মাথাব্যথা কেন? একবার চলে গিয়েই দেখ না। তা তোমরা কি অমনি-অমনি চলে যাবে?'

এই লোম্যানকেই প্রায় ছ বছর পরে, ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় বিনয় বসু গুলি করে মারে। তখন লোম্যান পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল। বিপ্লবীদের কাছে খবর এসে পৌঁছুল ২৯শে আগস্ট সে ঢাকায় আসছে।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বিপ্লবীদের কাছে সে-রব অবশ্যি গূঢ় ও গোপন। সকালবেলা, নটা বেজে পনেরো মিনিট। নারায়ণগঞ্জ রিভার-পুলিশের ইংরেজ সুপারইনটেণ্ডেণ্ট স্ট্রোক হয়ে হাসপাতালে ঢুকেছে, মিটফোর্ড হাসপাতালে। তাকেই দেখতে এসেছে লোম্যান। সঙ্গে ঢাকার পুলিশ-সুপার হডসন। হাসপাতালের অঙ্গনে লোম্যান হডসনের সঙ্গে কথা বলছে, পিছন থেকে কে একজন নির্ভয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এল। সন্দেহ করবার অবকাশও নেই এমনি নিরীহ একজন যুবক। হাসপাতালেরই কোনো কর্মী হয়তো। না কি পিছন দিক থেকে কেউ আসছে, পুলিশ-প্রবরেরা আন্দাজই করতে পারেনি। বিনয় এমনি আত্মস্থ। আর তার হাতের কাজ যেমন ক্ষিপ্র তেমনি অব্যর্থ। প্রায় ত্রিশ হাত দূর থেকে সে গুলি ছুঁড়ল। পর-পর পাঁচটা গুলি। একটা গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। দুটো গুলি বিদ্ধ করল লোম্যানকে আর তিনটে হজম করল হডসন। তারপর বিনয় পালাল। আত্মহত্যা করে গ্রেপ্তার এড়াবে তখনো সে সিদ্ধান্তের দরকার হয়নি।

কোত্থেকে হাসপাতালের এক কণ্ট্রাক্টর ছুটে এসে বিনয়ের হাত চেপে ধরল। বিনয় সবলে হাত ছাড়িয়ে নিল। হাত থেকে খসে পড়ল রিভলভার। তা যাক, জামার পকেটে আরো একটা আছে। খবরদার, আর এগিয়ে এস না। খবরদার। বিনয়ের সঙ্গে আছে দুজন সহচর। তারাই বুঝি দীনেশ আর সুধীর। আততায়ীদের ধরা গেল না। পুলিশের ক্রোধ ফেটে পড়ল ডাক্তারি হস্টেলের ছেলেদের উপর। যখন হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে এই দুষ্কাণ্ড ঘটেছে, তখন, সন্দেহ কী, সংলগ্ন হস্টেলবাসীরাই অপরাধী। তাদের উপরেই হামি হল পুলিশ। পিটিয়ে একান্ন জনকে ঘায়েল করে মিডফোর্ড হাসপাতালেই ভর্তি করালে।

লোম্যান আর হডসন— তারাও ঢুকেছে মিটফোর্ডে। দুজনের দেহেই অস্ত্রোপচার

হল। হডসন বেঁচে উঠলেও লোম্যান বাঁচল না। কিন্তু সেসব কথা আরো পরে।

'আচ্ছা আপনার তো বড় ঘরে জন্ম', মহারাজ জিজ্ঞেস করল সুভাষকে, 'ছেলেবেলা থেকে কত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেছেন, জেলের এত সব ক্লেশকষ্ট সহ্য করছেন কী ভাবে?'

'আপনারা যে ভাবে করছেন আমারও সেই ভাব। সবাই আমরা দেশের জন্যে।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু এত সব অখাদ্য খান কী করে? এতটুকুও আপত্তি করেন না!'

'বা, আপত্তি কিসের? আপনারা সবাই খেতে পারলে আমি পারব না কেন?'

আর জেলের চাকরবাকরদের প্রতি সুভাষের কী সস্নেহ ব্যবহার! কোনোদিন এসব দুর্বল নিরীহের প্রতি একটাও কটু কথা বেরুল না তার মুখ থেকে। কত সামান্যেই মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। একটি মধুর স্বর, একটি সস্নেহ হাসি, একটি সদয় করস্পর্শ! শুধু ব্রিটিশ-হৃদয়ই জয় করা গেল না। গান্ধীজিও সেই বিশ্বাস ছেড়ে দিলেন। ও তো শুধু শাসকের আহ্লাদেই ভরা নয়, শোষকের লুব্ধতায় ভরা। যতক্ষণ শোষণ থাকবে কে করবে অহিংসার ভজনা?

স্বয়ং গান্ধীই বলছেন, 'যে মুহূর্তে শোষণের ভাব চলে যাবে, সেই মুহূর্তেই অস্ত্রসজ্জা দুর্বহ ভার বলে মনে হবে। জাতিগুলি পরস্পরের শোষণে বিরত না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকারের নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব নয়।'

কয়েদিরা যখন ছাড়া পায়, প্রায়ই আসে সুভাষের কাছে জামা-কাপড় চাইতে। পারতপক্ষে কাউকে ফেরায় না সুভাষ, যা হাতের কাছে পায় দিয়ে দেয়। সব সময়েই কায়ে-মনে-প্রাণে একটি সেবার ভাব জাগিয়ে রাখে। যে সেবক হতে জানে না সে নেতা হবে কী করে?

টেনিস খেলতে গিয়ে মহারাজ পড়ে গিয়েছে, হাঁটুর চামড়া উঠে গিয়ে ঘা হয়ে গিয়েছে। নিম পাতা সেদ্ধ-করা জল দিয়ে সুভাষ রোজ নিজের হাতে সেই ঘা ধুয়ে দিচ্ছে, ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছে। কোন ঘরে কার অসুখ করেছে, খবর পেয়েই সুভাষ ছুটছে সেই ঘরে, বসছে তার শিয়রে। সারা রাত জেগে সেবা করছে। মহারাজ ভাবছে এই মহত্ত্ব আর মাধুর্যের উৎস কোথায়? কোথা থেকে আসে এই সুখে-দুঃখে নির্বিচল ভাব, এই সমপ্রাণতা? মাত্র দেশপ্রেমই কি এর সমগ্র রহস্য? না, এ রহস্য একটি ঠাকুর ঘর। জেলের প্রকোষ্ঠেই সুভাষ একটি ঠাকুর ঘর তৈরি করেছে। সেই ঠাকুর ঘরটিতে সে স্তব্ধ শান্ত হয়ে বসে আর ধ্যান করে। তার সমস্ত প্রাণশক্তিকে ঊর্ধ্বে কোন এক অধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে যুক্ত করে। সমস্ত শক্তির আধারই অধ্যাত্মশক্তি। সেই যোগায়, চালায়, পাইয়ে দেয়। সেই শক্তির থেকে বিযুক্ত থাকলে কোনো শক্তিই স্থায়ী হয় না। অধ্যাত্মশক্তিই অপরাভূয়।

এই মান্দালয় জেলেই লোকমান্য তিলক ছয় বছর কাটিয়ে গেছেন। ছয় বছর? হ্যাঁ, দীর্ঘ ছয় বছর। তাই জেল-জীবনে যখনই কোনো ক্লেশকষ্ট এসেছে, তখনই বন্দীরা ভেবেছে এরকম কষ্টক্লেশ তিলকও ভোগ করে গেছেন। এই উত্তরাধিকারের চেতনাও শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞায়।

তিলক নিজের হাতে একটি নেবুগাছ পুঁতে গিয়েছিলেন। দেখ সেই গাছে আজ ফল ধরেছে। তিলকের অধ্যাত্মশক্তির সাধনাও কি নিষ্ফল হবে?

সুভাষ বললে, আসুন এবার আমরা জেলের মধ্যে দুর্গাপূজা করি।

সকলে সমস্বরে আনন্দধ্বনিত হয়ে উঠল। দুর্গাপূজা। অশিবনাশিনী দুর্বৃত্তদমনীর উদ্বোধন।

জেল-সুপার মেজর ফিণ্ডলের কাছে রাজবন্দীরা আবেদন করল, আমাদের দুর্গাপূজা করতে দেওয়া হোক এবং পূজার ব্যয় বাবদ সঙ্গত টাকা মঞ্জুর করা হোক। ফিণ্ডলে বিচার করে দেখল এ আবেদনে অন্যায় কিছু নেই, অন্তত রাজদ্রোহ নেই। অ ছাড়া ভারতীয় জেলখানায় খ্রীস্টান কয়েদীদের ধর্মাচরণ করবার সুবিধে দেওয়া হয়, সুতরাং হিন্দু বন্দীদের বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু চূড়ান্ত অনুমতিদানের কর্তা তো সে নয়, কর্তা স্বয়ং গভর্নমেণ্ট। সুতরাং গভর্নমেণ্টের চূড়ান্ত অনুমতির সাপেক্ষে ফিণ্ডলে মঞ্জুর করলে। বন্দীরা আয়োজন লেগে গেল।

গভর্নমেণ্ট আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে। উলটে ভর্ৎসনা করলে ফিণ্ডলেকে। একটা যুদ্ধফেরত মেজর, তার মধ্যে এই কোমলতা কেন? আয়োজন থামিয়ে বন্দীরা গভর্নমেণ্টকে জানিয়ে দিলে তাদের পূজার আবেদন গ্রাহ্য না হলে তারা অনশন করতে বাধ্য হবে। করো গে—এমনি একটা বর্বর ভঙ্গি দেখিয়ে গভর্নমেণ্ট অনশনের হুমকিকেও অগ্রাহ্য করে দিল। বেশ। সুরু হল অনশন। অনশন সুরু হতে না হতেই বন্দীদের পত্রব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হল। বাইরের জগতের সঙ্গে থাকল না কোনো যোগাযোগ। অনশন করে আছ এ খবরটাও বাইরে কাউকে জানাতে পারবে না। শুধু খাদ্যের অনশন নয়, চিত্তেরও অনশন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, তিন দিন পরেই ফরোয়ার্ডে অনশনের খবর প্রকাশিত হয়ে গেল। কী করে খবর পেল ফরোয়ার্ড? গভর্নমেণ্ট হকচাকিয়ে গেল। তাদের এত কঠিন গূঢ়চারিতার জাল কে ছিন্ন করল? কারণ শুধু অনুমানই করা যায়, আর অনুমানকে প্রমাণের পর্যায়ে নিয়ে এসেই বা লাভ কি? থলের থেকে বেরাল তো বেরিয়েই পড়েছে। আরো একটা খবর বেরিয়েছে—সেটা বুঝি আরো মারাত্মক। ভারতীয় জেল-সংস্কার সম্পর্কে একটা কমিটি বসেছিল। তাতে জেলের ডাক্তার লেফটেনেণ্ট কর্নেল মুলভেনি সাক্ষ্য দিয়েছে। আশ্চর্য সত্যবাদী সাক্ষী। বলেছে, কোনো কোনো রাজবন্দীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দিয়েছি আই-জির অনুরোধে সে রিপোর্ট প্রত্যাহার করে পরিবর্তে আমাকে মিথ্যে রিপোর্ট দিতে হয়েছে। ইঙ্গিতটা কী? ইঙ্গিত দিনের আলোর মত স্পষ্ট। রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া সত্ত্বেও মুলভেনিকে ভালো বলতে হয়েছে। এ খবরটাও বের করল ফরোয়ার্ড। দেশের লোক খেপে গেল। আই-জির অপসারণ চাই। কিন্তু গভর্নমেণ্ট কি কখনো দেশের কথায় কান দেয়?

দিল্লীতে তখন এসেম্বলি চলেছে। স্বরাজী তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করল। মান্দালয় জেলে রাজবন্দীদের অনশনের জন্যে আর ঐ মুলভেনির রোমাঞ্চকর সাক্ষ্যের জন্যে। তুলসীচন্দ্রের বক্তৃতা যেমন শালীন তেমনি শাণিত। গভর্নমেণ্ট দন্তস্ফুট করতে পারল না। রাজবন্দীদের পূজার দাবি মেনে নিল। পনেরো দিন পর অনশন ভঙ্গ করল বন্দীরা।

অনশনের আগে সুভাষ এই মর্মে লিখেছিল বাসন্তী দেবীকে: 'মা, আজ মহাষ্টমী। আজ বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এ বছর এখানেই শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করছি। মা বোধ হয় আমাদের কথা ভোলেননি তাই এখানে এসেও তাঁর পূজার্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে নির্জীবতার মধ্যে পূজার আলো, পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। এই ভাবে ক বছর কাটবে জানি না। তবে মা যদি বৎসরান্তে এসে একবার দেখা দিয়ে যান তবে কারাবাস দুর্বিষহ হবে না আশা করি।

অনশন ও অনশনভঙ্গের পর সুভাষ এই মর্মে লিখছে দেশসেবক অনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে:

'আপনি বোধহয় শুনেছেন যে আমাদের অনশনব্রত একেবারে নিষ্ফল হয়নি। গভর্নমেণ্ট আমাদের ধর্মবিষয়ে দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং এর পর বাংলা দেশের রাজবন্দী পূজার খরচা বাবদ বছরে তিরিশ টাকা 'এলাউয়েন্স' পাবে। তিরিশ টাকা অতি সামান্য এবং এতে আমাদের খরচ কুলোবে না তবে যে প্রিন্সিপল গভর্নমেণ্ট এতদিন স্বীকার করতে চায়নি তা যে এখন মেনে নিয়েছে এই আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ। টাকার কথা সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে অতি তুচ্ছ কথা।

অনশনব্রতের সবচেয়ে বড় লাভ অন্তরের বিকাশ ও আনন্দলাভ। দাবিপূরণের কথা বাইরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। 'সাফারিং' ছাড়া মানুষ কখনো নিজের অন্তরের আদর্শের সঙ্গে অভিন্নতা বোধ করতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়লে মানুষ কখনো স্থির নিশ্চিন্ত ভাবে বলতে পারে না তার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরো ভালো ভাবে চিনতে পেরেছি এবং নিজের উপরে আমার বিশ্বাস শতগুণে বেড়ে গেছে।'

'বিশ্বজননীতে বিশ্বাস ও ভরসা রেখো', এই মর্মে লিখছে হরিহরণ বাগচিকে: 'তুমি তাঁর কৃপায় সমস্ত বিপদ ও মোহ উত্তীর্ণ হতে পারবে। মনের মধ্যে সুখ ও শান্তি না থাকলে কোনো অবস্থায়—বাইরের অভাব দূর হলেও, মানুষ সুখী হতে পারে না। সুতরাং সকল কর্তব্য করার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বজননীর চরণে হৃদয় নিবেদন করা চাই।'

অভয়ার সন্তান বিবেকানন্দ। অভয়ার সন্তান অরবিন্দ। অভয়ার সন্তান সুভাষ।

এগারো

উনিশশো পঁচিশ সালের নয়ুই অগাস্ট। অহিংসা দিয়ে কিছু হবে না—বিপ্লবীরা পারল না নিষ্ক্রিয় থাকতে। রাতের ট্রেন কাকোরি ছেড়ে লখনৌর দিকে চলেছে, চারজন যুবক গার্ডের ব্রেকভ্যানে উঠে পড়ল। গার্ডকে বললে, তাড়াতাড়িতে ওদের মালপত্র তুলতে পারেনি, ট্রেনটা থামানো হোক। গার্ড অস্বীকার করল। এই কথা! মুহূর্তে দুজন দুটো রিভলভার ওঁচাল—ওঁচাতেই গার্ড কেঁচো হয়ে গেল। একজন দিল চেন টেনে। আর ট্রেন থামতেই কম-সে-কম ষোলজন লোক ব্রেকভ্যানে উঠে পড়ল। গার্ডের সিন্দুক সরিয়ে নিয়ে গেল ধরাধরি করে। একজন গুর্খা যাত্রী তার রাইফেল তুলতেই বিপ্লবীদের গুলিতে খুন হয়ে গেল। কে আরেকজন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচাতে গিয়েছিল, তাকেও স্তব্ধ করা হল। আর কোন এক সাহেব সাহস করে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল

বন্দুক নিয়ে, সেও খোঁড়া হয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে। স্টেশনের থেকে খুব বেশি দূরে নয়, একটা ঝোপের মধ্যে পুলিশ পেল সেই সিন্দুকগুলোকে, কিন্তু হায়, সবগুলোই লুণ্ঠিত, বলা যায় অন্তঃসারশূন্য। বিপ্লবীদের ধরতে ধরতে সেপ্টেম্বর। আর মামলা সাজাতে-সাজাতে ডিসেম্বরের শেষ। আসামীর খাঁচায় ঢোকানো হল পঁচিশ জনকে। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য তিনজন—রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ি, রামপ্রসাদ বিসমিল আর ঠাকুর রৌশন সিং। চতুর্থ আরেক জন ছিল, নাম আশফাকউল্লা—সম্প্রতি পলাতক।

রাজেনের পরনে মুসলমানী পোশাক, ডাক-নাম নবাব। আশফাকউল্লার পরনে হিন্দু পোশাক, ডাক-নাম কুঁয়রজি। রামপ্রসাদ আর রৌশন কখনো হিন্দু কখনো মুসলমান, কখনো শিখ কখনো কাশ্মিরি।

দায়রার বিচার শেষ হতে-হতে পরের বছর এপ্রিল। বিচারে রাজেন, রৌশন আর রামপ্রসাদের ফাঁসির হুকুম হল। ইতিমধ্যে আশফাকউল্লাও ধরা পড়েছে, আলাদা বিচারে তার সম্পর্কেও সেই একই আদেশ হল। রাজেনকে নিয়ে যাওয়া হল গোণ্ডা জেলে রামপ্রসাদকে গোরক্ষপুর জেলে, রৌশনকে এলাহাবাদ জেলে আর আশফাকউল্লাকে ফয়জাবাদ জেলে। সবাই প্রিভিকাউন্সিলে আলাদা-আলাদা আপিল করলে। সবগুলিই পত্রপাঠ বাতিল হয়ে গেল। নিয়মরক্ষার জন্যে বড়লাটের কাছে করুণা প্রার্থনা করা হল, তাও বিনা বিবেচনায় প্রত্যাখ্যাত হতে সময় নিল না।

রাজেনের ভাই গোণ্ডা জেলে এসেছিল শেষ দেখা দেখে যেতে। কাল ভোরে ফাঁসি হবে তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই রাজেনের। সেলে বসে ভজন গাইছে, গীতা আওড়াচ্ছে। ভাইকে দেখে বললে, 'বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার জন্যে প্রার্থনা করিস। কী প্রার্থনা? আমার মুক্তির জন্যে নয়, দেশের মুক্তির জন্যে। প্রার্থনা করিস আমি যেন আবার আমার-ভারতবর্ষে এসে জন্মাই, আর আবার তার কল্যাণের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করি।

রামপ্রসাদের সঙ্গে তার বাবা-মা দেখা করতে এসেছে। সুস্থসমর্থ জোয়ান ছেলে কয়েক ঘণ্টা পরেই পৃথিবী থেকে অপসৃত হয়ে যাবে—দুঃখিনী মার না জানি কী ভীষণ লাগবে, সেই অনুভবে কেঁদে ফেলল রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদের মা থমকে গেল। বললে, 'তুমি কাঁদবে এ আমি দেখতে আসিনি।'

রামপ্রসাদ সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

'আমি ভেবেছিলাম, তুমি দেশের জন্যে প্রাণ দিচ্ছ, তোমার চোখমুখ না জানি আনন্দে কত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'কই আমি কাঁদিনি তো।' রামপ্রসাদ দু হাতে দু চোখ মুছে ফেলল। জলের লেশমাত্র না রেখে দু চোখে জ্বালল দুটি আনন্দের প্রদীপ।

কিন্তু বুড়ো বাপ যে কেঁদে আকুল। তখন রামপ্রসাদই বাপকে সান্ত্বনা দিল। বললে, 'মাকে দেখ। মা কেমন ছেলের গৌরবে শোক ভুলেছে। বাবা, তুমিও মার মতো শক্ত হও, আমাকে বুঝতে দাও আমি তোমার যোগ্য উত্তরাধিকারী।'

রৌশনের সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনি। তার মুখে শুধু এক মন্ত্র—বন্দেমাতরম্। যখন ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে উঠছে—বন্দেমাতরম। যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে—তখনো বন্দেমাতরম।

আশফাকউল্লার ওজন বেড়ে গিয়েছে।

'ওজনবৃদ্ধিতে আপনি সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছেন,' বললে জেলর, 'শুধু একজন ছাড়া।'

'তার মানে জেলে ওজনবৃদ্ধির ইতিহাসে আমি দ্বিতীয়, প্রথম নই?'

'না, আরেকজনের নাম পাচ্ছি, তার ওজন বেড়েছিল আপনারো চেয়ে ছ পাউণ্ড বেশি।'

আশফাকউল্লা ম্লান হয়ে গেল, বললে, 'ত হলে জেলে বি-ক্লাশে আমাকে আরো ক দিন রাখুন দয়া করে। ফাঁসি তো দেবেনই, তা কে আর রুখতে যাচ্ছে? আর সামান্য কটা দিন বেঁচে যেতে পারলে উচ্চতম রেকর্ডটা ভেঙে দিতে পারি।'

'তা হয় না। ফাঁসির হুকুম হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনাকে কনডেমড সেলে চলে যেতে হবে।' জেলর কী করবে, ফাঁসির প্রতীক্ষা-করা আসামীর আর কোনো ক্লাশ নেই।

'মৃত্যুর জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু হায়, ওজনবৃদ্ধির রেকর্ডটা ভাঙতে পারলাম না।'

আত্মীয়স্বজন যারা দেখা করতে এসেছিল তাদেরকে বললে, 'আনন্দ করো, উৎসব করো, আমিই বোধহয় প্রথম মুসলমান যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিল।'

এত সব প্রাণোৎসর্গের প্রদীপ্তি হিন্দু-মুসলমানের আত্মহননের কালিমায় ম্লান হয়ে গেল। উনিশশো ছাব্বিশের এপ্রিলে কলকাতায় দারুণ দাঙ্গা বাধল—মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে। দিল্লিতে আবদুল রসিদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে গুলি করে মারলে। শ্রদ্ধানন্দ তখন অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে ছিলেন। কে একজন স্লিপ পাঠাল, জরুরি প্রয়োজন দেখা করতে চাই। কিছুমাত্র সন্দেহ না করে শ্রদ্ধানন্দ তাকে আসতে বললেন, বলুন কী বক্তব্য। আবদুল রসিদ পিস্তলের গুলিতে তার বক্তব্য বললে।

গৌহাটিতে কংগ্রেস বসেছে, সভাপতি শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারকে নিয়ে হাতির শোভাযাত্রা বেরুবে এমন সময় শ্রদ্ধানন্দের হত্যার খবর এসে পৌঁছুল। হাতির দলকে খেদিয়ে দেওয়া হল, সমস্ত গৌহাটি—শুধু গৌহাটি নয়, সমগ্র দেশ শোকাভিভূত হয়ে পড়ল। শ্রদ্ধানন্দের উপর শোকপ্রস্তাবটা মহাত্মা গান্ধীই পেশ করলেন আর তা সমর্থন করল মহম্মদ আলি।

গান্ধী বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আবার বলছি, আবদুল রসিদ আমার ভাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে গুলি করলেও আসলে সে তার হত্যাকারী নয়। হত্যাকারী হচ্ছে তারা যারা হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমান ও মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে উত্তেজিত করছে।'

কিন্তু বিপ্লবীদের রণকৌশল অন্যরকম। সেখানে হিন্দু-মুসলমান নেই, শুধু মুক্তিকামী আর মুক্তিরোধীর দল। সেখানে কোনো ভাগবাঁটোয়ারার প্রশ্ন নেই, সেখানে শুধু সর্বকালের সর্বজনের স্বাধীনতা।

কাকোরি ডাকাতি সম্পর্কে তল্লাসি চালাতে গিয়ে পুলিশ এল দক্ষিণেশ্বরে, বাচস্পতিপাড়া লেনে। পুকুরপাড়ে একটা জীর্ণ দোতলা বাড়িতে গিয়ে হানা দিল। বাড়িতে ঢুকে দেখে এ যে দেখি রীতিমত একটা কারখানা। বারুদ, গুলি, ছররা, বোতলভর্তি নাইট্রিক আর

সালফিউরিক এসিড, কাঁচের নল, ব্যাটারি—কিছুরই তো অভাব নেই! আরে এ যে দেখি ছ-ঘরি ওয়েলবি রিভলভার, আর এ যে একটা জ্যান্ত বোমা।

ধরা পড়ল অনন্তহরি মিত্র, বীরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জি, নিখিলবন্ধু ব্যানার্জি, হরিনারায়ণ চন্দ্র ও আরো কজন। সেখান থেকে পুলিশ গেল চার নম্বর শোভাবাজার স্ট্রিটে। সেখানেও পাওয়া গেল অনেক কার্তুজ আর বেলজিয়ামের তৈরি পাঁচ ঘরি রিভলভার। সে বাড়িতে ধরা পড়ল প্রমোদরঞ্জন চৌধুরি আর অনন্ত চক্রবর্তী। সূর্য সেনও ছিল, কিন্তু পুলিশ বাড়িতে চড়াও হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে যথারীতি হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে অনন্তহরি মিত্রের দশ বছর জেল হল আর সকলের ভিন্ন-ভিন্ন মেয়াদে। আলাদা বিচারে প্রমোদ চৌধুরির জেল হল পাঁচ বছর। এ হল অবতরণিকা। এবার আসল নাটক।

ধরপাকড় হল বিচার হল শাস্তি হল—শুধু এতেই পুলিশের তৃপ্তি নেই। তাদের তৃপ্তি যদি কোনো স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারে, যদি কাউকে দাঁড় করাতে পারে রাজসাক্ষী করে। কিন্তু এ সব আসামী ফাঁসি যাবে তবু কিছু ফাঁস করবে না।

আই-বির জাঁদরেল অফিসর রায়বাহাদুর ভূপেন চাটুজ্জে কয়েদিদের গা শুঁকে শুঁকে বেড়ায় যদি এখনো কোনো গোপন সংবাদ বার করতে পারে। তোমরা গেছই, তোমাদের তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কিন্তু আমাকে যদি কিছু খবরাখবর দিতে পারো, আমার চাকরিতে উন্নতি হয়, আমার সামনে এখনো বিপুল ভবিষ্যৎ।

জেলখানার মধ্যে স্টেট ইয়ার্ডে রোজ আসে ভূপেন, আর কয়েদিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে ছাড়ে। নানা প্রলোভনের জাল পাতে, নানা ভাবে আলাপ-আলোচনায় বিস্তারিত হতে চায়। কয়েদিরা ভাবে একে একেবারে খতম না করতে পারলে শান্তি নেই, কিন্তু জোঁক ছাড়াবার মত পর্যাপ্ত নুন কই? কয়েদিদের একজন বললে, যদি বোঝো একেবারে শেষ করে দিতে পারবে তাহলে এগোও, নচেৎ আধমরা করে ছেড়ে দিলে ওরো যন্ত্রণা, আমাদেরো যন্ত্রণা।

ভূপেন স্টেট ইয়ার্ডে ঢুকেছে, দোতলার সেল থেকে নিখিল ব্যানার্জি ওয়ার্ডারকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, শিগগির দরজা খুলে দাও, আমার ধুতিটা নিচে উঠোনে পড়ে গিয়েছে। সরল বিশ্বাসে ওয়ার্ডার দরজা খুলে দিল। ধুতি কুড়িয়ে আনতে নিচে ছুটল নিখিল। নিচে পৌঁছেই ভূপেনের সামনে পড়ে গেল, আর বলে উঠল, 'নমস্কার।'

প্রত্যভিবাদনের জন্যে যেই ভূপেন দুহাত তুলেছে অমনি নিখিল তার মুখের উপর মারল এক প্রচণ্ড ঘুষি আর সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে তার মাথায় প্রমোদ মারল এক শাবলের ঘা। সেই এক ঘায়েই শেষ হয়ে গেল।

সেপাইটা এদিকে ঝুঁকেছিল কিন্তু প্রমোদ শাবল নিয়ে তাড়া করতেই সে ছুট দিল। তার হাত থেকে বেটনটা কেড়ে নিল অনন্তহরি। শাবলটা কোত্থেকে জোগাড় হয়েছিল ভূপেনের সাঙ্গোপাঙ্গোরা হদিস করতে পারল না। ওজন নিয়ে দেখা গেল পনেরো সের। লম্বায় বেশি নয়, মাত্র দেড় হাত।

ভূপেনের হত্যার জন্যে নতুন করে মামলা বসল। নিদারুণ মামলা। জেলের মধ্যে খুন, তাও কিনা পুলিশের বড় কর্তাকে। এ যে নতুন করে সেই কানাইলালের কীর্তি।

এ মামলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী মোটে দুজন। এক, ওয়ার্ডার, দুই, এক যাবজ্জীবনের কয়েদি, খুন-সহ ডাকাতি মামলার আসামী, নাম মতি। কিন্তু যাই বলো, মতি সাক্ষী হতে রাজি নয়। স্বদেশী বাবুদের সে দেবতা বলে ভক্তি করে, তাদের সে কিছুতে ফাঁসাতে পারবে না। আমি তো যাবজ্জীবনের জন্যেই দাগামারা, আমার আবার আশাভরসা কী। আমাকে মিছিমিছি প্রলোভন দেখাচ্ছ, আমি বাবুদের কাউকে সনাক্ত করতে পারব না। না, পারব না সাক্ষ্য দিতে। আমি কিছু দেখিনি।

এমন জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে বাইরে থেকে দেখা সম্ভব নয়। তবু ব্রিটিশের পুলিশের অসাধ্য কিছু নেই। গোটা কয় অ্যাংলোইণ্ডিয়ান কয়েদি সাক্ষী জোগাড় হল। তারা নয়কে হয় করে দিল। হ্যাঁ, স্যার, দেখেছি, স্বচক্ষে দেখেছি। সে কী মার! মাথার খুলি চৌচির হয়ে গেল, একটা চোখ বেরিয়ে গেল ছিটকে। মিথ্যা সাক্ষী না সাজিয়ে পুলিশের উপায় কী। কয়েদিদের কেউ স্বীকারোক্তি করবে না, কেউ রাজসাক্ষী হবে না, না, কেউ দন্তস্ফুট করবে না। যা করতে হয় তোমরা করো। যেমন তোমাদের অভিরুচি। পুলিশ তাই একরাশ মিথ্যা জড়ো করল। বিচারে প্রমোদ আর অনন্তহরির ফাঁসি হল। অনন্ত চক্রবর্তী, ধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায় ও রাখালের দ্বীপান্তর। বীরেনের ফাঁসির হুকুম হলেও আপিলে ছাড়া পেল। নিখিলও বেকসুর খালাস।

অনন্তহরি আর প্রমোদের শেষ ইচ্ছা ছিল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে তাদের ফাঁসি হয়। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়, জেলকোডে তার বিধান নেই। তখন দু বন্ধুর মধ্যে প্রার্থনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হল—আমার ফাঁসিটা আগে হোক, আমার ফাঁসিটা আগে। এ যেন মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের ক্রিকেট খেলা দেখার জন্যে টিকিটের প্রার্থনা।

সমস্ত পর্বটা সুভাষ মান্দালয়ে। তাকে বাইরে নিয়ে আসার পথ কোথায়?

বাংলার কংগ্রেস একটা পথ বার করল। নভেম্বরে নতুন ইলেকশান হচ্ছে, সত্যেন মিত্র আর সুভাষকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাও। সত্যেনকে ভারতীয় এসেম্বলিতে, দিল্লিতে, আর সুভাষকে বঙ্গীয় কাউন্সিলে, কলকাতায়। দুজনেই রাজি হল প্রস্তাবে। সত্যেনের বিরুদ্ধে কেউ লড়তে এল না, কিন্তু সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড়াল জে. এন. বসু। দাঁড়ালে কী হবে, বিপুল ভোটাধিক্যে সুভাষ জয়ী হল।

তার মানে দেশবাসী নির্ভুল উচ্চকণ্ঠে জানাল, সুভাষকে আমরা আমাদের প্রতিনিধিরূপে চাই। সে যখন জিতেছে তখন তাকে বাইরে আসতে দেওয়া হোক। সে তো বিনাবিচারে বন্দী। দেশের লোকের বিচারে সে তো জয়ী, সে তো বরবরেণ্য। তার আর এখন জেলে থাকা চলে কী করে? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বয়ে গিয়েছে দেশবাসীর কথা শোনে! কিন্তু শীতের দিকে সুভাষের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ল। নিমোনিয়া সেরে গেলেও ঘুষঘুষে জ্বর আর যেতে চাইল না। ওজনও কমতে লাগল।

রেঙ্গুনে মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হতে হল সুভাষকে। বোর্ড সুপারিশ করল, বন্দীকে জেলের মধ্যে রাখাটা স্বাস্থ্যসম্মত হবে না। গভর্নমেণ্টের থেকে নিশ্চয়ই একটা অনুকূল আদেশ আসবে, তারই প্রতীক্ষা করছে সুভাষ, নতুন জেল-সুপারের সঙ্গে তার একটা বচসা হয়ে গেল। ফলে সুভাষকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ইনসিন জেলে। নতুন জেল-সুপারের নাম ফ্লাওয়ারডিউ, কিন্তু সে আসলে না ফুল না শিশির।

'তোমার চেহারা কী ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে!' ব্যথিত বিস্ময়ে ইনসিনের জেল-সুপার বলে উঠল: 'তবু তোমাকে এরা ছাড়েনি?'

সুভাষ তাকিয়ে দেখল এ সেই মেজর ফিণ্ডলে!

'দেখ তুমি ছাড়াতে পারো কিনা।'

ফিণ্ডলে জোর-কলমে লিখল গভর্নমেণ্টকে। বন্দীর স্বাস্থ্যের যা অবস্থা তাকে জেলের মধ্যে পুরে রাখাটা বাঞ্ছনীয় হবে না।

গভর্নমেণ্ট লিখলে, বন্দীকে জিজ্ঞেস করে জানাও সে নিজের খরচে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে রাজি আছে কিনা। যদি রাজি থাকে, তবেব যাবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাকে যেতে হবে রেঙ্গুন থেকে জাহাজ ধরে, অন্য কোনো বন্দর থেকে নয়, না, কলকাতা তো নয়ই।

ও সব সর্তে বদ্ধ হয়ে যাব না। তা ছাড়া যাবার আগে কলকাতা দেখব না, আত্মীয়বন্ধুদের দেখব না, এ হয় কী করে? তারপরে কত দিন থাকতে হবে বিদেশে তারও ঠিকঠিকানা নেই। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল সুভাষ।

তারপর আদেশ এল, বন্দীকে আলমোরায় স্থানান্তরিত করো। চুপিচুপি স্থানান্তর করার ব্যবস্থা হল। রেঙ্গুন থেকে জাহাজে চড়িয়ে সুভাষকে নিয়ে আসা হল ডায়মণ্ডহারবার। কলকাতা পৌঁছুবার আগেই জাহাজে লোম্যান এসে আবির্ভূত হল। বললে, 'তোমাকে এখানে নামতে হবে।'

সুভাষ ভাবল লোম্যান বুঝি তাকে লুকিয়ে পাচার করে দেবার মতলবেই জাহাজে উঠেছে। 'না, আমি এখানে নামব কেন? কোথায় নামব?'

লোম্যান হাসল। বললে, 'তোমার জন্যে গভর্নর লঞ্চ পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই লঞ্চে নামবে।'

'বা, লঞ্চে নামব কেন?'

'সেই লঞ্চে মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তারেরা আছেন। তাঁরা তোমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গভর্নরের কাছে রিপোর্ট করবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে হয় আলমোরা নয় বাড়িফেরা।'

'বোর্ডের ডাক্তার কারা?'

'স্যার নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, লেফটেনেণ্ট কর্নেল স্যাণ্ডস আর মেজর হিংসটন।'

তখন সুভাষ আশ্বস্ত হয়ে নামল জাহাজ থেকে। বোর্ড পরীক্ষা করে তার সিদ্ধান্ত গভর্নরকে টেলিগ্রাম করে দার্জিলিংঙে পাঠিয়ে দিল। উত্তরের জন্যে এক দিন গভর্নরের লঞ্চে অপেক্ষা করল সুভাষ। পরদিন ১৯২৭-এর ১৬ই মে লোম্যান গভর্নরের উত্তর নিয়ে এল: তুমি খালাস্।

কী রকম যেন একটু নতুন-নতুন লাগছে না? তা লাগছে। গভর্নরের বদল হয়েছে যে ইতিমধ্যে। এখন আর লর্ড লিটন নেই, এখন স্ট্যানলি জ্যাকসন। এতদিন পুলিশ কমিশনারই বাংলার লাট ছিল, জ্যাকসন বললে, এখন থেকে আমিই শাসন করব ভাবছি। এই জ্যাকসনকে লক্ষ্য করেই কলকাতা সেনেট হলে গুলি ছুঁড়ল বীণা

দাস—সুভাষের হেডমাস্টার বেণীমাধব দাসের মেয়ে। গুলি ছোড়া জ্যাকসনকে নয়, ব্রিটিশ শাসনের দম্ভকে, নির্যাতনকে, নিষ্ঠুরতাকে। গুলি লাগল কি না লাগল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা গুলিটা যে ছুঁড়েছিল, ছুঁড়তে পেরেছিল। বড় কথা হচ্ছে একটি স্বদেশব্রতধারিণী বাঙালি মেয়ে যে তীব্রভাবে অনুভব করেছিল দাসত্বের যন্ত্রণা, চেয়েছিল অগ্নির অক্ষরে তার হাহাকারকে মূর্ত করতে। বড় কথা হচ্ছে তার দুঃসাহসী উৎসাহ, বড় কথা হচ্ছে তার দৃপ্ততার দীপ্তি।

'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটিকা।
ধূ ধূ জ্বলে ওঠে ধূমায়িত অগ্নি
জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নি!
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গস্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদদলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা
চিরবিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা॥'

ড্যালহৌসি স্কোয়ারের রাস্তায় টেগার্টকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়েছিল, এবারও সে বোমা ভ্রষ্ট হল, বিদীর্ণ হল ভয়াবহ ব্যর্থতায়। টেগার্টকে একটি ফুলকিও স্পর্শ করল না, মাঝখান থেকে নিজের হাতে বোমা ফাটিয়ে মারা পড়ল অনুজা সেন আর ধরা পড়ল দীনেশ মজুমদার। দীনেশ অবশ্য পরে পালিয়ে গিয়েছিল জেল থেকে, কিন্তু সে কথা পরে।

বীণা তার বিপ্লবী দলের এক বন্ধুকে বললে, 'আমাকে একটা রিভলভার জোগাড় করে দিতে পারো?'

'পারি। কী করবে?'

'দেখিনা কী করতে পারি।'

মান্দালয় জেল থেকে বেরিয়ে এসে সুভাষ তার মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছে।

'ওমা, আমার এত ভাগ্য!' পাশের ঘর থেকে আনন্দে বলে উঠলেন বীণার মা।

কথায়-কথায় বীণা সুভাষচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার মতে দেশ কী ভাবে স্বাধীন হবে, হিংসার পথে না অহিংসার পথে?

সুভাষ বললে, 'আসল কতা হচ্ছে একটা কিছু পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠতে হয়। স্বাধীনতার জন্যে আমাদেরও সারা দেশটাকে তেমনি পাগল করে তুলতে হবে। তখন হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন আর বড় হয়ে উঠবে না।'

'শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে

অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।'

কিন্তু রিভলবার হাতে নিলেই কি ছুঁড়তে পারবে টিপ করে? বীণা জিজ্ঞেস করলে বন্ধুকে, 'একবারটি প্র্যাকটিস করে নিলে ভালো হত না?'

কোথায় যাবে প্র্যাকটিস করতে, কোন নির্জনে? তার আর সময়ই বা কোথায়? দুদিন পরে কনভোকেশন। গভর্নর আসবে ভাষণ দিতে।

'প্র্যাকটিস লাগবে না।' বন্ধু আশ্বাস দিল: 'বিনয় বোসও প্র্যাকটিস না করেই পেরেছিল মারতে।'

বীণা সেনেট হলে ঢুকবে কোন অধিকারে? সে স্নাতক। সে যাবে তার বি-এর ডিপ্লোমা আনতে। প্রথম সারির ছাত্রীদের মধ্যে সে আসন নেবে।

জ্যাকসন লিখিত ভাষণ পড়ছে, তার চোখ হাতে-ধরা কাগজের উপর ন্যস্ত, সমস্ত ভক্ত জনমণ্ডলী শ্রবণতন্ময়। বীণা আস্তে-আস্তে সরতে-সরতে মঞ্চের বেশ খানিকটা কাছে এসে দাঁড়াল। একটা তীক্ষ্ণতম তুঙ্গতম মুহূর্ত। বীণা হাতে-ধরা পাঁচ-ঘরা রিভলভার থেকে জ্যাকসনের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল। গুলি জ্যাকসনের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। একচুলের জন্যে বেঁচে গেল জ্যাকসন। আর বীণা? সে বাঁচবার, পালিয়ে যাবার পথ তৈরি করে আসেনি। সে জেনে-শুনে ঝড়ের মধ্যে পড়ে জীবনকে আস্বাদ করতে এসেছে—হ্যাঁ সে ডুবে যেতেও প্রস্তুত।

'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
টুকরো করে কাছি
ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি।
ঝড়কে আমি করব মিতে
ডরব না তার ভ্রূকুটিতে
দাও ছেড়ে দাও ওগো আমি
তুফান পেলে বাঁচি।।'

ভাইস-চ্যান্সেলার কর্নেল শারওয়ার্দি বীণার গলা টিপে ধরল। তার হাত থেকে গুলি চলল এলোমেলো কিন্তু কেউই মারাত্মক আহত হল না। তারপর বিদ্যুৎব্রততী নম্রতায় স্নিগ্ধকান্ত হয়ে দাঁড়াল। দেশপ্রেমের উচ্ছ্বলিত প্রতিচ্ছবি।

ধরা পড়ার পর বীণাকে আই-বি অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। বেণীমাধব এলেন দেখা করতে।

আই-বি অফিসর বেণীমাধবকে বললে, 'ওকে শুধু রিভলভারের সিক্রেটটা বলে দিতে বলুন, তাহলেই ওকে আমরা ছেড়ে দেব।'

বীণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: 'আমার বাবাকে আপনারা চেনেন না। আমার বাবা তাঁর মেয়েকে কখনো বিশ্বাসঘাতক হতে শেখান না।'

কন্যাস্নেহে বাবা কাঁদছেন, মা কাঁদছেন, কন্যার মনও না কোন দ্রবীভূত হয়েছে,

তবু কন্যার যা কাজ তাই সে সারা জীবন ধরে সম্পন্ন করে যাবে, আ তার 'সর্বাধিক লাজ' হয়েও 'সর্বোত্তম গর্ব' হয়ে থাকবে।

জেল থেকে মা-বাবাকে কবিতায় চিঠি লিখল বীণা:

'মোরে ডাকিও না হেথা একা রব পড়ি
দুটি ক্ষীণ হস্তে মোর আঁকড়িয়া ধরি
সর্বোত্তম গর্ব মোর সর্বাধিক লাজ
মোর সারা জীবনের কাজ।'

ভুলই তো জীবনে ফুল ফোটায়। ভুল আর সত্য তো এক পথেরই সহচর। ভুলকে ঠেকাতে গেলে যে সত্যকেও ঠেকানো হবে। 'ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মরো ফিরে।' সত্য হোক, ভুল হোক, আসল কথা হচ্ছে অপরিমাণরূপে বাঁচো। ভুলের দুঃখের মধ্যেই সত্যের আনন্দ-জাগরণ। ভুলের উপলখণ্ডের উপর দিয়েই বয়ে চলেছে সত্যের ধীরস্রোত।

বারো

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের শুধু টালবাহানা, শুধু কালক্ষয়। ভারতবর্ষের ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষা ডোমিনিয়ন স্টেটাসটুকুও যাতে দিতে না হয় তার জন্যে যতদূর সাধ্য ঠেকিয়ে রাখা। সেই উদ্দেশ্যে উনিশশো সাতাশের নভেম্বরে সাইমন কমিশনের ঘোষণা করল পার্লামেণ্ট।

মহাত্মা গান্ধী তখন মাঙ্গালোরে, দিল্লির থেকে হাজার মাইল দূরে। বড় লাট লর্ড আরউইন তাঁকে জরুরি নিমন্ত্রণ পাঠাল। শিগগির আসুন, সুখবর আছে। মহাত্মা তাঁর ভ্রমণপঞ্জি বাতিল করে দিয়ে দিল্লি ছুটলেন। কী সুখবর? আরউইন সাইমন-কমিশনের নিয়োগপত্রটা দেখাল।

'শুধু এই? এর জন্যে ডাকা?' মহাত্মা নির্মম উদাসীন হয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ, আমি কী করব, আমি শুধু আমার কর্তব্য করছি।'

আরউইনের কর্তব্য সাইমন কমিশনের পক্ষে ভারতীয় নেতাদের সহানুভূতি সংগ্রহ করা। মহাত্মা বিনীত স্বরে বললেন, 'এ তো এক-আনার খামেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। মাঙ্গালোর থেকে ডেকে আনবার প্রয়োজন ছিল না।'

আরউইন বুঝল ভারতীয় নেতাদের সমর্থন পাওয়া সুদূরপরাহত। শুধু কংগ্রেস নয় ভারতবর্ষের সমগ্র জনসাধারণ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। যে ভারতবর্ষের এখন স্বাধীনতার ক্ষুধা, তাকে কিনা বলা হচ্ছে কী খাদ্যের তুমি উপযুক্ত, দেখি বিশদ বিচার করে। এখনো কিনা উপযুক্ততার বিচার! আর বিচারমণ্ডলীর মধ্যে একজনও ভারতীয় নয়। এ আঘাতের উপর আবার অপমান। পোড়ার উপর পোড়া, এ অপমান অসহ্য।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ হল, সাইমন কমিশন বয়কট করো। অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলও একই ধুয়ো তুলল, বয়কট করো। শুধু আনসারি নয়, জিন্নাও, শুধু বেশান্ত নয়, তেজবাহাদুর সাপ্রুও। সাইমন কমিশনের নিয়োগ তাই একদিক থেকে দেশের পক্ষে মঙ্গলের হাওয়া নিয়ে এল। কেননা এর আগে সমস্ত দল একসূত্রে এমন করে বাঁধা পড়েনি, এক মন্ত্রে মেলায়নি কণ্ঠস্বর।

সাতজন ইংরেজকে নিয়ে সাইমন কমিশন, তাই তার আরেক নাম সাইমন সেভেন বা সাত সাইমন। কিংবা বলতে পারো, সাত ছাইমন অর্থাৎ সাত মণ ছাই, সাত মণ পণ্ডশ্রম।

উনিশশো আটাশের তেসরা ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে নামল আর সেদিন সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে পালিত হল হরতাল। সর্বত্র এক নিশান এক ইস্তাহার এক প্রচারপত্র সাইমন ফিরে যাও, ফিরে যাও সাইমন। কোথাও-কোথাও কালো কাগজের ঘুড়ি উড়ল, কোথাও বা কালো রঙের বেলুন, তাতেও ঐ বুলি ঐ নির্দেশ—সাইমন ফিরে যাও, ভারতবর্ষ শুধু ভারতবাসীর জন্যে। আমাদের ভারত ছাড়া কথা নেই। দয়া করে তোমরা শুধু ভারত ছাড়ো।

হরতালের দিন কলকাতায় ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ হল, মাদ্রাজে গুলি চলল, লখনৌয়ে জওহরলাল নেহরু লাঠির বাড়ি খেল। কিন্তু লাহোরে লাজপত রায়ের উপর মারই ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াল। মারের ফলে লাজপত রায় মারা গেলেন।

শান্ত শোভাযাত্রা যাচ্ছিল রাজপথ দিয়ে, সঙ্গে ছিলেন লালা লাজপত রায়, সত্যপাল ও অন্যান্য দেশনেতা। পুলিশের হঠাৎ কী উল্লাস হল, লাঠি চালাতে সুরু করল। ভাবখানা দেখাল যেন এলোপাতাড়ি মারছে, কিন্তু বেশ হিসেব করে কয়েক ঘা বসাল লালাজির উপরে, এবং হিসেব করে, ঠিক বুকের উপরে। লালাজি পড়ে গেলেন, বিছানা নিলেন এবং কিছুকাল পরে চোখ বুজলেন।

পুলিশ-ইনস্পেক্টর স্কটই লালাজির বুকে লাঠি চালিয়েছিল। হিন্দুস্থান সোশিয়্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির কাউন্সিল ঠিক করল স্কটকে হত্যা করতে হবে। সেই কাউন্সিলের সদস্য সর্দার ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু আর চন্দ্রশেখর আজাদ। দাঁড়াও, সুযোগ আসুক। এর মধ্যে দলকে সংহত করো উদ্যত করো মন্ত্রপূত করো।

এদিকে ছাত্র-আন্দোলন জমাট বাঁধল। তার পুরোধা এক দিকে জওহরলাল, আরেক দিকে সুভাষচন্দ্র। এর আগে ছাত্রদের কোনো সঙ্ঘ ছিল না, সংগঠন ছিল না। কমিশনবর্জন আন্দোলনে ছাত্ররা যোগ দিচ্ছিল বলে নিয়মভঙ্গের অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ আঘাত হানছিলেন, তার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ জানাবার মত ছাত্রদের কোনো সংস্থান ছিল না। এবার ছাত্রদল গঠন করো।

'আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল,
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়বাদল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্য কালের ডাক,
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি

সরস্বতীর শ্বেত-কমল।
আমরা ছাত্রদল॥'

পুনায় মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করল সুভাষ। তার প্রধান বক্তব্য হল কংগ্রেসকে এখন দুটি নতুন শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার আন্দোলন করা উচিত—এক যুবশক্তি, আরেক শ্রমশক্তি। আর মেয়েরাও নিজেদের নিয়ে রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তুলুক। যেখানে যত শক্তি যত সম্ভবনা বর্তমানে সুপ্ত বা স্তিমিত আছে, সমস্তকে বহুবিচিত্রশিখায় উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে স্তূপীভূত দাসত্বের আবর্জনাকে দগ্ধ-নষ্ট করবার জন্যে।

সবরমতি আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে গেল সুভাষ। বললে, 'আপনি চলুন, চালান আবার দেশকে। সাইমন কমিশনের বর্জন উপলক্ষে সমস্ত দেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে। বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র—'

গান্ধীর শান্ত কণ্ঠে বিষাদের সুর বেজে উঠল : 'আমি কোথাও আলো দেখতে পাচ্ছি না।'

'সে কী! আপনার চোখের সামনে বারদোলি নো-ট্যাক্স আন্দোলন প্রস্তুত হয়েছে, বিক্ষোভের ঢেউ তুলেছে—এটা কি আলো নয়?'

এই বারদোলি আন্দোলনই উনিশশো বাইশ সালে মহাত্মা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এবছর নতুন সেটলমেণ্টে বারদোলি মহকুমার খাজনা প্রায় শতকরা পঁচিশ টাকা হারে বেড়ে গেল। আমরা বাড়তি খাজনা দেব না— করপীড়িত জনগনের প্রতিভূ হয়ে ঘোষণা করলেন বল্লভভাই। স্বরাজের জন্যে নয়, অত সুদূর ও দুরূহ কথা বোঝে না চাষীরা—আন্দোলন বাড়তি খাজনা বরবাদ করবার জন্যে, ভারমোচনের উপশমের জন্যে। এক কথায়, অতি সহজে, সকলে জোট বাঁধল, প্রতিজ্ঞায় ঘনীভূত হল। দেব না খাজনা।

যথারীতি লেলিয়ে দেওয়া হল পুলিশকে। খাজনা দেবে না তো অস্থাবর মালামাল ক্রোক করো। মালামাল না পাও তো গরু-মোষ ধরো।

একজন নিরীহ হিন্দু চাষীকে পুলিশ পরোয়ানা দেখাল। বললে, 'খাজনা দাও।'

'নতুন খাজনা দেব না। যদি পুরানো হারে নিতে চাও তো দিতে পারি।'

'না, নতুন খাজনা দিতে হবে।'

'দেব না।'

'না দিলে তোমার সমস্ত গরু-বাছুর ক্রোক করে নেব।'

'নাও গে। তবু নতুন হারে খাজনা দেব না।'

ভেবেছিল লোকটা বুঝি ভীতু, পুলিশ দেখে ঘাবড়ে যাবে, গরু-বাছুর ধরে নিয়ে যেতে দেখলে কেঁদে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু লোকটা অনমনীয় স্থির হয়ে রইল। পুলিশ তখন গেল এক মুসলমান রায়তের বাড়িতে।

'তুমি নিশ্চয়ই গোলমাল করবে না, ভালোয়-ভালোয় নতুন খাজনা দিয়ে দেবে।'

'মাফ করুন, নতুন খাজনা দিতে পারব না।'

'সে কী! ওসব গোলমাল তো হিন্দুরা করবে। তুমি মুসলমান, ভালো মানুষ,

তুমি কেন ওসবের মধ্যে যাও?'

গরিব রায়ত হাসল। বললে, 'খিদের মধ্যে খাজনার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নেই।'

না, এতটুকু বিচলিত হল না। গরু-বাছুর ধরে নিয়ে গেলেও না। পুলিশ দিয়ে হবে না, পাঠান নিয়ে এস। কোনো ক্রোক-নিলামে বাধা দিচ্ছে না প্রজারা। আশাতীতরূপে তারা অহিংস থেকেছে। তবু পাঠান সৈন্য আমদানি করবার হেতু কী? শুধু বিমর্দন করবার জন্যে।

এসেম্বলির প্রেসিডেন্ট বিঠলভাই প্যাটেল বড়লাটকে লিখল এরকম অত্যাচার চললে তিনি পদত্যাগ করবেন। সমস্ত বোম্বাই প্রদেশ জুড়ে সুরু হল অহিংস সংগ্রাম। গভর্নমেণ্ট বুঝল, আগুন আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না, যেহেতু খাজনা বৃদ্ধির পিছনে যুক্তির জোর নেই। সুতরাং গভর্নমেণ্ট পিছন ফিরল, বারদোলির বাড়তি খাজনা মকুব করে দিল। গভর্নমেণ্ট হার স্বীকার করে নিতেই উত্তেজনা জুড়িয়ে গেল। কংগ্রেস ঝড়ের হাওয়াটাকে নিজের পতাকার সঙ্গে বেঁধে নিতে পারল না।

তবু অন্য দিকে উত্তেজনা ছিল, ছিল রণোদ্যম। নিখিলবঙ্গ ছাত্র সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হল কলকাতায়, সভাপতি জওহরলাল। খড়্গপুরে রেলকর্মচারীরা ধর্মঘট করলে। তারপর ধর্মঘট হল জামশেদপুরে, লোহা-ইস্পাত কারখানায়, বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলে, লিলুয়ার রেল-ওয়ার্কশপে, বজবজে পেট্রোল ডিপোতে। ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে লাগল, ছড়িয়ে পড়তে লাগল কমিউনিস্ট-ভাবনা।

তবু গান্ধী তাঁর দাণ্ডী অভিযান সুরু করতে দু'বছর দেরি করে ফেললেন। তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লিখলেন, এ অভিযান দু'বছর আগে উনিশশো আটাশ সালেই আরম্ভ করা ঠিক ছিল। দেশ অকারণে দু'বছর পিছিয়ে গিয়েছে।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় কংগ্রেস হচ্ছে, এগারোই ডিসেম্বর লাহোরে ইংরেজ পুলিশ ইনস্পেক্টর স্যাণ্ডার্স খুন হল।

ক্ষুদিরামের মতই বুঝি ভুল হল রাজগুরুর। স্কট ভেবে স্যাণ্ডর্সকে হত্যা করল। কিন্তু এই ভুল ব্যক্তিগত হিসেবে বিশেষ মারাত্মক নয়, যেহেতু স্কট আর স্যাণ্ডর্স এক পালকের পাখি। দুজনেই পুলিশের উদ্ধত ধ্বজস্তম্ভ।

পুলিশ সুপারইনটেণ্ডেণ্টের অফিস থেকে যথারীতি বেরিয়ে তার মোটরবাইকে উঠতে যাচ্ছে স্যাণ্ডার্স, রাজগুরু ছুটে এসে রিভলভার উঁচিয়ে তার মাথায় গুলি মারল। গুলি খেয়েই স্যাণ্ডর্স মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ছুটে এল ভগৎ সিং। সেও তার রিভলভার থেকে কটা গুলি স্যাণ্ডর্সকে উপহার দিল। তারপর দুজনে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এমন উদাসীন ভাবে চলে গেল যেন তারা বিকেলবেলা এমনি বেড়াতে বেরিয়েছে।

না, একটা সাহেব সার্জেণ্ট তাদের পিছু নিয়েছে। পিছু নিয়েছে স্যাণ্ডর্সের গার্ড, চন্নন সিং। বিপ্লবীরা ডি-এ-ভি কলেজের বোর্ডিঙের দিকে এগিয়ে চলল। একজন ফিরে দাঁড়িয়ে সার্জেণ্টকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গুলি লাগল না। সার্জেণ্টও বিরত হল না অনুসরণ থেকে। কিন্তু এমনি দুর্দৈব, পা পিছলে পড়ে গেল সার্জেণ্ট— আর পড় তো পড়, তার হাত ভেঙে গেল। চন্দ্রশেখর আজাদ কাছেই ছিল ঘাপটি মেরে, সে চন্নন সিঙের তলপেটে গুলি বেঁধাল। চন্নন সিংকে আর উঠতে হল না।

বিপ্লবীরা বোর্ডিঙে ঢুকে পিছনের দেয়াল টপকে বেরিয়ে গেল। সেখানে তাদের সাইকেলগুলো মজুত ছিল, সেগুলোকে সহায় করে কতদূর এগিয়ে গিয়ে একটা প্রতীক্ষমান মোটরগাড়িতে চড়ে বসল, তার পরই হাওয়া। রাভি নদীর পারে সমস্ত বন চষে ফেলল পুলিশ কিন্তু পরিত্যক্ত সাইকেল কটা ছাড়া আর কিছুই ধরতে পারল না।

যথারীতি পুলিশ দয়ানন্দ-য়্যাংলো-বেদিক কলেজের একগাদা ছাত্র গ্রেপ্তার করলে। কিন্তু দিন দশেক পরে লাহোরের দেয়ালে-দেয়ালে হাতে-লেখা পোস্টার পড়ল : 'আমার রক্তের তৃষ্ণা এখনো নিবৃত্ত হয়নি। আমি আরো পাঁচ দিন লাহোরে আছি। যে পারো ধরো আমাকে। আমাকে ধরবার জন্যে সরকার যা পুরস্কার দেবে তার উপর আরো পাঁচশ টাকা আমি দেব। চন্নন সিংকে খুন করার আমার ইচ্ছে ছিল না, তবে যে কেউ পথের প্রতিবন্ধক হত সে-ই গুলি খেত।' পোস্টারে স্বাক্ষর পড়ল : 'ভারতীয় বিপ্লববাহিনীর প্রধান সেনাপতি।'

পুলিশ এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার করতে লাগল। পুলিশ যতই দুর্দান্তপনা করে ততই দেয়ালে-দেয়ালে জ্বলন্ত ভাষায় পোস্টার পড়ে। পুলিশ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। শেষে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে বিবেচনা করে দেখল বেশির ভাগ পোস্টারই পুলিশ-খ্যাপানো কৌতুক। কিন্তু প্রথম পোস্টারটা? কে সে প্রধান সেনাপতি?

এদিকে উনিশশো আটাশের ডিসেম্বরে কলকাতায় পার্ক-সার্কাসে কংগ্রেস বসল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি আর সুভাষ বিরাট ভলানটিয়ার-বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক, জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং।

'ভলানটিয়ার্স, ফল ইন।' সুভাষের মেঘগম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর চারদিকে একটা শৃঙ্খলা ও শক্তির সামরিক আবহাওয়া নিয়ে এল।

কে জানত এই হচ্ছে মহানাটকের স্টেজ-রিহার্সেল। ভলানটিয়ারদের পোশাকের জন্যে একটা মোটা টাকা অভ্যর্থনা সমিতির থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিল সুভাষ। কারু কারু কাছে বা এটা বাড়াবাড়ি মনে হল, সামান্য পোশাকের জন্যে এত খরচ!

'পোশাককে কে সামান্য বলে? পোশাকই চরিত্র গঠন করে, যা মানুষ হতে চায় পোশাকই সেই দিকে তাকে এগিয়ে দেয়। যে সৈন্য যুদ্ধ করবে তার ইউনিফর্ম থাকবে না?' বললে সুভাষ, 'হ্যাঁ, সৈন্য বৈ কি। আমার ভলানটিয়াররা সৈন্য আর এই কংগ্রেস-অঙ্গনই যুদ্ধক্ষেত্র।'

প্রতিপক্ষ কে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নেই আশা করি। প্রতিপক্ষ ঐ বলদর্পী ব্রিটিশ শাসন। দেখ দেখ কী সুসম্বদ্ধ শৃঙ্খলাছন্দিত এই 'বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স! দেখ এর মাস-প্যারেড, এর মার্চ-পাস্ট, এর রুট-মার্চ। সজ্জায়-সমারোহে স্পন্দনে-স্ফুরণে দীপ্তিতে-দৃঢ়তায় এ যেন নতুন জীবনের জয়গান। আর এই গানের গায়ক-গাথক সুভাষচন্দ্র। আর তার প্রধান সঙ্গতকার সত্য গুপ্ত। আর যতীন দাস।

এ তো হল বাইরের রূপসজ্জা। কিন্তু ভিতরে, কংগ্রেসের মূল অধিবেশনে কী হল? সেখানে কোথায় সামরিকতা? সেখানে সেই পুরোনো গড়িমসি, সেই পুরোনো দাঁড়ি পাল্লার ওজন নেবার পরিহাস। সরকারকে আবার সেই সময় দেবার প্রহসন। উনিশশো উনত্রিশের একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা ঐ জাতীয়

কনস্টিটিউশান না দাও তবে আমরা ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন করব। যেন এখুনি-এখুনি আন্দোলন সুরু করে দেবার সময় আসেনি। এখনো যেন শৈথিল্যে আলস্যে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে নেবার সময় আছে। সুভাষের সমস্ত মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এরই জন্যে আয়োজন করেছিল সে সভাপতির শোভাযাত্রা, যার জুড়ি এর আগে আর কখনো দেখেনি কংগ্রেস! এরই জন্যে এই বি-ভি, সমরপিপাসী স্বেচ্ছাসেবকের দল!

না, পূর্ণ স্বাধীনতার কমে কিছুতেই তুষ্ট হবে না কংগ্রেস— কিছুতেই না— এই মর্মে সংশোধনী প্রস্তাব তুলল সুভাষ। জওহরলাল তাকে সমর্থন করল। তবু সংশোধন প্রস্তাব পাশ হল না। ডোমিনিয়ন স্টেটাস? এখনো ডোমিনিয়ন স্টেটাস! যেন এক বছর বসে চুপচাপ চরকা কাটলেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেধে ভারতবর্ষের হাতে ঐ খইয়ের মোয়া উপহার দেবে। প্রখরনখর সংগ্রাম ছাড়া সূচ্যগ্র ভূমিও দেবে না।

প্রায় দশহাজার শ্রমিক বিরাট শোভাযাত্রা করে কংগ্রেস মণ্ডপে এসে উপস্থিত হল। জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাল আর সমস্বরে ঘোষণা করে গেল শ্রমিকের লক্ষ্যও পূর্ণাবয়ব স্বাধীনতা। শুধু শাসনের থেকে মুক্তি নয়, শোষণের থেকেও মুক্তি। এই শ্রমশক্তির জাগরণেও কংগ্রেস আলোকের আভাস খুঁজে পেল না? ভাবল এখনো আলস্য করার সময় আছে?

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

উনিশশো উনত্রিশের আটুই এপ্রিল দিল্লির এসেম্বলিতে দু-দুটো বোমা ফাটল। সঙ্গে সঙ্গে উঠল আওয়াজ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্তের কণ্ঠেই এ মন্ত্রের প্রথম উচ্চারণ। তখন বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছে, গভর্নমেন্ট ট্রেডস ডিসপিউটস বিল পাশ করতে চাইছে, এ নিয়ে প্রেসিডেন্ট বিঠলভাই প্যাটেল তাঁর রুলিং দিচ্ছেন, গ্যালারির থেকে দ্রুত নেমে এসে দুটি যুবক বোমা ছুঁড়ে মারল। কোনো মানুষকে লক্ষ্য করে নয়, শুধু উচ্চনাদ প্রতিবাদ জানাবার অভিলাষে। সার্জেন্টরা ছুটে এলো চারদিক থেকে। যুবক দুটি বিনা আড়ম্বরেই ধরা দিল। একজনের বয়েস চব্বিশ, নাম ভগৎ সিং, আরেকজনের বয়েস বাইশ, নাম বটুকেশ্বর দত্ত। ভগৎ সিং পাঞ্জাবি, বটুকেশ্বর পাঞ্জাবে মানুষ হলেও বাংলার ছেলে।

'আমরা আমাদের কাজ করেছি।'

'কী কাজ?'

'দেশের কাজ।'

'দেশের কাজ! এই বোমা ফাটানো!'

'হ্যাঁ, এই বোমা ফাটানো। দেখলেন না, আমরা কোনো মানুষকে আঘাত করিনি, আমরা আঘাত করেছি প্রতিষ্ঠানকে, এই অসার এসেম্বলিকে। শুধু অসার নয়, অপমানজনক। এই এসেম্বলিই যত কদর্য আইন পাশ করে আমাদের দেশকে পৃথিবীর চোখে হেয় করছে, এই এসেম্বলিই ব্রিটিশ শাসনের কায়েমি দুর্গ, এর বিরুদ্ধেই আমাদের এই প্রতিবাদ। হ্যাঁ, বধিরকে শোনাবার জন্যেই এই বোমার শব্দ, নিদ্রিতকে জাগিয়ে দেবার জন্যে। আর যে ভাবছ আরামে আছ সে এর থেকে দেখে নাও বিপদের সঙ্কেত।'

নিম্ন আদালত ভগৎ সিংকে জিজ্ঞেস করল : 'বিপ্লব বলতে তুমি কী বোঝ?'

'এক কথায় বুঝি জন-জাগরণ। ব্যক্তির হত্যা নয়, সমাজের পরিবর্তন। যে অবিচার ও অসাম্যের উপর বর্তমান সমাজের প্রতিষ্ঠা তারই উৎসাদন আমাদের বিপ্লব। যে ফল শ্রমিকেরা উৎপাদন করে দিচ্ছে তার উপযুক্ত অংশ থেকে তারা বঞ্চিত হবে, আর মালিক সিংহের ভাগ আদায় করে নিয়ে অপচয়ের তুবড়ি ছোটাবে— না, এ কিছুতে হতে পারবে না। যাতে তা না হয় তারই জন্যে আমাদের এই মাস-য়্যাকশনের চেষ্টা।'

প্রথম মামলা বোমা-বারুদ রাখবার অপরাধে। হত্যা করবার চেষ্টার অপরাধে।

বিচার আরম্ভ হবার দিন কোর্টে আসামীদের আনতেই উঠল আবার সেই জয়ধ্বনি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, তারপর বিচার শেষে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ শুনেও সেই জয়নিনাদ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

একটা মামলাতেই শেষ হল না। গভর্নমেণ্ট সুরু করল দ্বিতীয় মামলা স্যাণ্ডার্সের হত্যাকে কেন্দ্র করে— লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, তাতে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর ছাড়াও জড়ানো হল আরো বারো জনকে। তাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ দাস, রঘুনাথ বা শিবরাম রাজগুরু, শুকদেব, অজয় ঘোষ, চন্দ্রশেখর আজাদ আর ভগবতীচরণ। এদের মধ্যে চন্দ্রশেখর আর ভগবতীচরণ পলাতক।

আমরা সাধারণ কয়েদি নই, আমরা রাজনৈতিক কয়েদি, আমাদের প্রতি জেলের আচরণ একটু ভদ্র হওয়া উচিত— এই দাবিতে আসামীরা অনশন করতে চাইল।

'তুমিও অনশন করছ তো?' যতীনকে জিজ্ঞেস করল কেউ-কেউ।

ভাবছি করা ঠিক হবে কিনা।'

'ভাবছ! ঠিক হবে কিনা!'

'হ্যাঁ, কেননা এ এক ভীষণ খেলা।'

'ভীষণ খেলাই তো খেলতে চলেছি আমরা। তুমি আমাদের দলে আসবে না? দল-ছুট হয়ে থাকবে?'

'সেই তো আবার ভাবনা। দলছাড়া হই কী করে? কিন্তু শোনো', যতীনের হাসিমুখ গম্ভীর হয়ে উঠল: 'যদি এ খেলা একবার আরম্ভ করি শেষ পর্যন্ত খেলে যাব।'

'শেষ পর্যন্ত!'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ না দাবি স্বীকৃত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত। তার আগে যদি মৃত্যু ঘটে মৃত্যু পর্যন্ত।'

সুরু হল অনশন।

আর যে যাই ভাবুক, যতীন শুধু ভাবছে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। সে সুভাষের ভলানটিয়ার বাহিনীর মেজর, সে প্রগাঢ়-প্রতিজ্ঞ।

ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বরের পক্ষে অনশন তো জেল-আইন-ভঙ্গের শামিল। তারা তো সাজা-পাওয়া কয়েদি। সুতরাং অনশনের অপরাধে তাদের হাতে-পায়ে বেড়ি পরাও। দুর্বলতার জন্যে হাঁটতে-চলতে না পারে স্ট্রেচারে করে কোর্টে নিয়ে চলো। দেখি কত দিন থাকতে পারে না খেয়ে।

স্ট্রেচারে করে আনা হয়েছে কোর্টে, দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, তবু ঢোকার সঙ্গে

সঙ্গে ভগৎ সিং চেঁচিয়ে উঠেছে : ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আর বুটেশ্বর চেঁচিয়ে উঠেছে: সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।

কিছুতেই যে নত হয় না বিপ্লবীরা। তখন সুরু হল ফোর্সড ফিডিং— জোর করে খাওয়ানো। পাঁচজন জোয়ান জেলখাটা ওয়ার্ডার আর একজন ডাক্তার প্রত্যেক সেলে এসে ঢোকে, আসামীকে মেঝের উপর পেড়ে ফেলে দুজন দুটো হাত দুজন দুটো পা আর একজন মাথাটা চেপে ধরে। আসামীর দাঁতে দাঁত লাগানো, তাই মুখ দিয়ে কিছু খাবার পাঠানো অসম্ভব। তাই ডাক্তার তার নাকের মধ্যে দিয়ে নল চালিয়ে পাকস্থলীতে দুধ পাঠায়। পেটে দুধ কিছুটা পৌঁছে দিতে পারলে আসামীকে রাখা যাবে চাঙ্গা করে। আর দুধ যাতে যেতে না পারে তারই জন্যে আসামীর ঝটাপটি। ছ-ছটা ডাকাতের বিরুদ্ধে একজন উপবাসীর লড়াই, তাই ধস্তাধস্তিটাও নিদারুণ ক্লেশকর। ওয়ার্ডাররা সামলাতে না পারে, পাঠান সৈন্য তলব করো। শুধু মার খাওয়াও না, মেরে খাওয়াও।

ভগৎ সিং কোর্টে এসে দেখল কী রকম নৃশংস প্রহার করেছে পাঠানেরা, এই দেখুন সে সব চিহ্ন।

মহিমার্ণব আদালত দেখেও কিছু দেখল না। ভাবখানা এই, আহার খেলে কে আর প্রহার খায়!

কিন্তু বটুকেশ্বর কই? মারের চোটে বটুকেশ্বর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আসামীদের সেলে কলসীতে জল নেই, কী সদাশয় ব্যবস্থা, কলসীতে দুধ! পয়োমুখ নয়, সত্যিসত্যিই পয়ঃকুম্ভ। অর্থাৎ তেষ্টা পেলে জলের অভাবে আসামীরা যাতে দুধ খেতে বাধ্য হয়। জান্তে অজান্তে ভ্রান্তে আসামী দুধ খেলেই তো কর্তৃপক্ষের আনন্দ, আরো ভোগান্তি বাড়ানো যাবে ওদের। কিন্তু দুধ কে ছোঁবে! দুধের স্বাদ ঘোলে মিটলেও জলের স্বাদ দুধে মেটে না। আসামী অজয় ঘোষ জলের আশায় কলসী গড়াতে গিয়ে দেখল দুধ। পাগল হয়ে যাবার মত হল। এমন তেষ্টা পেয়েছে, মনে হল খানিকটা দুধই না শেষ পর্যন্ত খেয়ে ফেলি।

দরজার প্রহরীকে ডাকল অজয়। বললে, 'একটু জল দিতে পারো? অন্তত কয়েক ফোঁটা জল। এই দেখ জিভ কেমন ফুলে গিয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, হাত-পা জ্বলছে— অন্তত কয়েক ফোঁটা জল—'

প্রহরী বললে, 'হুকুম নেই।'

'হুকুম নেই! জলের বদলে দুধ দেওয়ার হুকুম?' খেপে গেল অজয়। দুধের কলসীটা দু হাতে তুলে ধরে সবলে ছুঁড়ে মারল। দুধে স্নান করে উঠল প্রহরী।

অনশনীদের সহানুভূতিতে সারা দেশ আন্দোলিত হয়ে উঠল। বন্দীদের দাবি ন্যায়সঙ্গত, সুতরাং সে সামান্য দাবি মেনে নিয়ে সরকার এ সব অমূল্য জীবন নির্বিঘ্ন করুক। কিন্তু কে কার কথা শোনে। জোর ছাড়া চোরও ধর্মশাস্ত্রে কান দেয় না। একটা অসভ্য দেশের সরকারও বোধকরি এত বর্বর হয় না।

যতীন দাসকে জেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তার অবস্থা দিন-কে-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওষুধের সঙ্গে জল মেশানো হয়েছে বলে ওষুধও সে খাবে না। তখন সরকারের বিবেকে বুঝি একটু মোচড় লাগল। আদেশ জারি করল, ডাক্তারি

কারণে আসামীকে বিশেষ আহার্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ডাক্তারি কারণ! আসামীরা এ অনুগ্রহ নিতে রাজি হল না। তাদের ডাক্তারি কারণ নয়, মানবিক কারণ। শুধু মনুষ্যত্বের ন্যূনতম মর্যাদার দাবিতে তাদের এই অনশন।

ডাক্তার রিপোর্ট দিলে যতীনকে জোর করে খাওয়াবার আর অবস্থা নেই। তার প্রবল জ্বর হয়েছে, দেখা দিয়েছে নিমোনিয়া। তবু সরকারের পাথুরে বিবেকে দংশন ফুটল না। বরং অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়ে নিল, আসামী যদি স্বকৃত কর্মের ফলে কোর্টে অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে ছাড়াই বিচার চালিয়ে যাওয়া যাবে। কার বিচার করবে? যে অনুপস্থিত তার বিচার? কিন্তু যে শত ডাকেও ফিরবে না, ভূরিভোজের নিমন্ত্রণ করলেও আসবে না, তার বিচার কে করবে, কোথায় করবে?

গভর্নমেণ্ট একটা জেল-অনুসন্ধান কমিটি বসাল যে দেখবে বিচারপ্রার্থী বন্দীদের কী সুবিধে পাওয়া উচিত আর যারা সাজা-পাওয়া বন্দী তারাই বা কতটুকুর হকদার! এর ফলে দোসরা সেপ্টেম্বর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য বিপ্লবীরা তাদের অনশন ভঙ্গ করলে কিন্তু যতীন ফিরল না, সে যথোক্তবাদী, যা বলেছিল তাই করল। দাবি অপূর্ণ থাকলেও সে পূর্ণ হয়ে চলে গেল। তেষট্টি দিন অনশনের পর উনিশশো উনত্রিশের তেরোই সেপ্টেম্বর সে মহাপ্রয়াণ করলে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের টেরেন্স ম্যাকসুইনিও ইংরেজের জেলে এমনি অনশনে প্রাণ দিয়েছিল। তার স্ত্রী মেরি ভারতবর্ষে টেলিগ্রাম পাঠাল : 'যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে শোকে ও গর্বে স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়দের সঙ্গে টেরেন্স ম্যাকসুইনির পরিবার একত্ববদ্ধ। স্বাধীনতা আসবেই আসবে।'

শহিদ যতীন দাসের মৃত্যুতে সমস্ত দেশ আলোড়িত হয়ে উঠল। তার মৃতদেহ লাহোর থেকে নিয়ে আসা হল কলকাতায়। বীরকে বরণ, বন্দন ও বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে সে কী বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তার তুলনা শুধু সে নিজেই। বেদনার আকারে যেন এক বৃহৎ বন্দনা মহাসৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিপুল লোকসঙ্ঘ কিন্তু কেউ কারু অনাত্মীয় নয়, এক মহৎ শোক সকলকে একই ব্রতমন্ত্রে গ্রথিত করে নিয়েছে—বন্দেমাতরম, বিপ্লব অমর হোক।

এই শোভাযাত্রার অগ্রনায়ক সুভাষ। প্রাণোৎসর্গকে জীবনোৎসবে নিয়ে যেতে হবে সেই যজ্ঞের পুরোধাও সুভাষ।

স্বাধীনতার ক্ষুধিত শিখা আরো প্রবল হয়ে জ্বলুক, ভস্ম করে দিক সমস্ত ভীরুতা, সমস্ত লোলুপতা, সমস্ত জাড্য আলস্য মালিন্য আবিল্য। ভস্ম করে দিক সমস্ত পরশাসনের পীড়ননিষ্ঠুরতা। ভস্ম হয়ে যাক সমস্ত অন্ধকারের কালিমা, অরুণগগনে নতুন সূর্যের অভ্যুদয় হোক, সুরু হোক প্রাণের গানের প্রেমের হোলিখেলা।

মহাত্মা ভগৎ সিংকে সর্দার উপাধি দিলেন কিন্তু যতীন দাসের বেলায় চুপ করে থাকলেন কেন? বললেন, ইচ্ছে করেই চুপ করে আছি। যদি কিছু বলতে হত হয়ত তা মনঃপুতো হত না।

কিন্তু লাহোর-বন্দীদের প্রায়োপবেশনের মধ্যেই এগারোই আগস্ট কলকাতায় বন্দী-দিবস পালিত হল। বিরাট সভা হল টাউনহলে। সভাপতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

সভার প্রাক্কালে হাজরা পার্ক থেকে বেরুল শোভাযাত্রা। যাত্রীদের মধ্যে সুভাষ, কিরণশঙ্কর রায়, ডাক্তার জে.এম.দাসগুপ্ত, সত্য গুপ্ত, ধীরেন মুখার্জি, সর্দার বলবন্ত সিং, প্রেম সিং ও আরো অনেকে। ধ্বনি উঠল বন্দেমাতরম, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, মুক্তি অথবা মৃত্যু, বেজে উঠল গানের সুর: বীরগণ জননীরে, রক্ততিলক ললাটে পরালো পঞ্চনদীর তীরে। আর কথা নেই, পুলিশ এসে সবাইকে গ্রেপ্তার করল। অভিযোগ কী? অভিযোগ সেই সনাতন, ষড়যন্ত্র আর রাজদ্রোহ। রাজদ্রোহ? হ্যাঁ, যে মুহূর্তে মুক্তি বা স্বাধীনতা শব্দ উচ্চারণ করেছ সেই মুহূর্ত থেকেই তুমি রাজদ্রোহী।

আলিপুরের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কে.এল.মুখার্জির কোর্টে নিয়ে যাওয়া হল সবাইকে। ম্যাজিস্ট্রেটের কী সুমতি হল, সবাইকে জামিন দিল। জামিনে বেরিয়ে এসেও সুভাষ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারল না, সে চলল লাহোরে, পাঞ্জাব ছাত্রসম্মিলনে সভাপতিত্ব করতে। সূর্যের তন্দ্রা নেই, সুভাষেরও বিশ্রাম নেই।

তেরো

যতীন দাসের আত্মবলিদানের পরে বন্দীদেব শ্রেণীবিভাগ হল এটাই বড় কথা নয়, দেশময় জাগল যুব-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন। না, আমরা প্রভুত্ব চাইনে রাজত্ব চাইনে, সোনা নয় মাটি নয় ইট-কাঠ-পাথর নয়, ক্ষমতার মোহ আমাদের কাছে প্রলোভনের বস্তু নয়, আমরা শুধু অমৃতে আলোকে আনন্দে ভালোবাসায় বাঁচার মত বাঁচতে চাই।

পুনায় মহারাষ্ট্র যুবসম্মিলনে সভাপতিত্ব করল জওহরলাল, আহমেদাবাদে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতৃবধূ, আর লাহোরে নাগপুরে অমরাবতীতে সুভাষ। লাহোরে সুভাষের সহযাত্রী কিরণ দাস, শহিদ যতীনের ছোট ভাই। অমৃতসরে পৌঁছুতেই কিচলু তাদের অভ্যর্থনা করে নিল। মোটরে করে পৌঁছুল শহরে। ধরমবীরের বাড়ি যাবার পথে বিরাট শোভাযাত্রা তৈরী হল। সবাই বললে, এ লোকসঙ্ঘ এড়িয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আগে হৃদয় পরে বুদ্ধি। এসব লোক তো আমার দেশের লোক, আমার মিত্র, আমার সুহৃৎ। এরা তো প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী আর পরোক্ষে কার্যহন্তারক নয়। এরা আমার সগোত্র। আমাদের এক লক্ষ্য এক অভিনিবেশ— আমি মোটরে আর ওরা রাজপথে, তা নয়, আমরা সকলেই এক পথে।

জনতা সুভাষকে হৃদয়ে করে নিয়ে গেল সভাস্থলে, ব্র্যাড্‌ল হল-এ। হল-এ পৌঁছে সুভাষ দেখল অনেক পুলিশও রয়েছে ভিড়ের মধ্যে। সুভাষ মর্যাদাগম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'প্রবেশপত্রের অধিকারে জনতা এ সভায় সমবেত হয়েছে। যাদের প্রবেশপত্র নেই তাদের জন্যে এ সভা নয়, তারা দয়া করে এ সভাস্থল ত্যাগ করলেই আমি সুখী হব।'

'আমরা পুলিশ।'

'পুলিশই হোন আর যিনিই হোন যাঁর কার্ড বা প্রবেশপত্র নেই তাঁর এ সভায় স্থান নেই। তিনি ধীরে চলে যান। না গেলে—'

পুলিশের দল ঘাড় ফেরাল।

'না গেলে আমরা অহিংস উপায়ে তাদের বহিষ্কার করে দেব।'

সে দৃপ্ত অথচ সৌজন্যসুন্দর ঘোষণায় আশ্চর্য ফল ফলল। পুলিশের দল ল্যাজ

গুটিয়ে সুধীরে প্রস্থান করল।

সেই সভায় সুভাষ যতীন দাসের নতুন নামকরণ করল। নতুন নাম যুবক দধীচি। যার বক্ষের পঞ্জর দিয়ে বজ্র নির্মিত হয়েছে। যে বজ্রে ধ্বংস হবে বৃত্রাসুর।

সভাশেষে সুভাষ লাহোর কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হল। আদেশ হল, কোর্টে বসতে পারো, দেখতে পারো বিচার, কিন্তু ডকের আসামীদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। বলব না কথা, আর, তোমাদের বিচার কে দেখে, দেখব শূরবীর বিপ্লবী যোদ্ধাদের। আমাদের এক লক্ষ্য এক অভিনিবেশ এক অভ্যুত্থান। কয়েদিদের শ্রেণীবিভাগ করেছে কিন্তু সেখানেও ইংরেজের কারসাজি। সেখানেও ডিভাইড য়্যাণ্ড রুল, ভিন্ন করে খিন্ন করো। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে এক শ্রেণীতে, একই সুবিধের অধিকারী করে রাখল না, একত্র করে রাখলেই যে ওদের একত্ব হবে— শুধু জীবনধারণের মাত্রা মেপে মেপে ওদের তিন ক্লাশে ঠেলে দাও, এ-ক্লাশ, বি-ক্লাশ, সি-ক্লাশ, অভিজাত মধ্যবিত্ত আর সাধারণ। তুমি রাজনৈতিক বন্দী বলেই আর অভিজাত নও, তুমি যদি গরিবগুরবো লোক হয়ে দেশের সেবায় কারাগারে এসে থাকো, চলে যাও সাধারণে। ব্রিটিশ পাটোয়ারি তোমাকে বরেণ্য বলে ভাবতে দেবে না। তবু যেটুকু সংগ্রহ করা গেছে সেটুকু যতীন দাসেরই তপস্যার ফল। সংগ্রহ করা গেছে আরেক বৃহত্তর বিত্তের উত্তরাধিকার। 'মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।'

জলন্ধর লুধিয়ানা হয়ে সুভাষ পৌঁছুল মিরাটে। কোর্টে গিয়ে দেখল ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের। সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে সন্দেহে পুলিশ আম্বালায় তাকে সার্চ করলে, বিনম্র প্রসন্নতা ছাড়া সুভাষের কাছ থেকে আর কিছুই পেল না। দিল্লিতে এসে ডাক্তার আনসারির আতিথ্য নিলে। বিঠলভাই প্যাটেল তাকে খেতে নেমন্তন্ন করে পাঠালেন।

দিল্লিতে আরো অনেক আহ্বান-নিমন্ত্রণ, কিন্তু হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে কিরণশঙ্করের টেলিগ্রাম এসে হাজির: শিগগির চলে এস। ম্যাজিস্ট্রেট আর মুলতুবি দিতে রাজি নয়।

দিল্লির সব কাজ ফেলে সুভাষ চলল কলকাতায়। কলকাতায় এসে দেখল বাংলা কংগ্রেসে বিভেদ দেখা দিয়েছে। এক দলের নেতা সুভাষ আরেক দলের নেতা যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। সেনগুপ্ত দক্ষিণপন্থী, মহাত্মার অনুবর্তী, সুভাষ বামপন্থী, কখনো-কখনো মহাত্মার বিপক্ষ। নেতৃত্বের জন্যে সংগ্রামে শেষপর্যন্ত সুভাষই জয়ী হল।

ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ফরোয়ার্ড পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করল। একটা ট্রেন-দুর্ঘটনার সংবাদ দিতে গিয়ে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে অতিরঞ্জন করেছে তারই জন্যে নালিশ। কোর্ট রেলওয়েকে প্রার্থিত ডিক্রি দিলে, ক্ষতিপূরণ অল্পসল্প নয়, দেড়লাখ টাকা। সবাই ভাবল ফরোয়ার্ড এবার উঠে যাবে। এত টাকা খেসারত দিতে গেলে তার কঙ্কালও থাকবে না। ফরোয়ার্ড উঠে গেল না, ফরোয়ার্ড লিবার্টি হয়ে গেল। কিংবা বলতে পারো ফরোয়ার্ড উঠে গিয়ে লিবার্টি নামে এক নতুন কাগজ বেরুল। কিছুদিন ফরোয়ার্ড চললেই লিবার্টিতে পৌঁছুনো যায়।

কিন্তু এবার কংগ্রেসে সভাপতি হবে কে? প্রায় সব প্রাদেশিক কমিটিই গান্ধীর নাম করে পাঠাল, কিন্তু মহাত্মা রাজি হতে চাইলেন না। তা হলে বল্লভভাই প্যাটেল হোক না, তাও না, মহাত্মা জওহরলালকে মনোনীত করলেন।

উনিশশো সাতাশের ডিসেম্বরে ইউরোপ থেকে ফিরে জওহরলাল নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলেছিল, মহাত্মার ডাইনে না থেকে বাঁ ঘেঁষে চলছিল, মহাত্মার কিছু কিছু কাজ সমর্থন করতে পারছিল না, কিন্তু লাহোর কংগ্রেসে তাকে সভাপতিত্ব দিয়ে গান্ধী যেন তাকে নিজের কাছেই টেনে নিতে চাইলেন। কংগ্রেসী বামপন্থীদের সঙ্গে সমস্বরে জওহরলালও পূর্ণ স্বাধীনতার কথাই বলে এসেছে। তা বলুক, তবু জওহরলালকে হাতে আনতে পারলে বামপন্থীরা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। মহাত্মার এ বিচক্ষণতা পুরস্কৃত হল। আর সেই থেকে জওহরলাল মহাত্মার নিঃসর্ত সমর্থক হয়ে দাঁড়াল।

তবু জওহরলালের সভাপতিত্বে লাহোর কংগ্রেসেই সক্রিয় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হল। বলা হল, ট্যাক্স দেব না। মহাত্মা গান্ধী সম্মতি দিলেন। বললেন, যদি একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে গভর্নমেণ্ট থেকে সাড়া না পাওয়া যায়, আমি উনিশশো ত্রিশের পয়লা জানুয়ারি থেকে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্সওয়ালা' হয়ে যাব।

কিন্তু সুভাষ ও তার দল এত অল্পে তৃপ্ত নয়। শুধু করব নয়, এখুনি কিছু করে ফেলি, গড়ে তুলি। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার কথা অনেক আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু তেমন কিছুই করা হয়নি, শুধু কালহরণ ছাড়া। এ কালক্ষয়ের কোনো কৈফিয়ত নেই।

'কিন্তু তুমি এখুনি-এখুনি কী গড়ে তুলতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন মহাত্মা।

'প্যারালেল বা সমানুরূপ গভর্নমেণ্ট গড়ে তুলতে চাই।' বললে সুভাষ, 'যেমন আয়র্ল্যাণ্ডে সিন ফিনরো গড়ে তুলেছিল।'

মহাত্মা খুশি হলেন না। বললেন, 'ও সব কাগজে কলমে খুব সুন্দর কথা কিন্তু বাস্তবে নয়। আমাদের মধ্যে সেই শৃঙ্খলাবোধ কোথায়, কই সেই সংগঠন, সেই চলনাশক্তি?

এত নৈরাশ্যের হেতু কী? কেন এই দৌর্বল্য, এই আত্মঅবিশ্বাস? বিরাট এক সেবকবাহিনী যদি গড়ে তুলতে পারি, কেন সফল হব না? সুভাষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

শুধু তাই নয়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তার নাম খারিজ হয়ে গেল। মহাত্মাই সদস্যদের নামের তালিকা প্রস্তুত করলেন। বললেন, যারা এক মতের মানুষ তাদেরই ওয়ার্কিং কমিটিতে আসা উচিত। জওহরলালেরও সেই কথা। তা কেন, যারা মাইনরিটি তাদেরও প্রতিনিধি থাকা দরকার। সুভাষের নাম প্রস্তাব করা হল। ভোটাভুটিতে টিকল না প্রস্তাব— মহাত্মার ইচ্ছাই প্রবল হল। সুভাষ তার দলের বাযট্টি জনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল সভা থেকে।

বেরিয়ে এসে সুভাষ কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করল। মাতার আশীর্বাদ চেয়ে বাসন্তী দেবীকে টেলিগ্রাম করল সুভাষ: 'অধিকসংখ্যকদের অত্যাচার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের আলাদা দল গড়তে বাধ্য করল, যেমন একদিন করেছিল গয়ায়। দেশবন্ধুর আত্মা আমাদের পথ দেখাক আর আপনার আশীর্বাদ আমাদের অনুপ্রাণিত করুক— এই প্রার্থনা।'

একত্রিশে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রি গত হলেই, নববর্ষের প্রথম মুহূর্তে কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহরু স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করল। হাড়কাঁপানো দুঃসহ শীত, তবু লক্ষ লোকের সমাবেশ হল। আর সে পতাকা যখন ঊর্ধ্বে উড্ডীন হল, লক্ষ শরীরে

জাগল এক নতুন রোমাঞ্চ, শৃঙ্খলমোচনের রোমাঞ্চ।

নতুন বছর না জানি কী নতুন পরিচ্ছেদ খুলে ধরে। উনিশ শো তিরিশের দোসরা জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ঠিক হল ছাব্বিশে জানুয়ারি সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে। একটা ঘোষণাপত্র তৈরি করা হল। সন্দেহ নেই মহাত্মা গান্ধীই এর রচয়িতা। ঠিক হল গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে অসংখ্য সভামঞ্চ থেকে এই ঘোষণাপত্র পড়া হবে।

'আমরা বিশ্বাস করি এ ভারতবাসীদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার যে তারা স্বাধীন থাকবে ও তাদের শ্রমের উপস্বত্ব তারা নিজেরা ভোগ করবে। পাবে তাদের জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু, যাতে করে পূর্ণতর বিকাশবর্ধনের সুযোগ আসবে। আমরা বিশ্বাস করি, যদি কোনো গভর্নমেণ্ট জনসাধারণকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ও তাদের নিপীড়নে নিযুক্ত হয়, তা হলে সেই গভর্নমেণ্টকে পরিবর্তন করা বা সর্বাংশে ধ্বংস করার আরো এক অধিকার তারা পেয়ে বসে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের অধিবাসীদের মূল অধিকার থেকে শুধু বঞ্চিতই করেনি, তাদেরকে অর্থে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে, আত্মিক সম্পদে, সর্বব্যাপারেই সর্বস্বান্ত করেছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ বা সার্বিক স্বাধীনতা অর্জন আমাদের একমাত্র কর্তব্য।'

ঘোষণার শেষ অনুচ্ছেদে বলা হল :

'যে শাসনপদ্ধতি আমাদের দেশে ধ্বংস নিয়ে এসেছে তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা আমরা মানুষের ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণনা করি। আমরা অবশ্য এ কথা স্বীকার করি যে হিংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা আসবে না। আমরা তাই ব্রিটিশ সংস্পর্শ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাব আর ট্যাক্স না দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে আইন অমান্য করতে উদ্যোগী হব। আমরা এ বিশ্বাসে নিশ্চিত যে যদি আমরা অহিংসার পথে থেকে ব্রিটিশ সংস্পর্শ ছিন্ন করতে পারি ও ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দিই, তা হলে এই অমানুষিক শাসনের অবসান অবধারিত।'

লাহোরে সেই শীতের রাত্রেই অনুভব করা গেল কংগ্রেসের শত আলস্যে-শৈথিল্যেও জনগনের সংগ্রামস্পৃহার এতটুকুও ক্ষয় হয়নি। শুধু অবসাদের ছাই এসে জমেছিল, একটা নাড়াচাড়া পড়তেই ভস্মস্তূপ থেকে উঁকি মেরেছে বৈশ্বানর। অত্যাচারের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও দেখা দিচ্ছে সর্বস্বপণ নির্ভীকতা, স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপ্তি ও আত্মবিসর্জনের প্রচণ্ড উৎসাহ। আর্তনাদকে রুদ্ধ করে রাখলে কী হবে, যন্ত্রণা ঠিকই আছে। আর যন্ত্রণা থেকেই সমস্ত বিপ্লবের উত্তেজনা।

কিন্তু তেইশে জানুয়ারি কে.এল. মুখার্জির বিচারে সুভাষের এক বছর জেলের হুকুম হল। তার অপরাধ সে রাজপথে শোভাযাত্রা চালনা করেছিল যার মুখে একটি মাত্র ধ্বনি ছিল : স্বাধীনতা।

লাহোরে স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রথম ভারতবাসী যে স্বাধীনতা উচ্চারণ করবার জন্যে জেলে গেল সে আর কেউই নয়, সে সুভাষচন্দ্র। আর তার কারাবরণের তারিখটাও লক্ষণীয়। তেইশে জানুয়ারি। সুভাষের জন্মদিন। সে পুণ্যদিনে জাতিও নতুন করে জন্মগ্রহণ করল। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল সুভাষকে অভিবাদন করে টেলিগ্রাম করল : লাহোর

ঘোষণার পর তুমিই প্রথম বলি, আমার অভিনন্দন নাও।

মহাত্মা গান্ধী স্থির করলেন, তিনিই নিজে সর্বপ্রথম আইন ভঙ্গ করবেন। সকলে জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল : কী উপায়ে?

বলছি। যে সত্যাগ্রহী সে কিছুই গোপন করে না। সত্যই স্বচ্ছতম বস্তু, আর যে সেই সত্যকে আশ্রয় করে থাকে সেও সারল্যের প্রতিমূর্তি।

লর্ড কিচনার বা ভন হিণ্ডেনবার্গ তাদের সমরকৌশল প্রচ্ছন্ন রাখে কিন্তু মহাত্মা রাখেন না এবং তিনি জানেন সাড়া দেশ জুড়ে এবার যে আন্দোলন সুরু হবে তা গত মহাযুদ্ধের চেয়ে কম গুরুতর হবে না। কী করবেন তিনি? তিনি লবণ-আইন ভঙ্গ করবেন। যেখানে সমুদ্র থেকে এক আঁজলা জল তুলে নিলেই নুন পাওয়া যায় সেখানেও নুন খেতে ট্যাক্স দিতে হয়। এই বর্বর আইন তিনি মানবেন না। তিনি তাঁর সহচরদের নিয়ে সমুদ্রতীরবর্তী কোনো লবণ-পল্লীতে যাবেন আর তিনি নিজেই নুন সংগ্রহ করে নেবেন জল থেকে। হ্যাঁ, নুনের ডিপোগুলোও দখল করে নেবেন। নুন জীবনধারণের প্রধান উপাদান। এ নুন আমাদের। এ আমাদেরই জল থেকে পাওয়া। এর জন্যে আবার ট্যাক্স কিসের? এ আমরা যখন-তখন তৈরি করে নেব। গান্ধীজি আর বারুদ-ফুরোনো গুলি নন, তিনি এখন একেবারে তাজা গুলি, তাঁর বুলিও এখন প্রায় গুলির মত।

বলছেন, 'আমি পদযাত্রায় নামলেই হয়তো ইংরেজ সরকার আমাকে গ্রেপ্তার করবে কিন্তু এবার আমি কোনো অবস্থাতেই উনিশশো বাইশ সালের মত আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেব না। আমি আমার আশ্রমবাসীদের নিয়ে এ আন্দোলন সুরু করব, যারা অহিংসায় ও নীতিনিষ্ঠায় শিক্ষিত, আমাদের দিক থেকে কোনো ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু আন্দোলন যখন বহুবিস্তৃত হয়ে পড়বে, তখন যদিও হিংস্রতাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে, তবুও এ কথা পরিষ্কার হয়ে থাক যে এবার আর কোনো অবস্থাতেই ফিরে যাওয়া নেই, এবং যতক্ষণ একটি মাত্র অহিংস যোদ্ধা জীবিত থাকবে ততক্ষণ এ আন্দোলনও মরবে না।

দেশের লোকের বুক সাহসে ভরে উঠল। এবার চৌরিচৌরা ঘটলেও আর পিছু হটা নয়।

গান্ধীজি একা যাবেন। না, বল্লভভাই প্যাটেলকেও সঙ্গে নেবেন না। আর সকলে কি তবে অলস হয়ে বসে থাকবে? বিশ্রাম করবে? মহাত্মা হাসলেন : 'হ্যাঁ, অলস থাকবে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে। ক্লান্ত হবার জন্যেই বিশ্রাম।'

এবার হয় আমরা জিতব নয় আমরা শেষ হয়ে যাব। আন্দোলনে নামবার আগে মহাত্মা লর্ড আরউইনকে চিঠি লিখলেন :

প্রিয় বন্ধু,

আইন-অমান্য আন্দোলনে নামবার আগে আমি আপনাকে লিখে দেখছি অন্য কোনো পথ আছে কিনা।

আমার ব্যক্তিগত মনোভাব অত্যন্ত স্বচ্ছ। মানুষ তো দূরের কথা, জীবিত কোনো প্রাণীকে স্বেচ্ছায় আঘাত দিতে আমি অক্ষম, যদিও সেই প্রাণী ও মানুষ আমার ও

আমার পরিজনদের বৃহত্তম ক্ষতিসাধনে তৎপর। তাই যদিও আমি ব্রিটিশ শাসনকে অভিশাপ বলে মনে করি, আমি কোনো ইংরেজের বা ভারতবর্ষে তার ন্যায়ার্জিত স্বার্থের অনিষ্ট করতে একেবারেই ইচ্ছুক নই।

ব্রিটিশ শাসন অভিশাপ হলেও ইংরেজমাত্রকেই আমি অভিসম্পাতের যোগ্য বলে মনে করি না। পৃথিবীর আর কোনো লোকের মতই ইংরেজ ভালো বা মন্দ, ব্যক্তিগত বিচারে আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আমার প্রিয়তম বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ। আর ব্রিটিশ শাসন যে অভিশাপ সে তো সরল ও সাহসী ইংরেজ লেখকদের বই থেকেই আমি শিখেছি।

ব্রিটিশ শাসনকে অভিশাপ মনে করি কেন তার কারণ কি বিশদ করে বলতে হবে?

একটা ব্যয়বহুল শাসনভার চাপিয়ে লক্ষ লক্ষ মূক মানুষের রক্তরস সমস্ত শুষে নেওয়া হচ্ছে। একটা জাতিকে দাস-জাতিতে পরিণত করা হচ্ছে। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি উৎখাত করে দিয়েছে। আমাদের নিরস্ত্র করে রাখতে-রাখতে সহায়হীন কাপুরুষ করে তুলেছে। বলুন এ আর কতদিন সহ্য করব?

আমার অসংখ্য দেশবাসীর সঙ্গে আমি আশা করেছিলাম ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বুঝি কিছুটা উদার হবে। অল্প মাত্রায় হলেও অন্তত ডোমিনিয়ন স্টেটাসটা দেবে, কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্টতর হচ্ছে সংগ্রাম ছাড়া ব্রিটিশ সরকার কিছুই দেবে না, কিছুই ছাড়বে না। আরো যত দ্রুত সম্ভব দেশের বাকি রক্তটুকুও শুষে নেবে।

আপনার নিজের মাইনেটাই ধরুন না। আপনার মাস-মাইনে একুশ হাজার টাকারও কিছু বেশি। তা ছাড়া আরো কিছু পরোক্ষ আদায় আছে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর মাইনে বছরে পাঁচ হাজার পাউণ্ড, টাকার মাসে পাঁচ হাজার চারশো টাকা। আপনার দৈনিক আয় দিনে সাত শো টাকা যেখানে একজন ভারতবাসীর গড় পড়তা রোজগার দিনে দু আনা। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর দৈনিক আয় একশো আশি টাকা যেখানে একজন ইংরেজের গড় পড়তা আয় দিনে দু টাকা। তার মানে আপনি ভারতবাসীর গড় পড়তা আয়ের পাঁচহাজার গুণেরও বেশি টাকা পাচ্ছেন আর ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছেন ইংরেজের গড় পড়তা আয়ের মোটে নব্বুই গুণ। তফাৎটা একবার দেখুন। আমি আপনাকে কোনরকম দুঃখ দেবার জন্যে এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলছি না, হয়তো যত টাকা আপনি পাচ্ছেন তত আপনার প্রয়োজন নেই, হয়তো আপনার রোজগারের বেশির ভাগই দানে-ধ্যানে ব্যয় হয় তবু নতজানু হয়ে বলছি বৈসাদৃশ্যটা একবার বিবেচনা করে দেখুন। যে বিধি-পদ্ধতিতে এ ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে আপনার কি মনে হয় না তার বিলোপ হওয়া বাঞ্ছনীয়?

যাই হোক, আমার আবেদন যদি আপনার হৃদয় স্পর্শ অক্ষম হয়, যদি কোনো অন্যায়ের প্রতিকারের ব্যবস্থা না করেন, তবে আপনাকে জানিয়ে রাখছি, আগামী ১১ই মার্চ আমি লবণ-আইন অমান্য করব। দরিদ্র দেশবাসীর দিক থেকে দেখতে গেলে এ আইন সম্পূর্ণ বেআইনি। এ আইন কেন যে আমরা এত দিন বজায় থাকতে দিয়েছি ভাবলে বিস্ময় লাগে। আমি জানি আমাকে গ্রেপ্তার করে ফেলে আমার পরিকল্পনাকে আপনি বানচাল করে দিতে পারেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার পিছনে হাজার হাজার

লোক এগিয়ে আসবে, আইন ভাঙার শাস্তি হাসিমুখে বরণ করে নিতে তাদের এতটুকুও বাধবে না।

লর্ড আরউইন গান্ধীকে আমলেই আনল না, এক কথায় জবাব পাঠাল। 'যাতে শান্তির ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা এমন কোনো কাজে প্রবৃত্ত হওয়া দুঃখের কথা।'

'আমি নতজানু হয়ে রুটি চেয়েছিলাম,' গান্ধীজি আবার লিখলেন আরউইনকে: 'পাথর পেলাম। ইংরেজ কেবল বলের কাছেই নতিস্বীকার করে এ আমি জানি বলেই আপনার উত্তরে বিস্মিত হইনি। শান্তির কথা বলছেন? সে শান্তি তো কারাগারের শান্তি। ভারতবর্ষই এক বিশাল কারাগার। আমি আপনার আইন অস্বীকার করি আর যে দুর্বহ শান্তির শোকাবহ একঘেয়েমি সমস্ত দেশের শ্বাসরোধ করে আছে তাকে ভেঙে ফেলাই আমার পবিত্র কর্তব্য।'

বারোই মার্চ গান্ধী তাঁর পদযাত্রা সুরু করলেন সবরমতি থেকে দণ্ডি, উনআশি জন অনুচর। রিক্ত গাত্র, নগ্ন পা, হাতে একটা লাঠি—ভারতবর্ষের ইতিহাসপুরুষ বেরুলেন স্বাধীনতালক্ষ্মীকে সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধার করে আনতে। ব্রিটিশ সরকার জামার হাতায় মুখ লুকিয়ে হাসল। এও আবার একটা আন্দোলন নাকি? য়্যাংলোইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যান পরিহাস করে লিখল, যতদিন ডোমিনিয়ন স্টেটাস না পায় গান্ধী শুধু সমুদ্রজল গরম করুক! কিন্তু পলকে সমস্ত দেশ তপ্ত সমুদ্রজলের মতই উত্তাল হয়ে উঠল।

গুজরাটের সমুদ্রকূলে ছোট একটি গ্রাম দণ্ডি, সবরমতি থেকে দুশো মাইল, গান্ধী যাবেন পায়ে হেঁটে। সেই বিরাট মহাপ্রস্থানে হাজার হাজার লোক এসে যোগ দিচ্ছে—এ শুধু পথযাত্রা নয়, এ আমাদের তীর্থযাত্রা—আমাদের কেউ ডাকেনি, আমরা নিজের থেকে এসেছি নিজের ডাকে। যদি কেউ না-ও আস আমি একলা যাব। কবিগুরুর 'একলা চলো রে' গানটি যে আমার জীবনের সাধনবীজ।

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণ তলে একলা দলো রে।।'

পায়ে-পায়ে দেশানুরাগের রক্ত গোলাপ ফুটিয়ে-ফুটিয়ে চলছেন গান্ধী। চলেছেন মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী মহিমায়, সমস্ত মৃত্যুকে ভয়কে অস্থিরতাকে অতিক্রম করে। চারদিকে সুরু হয়ে গেল আইন-ভাঙার মহোৎসব। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চোখ কচলাল। উঠে বসল। এ যে দেখছি লঘু কোনো খামখেয়াল নয়, এ যে দেখছি আর উপেক্ষা করে থাকা চলে না। গ্রামে-গ্রামে, পথে-পথে যেখান দিয়ে মহাত্মা যাচ্ছেন, শুধু তার আশে-পাশেই নয়, দেশের সর্বত্র, শহরে-গঞ্জে, বন্দরে-বাজারে পড়ে গেল আইন-অমান্যের হিড়িক। মহাত্মার দণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই লেগে গেল অহিংসার আগুন। বল্লভভাই প্যাটেল গ্রেপ্তার, হলেন, তাঁর চারমাস জেল হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, 'বারদোলাইজ্ দি কানট্রি।' সমস্ত দেশকে বারদোলি করে তোলো।

নির্বিচলে মহাত্মা এগিয়ে চলেছেন। কোনো সমরবিজয়ে নয়, বাণিজ্যবিস্তারে নয়, শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সত্যই স্বাধীন। যে সত্যে আগ্রহী সে স্বাধীনতায় প্রতিশ্রুত। স্বাধীনতাই তার চোখের আলো, মুখের ভাষা, বুকের নিশ্বাস, সর্বদেহের রক্তচলাচল।

চারদিকে শুধু এক বাণী, এক ধ্বনি—গান্ধীকি জয়। আর এক প্রতিনিনাদ: 'যাত্রা করো, যাত্রা করো, যাত্রীদল। উঠেছে আদেশ—বন্দরের কাল হল শেষ।'

'আমি আগে 'গড সেভ দি কিং' গেয়েছি, অন্যকেও গাইতে শিখিয়েছি।' বলছেন মহাত্মা: 'আমি আবেদন-নিবেদন আপস-মীমাংসায় বিশ্বাসী ছিলাম।' কিন্তু সে সমস্ত এখন গোল্লায় গিয়েছে। আমি জেনেছি এই গভর্নমেন্টকে সজুত করার পক্ষে এ সব কোনো উপায়ই উপায় নয়। রাজদ্রোহ—রাজদ্রোহই এখন আমার ধর্ম হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, আমাদের সংগ্রাম অহিংস। আমরা কাউকে হত্যা করবার জন্যে বেরোইনি, আমরা আমাদের ধর্মপালন করতে বেরিয়েছি—আর জেনো এই গভর্নমেন্টের অভিশাপকে চিরদিনের মত মুছে ফেলাই আমাদের একমাত্র ধর্ম।'

কলকাতায় মেয়র জে. এম. সেনগুপ্ত ইচ্ছাপূর্বক আইন ভাঙলেন, পার্কে দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজদ্রোহী রচনা—আর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। জেগে উঠল কলকাতা, জেগে উঠল বাংলা দেশ। সুরু হয়ে গেল জেল ভরতি করার ঢেউ। 'বাঁচি আর মরি, বাহিয়া চলিতে হবে তরী, এসেছে আদেশ—বন্দরের কাল হল শেষ।'

মহাত্মার কানে পৌঁছুল খবর, প্যাটেল আর সেনগুপ্ত আইন-ভঙ্গের জন্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন। মহাত্মা বললেন, 'ভয় নেই, জয় হবে অহিংসার। যদি নুনের ট্যাক্স উঠে যায়, যদি মদ রদ হয়, তা হলে তো অহিংসারই জয় হল। তা হলে স্বরাজ পেতে ভারতকে বাধা দিতে পারে এমন কোনো শক্তির কল্পনা করতে পারি না। তেমন শক্তি যদি কোথাও থাকে, আমি তাকে একবার দেখতে চাই। হয় আমার অভিলষিত বস্তু নিয়ে আমি ফিরব নয় আমার মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসবে।'

মৃত্যুভয় সুভাষেরও নেই। জেল-সুপার মেজর সোমদত্তের গুলি-করার আদেশের সামনে সুভাষ বুক মেলে দাঁড়িয়েছে।

চব্বিশ দিনের পদযাত্রা শেষ করে পাঁচুই এপ্রিল মহাত্মা দাণ্ডিতে এসে পৌঁছলেন। ছয়ুই এপ্রিল সবাইকে নিয়ে সমুদ্রে পুণ্য স্নান করলেন। তারপর সমুদ্রের পারে যে নুন পড়ে ছিল তা কুড়িয়ে নিয়ে লবণ-আইন ভঙ্গ করলেন। কত সহজলভ্য নুন, কত সহজসাধ্য আইন-ভঙ্গ।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হকচকিয়ে গেল। সমুদ্রের জল যে এত নোনতা তা আগে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি গান্ধীর আন্দোলনের কত শক্তি, কত মাহাত্ম্য। তারা যথারীতি লাঠি চালাল, গুলি চালাল। রুটির বদলে পাথর নয়, এ একেবারে নুনের বদলে গুলি। করাচি, রত্নগিরি, পাটনা, পেশোয়ার, কলকাতা, মেদিনীপুর, কোলাপুর, মাদ্রাজ আরো অনেক জায়গায় ব্রিটিশ গুণ্ডামি উদ্দাম হয়ে উঠল। গুলি চালাল করাচিতে, পেশোয়ারে, মেদিনীপুরে, মাদ্রাজে। সুরু হল অসভ্য অকথ্য নির্যাতন।

'কালো রাজত্ব' নাম দিয়ে গান্ধী প্রবন্ধ লিখলেন: 'হয় গ্রেপ্তার করো নয় লবণ আইন তুলে দাও। যদি এ দুটোর একটাও না করো তা হলে জনতা হাসিমুখে বরং

গুলি খাবে তবু নির্যাতন বরণ করবে না।'

আর কত জেলে পুরবে? সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ষাট হাজার লোক এরই মধ্যে জেলে ঢুকেছে। জেলে আর জায়গা কই? এখন মারধোর বা অসভ্যতা করা ছাড়া গভর্নমেন্টর পথ কী।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেও সত্যাগ্রহীদের দুর্দান্ত ভিড়। 'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমিই ধন্য ধন্য হে।' কিন্তু সত্যাগ্রহীদের নিয়ে মেজর সোমদত্তের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ওরা চোর গাঁটকাটাদের সঙ্গে একত্র সি-ক্লাশে থাকতে চায় না, ওরা জাঙ্গিয়া পড়তে নারাজ। ওরা এমন কী গুণবন্ত যে একেবারে মাথায় করে তুলে রাখতে হবে! নতুন একদল সত্যাগ্রহী এসেছে, তারা তো গোড়া থেকেই ঘাড় বাঁকাল। আমরা ওসব অখাদ্য খাব না, পরব না অসভ্য বেশ। কী, কথা শুনবে না? সোমদত্ত ডাণ্ডাবাজির অর্ডার দিল।

ওয়ার্ডাররা লাঠি চালাল, শিখ বন্দী বলবন্ত আর প্রেমসিংকে মারতে নিয়ে এল পাঠান প্রহরীদের। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হল, তারা সরকারের দলে গিয়ে সত্যাগ্রহীদের ঢিল ছুঁড়তে লাগল। সকাল নটা, মেজর সোমদত্ত পাগলা ঘন্টি বাজাবার হুকুম করে বসল।

'সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি—' সত্যাগ্রহীর দল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল: বন্দেমাতরম্।

সুভাষ যতীন্দ্রমোহন, কিরণশঙ্কর, সত্যরঞ্জন বক্সী, সত্য গুপ্ত, পূর্ণ দাস, ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্ত ও আরো অনেকে বেরিয়ে এল। কী ব্যাপার? কেন এই উন্মাদ নিনাদ? কেন নেই, ঘন্টি যখন বেজেছে, তখন বাক্যব্যয় না করে যে যার ঘরে ঢুকে পড়ো। পাগলা ঘন্টি বাজামাত্রই কয়েদিদের ঘর-বন্দী হতে হবে এই আইন। আইন যা আছে তাই আছে। কয়েদিদের আবার প্রশ্ন কী! জেলের বাইরে আইন ভাঙতে পারো, জেলের মধ্যে ভাঙা চলবে না। কামরায় ঢোকো এই মুহূর্তে। বন্দুকধারী সেপাইয়েরা এসে পড়েছে, এক পল্টন সেপাই। যে যার বিবরে লেজ গুটিয়ে সরে পড়ো।

বেরিয়ে এসেছে সোমদত্ত। এখন একেবারে যমদত্ত বা যমপ্রেরিতের মত চেহারা। আই-এম-এস ডাক্তার, গোড়ায় বেশ সুশোভন মুখোস পরেছিল, এখন সে মুখোস খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ব্রিটিশপালিত হিংস্রতা।

'জোর করে ঢোকাও।' গর্জে উঠল সোমদত্ত।

সুরু হল ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি। ঠেলে গুঁতিয়ে ঘুসি মেরে লাথি মেরে লাঠি মেরে যে করে পারো অবাধ্যদের ঢুকিয়ে দাও। কিন্তু সুভাষকে সরায় সুভাষকে নড়ায় কার সাধ্য!

সোমদত্ত হুঙ্কার করে উঠল: 'গুলি করো।'

'বেশ, তাই, গুলি করো।' সুভাষ বুক পেতে দিল।

প্রাণ দুর্মূল্য জানি, প্রাণকে অমূল্য করে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করে দেব। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করবার যে তেজ সেই তেজে মহিমান্বিত সুভাষ। এই জ্যোতির্ময় অপরাজেয় মূর্তি যে দেখেছে সেই কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে।

'গুলি করো।' জমাদার যমনা সিংকে লক্ষ্য করে আবার গর্জাল সোমদত্ত।

যমনা সিং বললে, 'রিটন অর্ডার দিন। লিখিত অর্ডার না পেলে গুলি করতে পারব না।'

সোমদত্ত থমকে দাঁড়াল। লিখিত অর্ডার দেবার মত অর কলজে নেই। হতবুদ্ধির মত বাঁশি বাজিয়ে দিল। ঢুকে পড়ল আরো একদল সান্ত্রিসেপাই। যে করে হোক ওদের সেলে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করো। চেলাচামুণ্ডারা তখন লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুভাষ অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। অল্প বিস্তর সবাই আহত হয়েছে, তার মধ্যে সেনগুপ্ত আর সুভাষই বেশি। সোমদত্তের এমন ব্যবস্থা যে সুভাষকে ফার্স্ট এইড পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্ত খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখছে কী করা যায়। এ দিকে সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল সুভাষ ও সেনগুপ্তকে প্রহার করে মেরে ফেলা হয়েছে। হাজার হাজার লোক জেল গেটে সমবেত হল।

'বল রে বন্য হিংস্র বীর
দুঃশাসনের চাই রুধির।
অত্যাচারী সে দুঃশাসন
চাই খুন তার চাই শাসন।
হাঁটু গেড়ে তার বুকে বসি
ঘাড় ভেঙে তার খুন শোষি।
আয় ভীম আয় হিংস্র বীর
কর আকণ্ঠ পান রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই।
দুঃশাসনের রক্ত চাই॥'

না, বিপরীত কিছু ঘটেনি, সুভাষ ও সেনগুপ্ত সুস্থ আছে। সোমদত্তের সম্পর্কে তদন্ত কমিটি বসেছে। সে সরবে এখান থেকে। সুভাষ কিরণশঙ্কর পূর্ণ দাস ও আরো কেউ কেউ অনশন সুরু করল। তাদের সামান্যতম সন্ত্রান্ততম দাবি মিটিয়ে ফেলল কর্তৃপক্ষ। বাসন্তী দেবীর হাতে ফলের রস খেয়ে অনশন ভাঙলে ছেলেরা।

সোমদত্ত বদলি হয়ে গেল। বিপ্লবীরা কী করে সব খবর পেয়েছে, ঠিক করলে সোমদত্তকে সাবড়ে দেবে। বিপ্লবী বীরেন ঘোষকে এ কাজের ভার দেওয়া হল। কী দিয়ে মারবে? সম্প্রতি রিভলভার মজুত নেই, বোমা ফেলেই কাজ হাসিল করবে। বোমার শক্তিটা একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। নিশ্চয়ই উচিত। নইলে অস্ত্র যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে কিংবা আশাভঙ্গ ঘটায়, তার চেয়ে তা ব্যবহার না করাই ভালো।

শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে দু-দুটো বোমা গভীর রাতে ধানবাদের রেললাইনের উপর ছোঁড়া হল। একটা আধখানা ফাটলেও আরেকটা একটু শব্দও করল না। সোমদত্ত বেঁচে গেল।

চোদ্দ

আইন-অমান্য আন্দোলন দিকে-দিকে জাগরণের আলো জ্বালাল—তার মধ্যে সব চেয়ে

বড় আলো নারী-জাগরণ। দলে দলে মেয়েরা বেরিয়ে এল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে, সমস্ত অবরোধের প্রাচীর ডিঙিয়ে। কোনো কৃত্রিম সম্ভ্রান্ততার চেতনা তাদের পারলে না আড়ষ্ট করে রাখতে। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা।' আর বুঝি স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখা গেল না। দুবৃত্তবৃত্তশমনী এবার স্বয়ং যুদ্ধে নেমেছেন।

মেয়েদের উদ্দেশ করে গান্ধী বললেন, 'শুধু বিলিতি কাপড় বর্জন করিয়ে ষাট কোটি টাকা বাঁচানো যায় আর মদ খাওয়া বন্ধ করিয়ে পঁচিশ কোটি। আপনারা শুধু ঐ দুজাতীয় দোকানে পিকেটিং সুরু করে ওদের শোষণবাণিজ্য অচল করে দিন। এ কাজে দুঃসাহসের কোনো রোমাঞ্চ নেই বলে পিছিয়ে থাকবেন না, একমাত্র আন্তরিক হওয়ার মধ্যেই রোমাঞ্চ, আর আন্তরিকতাই সাফল্যের অগ্রদূত। আর, প্রস্তুত থাকুন, ওরা আপনাদের জেলে ধরে নিয়ে যাবে, আর, চাই কি, শারীরিক আঘাত করবে, অপমান করবে। ঐ আঘাত আর অপমান সহ্য করা গর্বের জিনিস বলে মনে করবেন। আর আপনাদের যন্ত্রণাভোগই তো স্বাধীনতার পদক্ষেপকে দ্রুততর করবে।'

গভর্নমেন্ট প্রথম আঘাত হানল প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করে। সমস্ত দৈনিক পত্রিকাকে সরকারের পর্যবেক্ষণের অধীনে আনা হল। কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করা হল। জেলের পর জেল সত্যাগ্রহীতে উপচে গেল। নতুন জেল তৈরি হল, তাতেও তিলধারণের স্থান নেই।

গান্ধীজি বললেন, 'তবু এ তো আন্দোলনের পঞ্চম সপ্তাহ মাত্র।'

ব্রিটিশ সরকার জানে একটা মুক্ত মানুষের থেকে একটা বন্দী মানুষের শক্তি বেশি, তবু জেনে শুনে গান্ধীকে তারা পাঁচুই মে গ্রেপ্তার করল। রাত একটার সময় তাঁকে একটা লরিতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কোন এক রেলস্টেশনে, সেখান থেকে বোম্বাইয়ের কাছে বরিভলি-তে, সেখান থেকে মোটরে করে এরবাদা জেলে।

এর কদিন আগে গান্ধী চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন আরউইনকে: 'এর পর লবণ আইন ভাঙতে আমি দর্শনায় যাচ্ছি। সেখানকার নুনের কারখানা নাকি বড়লাটের বাড়ির মতই সুরক্ষিত। বিনানুমতিতে নাকি এক চিমটি নুনও কেউ নিয়ে যেতে পারে না। সেইখানেই এবার আমার অহিংস আক্রমণ চালাব ভেবেছি।

এই আক্রমণ আপনি তিন উপায়ে বন্ধ করতে পারেন। প্রথম উপায়, লবণ-ট্যাক্স রহিত করে। দ্বিতীয় উপায়, আমাকে ও আমার দলকে গ্রেপ্তার করে, যদি না অবশ্য আমাদের বদলা খাটতে লোক পাওয়া যায়। আর তৃতীয় উপায়, আপনার গুণ্ডাশক্তিকে লেলিয়ে দিয়ে, যদি না অবশ্য ভাঙা মাথার বদলে আস্ত মাথা এগিয়ে আসে।

হ্যাঁ, গুণ্ডাশক্তি ছাড়া কী! কী করেছে পেশোয়ারে, করাচিতে, মাদ্রাজে, মেদিনীপুরে!

পেশোয়ারে শাহিবাগে একটা সভার পর ন জন স্থানীয় নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। একটা লরিতে চাপিয়ে থানায় নিয়ে যাবার পথে লরি বিকল হয়ে পড়ে। নেতারা বললে, আমরা হেঁটেই থানায় যাচ্ছি। তখন তাদের নিয়ে জনগণের একটা মিছিল বেরোয়। কাবুলিগেট থানায় এসে দেখে থানা বন্ধ। ঘোড়ায় চড়ে এক পুলিশ কর্মচারীর উদয় হয়, তাকে দেখে জনতা জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ওঠে। কী, এতদূর স্পর্ধা! তখন পুলিশপুঙ্গব

খেপে নিয়ে সাঁজোয়া গাড়ি তলব করে। একখানা নয়, দু খানা নয়, তিনখানা। পূর্ণশক্তিতে ঐ তিনটে গাড়ি জনতার মধ্য দিয়ে পথ কেটে এগিয়ে যায়, কটা লোক চাপা পড়ে তক্ষুনি মারা যায়, কটা বিধ্বস্ত হয়। তখন অহিংসা চিন্তারও বাইরে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে সাঁজোয়া গাড়িতে আগুন লাগায়। পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকেও মার দেয়। আর কথা নেই। মুষলধারে গুলিবৃষ্টি সুরু হল। ক শ লোক কয়েক মিনিটের মধ্যে খতম হয়ে গেল।

ক দিন পরে গঙ্গা শিং কম্বোজ টাঙ্গায় করে যাচ্ছে, সঙ্গে স্ত্রী, ন-দশ বছরের মেয়ে হরপাল কাউর আর দেড় বছরের ছেলে বচিত্তার সিং, হঠাৎ কাবুলিগেটের কাছে এক ব্রিটিশ লান্স করপোরাল গুলি করে বসল। সে অনেক পাখি মেরেছে, ভাবল মানুষের বাচ্চা মারতে না জানি আরো কত রোমাঞ্চ, আর ভাবতে ভাবতেই দিল গুলি ছুঁড়ে। দুটো পাখির মতই হরপাল আর বচিত্তার পড়ে গেল মাটিতে, ওদের মা তেজো কাউরও গুলিবিদ্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। হাজার হাজার লোক শিশুদুটোকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে চলছে শ্মশানে, তখন সতর্ক না করেই মিলিটারির লোক আবার গুলি ছুঁড়ল। বাচ্চা দুটো আবার পড়ে গেল মাটিতে।

আবার জনতা এসে ওদের কুড়িয়ে নিয়ে চলল। আবার গুলি। গভর্নমেন্টের হিসেবমত সংখ্যা তেমন কিছু মারাত্মক নয়, ন জন হত, আঠারো জন আহত। এ বর্বরতার নজির ব্রিটিশ শাসন ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথায় পাওয়া যাবে?

মরুভূমিতে একটি ওয়েসিস পাওয়া গেল। গাড়োয়ালি সৈন্যরাও আদেশ অমান্য করেছে। নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাতে তারা রাজি হয়নি। যারা কোনো হিংসাত্মক কাজে উদ্যত নয়, নিরুপদ্রব, তাদের কোন বিবেকে হত্যা করব? ফল কী হল? ফল হল সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রশূন্য করা হল, বসানো হল, কোর্টমার্শাল বিচারে প্রত্যেকটি সৈন্যের দীর্ঘ কারাবাসের হুকুম হল।

মাদ্রাজে মিশনারি সাহেব রেভারেণ্ড প্যাটন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পিকেটিং দেখছিল, দেখছিল লাঠি-চার্জ কী রকম অমানুষিক হতে পারে, তারপরে, তার আরও অপরাধ, তার গায়ে খদ্দরের পোশাক—তাকেও ধবে পুলিশ পিটুনি দিলে। বোম্বাইয়ে কলবাদেবী রোডে পুলিশ সাহায্যে লরি করে বিলিতি কাপড় সরাচ্ছিল, বারো বছরের ছেলে বাবু গনু লরির সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করতে আসছে, অমনি তাকে চাপা দিয়ে মেরে রেখে লরি বীরবিক্রমে বেরিয়ে গেল। বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারকে বদলি করানো হল যেহেতু তার লাঠি পিকেটারদের গায়ে পড়ছে, পিঠে পড়ছে, মাথায় পড়ছে না—তাকে বদলি করে আনা হল উইলসনকে, লাঠি-বাজিতে ডি-লিট পাওয়া, কেননা তার লাঠি সব সময়েই মাথার উপর তাক করা—মাথা ফাটিয়ে রক্ত ছুটিয়ে না দিলে ব্রিটিশের হাতে লাঠির মাহাত্ম্য কী!

মাথায় গান্ধী টুপি দেখলেই মারো, হাতে জাতীয় পতাকা দেখলেই ছিনিয়ে নাও আর যদি মাটিতে বসে পড়ে ১৪৪ ধারা অমান্য করে, তা হলে তাদের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দাও। ধরে নিয়ে গিয়ে এমন জায়গায় ছেড়ে দিয়ে এস সেখান থেকে আসতে ট্রেন লাগে ও ট্যাঁকে যেন ট্রেনভাড়া না থাকে। আহতদের হাসপাতালে নেবে

কী, টেনে হিঁচড়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে এস। মারবার আগে উলঙ্গ করে নাও। হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে পিন ফোটাও। শরীরের এমন সমস্ত স্থান মুঠো করে চেপে ধরো যাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অকথ্য অসভ্যতা। এ সব বিধান কেন? না, ওরা নিরুপদ্রবে আইন ভঙ্গ করছে। কর্নাটক থেকে মেদিনীপুর ট্যাক্স দিচ্ছে না। বন-আইন ভেঙে গাছ কেটে ফেলছে। মদ খেতে দিচ্ছে না। বন্দরে-স্টেশনে বিলিতি কাপড়ের গাঁট খালাস হচ্ছে না। সবাই শাদা খদ্দর পরছে। পেশোয়ারে আবার লালশার্ট—তারা খোদাই-খিদমদগার বা ঈশ্বরের সেবক হয়েছে—তাদের মধ্যেও এসেছে আরেক গান্ধী—সীমান্ত গান্ধী।

সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে কঠিন হাতে দমন করো। নির্ভয়ে, নির্বিবাদে, নিরঙ্কুশ হয়ে। ইংরেজ শাসন দুর্জয়, দুর্বার। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই ভারতবর্ষে। ওরা কী করবে? ওদের হাতে কি অস্ত্র আছে? কে উত্তর দেবে? উত্তর দিল চট্টগ্রাম। উত্তর দিল ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি। উনি শো তিরিশের আঠারোই এপ্রিল ব্রিটিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে।

অস্ত্রাগার দুটো, একটা পুলিশ-আর্মির, আরেকটা রেলোয়ে-আর্মির। তৃতীয় আক্রমণের স্থল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। আরো দুটো কাজ হবে ধুম স্টেশনে রেলোয়ে লাইন তুলে দেওয়া আর শহরে যত সাহেব আছে তাদের কোতল করা।

পুলিশ আর্মারির ভার দেওয়া হল অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষকে, রেলোয়ে-আর্মারির ভার নির্মল সেন আর লোকনাথ বলের উপর। আর অম্বিকা চক্রবর্তী যাবে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। কেউ-কেউ যাবে দুমে, চল্লিশ মাইল দূরে, ফিস-প্লেট তুলতে। আর সাহেবগুলোকে মারতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না, তারা অমনি পালাবে। জাতীয় সেনাবাহিনীতে বাষট্টি জন ফৌজ, তার মধ্যে বেশির ভাগই কিশোর, স্কুল-কলেজের ছাত্র। সম্বল কটা পিস্তল আর বন্দুক আর বোমা। সম্বল সাহস শৌর্য মন্ত্রগুপ্তি আর বিপ্লবে বিশ্বাস। সম্বল অনুরাগ আর আনুগত্য।

এই অভিযানের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন। মাস্টার-দা। স্কুলে অঙ্কের মাস্টারি করে বলে মাস্টার-দা। মাস্টারকে লোকে ভয় করে, না হয় ভক্তিও করে, কিন্তু কী গুণে সকলের কাছে দাদার ভালোবাসা পায় সেটার সঠিক অনুমানের মধ্যেই এই নেতৃত্ব ব্যাখ্যা। সূর্য সেন স্বাধীনতার বিদ্যালয়েও এক নির্ভুল অঙ্কের মাস্টার।

নিজামপল্টনে সূর্য সেনের হেডকোয়ার্টার। সেখান থেকে তিন দল যাবে তিন জায়গায় তিনটে মোটরে করে। পিছনে থাকবে পদাতিক-বাহিনী। অগ্রগামীদের সঙ্কেত পেলে তারা এগোবে সাহায্য করতে। তারপর যার যার কাজ সমাধা করে ফিরবে হেডকোয়ার্টারে, রিপোর্ট করবে।

রাত্রি সাড়ে-আটটায় এই মহা-আক্রমণের লগ্ন নির্ধারিত হল। সেনাপতি ও সৈন্য সকলেই সমীচীন পোশাকে সজ্জিত। তৃপ্ত চোখে সবাইকে দেখলেন সূর্য সেন। সবাই আগুন হয়ে জ্বলছে, আবেগে-উৎসাহে ফুটছে, সকলেই মহৎ সংকল্পে দৃঢ়বদ্ধ। কিন্তু মোটরগাড়ি যে তিনখানা চাই। তৎক্ষণাৎ বেরুল দুজন। ট্যাক্সিড্রাইভার নাজির আহমেদকে খুন করে তৃতীয় ট্যাক্সি জোগাড় হল। তাই অপারেশান সুরু হতে দু ঘণ্টা দেরি হয়ে

গেল। কখনো-না-র থেকে দেরিও ভালো।

পুলিশ-আর্মারির সান্ত্রি 'হু-কামস' বলে বন্দুক তাক করবার আগেই গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ল। আর সব পাহারাদার হাওয়া হয়ে গেল নিমেষে। বিপ্লবীরা অস্ত্রশস্ত্র যা পেল লুঠ করে নিল। ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে নিয়ে উড়িয়ে দিল জাতীয় পতাকা।

রেলোয়ে-আর্মারির সান্ত্রিও এক গুলিতে শেষ হয়ে গেল। সার্জেন্ট মেজর ফ্যারেল এসেছিল এগিয়ে, সেও বাঁচল না। দরজার তালাটা খোলা যাচ্ছে না দেখে একটা মোটা দড়ি বেঁধে আরেক প্রান্ত গাড়ির ল্যাজের সঙ্গে বেঁধে উলটো দিকে গাড়ি চালাল। হেঁচকা টানে ছিটকে গেল তালা। তারপর যত পারো কুড়িয়ে নাও গোলাগুলি, বন্দুক-রিভলভার। তারপর দুটো আর্মারিতেই পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুনের শিখারই ধ্বনি-রূপ বন্দেমাতরম। সমস্ত একেবারে যুদ্ধের আঙ্গিকে সাজানো।

ধুমের কাছে রেল-লাইনও অপসারিত করা হল আর একটা মালগাড়ি বেলাইন হয়ে পড়ে রাস্তা জুড়ে রইল। টেলিগ্রাফ টেলিফোনের লাইনও কাটা হল। কিন্তু ইয়োরোপিয়ান ক্লাবে একটাও লালমুখ মিলল না। কেন, রাত তো বেশি হয়নি, ওরা পালাল কোথায়? আজ ইস্টার তো, তাই মদ খেতে আসেনি বোধহয়। ঠিকই তো ইস্টার বলেই তো এ দিনটাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আইরিশদেরও তো এই ইস্টার-বিদ্রোহ। সে বিপ্লব-চিহ্নিত দিনটিই তো শুভময়। কিন্তু সাহেবগুলো কোথায় গা ঢাকা দিল?

বলতে-বলতেই সামনে এসে পড়ল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাটিস্ট্রেট উইলকিনসনের গাড়ি। চক্ষের পলকে গুলি ছুঁড়ল বিপ্লবীরা। ড্রাইভার মরল, বডিগার্ড জখম হয়ে মাটি নিল। ম্যাজিস্ট্রেটও মাটিতে শুয়ে পড়ে মরার ভাব করল। মরল না।

নিজামপল্টনের হেডকোয়ার্টারে তিন দলের বিপ্লবীরা ফিরে এসে সূর্য সেনের কাছে রিপোর্ট করলে। সমস্ত কিছুই ঠিকঠিক হয়েছে, তবে দুঃখ সাহেবগুলোকে মারা গেল না। খবর এল তারা কর্ণফুলি নদী ধরে পালিয়ে গিয়েছে শহর ছেড়ে।

কিন্তু সারা গায়ে আগুন এ কে ছুটে আসছে এদিকে? আরে, এ যে দলের লোক, হিমাংশু সেন—আর্মারিতে আগুন লাগাতে গিয়ে নিজের গায়েও লাগিয়ে বসেছে। মাটিতে ঠেসে ধরে ধরে হিমাংশুর আগুন নেবানো হল। অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষ তাকে মোটরে করে রেখে আসতে গেল কোনো নিরাপদ আস্তানায়—বাইরের কেউ জানতে না পায় অথচ তার চিকিৎসা হয়।

হঠাৎ ওয়াটার-ওয়াকর্সের ওদিক থেকে শত্রুপক্ষ মেশিনগান চালাতে সুরু করল। তবে কি অন্য কোনো পথে ব্রিটিশের সৈন্য-রসদ এসে গেল নাকি? কুছ পরোয়া নেই, পাল্টা জাবাব দাও। পাল্টা জবাব শুনে স্তব্ধ হল মেশিন-গান। ততঃ কিম? পরের অবস্থাটার বোধহয় অঙ্ক কষা ছিল না। কখনো-কখনো এক জায়গায় এসে মাস্টারদেরও বুঝি অঙ্ক ভুল হয়। অসহযোগ আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারকে নিশ্চল করব, ততঃ কিম? তারপর কী। কী করে সে নিশ্চলকে সাগর পার করব? হায়, সে অঙ্কটাই কষা নেই। সূর্য সেন আদেশ করল, যত পারো অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাও। আত্মগোপন করো।

'কিন্তু অনন্ত সিংরা তো ফেরেনি।'

'আর কত অপেক্ষা করা যাবে ওদের জন্যে? কে জানে ওরা হয়তো ধরা পড়ে গেছে।'

বিপ্লবীরা প্রথমে গেল শুলুকবাহার পাহাড়ে, তারপর ফতেয়াবাদ পাহাড়ে, শেষে জালালবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিল।

তিনটি পুরো দিন চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের করতলে। ট্রেন আসছে না, ট্রেন ছাড়ছে না, টেলিগ্রাফে টেলিফোনে সংবাদের দেওয়া-নেওয়া নেই, পথে-ঘাটে গাড়ি-ঘোড়া নেই—ইংরেজ সরকারের নিশ্চিত পতন ঘটেছে। আর বিপ্লবীরা আহার-নিদ্রা ভুলে দারুণ নির্দয়কে জীবনে প্রিয় হতে প্রিয়তর জেনে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। যারা ভীরুতায় আরামে-স্বাচ্ছন্দ্যে সংকুচিত হয়ে থাকতে আসেনি, যারা আত্মবিসর্জনেই উজ্জ্বল হয়ে থাকতে চায়, যারা দুঃখ বিপদ ভয় ও মৃত্যুকেই ভগবান বলে মানে, তারাই আজ মহাজীবন-নাটকের মহিমায় নায়করূপে দেখা দিল। বধে বা বন্ধনে কিছুতেই যাদের কুণ্ঠা নেই, অপরাজিত আত্মার মহত্ত্বে যারা দীপ্যমান, তারাই আজ জালালবাদ যুদ্ধের বিজয়ী বীর।

বাইশে এপ্রিল ইংরেজের সৈন্য ঘিরেছে জালালবাদ। বিকেল পাঁচটায় যুদ্ধ সুরু হল। এক দিকে দেড়হাজার গুর্খা সৈন্য নিয়ে ইংরেজের ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফলস ও সুর্মা ভ্যালি লাইট হর্স বাহিনী, আরেক দিকে মুষ্টিমেয় কটি বাঙালি বিপ্লবী। এক দিকে শাসন-ত্রাসণের মহাগ্রাস আরেক দিকে উদ্যত চেষ্টা, জাগ্রত শক্তি, অপরাভূয় সংকল্প।

বিশ্বাস করতে পবিত্রতম রোমাঞ্চ হয় সে-যুদ্ধে ইংরেজ হেরে গেল। তারা উপলব্ধি করলে বিপ্লবীদের পরাস্ত করতে হলে আরো সৈন্য দরকার, দরকার আরো আধুনিক রণসম্ভার। বিপ্লবীদের সংখ্যা তখন বড়জোর পঞ্চাশ আর তাদের মধ্যে বেশি সংখ্যকেরই বয়েস পনেরো-ষোলোর মধ্যে। আর তাও তারা তিন দিন প্রায় অভুক্ত ও অপীত, পথশ্রমে দারুণ অবসন্ন। কিন্তু ওদের প্রতিজ্ঞায় অবসাদ নেই, প্রচেষ্টায় অবসাদ নেই, যেমন আগুনের অবসাদ নেই উত্তাপে আর দীপ্তিতে।

ভারতবর্ষে এমন যুদ্ধ অনেক দিন দেখেনি ইংরেজ। তাই না-পালিয়ে তাদের পথ কোথায়? কিন্তু বারোটি মহাপ্রাণ তারা শেষ করে দিয়ে গেল। যুদ্ধে প্রথম শহিদ হরিগোপাল বল, লোকনাথের ছোট ভাই, ডাক-নাম টেগরা। শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে লোকনাথকে বললে, দাদা, কিছুতেই থেমো না, শেষ পযন্ত যুদ্ধ করে যাও।

দ্বিতীয় শহিদ ত্রিপুরা সেনগুপ্ত, ঢাকার ছেলে। হরিগোপালের পরনে ধুতি শার্ট কিন্তু ত্রিপুরা পুরোদস্তর সৈনিক। খাকি প্যান্ট-কোটে জুতোয়-মোজায় সুসজ্জিত। বললে, 'চললাম, দুঃখ কোরো না। আবার আমাদের দেখা হবে, আবার আমরা যুদ্ধ করব।'

তৃতীয় শহিদ নির্মল লালা, দলে সব চেয়ে কনিষ্ঠ। কোনো আত্মীয়স্বজনই তাকে সনাক্ত করতে এল না। তারও মুখে ঐ কথা: আমাদের যুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। আমাদের আরো অনেক মরতে হবে। পেরোতে হবে অনেক জয়তোরণ।

একে একে শহিদ হল বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, নরেশ রায়, প্রভাস বল, জিতেন দাশগুপ্ত, পুলিনবিকাশ ঘোষ, শশাঙ্ক দত্ত, অর্ধেন্দু দস্তিদার, মধুসূদন দত্ত আর মতিলাল কানুনগো। সূর্য সেন বললে, এদের সকলকে গার্ড অব অনার দাও। তাই হল, মুক্ত আকাশের

নিচে পাহাড়ের চূড়ায় সবাই মৃত বীরসুন্দরদের অভিবাদন জানাল। পরে আবার আদেশ হল, অন্যত্র চলো, দুঃসাধ্যসাধনের পথে, আরো দূরে চিরন্তন মুক্তির অমৃতের প্রার্থনা নিয়ে। এগিয়ে চলো।

অম্বিকা চক্রবর্তী অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখল ঘন রাত, কেউ কোথাও নেই ধারে-কাছে। কেউ কোথাও নেই। সে একা—একেবারে একা। অম্বিকা একাকীই পথ চলতে লাগল। সৃষ্টির আগে বিধাতাও তো একা ছিলেন। একা থেকেই অম্বিকা নতুনের সৃষ্টি করবে।

তেইশে এপ্রিলের ভোরবেলা আবো অনেক সৈন্যসামন্ত এনে ফেলল ইংরেজ। বুঝল বিপ্লবীরা জালালবাদ ছেড়ে চলে গেছে। চলো পাহাড় গিয়ে দখল করি, চষে ফেলি বেয়নেট দিয়ে। গিয়ে দেখল—প্রকাণ্ড আবিষ্কার—বারোটি মৃতদেহ পড়ে আছে। লক্ষ্য করে দেখল, দুজনের মধ্যে এখনো জীবনের চিহ্ন আছে। একজন একেবারে যায়-যায় আরেকজন খানিকক্ষণ বুঝি বা লড়তে পারবে মৃত্যুর বিরুদ্ধে।

মতিলাল কানুনগোকে মিলিটারির কর্তা জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার নাম কী?'

'হরিবোল।' বলে, বলার সঙ্গে-সঙ্গে মতিলাল চোখ বুজল।

অর্ধেন্দু দস্তিদারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তার তলপেটে ও ডানবাহুতে গুলি লেগেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করা হোক তাকে বাঁচানো যায় কিনা। কিন্তু সদর এস-ডি-ওর শুধু লোভ মুমূর্ষুর কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্তি আদায় করা যায় কিনা। শোনা যায় সে নাকি মৃতের থেকেও স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে পারে। ডাক্তার আর নার্স, যারা ভাবছে সব সময়েই রোগীর কাছে থাকা দরকার, তারাও এস-ডি-ওর চক্ষুশুল হল। আপনারা একটু সরে যান না, আমি রোগীর সঙ্গে একটু আলাপ করি। একটা আহত অজ্ঞান রোগী কটা শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে সংগ্রাম করছে, তার সঙ্গে নিরালায় বসে মহামান্য এস-ডি-ও কী করবেন, ইংরেজ সরকারই বলতে পারে। দীর্ঘ এক স্বীকারোক্তি তৈরি করে ফেলল এস-ডি-ও। পৃথিবীকে বিশ্বাস করতে বলল, অর্ধেন্দু সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় কারু দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এই স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

অর্ধেন্দুর জ্ঞান এল তেইশের মধ্যরাত্রির কিছু পরে। শুধু একবার কথা কয়ে উঠল—শেষবার। বললে, 'মাস্টারদা, আমি ভুলিনি। মুক্তি নয় মৃত্যু। মৃত্যু নয় মুক্তি।'

সমস্ত দেশে, শুধু দেশে নয়, সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল এই বিপ্লববার্তা। খবর শুনে গান্ধী বিমর্ষ হলেন। তাঁর কাছে স্বাধীনতার চেয়েও অহিংসা বড়। কিন্তু সুভাষ? মনে-মনে মালাচন্দন দিয়ে বন্দনা করল বিপ্লবীদের। যে কোনো উপায়েই হোক স্বাধীনতা অর্জন করা নিয়ে কথা। ছলে বলে কৌশলে যে কোনো উপায়েই হোক ঈশ্বরকে লাভ করা নিয়ে কথা। ভক্তিতে বিরক্তিতে সমর্পণে বিদ্রোহে—যে কোনো উপায়ে। দ্রুততম উপায়ে। গান্ধীজির কাছে বুঝি প্রাপ্তির চেয়েও পদ্ধতি বড়। আর সুভাষের কাছে সর্বকালে প্রাপ্তিই মহত্তম।

পনেরো

সুভাষ উনিশশো তিরিশের সেপ্টেম্বরে জেল থেকে বেরুল। সেনগুপ্তের মুক্তির

দিনও সেই তারিখ। গত এপ্রিলের নির্বাচনে সেনগুপ্ত মেয়র হয়েছিল কিন্তু ছ মাসের মধ্যে শপথ নিতে পারেনি বলে সে নির্বাচন বাতিল হয়ে গিয়েছিল। আবার নতুন করে নির্বাচন হল। সুভাষ দাঁড়াল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। সুভাষই জিতে গেল। সুভাষই এখন কলকাতার মেয়র।

এর মধ্যে দেশ আর কতদূর এগোল? চলছে এখনো শুধু টালবাহানা হরেক রকম দরকষাকষি। জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে—যা সব সুপারিশ করেছে তা কহতব্য নয়, রাঘববোয়াল দূরের কথা, চুনোপুঁটিও নয়। লিবারেলরাও পর্যন্ত চটে গেছে, আইনসভা পর্যন্ত তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে বিদেশী দূতেরা, যদি কোনোমতে একটা মীমাংসায় পৌঁছুনো যায়। উঠেছে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের কথা। নি-কেজোদের কাজ বেশি ঘন ঘন জেলে যাচ্ছে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। কী আপনার সর্ত বলুন, কী হলে এই আইন-অমান্য আন্দোলন আপনি তুলে নিতে পারেন।

ওদিকে কংগ্রেস-অফিসের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে পুলিশে, সব খাতা-পত্র ব্যাজ-পতাকা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, চলেছে উদ্দাম লাঠিবাজি। কথায়-কথায় একশো চুয়াল্লিশ জারি হচ্ছে, সভা ভেঙে দিচ্ছে গায়ের জোরে। ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে নিচ্ছে। খবরের কাগজকে সত্য কথা বলতে দিচ্ছে না। সবচেয়ে বেশি অত্যাচার বাংলায়, তার মেদিনীপুরে। কাঁথিতে বেআইনি লবণ তৈরি দেখছে জনতা, পুলিশ গুলি চালিয়ে জনতার মধ্যে থেকে পঁচিশজনকে ঘায়েল করলে। জনতা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে যাচ্ছে তখনই তো তাদের গুলি করতে আনন্দ— চেচনাতে এমনি অবস্থায় গুলি চালিয়ে পুলিশ আঠারো জনকে জখম করলে আর ছজন খুন। তমলুকে চাষীদের খেত-খামার পুড়িয়ে দিলে, সত্যাগ্রহী শুধু নয়, সত্যাগ্রহে যাদের সমর্থন আছে, তাদেরও বাড়িঘর আস্ত রাখল না। অত্যাচার বহু জায়গায় ধর্ষণের চেহারা নিল। মাত্রার ধার ধারল না কোথাও।

ওঁরা গোল টেবিলের স্বপ্ন দেখুন, সর্ত নিয়ে তর্ক করুন, আমরা মেদিনীপুরের ছেলে, মেদিনীপুরের মেদিনী শত্রুরক্তে রঞ্জিত করে বোঝাই আমাদের মেদ-মজ্জা বীরত্বের কোন ধাতু দিয়ে তৈরি। দেখাই কী করে নিতে হয় প্রতিশোধ।

মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডি নিমন্ত্রিত হয়ে কলেজিয়েট স্কুলে এসেছে কী এক শিক্ষা-প্রদর্শনী দেখতে— প্রথম ঘরটাতে ঢুকতেই তার উপরে গুলি। দুটি কিশোর ছেলেও বুঝি এসেছিল প্রদর্শনীতে, কিন্তু তারা দেখল প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় আলেখ্য অত্যাচারী ইংরেজরাজত্বের প্রতিভূ এই ম্যাজিস্ট্রেট। পেডি কে, পেডিকে তারা চেনে না, তারা গুলি করছে রাজপুরুষকে। সাত-আটটা গুলি দুদিক থেকে একসঙ্গে ঝরে পড়ল পেডির উপর, পেডি ছুটে বেরিয়ে গেল সামনের দিকে, কিন্তু কদ্দূর গিয়েই পড়ল মুখ থুবড়ে। রক্তে মাটি ভেসে গেল। একটা ঘোড়ার গাড়ি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, কলকাতা থেকে চলে এল ডাক্তার আর নার্স, কিন্তু পেডিকে বাঁচানো গেল না। আততায়ীরা গেল কোথায়? চোখের পলকে তারা কর্পূরের মত উবে গিয়েছে। পেডির চেয়ারে এসে বসেছে ডগলাস।

কিন্তু ডগলাসের প্রাণে সুখ নেই! রাজামুন্দ্রি কলেজের অধ্যক্ষ তার ভাই, তাকে

চিঠি লিখছে ডগলাস : 'আমি ভয়াবহ বিপদের মধ্যে বাস করছি।'

'প্রাণের বদলে প্রাণ চাই।' মেদিনীপুরের ব্রিটিশ উচ্ছেদ সমিতি বেনামী চিঠি পাঠিয়েছে ডগলাসকে : 'নির্যাতন থামাও বলছি, নয়তো নিজেই যন্ত্রণায় পড়বে।'

উপায় কী, ডগলাসকে তো তার কর্তব্য করে যেতে হবে। পদাধিকারবলে ম্যাজিস্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করতে এসেছে ডগলাস, টেবিলের উপর মাথা নামিয়ে কী সব কাগজপত্র দস্তখৎ করছে, হঠাৎ গুলির শব্দ হল। একাধিক্রমে ছটা শব্দ। কী সর্বনাশ! কাকে মারল? আর কাকে! ডগলাস রক্তাপ্লুত হয়ে ঢলে পড়ল চেয়ারে। পেডিকে যেমন মেরেছে, তেমনি। দু-দুটি ছেলে দু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং কালহরণ না করেই ঘোড়া টিপেছে। এরা কারা, বেচারি কর্মচারী না আর কেউ, বডিগার্ডদের তটস্থ হতে না দিয়েই কর্মারম্ভ ও কর্মশেষ। কিন্তু এবার দুজনেই হাওয়া হয়ে যেতে পারল না। প্রদ্যোত ধরা পড়ল। ধরা পড়ল অনেকদূর ছুটে গিয়ে, একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়বার পর।

'বলো তোমার সঙ্গীর নাম কী?'

'বলব না।'

বলবে না? অকথ্য শুধু নয়, অভব্য অত্যাচার হল প্রদ্যোতের উপর। এখনো বলো দলের আরেকজনের নাম কী?

যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে প্রদ্যোত বললে, 'শীতাংশু বসু।'

পুলিশের স্ফূর্তি তখন দেখে কে! নাম বার করতে পেরেছি। ধরতে পারলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে— টাকাটা কার ভাগ্যে না জানি নাচছে— সবাই ব্যস্ত-ব্যগ্র হয়ে উঠল। কিন্তু বহু খোঁজাখুজি করেও শীতাংশুর পাত্তা পাওয়া গেল না। সন্দেহ রইল না, প্রদ্যোত পুলিশকে ধোঁকা দিয়েছে।

আর কী করা যাবে, প্রদ্যোত এখন চলে গিয়েছে জেল-জিম্মায়, ওর উপর আর পুলিশের থাবা বসানো যাবে না। শুধু ফাঁসির দড়িটাকেই পাকানো যাবে বসে। স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল প্রদ্যোতের ফাঁসির হুকুম দিল। হাইকোর্টে রায় বহাল রাখলে। ওজন বেড়ে গিয়েছে প্রদ্যোতের। হাসতে-হাসতে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াল। ফাঁসির দড়িটাকে সস্নেহে স্পর্শ করল— যেন উপর থেকে কে এক বন্ধু তার দিকে সৌহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে খুন করা হল খেলার মাঠে। যতদূর সম্ভব বার্জ তার বাংলোতেই আফিস করে কিন্তু তার খেলাধূলায় খুব ঝোঁক, বিশেষত ফুটবলে। এমনিতে তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, বাইরে কোনো সভা-সমিতিতে যদি বা যায়, চার দিকে প্রহরীর দেয়াল দিয়ে এমন আবৃত থাকে, সাধ্য নেই কেউ একটা চোখের দৃষ্টি পাঠায়। কিন্তু খবর পাওয়া গেল কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে মেদিনীপুর টাউন ক্লাবের যে ম্যাচ হচ্ছে তাতে টাউন ক্লাবের হয়ে বার্জ খেলবে। বার্জ যে টাউনক্লাবের প্রেসিডেন্ট।

এবার বুঝি বদান্য মহাকাল সুবর্ণ সুযোগ পাঠিয়ে দিল। দেশলক্ষ্মীর সমস্ত ভাণ্ডার যারা শতচ্ছিদ্র করে শুষে নিচ্ছে, রেখে যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের মরুভূমি, তাদেরকে দেবতা

আর ক্ষমা করবে না। এ শুধু অত্যাচারের প্রতিশোধ নয়, বিপ্লবের পথে স্বাধীনতাকেই এগিয়ে নিয়ে আসা।

মৃগেন্দ্র কুমার দত্ত, অনাথবন্ধু পাঁজা, নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী। আরো কত জন হাত-লাগানো বন্ধু। রথের দড়ি তো বাইরে নয়, রথের দড়ি অদৃশ্য হাতে-হাতে প্রচ্ছন্ন প্রাণে-প্রাণে।

কত চেষ্টায় রিভলভার সংগ্রহ করা হয়েছে, কত যত্নে খড়্গপুরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, কত কৌশলে শিখেছে গুলি ছোঁড়া, তারপরে সাইকেলে করে এনেছে মেদিনীপুর, রেখেছে অন্তঃপুরের অন্তরালে। এর পিছনে কত সংগঠনচাতুর্য, কত মন্ত্রগুপ্তি, কত সাহস, কত সহিষ্ণুতা, মৃত্যুকে উপেক্ষা করবার মত কী বলিষ্ঠ যোগসাধন! এদের কে ডাকল কে শেখাল কে পাঠাল! বিপদবেষ্টিত জীবন কে এদের কাছে রমণীয় করে তুলল! কে এদের বোঝাল ফাঁসির কাষ্ঠফলকেই রাজকীয় সমারোহ!

মাঠের চারদিক পুলিশ-গার্ডে ছেয়ে আছে, রিজার্ভ পুলিশের সাহেব ইনস্পেক্টর রেফারি। এখনো বাঁশি বাজেনি, দুদলের খেলোয়াড়রা নেমেছে প্র্যাকটিস করতে। বল এদিক-ওদিক চলে গেলে দর্শকেরাও না কোন মাঠে নেমে দু-একটা শট মারছে। মৃগেন আর অনাথ আরো একটু বেশি এগিয়েছে, তারা খেলোয়াড় সেজে মহমেডান স্পোর্টিং-এর দলের মধ্যে মিশে গিয়েছে। রেফারির বাঁশির পর দু দল লাইন-আপ করে দাঁড়াবার পরই তো শুধু বোঝা যাবে, তারা দুজন অবান্তর। এখন এই গোল-প্র্যাকটিসের সময় খেলোয়াড়দের এলোমেলো অবস্থায় তাদেরকে কে চিহ্নিত করতে যাচ্ছে? মহমেডান স্পোর্টিং ভাবতে পারে তারা বুঝি বা টাউন ক্লাবের লোক।

এই যে এদিকে, আমাকে দে, আমাকে। এমনি বলতে-বলতে মৃগেন আর অনাথ বল নিয়ে পরস্পরকে পাশ দিতে-দিতে এগিয়ে চলেছে। চলেছে টাউন ক্লাবের দিকে। চলেছে যেখানে বার্জ রয়েছে ফরোয়ার্ড লাইনে। বল তার পায়ের কাছে এসে পড়তেই ক্ষণকালের জন্যে বার্জ বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়েছে, আর চার-পাঁচ হাত দূর থেকেই দুই বন্ধু সমস্বরে গুলি করে বসেছে। মৃগেনের হাতে রিভলভার আর অনাথের হাতে অটোম্যাটিক পিস্তল। এত রণসজ্জা এত রক্ষীসজ্জা— সমস্ত ব্যর্থ করে দিয়ে বার্জ চক্ষের নিমেষে শেষ হয়ে গেল।

এমন এদের বল-পাশের কায়দা মৃগেন চলে গিয়েছে বার্জের পিছনে, অনাথ রয়েছে সামনে। পিছন থেকে পাঁচ রাউণ্ড আর সামনে থেকে তিন— বার্জ আর সশরীরে হাসপাতালে যেতে পেল না।

মাঠে যারা সশস্ত্র পুলিশ-অফিসার ছিল তারা মৃগেনকে তাড়া করল। সহকারী পুলিশ সুপার লাফিয়ে পড়ল মৃগেনের উপর। গুলি যা ছুঁড়ল মৃগেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বার্জের পুলিশ-রক্ষীরাই তাকে গুলি করল। আর রেফারি নিজেই গুলি করল অনাথকে। অনাথ মাঠেই মারা গেল আর মৃগেন মারা গেল হাসপাতালে।

ধরা পড়ল নির্মলজীবন, ব্রজ, রামকৃষ্ণ ও আরো চারজন। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে প্রথম তিনজনের ফাঁসি হল আর শেষের চারজনের দ্বীপান্তর।

ত্রাহি ত্রাহি ডাক পড়ল সাহেব মহলে। ইংলণ্ডে রব উঠল বাঙালিদের আরো

পীড়ন করো। রসাতলে পাঠাও। সমস্ত বাংলাদেশটাকেই ফাঁসিকাঠে লটকে দাও।

সর্বভারতীয় ভূমিকায় ইংরেজদের সঙ্গে দাবা খেলায় কোথায় কে কিস্তি দেবে দুপক্ষ তারই সুযোগ খুঁজছে। একদিকে গান্ধী আরেক দিকে আরউইন। গান্ধীজি বললেন, তিন সর্তে আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিতে পারি। প্রথমত গোলটেবিল বৈঠকের কর্মসূচীর মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতার সারবস্তু দেবার কথাটা সর্বাগ্রে রাখতে হবে। লবণ আইন তুলে দিতে হবে এবং মাদকদ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্রবর্জনের দাবিকে দাবানো চলবে না। আর আন্দোলন তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিতে হবে সমস্ত আটক বন্দীদের।

আরউইনও ধূর্ত, দুমুখো। সে মুখে বলছে, জাগ্রত ভারতবর্ষের জাতীয় অধিকারের দাবি আর আমরা অস্বীকার করতে পারব না, করতে গেলে ভুল হবে— অথচ কাজে অর্ডিন্যান্সের উপর অর্ডিন্যান্স জারি করছে, কথায়, লেখায়, চলায়, একত্র হওয়ায়, এমনকি প্ররোচনায়ও অর্ডিন্যান্স। আর গোলটেবিল বৈঠকও যদি বসাল, ছিয়াশি জন সদস্যের মধ্যে একজনও কংগ্রেসের নয়। একেই বলে না আছে নেই আয়োজন, পাড়া ভরে নিমন্ত্রণ। এ শুধু কংগ্রেসকে অপমান নয়, ব্রিটেনের নিজের গালে চুনকালি লাগানো। জগৎকে বোঝানো আমরা ভণ্ডের শিরোমণি, আমাদের সমস্ত আশ্বাস অন্তঃসারশূন্য।

পিঁপড়ের বলও বল, কাঠবিড়ালির সাহায্যও সাহায্য। এখনো অগণন লোক জেলের বাইরে আছে, এখনো ব্রিটিশ নির্যাতন আকাশছোঁয়া হয়নি, সুতরাং আন্দোলন আরো জোরদার করো। আগামী ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবস পূর্ণ আড়ম্বরে প্রতিপালন করো। আর পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে আবার শপথ নাও, স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত দুর্বার সংগ্রাম করে যাব, অকুতোভয় ও অপ্রতিহত গতিতে।

ছাব্বিশে জানুয়ারীর মধ্যরাত্রির আগেই গভর্নমেণ্ট গান্ধীজি সহ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দিয়ে দিল।

আরউইন বললে, এস এবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলি। তোমাদের ছাড়া কিছুই হবে না এ বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

আবার স্তোক, আবার ধোঁকা। শুধু কথায় মন ভেজানো। কিন্তু শত মেঘ করুক, শুধু মেঘেই মাটি ভেজে না।

কিন্তু ছাব্বিশে জানুয়ারি সুভাষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বাধীনতা-দিবস উদযাপন করবেই। সারা কলকাতায় একশো চুয়াল্লিশ, তাতে কী, স্বাধীনতা একশো চুয়াল্লিশের চেয়েও বেশি। গত বছর ষোলই জুন দেশবন্ধুর মৃত্যু-দিবস পালন করতে দেয়নি গভর্নমেণ্ট, ঐ একশো চুয়াল্লিশের জোরে। তখন সুভাষ জেলে। কিন্তু আজ?

আসুক বাধা, বাধাই বিধাতার যথার্থ বিধান। বাধা না থাকলে আমাদের শক্তি উদ্বোধিত হবে না। আসুক আঘাত, আঘাতই আমাদের বিদ্রোহরুদ্র করে তুলবে। জগতে জড়কে সচেতন করে তোলবার একমাত্র উপায় আঘাত। আঘাতই তো আমাদের আবদ্ধ শক্তিকে শৃঙ্খলমুক্ত করবে। সুতরাং এই দুর্যোগকেই মহাসুযোগ বলে মেনে নেব।

রাস্তায় শোভাযাত্রা নিয়ে বেরুলে পুলিশ তো গ্রেপ্তার করবেই, তার আগে না বাড়ির মধ্যেই আটক করে রাখে! পুলিশেরও সেই অভিসন্ধি। রাত থাকতেই তারা ঘিরেছে উডবার্ন পার্কের বাড়ি, ঘিরেছে কিরণশঙ্করের বাড়ি, পুলিন দাসের বাড়ি। কিরণশঙ্কর

ও পুলিন দাসকে আটকেছে, কিন্তু সুভাষ— সুভাষ কোথায়? সুভাষ বাড়িতে নেই।

তুমি ফের ডালে ডালে আমি ফিরি পাতায়-পাতায়। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে সুভাষ। ধুলো দিয়ে রাত কাটিয়েছে কর্পোরেশানের দালানে। সুভাষ কর্পোরেশানের মেয়র, মেয়রের যোগ্য শোভাযাত্রা তো তাকে বের করতে হবে। কর্পোরেশানের মধ্যেই তার কর্মচারীদের পুলিশ আটক করে কী করে?

বাড়িতে না পেয়ে পুলিশ ঠিক করল রাস্তাতেই যা করবার করবে। পুলিশের মধ্যে আছে পুলিন চ্যাটার্জি, ভূপেন ব্যানার্জি আর রবার্টসন।

বিরাট শোভাযাত্রার অগ্রনায়ক কে এ তেজোনিলয় দিব্যদীপ্ত পুরুষ চলেছে নগ্নপদে। কে এ লোকেশলোকগুরু। সর্বত্র আলো আর আশা, সাহস আর শক্তি বিকীর্ণ করতে করতে চলেছে, পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, মিত্রের আশ্রয়, শত্রুর শতঘ্নী, সূর্যবীর্যসমুদ্ভব, হাতে জাতীয় পতাকা, ঐ তো সুভাষ। পারিবারিক কারণে অশৌচ পালন করার জন্যেই হয়তো গায়ে উত্তরীয়। পাশে দুই সহচর, কর্পোরেশানের ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় আর শৈলেন ঘোষাল। আর পিছনে? পিছনে অগণিত জনসঙ্ঘ। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের প্রবাহ।

আর সকলকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছনে থাকবার মানুষ নয় সুভাষ। যদি লাঠি পড়ে আমার মাথার উপরেই আগে পড়ুক। ওদিকে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি বেরিয়ে এসেছে মেয়েদের শোভাযাত্রা নিয়ে।

আর এগোবেন না। ব্রিটিশ পুলিশের আস্ফালিত লাঠি উল্লসিত হতে চাইল। এ বলা বৃথা। আমরা কোনোদিন থামি না, পেছোই না, চিরকাল আমরা এগিয়ে চলি। আমাদের সংকল্প বৃথা নয়, নিষ্ঠা ক্ষীণদুর্বল নয়। মারতে হয় মারো, কিন্তু আমাদের বুকের ধনকে কেড়ে নিতে পারবে না। না, কিছুতে না।

সুভাষের হাত থেকে জাতীয় পতাকা কেড়ে নিতে চাইল পুলিশ। না, কখনো না। দুই হাতে দৃঢ় করে পতাকা ধরে রইল সুভাষ।

তখন পুলিশ উদ্দাম হাতে সুভাষের উপর লাঠি চালাল। মার ভালো। লালমুখো ফিরিঙ্গি পুলিশের তখন কী উদগ্র বন্যতা।

'মেরো না ওঁকে।' দুঃসাহসের দীপ্তি নিয়ে এগিয়ে এল জ্যোতির্ময়ী। বললে, 'উনি কলকাতার মেয়র।'

আমরা আমাদের মন্ত্র ভুলব না, বন্দেমাতরম। আমরা আমাদের বিত্ত ছাড়ব না, আমাদের জাতীয় পতাকা, স্বাধীনতার পতাকা। যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ি, ভুলব না, ছাড়ব না, ফিরে যাব না। লাঠির ঘায়ে সুভাষ অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

পরদিন তাকে সুস্থ করে নিয়ে এল কোর্টে। চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবার্গ জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার কী বলবার আছে?'

সম্ভ্রান্ত ও সরল, বিনয়ী ও সুদৃঢ়— সুভাষ বললে, 'মামলা সম্পর্কে আমার কিছু বলবার নেই। আমি অসহযোগী, আমি মামলায় কোনো অংশ নিই না। কিন্তু লালবাজার লক-আপে পুলিশি বর্বরতার বিষয়ে কিছু বলতে চাই।'

রক্সবার্গ নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'যা বলবার দরখাস্তে লিখে দিন।'

'আমার হাতে ব্যথা, লিখতে পারব না।'

রক্ষবার্গ তাকিয়ে দেখল আসামীর ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তখন সে নিরুপায় হয়ে বললে, 'আচ্ছা, আমি নোট করে নেব।'

কী নোট করলে, সুভাষের হাতের জখম, না, পুলিশের নির্দয়তা— কিছু বোঝা গেল না। নোট করল, আইনভঙ্গের অপরাধে সুভাষ দোষী আর তার শাস্তি ছয়মাস সশ্রম কারাবাস।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা ছাড়া পেয়ে সমবেত হয়েছে এলাহাবাদে, মতিলাল নেহরুর গৃহে, স্বরাজভবনে। মতিলাল তাঁর আনন্দভবন কংগ্রেসকে দান করেছেন। আনন্দভবনই স্বরাজভবন। অসুস্থতার জন্যে তাঁকে জেল থেকে আগেই ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু কিছু পরে, সাতুই ফেব্রুয়ারি, তিনি তাঁর মরদেহই ছেড়ে গেলেন। যাবার আগে মহাত্মাজিকে বললেন, 'ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ এইখানে, এই স্বরাজভবনে, আমারই উপস্থিতিতে, নির্ণয় করুন। আমার দেশমাতার ভাগ্যনিরূপণের সসম্মান মীমাংসায় আমিও পক্ষভুক্ত হই। যদি মরতেই হয়, যেন স্বাধীন ভারতের কোলে শুয়েই মরি। আমাকে আমার শেষ ঘুম পরাধীনতার মধ্যে নয়, স্বাধীনতার মধ্যে ঘুমুতে দাও।'

মতিলালের মৃত্যুতে দেশ আবার নতুন করে শোকাচ্ছন্ন হল। কিন্তু সংগ্রাম শোক-দুঃখ মানে না, সংগ্রাম শুধু অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে।

আরউইন বোধহয় চাইছিল গান্ধীর কাছ থেকে কোনো ইঙ্গিত আসুক। সত্যাগ্রহীর কোনো অভিমান নেই, গান্ধী আরউইনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি লিখলেন, আরউইন তড়িঘড়ি ডেকে পাঠাল গান্ধীকে।

তারপর সুরু হল কথা, ঘন্টার পর ঘন্টা— দিনের পর দিন। দেখা গেল আরউইন যেন সত্যিই কিছু দিয়ে-থুয়ে কংগ্রেসকে শান্ত করতে চায়। আইন-অমান্য আন্দোলন যেন ক্রমশই জাঁকিয়ে উঠেছে। গুজরাটে উত্তরপ্রদেশে বাংলায় কোনো কোনো অঞ্চলে ট্যাক্স-বন্ধ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। বাংলায় তার উপরে চলেছে সশস্ত্র বিপ্লব। বিলিতি কাপড় শুধু নয়, বিদেশী দ্রব্যই চলে যাচ্ছে বাজার থেকে। সবচেয়ে বড় কথা, দলে-দলে মেয়েরা নেমে পড়েছে, অত্যাচারে-অপমানেও ঘরে ফিরে যাচ্ছে না। সীমান্ত প্রদেশও টলমল। আরউইন ভাবলে, যদি খানিকটা কাটছাঁট করে মিটিয়ে নেওয়া যায় তো মন্দ কী। সতেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে সুরু করে দুসপ্তাহ কথা চলল, তারপর পাঁচই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

দেশের জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনা হতাশ হয়ে গেল। সমস্ত বিপ্লববুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়াল। যেন ধূমায়মান পর্বত মূষিক প্রসব করল। বন্দরের কাছাকাছি এসে তলিয়ে গেল জাহাজ।

ভারতের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে একটা গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসকে ডাকা হবে শুধু তার বিনিময়ে কংগ্রেস সমস্ত আইনঅমান্য আন্দোলন তুলে নিল।

খুচরো কটা উপশমের ব্যবস্থা হল বটে, যেমন বন্দীদের ছেড়ে দেবে, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে, অর্ডিন্যান্সগুলি তুলে নেবে, সমুদ্র থেকে খানিকটা জায়গা পর্যন্ত নুন তৈরি করতে পারবে বা মদ-গাঁজার দোকানে করতে পারবে পিকেটিং। কিন্তু এ সব খোলামকুচি দিয়ে কী হবে, আসল হীরে কই, কোহিনূর কই? আসল ঘরে মশাল

নেই ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া। এ যে অতিমেঘে অনাবৃষ্টি।

চুক্তির সর্তঅনুসারে সুভাষ বেরিয়ে এল জেল থেকে। কিন্তু কই স্বাধীনতা কই? দেশ আবার কাজ ফেলে কথার অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করল? কথার বেপারি বণিক ইংরেজকে কথা দিয়ে ভোলানো যাবে এ কথা কে বিশ্বাস করে? বিক্ষত বাংলা আরো বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

সুভাষ যেদিন বেরুল সেদিনই গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে বোম্বাই ছুটল। এই কি গান্ধীবাদ?

ষোলো

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায় বেরুল উনিশশো তিরিশের সাতুই অক্টোবর। ভগৎ সিং, রাজগুরু আর শুকদেবের ফাঁসির হুকুম হল আর বাকি আটজনের যাবজ্জীবন দীপান্তর। আপিল হল প্রিভি কাউন্সিলে। উনিশশো একত্রিশের এগারোই ফেব্রুয়ারি সে আপিল অগ্রাহ্য হল।

গান্ধীজি আরউইনকে অনুরোধ করলেন ঐ তিনটি জীবন বাঁচিয়ে দেওয়া হোক। ফাঁসির বদলে দীপান্তরের আদেশ হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না, বরং দেশবাসী ইংরেজের বদান্যতায় প্রসন্ন হবে। দেশবাসীর প্রসন্নতার দাম অনেক। আরউইন এমন একখানা ভাব দেখাল যে বিষয়টি সে গভীরভাবে বিবেচনা করছে। সকলের মনে আশা জাগল, ফাঁসি বোধহয় রদ হল। বোম্বাই থেকে দিল্লি সুভাষ মহাত্মার সঙ্গে এক ট্রেনে এক কামরায় এল। কিন্তু দিল্লিতে এসে সংবাদ শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল— আরউইন নাকি ফাঁসি দেওয়াই স্থির করেছে।

সুভাষ গান্ধীকে বললে, 'আপনি আপনার চুক্তি ভেঙে দিন। আক্ষরিক অর্থে না হোক আন্তরিক অর্থে এই ফাঁসি দিল্লি-চুক্তির বিরুদ্ধে।'

গান্ধীজি চুপ করে রইলেন। সহিংস বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে তিনি চুক্তি ভাঙবেন? গান্ধীজি নিজের পথে নিজের মত দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলুন, বিপ্লবীরাও তাদের ধর্মে অবিচলিত থেকে তাদের বিপুল লক্ষ্যে ধাবিত হোক। অন্তত তারা শেখাক কী করে সাহসে দুর্জয় থাকা যায়, কী করে ক্ষীণ হস্তে তুলে ধরা যায় ভৈরবের রুদ্র পিনাক, কী করে কোনো মীমাংসার মধ্যে না গিয়েই জীবনকে পূজাঞ্জলী করে উৎসর্গ করে দেওয়া যায়। দেখাক তাদের বিপদে দ্বিধা নেই, শাস্তিতে দণ্ড নেই, মৃত্যুতে বিভীষিকা নেই। তারা কোনো লাভের আশা করে না, কোনো স্বার্থচিন্তায় তারা সংকুচিত নয়, অর্থ নয় আরাম নয় খ্যাতি নয় নিরাপত্তা নয়, কোনো প্রতাপ-প্রতিপত্তি নয়— শুধু একমাত্র স্বাধীনতার টানে তারা ঘরছাড়া দিকহারা— অত্যাচারীকে ক্ষমা না করার বীর্যেই তারা ঊর্জস্বান। তারা ভীরু নয়, কপট নয়, তারা নিষ্ক্রিয় শান্তির ললিতবাণী মুখে নিয়ে ছদ্মবেশ ধরে ঘোরে না।

এলাহাবাদে অ্যালফ্রেড পার্কে চুপচাপ বসে ছিল চন্দ্রশেখর আজাদ— পাশে অর এক সঙ্গী। সেই চন্দ্রশেখর— দিল্লি কাকোরি লাহোর সব মামলাতেই যে নায়ক পলাতক, হয় নৌকার মাঝি হচ্ছে, নয় কারু মোটর-ড্রাইভার— কিন্তু পুলিশ তাকে কিছুতেই

বাগাতে পারছে না। যেখানে পালাবার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রটুকু পর্যন্ত নেই সেখান থেকে সে অনায়াসে উবে যেতে পারে— তার সম্বন্ধে পুলিশের এই হুঁশিয়ারি। পুলিশ পর্যন্ত তার পলায়নের চাতুরীতে সপ্রশংস। কিন্তু সেই চন্দ্রশেখর, সকাল নটায়, পার্কের বেঞ্চিতে বসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল।

প্রকাণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যদি কেউ ধরে দিতে পারো চন্দ্রশেখরকে, ওরফে সীতারামকে, ওরফে পণ্ডিতজিকে, বাড়ি ভেলুপুরা, বেনারস। যে অসহযোগ আন্দোলনে স্কুল ছেড়েছে, আইন-অমান্য আন্দোলনে জেলে গিয়ে যে বেত খেয়েছে, তারই অভ্যুত্থানের স্বপ্নচ্ছবি কাকোরিতে, লাহোরে, দিল্লির এসেমব্লিতে। ঐ যে গাছের নিচে বন্ধুর সঙ্গে বসে আছে চুপচাপ।

ভদ্রবেশী গুপ্তচরেরা দেখতে পেয়ে কোতোয়ালিতে খবর পাঠাল।

একটু কি অন্যমনস্ক ছিল আজাদ? চোখ চেয়ে দেখল হাত চল্লিশ দূরে দুজন পুলিশ কর্মচারী এগিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই তার দিকে। পিস্তল তুলে নিল আজাদ। কিন্তু পুলিশের গুলিই বুঝি মুহূর্তের এক ভগ্নাংশ আগে ছোঁড়া হল। আজাদ জখম হতেই গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। আর সেই অন্তরাল থেকেই সে একা শত্রুর সঙ্গে প্রায় পনেরো মিনিট লড়লে। প্রথম গুলি লেগেছিল পায়ে, দ্বিতীয় গুলি বাম বাহুতে। তবু আজাদের যুদ্ধে নিবৃত্তি নেই। সে তিন-তিনটি পুলিশ কর্মচারীকে ঘায়েল করলে পর পর। তার সঙ্গী বুঝি একটু দূরে আরেকটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল, তাকে লক্ষ্য করে আজাদ বললে, 'তোমাকে আমার সাহায্যে করতে আসতে হবে না, তুমি পালাও। আমি আমার শেষ গুলি দিয়ে নিজেকে শেষ করব।'

নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আজাদ আত্মহত্যা করলে।

তেমনি যুদ্ধ চলল রাইটার্স বিল্ডিং-এর বারান্দায়। একেবারে ইংরেজ রাজত্বের অহঙ্কারের দুর্গে। যোদ্ধা তিন সমদুঃখসুখ বন্ধু, বিনয় বসু, সুধীর বা বাদল গুপ্ত আর দীনেশ গুপ্ত। তিনজনের পরনেই সাহেবি পোশাক, গলায় মাফলার জড়ানো। ধার্য কার্য সম্পন্ন করবার দ্রুততায় দীপ্যমান। পশ্চিমের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এসেছে তিনজনে। পূব দিকে খানিকটা এগোতেই বাঁয়ে পাওয়া গেল ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস-এর ঘর। ডাইনে সুন্দর ড্যালহৌসি স্কোয়ার— শীতের রোদে ঠাণ্ডা জল টলটল করছে। জনে-যানে নিনাদিত।

'সাহেব ভিতরে আছেন?' আর্দালিকে জিজ্ঞেস করল দীনেশ।

'আছেন। কী দরকার স্লিপে লিখে দিন আমি নিয়ে যাচ্ছি সাহেবের কাছে।' আর্দালি দরজায় ঝোলানো স্লিপ দেখাল।

তোমাকে নিয়ে যাবার কষ্ট করতে হবে না— তিন বন্ধু আর্দালির পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে আর কর্নেল সিম্পসনকে মুহূর্তমাত্র সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়েই রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়ল। ব্যাপারটা কী বোঝবার আগেই সিম্পসন ঢলে পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই তিন যোদ্ধা চলল পূবের দিকে। কোন ঘরে— কে সাহেব আছে কালসর্প, এস অস্ত্রের যথার্থ প্রয়োগ করি।

'সাহেব ভিতরে আছেন?' ফিন্যান্স মেম্বারের কামরার সামনে দাঁড়াল যোদ্ধারা।

শব্দ শুনে আগেই আন্দাজ করেছে আর্দালি। বললে, 'না, কোথায় বেরিয়েছেন। ঘর খালি।'

বাইরে থেকেই ঘরের মধ্যে এলোপাতাড়ি কটা গুলি ছুঁড়ল যোদ্ধারা। এখন আর ঘরে ঢোকা নয়, বাইরে দিয়েই পালাবার পথ খুঁজে নিতে হবে। ততক্ষণে সারা রাইটার্স বিল্ডিং-এ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক পড়ে গেছে। দুপুর একটায় এ কী উপদ্রব! পড়ে গেছে ছুটোছুটি ডাকাডাকি গেলাম-মলাম! এগ্রিকালচারের সেক্রেটারি বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে চেয়ার ছুঁড়ে মেরেছে— চেয়ার আর কদ্দূর যাবে— ওদের স্পর্শও করল না। পুলিশের আই-জি বেরিয়ে এসে পিছন থেকে গুলি ছুঁড়ল, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আর ছুঁড়বে কী, তার হাত-পা কাঁপছে, পাশে দাঁড়ানো রক্ষী পুলিশকে বললে, তুমি ছোঁড়ো। আই-জির রিভলভার নিয়ে সার্জেন্ট ছুঁড়ল, গুলি বিপ্লবীদের স্পর্শও করল না।

কে আর সাহেব আছ পাপকর্মা শঠশিরোমণি ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি, বেরিয়ে এস। জুডিসিয়ল সেক্রেটারি নেলসন বুঝি দরজা ফাঁক করে উঁকি মেরেছিল, বিপ্লবীদের গুলি তার জানু বিদ্ধ করল। আর কে আছ মুখ দেখাও।

পূব দিকের সিঁড়ির মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যোদ্ধারা শেষ ঘরে ঢুকল। কাছেই লালবাজার, উর্ধ্বতন কর্মচারীরা হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে পড়েছে। যোদ্ধারা ঐ ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে সদলে ঢুকে পড়ে এমন কারো দক্ষতা ও সাহস নেই। বাইরে থেকেই ঘরের মধ্যে গুলি ছোঁড়ো। ঘরও পালটা জবাব দিচ্ছে। এই ভাবে ওদেরকে নিঃশব্দ করতে পারলেই ঢোকা সহজ হবে।

ঘর নিঃশব্দ হলে উর্ধ্বতন কর্মচারী কনস্টেবলকে বললে, 'ভিতরে উঁকি মেরে দেখ তো কী অবস্থা।'

ভয়ে-ভয়ে উঁকি মারল কনস্টেবল।

'কী দেখছ?'

'দুজন মাটিতে শুয়ে আছে, আরেকজন টেবিলে মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছে।'

'তা হলে, কী বলো, এখন বোধহয় ঢোকা যায়?'

পুলিশের দল পা টিপে-টিপে অনেক সাহস করে ঢুকল। দেখল মাটিতে শয়ান দুটি যুবক এখনো নিশ্বাস ফেলছে। দুজনেই গুলিবিদ্ধ কিন্তু সে-গুলি আত্মহননের গুলি। বাঁচানো যাবে কিনা, বাঁচিয়ে ফাঁসিকাঠে তোলা যাবে কিনা সন্দেহ। আর তৃতীয়জন, যে চেয়ারে বসা? সে মৃত। সে গুলির সাহায্য নেয়নি, সে সায়ানাইড খেয়েছে।

পুলিশ বিনয়কে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'বিনয় বোস। আমিই লোম্যানকে মেরেছি।'

'ওর নাম কী? দীনেশের দিকে পুলিশ ইঙ্গিত করল।

'বীরেন ঘোষ।'

'আর যে ঐ চেয়ারে বসে আছে?'

'সুপতি রায়।'

বিনয় আর দীনেশকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। বিনয়কে বাঁচানো গেল না, দুদিন পরে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। কিন্তু দীনেশ বাঁচল। পুলিশের ভাবখানা

এই, তারাই বাঁচালে, এবার এক মহা-অপরাধীকে দিতে পারবে চরমতম শাস্তি। কিন্তু আসলে ঈশ্বরই বাঁচালেন— বাঁচালেন যাতে দীনেশ দেখাতে পারে আরো বীরত্ব, রেখে যেতে পারে মৃত্যু-তুচ্ছ-করা প্রাণের অদ্বৈত আনন্দ। ঈশ্বরের যদি সমাপ্তি না থাকে তবে আমার এই খণ্ডকালের কর্মটুকুও সমাপ্ত নয়। আমিও অদ্বৈতরসসমুদ্রের একটি অখণ্ড তরঙ্গ।

স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল যথারীতি ফাঁসির হুকুম দিল, হাইকোর্ট যথারীতি সে রায় বহাল রাখলে। কিন্তু ডাকে বা সেলে দেখ এসে দীনেশকে। স্তব্ধ যোগারূঢ় ঈশ্বরবেষ্টিত। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে— যেন এই মন্ত্রেরই এক শরীরী উচ্চারণ।

বাড়িতে চিঠি লিখেছে দীনেশ— মাকে, দাদাকে, বউদিদিকে। মৃত্যু সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা— নিদারুণ নতুন। মা গো, আমি এক নতুন দেশভ্রমণে যাচ্ছি, কী ভীষণ আনন্দের কথা! তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো। তোমার আশীর্বাদেই ভগবানের আশীর্বাদ। আর ভগবানের আশীর্বাদ কি শুধু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেহারা নিয়েই দেখা দেয়? কখনো কখনো দেখা দেয় সংহারের বিভীষিকা নিয়ে। কে জানে সেই বিভীষিকাই ঈশ্বরের সৌন্দর্যমূর্তি!

আবার লিখছে দীনেশ : মরতে আমার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। আমি জানি এ জীবন মধুর কিন্তু মৃত্যু মধুরতর। মৃত্যুই আমার বন্ধু আমার সুহৃৎ আমার মুক্তিদাতা। মৃত্যুই শাশ্বত জীবন। আমি কে? আমিই তো সেই অবিনাশী অপ্রমেয় আত্মা, আমার আবার মৃত্যু কী! আমার জন্যে কেউ চোখের জল ফেলো না। কোনো লবণাক্ত আবিল জলে আমার আত্মার তর্পণ হবে না। আমাকে আনন্দ দাও, ভালোবাসা দাও, আমাকে শুধু তোমরা মনে রেখো।

জেল-ডাক্তার দীনেশের ওজন নিতে এসেছে। এ কী অসম্ভব কথা! ফাঁসির হুকুম হবার পর ওজন কখনো বারো পাউণ্ড বাড়তে পারে? নিশ্চয়ই আপনাদের যন্ত্রের কোনো ভুল আছে।

জেল-ডাক্তার হাসল। বললে, 'যন্ত্রের ভুল থাকলে তো আমার চাকরি যাবে।'

'তা হলে আমার বারো পাউণ্ড ওজন বেড়েছে বলে আপনার চাকরি যাবে।' দীনেশও স্বচ্ছ মনে হাসল: 'গভর্নমেণ্ট বলবে ফাঁসির কয়েদিকে বেশি-বেশি খাওয়াচ্ছেন।'

'বেশি-বেশি খাওয়াতে পারি তার এমন সঙ্গতি কই, সৌভাগ্যই বা হবে কবে?' দীনেশের প্রতি জেল-ডাক্তারও আকৃষ্ট: 'বেশি বেশি খেতে দিলেই তো হল না, হজম করে আত্মসাৎ করার শক্তি কয়জনের?'

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল দীনেশ, ওয়ার্ডার তাকে জাগিয়ে দিল। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমাকে এখুনি আরেক জায়গায় যেতে হবে। ধড়মড় করে উঠে পড়ল দীনেশ। যথারীতি প্রাতঃকৃত্য করল, স্নান করল, চুল আঁচড়াল, চশমার কাঁচ মুছল, হাসিমুখে গার্ডকে জিজ্ঞেস করল, ট্রেন কটার সময় ছাড়বে? গার্ড চোখ নামাল।

ও, হ্যাঁ, আমি প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুলেই তবে ছাড়বে। আমাকে না নিয়ে ট্রেন যাবে না।

দৃঢ় পদক্ষেপে মঞ্চের উপর গিয়ে দাঁড়াল দীনেশ, চোখমুখঢাকা ক্লোক চাপানো হল, এবার গলায় জড়ানো হবে ফাঁস— দীনেশ হাত তুলে হ্যাংম্যানকে বারণ করল।

কী ব্যাপার? কর্তৃপক্ষ ছুটে এল। মুখোস খুলে ফেলল। কয়েদি কী বলতে চাইছে?

মুখ-চোখের বাঁধন আলগা হবার পর দীনেশ বললে, 'চশমার ব্রিজটা সরে গিয়েছে, ঠিক করে নি।'

মুখোসটা আঁট করে বাঁধবার সময় চশমার নাকিটা ঠিক জায়গায় থাকেনি, বেঁকে বসেছে, কিন্তু পরমুহূর্তে যে মরে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তার ঐটুকু অসুবিধে সম্পর্কেও তীব্রতম চেতনা! ছেলেটার বুঝি ইস্পাতের স্নায়ু, বজ্রভীষণ মনোবল— সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল— জেল-সুপার, জেলা-হাকিম, সিভিল-সার্জন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও এর কী সহজ শান্তি কী সতেজ উপেক্ষা! তার মানে কী? তার মানে মৃত্যু নেই। শুধু একটা দেশভ্রমণ। একটা নতুন দেশ বেড়াতে যাব, চশমাটা ঠিক করে না বসিয়ে নিলে যে সব ভালো দেখতে পাব না।

চট্টগ্রামের ছটি পলাতক ছেলে ঠিক করল পাহাড়তলির ফিরিঙ্গিপাড়া আক্রমণ করবে। রজত সেন, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ চৌধুরি আর দেবপ্রসাদ গুপ্ত। ফিরিঙ্গিরাই যত অত্যাচারের কলকাঠি, রোদের চেয়ে বালির তাতেই বেশি ফোস্কা, আগে ওদের শেষ করো। রজত বাড়িতে এসেছে মাকে একটু দেখে যেতে। যদি সম্ভব হয় দুটি ভাত খেয়ে নিতে।

'মা গো!'

'কে রজত?' বিনোদিনী দেবী আকুল হয়ে উঠলেন কিন্তু স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ।

'আমরা ছ জন। ভাত রান্না করে দিতে পারবে?'

বরদাত্রী জননী কোমরে আঁচল জড়ালেন। বললেন, 'এখুনি দিচ্ছি, একটু বোস।'

ঘরের মধ্যে মার স্নেহচ্ছায়ায় ছটি বন্ধু নিরাপদ উত্তাপ অনুভব করল। থালায় করে গরস পাকিয়ে ভাত খায়নি কত দিন। দুরন্ত জ্বাল দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত নামালেন বিনোদিনী। থালায় করে বেড়ে দিলেন ছেলেদের। আর ছেলেরা যেই বসতে যাচ্ছে রব উঠে গেল পুলিশ আসছে।

আসছে, এখনো এসে পড়েনি, ঘিরতে পারেনি বাড়িটাকে। ছেলেরা ভাতের থালা ফেলে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। রজত বললে, 'মা গো, দুঃখ কোরো না, আর কোনো ঘরে মা পেয়ে যাব, আমাদের ঠিক সে খেতে দেবে।'

সবাই নদীর পারে ছুটে এল। উত্তাল কর্ণফুলি। একটা শাম্পান নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, হ্যাঁ, পাড়ি দাও, ওপরে যাব। এদিকে পুলিশও পিছু নিয়েছে তিন দলে বিভক্ত হয়ে। নদীর মধ্যে ধরা গেল না। বিপ্লবীরা নদী পার হয়ে ঢুকে পড়েছে কালারপোলে। এস, কতদূর আসবে। অমনি-অমনি ধরা দেব না। মরব এবং যুদ্ধ করে মরব। ডাকাত! ডাকাত! পিছু-নেওয়া পুলিশের লোক প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে যদি গ্রামবাসীরা এগিয়ে এসে সাহায্য করে। কালারপোলের ইউনিয়ন বোর্ডের মুসলমান প্রেসিডেন্ট তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে এল ডাকাত ধরতে।

কেন মিছিমিছি ধাওয়া করছেন আমাদের? আমাদের ধরিয়ে দিয়ে আপনাদের লাভ কী? আমরা কী আপনাদের শত্রু?

জনতা শুনল না, সমানে চলল তাড়া করে। বিপ্লবীরা তাই গুলি ছুঁড়লে। দুজন

গ্রামবাসী মারা পড়ল, মারা পড়ল কনস্টেবল প্রসন্ন বড়ুয়া। ফণী নন্দী আর সুবোধ চৌধুরি জনতার হাতে ধরা পড়ল। বাকি চারজন 'জুলদা' গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল, ঢুকল এক মুসলমান গৃহস্থের ঘরে। ডাকল: 'মা মা আছ?'

মুসলমান-ঘরণী বেরিয়ে এল। কে রে মা বলে ডাকে?

'হাঁড়িতে পান্তা ভাত আছে মা? আমাদের ভাই চাট্টি খেতে দেবে?

'বোসো বাবারা, গরম ভাত রেঁধে দিচ্ছি—'

কিন্তু ভাগ্যে আর ভাত খাওয়া নেই, পুলিশবাহিনীর সঙ্গে সৈন্যবাহিনী এসে জুটেছে। বিপ্লবীরা ভাতের মায়া ত্যাগ করে ছুটতে ছুটতে একটা বাঁশবনের মধ্যে ঢুকল। আয় এখন থেকেই যুদ্ধ করি।

পুলিশ-সৈন্য ঘিরে ফেলেছে বাঁশ-বন। হাঁক দিল: 'সারেণ্ডার!'

বিপ্লবীদের প্রত্যুত্তর বন্দুকের শব্দে ধ্বনিত হল: 'কখনো না।'

বেশ খানিকক্ষণ ধরে চলল এই যুদ্ধ। এরই নাম কালারপোলের যুদ্ধ। যখন আর আওয়াজ নেই, সৈন্যবাহিনী নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকল জঙ্গলে। দেখল অনিন্দ্যসুন্দর চারটি কিশোর মাটিতে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বুঝল আহত হয়ে পড়ে যাবার পরেও তারা মাটিতে পড়ে গুলি ছুঁড়েছে। দেখল রজত, মনোরঞ্জন, দেবপ্রসাদ—কারুরই প্রাণ নেই, শুধু স্বদেশই তার নিশ্বাস এখনো নিঃশেষ করেনি। মহানন্দে স্বদেশকে তারা গ্রেপ্তার করল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে তাদের হেপাজতে রাখতে পারল না। কয়েক ঘণ্টা পরেই তাদের পূর্বগামী বন্ধুরা তাকে ডেকে নিলে।

ফণী নন্দী আর সুবোধ চৌধুরির ফাঁসি হল।

চট্টগ্রামে পুলিশ অকথ্য অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে, জনসাধারণের উপর তো বটেই বিশেষ করে ছাত্রদের উপরে। সমস্ত অত্যাচারের মূল কর্তা ক্রেগ—পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল। এসেছে চট্টগ্রামে পয়লা ডিসেম্বর ঢাকায় রওনা হবে। মূল নেতা সূর্য সেন খবর পাঠিয়েছেন চাঁদপুরে ক্রেগকে হত্যা করতে হবে। বরাত পড়েছে ছাত্র রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আর কালীপদ চক্রবর্তীর উপর। রামকৃষ্ণ বৃত্তি-পাওয়া মেধাবী ছেলে। সে ঠিক কার্যোদ্ধার করতে পারবে।

চিটাগং মেল লাকশাম হয়ে চাঁদপুরে পৌঁছুবে। লাকশামে রেলোয়ে পুলিশের ইনস্পেক্টর তারিণী মুখার্জি সে-ট্রেনে উঠল। ক্রেগ যে ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় উঠেছিল তার সংলগ্ন 'কুপে'তে তারিণীর জায়গা হল। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ এই তারিণী। সে চলেছে চাঁদপুরে নেমে ক্রেগের স্টিমারে ওঠার ব্যবস্থার তদারকি করতে। তার মানে তার চাকরিতে একটু পালিশ লাগাতে।

রাত চারটার সময় চাঁদপুরে টেন এসে দাঁড়াল। দাঁড়াতেই নেমে পড়ল তারিণী। গার্ডের গাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রেলোয়ে পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে এঞ্জিনের দিকের একটা থার্ড ক্লাশ থেকে নামল রামকৃষ্ণ আর কালীপদ। শীত, তাই দুজনেরই গায়ে-মাথায় র‍্যাপার জড়ানো। একজনের সবুজ আরেকজনের লাল। তারিণীকেই ক্রেগ বলে ভুল করল। প্রথমত দেখল ফার্স্ট ক্লাশ থেকে নামল, দ্বিতীয়ত সাব-ইনস্পেক্টর স্যালিউট করল, তৃতীয়ত, দেখতে ঠিক সাহেবের

মত, অই আর দ্বিধা না করে পিছন থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে বসল। প্ল্যাটফর্মের পর উপড়ে গেল তারিণী। আর উঠল না। ধর—ধর—কে কাকে ধরে। জানালা তুলে ক্রেগ গুলি ছুঁড়ল বটে, বিপ্লবীদের নাগাল পেল না। সাব-ইনস্পেক্টর তো স্টেশন-মাস্টারের ঘরে গিয়ে লুকোল। কে পলাতকদের পিছু নেয়? তারা লাইনে-দাঁড়ানো মালগাড়িগুলির আড়াল দিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে।

ধীরস্থির সংযত পায়ে গাঁয়ের পথ ধরে চলেছে দুই কিশোর—কালীপদ আর রামকৃষ্ণ। সহসা দেখতে পেল পিছন দিকে থেকে মোটর ছুটে আসছে, হেড-লাইট ফেলে। চাঁদপুরের এ-এস-পির মোটর, সঙ্গে প্রচুর অস্ত্রসম্ভার। পালাবার আর পথ নেই, সামনে শুধু মাঠ তবু রাস্তা ছেড়ে পাশে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল দুজন, গাড়িটা যদি বেরিয়ে যায়। সবুজ আর লাল আলোয়ান—সহজেই ধরা পড়ল। গাড়ি বেরিয়ে গেল না, তাদের উপরই পড়ল প্রায় হুমড়ি খেয়ে।

বিচারে রামকৃষ্ণের ফাঁসির হুকুম হল, কালীপদর বয়েস কম বলে তাকে আন্দামানে পাঠালে।

কমডেমড সেলের পাশাপাশি দুই অন্ধকূপে মৃত্যুপতীক্ষায় দুই বিপ্লবী—দীনেশ গুপ্ত আর রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। আগে কেউ কাউকে চিনত না, এখন পাশাপাশি বাস করে মনে হল আদর্শে মহত্ত্বে প্রাণের প্রাচুর্যে এরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অনন্তকাল চলেছে পাশাপাশি। আর অনন্ত পথের অদ্বিতীয় যে বন্ধু, মৃত্যু বুঝি তাঁরই আহ্বান।

ক্রেগের গায়ে আঁচড় লাগল না বটে কিন্তু ডুর্নো আহত হল। ঢাকার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ডর্নো, মদের দোকানে ঢুকেছে বোতল কিনতে, দুটি যুবক তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বসল। দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে রাজপথের উপর এমন কাণ্ড কেউ ভাবতেও পারত না। কিন্তু বিপ্লবীরা পারে, তাদের স্বপ্ন আরো অভাবনীয়। ডুর্নো আহত হল মাত্র—তাতেই প্রাণ নিয়ে দেশে পালাল। ঘটনার নায়ক সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিককে কেউ ধরতে পারল না।

কিন্তু কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এলিসনকে ছাড়া হল না। রাস্তা দিয়ে সাইকেল করে যাচ্ছিল, কী একটা ফাটল চাকার কাছে। পিছন ফিরে তাকাতে গেল এলিসন। সঙ্গে সঙ্গে গুলি। সাইকেল থেকে নেমে এলিসন আততায়ীকে গুলি করতে গেল, গুলি বেরুল না, নিজেই পড়ে গেল মাটিতে। শত চেষ্টা করেও এলিসনকে বাঁচানো গেল না। আর এই মৃত্যুদণ্ডের বিধাতা তরুণ শৈলেশ রায় নিরাপদে পালিয়ে গেল। কেউ পালিয়ে যেতে পারে, কেউ পারে না। কিন্তু সাফল্য আর বৈফল্য যাই হোক, বিপ্লবীরা স্বাধীনতাকে ঠিক এগিয়ে আনছে।

গান্ধী-আরউইন চুক্তিও সেই পথেই।

সুভাষ সরাসরি মহাত্মাকে বললে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি স্বাধীনতার দাবিতে অচল থাকবেন ততক্ষণ আপনার সমস্ত চুক্তি সমর্থন করব কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি স্বাধীনতার চেয়ে অল্পতর দাবিতে নেমে আসবেন সেই মুহূর্তেই আপনার বিরোধিতা করব।

মহত্মা বললেন, তথাস্তু।

অল্প কদিন পরেই করাচিতে কংগ্রেস হচ্ছে। মহাত্মা বললেন, কংগ্রেসকে বলা

হবে সে যদি গোলটেবিল বৈঠকে যায়, তার চুক্তির হাত বেঁধে দিতে হবে অর্থাৎ এমন কিছুতে সে সই করবে না যা লাহোর কংগ্রেসের স্বাধীনতা-প্রস্তাবের অসদৃশ। আর তিনি নিজে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন যাতে সহিংস বন্দীরাও ছাড়া পায়।

বাংলার বিপ্লবী মুক্তিব্রতীরা বুঝি আশার আলো দেখল।

কিন্তু ইংরেজকে গান্ধী চিনেও চিনলেন না। সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল অথচ ভগৎ সিং ও তার সঙ্গীদের ফাঁসিটা মকুব করল না আরউইন। আরউইন পাদ্রী হতে পারে কিন্তু সে জানে আগে সাম্রাজ্য পরে পাদ্রীগিরি। সাম্রাজ্যই যদি যায় তবে পাদ্রীগিরি চালাবে কোথায়?

আঠারোই মার্চ ভগৎ সিং-এর বাবা জেল-দপ্তর থেকে চিঠি পেল, তোমার সঙ্গে তোমার ছেলের শেষ সাক্ষাৎকারের তারিখ ২৩শে মার্চ ও সময় বেলা এগারোটা। ঐ দিন ঐ সময় লাহোর সেন্ট্রাল জেলে তোমার রক্তসম্পর্কিত সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে এস। অনুরূপ চিঠি গেল রাজগুরু আর শুকদেবের বাড়িতে।

তেইশে মার্চ সন্ধেয় পর-পর তিনজনের ফাঁসি হয়ে গেল।

সুভাষ তখন করাচির পথে, শুনতে পেল, গতকাল, তেইশে ভগৎ সিংদের ফাঁসি হয়ে গেছে। আরও খবর রটল তাদের মৃতদেহের প্রতি সম্মান দেখানো দূরের কথা, ব্রিটিশ সরকার একটু করুণা দেখাতেও রাজি হয়নি।

সমস্ত দেশ শোকে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। ভগৎ সিংদের পথ ঠিক পথ না ভুল পথ এ প্রশ্ন আর থাকল না, এ কি রেভলিউশান না টেররিজম, বিপ্লববাদ না সন্ত্রাসবাদ, গোঁড়া মহলের এ তর্কও সিকেয় তোলা থাকল—ভগৎ সিংদের মত ছেলে যে-কোনো দেশের পক্ষেই গৌরব সকলে তা নতমস্তকে মেনে নিল, আর ভগৎ সিংদেরই তো একজন যতীন দাস। আর যতীন দাসেরই তো কত শত সহচর বাংলা দেশে। বিপ্লববাদ চিরজীবী হোক।

মহাত্মা যখন করাচিতে নামলেন তখন তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হল, যুবকেরা তাঁকে কালো ফুলের মালা উপহার দিলে। তাদের আপশোস, মহাত্মাই ভগৎ সিংদের ফাঁসিকাঠে লটকে দিলেন। চুক্তিতে কেন তাদের মুক্তির সর্ত অন্তর্ভুক্ত করলেন না। আর আরউইন যদি এত আবেদন-নিবেদন উপেক্ষা করতে পারল, মহাত্মাই বা কেন ভেঙে দিলেন না চুক্তি?

মহাত্মা হাসিমুখে কালো ফুলের মালা নিলেন মাথা পেতে। গভর্নমেণ্ট আনন্দিত হল, আশা করল যদি এই নিয়ে কংগ্রেসে একটা ভাঙন হয়।

কিন্তু সুভাষ ভাঙন ধরাতে দিল না। যদিও সে চুক্তির বিরোধী, যদিও সে বিশ্বাস করে গান্ধীজি ভুল করছেন, তবু পাছে কংগ্রেস হীনবল হয় ও ইংরেজ সরকার সেই হীনবলতার সুবিধে নেয়, সুভাষ গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিল তাকে খণ্ডিত হতে দিল না। কথা হল কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে সে গান্ধীর বিরোধিতা করবে না কিন্তু অন্যত্র তার স্বাধীন মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। ভুল করছেন জেনেও জাতির নেতার প্রতি এই বাধ্যতা ছিল বলেই তো ভবিষ্যতে সুভাষ নেতাজীই হতে পেরেছে।

সময়ের মেজাজ কী রকম বদলে গিয়েছে তা লক্ষ্য করবার মত। ভগৎ সিং

ও সহচরদের সাহস ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করে কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ করল। অথচ এই কংগ্রেসই গোপীনাথের বেলায় কী চিত্তদারিদ্র্য প্রকাশ করেছিল। কংগ্রেস তখনো অহিংস, এখনো অহিংস। তবে এ তারতম্য কেন? কে জানে কংগ্রেস হয়তো মনে মনে বুঝতে পারছে চুক্তিতে কিছু হবে না, যুক্তিতে কিছু হবে না—যদি হয়তো হবে একমাত্র গণ-অভ্যুত্থানে।

এইখানেই গান্ধীবাদের উত্তরে সুভাষবাদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। করাচিতে নিখিল ভারত যুবকংগ্রেসের সভাপতি হয়ে উদ্দীপ্ত বক্তৃতা দিল সুভাষ। দিল্লীচুক্তি শুধু অপদার্থ নয়, দিল্লীচুক্তি সর্বনাশা। শুধু তৃষ্ণার্তকে মরীচিকা দেখিয়েই তা ক্ষান্ত হচ্ছে না, একেবারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অকর্মণ্যতার রসাতলে। চুক্তি বা আপস অত্যাচারিতের সমস্ত সংগ্রামস্পৃহাকে খর্ব করে আর শত্রুকে সময় দেয় তার ছিদ্রগুলিকে ভরাট করে নেবার জন্যে। তাই প্রমাণিত হল।

গোলটেবিল বৈঠক থেকে গান্ধী শূন্য হাতে ফিরে এলেন।

সতেরো

দিল্লীচুক্তিতে কথা ছিল পুলিশি অত্যাচার ক্ষান্ত হবে। হিমালয় বিচলিত হবে কিন্তু ইংরেজ পুলিশ বিচলিত হবে না। উনত্রিশে অগাষ্ট কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হয়ে মহাত্মা চললেন বিলেতে গোলটেবিলের গোলমালে, তার কদিন পরেই হিজলি বন্দীশিবিরে পুলিশ গুলি চালিয়ে সন্তোষ মিত্র আর তারকেশ্বর সেনকে খুন করলে।

কী একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একজন বন্দী ও সান্ত্রির সঙ্গে খিটিমিটি বেধেছিল, তাই নিয়ে হাতাহাতি। অভিযোগ উঠল একজন বন্দী নাকি সান্ত্রির হাত থেকে বেয়নেট কেড়ে নিতে চেয়েছিল। ব্যস, আর কথা নেই। রাত নটায়, বন্দীরা কেউ যখন ঘরে, কেউ যখন বা খেতে বসেছে, পুলিশ দুর্দম উল্লাসে গুলি চালাল। সে তাদের কী জয়হুঙ্কার—'রামজি কি জয়। হুকুম মিল গিয়া, হুকুম মিল গিয়া।'

সেপাই-সান্ত্রিরা দলে-দলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল উপরে। শালা লোককো মারো। মার ডালো শালা লোককো। চলল বেটন চলল বেয়নেট চলল বুলেট। সন্তোষের তলপেটে গুলি বিঁধল আর তারকেশ্বরের কপালে। তাছাড়া কুড়িজন আহত হল, তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। খবর পৌঁছুল কলকাতায়। খবর পৌঁছুল সুভাষের কক্ষে।

সতীন সেন উত্তেজিত হয়ে বললে, 'পাশবিকতার কি সীমা নেই?'

সুভাষ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, 'শুধু পাশবিকতা হলে সীমা থাকত। এ তার চেয়েও বেশি।'

কিন্তু খবর শুনে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। সন্তোষ আর তারকেশ্বরকে নিয়ে আসতে হবে কলকাতায়। না, ওদের মৃতদেহদুটোকে নয়, জলজ্যান্ত ওদেরকেই নিয়ে আসতে হবে। ওদের এই আত্মাহুতিই তো বাস্তব সত্যাগ্রহ। বহুশতলক্ষ সত্যাগ্রহীর দীক্ষা হবে ওদের রক্তে। সুভাষই নিজে গিয়ে নিয়ে এল ওদের, ওদের শব ধারে কাঁধ দিয়ে নিজেই নিয়ে গেল শ্মশানে। তারপর সভা ডাকল মনুমেন্টের নিচে।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব নিয়ে তখন সুভাষে সেনগুপ্তে অনেক বিরোধ, অনেক

মন-কষাকষি। কিন্তু আজকের ব্যাপারে আবার বিরোধ কী! সুভাষ সেনগুপ্তকে ফোন করল: 'আজকের সভায় আসুন।'

'হ্যাঁ, যাব। আমাদের সভা আলাদা হবে।'

'মানে, মনুমেন্টেরই নীচে?'

'হ্যাঁ, একই জায়গায়।'

'তার মানে কংগ্রেসের তরফ থেকে দুটো সভা হবে?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'না, না, একটা সভা হবে।' সুভাষ প্রশান্ত স্বরে বললে, 'আর সেটা আপনারই সভা। আপনার সভাতেই আমরা উপস্থিত হব। আপনিই সেই সভার সভাপতি।'

দেশের ডাকে, অত্যাচারের প্রতিরোধের ডাকে, সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহের ঊর্ধ্বে উঠে গেল সুভাষ। উদারপুরুষ বীরভদ্র সুভাষ। মঞ্চে যতীন্দ্রমোহনের পাশে এসে দাঁড়াল। বিরাট জনতাকে সম্বোধন করে বললে, 'দলের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ অনেক বড়। দুঃখের মধ্যে দিয়ে সেই দেশ আমাদের ডাকছে এই দুঃখ নিবারণ করো।'

টাউনহলে ও সভা হল। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও এলেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন, 'ডাক যখন পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতী নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে।' ইংরেজ সরকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতা কারণ এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়।'

বক্সা জেলের রাজবন্দীদের উদ্দেশ করেও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

'নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন,
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
'অমৃতের পুত্র মোরা'—কাহারা শুনাল বিশ্বময়
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥'

হিজলির ঘটনা নিয়ে তদন্ত বসল। সেই তদন্ত উপলক্ষে সুভাষ আর সেনগুপ্ত দুজনেই চলে গেল হিজলি, একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে লাগল।

তদন্ত কমিশন রায় দিল গুলি চালানো অন্যায় হয়েছে। কমিশনের রায়ে কী এসে যায়? অন্যায় হলে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত হবে ইংরেজ? কখনো না। আবার যখন বাগে পাবে ফের গুলি ছোটাবে। লোকদেখানো তদন্তের অভিনয় করে জগৎকে বোঝাবে, ইংরেজ কী ন্যায়নিষ্ঠ! আর যে ইংরেজকে জানে সে ঠিক বুঝবে ইংরেজ কী ধাপ্পাবাজ!

চট্টগ্রামে পুলিশ ইনস্পেক্টর আশানুল্লাও নির্যাতনের সাইক্লোন চালিয়েছে। হয়েছে

খান-বাহাদুর। সূর্য সেন ঠিক করল আশানুল্লার আসান করে দিতে হবে। হরিপদ ভট্টাচার্যকে ভার দিল। কি রে, পারবি তো?

পারব। পনেরো-যোল বছরের ছেলে হরিপদ বুক ফুলিয়ে বললে, পারব।

যদি ধরা পড়িস, তারপরের সেই ভয়াবহ অত্যাচারের কথা মনে করিস। নখে ছুঁচ ফোটাবে, ব্যাটারি চার্জ করবে, বরফের উপর শুইয়ে রেখে বরফ দিয়ে চাপা দেবে।'

কিছু কেয়ার করি না।

মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে—রেলোয়ে কাপ-এর চূড়ান্ত খেলা। আশানুল্লার টিম টাউন ক্লাব জিতেছে কোহিনূর ক্লাবকে হারিয়ে। আশানুল্লার ভীষণ আনন্দ। পারলে সে নিজেই হয়তো কাপটার জন্যে হাত বাড়ায়। অন্তত ম্যাজিস্ট্রেটের থেকে একটা হ্যাণ্ডসেক আদায় করে। সহসা পিছন থেকে আশানুল্লার পিঠে গুলি ছুঁড়ল হরিপদ। আশানুল্লা পড়ে গেল। হরিপদ নড়ল না। ধরতে বেগ পেতে হল না পুলিশের। তারপর শুরু হল মায়ের হরিরলুট। যেমন বস্তার পর বস্তা ফেলে গুদাম বোঝাই করে তেমনি লোক ধরে ধরে একটার উপর আরেকটাকে ফেলে লকআপ বোঝাই করে ফেলল—আর প্রত্যেকটা লোকই মার-খাওয়া মাথা-ফাটানো। একা হরিপদকে ধরে একা হরিপদকে মেরে একা হরিপদর মাথা ফাটিয়ে ইংরেজের রক্তস্পৃহা নিবৃত্ত হবার নয়।

হরিপদর বেলায় ছুঁচ ব্যাটারির অতিরিক্ত আরেক ব্যবস্থা চালু করল ইংরেজ। গ্রামে গ্রামে ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে দিয়ে লোক জড়ো করো। বলো আশানুল্লাকে যে মেরেছে সেই দুর্দান্ত আসামীকে দেখবে এস। তাকে শিকলে বেঁধে আনা হয়েছে তোমাদের সামনে। তোমাদের সামনেই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। চাবকানো হবে। দেখবে এস।

সকলে এসে দেখল কচি কৃশ কোমল একটি ছেলে। সকলের সামনে হরিপদকে পুলিশ বেত মারে, সঙিনের খোঁচা মারে আর বলে, 'বল ইংরেজের জয় হোক, সূর্য সেনের ক্ষয় হোক।'

হরিপদ চেঁচিয়ে বলে, 'ইংরেজের ক্ষয় হোক, মাস্টারদার জয় হোক।'

বিচারে হাজির হল হরিপদ। এ যে একেবারে একটি বালক। হাকিম ফাঁসির হুকুম দিতে পারল না। যাও কালাপানি পেরোও।

ডুর্নোকে গুলি করার পর ঢাকায় পুলিশি তাণ্ডব প্রচণ্ড হয়ে উঠল। মনে হল কারু শরীর যেন শরীর নয়, সম্পত্তি সম্পত্তি নয়।

সুভাষ বললে, আমি ঢাকায় যাব।

যেমন বলা, রওনা হয়ে গেল। সঙ্গে জে. সি. গুপ্ত, হেমেন দাসগুপ্ত, নরেন চক্রবর্তী। আর ছাত্রনেতা অবিনাশ। নারায়ণগঞ্জে নামতেই ঢাকায় পুলিশ-সুপার এলিসন স্থানীয় এস-ডি-ওকে নিয়ে উপস্থিত। বললে, 'আপনাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

'আমাকে কি আপনি গ্রেপ্তার করছেন?'

'না, তবে আপনার চলা-বলা আবদ্ধ।'

'আমাকে তবে কী করতে হবে?'

'আপনার জন্যে স্টিমার তৈরি, আপনাকে ফিরে যেতে হবে।'

'আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে।'

'চলুন।'

আর সকলে থাকল, সুভাষ আর নরেন ফিরে চলল স্টিমারে। কমলাঘাটে স্টিমার এসে লাগতেই একটা এক ফালি সিঁড়ি ফেলে তাড়াতাড়ি নেমে গেল এলিসন। তাড়াতাড়ি সিঁড়িটা টেনে নিল, যাতে দেখাদেখি সুভাষ না নেমে পড়ে।

'ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল।' যাত্রীদের মধ্যে থেকে কে বলে উঠল।

'কোথায় পালাবে? ওর সিঁড়িও তুলে নিয়েছে।' আরেকজন কে বললে।

এর কমাস পরেই কুমিল্লায় গুলি খেল এলিসন।

স্টিমার এসে দাঁড়াল চাঁদপুর। সুভাষ বললে, কলকাতায় ফিরব না, যেমন করে হোক, আবার ঢাকায়ই ফিরে যাব। চাঁদপুর থেকে কুমিল্লা। কুমিল্লায় কামিনী দত্ত, বসন্ত মজুমদার, হেমপ্রভা। অভয় আশ্রম, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশ-প্রাঙ্গণ, হরদয়াল নাগ। সেখান থেকে ব্রাহ্মণবেড়িয়া। সেখান থেকে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে তেজগাঁ। তেজগাঁয় পুলিশ এসে সুভাষকে গেপ্তার করলে। অপরাধ?

ঢাকার সদর এস-ডি-ও সশরীরে উপস্থিত। আপনি আমার ১৪৪ ধারার নোটিশ অমান্য করে ঢাকায় ঢুকেছেন।

'তা গ্রেপ্তার করেছেন, ভালো কথা। কিন্তু জামিন দেবেন তো?' সুভাষ তাকাল।

'দিতে পারি যদি কথা দেন আপনি ঢাকায় ঢুকবেন না।'

'কথা-টথা আমি দিতে পারব না।'

'তা হলে চলুন আমাদের সঙ্গে।'

সুভাষকে জেল-হাজতে নিয়ে গেল। হাজতে কারা দেখা করতে এসেছিল, সুভাষ পুলিশকে বললে, সামনে থেকে লোহার জালটা সরিয়ে নিন।

তা কি করে নেওয়া যায়। পুলিশ অসম্মত হল।

সুভাষ দেখা করল না।

তিনদিন পরে জামিন মঞ্জুর হল। মোকদ্দমার দিন পড়ল তেইশে নভেম্বর। বিশেই তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলে নিল সরকার।

ক দিন পরেই ত্রিপুরার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনস খুন হল। সম্ভ্রান্ত ঘরের দুটি মেয়ে, ফৈজুন্নেসা গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলের ক্লাশ এইটের ছাত্রী, শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী, একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে এল। আর্দালির হাত দিয়ে কার্ড পাঠাল ভিতরে, কার্ডে ইংরিজিতে নাম লেখা মীরা দেবী আর ইলা সেন। এস-ডি-ও নেপাল সেনের সঙ্গে কথা কইছিল স্টিভেনস, কথা কইতে-কইতে বাহিরে এল। বাইরে আসতেই শান্তি স্টিভেনসকে একটা দরখাস্ত দিলে। নিরীহ দরখাস্ত—স্কুলের ছাত্রীদের জন্যে যদি একটা সুইমিং পুল তৈরি করে দেন।

স্টিভেনস বললে, 'হেডমিসট্রেসের থ্রু দিয়ে এস।' সেই মর্মে স্বহস্তে নোট লিখে দিলে দরখাস্তে।

নোট লিখে দরখাস্ত শান্তির হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে, সুনীতি আঁচলের তলা থেকে রিভলভার বের করে স্টিভেনসের বুকের উপর গুলি চালিয়ে দিল।

'পাকড়ো! পাকড়ো!' চেঁচিয়ে উঠল নেপাল সেন।

শান্তি-সুনীতি পালাবার চেষ্টা করল না, আর গুলিও ছুঁড়ল না, দিব্যি ধরা দিল। তাদের নির্ধারিত কাজ একগুলিতেই সমাধা হয়েছে। হ্যাঁ, রক্তাক্ত দেহে মরে পড়ে আছে স্টিভেনসন। চোদ্দ-পনেরো বছরের দুটি মেয়ে। বিশুদ্ধসিদ্ধাসনা বীরাঙ্গনা। কে ওদের ফাঁসি দেবে? বিচারে শুধু যাবজ্জীবন কারাবাস হল। এ আবার নতুন কী শাস্তি! যতক্ষণ স্বাধীনতা না আসে ততক্ষণ প্রাণধারণই তো যাবজ্জীবন কারাবাস।

কিন্তু প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার ধরা দিল না। বি-এ পাশ, চাটগাঁয় নন্দনকানন স্কুলের শিক্ষিকা, পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাবে বোমা ছুঁড়ল। বোমার বিদারণের শব্দ শেষ হতেই শোনা গেল সাহেব-মেমদের চিৎকার। দশ-বারোজন ঘায়েল।

বিপ্লবীদের সবাই পালাল কিন্তু প্রীতিলতা পালাল না। তার হাতের রিভলভারটা একটি তরুণ বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে প্রীতিলতা বললে, 'এটা যেন ওরা না পায়।'

'আপনি চলে আসুন।'

'না, আমাকে ওরা ডাকছে—' প্রীতিলতা আকাশের দিকে ইশারা করল।

সব শান্ত হলে পুলিশ যখন কাছে এল তখন দেখল পুরুষের বেশে কে একটি সুন্দরী মেয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু, না, উৎসাহিত হবার কারণ নেই, সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে প্রীতিলতা। অথচ কিছুদিন আগে ধলঘাটের যুদ্ধে তাকে বাঁচিয়েছিল সূর্য সেন। গ্রামের একটি বিধবা মহিলা, সাবিত্রী দেবী, বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছেন। দোতালা মাটির ঘর, নিচে থাকেন মহিলা, তাঁর একটি ছেলে আর মেয়ে আর উপরে বিপ্লবীরা, সূর্য সেন, নির্মল সেন, অপূর্ব সেন আর প্রীতিলতা।

রাত নটা। উপরের ঘরে বসে খাচ্ছে বিপ্লবীরা, সাবিত্রী দেবীর ছেলে হঠাৎ বলে উঠল: পুলিশ!

শুধু পুলিশ নয়, পল্টনে বাড়ি ঘিরেছে। পল্টনের অধিকর্তা স্বয়ং ক্যাপটেন ক্যামেরন। আর কিছু হোক না হোক প্রীতিলতাকে বাঁচাতে হবে। বাড়ির মধ্যে, ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সূর্য সেন প্রীতিলতাকে নিয়ে রান্নাঘরের ছাদের উপর লাফিয়ে পড়ল, ছাদ থেকে পিছনের দিকে নেমে জলা-জংলার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

হাবিলদারকে এগিয়ে দিয়ে ক্যামেরন উঠছে সিঁড়ি দিয়ে। পিছনে আরো অনেকে। হাবিলদারকে সবলে ধাক্কা মেরে অপূর্ব ফেলে দিল নাচে। ক্যামেরন খোলসা হয়ে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গেই নির্মল তাকে গুলি করলে। তারপর সুরু হল ধলঘাটের যুদ্ধ। অপূর্ব-নির্মল প্রাণ দিলে।

পুলিশ আর কাকে ধরবে, ধরল সাবিত্রী দেবীকে আর তাঁর ছেলে রামকৃষ্ণকে। পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিল বলে বিচারে মাতা-পুত্রের চার বছর করে সশ্রম জেল হল।

রামকৃষ্ণ মেদিনীপুর জেলে যক্ষ্মায় মারা গেল আর যদিও সাবিত্রী দেবী সেই একই জেলে ছিলেন, ছেলেরা শেষ সময়েও তাঁকে কাছে গিয়ে একটু সেবা করতে দেওয়া হল না। রামকৃষ্ণ যখন শেষ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে মারা গেল, তখন দয়ালু সরকার মাকে বললে, 'ইচ্ছে করলে দূরে দাঁড়িয়ে একটু শেষ দেখা দেখতে পারেন ছেলেকে।

একটু কাছে যেতে পাই না? ওর কপালে একটু হাত রাখতে পারি না? না। হুকুম নেই। দূরে দাঁড়িয়েই সাবিত্রী দেবী দেখলেন ছেলেকে। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। ইংরেজ সরকার সদাশয়, অন্তত এ কথাটা বললে না যে চোখের জল ফেলারও হুকুম নেই।

'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?'

ইউরোপিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্স গুলি খেল। গুলি খেল ওয়াটসন, স্টেটম্যানের সম্পাদক। অতুল সেনের প্রথম গুলি ওয়াটসনকে স্পর্শ করল না। স্টেটসম্যান অফিসের গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল অতুল। লাঞ্চ খেয়ে ওয়াটসন ফিরছে অফিসে, গেটের কাছে তার গাড়ি কিঞ্চিৎ মন্থর হল। অতুল তাক করে গাড়ির মধ্যে গুলি ছুঁড়ল। ভাবল কাজ বুঝি হাসিল হয়েছে। না কি বুঝল হয়নি। কাগজের পুরিয়ায় কী ছিল, নিজের মুখে ঢেলে দিল। নিজের প্রাণ নিজে নিলে।

আবার কদিন পর ময়দানের রাস্তায় চলন্ত মোটরের মধ্যে ওয়াটসনকে গুলি করা হল। অফিসের পর লেডি সেক্রেটারিকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে ওয়াটসন, হঠাৎ একটা খোলা 'টুরার'—তাতে তিনজন যাত্রী—তার পিছু নিয়েছে। ওয়াটসন আর ড্রাইভারকে বললে, জোরে চালাও। কত জোরে চালাবে—টুরার একেবারে পাশে এসে পড়েছে। পাশে এসেই গুলি ছুঁড়েছে ওয়াটসনকে। গুলি লাগল বটে কিন্তু মরাত্মক হল না। ওয়াটসন এবারও বেঁচে গেল। তার সেক্রেটারিও অস্পৃষ্ট।

টুরারটা পাওয়া গেল বেহালায়। দুজন বিপ্লবী পড়ে মরে আছে—মণি লাহিড়ি আর অনিল ভাদুড়ি। তৃতীয় ব্যক্তি পলাতক।

কিন্তু ইংরেজ বিচারক গার্লিক বাঁচল না। আলিপুরের জেলাজজ গার্লিক। যে স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়েছিল তারই প্রেসিডেন্ট ছিল সে। একটি নিরীহবেশী ছেলে সামনের দরজা দিয়ে কোর্টে ঢুকল। কোর্টে তো যে কেউ যে কোনো সময়ে ঢুকতে পারে। ঘরভরতি লোক, উকিল ব্যারিস্টার সাক্ষী পেশকার—সম্ভ্রান্ত কক্ষ গমগম করছে—ছেলেটি সটান সাক্ষীর কাঠগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। কিছু বলবে, না, দরখাস্ত পেশ করবে, পিছনে কোনো উকিল আছে হয়তো—এক মুহূর্তেই সবাই কেমন বিমূঢ় হয়ে রইল। এক মুহূর্তেই। কাঠগড়ায় উঠেই বিপ্লবী গার্লিককে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। প্রথম গুলি ভ্রষ্ট হল। দ্বিতীয় গুলি গার্লিকের কপাল বিদ্ধ করল।

'ও গড!' বলেই গার্লিক টেবিলের উপর ঢলে পড়ল।

রক্ষী সার্জেন্টও বিপ্লবীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। সেও পড়ে গেল মাটিতে। তার পকেটে পাওয়া গেল একটুকরো কাগজ: 'ধ্বংস হও। দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার নাও। ইতি বিমল গুপ্ত।'

পুলিশ অনেক খোঁজখবর করে জানতে পারল বিমল গুপ্ত ছদ্মনাম। বিপ্লবীর আসল নাম কানাইলাল ভট্টাচার্য, বাড়ি জয়নগর মজিলপুর।

গান্ধীজির বিলেত যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেঙ্গল অর্ডিনান্স পাশ হয়ে গেল। সরাসরি বিচার, পিটুনি ট্যাক্স, অন্তরীণ বন্দীকরণ—যাবতীয় কদর্যতা আবার আমদানি হল। 'ল-লেস-ল,' সুভাষ বললে, 'আইনছাড়া আইন—এ আমরা সহ্য করব না কিছুতেই।'

গান্ধীজির রওনা হবার আগে সুভাষ তাঁকে বলেছিল, 'গোলটেবিল বৈঠকে দেখবেন কতগুলো খুঁটিনাটি ব্যাপারেই ইংরেজ সরকার আপনাকে আবদ্ধ রাখতে চাইবে। দেখবেন সেখানে একটা গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে ওরা আসল বিষয় অর্থাৎ স্বাধীনতার ব্যাপারটাই চাপা দিয়ে দেবে।'

গান্ধীজি বললেন, 'না, না, আমি আগেই প্রধান ব্যাপারগুলি সম্পর্কে বোঝাপড়া করে নেব। তোমরা কিছু ভেবো না।'

স্বাধীনতাই কি প্রধানতম ব্যাপার নয়?

আঠারো

মহাত্মা গান্ধী একাই কংগ্রেস, একাই ভারতবর্ষ। সঙ্গে কোনো পরামর্শদাতা নেই, কোনো রাজনৈতিক সহকর্মী নেই—তিনি একাই সমস্ত। তবু এ বুঝি একমাত্র গান্ধীর পক্ষেই সম্ভব। পরনে খাটো খদ্দরের ধুতি, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা, হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত খালি, পদতলে আঙুল-বের-করা স্যাণ্ডেল। গায়ে কোনো শার্ট-কোর্ট নেই, না, একটা ফতুয়া পর্যন্ত নেই, শুধু মোটা একটা খদ্দরের চাদর, কোমরে ঝোলানো একটা ঘড়ি—এই পোযাকেই তিনি পৌঁছুলেন লণ্ডন। এই পোযাকেই তিনি গোলটেবিল বৈঠক হাজির হলেন, বাকিংহাম প্যালেসে রাজার নিমন্ত্রণ রাখলেন। কিন্তু আসল কাজ কদ্দূর এগোল?

জওহরলালকে চিঠি লিখছে সুভাষ: 'গোলটেবল ব্যর্থ হবেই, এক আমার বদ্ধমূল ধারণা। অবশ্যি গান্ধীজি যদি আরো আপসের জন্যে রাজি থাকেন সে আলাদা কথা। আমার মনে হয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকুই ভারতের ভাগ্যে জুটবে। কিন্তু এত অল্পে আমাদের তুষ্ট হবে কী করে?'

সুভাষ যা ভেবেছিল তাই হল, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন উঠে গেল। মুসলমান আর শিখ দু দলই সব ব্যাপারে আলাদা অস্তিত্বের দাবিদার হয়ে দাঁড়াল। গান্ধীজি মুসলমানদের শাদা চেক দিতে চাইলেন, দেশে গিয়ে যে অঙ্ক বলবে সেই অঙ্ক তিনি বসিয়ে দেবেন, শুধু এখানে বৈঠকে এস আমরা সম্মিলিত হই। সংখ্যালঘুরা রাজি হল না। মূল বিষয় স্বাধীনতা সিকেয় তোলা রইল, সাম্প্রদায়িকতার গাঁজলা নিয়েই মেতে রইল ব্রিটিশ ক্যাবিনেট।

তবু ইংরেজদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস মহাত্মার। যেহেতু তিনি ইংরেজদের ভালোবাসেন সেই হেতু তারাও ভারতবাসীকে ভালোবাসবে। যেহেতু তিনি সৎ সরল ও সাধু ইংরেজও সেই কারণে সৎ সরল ও সাধু হবে। তাঁর যেমন কারু প্রতি বিদ্বেষ নেই ইংরেজও তেমনি বিদ্বেষমুক্ত হবে।

এ কখনো হয়? ব্যক্তির কথা নয় দেশের কথা শুনতে চাই—ভারতবর্ষের কথা,

তার সামগ্রিক স্বার্থের কথা। আর, সুভাষ বলছে, ভারতবর্ষের একটা মাত্র স্বার্থ, আর সে স্বার্থের নাম স্বাধীনতা।

'তোমরা সন্ত্রাসবাদের কথা তুলেছ?' মহাত্মা বললেন শেষ পর্যন্ত, 'সেই সন্ত্রাসবাদকে দমন করতে তোমরা কতদূর সন্ত্রাসবাদী হয়েছে তা দেখছ না? দেয়ালের লিখন পড়ো যা সন্ত্রাসবাদীরা নিজের বুকের রক্ত দিয়ে লিখেছে। কী লিখেছে তোমরা পড়তে পারছ না, বুঝতে পারছ না? লিখেছে আমরা গমের রুটি চাই না, স্বাধীনতার রুটি চাই। যতক্ষণ সে রুটি না পাই ততক্ষণ আমাদের শান্তি নেই, অন্যদেরও শান্তি নেই।'

গান্ধীজি আবার নরম হচ্ছেন: 'আর কিছু না দাও, তোমাদের বন্ধুতা দাও, হৃদ্যতা দাও, দাও তোমাদের অংশীদার হতে। পরস্পরের লাভের জন্যে অংশভোগ। শুধু ছুরি আর বর্শা আর গুলি আর বিষের কৌটো দেখিয়ো না আমাদের। না, দেখিয়ো না। আমরা অন্তত এতদিনে 'না' বলতে শিখেছি।'

তারপরে করুণ আবেদন করলেন, 'ঈশ্বরের নাম করে বলেছি, এই বাষট্টি বছরের কৃশ বৃদ্ধকে ক্ষুদ্র একটি সুযোগ দাও। তাকে ও তার প্রতিষ্ঠানকে এককোণে একটু স্থান দাও, এবং একবারের মত বিশ্বাস করে দেখ। আর যদি একান্তই না দাও ভেবো না আমরা বিধ্বস্ত হয়ে যাব। আমরা বহু সমস্যা কাটিয়ে উঠেছি, প্লেগ আর ম্যালেরিয়া, সাপ আর বিছে আর বাঘ—এও আমরা কাটিয়ে উঠব।'

শেষকালে বললেন, 'আমি এখন কোন পথে যাব জানি না, কিন্তু যে পথেই যাই তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ দিয়ে যাব।'

কিন্তু ভবী কিছুতেই ভোলবার নয়। এদিকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট পালটে গেল। স্যামুয়েল হোর নতুন ভারত-সচিব হল। বলে দিল, আর বৈঠক-ফৈঠক হবে না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও সকলে। সর্বসাকুল্যে কী লাভ হল? শুধু সময়নাশ। শুধু দেশের সংগ্রাম-উদ্যতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া। গান্ধীজি শূন্য হাতে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন আটাশে ডিসেম্বর।

এখন আর আরউইন নেই, এখন উইলিংডন। গান্ধী ফেরবার পাঁচ দিন আগে জওহরলাল গ্রেপ্তার হল। গ্রেপ্তার হল সীমান্ত প্রদেশের খান সাহেব। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বেআইনি ঘোষিত হল। সেই কংগ্রেস কমিটির আমন্ত্রণে সুভাষ যাচ্ছিল বোম্বাই, কল্যাণ স্টেশনে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। নিয়ে গেল মধ্যপ্রদেশের শিওনি জেলে। স্বয়ং গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন। আটক হলেন আবার সেই পুনায় এরবাদা জেলে। গ্রেপ্তার হল প্যাটেল—একে একে সমস্ত নেতা। উনিশশো বত্রিশের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী দু মাসের মধ্যেই বত্রিশ হাজারেরও উপর লোককে ইংরেজ জেলে পুরলে।

কংগ্রেসের পালে আর হাওয়া নেই, হালে আর মাঝি নেই, কোথায় সোনার বন্দরে গিয়ে পৌঁছুবে, না, পৌঁছুল গিয়ে এক নিষ্ফলা মরুভূমিতে।

শিওনি জেল থেকে সুভাষকে নিয়ে গেল জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে। শরীর ভেঙে পড়ল। নিয়ে গেল ভাওয়ালি স্যানাটোরিয়ামে। সেখান থেকে লখনৌ, বলরামপুর হাসপাতালে। অনেক ধরা-পড়ার পর ইংরেজ ডাক্তার বাকলি তাকে ইউরোপ যাবার সুপারিশ করল। গভর্নমেণ্ট বললে, যেতে পারো কিন্তু নিজের খরচে। সঙ্গে জুড়ে দিল আবার সেই

ক্ষুদ্র সর্ত, কলকাতা হয়ে যেতে পারবে না।

উনিশশো তেত্রিশের তেইশে ফেব্রুয়ারী সুভাষ ইটালিয়ান জাহাজে ভিয়েনার উদ্দেশে রওনা হল। জাহাজ থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে একটি বাণী পাঠাল সুভাষ: 'যদি বাংলা মরে যায়, তবে বাঁচবে কে? আর যদি বাংলা বেঁচে থাকে, তবে কে মরবে?'

আটুই মার্চ সুভাষ পৌঁছুল ভিয়েনায়। উঠল ডাক্তার ফুর্থের স্বাস্থ্যনিবাসে। এখানেই সর্দার বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে সুভাষের অন্তরঙ্গতা ঘটল।

'শুনেছ টাটকা সংবাদ? গান্ধীকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'শুনেছি।'

'আরো শুনেছ ভয়ানক কথা?' জিজ্ঞেস করল প্যাটেল।

'কী?' সুভাষ তাকাল উৎসুক হয়ে।

'গান্ধী আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণ তুলে নিয়েছে।'

সুভাষ স্তব্ধ হয়ে রইল।

'আন্দোলন তুলে নিয়ে যথারীতি সরকারের কাছে আবেদন পাঠিয়েছে, অর্ডিন্যান্সগুলো তুলে নাও, ছেড়ে দাও সত্যাগ্রহীদের।'

'সরকার নিশ্চয়ই সে আবেদন কান দেয়নি।'

'নিশ্চয়ই না।' প্যাটেল বললে সবলকণ্ঠে, 'যে শক্তিহীন সংগ্রাম ত্যাগ করে বসে থাকে তার শত্রু তার আবেদন শোনে না। শরণাগতির আবার শর্ত কী!'

গান্ধীর এই আত্মসমর্পণের ভাব দেখে দুই নেতা, প্যাটেল আর সুভাষ, মর্মাহত হল। তারা যুক্ত বিবৃতি প্রচার করল।

'আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রত্যাহার গান্ধীজির পরাজয় স্বীকারের নিদর্শন। আমাদের পরিষ্কার অভিমত এই রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীজি ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং নতুন নীতিতে কংগ্রেসের নতুন রূপায়ণ ঘটাবার সময় এসেছে। যা গান্ধীজির আজন্মপালিত নীতির অনুবর্তী হবে না সেই ভাবে তিনি পরিচালনা করবেন এ আশা করা অন্যায়।'

নীতি বদলের দিন এসেছে, হয়তো বা নেতা বদলের। গান্ধী শুধু আন্দোলনই তুলে নিলেন না, কংগ্রেসই ভেঙে দিলেন। কারু আর এখন সংগ্রামে মন নেই, সবাই এখন কাউন্সিলে ঢুকতেই উসখুস করছে।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নরিম্যান জেল থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'গান্ধীজির এই রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেশানোর অভ্যাস কবে সংশোধিত হবে? কবে এই ভ্রান্তির থেকে দেশ পরিত্রাণ পাবে? সরল ও সবল ব্যক্তিত্বের নেতা আমরা কবে পাব, যে সোজা কথা সোজা করে বলতে পারে, এক কথায়, যার আছে রাজনৈতিক মস্তিষ্ক!'

জেনেভাতে রোমা রলাঁর সঙ্গেও সুভাষের সেই মর্মে কথা হল।

'যদি স্বাধীনতার জন্যে এমন কোনো নতুন আন্দোলন শুরু করা যায় যা গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহের অনুরূপ নয়, তা হলে আপনারা কী প্রতিক্রিয়া হবে?' সুভাষ রলাঁকে জিজ্ঞেস করলে।

'আমি দুঃখিত হব।' বললেন রলাঁ, 'আমার বিশ্বাস গান্ধীর সত্যাগ্রহই ভারতবর্ষের

স্বাধীনতা আনতে পারবে। যদি না পারে আমি হতাশ হব। বলো তো সমস্ত পৃথিবীতে গান্ধী কী মহৎ আশার সঞ্চার করেছে!'

'কিন্তু মহাত্মার যে ভাব তা পার্থিব জগতে অচল, অন্তত রাজনীতির ক্ষেত্রে।' সুভাষ বললে শান্ত কণ্ঠে, 'তাঁর শত্রুর সঙ্গে ব্যবহার একেবারে অকপট। ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে কেউ চায় না, তবু দেখুন গায়ের জোরে ওরা আমাদের বুকের উপরে চেপে বসে আছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অসুবিধে ও বিরক্তিসত্ত্বেও শুধু গায়ের জোরেই ওরা ওদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। যদি সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, আপনি কি চাইবেন না যে জাতীয় আন্দোলন এবার অন্য পথে চালিত হোক? না কি আপনি তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ রাখা ছেড়ে দেবেন?'

রলাঁ গম্ভীরস্বরে বললেন, 'না, যে কোনো ভাবে যে কোনো পথে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

পরে তিনি তাঁর শেষ কথা বললেন, 'বিশ্বের শোষিত শ্রমজীবীর জন্যে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করতে হবে। যে পার্টি এই উদ্দেশে লড়বে আমি তাকেই বরেণ্য বলে স্বীকার করব। আমার সহানুভূতি চিরকালই নির্যাতিত শ্রমজীবীর উপর। গান্ধী বা আর যেই হোক যে দল শ্রমজীবীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে তার প্রতি আমার কোনো অভ্যর্থনা নেই।'

এ যেন সুভাষেরই অন্তরের কথা।

'আমার শেষ কথা, এক কথায়,' রলাঁ আবার বললেন, 'আন্তর্জাতীয়তা। সমস্ত জাতির জন্যে সমানাধিকার। আমরা এমন সমাজ চাই যেখানে শোষণ থাকবে না, পরাধীনতা থাকবে না, নরনারীর মধ্যে অধিকারের তারতম্য থাকবে না আর সকলেই সেই সমাজের জন্যে শ্রম দান করবে।'

সুভাষের সমস্ত চেতনা নবীন উদ্দীপনায় ঝংকৃত হয়ে উঠল।

জওহরলালকে চিঠি লিখছে সুভাষ: 'আজকে যাঁরা নেতৃত্বের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার উপরেই আমি ভরসা রাখি। তুমিই পারবে কংগ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আমি একান্ত ভাবে এই আশাই করব যে তুমি তোমার আদর্শে পৌঁছুতে বিনাদ্বিধায় তোমার ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করতে পারবে।'

কিন্তু জওহরলাল বুঝি শেষ পর্যন্ত গান্ধীবাদেই অভিভূত হয়ে রইল। আর মহাত্মাকে বলতে হল, সুভাষের জয়ের অর্থ আমারই পরাজয়।

উনিশশো সাঁইত্রিশের মার্চে সুভাষকে ইংরেজ ছেড়ে দিল আর আটত্রিশের হরিপুরার কংগ্রেসে সুভাষ সভাপতি হল।

উনিশশো পঁয়ত্রিশে গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট চালু হবার পর কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নেবার দিকে ঝুঁকেছে। কংগ্রেস আর বেআইনি নয়। এখন কংগ্রেসে ঢুকলে বেশ কিছু গুছিয়ে নেওয়া যায়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নিয়েছে। এখন ইংরেজের সঙ্গে আপস করে কেন্দ্রে ও প্রদেশে যা পারো যতটা পারো কর্তৃত্বের আসরে এসো বসো। কর্তৃত্বের মত মদ নেই। প্রভুত্বলিপ্সাই সর্বনাশা মদিরা। কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে সুভাষ এই আভাসই দিয়ে বসল।

ইম্পিরিয়্যাল প্রেফারেন্স বা ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে বেশি সুখসুবিধে দিতে হবে—এ পক্ষপাতিত্ব চলবে না। ফেডারেশান ছাড়তে হবে। শিল্পোন্নয়নের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার দিকে কংগ্রেসের দৃষ্টি দিতে হবে। বুনিয়াদি শিক্ষার খসড়া তৈরি করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্রের দিকে। এ যে সব নতুন কথা কইতে সুরু করেছে। এ যে আপসের কথা নয়, সংগ্রামের কথা। এ যে থেমে থাকার কথা নয়, এ যে এগিয়ে যাবার কথা। স্থগিত করবার কথা নয়, সক্রিয় হবার কথা। এ যে পুনরাবৃত্তি নয়, এ যে অভূতপূর্বতা। যাক, এক বছরের তো মামলা। সুভাষকে তো আর উনিশশো উনচল্লিশে মোড়লি করতে ডাকা হবে না।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখলেন জওহরলালকে: 'কাজ করবার যন্ত্র যদি বিকল হয়ে যায় তবে তাকে সেই চালাতে পারে যার চালাবার শক্তি আছে বুদ্ধি আছে। যদি চালকের পথে বাধা এসে দাঁড়ায়, সেই বাধা সরিয়ে দেওয়াও সেই চালকেরই কাজ। যন্ত্রের চালক মানুষ হিসেবে বড় নাও হতে পারে কিন্তু সন্দেহ কী সে যে যন্ত্রবিদ।'

সুভাষ হরিপুরার পরেই সরে দাঁড়াল না। উনিশশো উনচল্লিশেও সে কংগ্রেসের সভাপতি-পদের প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল। কংগ্রেসের গান্ধীচক্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাল পট্টভিই সীতারামায়াকে। গান্ধীচক্র যুক্ত বিবৃতি দিল: 'আমাদের মত পট্টভিই কংগ্রেসের সভাপতি হবার যোগ্যতম ব্যক্তি।' অবশ্য সে বিবৃতিতে দুজন অনুপস্থিত—গান্ধী আর জওহরলাল।

সকলেরই তখন এই জিজ্ঞাসা: আমরা কি গণতন্ত্রের সাধক, না কি হিটলারি একনায়কত্বের?

সুভাষ সরে দাঁড়াল না। উঠে দাঁড়াল। নিজের বিবেক বুদ্ধি নিজের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত শুধু স্তবমন্ত্রের মোহমুগ্ধতায় হারিয়ে ফেলব না। দেশ বেছে নিক কাকে চায়। দেশ সুভাষকে বেছে নিল।

মহাত্মা লিখলেন: 'আসলে এ আমারই পরাজয়। কেননা পট্টভিকে আমিই যোগ্যতর মনে করে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছিলাম। আমার পরাজয়ে আমি আনন্দিত। কেননা আজ স্পষ্ট হল অধিকাংশ কংগ্রেস-প্রতিনিধি আমার নীতি ও পদ্ধতি পছন্দ করে না।'

তারপরে করলেন সেই স্বগতোক্তি: 'সুভাষ বোস, আর যাই হোক, দেশের শত্রু নয়।'

একি সান্ত্বনা না, যন্ত্রণা? রাজনীতি বুঝি এমনি নির্মম—সে বুঝি মহত্তম সাধুকেও বৈদান্তিকতায় অটল রাখতে পারে না। রাখতে পারলে সে হয়তে বলতো: সুভাষ বোসের জয় আমারই জয়।

অথচ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সুভাষের কী প্রাণপাত শ্রদ্ধা! কলকাতায় তার জয়োপলক্ষে আহূত এক সভায় সুভাষ বলছে যুবকদের: বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের চেয়ে তোমরা অগ্রগামী এ কথা তোমরা কেমন করে প্রমাণ করবে? শুধু তাঁদের সমালোচনায় তোমাদের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। দেশের ও জাতির জন্যে তারা যা করেছেন তার চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর কিছু করতে পারো তবেই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হবে। আজকে এই

উল্লাসের মুহূর্তে এমনি একটি কথাও উচ্চারণ কোরো না যার ফলে কেউ আহত হয় বা কেউ ব্যথা পায়।'

কিন্তু গান্ধীচক্র সুভাষের উপর প্রতিশোধ নিল। তোমারই মতের লোকদের নিয়ে ওয়াকিং কমিটি গঠন করো বলে গান্ধীপন্থী সদস্যেরা—সংখ্যায় বারোজন—কমিটি থেকে সরে পড়ল।

কিন্তু গোবিন্দবল্লভ পন্থ এক প্রস্তাব আনল যে কংগ্রেসের এই অভিমত যে-কমিটিই কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করুন না কেন, তার সদস্যদের গান্ধীর মনোনয়ন পেতে হবে। অর্থাৎ গান্ধীর ইচ্ছানুসারেই সুভাষকে কমিটির সদস্য নির্বাচন করতে হবে।

সুভাষ উনিশো উনচল্লিশের কংগ্রেসে ত্রিপুরিতে এল, নিদারুণ অসুস্থতা নিয়ে, এম্বুলেন্সে। ডাক্তাররা তাকে বারণ করতে চেয়েছিল কিন্তু সে বারণ গ্রাহ্য করেনি সুভাষ। জীবনের ডাকে মৃত্যুকে তুচ্ছ করার যার আমরণ প্রতিজ্ঞা, যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে শ্বাস বইছে সে বিরত হয় না। কিন্তু সেই কংগ্রেসেই গান্ধীপন্থীরা পন্থ-প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিল। এমন প্রস্তাব কংগ্রেসের মূল সংবিধানের পরিপন্থী কিনা তারও বিচার কেউ করল না।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: 'অবশেষে আজ এমন কি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিট্‌লারনীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্যে যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।'

সুভাষ প্রেসিডেন্টের পদ পরিত্যাগ করল।

আরো পদ আছে, আছে আরো পদক্ষেপ। আরো জয়ধ্বনি। চলো দিল্লি চলো। সুভাষ সরে যেতেই আবার ওয়ার্কিং কমিটি জেঁকে বসল। তারা পাঁতি দিল সুভাষকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গেলেন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে।

গান্ধী বললেন, আমি কী জানি। এ হচ্ছে কমিটির হাইকমাণ্ডের সিদ্ধান্ত। সুভাষ যদি এই হাইকমাণ্ডের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তবেই তার শাস্তি প্রত্যাহৃত হতে পারে।

কিন্তু সুভাষ কি বশ্যতার জন্যে জন্মগ্রহণ করেছে? না কি বিপ্লবের জন্যে? রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: কংগ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। মুক্তির সধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস্যা সাত্ত্বিক—এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যারা রক্ষক রূপে একত্র হয়েছেন তাদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারেই নেই যে উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত?'

সুভাষ ফরোয়ার্ড ব্লক স্থাপন করলে। ঘোষণা করলে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জন এবং যে কোনো বৈধউপায়ে স্বাধীনতা-অর্জন। এবং বিপ্লব বৈধ উপায়। যুদ্ধবিগ্রহও বৈধ উপায়।

রবীন্দ্রনাথ সুভাষের এই কংগ্রেস-বিদ্রোহ সবান্তঃকরণে সমর্থন করলেন। লিখলেন:

আজ আমি জানি বাংলাদেশের জননায়কের প্রধানপদ সুভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবে এই আশা করে আমি সুদৃঢ়সঙ্কল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলা দেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সে সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।

যদি বাঙলা মরে তো কে বাঁচবে? আর যদি বাঙলা বাঁচে তো কে মরবে? তাই জয় বাংলাদেশ, জয় ভারতবর্ষ।

জয় হিন্দুস্থান!

জয় হিন্দ!

উদ্যতখড়্গ সুভাষ

(তৃতীয় খণ্ড)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এক

উনিশশো উনচল্লিশের পয়লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যে কালো মেঘ আকাশের ঈশানে-নৈঋতে সঞ্চিত হচ্ছিল এতদিন ধরে, সহসা বজ্রবিদুৎ সহ বিদারিত হল। হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে।

তেসরা সেপ্টেম্বর সুভাষ মাদ্রাজে সমুদ্রতীরে প্রায় দুলক্ষ লোকের এক সমাবেশে উদ্দীপ্ত বক্তৃতা দিচ্ছে, ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা লোক এগিয়ে এসে তার হাতে একখানা সান্ধ্য দৈনিক পত্র গুঁজে দিল। চোখ বুলিয়েই চমকে উঠল সুভাষ। দারুণ সুসংবাদ। ইংলণ্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

যুদ্ধ! তার মানে জার্মানিও ছেড়ে কথা কইবে না। তার যা এখন প্রচণ্ড প্রতাপ, সে প্রখর সমরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইংলণ্ডকে নাজেহাল করে ছাড়বে। ভারতবর্ষের পক্ষে এই সুবর্ণসুযোগ! স্বাধীনতা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কী স্বপ্ন আছে! আর কী অন্বেষণ আছে। আর কী সংগ্রাম!

সুভাষ এতক্ষণ বিদ্রোহের কথা বলছিল— তার ফরওয়ার্ড ব্লক তো সেই বিদ্রোহেরই ধ্বজপট—এবার বলতে লাগল যুদ্ধের কথা, যুদ্ধের প্রেক্ষিতে গণবিপ্লবের কথা আর গণবিপ্লবই তো স্বাধীনতার সার্থক উষাভাস। বিপ্লবের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আজ উপস্থিত। এই মাহেন্দ্রক্ষণেই সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত হানতে হবে বৃটিশকে। ওদের বিপদেই আমাদের সম্পদের সূচনা। ওরা ক্ষীণবল হলেই আমরা পারব দুর্বিষ হতে। এ সুযোগ আর উপেক্ষা করা নয়। গনগনে আগুনে লোহা তপ্ত থাকতে থাকতেই হাতুড়ির ঘা মারো।

বৃটিশ কার বিরুদ্ধে লড়ছে? লড়ছে ফ্যাসিজম-এর বিরুদ্ধে। লড়ছে বিশ্বমানবের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে। ওদের এক হাটে দুই দর। স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে অথচ ভারতবর্ষকে পরাধীন করে রাখছে। ওরা যে ফ্যাসিস্টের চেয়েও জঘন্য, ওরা যে ইম্পিরিয়ালিস্ট, সেই কথাটাই ওদের কে বোঝায়? সন্দেহ কী, ওদের সর্বনাশেই আমাদের পৌষ মাস। ওদের আঁস্তাকুড়ে ফেলতে পারলেই আমরা সোনার পিঁড়িতে বসতে পারব।

গতবছর সেপ্টেম্বরে যখন মিউনিক প্যাক্ট সই হয় তখনই সুভাষ ভবিষ্যৎ-বাণী করে ছিল, যুদ্ধকে ঠেকানো যাবে না, যুদ্ধ অনিবার্য। চেকোশ্লোভাকিয়ার খানিকটা অংশ জার্মানির অন্তর্ভুক্ত হবে এই সম্মতির ভিত্তিতেই মিউনিক প্যাক্ট। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী চার দেশ—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি আর ইটালি। শুধু অংশ নিয়েই আগ্রাসী হিটলার পরিতৃপ্ত হবে এ আর যে কেউ বিশ্বাস করুক, সুভাষ করেনি। সে বলেছিল, এ চুক্তির ফলে অদূর-ভবিষ্যতে চেকোশ্লোভাকিয়া তো সমূলে যাবেই, ইংলণ্ড-ফ্রান্সও যুদ্ধকে এড়াতে পারবে না। চেম্বারলেনের ছাতা ছাতু হয়ে যাবে।

উনিশ শো। আটত্রিশ কেন, উনিশ শো তেত্রিশে সুভাষ যখন বার্লিনে তখনই হিটলারের হালচাল দেখে বুঝে নিয়েছিল যুদ্ধ অবধারিত, নিয়তিলিখিত। আর যুদ্ধ বাধলেই ইংলণ্ড তো বটেই সমস্ত ইউরোপই পঙ্গু হয়ে যাবে, আর সেই দুর্যোগেই ভারতবর্ষের সুযোগ, ভারতবর্ষের উত্থান। সুতরাং আর কার কাছে কী তা কে জানে, সুভাষের কাছে যুদ্ধ বরণীয়। যুদ্ধই তার

ব্যাধির নিরসন। সে ব্যাধির একমাত্র নাম পরাধীনতা।

চেক তরুণী কিটি ও তার স্বামী এলেক্স-এর সঙ্গে এক সভায় সুভাষের আলাপ হল। আমেরিকানদের ক্লাবে কে এক ভারতীয় বক্তৃতা দেবে সেই শুনতে দুজনের আসা। আসল উদ্দেশ্য অন্য। কদিন আগে গান্ধীটুপি-মাথায় এক ভারতীয়কে রাস্তায় দেখে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিল কিটি। কী সৌম্য সুন্দর প্রশান্ত মূর্তি—দুই চোখে প্রদীপ্ত বুদ্ধি, যেন এক নজরে অনেক দূর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে সহসা, তারপরেই দৃষ্টি আবার পাঠাচ্ছে গভীরে, নিজের অন্তরের মধ্যে। আর কী রাজকীয় ছন্দে হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, পদক্ষেপে যেমন দৃঢ়তা তেমনি সংযম। আলোকে অলোকময় করে যাচ্ছে। আর এ আলো বুঝি অতিমর্ত্য আধ্যাত্মিকতার আলো।

এলেক্স বললে, চলো সভায় গিয়ে বক্তাকে জিজ্ঞেস করে জানা যাবে সেই গান্ধীটুপি পরা ভারতীয়টি কে, ঠিকানা কী।

কী আশ্চর্য! সভায় গিয়ে দেখল বক্তাই সেই গান্ধীটুপীপরা ভারতীয়। আর তার নাম সুভাষচন্দ্র বোস। দেখে দুজনের আনন্দ আর ধরে না। জীবনের বাজনা থেকে যেন কী এক অজানা সুর হারিয়ে গিয়েছিল, কালকৃপায় হঠাৎ তা আবার খুঁজে পেয়েছে। কী বলছেন, বক্তা? বলছেন ভারতবর্ষের কথা, তার স্বাধীনতা লাভের জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রামের কথা। বলছেন, সম্প্রতি গান্ধী কেমন অহিংসার নেশায় স্তিমিত হয়ে পড়েছেন, বিপ্লববহ্নিকে রাখছেন ঘুম পাড়িয়ে। আশা করে আছেন তার প্রেমের স্পর্শে অপর পক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে। কিন্তু লুণ্ঠিত গৃহস্থের নিরীহ প্রার্থনায় পরস্বাপহারী দস্যুর হৃদয়ের পরিবর্তন হয় এমন কথা কে কবে শুনেছে? তাছাড়া বর্বর ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের হৃদয় আছে একি বিশ্বাস করবার? হৃদয় থাকলে একটা দুর্বল দেশকে এমন ভাবে শোষণ করতে পারে?

ঠিক যেন রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়, সব মিলিয়ে একটা তাত্ত্বিক বিচার। শাশ্বতের সুর লাগানো। বলুন এ অত্যাচারের উচ্ছেদ হবে কিসে? শুধু অহিংসায়? নিষ্ক্রিয়তায়? নাকি সশস্ত্র প্রতিরোধে? বক্তব্যের কেউ প্রতিবাদ করতে পারল না। কেউ বলতে পারল না পরশাসন পাপ নয়, আর সশস্ত্র প্রতিরোধ অনুচিত। সবাই তাই সরব আনন্দে সমর্থন করল সুভাষকে। ভিড় ঠেলে কিটি আর এলেক্স এগিয়ে গিয়ে সুভাষের করমর্দন করলে। বললে, যদি কাল আমাদের ওখানে লাঞ্চ খেতে আসেন।

একবাক্যে নিমন্ত্রণ নিল সুভাষ। ভিতরে এত যন্ত্রণা, এত উত্তেজনা, অথচ মুখে কী ধ্যানীর প্রশান্তি। এখন বোধহয় বিস্তীর্ণ আলাপ করার সময় নেই। ভিড়ের মধ্যে দ্রুত মিলিয়ে গেল সুভাষ। হাসিটুকু রেখে গেল। রেখে গেল চিত্তের সুগন্ধ।

কিন্তু পাদ্রি জনসন খুব অসন্তুষ্ট। তারই উদ্যোগে আমেরিকান ক্লাবে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভেবেছিল অন্যরকম কিছু বলবে, ধর্মের কথা, উপনিষদের কথা, অদ্বৈত্যবাদের কথা—কিন্তু বললে কিনা রক্তাক্ত রাজনীতির কথা! পরপীড়ক ব্রিটিশের সর্বাত্মক উচ্ছেদের কথা। কী সর্বনাশ! আমি এখন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে মুখ দেখাব কী করে? কী কৈফিয়ত দেব? ছি ছি, আগে জানলে কে এ বক্তৃতার ব্যবস্থা করত?

পাদ্রি জনসনের এত চঞ্চল হবার কারণ কী? পক্ষে-বিপক্ষে কত কী লোকে বলে যায় কে অত গ্রাহ্য করে? কথা জলের মত বয়ে যায়, পড়ে গিয়ে স্তব্ধতার সমুদ্রে। কিন্তু সুভাষ যা বলল এ বুঝি জলের বুদ্বুদ নয়, এ বুঝি আগুনের স্ফুলিঙ্গ। জলে ভেসে যাবার মত নয়, দিনে-রাত্রে জ্বলে থাকবার মতো।

তাই বুঝি পাদ্রি এমন দিশেহারা।

পরদিন ঠিকানা চিনে ঠিক সময়ে কিটিদের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন সুভাষ।

'কি, দেরি হয়নি তো?'

'না, না, আসুন—' চেকদম্পতি আনন্দে উথলে উঠল।

'খুব তাড়াতাড়ি আসছি—'

'কেন, তাড়া কিসের?'

'এক জায়গায় গিয়েছিলাম—'

'কোথায়? যদি আপত্তি না থাকে—'

'না, না আপত্তি কী!' সুভায বুঝি একটু গম্ভীর হল; 'গিয়েছিলাম গোয়েরিঙ-এর সঙ্গে দেখা করতে।'

'গোয়েরিঙ?' চেকদম্পতি সমস্বরে গর্জন করে উঠল: 'ঐ বর্বর পশুটার কাছে?'

সুভাষ ক্ষীণ একটু হাসল। বললে, 'চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে গোয়েরিঙ হয়তো তাই, কিন্তু তোমাদের যারা মিত্র—ব্রিটিশ—ভারতবর্ষের কাছে তারা কী? তাদের বর্ণনায় ভারতবর্ষও কি ঠিক ঐ ভাষাই ব্যবহার করবে না? একটা গোটা দেশকে যারা দারিদ্র্যে ও দৌর্বল্যে অধঃপতিত করে রেখেছে তারা তো গোয়েরিঙ-এরই জাত-ভাই। উপায় নেই', সুভাষ গম্ভীর হল: 'কাঁটা দিয়েই আমাদের কাঁটা তোলবার চেষ্টা করতে হবে।'

'কিন্তু ওরা তো মানুষ নয়, ওরা মূর্তিমান শয়তান—'

'কিন্তু ওরা আমাদের শত্রুর শত্রু, সেই হিসেবে আমাদের মিত্রতুল্য। তুমি জানো না ভারতবর্ষের কী নিদারুণ দুর্গতি, কী দুঃসহ অপমান। যে করে হোক তার অবসান চাই। আমার মতে বিদেশী শক্তির সশস্ত্র সাহায্যই তার একমাত্র উপায়।'

'তাই বলে তুমি নাৎসীবাদকে সমর্থন করবে?'

'কখনো না। তুমি জানো না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তোমার এই নাৎসীবাদের মতই জঘন্য-বর্বর। গান্ধী বলেন অহিংসাতেই স্বাধীনতা আসবে, আমরা তা বিশ্বাস করি না, আমরা মনে করি সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র পথ, আর ইউরোপে যুদ্ধ যখন বাধবে, তখন সেই যুদ্ধই হবে সেই বিপ্লবের অগ্রদূত। আমি তার ভূমিকাটাই রচনা করবার চেষ্টা করছি।'

শান্ত, অথচ কী দৃঢ়, নিয়ত-উদ্যত অথচ কেমন উদাসীন—চেকদম্পতি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সুভাষের দিকে।

ভারতবর্ষের একমাত্র আন্দোলন অহিংসা আইন অমান্য—তাও গান্ধী স্থগিত রাখলেন। পরে সমগ্র আন্দোলনই প্রত্যাহৃত হল। প্রত্যাহৃত হল কেন? না, আন্দোলনে কোথাও হিংসা দেখা দিয়েছে। এখন প্রত্যাহারের পর দেশ কী করবে? গান্ধী বললেন, চরকা কাটবে।

গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন: প্রত্যহ আধঘণ্টা সুতো কাটুন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, সুতো কাটায় যদি স্বাধীনতা লাভের সাহায্য হয় তবে আধঘণ্টা কেন, কেন আটঘণ্টা কাটব না?

সবচেয়ে বেশি হতাশ হল সুভাষ। আর হলেন বিঠল ভাই প্যাটেল। দুজনে তখন ভিয়েনায়, রয়টারে একটা যুগ্ম বিবৃতি দেবেন তারই খসড়া নিয়ে আলোচনা করছেন।

'রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গান্ধী ব্যর্থ।' বললে সুভাষ।

'আমারও সেই কথা।' সায় দিলেন প্যাটেল।

'রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স করে অনর্থক সময় নষ্ট করলেন—'

'আলাপ-আলোচনাতে না গেলে তো সরাসরি লড়াই করতে হয়।'

'ক্ষতি কী! হবে লড়াই। স্বাধীনতার জন্যে ভারতবাসীরা রক্ত দিতে প্রস্তুত। সুভাষ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল: 'কিন্তু আলাপ-আলোচনায় ফল কী হল? যেখানে ছিলাম সেখান থেকেও পিছিয়ে গেলাম। কনফারেন্স করে দেশে কোনো মৌলিক পরিবর্তন এসেছে ইতিহাসে এর নজির আছে?

'সত্যি গান্ধী যে কেন পিছু হটলেন, দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন না, বোঝা কঠিন।'

'গান্ধী সেকেলে আসবাব, এককালে ঘরের অনেক কাজে লেগেছিলেন, এখন বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়েছেন।'

'কিন্তু গান্ধীর নামের টান চিরদিন থাকবে।'

প্যাটেল আর সুভাষ যুগ্মবিবৃতিতে স্বাক্ষর দিলেন: রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীজি ব্যর্থ। একতরফা নিজেরা দুঃখ সয়ে বা প্রতিপক্ষকে অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসার চেষ্টা করে আমরা শাসকদের হৃদয় গলাতে পারব এ আশা বৃথা। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে মহাত্মা পরোক্ষে মেনে নিলেন কংগ্রেসের এ পদ্ধতি অচল। এখন চাই পদ্ধতি-পরিবর্তন, তার জন্যে চাই নতুন নেতা। মহাত্মা বহাল থাকলে তিনি এমন কোনো কর্মপন্থা কখনোই স্থির করবেন না যা তাঁর সারাজীবনের নীতির অনুগামী নয়। সুতরাং যারা পদ্ধতির পরিবর্তন বা কংগ্রেসের আমূল সংস্কার চায় তাদেরকে নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই একটা দল গড়তে হবে আর তার মনোভাব হবে যুদ্ধোন্মুখ। অসহযোগ আন্দোলন ছেড়ে দেওয়া নয়, আন্দোলনের রীতিবদল। আর নিষ্ক্রিয়তা নয়, এবার থেকে সক্রিয় সম্মুখসমর।

কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় ঐ যুদ্ধোদ্যোগ বোধহয় সম্ভব নয়। একমাত্র আশা যদি বিদেশ থেকে সাহায্য আসে। অন্তত যদি বৃটেনের বিরুদ্ধে ভারতের অনুকূল জনমত সৃষ্টি করা যায়। যদি জনমতের প্রাবল্য তার মুষ্টি শিথিল হয়। তাই বিদেশ থেকে এদিকে চেষ্টা চালানোই শুভকর।

সুভাষের ইচ্ছে রাশিয়ায় যায়।

প্যাটেল জিজ্ঞেস করেন: সেখানে যাবে কেন? তুমি কি কমিউনিস্ট?

না, আমি কমিউনিস্ট নই। আমি রাশিয়ায় যেতে চাই বিপ্লবের কলা-কৌশল শিখতে। আর রাশিয়া তো ইংলণ্ডের বিপক্ষ। যদি তার কাছ থেকে পাই কিছু সাহায্য।

প্যাটেল বাধা দিলেন। বললেন, ওদিকে যেও না। রাশিয়ার সঙ্গে জড়াতে গেলে তোমার কাজের ব্যাঘাত হবে।

রাশিয়া ছাড়া আরো বলশালী দেশ আছে। তাদের মিত্রতাও কম কামনীয় নয়। তারই সন্ধানে সুভাষ ইউরোপের বহু শহর পরিভ্রমণ করল— বারলিন, রোম, প্রাগ, ওয়ারশ, ইস্তাম্বুল, বেলগ্রেড, বুখারেস্ট। জেনেভাতে রোমা রঁলার সঙ্গে দেখা হল, রোমে মুসোলিনির সঙ্গে। আয়র্ল্যাণ্ডের ডি ভ্যালেরা ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ডাঃ বেনেশ-এর সঙ্গেও পরামর্শ হল। আর বার্লিনে হিটলারকে ধরতে না পেয়ে রিবেনট্রপকে জিজ্ঞেস করল সুভাষ, 'বৃটেনকে আপনারা কবে আক্রমণ করছেন?'

রিবেনট্রপ বললে, 'বৃটেনকে আক্রমণ করবার আমাদের কোনো মতলব নেই। আশা করছি তার সঙ্গে একটা আপস হয়ে যাবে।'

'আপস! তার সঙ্গে আমাদের কোনো আপস নেই।'

'কিন্তু আমরা যদি সাহায্য করতে না পারি?'

'তোমাদের সাহায্য ছাড়াই আমরা লড়ব।' সুভাষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মত বললে, 'আমরা রণে ভঙ্গ দেব না। আর শেষ পর্যন্ত আমরাই জয়ী হব।'

'দেখা যাক।'

'কিন্তু তোমরাই বা আপসের মনোভাব কতদিন বজায় রাখতে পারবে? আমি দেখতে পাচ্ছি যুদ্ধ অনিবার্য। হাওয়ায় বারুদের গন্ধ।' সুভাষ ভবিষৎবাণী করলে: 'সে যুদ্ধের সুযোগ আমরা নেবই।'

উনিশশো তেত্রিশের অক্টোবরে ভিয়েনায় বিটলভাই প্যাটেল মারা গেলেন। উইল করে সুভাষকে দিয়ে গেলেন এক লাখ টাকা। তুমি এই টাকা দিয়ে বিদেশে ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রচার করো। বিদেশকে জানাও বোঝাও ভারতবর্ষ কত বড় গরীয়ান দেশ, ইংরেজ তাকে কী কৌশলে পদানত করে রেখেছে, রেখেছে দারিদ্রের পঙ্ককুণ্ডে, কী অচিন্ত্য কাঠিন্যে আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি—তোমরা কি উত্তপ্ত সমর্থনে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে না? স্বাধীনতার অভ্যর্থনায় বদান্য হবে না? পরস্ব-দস্যু ইংরেজের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গঠন করবে না?

সেই প্রচারের জন্যই এই দান। সুভাষ, তুমিই এর যোগ্য রূপকার।

তার প্রতি বিঠলভাইয়ের এই আস্থা দেখে সুভাষ অভিভূত হল। নতুন উৎসাহে নতুন কাজে নামল—বিদেশে সংযোগ প্রতিষ্ঠার কাজ। বিদেশের জনমত ভারতের অনুকূলে আনতে পারলে ভারতে স্বাধীনতার আবির্ভাব দ্রুততর হবে—বিদেশস্থ ভারতীয়দের ডাক দিল সুভাষ। স্বদেশবাসীদের বললে, তোমরাও এই অভিযানে এগিয়ে এস।

কিন্তু হায়, বিঠলভাইয়ের টাকাটা সুভাষের হাত থেকে কেড়ে নিলেন বল্লভভাই। কেড়ে নিলেন অর্থাৎ মামলা করে জিতে নিলেন। মামলায় বলা হল, বিঠলভাইয়ের উইলের অর্থ অস্পষ্ট—বৈদেশিক প্রচারের কোনো সীমা সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, সে কারণে উইল অকার্যকর। আদালতও তাই সাব্যস্ত করল। অকর্মণ্য উইলের ফল সুভাষের প্রাপ্য নয়।

সমস্তই আইন? দাতার অন্তরটা দেখলে কী ক্ষতি হত? বিঠলভাই তো আইনের লোক। তিনি ইচ্ছে করেছিলেন তাঁর টাকাটা সুভাষের হাতে যায়। কী ভাবে কী প্রচার করতে হবে সে সম্পর্কে তাঁর বা সুভাষের মনে কোনো দুরাশা ছিল না। উইলের লিখিত ভাষার কারুকার্যের ত্রুটিটাকেই বড় করে দেখা হল? অন্তরের কথাটার কোনোই দাম হল না?

ইংরেজের অন্তরের পরিবর্তন ঘটাব এই আমাদের সাধনা। কিন্তু আমরা কি আমাদের নিজেদের অন্তরের পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করেছি! আমরা কি অদ্যোপান্ত সেই বিদ্বেষ বিষেই জর্জরিত নই?

কেউ-কেউ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বিরক্ত হলেন। তাঁরা বললেন মহাত্মা ইচ্ছে করলেই সর্দার প্যাটেলকে মামলা থেকে নিরস্ত করতে পারতেন। সর্দার প্যাটেল মহাত্মার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ, কিছুতেই তিনি মহাত্মার অবাধ্য হতেন না। আর ইংরেজের আদালত তো কংগ্রেসের পরিত্যক্ত এলাকা। মহাত্মা অনায়াসে বলতে পারতেন, বিঠলভাইয়ের আন্তরিক ইচ্ছারই মর্যাদা রক্ষা করা হোক, আইনের সংকীর্ণ গলিখুঁজির মধ্যে নাই বা গেলেন সর্দার। কিন্তু, না, মহাত্মা চুপ করে রইলেন।

অপর দল বললেন, চুপ করে থাকবেন না তো কী! এক ভাইয়ের বিষয় নিয়ে অন্য ভাইয়ের বিক্ষোভ—সেই ব্যক্তিগত ব্যাপারে মহাত্মা নাক গলাতে যাবেন কেন? সর্দারকে পরামর্শ

দেবার তাঁর এক্তিয়ার কোথায়? এও বুঝি আইনের নটখটি। ফলকথা, সত্যমের জয়তে, এ পতাকা সেদিন উড়ল না। সুভাষ লাখ টাকা থেকে বঞ্চিত হল।

তবু যেখান থেকে ডাক এল ছুটে গেল সুভাষ। সেখানেই ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করল। ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে তার এক বাণী—তোমরা সবাই ভারতের দূত। ভুলো না ভারতের স্বাধীনতাই তোমাদের মহত্তম সিদ্ধি। স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই।

ডাক এল ইংলণ্ড থেকে। ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন নামে এক সর্বভারতীয় গোষ্ঠী রাজনৈতিক সম্মিলন আহ্বান করেছে। তার সভাপতিরূপে তারা সুভাষকে নিমন্ত্রিত করল। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বাদ সাধল। 'ভিসা' দিল না। যেতে পারল না সুভাষ। অথচ জওহরলালকে ইংরেজ সরকার বাধা দিল না। বরং উল্টে তাকে সমাদর করল। জওহরলালকে ইংরেজের তত ভয় নয়, যত ভয় সুভাষকে। গদি পেলে জওহরলাল গদিতে গিয়ে বসবে কিন্তু সুভাষের গদির উপর কোনো মোহ নেই। ক্ষমতায় এলে জওহরলাল ইংরেজদের তাড়াবে না, সে নিজেই যে অনেকখানি ইংরেজ, কিন্তু সুভাষ ক্ষমতায় এলে কী করবে কিছুই বলা যায় না, কেননা সে আপসের নয়, সে বিপ্লবের। সুভাষ তার অভিভাষণ ডাকে পাঠিয়ে দিল। লণ্ডনের ফ্রিয়ার্স হলে সভা, প্রকাশ্য সভায় তা পড়া হল। বক্তব্যের দীপ্তিতে সচকিত হয়ে উঠল। এ যে এক নতুন সুভাষ, আগামী সুভাষ।

'ভারতবর্ষে ইংরেজের কম বিরুদ্ধতা করা হচ্ছে না। উনিশশো বত্রিশের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় সত্তর হাজারই জেলে গেছে। জেলের বাইরেও নানাভাবে সংগ্রাম চলেছে। তবু ইংরেজ সরকার অক্ষত, নির্বিচল। সে বলছে যতক্ষণ পুলিশ আমার অনুগত, রাজকর্মচারীরা বশংবদ, সর্বোপরি সামরিক শক্তি যতক্ষণ আমার করতলে, ততক্ষণ ভয় কী? তোমাদের ঐ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আমার কী করবে? আর যাই করুক সিংহাসন টলাতে পারবে না। ইংরেজ সরকারের এ স্পর্ধা করার অধিকার আছে বটে। কিন্তু এই স্পর্ধাকে আমরাচূর্ণ করতে পারি, দুই উপায়ে। এক, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে; দুই আর্থিক অবরোধে। এই দুয়ের জন্যেই আমাদের বিদেশের সাহায্য নিতে হবে। অস্ত্রও বিদেশ দেবে, আর বিদেশের আনুকূল্যেই ঘটবে এ অবরোধ। তারই জন্যে ভারতের সম্পর্কে বিদেশে বিস্তৃত প্রচার দরকার। ইংরেজকে চেনানো দরকার। নইলে দেশে বসে শুধু অহিংস আইন অমান্য চালালে শুধু বালিতেই বীজ বোনা হবে।'

দৃঢ়, স্পষ্ট বক্তব্য। প্রত্যয় রঞ্জিত। সশস্ত্র অভ্যুত্থান চাই। নিজেদের জিম্মাদারিতে অস্ত্র না থাকে, বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সে সংগ্রহের সন্ধান দেখ।

হঠাৎ খবর এল বাবা কলকাতায় মৃত্যুশয্যায়। জাহাজে যাবার সময় নেই, বিমানে যাত্রা করল সুভাষ। বিনা বিচারে বন্দী চলল বিনানুমতিতে। করাচিতে পৌঁছেই খবর পেল বাবা আর নেই। দমদমে পৌঁছানোমাত্র সংশোধিত ফৌজদারি আইনে পুলিশ তাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করলে। পরে আবার আদেশ হল সাত দিন পরে আবার তাকে তার নির্বাসনে ফিরে যেতে হবে। পরে আবার আদেশ সংশোধন হল, পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত থাকতে পারবে, তারপরেই বহিষ্কার। সুভাষ জাহাজে করে ফিরে চলল।

সুভাষের এখন কাজ কী? যে বই লিখতে সে শুরু করেছে তা শেষ করা ও যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশ করা। বইয়ের নাম 'দ্য ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'— ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস আর সেই সম্পর্কে তার টীকাভাষ্য। তার দিক নির্ণয়।

শ্রীমতী এমিলি শেংকল সুভাষের গ্রন্থ-প্রণয়নের সহায়িকা।

কোন পথে স্বাধীনতা আসবে এ নিয়ে সুভাষের কোনো প্রশ্ন নেই, তার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা। গান্ধীর কাছে মুখ্য হচ্ছে স্বাধীনতা-অর্জন, সে স্বাধীনতার কী রকম চেহারা হবে, কী হবে তার সংবিধান, কোন ধাঁচের হবে তার অর্থনৈতিক কাঠামো—এসব নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। সেসব ব্যাপার পরে ধীরে সুস্থে ভেবে-চিন্তে ঠিক করলেই হবে। কংগ্রেস সরে গিয়ে যদি অন্য দল শাসনে এসে পরে সেসব ঠিক করে নেয়, তাতেই বা আপত্তি কী। না, ঘোরতর আপত্তি, সুভাষ তার বইয়ে বিশদ হল। স্বাধীনতার সঙ্গে তার রূপায়নের আকৃতি-প্রকৃতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সে সম্পর্কে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। সুভাষ সমাজতান্ত্রিক, তাই স্বাধীন ভারত গড়াব ভার সে পুঁজিবাদীদের হাতে ছেড়ে দিতে পারবে না, আবার খোলাখুলি গণতান্ত্রিক নিয়মে সংবিধান তৈরী হবে এও তার মনঃপূত নয়। তাহলে আবার সেই কায়েমী স্বার্থ এগিয়ে এসে সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস আত্মসাৎ করে নেবে। তাই রাষ্ট্রের শাসন কাউকে বা কোনো দলকে প্রথমটা ধরতে হবে শক্ত হাতে। তাই বলে ভিন্নমতের দলের অস্তিত্ব থাকবে না বা তা মর্যাদা পাবে না সে স্বেচ্ছাচারও অসহ্য। মার্কসবাদ নয় ফ্যাসিবাদ নয়, দুয়ের সৎগুণের সমন্বয়ে গড়া সে এক নতুন সমাজতান্ত্রিক দল, যে দেশকে নির্বিঘ্ন কর্তৃত্বে গড়ে তুলে নিয়ে যাবে বিস্তীর্ণতম সমৃদ্ধিতে— যে দেশের নাম সব সময়েই ভারত—মহাভারত। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ।

'ভারতে আমাদের কাজ হবে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাগুলির সমন্বয় করে এক নতুন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করা।' ১৯৪৪-এর টোকিও বক্তৃতায় বলছেন নেতাজী: 'কোনো বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে মানবজাতির প্রগতির শেষ ফসল বলে ঘোষণা করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। মানবপ্রগতি কোনোদিনই থামতে পারে না। সারা বিশ্বের অতীত অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই আমাদের একটি নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে হবে। সুতরাং ভারতে আমরা বিশ্বপ্রচলিত বিভিন্নমুখী মতবাদগুলি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছি। সকল মতবাদের কল্যাণকর অংশগুলির আয়ত্ত করতেই আমরা সচেষ্ট।

আরো বলেছেন:

'আমি জাতীয়তাবাদী। জাতীয় মর্যাদা ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে আমি আমার শেষ রক্ত বিন্দুও উৎসর্গ করব। এই জাতীয়তাবাদের বিকাশ কোনো সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ সাধনের জন্যে নয়, এ সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্যে— পৃথিবীকে আরো সুন্দর ও সুখী করে গড়ে তোলার জন্যে।'

কিন্তু এখন সাল ১৯৩৪—সুভাষের বই লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হল আর প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সরকার তার ভারত প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিল। কে কাকে আটকায়? বই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসতে লাগল আর ঢুকতে লাগল পড়ুয়াদের নিভৃত কোটরে। তারপর ফিরতে লাগল হাতে হাতে। যারা বইয়ের নাগাল পেল না তারা সুভাষের বাণীর নাগাল পেল। কী সে বাণী? গান্ধীর ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন চাই জঙ্গী বাহিনী—আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী, ও স্বাধীনতা-অর্জনের জন্যে অকাতর দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত—একমাত্র তারই হাতে ভারতের ভবিষ্যৎ।

বই প্রকাশ করবার আগে সুভাষ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিল যদি তিনি বার্নার্ড শ বা এইচ জি. ওয়েলসকে এই বইয়ের ভূমিকা বা পূর্বভাষণ লিখে দিতে অনুরোধ করেন। রমা রলাঁর কথাও সুভাষের মনে হয়েছিল কিন্তু রলাঁ যেরকম প্রচণ্ড গান্ধীভক্ত, ভূমিকা লিখে দেবেন বলে

বিশ্বাস হয় না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও যে তার অনুরোধ রাখবেন এ সম্পর্কে সুভাষের সংশয় ছিল, কেননা এ বই গান্ধীর সমালোচনা, আর কেনা জানে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর বিশেষ অনুরাগী?

সুভাষ যা সন্দেহ করেছিল রবীন্দ্রনাথ তার প্রার্থনা নামঞ্জুর করলেন। বার্নার্ড শন-কে যদ্দূর জানেন, আবেদন নিষ্ফল হবে। তারপরে মহাত্মাজী সম্পর্কে লিখলেন:

'মহাত্মাজী অতি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের মনকে এক যুগ থেকে আরেক যুগে নিয়ে যেতে পেরেছেন। কেবল একদল রাষ্ট্রনৈতিকের নয় সমস্ত জনসাধারণের মনকে তিনি বিচলিত করতে পেরেছেন—আজ পর্যন্ত আর কেউ তা পারেনি।... মহাত্মাজীর চরিত্রের মধ্যে এই একটা প্রবল নৈতিক শক্তিকে ভক্তি যদি না করতে পারি তবে সেইটেকেই বলব অন্ধতা। অথচ তাঁর সঙ্গে আমার স্বভাবের বুদ্ধির ও সংকল্পের বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রবল। মনের দিকে কল্পনার দিকে ব্যবহারের দিকে তিনি আর আমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর জীব। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি দেশের ক্ষতি করেছেন কিন্তু দেশের চিত্তে হঠাৎ যে বল এনে দিয়েছেন একদিন সেটা সমস্ত ক্ষতিকে উত্তীর্ণ হয়ে টিকে থাকবে।'

মহাত্মার নৈতিক শক্তির প্রতি সুভাষেরও অশেষ শ্রদ্ধা। অনন্য প্রাণশক্তিতে তিনি যে নির্জীব দেশকে জাগিয়ে তুলেছেন সুভাষ তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু তার আপত্তি, গান্ধীর রাজনীতি বাস্তবতাবর্জিত, অসার্থক। গান্ধীর পথে স্বাধীনতা আসবার নয়।

গান্ধী প্রতিপক্ষকে বুঝতে চান না, প্রতিপক্ষের সার্বিক শক্তির পরিমাপও তাঁর ধারণায় নেই, আর কোনো বিদেশী শক্তির আনুকূল্যও তিনি সন্ধান করেন না—তাঁর ভরসা বলতেও ঐ শত্রু বৃটিশ। শত্রুকে তিনি প্রেমের স্পর্শমণিতে মিত্র করবেন। তাঁর বিশ্বাস বৃটিশ অক্ষম অনড় অনুতপ্ত হয়ে নিজের থেকেই ভারত ছেড়ে চলে যাবে। সুভাষের মতে এটা বাস্তব রাজনীতি নয়, নিছক ধর্মকথা। রাজনৈতিক রাষ্ট্রগুরু হবেন, না, ধর্মনৈতিক জগৎগুরু হবেন এই নিয়েই গান্ধীর দ্বিধা। অহিংসা দিয়ে আর যাই হোক স্বাধীনতা হবে না। তাই গান্ধীর নেতৃত্ব অকার্যকর।

বই পেয়ে খুশি হয়ে রমা রলাঁ ভিলা অলগা থেকে চিঠি লিখলেন সুভাষকে। তার সংগ্রামী সত্তাকে অভিনন্দন জানালেন। লিখলেন:

আমরা চিন্তার জগতের অধিবাসী। ক্লান্তি আর নিষ্ফলতাবোধ আমাদের আক্রমণ করে। আমরা তখন সংগ্রাম ছেড়ে অধ্যাত্মজগতে আশ্রয় খুঁজি। ঈশ্বর, আত্মা, আর্ট— এই সব বিমূর্ত রাজ্য আমাদের প্রলুব্ধ করে বলেই আমরা আরো কঠিন সংকল্পে সংগ্রাম করে যাব। আমাদের জীবনই সংগ্রাম, অনবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম। সংসার সমুদ্রের সেই তীরেই আমাদের বাস যেখানে মানুষ নিয়ত সংগ্রামশীল। আপনি নিরাময় হয়ে উঠুন। ভারতবর্ষের সংগ্রামের জন্যে—কল্যাণের জন্যে আপনাকে নিরাময় হতেই হবে।

জেনেভায় রঁলার সঙ্গে দেখা করল সুভাষ। তারপর গেল ডাবলিনে, ডি-ভ্যালেরার ডাকে। বৃটিশের দাসত্ব থেকে আয়র্ল্যাণ্ডকে মুক্ত করেছে ডি-ভ্যালেরা। ডি-ভ্যালেরাই তো আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার প্রধান প্রণেতা। ইংরেজের জাতশত্রু। তার প্রতপ্ত প্রাণের স্পর্শ নিয়ে আসি।

রোমে এশীয় ছাত্র-সম্মিলনে ভাষণ দিল সুভাষ। সে সম্মিলনের উদ্বোধক মুসোলিনি। নিয়ে আসি তার উদ্দীপ্ত প্রেরণা।

জওহরলাল দেশে ফিরে যাচ্ছে। সে এখন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে মনোনীত, তার পথ কে অবরোধ করে? কিন্তু সুভাষ বিনাবিচারে বন্দী, নির্বাসিত। বাংলা দেশ থেকে মহাত্মা

গান্ধীর কাছে অনুরোধ গিয়েছিল সুভাষকে যেন কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়। তাহলে ইংরেজ হয়তো মহাত্মার মুখ চেয়ে সুভাষের নির্বাসন নাকচ করে দেবে। কিন্তু সুভাষকে মহাত্মার পছন্দ নয়। তাঁর ভয় সুভাষ কংগ্রেসের মধ্যে ফাটল ধরাবে। জওহরলাল যতই স্বাতন্ত্র্যবাদী হোক, আসলে সে গান্ধীর বশীভূত। অহিংসার পোষ্যপাল্য। জওহরলালকে অভিনন্দন করে চিঠি লিখল সুভাষ: তুমিই পারবে কংগ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তোমার আদর্শের কথা ভুলো না, তার রূপায়ণে তুমি তোমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করবে। গান্ধীজি তোমাকে একেবারে খারিজ করে দিতে পারবেন না, সুতরাং এ সুযোগ ছেড়ো না। আমি তোমার পিছনে আছি।

আরো লিখল: দুটো কাজ তড়িঘড়ি করতে হবে। এক, মন্ত্রিত্ব নেবার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া; দুই, ওয়ার্কিং কমিটিকে সম্প্রসারিত করা। তাহলেই অধঃপতন থেকে বাঁচবে কংগ্রেস। তাছাড়া তুমি যে কংগ্রেসের একটা বৈদেশিক দপ্তর খোলার সংকল্প করেছ তাতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এটা যে আমার অভিলাষ।

জওহরলাল যাবার আগে সুভাষকে উৎসাহিত করলেন—লখনউর কংগ্রেসে সে যেন হাজির থাকে। কী করে থাকবে? সে তো রাজবন্দী, তিনবছর ধরে ইউরোপেই আটক পড়ে আছে। তা কে না জানে! তবু জওহরলাল তাতাতে চাইল! দেখনা চেষ্টা করে। তা চেষ্টা না হয় করলাম কিন্তু তুমি তো এখন কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা, তুমিই বা আমাকে ওপার থেকে কী সাহায্য করতে পারো? দেখনা তোমার চেষ্টায়ও কিছু সুফল হয় কিনা।

যাবার জন্যে মন যখন একবার উতলা হয়েছে তখন সুভাষকে কে রোখে? সে অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়বে। যা হবার হবে, ভয়কে সে আর ভয় করে না।

তবু তার অভিপ্রায়টা ইংরেজের দরবারে জানিয়ে রাখা সমীচীন। না, অনুমতি ভিক্ষা করছি না, অনুমতি চাইলে যে পাওয়া যাবে না তা আমার জানা আছে, আমি শুধু আমার অভিলাষটা ব্যক্ত করছি—আমি আমার ভারতবর্ষে ফিরে চললাম।

ইংরেজের বৈদেশিক দপ্তর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আপনি আমাদের বন্দী, আপনার প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব কিছুতেই অনুমোদন করা চলে না। স্বাধীনভাবে আপনার ভারতবর্ষে প্রবেশ অকল্পনীয়। যদি তবু আপনি উদ্যোগী হন আপনাকে প্রতিরোধ করা হবে।

কিন্তু কোথায়, কোথায় সুভাষ? কোথায় যেন সুভাষ আভাষ দিয়েছিল সে বিমানে যাত্রা করবে। গুপ্তচরেরা রোমের বিমান বন্দরে এসে হানা দিল। অনেক অনুসন্ধান করল কিন্তু সুভাষ কোথায়? সুভাষ গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়েছে। বিমানে ওড়েনি, জাহাজে ভেসেছে। ইতালিয়ান জাহাজ কাঁতেভার্দে সুভাষকে নিয়ে বম্বে এসে পৌঁছল। সুভাষ জানে অবতরণ করা মাত্রই তাকে ধরে কারাগারে নিয়ে যাবে। তবু বিদেশের স্বাধীনতার চেয়ে দেশের কারাগারও তার কাছে বেশি রমণীয়।

যা ভেবেছিল তাই। ইংরেজের পুলিশ সুভাষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, প্রথমে আর্থার রোড জেলে, দুদিন বাদে যারবেদা জেলে। সেই বিনা বিচারে নির্বাসন। দেশ জুড়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হল, সুভাষচন্দ্রের মুক্তি চাই। সরকার থেকে বলা হল, অসম্ভব, ছাড়া পেলে সুভাষ আইরিশ-পদ্ধতিতে গেরিলা-যুদ্ধ প্রবর্তন করবে। সুভাষের মুক্তি নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও প্রশ্ন উঠল। লর্ড জেটল্যাণ্ড বললেন, বিরাট শক্তিধর প্রতিভাবান পুরুষ বলেই তো তাঁকে আমাদের বেশি ভয়, তাঁর সমস্ত চেষ্টাই যে ধ্বংসের, আপসের নয়।

মন্ত্রিত্ব দিয়ে কংগ্রেসকে ভোলানো যাবে কিন্তু সুভাষকে নয়। জওহরলাল যদিও গোড়াতে

মন্ত্রিত্বের বিরোধী ছিল, সবাই জানত, সে সুভাষ নয়, সে গান্ধীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে না কিছুতেই। সেই প্রভাব সৃষ্টির জন্যেই তো তাকে কংগ্রেসের সভাপতি করা, তার মুখ সেলাই করে দেওয়া। আদর্শে সে যতই কেননা নির্ভীক ও স্বতন্ত্র হোক, কর্মে সে সীমিত-সংযত, গান্ধীরই অনুবর্তী।

যারবেদা জেল থেকে সুভাষকে কার্শিয়াঙে সরিয়ে নেওয়া হল। সেখানে শরৎচন্দ্র বসুর বাসভবন ছিল, সেখানেই সে রইল অন্তরীণ। অসুখ বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে, তাই কিছুকাল পরেই কলকাতার চলে এল সুভাষ। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হল। দেহের এখন দুই অসুখ—ভিতরের আর বাইরের। ভিতরের অসুখ জ্বর, বাইরের অসুখ বন্দিত্ব। জ্বর হয়তো সারবে, কিন্তু বন্দিত্ব ঘুচবে কবে ?

উনিশশো সাইত্রিশের সতেরোই মার্চ সুভাষ বিনাশর্তে মুক্তি পেল। ইংরেজ দেখল নতুন শাসনতন্ত্রের আমলে, কংগ্রেস তো এখন মন্ত্রিত্বে গদীয়ান হতে চলেছে, অসি ছেড়ে হাতে মসী নিয়েছে, এখন আর তবে ভয় কী।

মুক্তি পেয়েই বা লাভ কোথায় ? বিপ্লব তো ভিজে বারুদ হয়ে গিয়েছে। তবে একটা লাভ, পরিপূর্ণ চিকিৎসায় অসুখটা সারিয়ে নেওয়া যায়। ডাক্তাররা বললে, ডালহৌসি যাও।

তার আগে, তুমি দেশ গৌরব, দেশের মানুষের সমাদর ও আশীর্বাদ নাও। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কী সে আনন্দ উদ্বেল সভা! অগণন মানুষের কী সে প্রাণঢালা ভালোবাসা! আমরা সুভাষকে চাই। সুভাষই পারবে আমাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করতে। শুধু শিথিল করা নয়, চাই ছিন্ন করা। শাসকের হাত থেকে চেয়ে নেওয়া নয়, শাসকের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া।

এই সভা হল ছয়ুই এপ্রিল আর পঁচিশে এপ্রিল সুভাষ ডালহৌসি রওনা হল। ডালহৌসিতে ডাঃ ধরমবীরের স্নেহে ও সেবায় অনেকটা সুস্থ হয়ে সাতই অক্টোবর ফিরল কলকাতায়। আঠারোই নভেম্বর আবার পাড়ি দিল ইউরোপে।

এবার ইংল্যাণ্ডে যাবার বাধা নেই। লণ্ডনে সুভাষের জন্যে বিপুল সংবর্ধনা অপেক্ষা করছে। ডরচেস্টারের বিশাল বিস্তীর্ণ সভায় সুভাষ ইংরেজ জনতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। ইংরেজ জনসাধারণ এ পর্যন্ত সুভাষ সম্পর্কে নানা কল্পকাহিনীই শুনে এসেছে, এবার তারা তাকে সাশরীরে প্রত্যক্ষ করল। শুধু দেখলই না, শুনল। শুনল—কী তার বক্তব্য, কেমন তার কণ্ঠস্বর। দেখল এক উজ্জ্বল পুরুষ, নির্ভীক ও নিঃসংশয়। দেশপ্রেমের পরিপূর্ণ স্তব—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় নির্ঝর-নিরর্গস। অথচ কণ্ঠস্বর কী গম্ভীরমেদুর। প্রশান্ত মুখে করুণামধুর লাবণ্য মাখানো। অথচ বক্তব্য কী দৃঢ়, যুক্তিনিষ্ঠ! 'বৃটিশ জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, আমরা লড়ছি গ্রেটবৃটেনের বিরুদ্ধে। আগে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করি, পরে গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে আমরা সাধ্যমত অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক গড়ে তুলব. আগে স্বাধীনতা—পরিপূর্ণ 'স্বাধীনতা।'

প্রতিবাদ করবার মত কিছু তো নেইই, বরং মুগ্ধ হয়ে শোনবার মত বক্তৃতা। লোকে বলে এ ধ্বংসের পূজারি, কিন্তু ধ্বংস ছাড়া শত্রু উচ্ছেদ হয় কী করে ? শত্রুর সঙ্গে রফা-নিষ্পত্তি করে যা পাওয়া যায় তা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, তা খর্বীকৃত দুর্বলের পরিতোষ।

এদিকে উনিশশো আটত্রিশের আঠারোই জানুয়ারি কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হল হরিপুরার কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি সুভাষচন্দ্র।

অনেকের মনে হল এ গান্ধীর চাতুরী। রাজনীতির ভাষায় বলতে গেলে কূটনীতি। সুভাষকে তাঁর কর্তৃত্বাধীনে টেনে আনবার চেষ্টা। জওহরলাল এসে গিয়েছে, সুভাষ কেন বাকি থাকে?

আশ্চর্য, বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে সুভাষের যুক্ত বিবৃতির কথা গান্ধী ভুললেন কী করে? সভাপতিত্বের লোভে সে কি তার বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হবে? দেশের গৌরবের বাইরে তার কি আর নিজের কোনো গৌরব আছে? তার পদবীই যে দেশ গৌরব।

ইউরোপে আসবার আগে কলকাতায়ই উডবার্ন পার্কের বাড়িতে মহাত্মার সঙ্গে সুভাষের দেখা হয়েছিল।

গান্ধীজি বললেন, 'তোমাকে বিপ্লবীদের সংশ্রব ত্যাগ করতে হবে। কি, পারবে করতে?'

সুভাষ বিনীত স্বরে বললে, 'না'।

'না!' গান্ধীজি বুঝি চমকে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'তা হলে তো সকলের আগে আপনার সংশ্রবই ত্যাগ করতে হয়।'

'আমার?'

'হ্যাঁ, আপনার। আপনিই তো মহত্তম বিপ্লবী।'

গান্ধীজি সশব্দে উঠলেন। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি হিংসায় বিশ্বাস করি না।'

সুভাষ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'বিপ্লব হিংসা নয়।'

চব্বিশে জানুয়ারি কলকাতায় ফিরে এল আর এগারোই ফেব্রুয়ারি হরিপুরা যাত্রা করল। কংগ্রেসের একান্নতম অধিবেশনে সভাপতি সুভাষ। চিত্তরঞ্জন দাশ দেশবন্ধু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত দেশপ্রিয়, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল দেশপ্রাণ, আর আমাদের সুভাষ দেশগৌরব। একান্নটি তোরণের ভিতর দিয়ে একান্নটি বলদবাহী শকটে সভাপতির মিছিল এগিয়ে যেতে লাগল। নতুন উন্মাদনায় দেশের লোক ঝংকৃত হয়ে উঠল। নবীন নেতৃত্বের শাণিত প্রতীক সুভাষ যেন এক নিষ্কাশিত তরবার। অস্পষ্টতার জং ধরেনি কোথাও, তা আদ্যোপান্ত সরল, সহজ ও মর্মান্তিক। রক্তের সঙ্গে মানবতাবোধের মমতার অমৃত মিশে আছে। সবাই নতুন ছন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল। মহাত্মা এবার সুভাষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন, এবার নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলবেই খুলবে।

উনিশে ফেব্রুয়ারি হরিপুরা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষ সভাপতিরূপে ভাষণ দিল। ঐতিহাসিক ভাষণ। শুধু ইতিহাস নয়, ভারতবর্ষের জীবন-উজ্জীবন!

সুভাষ সত্যিকার সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী নেতা। তার জাতীয়তাবাদের অর্থ স্বদেশের স্বাতন্ত্র্যবাদ, তাতে পররাজ্যলিপ্সা নেই, নেই আগ্রাসন বা উৎসাদন—স্থির লক্ষ্য শুধু একটি, পৃথিবীর বন্ধনমুক্তি এবং নির্বন্ধন পৃথিবীতে নিজের বৈশিষ্ট্যে নিজের ঔজ্জ্বল্যে ভারতবর্ষের জেগে ওঠা! নিজের দেশের কথা কে ভুলতে পেরেছে? রাশিয়া পেরেছে, না, জার্মানি পেরেছে, না ইটালি পেরেছে? পৃথিবীর বন্ধন মুক্তির অর্থ এ নয় যে আমি দেশের স্বাতন্ত্র্যকে জলাঞ্জলি দেব। যদি ভারতবর্ষ না থাকে তবে পৃথিবী কোথায়!

'আমাদের সংগ্রাম শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।' হরিপুরার ভাষণে বললে সুভাষ, 'আর বিশ্বসাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার উপায়ই হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিলোপসাধন। তাই আমরা যে সংগ্রাম করছি সে শুধু ভারতবর্ষের জন্যে নয়, বিশ্বমানবের জন্যে। ভারতবর্ষের মুক্তির অর্থই সমগ্র মানবজাতীর সর্বাঙ্গীন মুক্তি।'

এ মুক্তির পথ কী? পথ—বিপ্লবের পথ, রক্তস্নানের পথ। বিপ্লব বিজয়ের পর কী

হবে তোমাদের রাষ্ট্রগঠনের কাঠামো? জেনে রাখো আমাদের রাষ্ট্র হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে রাষ্ট্রের লক্ষ্যই হবে জনগণের সেবা, জনগণের সমৃদ্ধিবর্ধন। সে রাষ্ট্রে সমস্ত দারিদ্র্যের অবসান হবে—শুধু বিত্তেরা দারিদ্র্য নয়, চিত্তেরও দারিদ্র্য। কিন্তু ভুললে চলবে না সে হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় রাষ্ট্র। শুধু আধুনিকতম বিজ্ঞানের সাহায্যেই সে বলীয়ান হবে না, সে নিজের সংস্কৃতিতে ও ঐতিহ্যে, নিজের প্রজ্ঞানে ও দর্শনেও দীপ্যমান হবে। ঐতিহ্যবিচ্যুত ও সংস্কৃতিবিহীন বলমত্ততার আয়ু কতটুকু? ভারতীয় সংস্কৃতিতে এমন কিছু আছে যা বিশ্বমানবের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যা না নিলে বিশ্বসভ্যতার চরম উন্মেষ সম্ভব নয়। সমস্ত বিশ্ব ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে আর আমরা ভারতবাসীরা—আমরাই বিশ্বের দিকে মুখ করে স্বদেশকে ভুলে থাকব?

সে রাষ্ট্র শাসন করবে কে? দেশবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসন করবে। এক কথায় বলা যায়, যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে সেই দল। এই দলের ভিত্তিও হবে গণতান্ত্রিক। অন্য সমস্ত দলকে উচ্ছেদ করে যদি একটি মাত্র দলই সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে চায় সেটাই হবে একনায়কত্বের স্বেচ্ছাচার। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস টিকে থাকবে—শুধু পার্টি হিসেবে, কিন্তু অন্য দলকে নিজের কুক্ষিগত না করে। অন্য দল যদি তাদের মতের স্বাধীনতা হারায় তাহলে আর স্বাধীনতা কোথায়? চিন্তনের বচনের লিখনের স্বাধীনতাই তো সর্বাগ্রগণ্য।

সুভাষ বললে, 'রাশিয়া জার্মানি ও ইটালির মত যদি অন্য সব দলকে নির্মূল করে ভারতরাষ্ট্র শুধু এক কংগ্রেস পার্টিকেই স্বীকার করে নেয় তা হলেই সেটা সামগ্রিক স্বৈরাচারী হবে। কিন্তু তা হতে দেওয়া হবে কেন? কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে অন্যান্য ভিন্নমতাবলম্বী দলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে। তাহলেই আর স্বৈরাচারের ভয় থাকবে না।

কিন্তু এসব পরের কথা। সর্বাগ্রে চাই স্বাধীনতা। প্রথমে জঙ্গল-জঞ্জাল সাফ করো, মাটি চৌরস করে নাও, পরে নির্মাণ করো তোমার আকাঙ্ক্ষার সুধাসৌধ। সে-নির্মিতির পদ্ধতি-প্রকরণও তৈরি করল সুভাষ। এক কথায় সে 'প্ল্যানিং কমিশন' প্রবর্তন করলে। সে কমিশনের উদ্দেশ্য দেশকে শিল্পবিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। একমাত্র শিল্পোন্নয়নেই দেশ সমৃদ্ধিমান হতে পারে, ঘুচতে পারে দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, কর্মহীনতা। আর সে শিল্পোন্নয়ন আসতে পারে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সে বিপ্লব ইংলণ্ডের মত ধীরে সুস্থে নয়, রাশিয়ার মত দ্রুততালে। দীপক-রাগে। ঝটিকা-গতিতে।

এতে চরকা বা কুটির শিল্পের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই তবু এ প্রস্তাব যেন গান্ধীপন্থীদের মনঃপূত হল না। সুভাষের মতে, কমিশনই ঠিক করবে কোন শিল্প থাকবে কুটিরে কোন শিল্প বা কারখানায়। জাতির বৃহত্তম কল্যাণবোধই কমিশনের প্রেরয়িতা হবে। যেখানে কল্যাণ জাগ্রত সেখানে কুটিরে-কারখানায় দ্বিধা কী! পরিকল্পনাটা আদ্যোপান্ত বৈজ্ঞানিক কিন্তু ভবী ভুলল না। গান্ধীবাদীদের মনে হল এতে করে দেশ যন্ত্রচালিত হয়ে তার চরিত্র হারাবে। যার পেটে অন্ন নেই তার আবার চরিত্র কী। খালি পেটে যে ধর্ম হয় না একি কারু অজানা? তুমি শুধু যন্ত্রই দেখলে তার প্রেক্ষিতে জনসাধারণের যন্ত্রণাটা দেখলে না? যন্ত্র দিয়ে যদি অধিকাংশ যন্ত্রণার সমাধান হয় তবে যন্ত্রায়িত হতে বাধা কী! তেমন-তেমন ব্যাধিতে দ্রুত অস্ত্রোপচার করা হয় না? তেমনি এই দরিদ্র্য-ব্যাধি দূর করতে এই শিল্পোপচার প্রয়োজন।

জীবিকা আর জীবন এই দুই নিয়ে মানুষ। জীবিকার উপযুক্ত সংস্থান না থাকলে জীবন অর্থহীন। আর কে না জানে জীবন জীবিকাসর্বস্ব নয়। শুধু রুটি পেলেই মানুষ বাঁচে না। জীবনের সব ঘরে তার আলো চাই। কর্মের ঘরে ধর্মের ঘরে সংগ্রামের ঘরে সাধনার ঘরে। জীবন সুভাষের কাছে এক অভঙ্গ সত্তা, এক অচ্ছিদ্র অভ্যুদয়। সুভাষকে নতুন করে আধ্যাত্মিকতা শেখাতে হবে না। সে বিবেকানন্দের যথার্থ উত্তরসাধক। আধ্যাত্মিকতা পার্থিবতাকে বাদ দিয়ে নয়। শুধু যোগেশ্বর কৃষ্ণ কী করবে যদি তার সঙ্গে ধনুর্ধর অর্জুন না মিলিত হয়? কৃষ্ণার্জুন একত্র হলেই জয়লক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব। কৃষ্ণার্জুনের মিলনই ধ্রুবানীতি, রাজনীতি অখণ্ডিকা।

সুভাষ জওহরলালকে অনুরোধ করলে এই প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতি হতে। জহরলাল তখন ইউরোপে, সে এ প্রস্তাবে সম্মত হল। তার এ সম্মতিতে রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হলেন। লিখলেন, সুভাষের এ বৈপ্লবিক পরিকল্পনা অভিনন্দনযোগ্য। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাও এর সমর্থনে। তুমি কী বলতে চাও?

আগে সংক্ষেপে জানা দরকার সুভাষ কী বলতে চায়? সুভাষ চায় জাতীয়তাবাদকে সমাজতন্ত্রের উপর দাঁড় করাতে। সমাজতন্ত্রের জন্যে চাই ব্যাপক শিল্পপ্রতিষ্ঠা। শিল্পের আশ্রয় পেলেই কৃষিকর্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিস্তৃত হতে পারবে। শিল্পই সাধারণ জীবনযাত্রার মান বাড়াবে, বিশ্বের বাজারে বিদেশী পণ্যের সঙ্গে পারবে পাল্লা দিতে। সুতরাং দিকে দিকে উৎপাদিকা শক্তির বিবর্ধন কর।

ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত হবার পর ভারতবর্ষ কী ভাবে একীকৃত হবে সুভাষ তারও রূপরেখা তুলে ধরল। এক রাষ্ট্রভাষা, একপ্রকার বেশভূষা, একধরনের আহার্য। বেশে-খাদ্যে ইতর বিশেষ ঘটে ক্ষতি নেই, প্রধানত বাঁচিয়ে রাখতে হবে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। একতায় সমস্যা আসলে মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। মনে সেই সুর বাজিয়ে দিতে হবে যে আমরা সবাই এক দেশমাতার সন্তান। প্রান্তে হোক কেন্দ্রে হোক সবাই আমরা একই অঞ্চলের নিধি। অসমুদ্রহিমাচল জাগিয়ে রাখতে হবে সেই মাতৃবন্দনার প্রাণদ-মন্ত্র—বন্দেমাতরম্। সেই তো আসল সাম্যবাদ। আমরা সবাই ভারতীয়, আমরা সবাই মায়ের সেবায় উৎসর্গীকৃত।

জওহরলাল এ পরিকল্পনার অনেক ব্যাখ্যা-ভায্য করল কিন্তু এমন ভাব দেখাল যে এ পরিকল্পনা বুঝি তারই রচনা। এ যে সুভাষিত তা সে ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করতে চাইল না। যদি স্বাধীন ভারত কোনোদিন এ পরিকল্পনার সূত্র ধরে রূপায়িত হয় তবে তার কৃতিত্ব যেন হবে জওহরলালের। কিন্তু এ ইতিহাস নয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ প্রণয়নের প্রথম প্রস্তাবক প্রথম সূত্রধার সুভাষ।

কিন্তু সেসব তো স্বাধীনতার পরে। স্বাধীনতা কোথায়? স্বধীনতা কবে? স্বাধীনতা কোন পথে?

নতুন শাসন-বিধিতে প্রদেশে মন্ত্রীত্ব নিয়ে কংগ্রেসীরা নতুন নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে—গান্ধীর মুখে শুধু আপসের কথা। আসলে মূল ক্ষমতা যে কেন্দ্রে বড়লাটের হাতেই সংরক্ষিত তা জেনেও নেতারা কেমন নিষ্ক্রিয়। সুভাষ ব্রিটিশ শাসকদের সতর্ক করে দিল, রক্ষাকবচগুলি বড়লাটের হাতে রেখে মন্ত্রীদের হাতে ছেলেখেলার খেলনা তুলে দেওয়ার ছলনা বরদাস্ত করা হবে না।

সুভাষের এই মনোভাব গান্ধীবাদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা। তার পরে সেদিন বম্বেতে করপোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে সুভাষ সরাসরি সাম্যবাদের নান্দীপাঠ করে এসেছে। সাম্যবাদ

তো আর গান্ধীবাদের দোসর নয়। তাই গান্ধীচক্র সুভাষের প্রতি বক্রাক্ষ হয়ে রইল। শুধু তাই নয়, সেপ্টেম্বরে মিউনিক প্যাক্ট সই হবার সময় থেকেই সুভাষ রব তুলেছে ইউরোপে যুদ্ধ অনিবার্য, আর যুদ্ধে ইংলণ্ড একবার জড়িয়ে পড়লে সেই হবে তাকে চরম আঘাত হানবার মহেন্দ্রক্ষণ। সেই আশায় আন্দোলনে প্রস্তুত হবার ডাক দিয়েছে সুভাষ, কিন্তু অন্যের বিপদে স্বার্থসন্ধান করা কি গান্ধীনীতি?

কিন্তু এ নীতির কথা নয়, এ পরিচ্ছন্ন রণকৌশল। যে আমার শত্রু তাকে বেকায়দায় পেলে তার কবল থেকে আমার হৃতধন উদ্ধার করব এ তো অত্যন্ত সরল কথা। খাপখোলা তরোয়ালের মত সরল। প্রশ্নটা হচ্ছে দ্রুততার প্রশ্ন। এখন থেকেই তরোয়ালে শান চড়ানো উচিত। আর হাঁটি-হাঁটি পা-পা নয়। আঠারো মাসে বছর করা নয়। সামনাসামনি চুলের ঝুঁটি মুঠো করে আঁকড়ে ধরে ঝাঁকুনি দেবার এই সময়।

কিন্তু গান্ধীপন্থীরা মন্ত্রিত্বের চরকায় স্বায়ত্তশাসনের সুতো কাটতেই বেশি উৎসুক। সুভাষের নেতৃত্বকে তাঁরা বলতে চাইলেন ফুটো নৌকো, ডুবন্ত জাহাজ। শুধু অকেজো নয়, আত্মঘাতী।

সুভাষ জওহরলালকে ডাক পাঠাল।

রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ব্যাপারটা যেন আঁচ করতে পেরেছিলেন, তিনি লিখলেন জওহরলালকে: চলতে-চলতে যন্ত্র যদি বিকল হয়ে পড়ে তবে তাকে সেই চালাতে পারে যে শক্তিধর, যে যন্ত্রবিদ। পথের মাঝখানে বাধা এসে পড়লে সেই শক্তিধরই পারে তাকে সরিয়ে দিতে। সে চালক মানুষ হিসেবে খুব মহনীয় নাও হতে পারে কিন্তু সে যন্ত্রবিদ, কাজের মানুষ তো বটে।

কিন্তু জওহরলাল দুঘোড়ার সওয়ার। তার দু নৌকোয় দু পা। সে বিপ্লবের প্রতি উন্মুখ আবার সে গান্ধীতেও আসক্ত। দ্বিধায় দুলছে সারাক্ষণ, সাড়া দিতে পারল না। একবার এগুচ্ছে তো আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। চিন্তা করতে বসছে। বিপ্লবে বিশ্রাম নেই, পিছটান নেই। শুধু ওৎ পেতে থাকা আর বিদ্যুৎচকিত মুহূর্তে আকস্মিক ঝাঁপিয়ে পড়া।

সুভাষ অস্থির হয়ে উঠল। এ কালহরণ করবার কাল নয়।

উনিশশো উনচল্লিশে ত্রিপুরী। ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসেছে, ১৯৩৯-এ কাকে সভাপতি করা যায়। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যে সব নাম এসেছে তাদের মধ্যে তিনজনই অগ্রযায়ী। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পট্টভি সীতারামায়া আর সুভাষচন্দ্র। এখন এই তিন গণনীয়ের মধ্যে কে বরণীয়?

কার ইচ্ছায় কে জানে আজাদ হঠাৎ নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিল। বললে, পট্টভির অনুকূলে আমি সরে যাচ্ছি। আমি চাই অবিরোধে সর্বসম্মতিক্রমে পট্টভিই নির্বাচিত হোক। কিন্তু অবিরোধে সুভাষ সরে যেতে প্রস্তুত নয়। যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি হেরে যাই আমি হাসিমুখেই সরে যাব। যে করে হোক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া দরকার। আর তা হবে নির্দিষ্ট সমস্যা ও বিশিষ্ট কর্মসূচীর উপর। কোনো ধোঁকাবাজি চলবে না, না কোনো উপরচাল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচ্ছন্ন নির্বাচন। একদিকে পট্টভি আরেক দিকে সুভাষ। পট্টভির দিকে স্বয়ং গান্ধী ও তাঁর দলবল, সুভাষের দিকে শুধু আর্ত দেশের বিবেক, স্বাধীনতার আতীব্র আস্পৃহা।

অসাধ্যসাধন ব্যাপার, নির্বাচনে সুভাষের জয় হল।

গান্ধীজি বিষণ্ন হলেন। বললেন, 'পট্টভিকে আমিই খাড়া করেছিলাম, আজাদকে আমিই দিয়েছিলাম সরিয়ে। সুতরাং এ হার আমার হার। এ নির্বাচনে এটাই স্পষ্ট হল যে আমার আদর্শ ও নীতি অধিকাংশ কংগ্রেস প্রতিনিধির মনঃপূত নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে

আমি আনন্দিত।'

আনন্দিত তো সুভাষকে তার জয়ে তিনি অভিনন্দন জানালেন না কেন? বরং তার মর্মে ঘা দিয়ে বললেন: 'আর যাই হোক সুভাষ বোস দেশের শত্রু নয়।'

অভিনন্দন পাঠালেন দেশের কবি রবীন্দ্রনাথ:

'বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতা বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো ও আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন জিজ্ঞাসা জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা—তা দিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি, তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চরিত্রশক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। তোমাকে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশে সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।'

তুমি শুধু 'দেশের শত্রু নয়' নও, তুমি দেশের পরমবান্ধব। শুধু নেতা বা নায়ক নও, তুমিই রণজিৎ, তুমিই আসল যুদ্ধকর্তা।

গান্ধীপন্থীরা সুভাষের জয় সহ্য করতে পারল না। চৌদ্দ জন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, তার মধ্যে শরৎচন্দ্র বসুকে বাদ দিয়ে বাকি তেরোজন একযোগে পদত্যাগ করে বসল। আজাদ, পট্টভি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্যাটেল, আবদুল গফফুর, সরোজিনী নাইডু, কৃপালিনি, ভুলাভাই, হরেকৃষ্ণ সবাই এক পথের পথিক। সবাই এক জাদুকরের হাতের পুতুল। জওহরলাল সরাসরি পদত্যাগ করল না বটে কিন্তু সুভাষেরই দোষ এই ভাব দেখিয়ে দূরে সরে থাকল।

সুভাষ দমবার পাত্র নয়, সে একাই এক লক্ষ। উপায় নেই, কংগ্রেসের যাবতীয় কাজ সে একাই নির্বাহ করবে।

স্বাস্থ্য আরো ভেঙে পড়ল সুভাষের। ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগ দিতে যখন সে যাত্রা করল তখন তার একশো চার ডিগ্রি জ্বর। এই অবস্থায় কেউ বাড়ি ছাড়ে? এই দীর্ঘ যাত্রার ঝুঁকি নেয়? কিন্তু সুভাষের পণ যে অয়স্কঠিন। তার মুক্তির স্পৃহা যে আকাশস্পর্শী। সে যে মৃত্যুতেও অক্ষুণ্ণ। ডাক্তারেরা বারণ করল শতমুখে—প্রাণের চেয়ে আর দামী কী? জীবনের অন্ত তুচ্ছ, দাসত্বের অন্তই বেশি শ্লাঘনীয়। আমি যাব। দেশকে ডাক দেব খরতর সংগ্রামে। দেশের ব্যাধিই দুশ্চিকিৎস্য। সঙ্গে ক'জন নিকটতম আত্মীয় ও ডাক্তার, সুভাষ পৌঁছল ত্রিপুরীতে, মহাকৌশল বা মধ্যপ্রদেশের সুরম্য অরণ্য অঞ্চলে। হরিপুরায় কংগ্রেস-নগরের নাম ছিল বিঠল-নগর, এবার

ত্রিপুরীতে কংগ্রেস-নগরের নাম দেওয়া হয়েছে বিষ্ণুদত্ত-নগর। সেইখানে সভাপতিকে নিয়ে যাওয়া হবে হাতি-টানা রথে করে। হাতির সংখ্যা দশ বিশ নয়, হাতির সংখ্যা বাহান্ন। সে এক বিরাট রাজকীয় শোভাযাত্রা! কিন্তু রথে সুভাষ কই? এ যে দেখি সুভাষের প্রতিকৃতি! ব্যাকুল জনতা উদ্বেল হয়ে উঠল, সুভাষ কোথায়? সুভাষ চলেছে এ্যাম্বুলেন্সে, স্ট্রেচারে শুয়ে। তার তখনো একশো-চার ডিগ্রি জ্বর।

জ্বরেও যে জীর্ণ হয় না, শত প্রাতিকূল্যেও যে নির্বিচল, শায়িত হলেও যে উত্থিত সেই অদম্য প্রতিজ্ঞাই চলেছে রণাঙ্গনে। নির্ভুল পদক্ষেপে। এমন ভাবে কে কবে এসেছে সভাপতি? এ তো শোভাপতি নয়, এ যে অধিপতি। এ যে যুদ্ধ জয়ের অগ্রনায়ক।

শরৎচন্দ্র বসু সুভাষের ভাষণ পড়লেন। ভাষণের সার কথা হল এই, ইংরেজকে চরমপত্র দিতে হবে। ছমাসের মধ্যে ইংরেজকে দিতে হবে স্বাধীনতা। না দিলে প্রবলতর ও ব্যাপকতর আইন অমান্য আন্দোলনে নামতে হবে এবং তা স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায়। মরি কি বাঁচি, স্বাধীনতার জন্যে এই আমাদের শেষ সংগ্রাম। এই আমাদের শেষ সুযোগ। আন্তর্জাতিক সঙ্কটের এমন ঘনীভূত মুহূর্ত আর আমরা কখন পাব? ওদের সর্বনাশেই আমাদের পৌষমাস করতে হবে।

সুভাষ গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিল। কিন্তু গান্ধী কোথায়? গান্ধী অনুপস্থিত। তিনি তখন রাজকোটে দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পুরোধা হয়ে অনশনে ব্রতী হয়েছেন। ত্রিপুরীর কংগ্রেসের চেয়ে রাজকোট কি বেশি জরুরি? কংগ্রেস-অধিবেশনের সমাপ্তি পর্যন্ত কি আন্দোলন স্থগিত রাখা যেত না? গান্ধী অনুপস্থিত থাকলেও অচেতন ছিলেন না। তার প্রমাণ এল গোবিন্দবল্লভ পন্থের অভিনব প্রস্তাবে। শুধু অভিনব নয়, অভাবনীয়।

সুভাষ যখন সভাপতি তখন সে-ই তার মনোমত সদস্য নিয়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করুক। খুব ন্যায্য প্রস্তাব। সমধর্মী বা সমমনাদের নিয়ে কাজ করলেই বাঞ্ছিত ফল দ্রুত আসবে। কিন্তু পন্থ-প্রস্তাবে একটা শর্ত রইল প্রকট হয়ে। সুভাষ নির্বাচিত সদস্যদের প্রত্যেককে গান্ধীর আশীর্বাদপুষ্ট হতে হবে। তার অর্থ সুভাষ তাকেই নির্বাচিত করতে পারবে যে গান্ধীর মনোনীত। গান্ধীর নান্দিকার ছাড়া আর কারু স্থান নেই কমিটিতে। এমন আজগুবি প্রস্তাব ভাবা যায় না। ঐক্যতানে বাদ্য বাজাবার জন্যে সুভাষ শিল্পী সংগ্রহ করবে কিন্তু গান্ধী হবে তার ব্যাণ্ড মাস্টার। এ ডিক্টেটারশিপ বা একচ্ছত্রত্ব ছাড়া আর কী! গান্ধীও কি তবে এক অহিংসক বা ননভায়োলেন্ট হিটলার? প্রস্তাব যতই অগণতান্ত্রিক হোক, তা-ই ভোটাভুটিতে পাশ হয়ে গেল। হিসেবে দেখা গেল, পাশ হত না যদি সোশ্যালিস্টরা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিত। আর জওহরলাল একজন সোশ্যালিস্ট!

জওহরলালকে চিঠি লিখছে সুভাষ: 'আমি জানতে চাই তুমি কি সমাজতন্ত্রী, না বামপন্থী, না দক্ষিণপন্থী, না মধ্যপন্থী, না গান্ধীপন্থী, না আর কিছু? পন্থপ্রস্তাবে তুমি কি প্রতারণার কৌশল দেখতে পাচ্ছ না? সত্যি করে বলো এ কৌশল কি সত্য ও অহিংসার পরিপন্থী নয়?'

অন্তত এ প্রতারণা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। যে গণতন্ত্র সুভাষকে গণপ্রতিবাদে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাকে হেয় করবার জন্যেই এ চক্রান্ত। সমাজতন্ত্রীরা কি অগণতন্ত্রী? তারা কি তবে একনায়কতন্ত্রের উপাসক? অবিচার শুধু ইংরেজই করে না, অবিচার করে তার সমানতীর্থসেবী সহকর্মীর দল, অবিচার করেন স্বয়ং মহাত্মা।

একমাত্র কবিকণ্ঠেই অমোঘ প্রতিবাদ উচ্চারিত হল: 'অবশেষে আজ, এমন কি কংগ্রেসের

মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির জয়ধ্বনি শোনা গেল। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।....কংগ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার চাপ হয়তো অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যারা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্টভাবে অধিকার করে আছেন, সঙ্কটের সময় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজাপথে চলেনি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে কংগ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হত, তার ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে, এই ব্যবহার বিকৃতির মূলে আছে শক্তি স্পর্ধার প্রভাব।....ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তি পূজার বেদী গড়ে উঠেছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি—যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনি ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন?'

অধিবেশনের শেষে সুভাষ ত্রিপুরী ছাড়ল। সভাপতির প্রত্যাবর্তনের সময়ও জাঁকজমক কম হয় না, কম হবার কথা নয়। কিন্তু সুভাষের ফিরতি পথে, বিষ্ণুদত্তনগর থেকে রেলস্টেশন, কোনো শোভাযাত্রা নেই। হাতিরা বনে পালিয়েছে, রথের চূড়া গিয়েছে ভেঙে, চাকা ভূতলে। সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কজন আত্মীয় আর ডাক্তার আর ছজন মাত্র কংগ্রেসী। বিদায়কালীন কোথাও এতটুকু আবেগ-উচ্ছ্বাস নেই, শুধু এক বিস্তীর্ণ বিষণ্ণতা। কে চলেছে? রুগ্ন ভগ্ন ম্রিয়মাণ! না, তাকিয়ে দেখ—চলেছে এক অনলসঙ্কাশ প্রতিজ্ঞাপুরুষ। সর্বশত্রু বিদারণ সমর্থ ধীর স্থির মহাবীর।

সুভাষ সরাসরি কলকাতায় না ফিরে এল জামাডোবায়, শরীর সারাতে। মাসাধিক কাল বিশ্রামে থেকেও শরীর বুঝি সম্পূর্ণ সারল না। এ অসুখ সারার নয়, বাঘা-বাঘা গান্ধীপন্থীরা টিপ্পনী ঝাড়ল, এ হচ্ছে 'পলিটিক্যাল ফিভার', 'স্ট্রেঞ্জ ইলনেস'—তাই এতদিনেও কিনা ওয়ার্কিং কমিটির নাম নেই। কমিটি ছাড়া কংগ্রেস ছিন্নশির কবন্ধ ছাড়া আর কী! কিন্তু নাম পাঠাবে কার? নাম পাঠাবে কাকে?

অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্যে সভা ডাকল কলকাতায়। কে জানে বা গান্ধীর নির্দেশে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাকে চিঠি লিখেছেন: রূঢ় আঘাতে বাংলাদেশ জখম হয়েছে, আপনি সেই ক্ষতস্থানে আপনার পেলব হাতের প্রলেপ দিন। আর মহাত্মা গুরুদেবকে উত্তরে লিখলেন: সমস্যা কঠিন। সমস্ত নির্ভর করছে সুভাষের সুমতির উপর। এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

কবি সুভাষকেও উপদেশ দিলেন একটা বোঝাপড়া করে নিতে। লিখলেন: 'সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে। এমন অনুকূল অবসর যদি দ্বিধা করে হারাও তাহলে আরও কোনোদিন ফিরে পাবে না। বাংলাদেশ থেকে তুমি যে শক্তি পেতে পার, তার থেকে বঞ্চিত হবে, অন্যপক্ষও চিরদিন তোমার শক্তি হরণ করতে থাকবে। এত বড়ো ভুল কিছুতেই কোর না। তোমার জন্য বলছিনে, দেশের জন্যে বলছি।'

এর আর বোঝাপড়া কী। হয় নির্জলা বশ্যতা নয় পদত্যাগ। পদত্যাগেরও ইঙ্গিত দিলেন কবি। লিখলেন: মহাত্মাজী যাতে শীঘ্রই তাঁর শেষ বক্তব্য তোমাকে জানান সেই দাবী করবে। যদি তিনি গড়িমসি করেন তাহলে সেই কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করতে পারবে।

আটাশে এপ্রিল কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাষ্ট্রীয়-সমিতির সভা। শরীর সম্পূর্ণ না সারলেও সাতদিন আগে সুভাষ ফিরেছে কলকাতায়। গান্ধীও এসেছেন সদলে। এখন জয় হবে কার? নতির, না নীতির? জয়ী হবে কে? অনেকের উপরে এক, না একে-একে অনেক? একটি আসনেও সুভাষের নির্ব্যূঢ় কর্তৃত্ব দেওয়া হল না। প্রত্যেকটি আসনই গান্ধীর

অনুমোদনের স্বাক্ষর চাই। সভাপতির উপরেও সর্বপতি। সুভাষ সভাপতির পদে ইস্তফা দিল। কোনো ক্ষোভ নেই আস্ফালন নেই, ক্ষুদ্র কটাক্ষ নেই, শুধু সত্যের সঙ্গে সসম্মানে সহযোগ। 'একান্ত সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই আমার পদত্যাগপত্র দাখিল করলাম।' সবিনয়ে নিবেদন করল সুভাষ।

আবার কবির অভিনন্দন এল : 'ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যেও তুমি যে ধৈর্য ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়েছ তা অতুলনীয়। তোমার নেতৃত্ব শক্তিকে অভিবাদন করি। ধীরতা ও ভদ্রতা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে আত্মসম্মান রাখবার জন্যে তোমার পথেই চলতে হবে। তাহলে তোমার এই ক্ষণিক পরাজয় শুচির জয়ে রূপান্তরিত হবে।'

নামে মাত্র সভাপতি থাকতে যেমন সুভাষ রাজি নয় তেমনি রাজি নয় সে নামে নামে মাত্র দেশপ্রেমিক থাকতে। তাকে যেতে হবে এগিয়ে। অগ্রগামী কে? যে সংগ্রামী সেই অগ্রগামী। এই এগিয়ে চলার দলই ফরোয়ার্ড ব্লক।

তড়িঘড়ি গান্ধী এক ফরমান জারি করলেন, কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল। সত্যিই তো, প্রদেশে প্রদেশে যখন কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব নিয়েছে তখন আর সেখানে কিসের সত্যাগ্রহ, কিসের আইন অমান্য।

বম্বেতে রাষ্ট্রীয়-সমিতির নির্দেশ আরো স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হল। প্রথমত, কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া কোথাও কোনো সত্যাগ্রহ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা সম্পর্কে চলবে না কোনো বিরূপ সমালোচনা। গণতন্ত্রের উপর এ কী নির্মম কুঠার! শুধু বিরুদ্ধ আচরণ নয়, বিরুদ্ধ আলোচনা পর্যন্ত বরবাদ।

প্রতিবাদে প্রখর হল সুভাষ। নয়ুই জুলাই দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ দিবস উদযাপিত হল। যে বাক্যের ও ব্যবহারের স্বাধীনতা ইংরেজ হরণ করেছে, কংগ্রেস স্বয়ং সেই স্বাধীনতার কণ্টক হবে? যে দুর্নীতির জন্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়া যায় সেই দুর্নীতির জন্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়া যাবে না? ডেমোক্রেসি কি কংগ্রেসের বাইরে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নয়? রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি সুভাষের কাছে কৈফিৎ চাইলেন। প্রতিবাদ দিবস পালন করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করার দরুণ কেন তার দণ্ড হবে না তার কারণ দর্শাও।

সুভাষ দৃঢ় অথচ নম্র ভাষায় কারণ দেখাল। যা করেছি তা একমাত্র মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে। মহাত্মা গান্ধীই স্বীকার করেছেন সংখ্যালঘুদের বিদ্রোহ করবার অধিকার আছে। আমার এ বিদ্রোহ নয়, আমার এ শুধু প্রতিবাদ, সমালোচনা। যা আপনারা শৃঙ্খলা বলতে চান, তা আসলে হচ্ছে শৃঙ্খল, বাকরোধ আর গতিরোধ। তবু যদি এই শৃঙ্খলভঙ্গের জন্যে কাউকে দণ্ড দিতে চান সর্বাগ্রে আমাকে দণ্ডিত করুন।

ব্যস, আর কথা নেই। তাড়িয়ে দাও সুভাষকে। দিনে-দিনে ও যেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, কে জানে ওই একদিন দেশের হৃদয়েশ্বর হয়ে উঠবে।

ওয়ার্ধায় নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসল। উনচল্লিশের আগষ্ট মাস থেকে তিন বছরের জন্যে সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত হল।

আর, কদিন পরেই পয়লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বাধল।

দুদিন পরে, তেসরা সেপ্টেম্বর ইংরেজ ভারতবর্ষকেও যুদ্ধে নামাল। কারু কোনো অভিমত নিল না, না গান্ধীর না রাজেন্দ্রপ্রসাদের, না বা কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর। ভারতবর্ষ ইংরেজের

ঢালাও জমিদারি, এখান থেকে সংগ্রহ করতে হবে তার ধনসম্পদ আর জনসম্পদ—এখানে আবার কার সঙ্গে কী পরামর্শ! কেউ কিছু জানল না, রাতারাতি অর্ডিন্যান্স জারি হয়ে গেল—ভারতবর্ষ যখন যুদ্ধে লিপ্ত তখন তার আভ্যন্তরীণ শান্তিতে যেন না ব্যাঘাত ঘটে। আন্দোলনকারীরা, সাবধান।

প্রার্থিত শুভলগ্ন উপস্থিত। সুভাষ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যুদ্ধে ইংরেজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেই তার ক্ষতাক্ত হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে স্বাধীনতা। আমরাও তো যুদ্ধই করছি আর যুদ্ধ করছি ইংরেজের বিরুদ্ধে। শত্রুর দৌর্বল্যের উপর চরম আঘাত হানাই তো সনাতন যুদ্ধনীতি। এই মর্মে জনমত গঠন করবার জন্যে সুভাষ দেশময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই এখনই মুক্তিলাভের সুবর্ণ সুযোগ। ঘরে-ঘরে সংগ্রামীরা প্রস্তুত হও। তরবারি শাণিত করো।

কিন্তু গান্ধীর অন্যমত, অন্যকথা। তিনি বললেন, বিপন্নকে বিব্রত না করে বরং তাকে আমাদের সাহায্য করাই বিধেয়। স্বাধীনতা আমাদের কাম্য বটে কিন্তু বৃটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করা আমাদের কাম্য নয়।

জওহরলালের সেই সুর—আমাদের উদার হতে হবে। অনেকে ইংল্যাণ্ডের দুর্যোগকে ভারতবর্ষের সুযোগ করে নিতে চাইছে, কিন্তু উদারপন্থী কংগ্রেস তাতে সায় দেয় না। এমন কিছু করা উচিত হবে না যা বিশ্ববিবেকের সম্মানহানিকর।

আবুল কালাম আজাদও একই ধুয়ো ধরলেন। এ যুদ্ধে ভারত গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে সমর্থন করতে দ্বিধা করবে না।

গণতান্ত্রিক দেশ বলতে ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্স। ধুরন্ধরদের মতে তাদের সাহায্য করাই ধর্মনীতি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, ভারতবর্ষে কোন তন্ত্র? বলতে গেলে বলতে হয় দাস-তন্ত্র। ধর্মনীতি কি? শৃঙ্খল ছিন্ন করে মুক্ত হওয়াই তার একমাত্র ধর্ম আর সেই উদ্দেশে শত্রুকে সর্বাংশে বিপর্যস্ত করাই একমাত্র নীতি।

ওয়ার্ধাতে আবার কংগ্রেস কমিটির সভা বসল, যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের এখন কী করণীয়। কী আশ্চর্য। সে-সভায় ডাকা হল সুভাষকে। সুভাষকে বহিষ্কার করে দিলে কি হবে তার নেতৃত্বকে উপেক্ষা করা যায় না।

কংগ্রেস কমিটির সভা বসবার আগেই বড়লাটের ডাকে গান্ধী গিয়েছিলেন দেখা করতে। যুদ্ধে কংগ্রেস কী করবে বা না করবে তা কংগ্রেসই জানে, গান্ধী সে সম্বন্ধে কোনো কথা দিতে অক্ষম। তবে ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, মানবিকতার দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে। যে লণ্ডন তাঁর ধারণায় দুর্ভেদ্য ছিল তা বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে এই বেদনায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। মনশ্চক্ষে দেখতে চাইলেন ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবে, পার্লামেন্ট ভবন ও সেণ্টপলের গির্জা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, আর অমনি ভেঙে পড়লেন কান্নায়। ঈশ্বরের সঙ্গে মনে মনে ঝগড়া করলেন, তুমি কেন এমন জিনিস ঘটতে দাও পৃথিবীতে? ঈশ্বর তাঁকে বললে, বিশ্বাস হারিও না।

যুদ্ধে নিবৃত্ত হবার জন্যে হিটলারকেও চিঠি লিখলেন গান্ধী।

'এ আমার আস্পর্ধা বলে আপনার মনে হতে পারে কিন্তু মানবিকতার পক্ষ নিয়ে বলছি যে যুদ্ধে মানবসভ্যতাকে বিরাট বর্বর রাজ্যে রূপান্তরিত করতে চলছে সে যুদ্ধ থেকে আপনি ক্ষান্ত হোন। যে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যেই আপনি যুদ্ধ করুন না কেন, বর্বরতার মূল্যে তা ক্রয় করবার নয়। যুদ্ধের পথ ছেড়ে-দেওয়া একজন অহিংস অথচ সফল সংগ্রামীর আবেদন

কি আপনি শুনবেন?'

চেম্বারলেন বললে, শুনবে না। হিটলার ঈশ্বর বলে কাউকে চেনে না। আর সে যা জানে বা বোঝে তা একমাত্র প্রহার ও প্রহরণ।

হিটলার গান্ধীর চিঠি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিল।

লিনলিসগোকে গান্ধী কোনো কথা দিতে পারলেন না। যা ঠিক করবার কংগ্রেস ঠিক করবে। 'কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে।' গান্ধী আবার ঘোষণা করলেন। বললেন, 'এ মুহূর্তে আমি ভারতবর্ষের মুক্তির কথা ভাবছি না। মুক্তি আসবে কিন্তু তার মূল্য কী যদি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পতন হয়, কিংবা যদি জার্মানিই ধুলো হয়ে যায়?'

ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস কমিটির সভায় তিনটি প্রস্তাব উঠল। প্রথম গান্ধীর, ইংরেজের সঙ্গে নিঃসর্ত সহযোগিতা। ইংরেজ যদি হেরে যায়, তাহলে কে জিতল? দ্বিতীয় প্রস্তাব সুভাষের, ইংরেজের বিরুদ্ধে অকপট অখণ্ড সংগ্রাম। আর তা এক্ষুণি-এক্ষুণি, এই দণ্ডে, আজকের সূর্য অস্ত যাবার আগেই। যেন ইংরেজ ভারতবর্ষ থেকে রসদ না পায়, সৈন্য না পায়, না পায় অস্ত্রশস্ত্র। কংগ্রেস সংগ্রাম না করে এক কোণে চুপ করে বসে থাকুক, ফরোয়ার্ড ব্লক একাই সংগ্রাম করবে। একাই সমগ্র দেশের প্রাণস্বরূপ ত্রাণস্বরূপ হয়ে উঠবে। তৃতীয় প্রস্তাব জওহরলালের। সর্তাধীন সহযোগিতা। সহযোগিতা করব কিন্তু তার আগে জানতে চাই বিনিময়ে আমাদের কী দেবে? স্বাধীনতা দেবে তো?

জওহরলালের প্রস্তাব গৃহীত হল। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আগে বিশদ করে ব্যক্ত করুক কী উদ্দেশ্যে বা কোন অভিসন্ধিতে সে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। ভারতবর্ষকে সে যদি স্বাধীনতা দিতে অঙ্গীকার করে তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ইংরেজের সহযোগিতা করবে। যদি অঙ্গীকার না করে তাহলে ভারতবর্ষ কী করবে সেই আসল কথাটাই উহ্য রইল।

কদিন বাদে বড়লাটের উত্তর এল। উত্তরে অঙ্গীকারের নামগন্ধও নেই। বলা হল ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়ে বড়লাট একটা পরামর্শ-সভা তৈরি করবে, সে সভাই যুদ্ধের ব্যাপারে বড়লাটকে উপদেশ দেবে, বুদ্ধি জোগাবে। আর হ্যাঁ, ভারতবর্ষকে যথাকালে ডমিনিয়ন-স্টেটাস দেওয়া হবে— আগে যুদ্ধটা থামুক, কাল পরিপক্ব হোক। সেই বস্তা-পচা স্টেটাস! দশবছর আগে যে মন্ত্র প্রথম আওড়েছিল আরউইন! দশবছর ধরে থেকে থেকে যে মন্ত্র শুনিয়ে শান্ত রেখেছে ভুজঙ্গকে। এবার আর সাপ বশে থাকবে না, এবার সে ফণা বিস্তার করবে। ডমিনিয়ন স্টেটাসের বাস্তব চেহারাটি কী। যুদ্ধের নামে মন্ত্রীদের ক্ষমতার সঙ্কোচ, নানাপ্রকার বিধিবন্ধনের প্রবর্তন। সভা-সমিতি বন্ধ, শোভাযাত্রা নিবারিত। যখন-তখন যাকে-তাকে গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে কারারোধ। আর সমস্ত কিনা দেশরক্ষার অছিলায়।

পরিহাসটা উপভোগ করার মত। কার দেশ, কে রক্ষা করে। আর রক্ষা করা কী ভাবে? তাকে আস্টেপৃস্টে বেঁধে, দমন করে, দলন করে। বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ কিন্তু তুমি পরাধীন থাকো। পরাধীন হয়ে রক্ষা পেলেই একদিন, যথাকালে, তোমাকে ডমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হবে। স্বাধীনতা? স্বাধীনতা তোমার জন্যে নয়।

এত ভণ্ডামি যেন কংগ্রেসেরও বরদাস্ত হল না। ওয়ার্কিং কমিটি আটটা প্রদেশের মন্ত্রীসভাকে ডাক দিল পদত্যাগ করতে। গদি ছেড়ে নেমে এস। সহযোগিতার যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়া গিয়েছে। আর ঐ শঠতাকে প্রশ্রয় দিও না।

মন্ত্রীরা গদি ছেড়ে মাটিতে এসে দাঁড়াল। সবাই ভাবল এবার বুঝি আন্দোলনের অজগর

জেগে উঠবে, দিকে দিকে জ্বলবে রোষানল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কংগ্রেসের যেন আর কিছু করণীয় নেই। প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা প্রতিবাদও যেন সে ভুলে গিয়েছে। মন্ত্রীরা যেন ছুটি নিয়ে বেরিয়েছে হাওয়া খেতে।

গান্ধী বললেন, দেশ এখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত নয়।

সহ্য হচ্ছিল না সুভাষের। কত অমূল্য সময় চলে গিয়েছে, কত মুঠো-মুঠো সোনার সুযোগ। সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগে নাকি? সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়াই সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হওয়া। আর যে ঝাঁপিয়ে পড়তে জানে সেই জয়লক্ষ্মীকে আনতে পারে ছিনিয়ে।

এর মধ্যে কত ভারতীয় সৈন্য পাচার করেছে বিদেশে, দেশের ভাণ্ডার থেকে লুট করে নিয়েছে কত ধনসম্পদ। দেব-দিচ্ছি হবে-হচ্ছে এই ধোঁকা দিয়ে কংগ্রেসকে আপসের আফিং খাইয়ে নিস্তেজ করে রেখেছে। কোথাও একটা খড়্গ উদ্যত হল না, না, আমাদের সৈন্যেরা যাবে না তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করতে, না, আমরা কেড়ে নিতে দেব না আমাদের খাদ্য সঞ্চয়। আমাদের বন্ধন ছেদন করবার জন্যে লড়বে, আমাদের সম্বলে আমাদের সম্পদে আমাদের অধিকার। তোমরা নিপাত যাও। তোমরা উৎখাত হও।

গদিয়ান কোনো নেতাই ডাক দিল না। গদি-ছুট মন্ত্রীরা চরকা কাটতে বসল। আপস না পাপোষ! চরণছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ। আহা, তুমি আছ তাই আমি আছি। তোমার এই দুঃসময়ে তোমাকে বিব্রত করা কি আমার ঠিক হবে? আমি স্বাধীনতাবর্জিত হয়েছি বলে কি সুনীতি বর্জিত হব?

একমাত্র জাগ্রত উত্থিতপুরুষ সুভাষ। যার স্বাধীনতা নেই তার স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সংগ্রামই একমাত্র সুনীতি। আর সংগ্রামে ছল বল কৌশল সমস্ত কিছুই বৈধ উপায়। সুভাষ তার ফরোয়ার্ড ব্লক নিয়ে আন্দোলনে নামল। স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশকে চাইল উদ্বুদ্ধ করতে। আপসের নেশা কাটিয়ে, ধরিয়ে দিতে চাইল আগুনের নেশা। ফরোয়ার্ড অর্থই আগুয়ান। পৃথিবীতে সবচেয়ে আগুয়ান কে? একমাত্র আগুনই আগুয়ান। আগুনই সর্বভুক। সর্বভুক আগুনের কোনো দোষ নেই। তেমনি আবার জয়াকাঙ্ক্ষার মধ্যেও কোনো আপস নেই কোনো বিরতি নেই, নেই কোনো নীতির দুর্বলতা।

নাগপুরে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী সভা ডাকল সুভাষ। কংগ্রেসী মনোভাব অর্থাৎ সহযোগিতার মনোভাবকে ধিক্কার দিল শতমুখে। এযুদ্ধে ইংরেজকে জিতিয়ে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম করা। পায়ের শৃঙ্খলে আঘাত না হেনে নিজের পায়ের গোড়ায় কুড়ুল মারা। ইংরেজ কবে তার কথা রেখেছে? যুদ্ধজয়ের পর তার গ্রাসের থাবা আরো দৃঢ় আরো বিস্তৃত করবে। তার যদি কিছু সুনীতি থাকে তবে সে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে দিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষকে ডাকুক না তার কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে, বিশ্বের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে। তা নয়, ইংরেজের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষকে তার বুটের তলায় রাখা। Shoe-নীতিই তার একমাত্র সুনীতি।

কিন্তু আর নয়, ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার একমাত্র ভারতবাসীর। এই প্রবল পবিত্র অগ্নিমন্ত্রের উদ্গাতা সুভাষ। All power to the Indian people —সমস্ত শক্তির আধার ভারতবাসী, সমস্ত শক্তির প্রয়োগ-নিয়োগ ভারতবাসীর হাতে। আর এই ভারতবাসীর মধ্যে হিন্দুমুসলমান নেই। আমরা সকলে এক আকাশের নিচে, এক মাটির সমতলে, এক নিশ্বাসবায়ুর শরিক।

ছমাস পরে ১৯৪০ এর মার্চে রামগড়ে কংগ্রেস বসল। কংগ্রেস-নগরের নাম হল মাজহার-নগর। সভাপতি আবুল-কালাম-আজাদ। সহকারী রাজেন্দ্রপ্রসাদ। কংগ্রেস-নগরের পাশেই বসল নিখিল ভারত আপস-বিরোধী-সম্মিলন। সভাপতি সুভাষ, সহকারী কিষাণ-নেতা সহজানন্দ। কংগ্রেস সক্রিয় কোনো পন্থার নিরূপণ করল না, শুধু নিষ্ফল বাক্যব্যয়ে নিজেকে ক্ষয় করতে লাগল। আন্দোলন শুরু করবেন কবে? অস্থির জনতা ঘিরে ধরল গান্ধীকে। গান্ধী স্মিতমুখে বললেন, যখন তোমরা তৈরি হবে।

আপনারা কি তৈরি? নাকি আপনারা এখনো দ্বিধাগ্রস্ত? যদি আপনারা সংগ্রামে রাজি থাকেন, যদি গয়ংগচ্ছ ভাবকে আর প্রশ্রয় দিতে না চান তবে হাত তুলুন—প্রতিজ্ঞার হাত, প্রতিরোধের হাত, কারাগারের অর্গলমোচনের হাত। বিরাট জনতা হাত তুলে সোল্লাসে সমর্থন জানাল। আমরা স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতাই আমাদের ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার পানীয়। আর স্বাধীনতা মীমাংসায় মেলে না, জিঘাংসায় মেলে। যে বস্তুর যে দাম, যে সাধনের যে প্রণালী। 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব।' ওরা যদি ওদের স্বাধীনতার জন্যে লড়তে পারে, বিরাট জনতা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, আমরাও লড়ব আমাদের স্বাধীনতার জন্য। আমাদের রক্ত কিছু কম লাল নয়।

সম্মিলনে সাব্যস্ত হল আগামী জাতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ ১৯৪০-এর ৬ থেকে ১৩ এপ্রিলে ফরোয়ার্ড ব্লক সক্রিয় আন্দোলনে নামবে—আইন অমান্য আন্দোলন। যেমন কথা তেমন কাজ। দেশময় শুরু হল আইনের অমাননা। গভর্নমেণ্টও আপসের ভঙ্গিতে বসে না থেকে শুরু করল ধরপাকড়, নির্জলা লাঠিচার্জ। আন্দোলন যাতে বিস্তৃত না হতে পারে শুরু করল বিনা বিচারে আটক করা। কিন্তু আশ্চর্যের আশ্চর্য, সুভাষকে ধরছে না এখানো।

কংগ্রেস পড়েছে মহাফাঁপরে। তার আওতার বাইরেও এ যে দেখি বিপুল আন্দোলন গড়ে উঠেছে—যেমন আয়তনে তেমনি তাৎপর্যে। এ যে দেখি আইনের অমাননার চেয়েও বেশি কংগ্রেসের অবমাননা। গান্ধী সুভাষকে ডেকে পাঠালেন।

সুভাষকে নতুন বিশেষণ দিয়েছিলেন গান্ধী—'Spoilt Child' বা বখাটে ছেলে। এখন দেখলেন সেই বখাটে ছেলে সমস্ত দেশকেই শুধু বিকিয়ে দিচ্ছে না, কংগ্রেসকেই বোকা বানিয়েছে।

গান্ধীব কিছু বলবার আগে সুভাষই বললে, 'আপনি আসুন, নামুন আমাদের পুরোধা হয়ে। ফ্রান্সের পতন হয়েছে, জার্মান সৈন্য ঢুকে পড়েছে প্যারিসে। শিগগিরই এমনি একদিন লণ্ডনে ঢুকে পড়বে, পতন হবে বৃটেনের। এখুনিই প্রবলতর আন্দোলনে নেমে পড়া দরকার। আপনি আসুন।'

গান্ধী শান্তমুখে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'আন্দোলনের জন্যে দেশ এখনো তৈরি হয়নি। এখন আন্দোলন চালাতে গেলে আমাদের লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভবনা বেশি।'

তার অর্থ সুভায যে আন্দোলনে নেমেছে তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। সুভাষ তা মানতে রাজি নয়। তার অগ্রগামিতায় যতিপাত নেই

সুভাষকে গান্ধী আশীর্বাদ করলেন। এই অপ্রতিরোধ্য প্রাণশক্তিকে সম্বর্ধিত না করে বুঝি থাকা যায় না। বললেন, 'তোমার চেষ্টার ফলে দেশে যদি স্বাধীনতা আসে তবে আমিই টেলিগ্রামে প্রথম তোমাকে অভিনন্দন পাঠাব।'

না, এর মধ্যে ব্যঙ্গের স্পর্শ ছিল না, ছিল বুঝি বা একটু অভিমানের স্পর্শ। গান্ধী বলছেন, 'সুভাষকে আমি চিরদিন ছেলের মতই দেখেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি সে আমাকে

আর ভালোবাসে না। অবশ্য কংগ্রেস থেকে তার বিতাড়নের সঙ্গে যে আমি জড়িত, সে দুঃখ আমার কম নয়।' পরে আবার বলছেন, 'আমার ভালোবাসা গোলাপের পাপড়ির মত কোমল আবার তা ইস্পাতের মত কঠিন।'

সুভাষের আন্দোলন বাধা মানল না।

তারপর এল করপোরেশানের ইলেকশান। সুভাষ আরেক অসাধ্যসাধন করল—ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে মুসলিম লিগের মিতালি ঘটাল। নাম হল করপোরেশান প্যাক্ট। হিন্দু-মুসলমান সমান-সমান, প্রত্যেকে সমান। দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রেতকে সমাধিস্থ করল সুভাষ। দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্টের পর সুভাষের এই করপোরেশান প্যাক্ট। সমান ভিত্তিতে সুষম সমাধান। জিন্নার মুসলিম রাষ্ট্র নয়, নয় বা সাভারকারের হিন্দু রাষ্ট্র—এ হচ্ছে ভারতবাসীর ভারতবর্ষ। প্রীতিতে সমানধর্ম। মানুষের সমাজতন্ত্র।

যে ভিত্তিতে আই-এন-এর প্রবর্তন। বন্দোমাতরম নয় ; আল্লা হো আকবর নয়—আসমুদ্র হিমাচল জয়হিন্দ!

ইলেকশানে জয়লাভের পর মেয়র হল সিদ্দিকি, আর সুভাষ হল অলডারম্যান। এবার হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে সমান শক্তিতে লড়তে পারবে সমান-শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে।

দেশের নানা কোটর থেকে বিষাক্ত বিক্ষেপ শুরু হয়েছে—সুভাষ নাকি মুসলমানের গোলামি করছে! সুভাষ গর্জে উঠল : ইংরেজের গোলামি নির্মূল করতে আমাকে যদি আমার ভাইয়ের গোলামি করতে হয় তাতে আমি হাজারবার রাজি।

হিটলার যে যুদ্ধে জিতছে তাতে যে সুভাষের আনন্দ সেটা হিটলারের জয়ের জন্যে নয়, ইংরেজদের পরাজয়ের জন্যে। যেমন করের হোক ইংরেজকে সরাও, ইংরেজকে তাড়াও, ইংরেজকে পর্যুদস্ত কর।

ওদিকে ইংল্যাণ্ড বিপরীতধর্মী রাশিয়ার সঙ্গে হাত মেলাতে পারবে কিন্তু ভারতবর্ষকে কবলমুক্ত করবে না। আমাকে বন্দীদশা থেকে বাঁচাও বলে চেঁচাবে কিন্তু নিজে তার ঘরের বন্দীকে বাঁচাবে না। এ দুর্নীতিপরাণকে আগে উচ্ছেদ করো। ওর উচ্ছেদ ছাড়া মুক্তি নেই। ও শুধু হাত তুলে নিলে হবে না, ও শুধু পাশ ফিরে শুলে হবে না, ওকে ছুঁড়ে আরব সাগরের ওপারে ফেলে দিতে হবে। যে কোনো মূল্যে যে কোনো পদ্ধতিতে যে কোনো চাতুরীতে স্বাধীনতা।

ভারতবর্ষের জন্যে বিরাট সংবাদ আছে।

গত ১৩ই মার্চ বিলেতে তরুণ পাঞ্জাবী উধম সিং-এর গুলিতে মাইকেল ও-ডায়ার নিহত হয়েছে। উনিশশো উনিশ সাল থেকে প্রতিশোধের আগুন বুকে করে পুষে রেখেছে উধম সিং। কুড়ি বছরেও সে তা নিভতে দেয়নি। ব্যাক্সটল হলে ও-ডায়ার বক্তৃতা দিতে এসেছে—লর্ড জেটল্যাণ্ড সভাপতি। বক্তৃতার বিষয় আফগানিস্থান।

এশিয়ার দেশসমূহ সম্বন্ধে যেন কতবড় বিজ্ঞ এমনি ভাব করে মুরুব্বিয়ানার সুরে বক্তৃতা দিচ্ছে! নরখাদক পিশাচ কোথাকার! দেশে ফিরলে ইংরেজরা তাকে তার হত্যাকীর্তির জন্যে কুড়ি হাজার পাউণ্ডের তোড়া উপহার দেয়। তোড়া পেয়ে নির্লজ্জটা হাসে! নাও আরো কটা পাউণ্ডের তোড়া নাও। উধম সিং এগিয়ে এসে ও-ডায়ারকে লক্ষ্য করে ছ-ছটা গুলি মারে। সভা তখন ভাঙনের মুখে, পালাতে গিয়েও পালাতে পারল না উধম সিং। ধরা পড়ল।

'ও-ডায়ারকে পড়ে যেতে দেখেছি। আচ্ছা জেটল্যাণ্ডও কি পড়েছে? আমি তো ওকে লক্ষ্য করেও গুলি ছুঁড়েছিলাম। সে কী, পড়েনি? পড়া উচিত ছিল।'

কোর্টে ফাঁসির হুকুম পেয়ে উধম সিং বললে, 'জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিশোধ নিতে পেরে আমি কৃতার্থ। দেশের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারার মত গৌরব আর কিছুতে নেই। হ্যাঁ, এটাও আমার দেশেরই জন্যে যুদ্ধ। বুড়ো হয়ে রোগে ভুগে মরার চেয়ে এমনি ভরা প্রাণে মরার মধ্যে অনেক আনন্দ।'

কিন্তু কংগ্রেস এখনো রণবিমুখ। এখনো নীতিস্থিত। জওহরলাল বলছে: ইংলণ্ড যখন জীবন-মরণ যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন তার বিরুদ্ধে আইন-অমান্য আন্দোলন করা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্মান হানিকর।

ইতিমধ্যে বিলেত থেকে এসে গিয়েছে ক্রিপ্‌স। শুরু হয়েছে কুমন্ত্রণা। অসার কথার কচকচি। আকালে নেতা আবার মাকালে আকৃষ্ট হয়েছেন। জুলাই মাসে পুনরায়ও কংগ্রেসীদের মুখে সেই পুরোনো কথারই পুনরাবৃত্তি—শুধু যা একটু বচন বিন্যাসের হেরফের। বললে, আমাদের দেশরক্ষার জন্যে তোমাদের যুদ্ধে আমরা সক্রিয় সাহায্য করছি, কিন্তু বলো, প্রতিশ্রুতি দাও, আমাদের স্বাধীনতা দেবে।

আমাদেরই হোক বা তোমাদেরই হোক, যে কোনো দেশরক্ষার সক্রিয় সাহায্যে বদ্ধপরিকর হওয়া তো হিংসাকেই পালন-পোষণ করা—গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। তাঁর মতে এখন শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে চরকা কাটা আর হরিজনকে পরিজন ভেবে সেবা করা।

অস্থির হয়ে উঠেছিল সুভাষ। মিথ্যা অন্ধকূপ হত্যার কলঙ্কিত নিদর্শন হলওয়েল মনুমেণ্ট ধ্বংস করার আন্দোলনে সুভাষ দেশবাসীকে ডাক দিল। হিন্দু-মুসলমান একসূত্রে গাঁথা পড়ল। দেশের ঐ অলীক অখ্যাতি মুছে ফেল। ইতিহাসকে কলঙ্কমুক্ত করো। তেসরা জুলাই সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি দিবস। ঠিক হল ঐদিনই সুভাষের অভিযান শুরু হবে।

অভিযানে হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়েছে, গভর্ণমেণ্ট প্রমাদ গুনল। হিন্দু-মুসলমান যাতে মিলতে না পারে, না পারে একই মঞ্চে পাশাপাশি দাঁড়াতে, তাঁরই জন্যেই তো তাদের আপ্রাণ চেষ্টা, তাদের যতসব অধম চাতুরী। সুভাষ যে সেই চাতুরী বানচাল করতে বসেছে। কোত্থেকে খুঁজে এনেছে হলওয়েল মনুমেণ্ট। অসম্ভব, এই আন্দোলন স্তব্ধ করো। গ্রেপ্তার করো সুভাষকে।

অভিযানের একদিন আগে দোসরা জুলাই পুলিশ গ্রেপ্তার করল সুভাষকে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য জিন্দাবাদ। বিরাট প্রতিবাদ-সভা হল এ্যালাবার্ট হল-এ। সুভাষ বোসের মুক্তি চাই। ভেঙে ফেল হলওয়েল। মুসলিম-ছাত্ররাই আন্দোলনের অগ্রণী হল। খ্যাপা পুলিশ ছাত্রদের লাঠিচার্জ করলে। করলে বেপরোয়া ধরপাকড়। আগুন লেগে গেল ছাত্র সমাজে। গভর্নমেণ্ট ঢোঁক গিলে বিবৃতি দিলে—হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করা হবে। ছাত্ররা ক্ষান্ত হও শান্ত হও। শুধু মনুমেণ্টই দূরীকৃত হল না, বন্দীদেরও ছেড়ে দেওয়া হল একে-একে। কিন্তু সুভাষকে নয়, কখনোই নয়। সে যে নতুন মন্ত্রের উদ্গাতা—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলন। যদি হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়ে লড়তে পারে তবে স্বাধীনতা পলকের অর্জন, করতলে আমলকি।

এ হেন নেতা, শুধু পথপ্রদর্শক নয়, পরিচালক, গভর্নমেণ্টের পক্ষে ভয়াবহ। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। সে আপাদমস্তক রাজদ্রোহী। অতএব তাকে থাকতেই হবে কারাপ্রাচীরের কঠিন অবরোধের মধ্যে। তার ত্রাণ নেই।

সবচেয়ে আশ্চর্য দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সভা বসল তাতে সুভাষের গ্রেপ্তার

হবার বিষয়টা উল্লিখিতও হল না। প্রতিবাদ করা দূরের কথা, একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলল না কর্তারা। এটা কেমন ব্যাপার হল দিল্লি থেকে ওয়ার্ধায় ফিরে এলে জিজ্ঞেস করা হল গান্ধীকে। গান্ধী বললেন, সুভাষ তো আর কংগ্রেসের অনুমতি নিয়ে আইনের বিরুদ্ধতা করেনি, সে তো বীরের মত ওয়ার্কিং কমিটিরই বিরুদ্ধতা করেছে।

সুভাষ জেলে বসে দিন গুনতে লাগল। কিন্তু, না, এভাবে জেলের মধ্যে বসে-বসে দিনক্ষয় করা যায় না। যে করে হোক, জেল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বেরিয়ে যেতে হবে দেশের বাইরে। কে না জানে সমগ্র দেশই বৃটিশের কারাগার। সুভাষ উপলব্ধি করল এ যুদ্ধে ইংরেজের হার অবধারিত। শুধু হারবে না তার সাম্রাজ্য খসে পড়বে। তবু সেই মরণদশায় পৌঁছেও সে স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে না। স্বাধীনতার জন্যে ভারতবর্ষকে সব সময়ই সংগ্রাম করতে হবে। তাই ইংরেজের এই মরণদশায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সহজ হবে যদি ভারতবর্ষ ইংরেজের শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলায়। সুতরাং যে ভাবেই হোক খোলাতে হবে জেলের দরজা। পরের কথা পরে। আগে একবার তো বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু কিভাবে বেরুবে? সংকল্প ছাড়া সুভাষের আর অস্ত্র কী! একাগ্রতাই তার তীক্ষ্ণতা। আত্মবিশ্বাসই তার দুর্ভেদ্য কাঠিন্য।

যুদ্ধের পর এক বছর কেটে গেল সহযোগিতার পুরস্কার কী পেল কংগ্রেস? লজ্জার কথা, পেল শুধু একটা শূন্যগর্ভ ক্রিপস মিশন। যুদ্ধান্তে সেই ডমিনিয়ন স্টেটাসের ভাঁওতা। কংগ্রেসের এবার টনক নড়ল। বম্বেতে বসল কমিটির সভা। আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সত্যাগ্রহ শুরু করা যাক। উপায় নেই, গান্ধীকেই ডাকো অন্দোলনের নেতা হতে।

গান্ধী ডাক উপেক্ষা করতে পারলেন না, ফিরে এলেন নেতৃত্বে। সত্যাগ্রহ প্রবর্তন করলেন— দলবদ্ধ নয়, একক সত্যাগ্রহ। জনগণের উত্তাল ঢেউ উঠে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, একজন-একজন করে আইন ভাঙবে আর ধীরে পায়ে জেলে যাবে। প্রথম সত্যাগ্রহী বিনোভা ভাবে। তিনি সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করলেন: লোক দিয়ে বা টাকা দিয়ে বৃটিশের যুদ্ধকে সাহায্য করা অন্যায়। যুদ্ধের একমাত্র প্রতিকার অহিংসা রীতিতে যুদ্ধকে প্রতিরোধ করা। ভাবে-কে গ্রেপ্তার করা হল, বিচারে জেল হল তিন মাস।

এভাবে দেশ স্বাধীন হবে? এ একটা প্রহসন ছাড়া আর কী। এক বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি জন জেলে যাবে তাতে তেত্রিশ কোটি মানুষের মুক্তি তো হাজার বছরেও হবে না। দ্বিতীয় গ্রেপ্তার জওহরলাল। বিচারে তার জেল হল চার বছর। তৃতীয় বন্দী সর্দার প্যাটেল। তার কয়েদ অনির্দেশ্য কালের জন্য। গ্রেপ্তার বা বিচারের পর জনসাধারণ না কোনো বিক্ষোভ দেখায়—কঠোর নির্দেশ জারি করলেন গান্ধী। বিক্ষোভ বা হিংসাশ্রয়ী কোনো উত্তেজনা দেখা দিলেই তিনি তুলে নেবেন সত্যাগ্রহ। চতুর্থ বলি বম্বের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খের। পঞ্চমে কে নির্বাচিত হন কে জানে? অধৃষ্য সুভাষ অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। এত মন্থরতা যেন সে সহ্য করতে পারছিল না। শুধুই ধূমায়ন, অতৃপ্ত শিখায় প্রজ্বলন হবে না?

স্টেটসম্যান পত্রিকা Crauk's corner বা পাগলের আস্তানা বলে একটা ব্যঙ্গাত্মক বিভাগ খুলেছে। তাতে শুধু সত্যাগ্রহ ও সত্যাগ্রহীদের খবর। রং-তামাসা।

সত্যি-সত্যি সমস্ত দেশ যদি পাগল হয়ে যেতে পারত!

কিন্তু সুভাষ কী করবে? কী করে জেলের দেয়াল ডিঙোবে?

জেলে থেকেই সুভাষ কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। সেই খাতিরে গভর্নমেন্ট

তাকে ছেড়ে দেবে এমনি আশা করো? কদাচ না। যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন তারা তাকে বন্দী রাখবে। পচিয়ে মারবে। যুদ্ধের পরে যখন স্থিতাবস্থা ফিরে আসবে তখন দেখা যাবে কাকুতি মিনতিতে সুভাষকে ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা।

স্থিতাবস্থা? সুভাষ মরীয়া হয়ে উঠল।

গভর্নমেণ্টকে এক চরমপত্র দিয়ে বসল। লিখলে, আমাকে বন্দী করে রাখতে গভর্নমেণ্টের কোনো অধিকার নেই, না ন্যায়ে, না বা আইনে। যদি পত্রপাঠ গভর্নমেণ্ট আমাকে মুক্তি না দেয় আমি আমরণ অনশন করব। যদি জীবিত না বেরুতে পারি মৃত হয়ে বেরুব। কোনো প্রাচীর বা শৃঙ্খল কোনো পর্বত বা সমুদ্র আমাকে রুখতে পারবে না।

গভর্নমেণ্ট হাসল। এ এক বালসুলভ চপল পাগলামি। খবরটা স্টেটসম্যানের Crauk's Corner-এ স্থান পাবার মত।

কিন্তু খবর শুনে সারা দেশ বজ্রাহত হয়ে রইল—পেশোয়ার থেকে মান্দালয়। বৃটিশের কারাগারে সুভাষ অনশনে প্রাণ দেবে?

হোম-মিনিস্টার নাজিমুদ্দিন সুভাষের মেজদা শরৎবাবুকে অনুরোধ করলেন, সুভাষকে প্রতিনিবৃত্ত করুন। অনশন নিরর্থক। সরকার তাকে ছাড়বে না, পারে না ছাড়তে।

আটাশে নভেম্বর রাত্রে শরৎবাবু সুভাষের কারাকক্ষে এসে সুভাষের সঙ্গে দেখা করলেন। জানালেন সরকারী বক্তব্য।

কিন্তু সুভাষ টলল না এক চুল। পর্বত টলুক, সুভাষ টলবে না। মনে সংকল্প করবে, বাক্যে উচ্চারণ করবে, কর্মে তা সুসিদ্ধ করবে—সুভাষের এই মন্ত্র। পরদিন ১৯৪০-এর ২৯শে নভেম্বরের প্রত্যূষ থেকে সে অনশন শুরু করল। খবর শুনে সমস্ত দেশ—পেশোয়ার থেকে পেগু—স্তব্ধ হয়ে গেল। আমাদের সুভাষ অনশনে প্রাণ দেবে আর আমরা স্থির থাকব সুস্থ থাকব?

সাতদিনের অনশনেই গভর্নমেণ্ট হিমসিম খেল। সুভাষের শরীর ভালো নয়, যদি সত্যি না বাঁচে? সে প্রতিজ্ঞায় এমন ধনুর্ধর যে শারীরিক কোনো ক্লেশের কাছেই সে পরাভূত হবে না। ঠিক মৃত্যুকে বরণ করে নেবে। তখন জলতরঙ্গ কে প্রতিরোধ করবে? তখন কেউ জানবে না হাঁটি হাঁটি পা-পা করা একক সত্যাগ্রহ। কারার লৌহ-কপাট লোপাট করে দেবে। দরকার নেই আর গোঁয়ারতুমি করে। ছেড়ে দাও আপাতত। গৃহবন্দী হয়ে থাকুক।

পাঁচুই ডিসেম্বর সুভাষকে মুক্তি দেওয়া হল। সে তার এলগিন রোডের বাড়িতে ফিরে যাক। সেখানে গিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিক। শরীর সারলে আবার না কোন ধরা যাবে! তাছাড়া সাতাশে জানুয়ারি তার মামলার দিন। যেদিন শুনানি সেদিনই রায়। শ্রীমান আবার শ্রীঘরে।

বাড়ির সদরে-খিড়কিতে সশস্ত্র প্রহরী—দিন-রাত সজাগ। তাছাড়া পথচারীর সাদা পোষাকে অনেক গুপ্তচর। লোকের আনাগোনা নিয়ন্ত্রিত, পরীক্ষিত। ভয়-ভাবনার কিছু নেই। নিরীহ ভালোমানুষের মত সুভাষ এখন থাকুক গৃহাশ্রিত হয়ে। হ্যাঁ, এখন গৃহই সুভাষের আশ্রম। সে আশ্রমে নিশ্চল মৌনে সে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন। নিঠুর নিদারুণ তপস্যা। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া কেউ তাকে এক পলক দেখতে পারছে না, কারু সঙ্গে তার কথা নেই এক বিন্দু। নিশ্চিদ্র স্তব্ধতায় নিগূহিত নির্জনে সে এখন যোগাসীন। একাগ্রতাই তার যোগ, আর দেশের মুক্তিই তার ব্রহ্মপদ।

সতেরোই জানুয়ারি ১৯৪১ রাত প্রায় দেড়টার সময় এলগিন রোডের বাড়ি থেকে একখানা

গাড়ি বেরুল অতর্কিতে। এগিয়ে চলল, চলল এগিয়ে। সতেরোই জানুয়ারি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম—ইতিহাসের রক্তাক্ষর দিন নয়? সেই দিনেই সুভাষের যাত্রা শুরু হল। সেই স্বাধীনতার জন্যে। এলগিন রোডের বাড়ি নদিন চেপে রাখল খবরটা। তার ছাব্বিশে জানুয়ারি সেই স্বাধীনতা দিবসে খবরটা রাষ্ট্র করা হল— সুভাষকে পাওয়া যাচ্ছে না। সুভাষ নিরুদ্দেশ।

ততদিনে সুভাষ কাবুলে পৌঁছে গিয়েছে।

তারপর গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হল গতকাল দমদম বিমানবন্দর থেকে যে জাপানী বিমান উড়েছে তাতে কে এক রহস্যময় যাত্রী ছিল। সেই তবে সুভাষ। কেউ বললে, একখানা জাপানী জাহাজও কাল রাত্রে হঠাৎ নোঙর তুলেছে। তবে সুভাষ কি জাপানে গেল?

সা চাতুরী চাতুরী। সে চাতুরী দ্বারা ইহকাল ও পরকাল দুই কালই গুছোনো যায় সেই আসল চাতুরী। যে চাতুরী দ্বারা নিজেও বেরিয়ে পড়তে পারে আর পুলিশকেও নির্জলা ধোঁকা দিতে পারে স্বাধীনতার সাধনায় সেই আসল চাতুরী। এই গুজবের ফলে হন্যে হওয়া পুলিশ শুধু পূব সীমান্তেই খোঁজ-তালাস চালাল। পশ্চিম-সীমান্ত পরিষ্কার।

গভর্ণমেণ্টে হাহাকার পড়ে গেল। সিংহকে খাঁচায় পুরেও রাখা গেল না। কে জানে এ সিংহ বুঝি খাঁচার চেয়েও বড়। এত সব সান্ত্রী-রক্ষী মন্ত্রী-তন্ত্রী পাহারাদার টহলদার এত সব গূঢ়চর-গুপ্তচর—সবাইকে বোকা বানিয়ে দিল। ওরা করছিল কী? ঘুমুচ্ছিল, না বেড়াতে গিয়েছিল? গেল কখন? কোথায় গেল?

মহাত্মা গান্ধী শরৎবাবুকে তার করলেন: সুভাষ সম্পর্কে চমকপ্রদ সংবাদ। সত্য কী, জানান। চিন্তিত।

শরৎবাবু উত্তর দিলেন: সুভাষ কোথায় সমগ্র জনসাধারণের মত আমরাও অজ্ঞ। ঠিক কখন চলে গেল এবং কী তার উদ্দেশ্য কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তিন দিন ধরে যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো খবর নেই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইঙ্গিত করছে— সন্ন্যাসগ্রহণ।

রবীন্দ্রনাথও তার পাঠালেন: সুভাষের অন্তর্ধানের সংবাদে ভীষণ উদ্বিগ্ন আছি। মাকে আমার সমবেদনা জানাবেন। দয়া করে যা সংবাদ পান আমাকে জানাতে দেরি করবেন না।

শরৎবাবু উত্তর দিলেন: 'আপনার বার্তা মাকে ও আমাদের সকলকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। গত কয়েকদিনের আপ্রাণ চেষ্টায়ও সুভাষের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু যেইখানেই সে থাকুক আপনার আশীর্বাদ থেকে সে যেন কোনোদিন বঞ্চিত না হয়।'

কিন্তু কোথায় সুভাষ? সুভাষ কোথায়?

দেশজোড়া এই এক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা—হয়তো বা সকরুণ আর্তনাদ: সুভাষ কোথায়? কোথায় সুভাষ?

দুই

আঠারোই জানুয়ারি মধ্যরাত্রে সুভাষ গোমো স্টেশনে পৌঁছে দিল্লী-কালকা মেলে চেপে পেশোয়ারে যাত্রা করল।

পেশোয়ারের ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা আকবর শা-র সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করা হয়েছে। সে যেন একজন বিশ্বস্ত ও ওয়াকিবহাল সহচরের জোগাড় রাখে। সমস্ত ঘটনার চালক ও নিয়ামক ভগবান। ভগবানই ডেকেছেন এই দুর্গম ও দুরারোহের পথে, সঙ্কটে ফেললেও তিনিই আবার নিষ্কণ্টক করে দেবেন। তাঁর দেওয়া জ্ঞান তাঁর দেওয়া শক্তিতে সমাধা করতে চলেছি।

পরনে মৌলবীর ছদ্মবেশ। আঁটসাঁট পায়জামা, শেরওয়ানি আর ফেজ। সব চেয়ে যেটা বেশি মানিয়েছে সেটা তার লম্বা দাড়ি। এই দাড়ি লাগাতে গিয়েই সুভাষের বেরুতে দেরি হল। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট—রাতটা কাটল নিরিবিলি। পরদিন সকালে এক শিখ ভদ্রলোক গাড়িতে উঠলেন ও গায়ে পড়ে উর্দুতে আলাপ শুরু করলেন।

'আপনি কদ্দূর যাবেন?'

হাতে-ধরা খবরের কাগজের উপর চোখ রেখে নির্লিপ্ত স্বরে সুভাষ বললে, 'রাওয়ালপিণ্ডি।'

'সেখানে কী কাজ?'

'ইনসিওরেন্স। আমি ইনসিওরেন্সের অর্গানাইজার।' খবরের কাগজে যেন কত আকাঙ্ক্ষা এমনি অভিনিবেশে চোখ আনত রাখল সুভাষ।

'ইনসিওরেন্সের কাজে আপনাকে এখানে-ওখানে ঘুরতে হয়?'

'হুঁ!' এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর আর কী হতে পারে?

'আপনার দেশ কোথায়?'

সুভাষের সাফ জবাব: 'লখনউ।'

'আপনার নাম কী জানতে পারি?'

স্পষ্ট কথার কষ্ট নেই। সুভাষ স্পষ্ট বললে, 'আমার নাম জিয়াউদ্দিন।'

শিখ ভদ্রলোক আর কথা বাড়াতে পারলেন না। প্রতিপক্ষ যদি একটাও পালটা প্রশ্ন না করে তা হলে আলাপ জমে কী করে?

সারা দিন কী স্তব্ধ উৎকণ্ঠায় কেটেছে। সমস্ত পথই যেন যোগ। সর্বক্ষণ ঈশ্বরমগ্নতা। তিনিই সর্ববিপদ আচ্ছাদন করবেন এই দৃঢ়বিশ্বাস। মনোযোগে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য না আসে—সর্বক্ষণের সতর্কতা। এই তো অব্যর্থকালত্ব। মৌলবি জিয়াউদ্দিন। আয়নাতে নিজের মুখ দেখে চিনতে পারছে না সুভাষ, অন্যে পরে কা কথা। তবু ট্রেন থামলে বাইরের দিকে মোটেই তাকাচ্ছে না সুভাষ, কাগজে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। নাড়ি ছাড়লে ফের সহজ বিশ্বাস।

জিয়াউদ্দিন! রাসবিহারী বসুও কত ছদ্মনাম নিয়েছিল, ধরেছিল কত ছদ্মবেশ। কখনো পাঞ্জাবি, কখনো গুজরাতি, কখনো বাঙালিবাবু, কখনো একেবারে ফিটফাট সাহেব। সব ভাষাতেই অভ্যস্ত। কথা শুনে কে বলবে এ তার আজন্মের ভাষা নয়। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, আয়তসুন্দর চক্ষু। লেলিহান আগুন বললে বোঝানো যাবে না— এ এক অনিরুদ্ধ প্রভঞ্জন। আগুন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বিস্তীর্ণ হয়, প্রভঞ্জন দেশের সীমান্ত পেরিয়ে ছুটে যায়। রাসবিহারী তেমনি জাপানে চলে গিয়েছে।

হ্যাঁ, দেরাদুনের সেই ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সামান্য হেডক্লার্ক। উনিশ শো বারো সালের ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট হার্ডিঞ্জ হাতি চড়ে শোভাযাত্রা করে দিল্লিতে ঢুকছেন, চাঁদনিচকের মাঝামাঝি এক বোমা এসে পড়ল ঠিক হাওদার উপর। বড়লাট আর তাঁর পিছনে ছাতিধরা জমাদার মহাবীর সিং-এর মাঝখানে। পিঠে রক্তাক্ত আঘাত পেলেও বেঁচে গেলেন হার্ডিঞ্জ। সেই থেকে রাসবিহারী পলাতক। তাকে এই লাটমারা ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, কারণ যে-বোমাটা ফেটেছে সেটা সিগারেট-টিনের বোমা—আর এই সিগারেট-টিনের বোমা বাঙালি বিপ্লবীদের উদ্ভাবন। দেখতে মনে হবে নিরীহ সিগারেটের টিন, গায়ে-আঁটা ল্যাবেলটা পর্যন্ত নিখুঁত, হাতে করে বইছে মানে লোকটা কড়া সিগারেটখোর, সঙ্গের দেয়াশলাইয়েও সেই ইঙ্গিত। আর দরকার হলে, গুরুজন দেখলে, টিনটা কোন না জামার পকেটেও লুকোনো

যায়।

উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাঙলার বিপ্লব-সেতু রাসবিহারী। সে শুধু সংযোজক নয়, সে চালক-পালক। সমস্ত উত্তর-ভারতে বিপ্লবের উত্তাপ সে-ই জীইয়ে রেখেছে। তার মতে স্বদেশের শত্রুকে নিধন করা ধর্মীয় কর্তব্য। গীতাই বলো বেদই বলো কোরাণই বলো সব ধর্মই স্বদেশের শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। এই যে চুনোপুঁটিদের ছেড়ে জাঁদরেলদের মাথায় এসে বাজ পড়ছে, তার মানে ভারতবর্ষের ভবিতব্যের ভার ভগবান নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। বারে বারে এইসব বোমা-ফাটানোর অর্থ কী? বারে বারে ব্যর্থ হলেও একেবারে নিষ্ফল নয়,—বলছে রাসবিহারী। এ শুধু দেশবাসীকে জাগিয়ে রাখা, বুঝিয়ে দেওয়া, আমরা বিদেশী শাসনের অধীনে কী অসহ্য অপমানে দিন কাটাচ্ছি। সমবেদনার সমচেতনায় সমগ্র দেশ একদিন উত্থিত হবে, আর সেই উত্থানই হবে উন্মুক্ত বিপ্লব—বৃটিশ প্রভুত্ব ডুবে যাবে অতলে।

লাট-মারা মামলার আসামীকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এমন একটা ঘোষণা একটা কাকপক্ষীকেও প্রলুব্ধ করতে পারল না। কে আসামী, কোথায় আসামী? পুলিশ উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরতে লাগল। ঠাট বাট বজায় রাখতে এক-ওকে ধরে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইনের খোপে ফেলে খাপ খাওয়াতে পারে না।

রাসবিহারীর নামে হুলিয়া বেরুল, তার যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর ছিল গভর্নমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করল, কিন্তু কোথায় রাসবিহারী? সে কখনো লাহোরে, কখনো কাশীতে, একবার তো কলকাতায় ধর্মতলা পোস্ট অফিসের দোতলায়। ছদ্মবেশের নানা কৌশলে পুলিশকে সে অনবরত ধোঁকা দিচ্ছে অথচ তার রাসলীলা হ্রাস পাচ্ছে না, এখানে-ওখানে বোমা ফাটছে, চলছে সহিংস সঙ্ঘর্ষ। পুলিশ নাজেহাল। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সের যুবক ফর্সা, লম্বা, বড়-চোখ, এক হাতের মাঝের আঙুলটা শক্ত, নাড়তে পারে না, মাঝের গিঁটের উপর কালশিরা—রাসবিহারী সম্পর্কে এত সব খুঁটিনাটি ব্যাপার সংগ্রহ করেছে পুলিশ, অথচ জলজ্যান্ত লোকটাকে কবজা করতে পারছে না। এ কী দুর্ভোগ! দিল্লীতে আরেক রাজদ্রোহের মামলায় তাকে আসামী করছে পুলিশ কিন্তু তার নাম দিতে হয়েছে ওরফে বিনোদবিহারী বসু। রাসবিহারীর রসজ্ঞান আছে। রাসেই তো তার বিনোদবিহার। রাসবিহারী ঠিক করল দেশের বাইরে থেকে স্বাধীনতার জন্যে ইন্ধন জোগাবে। এই উদ্দেশে সে চন্দননগরে এল, ইঙ্গ-বঙ্গ সাজল, নাম নিল পি. এন টেগোর। আর এই ছদ্মনামেই সে পাশপোর্ট সংগ্রহ করল। তারপর জাপানী জাহাজে ১৯১৫ সালের ১২ই মে স্বদেশ থেকে বিদায় নিল।

'ভারতবর্ষের মুক্তি চাই কেন?' বলছে রাসবিহারী, 'চাই বিশ্বমুক্তির জন্যে। স্বাধীন ভারতবর্ষের কাছ থেকেই বিশ্ব নবজাগরণের দীক্ষা নেবে। রূপান্তরিত হবে। রাজশক্তি ও অস্ত্রশক্তির অবসান ঘটিয়ে শান্তিশক্তির নিকেতন হয়ে উঠবে। বিশ্বের জন্যেই ভারতবর্ষকে দরকার। স্বাধীন ভারতবর্ষ। সত্য ভারতবর্ষ।'

সুভাষ ভাবছে, রাসবিহারীর সঙ্গে কি কোনদিন দেখা হবে? তার লক্ষ্য তো রাশিয়া আর রাসবিহারী তো টোকিয়োয়।

কী অসাধ্য সাধন করে সুভাষ বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। সারারাত মোটরে দীর্ঘ নির্জন পথ অতিক্রম করেছে। গাড়িতে দুজন মাত্র আরোহী—সুভাষ আর গাড়ির ড্রাইভার। ড্রাইভার আর কেউ নয়, সুভাষের ভাই-পো, ডাক্তার শিশির বোস। বুদ্ধি দিয়ে যেন কিছুই নিরূপণ [illegible] কোথায় চলেছে? কোনো গণনার মধ্যেই যেন আনা যাচ্ছে না হিসেব।

এ যেন পারহীন পাথার, প্রান্তহীন প্রান্তর। কত দিনে কত দূরে কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে? এ বুঝি আবেগেও দুরবগাহ। স্বপ্নেরও সাহসের বাইরে। এ অঙ্ক নেই কোনো পাটিগণিতে। অসম্ভবকে পথের সঙ্গী করে এ কোনো অধৃষ্য অভিযান! পথে কত বাধা কত কৃচ্ছ্র কত ক্লেশ কত ভয়— গূঢ়ফণা গুপ্ত সর্পের দল কিলবিল করছে আশেপাশে—সর্বোপরি অস্বাস্থ্য—তবু কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছে না সুভাষ। এ কি শুধু দুঃসাহস, শুধু বীর্যবত্তা, শুধু স্বদেশপ্রেম? না, এ এক অমোঘ ঈশ্বরপ্রেরণা। এ যাত্রা তাই এক ঈশ্বরপ্রেরিতের সম্মুখযাত্রা। সর্বকার্যসমর্থ জগন্নিয়ন্তা ঈশ্বর সুভাষকে ডেকেছেন। কাউকে ডেকেছেন কারাগারে, কাউকে ফাঁসির মঞ্চে, কাউকে উন্মুক্ত-উন্মুখ বিশাল রণক্ষেত্রে।

রাত্রিশেষে, অর্থাৎ আঠারোই জানুয়ারি ভোরবেলা গাড়ি এসে পৌঁছল ধানবাদের কাছে, বারারিতে। বারারিতে সুভাষের বড় ভাই-পো অশোক বোসের বাংলো। সুভাষকে অদূরে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে শিশির একাই গাড়ি নিয়ে ঢুকলো। সুভাষ পরে আসছে পায়ে হেঁটে—আপন মনে, একা-একা। সে এখন রাঙা-কাকা নয়, সে এখন ইনসিওরেন্সের এজেন্ট—লখনউয়ের মৌলবী জিয়াউদ্দিন। হাতে এটাচি কেস।

গুডমর্নিং স্যার! জিয়াউদ্দিন সুপ্রভাত জানিয়ে অশোকের সঙ্গে করমর্দন করল।

কাছাকাছি কোথায় লোকজন বা চাকরবাকর আছে কে জানে, জিয়াউদ্দিন ইংরেজিতেই কথাবার্তা বললে, তার কোম্পানির কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, আজকের দিনটা এখানেই কাটিয়ে দেবার কথা। উদার শ্রদ্ধায় অতিথিকে গ্রহণ করল অশোক। আগে থেকেই অবহিত ছিল তাই ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটি হল না। অপূর্ব বেশে আগন্তুককে দেখে ঘরে-বাইরে কৌতূহলী হয়েছিল তারাও জেনে নিল, নির্ভেজাল মৌলবীসাহেব। এখানকার কেউ উর্দু ঠিক বলতে বা বুঝতে পারবে না বলেই ইংরেজিতে কথা কইছে। এমন নিখুঁত অভিনয় কারু মনে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহের রেখাপাত হল না।

বাইরের ঘরে জায়গা হল মৌলবীসাহেবের। সেখানেই তার খাবার এল। যদি বিশ্রাম করতে হয় ঐখানে ঐ ইজিচেয়ার আছে।

আমার আবার বিশ্রাম! জিয়াউদ্দিন চমকে উঠল। হাসিমুখে বললে, 'শীতের বেলা আর কতটুকু! সন্ধের ট্রেনেই আমি চলে যাব।'

সন্ধে হতেই জিয়াউদ্দিন বললে, 'আমি এবার যাই।'

'দাঁড়ান, আপনাকে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দি।' অশোক ব্যস্ত হবার ভাব করল।

'না', আর দরকার নেই। রাস্তায় আমি একটা ধরে নেব।'

এটাচি কেস হাতে, জিয়াউদ্দিন বেরিয়ে গেল। যেমন এসেছিল তেমনি—একা-একা, নিঃসঙ্গ নিঃসম্পর্ক। কোথাও সন্দেহের ছায়া পড়ল না এতটুকু।

আধঘন্টাটাক পরে শিশির দাদা-বৌদিকে বললে, 'চলো না একটু ঘুরে আসি।'

'চলো'।

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিনজন। কোথাও এতটুকু বেসুরো বাজল না। চাকর-বাকর বুঝল, সবই স্বাভাবিক। কতদূর এগিয়ে রাস্তায় ধরে ফেলল জিয়াউদ্দিনকে। আসুন। জিয়াউদ্দিন কালবিলম্ব না করে উঠে পড়ল গাড়িতে। এবার চলো স্টেশনে। দ্রুত গতিতে চলো। দিল্লি-কালকা মেল এসে পড়তে আর দেরি নেই। এ ট্রেনে চড়েই উধাও হতে হবে। আপাতত পেশোয়ার, তারপর যতদূর চোখ যায় ততদূর। এমন করে কে কবে যাত্রা করেছে? না, এ নিরুদ্দেশ

যাত্রা নয়। এ যাত্রা একলক্ষ্যে। স্পষ্টীভূত শরব্যের সন্ধানে। ভারতবর্ষের অব্যর্থ স্বাধীনতায়। এক পলক গাড়ির মধ্যে তাকাল বোধহয় জিয়াউদ্দিন। না, চিন্তিত হবার কিছু নেই, সুটকেস আর বিছানা ঠিক উঠেছে গাড়িতে।

যদি না উঠত তো না-ই উঠত। সব রকম রিক্ততা ও কাঠিন্যের জন্যে সে প্রস্তুত। যে বৃহৎ একটা দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত সে ছোট-খাট কষ্ট ও অসুবিধাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। সন্দেহ কী, দেশের পরাধীনতাই তার বৃহত্তম যন্ত্রণা। সেখানে কোথায় কী কারাক্লেশ, কোথায় কী তৃণশয়ন! সুভাষের তাই কোনো বৈকল্য নেই, বৈচিত্র্য নেই। তার সমস্ত ব্যক্তিত্বে নির্ভয় প্রত্যয়, দুই চোখে অগাধের তন্ময়তা। প্রত্যয়—পথের সাথি সঙ্গেই আছেন, আর তন্ময়তা—'দুয়ার খুলে সমুখ পানে যে চাহে, তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।'

গোমো স্টেশনে গাড়ি থামল। বাক্স-বিছানা নিয়ে চটপট নেমে পড়ল জিয়াউদ্দিন।

গাড়ি ফিরে গেল। ফিরে গেল মানে খনিক দূরে গিয়ে দাঁড়াল। দেখা যাক ট্রেনটা এল কিনা। এলে পরেও দেখতে হবে ট্রেনটা বেরিয়ে গেল কিনা। আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে নিঃসংশয় হওয়া, রাঙাকাকাবাবু তাহলে টিকিট কেটে নির্বিঘ্নে গাড়িতে উঠতে পেরেছেন—বন্দী বিহঙ্গ এবার তবে পিঞ্জর থেকে ছাড়া পেয়ে নীল আকাশে পাখা মেলেছে।

পেশোয়ারে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা আকবর শা। তার কাছে খবর এসে গেছে, সুভাষ আসছে। তার পথ সুগম করে দাও। পাঠানরা যে কত সবল-সমর্থ, আশ্রিতরক্ষক তা প্রমাণিত করো। আকবর শা নিজে না গিয়ে পাঠিয়ে দিল আবাদ খাঁকে—সুভাষবাবুকে নিয়ে এসো। পাঠিয়ে দিল পেশোয়ারের আগে নৌশেরা স্টেশনে। খোদ পেশোয়ারে নামলে কারু চোখে পড়ে তাই এই সতর্কতা। আবাদ খাঁ প্রচ্ছন্নে বিপ্লবী হলে কী হবে, প্রকাশ্যে লরি-চালক। তাকে চট করে কেউ সন্দেহ করবে না। সে তার লরিতে করে সুভাষবাবুকে পৌঁছে দেবে গোপন আস্তানায়। আবাদের কাছে সঙ্কেত আছে।

জংশন স্টেশন নৌশেরা। ট্রেনের কামরায় জিয়াউদ্দিনকে চিনতে আবাদের ভুল হল না। সঙ্কেত দেখিয়ে বললে, এখানে নামুন। আকবর শা-র সেই অনুরোধ। বাইরে আমার লরি দাঁড়িয়ে।

কথা না বাড়িয়ে বাক্স-বিছানা নিয়ে সুভাষ লরিতে এসে উঠল। পেশোয়ারের দিকে লরি ছোটাল আবাদ খাঁ। পথে ধুলো উড়িয়ে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষকে গোপন আস্তানায় পৌঁছে দিল। সন্ধে হয়-হয়, রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। কেননা যে সুভাষকে কাবুলে নিয়ে যাবে সেই দুর্ধর্ষ ভকতরাম এখনো সামিল হয়নি।

যুদ্ধের বাজার, চারদিকে কড়া পাহারা—গুপ্তচররা তো প্রকাশ্যেই ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু আবাদ খাঁর আচ্ছাদনও দুর্ভেদ্য। সুভাষের সুটকেশে পাঠানের পোশাক, সুভাষের পাঠান সাজতে তাই দেরি হল না। কে বলবে সীমান্তের ওপারে তার দেশ নয়?

পরদিন ভকতরাম হাজির। আকবর শা-ই রেখেছে যোগাযোগ। ভকতরামেরও পাঠানের সাজসজ্জা। সুভাষকে সুস্থ-সমর্থ দেখে ভকতরামের কী আনন্দ। বললে, 'লখনৌয়ের মৌলবির চেয়ে আফগানিস্থানের পাঠানের বেশেই আপনাকে বেশি মানিয়েছে।

'তুমিও তো কম যাও না।' খুশি চোখে তাকাল সুভাষ।

'বা, আমি তো এখন কাবলিওয়ালা। আমার নাম ভকতরাম নয়, আমার নাম রহমৎ খাঁ।

'আর আমি? আমি তোমার দাদা—বড় ভাই। জিয়াউদ্দিন।'

'কিন্তু ভাষা? ভারতীয় ভাষায় কথা বলতে গেলেই তো ধরা পড়ে যাবেন।'

'তাই, শোনো, আমি এখন থেকে হাবা-কালা হয়ে যাব। কিছু শুনি না, বুঝি না, কথা বলতে পারি না— সেই রকম অভিনয় করে যাব। জানো তো' সুভাষ হাসল বোবার শত্রু নেই।'

ভকতরাম গাড়ি নিয়ে এসেছে। ভোর রাত্রে যাত্রা সুরু হল। ড্রাইভার ছাড়া যাত্রী চারজন। সুভাষ, ভকতরাম, আবাদ খাঁ আর এক গাইড। গাড়ি চলেছে পেশোয়ার ছেড়ে জামরুদের দিকে। জামরুদ পেরিয়ে পৌঁছুল একটা ছোট গ্রামে, খাজুরি-ময়দানে। আর গাড়ির রাস্তা নেই। এখান থেকে শুধু পায়ে হাঁটা, অচ্ছিন্ন পায়ে হাঁটা। কিন্তু কতদূর কাবুল? কতদূর রাশিয়া?

আবাদ খাঁ আর ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরে গেল। গাইড চলল এগিয়ে, পথ দেখিয়ে। কিন্তু কোন পথ, কোথায় পথ? এ যে শুধু পাথরের স্তূপ, অরণ্য-প্রসার। দুর্গম, দুর্ভেদ্য, দুরারোহ। সুভাষ তবু অক্লিষ্ট পায়ে এগিয়ে চলেছে, চড়াই-উৎরাই ভেঙে-ভেঙে, সাহসে, সাধ্বসে, সতর্কতায়। পা না স্খলিত হয়, অমনোযোগে আঘাত না গায়ে লাগে। নীলাঞ্জনা মায়া ও শ্যামল ছায়ায় মানুষ হলেও সুভাষ পারবে পাহাড়ের মোকাবিলা করতে। বাঙালি বলেই তো পারবে। তার হাতে বন্দেমাতরম-এর মন্ত্রাঙ্কিত পতাকা। 'দুর্গমেতে দুঃখহরা' দয়াময়ী মা তাকে রক্ষা করবেন।

শুধু পাথর নয়, রবফ—শুধু রুক্ষতা নয়, শীত। শুধু অনিদ্রা নয়, অনাহার। তবু সুভাষের বিরতি নেই, নেই ফিরে-যাওয়া। কোথাও দুটুকরো ভুট্টার রুটি, এক ভাঁড় চা, কোথাও বা পাহাড়ের আশ্রয়ে এক চমক ঘুম। গাইড ও ভকতরাম তো তবু এ পথে এ পরিবেশে অভ্যস্ত, সুভাষই আগন্তুক, নবাগত। তবুও তার ক্লান্তি এলেও ক্ষান্তি নেই, তার আগ্নেয় আগ্রহকে শীতল করতে পারে এমন বরফ নেই, রুদ্ধ করতে পারে এমন পাহাড় নেই। সে গতানুগত নয়, সে ঈশ্বরপ্রেরিত। সে বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের উত্তর সাধক।

আরো এগিয়ে গারহি গ্রামে এসে পৌঁছল সুভাষ। আর কিছুটা এগোতে পারলেই আফগানিস্থান। গারহিতে একটা গরিব আস্তানায় রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরেই আবার যাত্রা করল সুভাষ। আড্ডাশরিফ-এ যখন পৌঁছুল তখন সন্ধ্যা।

রহমৎ বললে, 'এতক্ষণে আমরা ভারতের সীমা পার হয়ে এলাম।'

'কিন্তু এখানে থাকব কোথায়?'

'বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে।'

আড্ডাশরিফ এক প্রসিদ্ধ দরগা। সেখানকার পীর এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার কাছে থাকবেন।'

আর তবে কথা নেই। সংলগ্ন মসজিদে রাত কাটাল সুভাষ।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হল। অন্তরে-বাহিরে শুধু একমাত্র ডাক : চলো চলো। 'যেমনি আমি চলি তোমার প্রদীপ চলে আগে।' কোনো ভয় নেই, যদি প্রদীপ না-ও জ্বলে, হে জগদীশ্বর, পথই আমাকে পথ দেখাবে।

গারহি থেকে দুজন রক্ষী দেওয়া হয়েছিল তারা বিদায় নিলে। এখান থেকে নতুন রক্ষী মোতায়েন হল। আগের মতন এরাও পাঠান, এরাও সশস্ত্র। আগে সংখ্যা ছিল দুই, এখন তিন। উপায় কী, পথ যে দুর্জ্ঞেয়। অন্তর্ধানের খবর পেয়ে শত্রুর কোন চর কোথায় এসে

উঁকি মারবে ঠিক নেই। তা ছাড়া ডাকাতের উপদ্রবও কি কিছু কম নাকি রাস্তায়? তারপর পথে কত লোকের কত জিজ্ঞাসা। তোমরা কে? কোথায় চলেছ? যখন যেমনি লাগসই তেমনি বলেছে রহমৎ। সেই তো বলবে, তার সঙ্গীটি তো মূক ও বধির।

'ও কে?' সুভাষের দিকে আঙুল বাড়ায় কেউ-কেউ।

'ও আমার বড় ভাই। বোবা-কালা। কথা কইতে পারে না।'

'চলেছ কোথায়?'

'চলেছি সাখিসাহেবের দরগায়। সেখানকার পীর খুব জাগ্রত। তাঁর দোয়ায় অসুখ সারে।

কেউ-কেউ বা গায়ে পড়ে সহানুভূতি জানায়। দাওয়াই বাতলায়। দেখি দেখি জিবটা। কেউ আবার টিপে-টিপে দেখে। রোগ যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। কী নিখুঁত অভিনয় করতে হয় সুভাষকে। আড়ষ্টতার অভিনয়।

হাঁটতে-হাঁটতে জিরোতে-জিরোতে দুরন্ত ঘুর-পথে লালপুরায় যখন এসে পৌঁছুল সুভাষ দেখল তার হাত-ঘড়িতে রাত নটা বেজে দশ মিনিট। এখানে থাকবে কোথায়? ভয় নেই, খোদ সরকারী মহকুমা-শাসকের বাড়িতে। অফিসর একজন খান পাঠান, আফগান মুলুকে খাতিরদারি আছে, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু লালপুরার পর আরো কত দূর? বেশি নয়, অল্প কয়েক মাইল। সে পথটুকু পেরোলেই নদী পড়বে। নদীর নাম কাবুল নদী। সে নদী পেরোলেই বাস মিলবে। আর টানা বাস-এ একেবারে কাবুল। লালপুরার খান-সাহেব শুধু আশ্রয়ই দিলেন না, বিদায় নেবার প্রাক্কালে সুভাষকে একখানা চিরকুট দিলেন। বললেন, এটা সঙ্গে রাখবেন, কেউ যদি বাধা দেয় বা বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে, তাকে এটা দেখাবেন। আপনার সমস্ত বাধা সরে যাবে, বিপদ হতে পারবে না। চিরকুটটা খান-সাহেবের নিজের হাতে ফার্সি ভাষায় লেখা। এই পত্রবাহক জিয়াউদ্দিন আর রহমৎ খাঁ লালপুরার লোক, সাখি-সাহেবের দরগায় যাচ্ছে। পথে কেউ যেন না এদের হয়রান করে। এদের আচরণের জন্যে আমি দায়ী থাকলাম।

নির্বিঘ্নে কাবুল নদীর ধারে এসে পৌঁছুল সুভাষ। কিন্তু নদী যে পেরোবে নৌকো কই?

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়
আমার ভার লাঘব করি—
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

তেমনিই হবে। পারাপারের নৌকো নেই, সেতু নেই, কিন্তু ভিস্তিওয়ালার চামড়ার থলে আছে। কতগুলি থলে একত্র করে দড়ি বেঁধে দিব্যি ভেলা করা হয়েছে, তাতে চড়ে পার হয়ে যাও। প্রথমটা ভয় করলেও ভয় জয় করল সুভাষ। কার্য সিদ্ধ করার আগে নিশ্চয়ই নিয়তি তাকে ডুবিয়ে মারবে না— আর যদি মারে তো মারবে— পৌঁছুনোর চেয়ে পেরোনোটাই বড় কথা—সুভাষ স্থির হয়ে ভেলাতে গিয়ে উঠল। বসল স্থির হয়ে।

ভীষণরঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন
করিয়া হেলা

রাত্রিবেলা॥

রহমৎ আর চলনদাররাও সঙ্গী হল। দেখতে-দেখতে নদী পার হয়ে গেল নিরাপদে। সীমান্তের খণ্ড প্রদেশ আর নয়—এবার খাঁটি আফগানিস্থান। এ অঞ্চলে অস্ত্র নিয়ে চলা নিষেধ। সুতরাং দেহরক্ষী দুই চলনদারই বিদায় নিল। এখন পথ চলতে রইল শুধু দুজন—জিয়াউদ্দিন আর রহমৎ খাঁ—সুভাষ আর ভকতরাম। তাদের গন্তব্য খোদ কাবুল, সেখান থেকে রাশিয়ান দূতবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্লেনে করে সুভাষের একলা মস্কো যাওয়া।

কিন্তু কোথায়, কতদূরে গেলে কাবুলের বাস পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে ডাকাঘাঁটিতে। কিন্তু সেখানে যেতে পথে আবার অন্য বিপদ। চুঙ্গিকর ফাঁকি দিয়েছে কি না তার ছাড়পত্র চাইবে, সার্চ করবে জিনিসপত্র। সুতরাং অন্য পথ ধরো, অন্য পথ মানেই দূর-পথ, ঘুর-পথ। হোক দুরত্যয় তবু নিবৃত্ত হব না।

তিন দিন বেশি সময় লাগিয়ে দুজন 'ঠাণ্ডী'তে এসে পৌঁছুল। গাছের ছায়ায় জায়গাটা সত্যিই ঠাণ্ডা, আর সব চেয়ে মনোলোভন, কাছেই একটি কুয়ো আছে। কতক্ষণে বাস আসে ঠিক নেই, সুভাষ শুয়ে পড়ল। কিন্তু রহমৎ খাঁ এক পায়ে খাড়া—বাস এসে না ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে কী, আসেই না একটাও। ঐ বুঝি একটা আসছে! না, ওটা কাবুলের নয়। কী জানি কেউ ধোঁকা দিল নাকি? এটা নিশ্চয়ই কাবুলের—রহমৎ খাঁ হাত দেখাল, কিন্তু বাস থামল না। বাস দরকার নেই, একটা লরি হলেও তো চলে। লরি-ই বা থামে কই? চিন্তা করে কী হবে, বিলাপও বা কার কাছে করব—সুভাষ ঘুমিয়ে পড়ল। রহমৎ, অনেক রাত হয়ে গেছে, তুমিও ঘুমোও।

মাঝরাতে রহমৎ হঠাৎ কোলাহল করে উঠল, উঠে পড়ুন, লরি এসেছে।

এক ডাকে উঠে পড়ল সুভাষ। দেখল মালপত্রে বোঝাই একটা লরিকে রহমৎ দাঁড় করিয়েছে। উঠে পড়ুন। কিন্তু কোথাও তো দেখছি বসবার জায়গা নেই, উঠব কোথায়?

'ঐ বাক্সের উপরই চড়ুন।' ড্রাইভার মুখ করে উঠল।

তাই সই। ঐ বাক্সে চড়েই কাবুল যাব। সুভাষ কষ্টেসৃষ্টে কঠিন বাক্সের উপরই চেপে বসল। কিন্তু তারও চেয়ে কঠিন, উন্মুক্ত শীতের রাত, বরফ পড়ছে অঝোরে। আরো কঠিন, বাক্সে বসে উঁচু হয়ে যাবার দরুণ বারে বারেই গাছের ডালের বাড়ি খাবার আশঙ্কা জাগছে, তাই বারে-বারেই মাথা নোয়াতে হচ্ছে, নত মাথায় নিশ্চল হয়ে থাকতে হচ্ছে অনেকক্ষণ। বরফের মধ্যে চোখ খুলে রাখা কঠিন, অথচ চোখ খোলা না রাখলে গাছ চিনবে কী করে?

'এর চেয়ে কি ভালো গাড়ি জুটলো না?' সুভাষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কথাটা।

'এও কত সাধ্য সাধনা করে থামিয়েছি।' বললে রহমৎ, 'এটা না পেলে দুজনেই মাঠের উপর পড়ে থাকতাম। জমে বরফ হয়ে যেতাম।'

লরি পরদিন বাটখাক-এ এসে থামল। সেখানকার আফিসারকে লরি ড্রাইভার তার ছাড়পত্র দেখাল। কিন্তু মালের মধ্যে ঐ মানুষ দুজন কে?

'আপনারা কে?' অফিসর হুমকে উঠল।

'আমরা স্বাধীন পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দে।' বললে রহমৎ খাঁ, 'চলেছি সাখি-সাহেবের দরগায়।'

'সেখানে কী?'

'সঙ্গে যিনি যাচ্ছেন তিনি আমার বড় ভাই, হাবা-কালা।' সুভাষের দিকে হাত করল

রহমৎ। 'যদি সেখানে পীরের দোয়ায় এর ব্যাধির কোনো সুরাহা হয়।'

অফিসর হাত পাতল : 'ছাড়পত্র কই?'

হাত পাতার ভঙ্গি দেখে রহমতের মনে হল, ঘুষ দিলে চলে হয়তো। কিন্তু রহমৎ খাঁ ঘুষ দেবার পথে না গিয়ে সেই পাঠান খান-এর সেই চিরকুট দেখাল। চিরকুট দেখা মাত্রই অফিসর স্তব্ধ হয়ে গেল। পথ ছেড়ে দিতে দেরি করল না।

শুধু চা খেয়েই পথ চলছে দুজন। তবু এটুকু তপ্ত উপশম যে পাচ্ছে তাই শিবের কৃপা। পাঠান হয়ে তো কোট-ওভারকোট পরা চলে না, রেওয়াজ-মত যা গায়ে আছে তা এই শীতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু এত ঠাণ্ডার মধ্যেও উত্তাপ আছে বৈকি—সে স্বপ্নের উত্তাপ। সে স্বপ্ন না থাকলে এত কায়কৃচ্ছ্র সহ্য হত কী করে?

বিকেল চারটে নাগাদ কাবুল এসে গেল। ব্যস, আর কথা কী। এখন একবার রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলেই হয়ে যাবে। বিমানে করে একেবারে মস্কো। লাহোরী-গেটের কাছে একটি সরাইয়ে ঘর নিল দুজন। পেশোয়ার থেকে আফগানী টাকা ভাঙিয়ে এনেছে, তার থেকে দেওয়া হয়েছে লরিওয়ালাকে, সরাইওয়ালাকেও দেওয়া হবে। সেদিক থেকে ভাবনা নেই, কিন্তু সরাইটা যেমন নোংরা তেমনি কুৎসিত। বলতে গেলে, একটা আস্তাবল। ব্যবসার উদ্দেশ্যে যারা গাধা বা উট নিয়ে যাতায়াত করে তাদের আড্ডা—মানুষ আর জানোয়ারের খোঁয়াড়। কিন্তু আত্মগোপনের পক্ষে এমনি সরাই-ই খুব ভালো।

পরদিনই সুভাষ ব্যস্ত হয়ে বললে, 'চলো রাশিয়ার দূতাবাস খুঁজে বার করি।'

দুজনে শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কাউকে জিজ্ঞেস করা যাবে না পাছে কারু সন্দেহ হয়। সুতরাং চোখ মেলে ঘোরা আর ঘুরতে-ঘুরতে দেখা রাশিয়ার দূতাবাস চোখে পড়ে কি না। অনেক দূতাবাস চোখে পড়ল, ইজিপ্টের ইরানের ইটালির গ্রিসের কিন্তু রাশিয়াকে খুঁজে বার করা গেল না। পেশোয়ারি চপ্পল পরে বরফের উপর দিয়ে আর কত হাঁটা যায়, সুভাষ আর রহমৎ সরাইয়ে ফিরে এল।

পরদিন সকালে আবার বেরুল দুজনে। শহরের অন্য অঞ্চল ঘুরতে লাগল—এদিকে না মেলে চলো ওদিকে। রাশিয়াকে খুঁজে বার করবই করব। কাউকে প্রশ্ন করা নেই, কেবল ঘোরা। কেবল দেখে বেড়ানো।

ঐ যে, ঐ দেখ বাড়ির মাথায় লাল পতাকা উড়ছে। পেয়ে গেছি। অধ্যাবসায়ীর হাতে ফল না এসেই পারে না। কিন্তু বাড়ির দরজা যে বন্ধ। বাইরে পুলিশ প্রহরী। বিনা পরিচয়ে কেউ কি আমাদের ঢুকতে দেবে? খান-সাহেবের চিরকুট এখানে অচল। তা ছাড়া আমাদের যা পোশাক তা যে কোনো সম্ভ্রান্ত আবাসই প্রত্যাখ্যান করবে। তবে উপায়?

পরদিন আবার রুশ দূতাবাসের দিকে বেরুল দুজনে। ফটকের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে রইল। মতলব যখন দূতের গাড়ি বেরুবে তখন তা থামিয়ে সরাসরি দূতের সঙ্গে কথা কইবে। এছাড়া সাক্ষাতের আর পথ নেই।

কত গাড়ি এল গেল, রাশিয়ার দূতের গাড়ি কোনটা তা কে বলে দেবে? দূতের গাড়িতে নিশ্চয়ই লাল পতাকা থাকবে, অতএব তার আশায় দাঁড়িয়ে রইল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল—সাড়ে চারটে নাগাদ প্রতীক্ষার বর মিলল—বেরুল সেই লাল-নিশান-ওড়ানো মনোরম গাড়ি। পিছনের সিটে একজন মাত্র আরোহী—নিশ্চয়ই রাষ্ট্রদূত স্বয়ং। রহমৎ খাঁ এগিয়ে ছিল,

হাত তুলে গাড়ি থামাল।

কী চাই? জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল রাষ্ট্রদূত।

রহমৎ খাঁ রাশিয়ান ভাষা জানে না, ফার্সিও তার আয়ত্তে নয়। তবু ঝাপসা-ঝাপসা ফার্সিতে সে বললে, 'সুভাষ বোস কাবুলে এসেছেন, মস্কোতে যেতে চান। আপনি যদি সাহায্য করেন—'

'সুভাষ বোস?' রাষ্ট্রদূত উল্লসিত হয়ে উঠল: 'তিনি কোথায়?'

'ঐ যে।' অদূরে দাঁড়ানো জিয়াউদ্দিনকে দেখিয়ে দিল রহমৎ।

রাষ্ট্রদূত এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। হঠাৎ যেন চেহারায় মিল খুঁজে পেল না। বললে, 'উনি যে সুভাষ বোস সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হব কী করে? কাগজপত্র কিছু আছে?'

রহমৎ খাঁর ভাষায় আর কুলোল না। বুঝিয়ে বলতে পারল না কী অবস্থায় ছদ্মবেশে এই অভিনব ভাবে সাহায্য নিতে হচ্ছে। ভাষায় দখল নেই বলে কথার সুরে আনতে পারল না আন্তরিকতা, সত্যের সংস্পর্শ। রাষ্ট্রদূতের গাড়ি বেরিয়ে গেল।

কী বিরাট আশা-ভঙ্গের বোঝা বয়ে নিয়ে সরাইয়ে ফিরল সুভাষ। যারা এই পথে সুভাষের পলায়নের পথ পরিকল্পনা করেছিল তারা এই ভাষার কথাটা একদম ভেবে দেখেনি। আফগানদের মাতৃভাষা ফার্সি, পুস্তু নয়, আর রহমৎ খাঁ শুধু পুস্তুই জানে—ফার্সির জ্ঞান এ কদিনের রাস্তাঘাট থেকে যৎসামান্য যা কুড়িয়ে নেওয়া। এমন লোক যদি সঙ্গে থাকত যে দূতাবাসের চেনা তাহলে ভাষার ব্যবধানটা প্রতিবন্ধক হত না। সবাই ভেবেছিল সুভাষ বোসের নাম শোনা মাত্রই দূতাবাস দু'হাত বাড়িয়ে ডেকে নেবে আর পত্রপাঠ প্লেনে করে পাঠিয়ে দেবে মস্কো। এখন দেখা গেল স্বপ্ন আর সত্যের মধ্যে অনেক সিঁড়ি। এখন কী করা!

'পেশোয়ারে খবর পাঠাই, রাশিয়ান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে যোগ্য লোক পাঠান।'

সুভাষ জিজ্ঞেস করলে, 'খবর কাকে দিয়ে পাঠাবে?'

'দেখি একটি বিশ্বস্ত লরি-ড্রাইভার পাই কিনা।'

'পেলেই বা কী! কত দিনে যোগ্য লোক জোগাড় হবে তা কে জানে?' সুভাষ বললে, 'আমি ভাবছি ইটালিয়ান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কেমন হয়?

'মন্দ কী! তারই বরং চেষ্টা করি।' রহমৎ খাঁ সায় দিল: 'কিন্তু যাই বলুন, আমি ভাবছি এ সরাইখানা ছেড়ে দেব। এ নোংরার মধ্যে থাকলে অসুখ করে যাবে।'

উঠোনের মধ্যে উট আর ঘোড়া বাঁধা, চারদিক দুর্গন্ধে হতচ্ছাড়া। ফাঁসির আসামীর সেল-এর মত কুঠুরি, দরজা বন্ধ করলে দিনের আলোতেও ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। প্রথম যেদিন আসে সেদিন কী প্রচণ্ড শীত, সঙ্গে কারু বিছানা নেই, ঘরের মেঝেতেই শুতে হবে। চৌকিদার বললে, বিছানা ভাড়া পাওয়া যেতে পারে। ঘরের ভাড়া যদি দৈনিক এক টাকা, বিছানার ভাড়া আট আনা। টাকা আনা অবশ্যি আফগানি টাকা আনা। তাই সই। দুটো বিছানা ভাড়া করল রহমৎ। যা হোক, যেমনতরোই হোক, কম্বলের উপর গা এলিয়ে একটা বালিশের মতন বস্তুতে তো খানিকক্ষণের জন্যে মাথা গোঁজা যাবে।

রহমৎ খাঁ বাজারে বেরিয়ে খাবার কিনে আনল, শুকনো রুটি আর কাবাব আর কটা মোমবাতি ও কিছু কাঠ। সেই রুটি ছেঁড়ে দাঁতের এমন সাধ্য নেই, সেই কাবাব গেলে রসনার নেই এমন সমর্থন। তারপরে কাঠগুলি ভিজে, আগুন না হয়ে ধোঁয়া হতে লাগল অনর্গল।

দরজা খুললে বরফে হাওয়া, বন্ধ করলে ধোঁয়ায় প্রাণান্ত। কিন্তু তাই বলে ঘুম অসৌহৃদ্য করল না। মড়ার মত ঘুমুল দুজন। সকালে জেগে উঠে দেখল শরীরের সমস্ত কব্জায় জ্যাম ধরে গেছে। নড়ে-চড়ে এমন কোথাও শৈথিল্য নেই। তবু ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকলে তো চলবে না, ইউরোপে যাবার পথ খুঁজতে হবে এবং সেটা যত দ্রুত হয় তত মঙ্গল। ইংরেজের রাজ্যে কত না জানি হুলস্থূল পড়ে গেছে, খাঁচার পাখি উড়ে পালিয়েছে, যে করে পারো আবার তাকে খাঁচায় পোরো, ডানা কেটে দাও। অচল হয়ে থাকা তাই অসম্ভব। অস্বাস্থ্যের কথা কে ভাবে, অসুবিধে কে গ্রাহ্য করে, আমাকে শুধু এখন ইউরোপে যাবার পথ দেখাও। মস্কো না হয় রোম, না হয় বার্লিন।

'এ সরাইয়ের চেয়ে ভালো জায়গা তুমি কোথায় পাচ্ছ?' সুভাষ নিচু গলায় বললে, 'বেশি খোলামেলা থাকতে গেলে না ধরা পড়ে যাই।'

'না, আমি ভাবছি উত্তমচাঁদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিই।'

'কে উত্তমচাঁদ?'

'পেশোয়ারে 'নওজোয়ান ভারতসভা'র প্রাক্তন সম্পাদক। এরা কংগ্রেসেরই সরিক, বৈশিষ্ট্য সমাজতন্ত্র। মহাত্মার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে পেশোয়ারে গুলি চলে, কংগ্রেসের মত 'নওজোয়ানও' নিষিদ্ধ হয়। দু বছর জেল খাটে উত্তমচাঁদ। কাবুলে তার কাকার দোকান আছে, সে আমার পরিচিত, যতদূর জানি উত্তমচাঁদ সে-দোকান চালায়। একবার সে দোকানে গিয়ে খোঁজ করলে মন্দ হয় না।'

'তার আগে ইটালির এমব্যাসিতে গিয়ে খোঁজ নাও।' সুভাষ চঞ্চল হয়ে উঠল।

'চলুন যাই সেখানে।'

'আমি না, তুমি একলা যাও। গিয়ে দেখ কোনো সুবিধে হবে কিনা।'

দরজায় আফগান কনস্টেবল, ইটালির দূতাবাসে ঢুকতে বাধা পেল রহমৎ। কনস্টেবল জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

রহমৎ বললে, 'আমি জাপানী এমব্যাসির চৌকিদার।'

দিব্যি চোখে ধুলো দিতে পারল রহমৎ। একেবারে অধিকর্তা সেনর কনোরির কাছে গিয়ে বক্তব্য নিবেদন করল।

'বলো কী! সুভাষ বোস এসেছে। আমি কালই রোম ও বার্লিনে খবর পাঠাচ্ছি। দু-তিন দিনের মধ্যেই আশা করি পথের সব ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

রহমতের মুখে খবর শুনে অন্ধকারে আলোর আভাস দেখল সুভাষ। কিন্তু মন খুব খুশি নয়। মন মস্কোর দিকে, রোম-বার্লিনের দিকে নয়। কিন্তু নেই-মামার চেয়ে কাণা-মামা ভালো। যে কোনো পথে হোক, আফগানিস্থানের সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া দরকার। আর তা অকালবিলম্বে।

দু-তিন দিন কেটে গেল, কোনো সাড়া-শব্দ নেই। সাড়া-শব্দ যেটুকু এল তা শুধু আনন্দ আর অভিনন্দন। কাজের কাজ কিছু এগোচ্ছে না। শুধু হবে-হচ্ছে। শুধু গয়ংগচ্ছ। কণ্টকের উপর দিয়ে সুভাষের মুহূর্তগুলো চলে যাচ্ছে। সব চেয়ে বড় কণ্টক একটা গোয়েন্দা পুলিশ পিছনে লেগেছে। রুটিওয়ালার দোকানে একটু শাদা পোশাকের আফগান চুপচাপ বসে থাকে। রহমৎ এলেই তাকে কূটদৃষ্টিতে দেখে। এ চাউনি রহমতের অজানা নয়। সুভাষকে এসে বলে নতুন বিপদের কথা।

'আমারো তাই মনে হয়েছে। তুমি শিগগির উত্তমচাঁদের খোঁজ করো।' সুভাষ অস্থির হয়ে ওঠে: 'এ তল্লাট এখুনি ছাড়তে হবে। আর শোনো আমার ঘড়িটা তুমি তোমার হাতে পরো। বোবা-কালার আবার ঘড়ি কী।'

'ঐ, ঐ এসেছে লোকটা।' রহমৎ হুঁশিয়ারি দেয়।

মুহূর্তে বোবা-কালো হয়ে যায় সুভাষ।

'তোমরা কে? শাদা পোশাকের গোয়েন্দা হুমকে ওঠে: 'এখানে কেন এসেছ?'

'আমরা মুসাফির।' রহমৎ খাঁ স্বচ্ছকণ্ঠে বলে, 'সীমান্ত-প্রদেশ থেকে এসেছি। চলেছি সাখি-সাহেবের দরগায়। আমার সঙ্গে যিনি আছেন,' সুভাষের দিকে নির্ভুল আঙুল দেখায় রহমৎ: 'উনি আমার বড় ভাই। আকাট বোবা-কালা তার উপরে অসুস্থ। তারই জন্যে যাচ্ছি দরগায়। কিন্তু বরফ পড়ে রাস্তা বন্ধ। পথ খুললেই রওনা হব।'

'এ সব বানানো কথা। এক বর্ণও বিশ্বাসের যোগ্য নয়।' গোয়েন্দা তেরিয়া হয়ে বললে, 'চলো থানায় চলো।'

রহমৎ চোখে-মুখে কাতরতার ছবি ফোটাল কিন্তু সুভাষ নিরেট এক স্তব্ধতার জড়পিণ্ড।

'মিছিমিছি কেন মুসাফিরদের হয়রান করছ?' রহমৎ মিনতির সুর ফোটাল: 'দেখছ না আমার ভাই কেমন জ্বরে কাহিল হয়ে পড়েছে, শীতে হাঁটতে পারে এমন তার সাধ্য নেই।'

'ও সব বাকতাল্লায় ভুলছি না। থানায় চলো।' আফগানি গোয়েন্দা ধমক দিয়ে উঠল।

'বেশ তো, যেতে হয় আমি যাব। আমার ভাই অক্ষম অসমর্থ, সে হাঁটতে পারবে না। আর যেতেই যখন হবে তখন দাঁড়াও, আমি এক পেয়ালা চা খেয়ে নিই। আমার ভাইকেও খাওয়াই।'

গোয়েন্দা হঠাৎ সুর পালটাল। বললে, 'তাই খাও, আমাকেও চা খেতে কিছু দাও দেখি।'

অবাক্য ব্যয়ে রহমৎ একখানি দশ টাকার আফগানি নোট গোয়েন্দার হাতে গুঁজে দিল। গোয়েন্দা চলে গেল।

'কই উত্তমচাঁদের দোকান খুঁজে পেলে?' সুভাষ আবার তাড়া দিল।

উত্তমচাঁদের কাছে যেতে রহমতেরই বুঝি এখন কুণ্ঠা হচ্ছে। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা না করে কেন সুভাষকে এ পথে আসতে দিয়েছে তার জন্যে উত্তমচাঁদ নিশ্চয়ই তাকে তিরস্কার করবে। উত্তমচাঁদকে এড়িয়ে যদি তড়িঘড়ি পার করে দিতে পারত তাহলে ভকতরামও পার পেত। কিন্তু আর গড়িমসি করবার সময় নেই। গোয়েন্দা আবার পিছু নিয়েছে।

'সাখি-সাহেবে যেতে দেরি করছ কেন?

'বাস যাচ্ছে না যে।' রহমৎ নিষ্পাপ মুখে বললে।

'কে বললে যাচ্ছে না? ডাক-গাড়ির খোঁজ করেছিলে?

'ডাক-গাড়ি! আজই খোঁজ নিচ্ছি।' রহমৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'দেখ তোমাদের উপর দারোগাসাহেবের সন্দেহ বাড়ছে। তিনি তোমাদের থানায় নিয়ে যেতে বলেছেন।'

রহমৎ খাঁ সানুনয়ে বোঝাতে চাইল তারা দুভাই ধর্মভীরু মুসলমান, মুসাফিরিতে বেরিয়েছে, মিছে তাদের হয়রানি করা! তবে থানায় যদি যেতে হয় সে নিজে যাবে, তার ভাই তো বোবা-কালা, তার গিয়ে লাভ কী?

'বোবা-কালা বলে কি হাঁটতে পারে না? ওকেও যেতে হবে।'

রহমৎ খাঁ দুখানা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিল। গোয়েন্দা নরম হল না। তখন রহমৎ সেই পাঠান শাসকের চিরকুট দেখাল। তখন ঢোঁক গিলল গোয়েন্দা। বললে, 'ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু তোমার এ হাতঘড়িটি চাই।'

সুভাষের সোনার ঘড়ি। তার বাবার দেওয়া।

উপায় নেই, ঘড়ি খুলে দিল রহমৎ।

ভেবেছিল ছাড়ান পেয়েছে বুঝি। কিন্তু পরদিন আবার গোয়েন্দা এসে হাজির। ওকি, তোমরা এখনো যাও নি ? বটে ? আরো কিছু ছাড়ো।

সেকি, ঘড়ির কী হল ?

সেটা দারোগাবাবু নিয়েছে। বেশ, গোটা পাঁচেক টাকা ধার দাও আপাতত, দরগা থেকে ফিরে এলে শোধ দিয়ে দেব।

আবার পাঁচ টাকা নিয়ে চলে গেল গোয়েন্দা। স্বয়ং দারোগা যখন হাত বাড়িয়েছে তখন বিপদ একেবারে দরজার কাছে। রোম-বার্লিন থেকে কোনো খবর নেই। যে করে হোক উত্তমচাঁদকে খুঁজে বের করা চাই। এ সরাইখানা এক্ষুনি ছেড়ে দেওয়া দরকার। এ-বাজার ও-বাজার ঘুরে রহমৎ খাঁ উত্তমচাঁদের দোকানের হদিস পেল। সুভাষ উৎকণ্ঠিত হয়ে রহমতের অপেক্ষা করছে। কতক্ষণে ফিরে আসে।

'কি, দেখা পেলে ?'

'না, দোকান বন্ধ।'

'ওর বাসা কোথায় ?'

'কাকে জিজ্ঞেস করব ?' হতাশের মত মুখ করল রহমৎ : 'কে আবার কী সন্দেহ করে !' আবার গিয়ে দোকান খোলা পেল।

'আপনি কে ?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল উত্তমচাঁদ।

রহমৎ খাঁ বললে, 'আপনি ঘালাচে গ্রামের হরিকিষণকে চিনতেন ? যিনি পাঞ্জাবের গভর্নর মোরেন্সিকে গুলি করেছিলেন—'

'শহীদ হরিকিষণ। ফাঁসি যাবার আগে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কী তোমার শেষ ইচ্ছা সে বলেছিল, ভারতবর্ষে আবার জন্ম নিতে চাই।' শ্রদ্ধায় দীপ্ত হল উত্তমচাঁদ : 'চিনতাম বই কি, খুব চিনতাম। কেন, কী, হয়েছে ?'

'আমি তার ছোট ভাই, ভকতরাম। খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।'

'কি বিপদ ?'

আশ্বস্ত হয়ে আনুপূর্বিক সব বললে ভকতরাম। এখন আপনি আশ্রয় না দিলে বাঁচবার আর উপায় নেই।

শহরের সব চেয়ে বিশ্রী অঞ্চল হিন্দুগুজারে উত্তমচাঁদের বাস। বাড়িটা দোতলা, উপরে সে থাকে, নিচে ভাড়াটে। ভাড়াটের বাড়িতে অনেক লোকজন। অনেক আনাগোনা। অন্য কোনো এলাকায় রাখা যায় না ?

কাছেই এক মুসলমান বন্ধু থাকে, হাজী সাহেব, তার কথা মনে পড়ল। তাকে গিয়ে বলতেই সে প্রথমে খুব উৎসাহিত হল, পরে রাজনৈতিক হাঙ্গামায় জড়িয়ে যাবে ভেবে পিছু হটল।

'জানো তো আমার স্ত্রী জার্মান, সর্বত্র তার গতিবিধি।' বললে হাজীসাহেব, 'কোনো

আলাদা ঘরে জিয়াউদ্দিনকে রাখতে পারব না লুকিয়ে। সব ফাঁস হয়ে যাবে।'

অগত্যা উত্তমচাঁদ নিজের বাড়িতেই সুভাষকে আশ্রয় দিতে রাজি হল। ধরা পড়লে পড়ব, ভবিষ্যতে ঘর-সংসার বা দোকান-পসারের যা হবার তা হবে, তবু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মহান শিল্পীকে আশ্রয় না দিয়ে পারব না।

'যাও বোসবাবুকে নিয়ে এস।'

'তিনি এসেছেন।' বিকেলের দিকে ভকতরাম এসে খবর দিল।

'কোথায় ? উদগ্র ঔৎসুক্যে তাকাল উত্তমচাঁদ।

'নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন।' ভকতরাম দেখিয়ে দিল : 'ঐ যে।'

উত্তমচাঁদের দোকান ঘেঁষেই কাবুল নদী। কে একজন হুবহু পাঠান ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। ওই সুভাষ বোস ? কাছাকাছি হতেই সবিস্ময়ে তাকাল উত্তমচাঁদ। পরনে শালওয়ার আর শার্ট—দুইই ময়লা—গলায় ততোধিক ময়লা একটা চাদর জড়ানো, মাথায় পাগড়ি, পায়ে জুতো-মোজা—মুখে এক জঙ্গল দাঁড়িগোঁফ—সত্যি এই কি সুভাষ ? শত ছদ্মবেশ হলেও কোথায় যেন কী একটু কম পড়েছে, কিন্তু আলোচনা করবার জায়গা নয় এটা—তাড়াতাড়ি ঘরের আড়ালে চলে যাওয়া প্রয়োজন—কে কী দেখবে, কী বুঝবে কেউ জানে না। এখন যে বরফ পড়তে শুরু করেছে এইটেই মঙ্গল। ঠাণ্ডার দরুণ প্রতিবেশীদের দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কোনো ছিদ্রে কারু কৌতূহলই আর জেগে নেই। অতিথিদের বাড়ি নিয়ে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করল উত্তমচাঁদ। কয়লার উনুন ধরিয়ে জল গরম করল। চা বানাল। জিজ্ঞেস করলে, 'স্নান করবেন ?'

'তেরো দিন ধরে এসেছি, এ পর্যন্ত স্নান করিনি। সে সুযোগ কোথায় ?'

'ভিজে জামা-কাপড়গুলো ছাড়ুন—' শুকনো শার্ট আর শালোয়ার নিয়ে এল উত্তমচাঁদ।

সুভাষ বেশান্তরিত হল। তারপর খাপ থেকে চশমা বের করে পরে বললে, 'কাবুলে এই প্রথম চশমা পরলাম।'

মুহূর্তে জ্যোতির্ময় মূর্তি উদ্ভাসিত হল। উত্তমচাঁদের দ্বিধার বাষ্পটুকুও আর থাকল না।

ভকতরাম বললে, 'সরাইখানা থেকে আমাদের গাঁটরিগুলি নিয়ে আসি।'

'খুব সাবধান। সেই গোয়েন্দা যেন পিছু না নেয়।'

উত্তমচাঁদ অন্দরে গেল। অতিথির খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা হয়েছে খোঁজ নেওয়া দরকার।

স্ত্রী রামো দেবী জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার এ নতুন অতিথিটি কে ?'

উত্তমচাঁদ বুদ্ধিমান, চেপে যেতে চাইল। কেননা সে জানে স্ত্রীলোকমাত্রই বেশি বকে, এক কথা বলতে আরেক কথা বলে ফেলে আর কোনো গূঢ় সংবাদই গোপন করে রাখতে জানে না। তাই সে নির্লিপ্তের মত বললে, 'জালালবাদ থেকে ব্যবসা উপলক্ষে এসেছে, আমার এক খদ্দের।

'খদ্দের ? হিন্দু ?'

'তা ছাড়া আবার কী ?'

'কিন্তু আমি দেখলাম সে তোমাকে মুসলমানের মত সেলাম করল, আর সঙ্গে তুমি পুস্তুতে কথা কইলে—কী ব্যাপার ?'

ঘাবড়ে গেল উত্তমচাঁদ। বললে, 'তোমাকে পরে সব বলব। এখন অতিথির জন্যে আহার তো তৈরি করো।'

'না, কী ব্যাপার, আমাকে এখুনি বলতে হবে। অপরিচিত লোককে বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে

রাখবে তা হবে না। যদি লুকিয়ে রাখতে হয়, অন্যত্র রাখো। আমার ঘরে কোনো পাঠানের ঠাঁই নেই।'

দু একদিনের মধ্যেই যে সুভাষ বেরিয়ে যেতে পারবে এমন মনে হয় না। তাই, ভগবান রক্ষা করুন, স্ত্রীকে সব বললে উত্তমচাঁদ।

ভয়ে রামো দেবীর মুখ পাংশু হয়ে গেল। সুভাষ বোস? কিন্তু তিনি এখানে আছেন এ খবর পুলিশ জানতে পেলে তাদের কী পরিণাম হবে আন্দাজ করতেও গা হিম হয়ে যায়।

'সেই জন্যেই ওকে সর্বক্ষণ সাবধানে ঢেকে রাখতে হবে।' উত্তমচাঁদ গম্ভীর মুখে বললে, 'আমাদের বাড়িতে থেকে যদি সুভাষবাবু গ্রেপ্তার হন তা হলে আমাদের কলঙ্কের সীমা থাকবে না।'

সে কলঙ্ক বুঝি পুলিশি লাঞ্ছনার চেয়েও অসহনীয়। মুহূর্তে রামো দেবীর চেতনান্তর ঘটল। বললে, 'তুমি তার জন্যে ভেবো না। আমি সমস্ত সামলাব। কাকপক্ষীও এ কথা জানতে পারবে না। কত বড় লোক আমাদের বাড়িতে এসেছেন! আমাদের এত ভাগ্য!'

স্ত্রী এসে স্বামীর সঙ্গে হাত মেলাল—আচ্ছাদনের সমস্যা আর থাকল না। কিন্তু উত্তমচাঁদকে তো দোকানে যেতে হবে, তখন বোসবাবুকে দেখবে কে?

'আমি দেখব। রামো দেবী বললেন, 'তুমি তাঁর ঘর তালা-বন্ধ রাখো। তিনি ভিতরে নিশ্চিন্তে থাকুন।'

'কিন্তু ঘরের চাবি?'

'চাবি আমার কাছে থাকবে। আমি তদারকি করব।'

উত্তমচাঁদও নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু ভুত দেখল নিচের তলার ভাড়াটে। একদিন সকালবেলা তার শখ হল ছাদে উঠবে। ছাদেব সিঁড়িটা সুভাযের ঘরের পাশ দিয়ে। মুহূর্তেব ভুলে ঘরের দবজাটা খোলা ছিল, সেই ফাঁক দিয়ে চকিতে ভদ্রলোক কী দেখল কে বলবে তার আর ছাদে ওঠা হল না।

পরদিন উত্তমচাঁদকে বললে, 'আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'কেন? কী হল?'

'আপনার বাড়িতে থাকতে আমার দারুণ ভয় হচ্ছে। আপনি দুজন অচেনা অতিথিকে আশ্রয় দিয়েছেন—'

'অচেনা? অচেনা কী বলছেন?' উত্তমচাঁদ মুক্তকণ্ঠে বললে, 'ওঁরা আমার আত্মীয়। একজন তো অসুস্থ, চিৎকিসার জন্যে এসেছেন—'

'কোন জন? যার চোখে চশমা?' ভদ্রলোক ফ্যাকাসে মুখে বললে, 'দেখে অবধি আমিও অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমাবও প্রাণের আশা উধাও হয়েছে। আমি পালাই।'

ভদ্রলোক বাড়ি ছেড়ে দিল। ভাবিয়ে তুলল উত্তমচাঁদকে। ভয়ভীতু লোকটা এখন ঘরে-বাইরে না বলে বেড়ায়, গুজব রটায়! ঠিক করল অতিথিদের কদিনের জন্যে অন্যত্র সরিয়ে দেবে। অন্তত ইটালি থেকে যত দিন না কোনো ব্যবস্থা হয়!

অনেক ঘুরে এক সরাইখানায় জায়গা পাওয়া গেল। উত্তমচাঁদ বললে, 'আপনারা কদিন ওখানে গা-ঢাকা দিন।

'তা দিচ্ছি।' সুভাষ বললে, 'কিন্তু আপনি ইটালির এমব্যাসি থেকে খোঁজ নিন আমি যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তার উত্তর কই?'

উত্তর যা পাওয়া গেল তা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বার্লিন আর রোম দু জায়গাই সুভাষকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তার এই ঐতিহাসিক পলায়নের জন্যে। মস্কোতে লেখা হয়েছে ছাড়পত্রের জন্যে। অচিরেই পাওয়া যাবে আশা করি। বন্দোবস্ত পাকা হলেই খবর দেব। কোথায় কবে কী পাকা হবে ভগবান জানেন। নতুন ডেরাতে গিয়ে শুকনো রুটি-কাবাব খেয়ে সুভাষের অসুখ করে গেল। একজন ডাক্তার না দেখালে নয়। বিশ্বাস করে কাকে ডাকা যায় ভকতরাম এল উত্তমচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে।

উত্তমচাঁদ বললে, 'যা হবার হবে, আপনারা আমার বাড়িতে আবার ফিরে আসুন। ডাক্তার ডাকতে হবে না, আমার স্ত্রীর সেবাযত্নেই বোসবাবু সেরে উঠবেন।'

'কিন্তু ঐ ভাড়াটে?'

'সে আর এ তল্লাটে নেই। ভয়ে কোথায় লুকিয়েছে কে জানে।'

সেই দিনই সেই ভাড়াটে-ভদ্রলোকের সঙ্গে উত্তমচাঁদের দেখা হল বাজারে। ভদ্রলোক নিজের থেকেই অনুতাপ করলে, তার আচরণটা ঠিক হয়নি। কিন্তু তার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু পুলিশি উৎপীড়নের ভয়। 'পুলিশ তো একদিন খোঁজ পাবেই তিনি এখানে ছিলেন তখন আমাকে ও বাড়িতে দেখে কী নাকালটাই করবে ভাবুন তো। আমার কতগুলি কাচ্চা-বাচ্চা—'

'তিনি এখানে ছিলেন পুলিশ তা জানবে কী করে? আপনিই বলে বেড়াচ্ছেন বুঝি?'

'আমি বলে বেড়াব আমাকে এমনি মূর্খ ভেবেছেন? তা হলে পুলিশ তো শেষপর্যন্ত আমাকেই এসে ধরবে। ওরে বাপ্‌স, সে ভয়েই তো [illegible] মুখে চাপা দিয়ে থাকব। কিন্তু বোসবাবু এখন কোথায়? কেমন আছেন?'

'জানি না। তবু এটুকু জানি বোসবাবু যদি এখানে ধরা পড়েন তার জন্যে দায়ী হবেন আপনি। লোকে শুনে আপনাকে ধিক্কার দেবে। তখন কলঙ্কিত মুখ দেখাবেন কী করে?'

ভদ্রলোকের মুখ ম্লান হয়ে গেল। উত্তমচাঁদের সাহসের বিন্দু-বিসর্গও যদি তার থাকত। সে যে নিতান্ত ছাপোষা, তার যে অনেকগুলি ছেলেপিলে। জিয়াউদ্দিন আবার যথারীতি উত্তমচাঁদের দোতলার ঘরে তালাবন্ধ হল। সেবাযত্নে তার আমাশা সারলেও দেখা দিল কাশি। কাশির শব্দ উঠলেই ভয় হয় আশেপাশের লোক শুনতে পেল বুঝি। না, ভয় নেই, যখনই কাশি ওঠে তখনই রেমো দেবী উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন, অনুপস্থিত চাকর-বাকরের উদ্দেশ্যে হাঁক ডাক শুরু করেন যাতে ঐ হাঁক ডাকে কাশির শব্দ ডুবে যায়, কেউ না কিছু সন্দেহ করে। নিশ্ছিদ্র আচ্ছাদন দিয়ে রামো দেবী ঢেকে রাখে অহর্নিশ। যেমন উত্তমচাঁদের ত্যাগ তেমনি রামো দেবীর নিষ্ঠা।

কিন্তু এমনি নিষ্ক্রিয় হয়ে কতদিন থাকা যায়? মস্কো থেকে ছাড়পত্র এখন কেউ জোগাড় করে দিতে পারল না—না রোম না-বা বার্লিন। এখন যুদ্ধের ব্যাপারে তিন দেশে মিত্রতা—তিন দেশই ইংলণ্ডের শত্রু—তাই মস্কোর সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শ না ঘটলেও রোম বা বার্লিন তা আদায় করে দিতে পারবে এই ভরসায়ই ওদের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু না রাম না রহিম কোনো দিক থেকেই কোনো সাড়া নেই। তখন সুভাষ ভাবল, বাড়ির বার হই, নিজেই চেষ্টা করে দেখি। পায়ে হেঁটেই সীমান্ত পার হয়ে রাশিয়ায় যাই।

সুভাষ উত্তমচাঁদকে বললে, 'আমাকে রুশ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারে এমন একজন চলনদার আমাকে দিতে পারেন? আমি পায়ে হেঁটেই রাশিয়ায় যাব।

'কিন্তু সে পথ তো দারুণ দুর্গম।'

'দুর্গমকে আমি গ্রাহ্য করি না। পারমিট ছাড়া ঢোকার দরুণ রাশিয়ানরা আমাকে এ্যারেষ্ট করবে— তা করুক। না-হয় জেলে পুরবে—তা পুরুক। পরে সোভিয়েট গভর্নমেন্ট যখনই জানবে সুভাষ বোস তাদের জেলে আটক রয়েছে তক্ষুনি ছেড়ে দেবে আমাকে। আপনি চলনদার দেখুন। এই নির্জীব অবস্থাটা আর বরদাস্ত করতে পারছি না।'

সুভাষ তখুনি রাস্তায় বেরুবার জন্যে তৈরি।

'এ কী, কোথায় চললেন?' উত্তমচাঁদ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'এক জোড়া জুতো কিনে আনি।' নিজের পায়ের দিকে তাকাল সুভাষ: 'এটা দিয়ে আর চলছে না।'

ভকতরাম বললে, 'চলুন। আমি চিনি জুতোর দোকান।'

এতদিনে কাবুলের দোকান-বাজার সব রপ্ত করেছে ভকতরাম। রাস্তাঘাট সব তার নখদর্পনে।

'যাচ্ছেন যে,' উত্তমচাঁদ বাধা দিল: 'এমনি পাঠানি পোশাকে যাবেন না, আফগানি পোশাকে যান।'

উত্তমচাঁদ একপ্রস্থ আফগানি পোশাক এনে দিল—মায় টুপি পর্যন্ত। জুতোটা বেমানান—তা জুতো কিনতেই তো তিনি যাচ্ছেন। ভকতরাম সুভাষকে এক ভারতীয়ের দোকানে নিয়ে গেল। জুতো কেনা হয়ে গেল, উঠতে যাচ্ছে সুভাষ—দোকানদার জিজ্ঞেস করলে, আপনি কি ভারতীয়? সুভাষ চমকে উঠল। বুঝল কেনার প্রসঙ্গে তাতে আর ভকতরামে যে দু চারটে কথা হয়েছে তার থেকেই বুঝে নিয়েছে তাদের দেশ কোথায়। একটুকুও ঘাবড়াল না সুভাষ বললে, 'হ্যাঁ, আমি ভারতীয়—আমার নাম জিয়াউদ্দিন।'

'এখানে কী উপলক্ষে এসেছেন?'

'আমি এখানে হাবিবিয়া কলেজের প্রোফেসর।'

'হবিবিয়া কলেজ? ওখানকার সব ভারতীয় প্রোফেসরকে আমি চিনি। আপনার নাম শুনেছি বলে তো মনে হয় না।'

'আমি হালে এসেছি, এই দিন দশ বারো—'

'বা, খুশি হলাম। আমার খদ্দের বাড়ল। বসুন, একটু চা খেয়ে যান।'

আরেকদিন এসে খাব। আজ একটু তাড়া আছে।' হাসিমুখে বিদায় নিল জিয়াউদ্দিন।

পরে রহমৎকে বললে, 'দোকান থেকে আফগানিস্থানের একটা মানচিত্র কিনে আনো। ম্যাপ দেখে ঠিক করব কোন পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে রাশিয়ায় যাওয়া যায়।'

কী দুর্ধর্ষ সঙ্কল্প—ভকতরাম সুভাষের দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইল।

আফগানিস্থান ও রাশিয়ার মধ্যে হ্যাঙ্গো নদী। আগে বাস-এ করে মাজার-শরিফ পর্যন্ত যাও, তারপর পায়ে হেঁটে নদীর পারে পৌঁছোও। তারপর ভিস্তির ভেলায় চেপে নদী পার হও। নদীর ওপারেই সোভিয়েত দেশ।

চলনদার যাকে পাওয়া গেল সে একজন চোরা-কারবারি। চোরাই মাল নিয়ে নদীর এপার-ওপার করতে সে ওস্তাদ।

সুভাষ হেসে বললে 'তাহলে ওর হাতেই আমাকে সঁপে দিন। ও আমাকে ওপারে চালান করে দিক। আমি রাশিয়ার মুখ দেখি।'

চলনদার সাতশো আফগানি টাকা ঘুষ চায়। টাকার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না।

সে উত্তমচাঁদ দেখবে। আরো খবর জুটল চলনদার লোকটা নাকি জুয়াড়ি। তাতে কী যায় আসে? জুয়াড়ি বলেই তো এত বড় ঝুঁকি নিতে সাহস পায়। ও ঠিক দান ফেলবে। ঠিক পার করে দেবে। কিন্তু হঠাৎ দ্বিমতের কারণ এসে জুটল। ইটালি থেকে চিঠি এসেছে ওদের লোক আসছে সুভাষ বোসকে নিয়ে যেতে। ইতিমধ্যে সুভাষের একটা ফোটা তুলতে হবে। পাসপোর্টের সাথে ফোটো দরকার। এখন প্রশ্ন হল কোন পথে কোথায় যাওয়া? ইটালিতে না রাশিয়ায়? যন্ত্রযানে না, পায়ে হেঁটে।

উত্তমচাঁদ বললে, 'আমার মতে চলনদারের সাহায্যে রাশিয়ায় যাওয়াই সমীচীন। রাশিয়ায় গিয়ে পড়লে, যেখানেই হোক মস্কো আপনাকে ডেকে পাঠাবে ও আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। কিন্তু আপনাকে ইতালিয়ানরা একবার হাতে পেলে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।'

উত্তমচাঁদ বললে, 'আমার মতে চলনদারের সাহয্যে রাশিয়ায় যাওয়াই সমীচীন। রাশিয়ায় গিয়ে পড়লে, যেখানেই হোক মস্কো আপনাকে ডেকে পাঠাবে ও আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। কিন্তু আপনাকে ইতালিয়নরা একবার হাতে পেলে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।'

'আমারো সেই মত।' ভকতরাম সায় দিল।

'কিন্তু এখন দুই পরিস্থিতি তৌল করে দেখতে পাচ্ছি ইটালিয়ানদের সঙ্গ ধরাটাই ভালো।' সুভাষ বললে যুক্তিবাদীর মত: 'চলনদার লোকটি খুব বিশ্বাসভাজন নয় আর পথও বিপন্ময়। কে জানে রাশিয়ায় পৌঁছুবার আগেই আমি গ্রেপ্তার হয়ে যাব। কে জানে আগে-পরে জঙ্গলে-পাহাড়ে আমি খুনও হয়ে যেতে পারি। তখন তো আমার সঙ্গে কোনো রক্ষী নেই, রহমৎও নেই। এদিকে ইটালিয়ানদের সাহয্যে ইউরোপে চলে যাওয়াটা কত সহজ, কত নিরাপদ। এখন তো রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি, কে বলে আমাকে মস্কোতে যেতে দেবে না? আমার তো মনে হয় এখান থেকে যাওয়ার চেয়ে রোম বা বার্লিন থেকে যাওয়া বেশি সহজসাধ্য। তাছাড়া আমি মস্কোকে চাইলেও মস্কো আমাকে নেবে কিনা তার ঠিক কী। সুতরাং ঝোপের পাখির লোভে হাতের পাখি ছাড়া উচিত হবে না।'

'সেও একটা কথা বটে।' ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝল ভকতরাম।

ফোটো তোলাও কম হ্যাঙ্গামা নয়।

ইটাসির দূত জিয়াউদ্দিনকে খবর পাঠাল: অমুক রাস্তার অমুক জায়গায় অমুক নম্বরের একখানা গাড়ি বেলা এগারোটার সময় দাঁড়িয়ে থাকবে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে জিয়াউদ্দিন যেন সটান এগিয়ে এসে গাড়িতে উঠে পড়েন। গাড়ির ভিতরে যে একজন লোক থাকবে তাকেও কোনো প্রশ্ন করবার দরকার নেই। গাড়ি জিয়াউদ্দিনকে একটি নিভৃত স্থানে নিয়ে যাবে। কোথাও কোনো বিপদের ভয় নেই। সেখানে ফটো তোলা হবে। তারপর গাড়ি আবার তার যাত্রার আগেকার প্রথম জায়গায় ফিরে আসবে। নেমে যাবে জিয়াউদ্দিন।

এ অভিযানে রহমৎ তার সঙ্গী নয়, তবু একা-একাই এগিয়ে গেল জিয়াউদ্দিন। দেখি না নির্ভীককে নিয়তি কোথায় নিয়ে যায়। ফটো তোলা হল। এবার তবে পোশাক। মাপ-জোক দিতে দর্জির দোকানে যাওয়া চলবে না। দর্জিকে কোথাও ডেকে আনতে হবে। উত্তমচাঁদের বাড়িতে হতে পারে না—হিন্দুর বাড়িতে জিয়াউদ্দিনকে দেখে দর্জি কী ভাববে? হাজিসাহেব কি সাহায্য করবেন? এ তো বাড়িতে অতিথি করে রাখা নয়, খানিকক্ষণের জন্যে দর্জির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। উত্তমচাঁদ বলতে গেল।

হাজিসাহেব একবাক্যে রাজি। রাজির চেয়েও বেশি। বললে আপনি ভাববেন না, আমার

চেনা দর্জি আছে, তাকে ডেকে আনছি। বোসবাবুর বেরুবার দিন করে ঠিক হয়েছে?

'আঠারোই মার্চ।' উত্তমচাঁদ উদ্বিগ্নমুখে প্রশ্ন করল: 'দু সেট সুট—এর মধ্যে করে দিতে পারবে।?'

'খুব পারবে।'

দর্জি এল মাপ নিতে। হাজিসাহেবের মেহমান জিয়াউদ্দিন, হাবিবিয়া কলেজের প্রোফেসার—দর্জি মাপ নিল। কিন্তু ছলনার মাপ নিতে পারে দর্জির ফিতে পেন্সিলের সে সাধ্য নেই।

উত্তমচাঁদ হন্তদন্ত হয়ে হাজিসাহেবের কাছে আবার ছুটে এল। দূতাবাস থেকে চিঠি এসেছে জিয়াউদ্দিনের মালপত্র ষোল তারিখেই যেন তৈরী থাকে। মালপত্র আর কী, শুধু একটা সুটকেস। সেই সুটকেসে যদি সুট-ই না থাকে তাহলে তো কেলেঙ্কারি। দর্জিকে তাগাদা দিন। পনেরোই যেন দিয়ে যায় ঠিকঠাক।

তাগাদার মান রাখল দর্জি। কিন্তু একটা ভেস্ট কম পড়েছে।

দর্জি বললে, 'দু-তিনদিন পরে দিয়ে যাব।'

'পরে পেলে আর লাভ কী।' উত্তমচাঁদের মুখে কষ্টের কাষ্ঠ হাসি ফুটল।

'না, পরে পেলেও চলবে।' হাজিসাহেবের জার্মান স্ত্রী এগিয়ে এল। বললে, 'পেলেই আমি জার্মানিতে আমার বোনের কাছে পাঠিয়ে দেব। যার জিনিস তার ঠিকানা খুঁজে নিয়ে ঠিক তাকে পৌঁছে দেবে দেখো।'

ঠিক দিনে জিয়াউদ্দিনের সুটকেশ দূতাবাসে জমা হয়ে গেল। আফগান জিয়াউদ্দিনের ইটালিয়ান নাম এখন 'তাবাতাইন' ওরফে অর্ল্যাণ্ডো মাৎসোটা।

পরদিন সতেরোই সকালেই মাৎসোটা উত্তমচাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

সুভাষচন্দ্রকে প্রণাম করল উত্তমচাঁদ।

রহমৎ খাঁ তখনো আছে জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে। গাড়ি এল। মালপত্র উঠল। উঠল অর্ল্যাণ্ডো মাৎসোটা। গাড়িতে আরো দুজন যাত্রী। একজন ইটালির আরেকজন জার্মানির। জার্মান ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়র, নাম ডক্টর ওয়েলার। গাড়ির ড্রাইভার ইটালিয়ান।

'এবারে তবে যাই।' স্নেহপূর্ণ উদাস চোখে সুভাষ তাকাল ভকতরামের দিকে।

ওয়েলার বললে, 'হাজিসাহেবকে বোলো এবার থেকে যা যোগাযোগ করবার যেন আমার সঙ্গে করে।'

ভকতরাম একদৃষ্টে অপস্রিয়মাণ গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। এতদিনে, দুর্যোগের কালসাপকে শিয়রে নিয়ে বসবাস করার দুর্দিন শেষ হল। সিদ্ধির উল্লাসে ভকতরামের বুক ভরে উঠল কিন্তু, তবু, তবু তার দু চোখে বিষাদের মেঘ ঘনিয়ে এল।

কী উদারদর্শন মহদাশয় নেতা! স্থির চিত্ত, দৃঢ় বদ্ধপরিকর, বিগতভী। দেড় মাসের উপর কালা-বোবার অভিনয় করে গেলেন! কত কষ্ট কত ক্লেশ কত কৃচ্ছ্র তবু এতটুকু কাতরতা নেই। কত যুদ্ধ কত সংঘর্ষ কত আঘাত তবু এতটুকু বৈচিত্র্য নেই। বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, পর্বতের মধ্যে সুমেরু—এমন নেতা বুঝি আর হয় না। অথচ ব্যক্তিগত সম্পর্কে কি মধুর, আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয়। সাধে কি আর ভকতরামের চোখ ছলছল করে? অথচ প্রাপ্তব্য কী লক্ষ্য কী? কোনো আত্মোদরপূর্তি নয়, দেশের স্বাধীনতা, আপামর সর্বসাধারণের শোষণমুক্তি। সেই যুদ্ধে, তুমি, ভকতরাম, তুমিই বা কম কিসে? কে যেন ফিসফিস করে বললে কানে কানে।

চমকে উঠল ভকতরাম। এ কি, মাৎসোটা সাহেব নাকি? না, মৌলভি জিয়াউদ্দিন! ভকতরাম চোখ মুছে ফেলল। না, কেউ নয়, শুধু সুভাষ বোস। ইউরোপ-এশিয়া জুড়ে শুধু এক নাম, এক নেতা, এক গরীয়ান ব্যক্তিত্ব।

ভকতরাম ফিরে এসে উত্তমচাঁদকে খবর দিলে। গাড়ি বোসবাবুকে নিয়ে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সকলে।

হাজিসাহেব বললে, 'পাসপোর্ট ইটালিয়ান হলে কী হবে, ওয়েলার চাইবে বোস-বাবুকে জার্মানিতে নিয়ে যেতে।'

'ইটালিও সহজে ছেড়ে দেবে না।' উত্তমচাঁদ হাসল: 'জার্মানি আর ইটালি একদলে থাকলে কী হবে, আসলে ওরা পরস্পরকে অবিশ্বাস করে।'

একে-অন্যের শত্রু কিন্তু যেহেতু দুজনের একই প্রতিপক্ষ তখন দুই শত্রুতে বন্ধুতা। এ তো সহজ রাজনীতি। তাই জার্মানি-ইটালি আমাদের বন্ধু কেননা আমাদের সকলেরই এক শত্রু—ইংলণ্ড।

'কিন্তু বোসবাবুর লক্ষ্য তো মস্কো।' বললে ভকতরাম, 'তাঁরা তো সীমান্ত পেরিয়ে ট্রেনে করে মস্কোই চলেছেন।'

'সেই ভরসা।' হাজিসাহেব গম্ভীর মুখে বললে, 'কিন্তু ওঁর পাসপোর্ট তো ইটালিয়ান।

'ও কথা ভেবে আর কী হবে?' উত্তমচাঁদ বললে হাসিমুখে, 'নিয়তি পথ নির্দিষ্ট করে রেখেছে, দিগ্বিজয়ী ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে যাবে সেই পথ ধরে।' তারপর হঠাৎ ভকতরামের ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রশ্ন করল: 'যাবার সময় তোমাকে কী বললেন বোসবাবু?'

'বললেন খুব সাবধানে থেকো।'

উত্তমচাঁদ হাসল: 'আমাকেও বলে গেছেন সেই কথা। তিনি জানেন, সবাই জানে, যখন দেখা যাবে পাখি শুধু খাঁচা ভেঙে উড়ে পালায়নি, বিদেশী বৃক্ষে গিয়ে বাসা বেঁধেছে তখনই শুরু হবে ইংলণ্ডের ডাণ্ডাবাজি। সত্যি ভকতরাম, খুব হুঁশিয়ার।'

'আমি আজই ভারতবর্ষে রওনা হচ্ছি। কিন্তু আপনাকে বলে যাচ্ছি কোনো গোয়েন্দারই সাধ্য নেই আমার সন্ধান পায়।'

কয়েকদিন পর জার্মান দূতাবাস থেকে হাজিসাহেবের কাছে খবর এল ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য নেতা সুভাষচন্দ্র বসু ২৮শে মার্চ বার্লিনে পৌঁচেছেন।

প্রায় তিনমাস পরে হাজিসাহেবের স্ত্রীর কাছে জার্মান ভাষায় চিঠি লিখল সুভাষ। বার্লিনে তাঁর যে বোন আছে তার মারফত বাকি ওয়েস্টকোটটা পাওয়া গিয়েছে, তারই সুসংবাদ। আর কিছু ধন্যবাদ উত্তমচাঁদকে। হাজিসাহেবের স্ত্রী জায়গাটা অনুবাদ করে পড়ে শোনালেন। 'আপনি আমার জন্যে যা করেছেন তার জন্যে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার ঋণ অপরিশোধ্য।'

আমি কি করেছি!

কী করেছ? কাবুলের পুলিশ এতদিনে সচকিত হল—ধরল উত্তমচাঁদকে। তাকে আফগানিস্থান থেকে বহিষ্কৃত করে দিল। তার রেডিওর দোকান বাজেয়াপ্ত করল। লক্ষ টাকার দোকান জলের দরে নিলেম হয়ে গেল। সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরল ভারতবর্ষে। সেখানে ইংরেজের বন্দীনিবাসে। পাষাণকারায়।

কী করেছি আমি! স্বাধীনতার যজ্ঞে নিজের সমস্ত স্বার্থকে আহুতি করে বিনিঃশেষ

উৎসর্গ করেছি। কিন্তু ভকতরাম?

শত চেষ্টা করেও তার কোনো হদিস করা গেল না। কোথায় সে অদৃশ্য হল, কেমন করে, কারু জানা নেই।

ইংরেজের পুলিশ শেষ পর্যন্ত ধরল এসে আবাদ খাঁকে।

বলো, কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেলে জিয়াউদ্দিনকে। দলে কে-কে ছিল? কারা মদত দিয়েছে? কারা? বলো বলছি।

বলব না। কিছুতেই বলব না। মারের পর মার, প্রচণ্ড প্রহার, তবু মুখ খুলল না আবাদ খাঁ। না, না, কিছুতেই বলব না। প্রাণ নাও কিন্তু জবান নিতে পারবে না।

কোথা থেকে পেল এই লোহার মেরুদণ্ড? এই বজ্রসার প্রতিজ্ঞা?

তিন

আফগানিস্থানের সীমান্ত শহর পাটাকেসর। নদী পেরিয়ে গাড়ি সুভাষকে নিয়ে থামল টারমিজ-এ রুশ এলাকায়। সেখান থেকে ট্রেনে করে মস্কো। নতুন দিগন্তের দেশ। সর্বতীর্থসার মানবতার পুণ্যক্ষেত্র।

'তুমি তো ইটালিয়ান, অর্ল্যাণ্ডো মাৎসোটা,' বললে ওয়েলার, 'তবে তুমি এত গম্ভীর, নিরানন্দ কেন? ইটালিয়ানরা তো খুব ফুর্তিবাজ, চপল-চটুল—'

ঠিকই তো। সুভাষ নড়ে-চড়ে বসল, হাসল স্বচ্ছমুখে। বললে, 'হ্যাঁ, আমি ইটালিয়ান—'

'তবে তুমি স্মোক কর না কেন? ড্রিঙ্ক কর না কেন? ইটালিয়ান কি ও দুটো দ্রব্যের থেকে দূরে থাকে?

কথাটা সুভাষের বিবেচনায় দামি মনে হল। সত্যিই তো যদি সে এমনি নিবৃত্তি-পরায়ণ থাকে তবে তার পক্ষে মাৎসোটার অভিনয় যথার্থ হবে না। কম পড়ে যাবে। কম পড়লেই লোকের সন্দেহ বা কৌতূহলের বিষয় হয়ে পড়বে। ঠিক বলেছে ওয়েলার। যখন যেমন তখন তেমন। কাবুলে থাকতে জিয়াউদ্দিনের ভূমিকায় কত সে অখাদ্য খেয়েছে। এখানকার পরিস্থিতিতে অন্য সব সংস্কারও বর্জন করতে হবে। যেমন দেশ তেমনি বেশ। যেমন কলি তেমন চলি।

তারপর কী অসহ্য শীত। সমরখন্দের কাছে সুভাষ ওয়েলারের উদ্দেশে হাত বাড়াল: 'দিন একটা সিগারেট দিন।' জীবনে সেই প্রথম ধূমপান করল সুভাষ।

সোভিয়েত দেশ সরকারী ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। তার তখন জার্মানিও মিত্র, ইংলণ্ডও মিত্র—তার দুদিকেই শান্তি ও অনাক্রমণ। সুতরাং ইংলণ্ডের অখণ্ড শত্রু সুভাষকে সংবর্ধনা করে নিতে সে অক্ষম। সহানুভূতি থাকলেও অপারগ। কাজে-কাজেই যেখানে সে চলেছে সে সেখানেই যাক।.না, রাশিয়া কোনো বাধাও দেবে না। বরং যে দুর্দিন সে এখানে আছে তার সমস্ত সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেবে।

উদ্বেল সৌহার্দ্যে রমণীয় ব্যবস্থা। আর সেইখানে সুভাষ প্রথম মদ্যপান করল।

কত দিনের দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার। সিগারেট খাব না, মদ ছোঁব না। ত্যাগীর রাজা সুভাষ দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সে সব ছেড়েছে—সে সব ছাড়তে পারে। চাকরি-বাকরি আরাম-বিরাম বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজন প্রভাব-প্রতিপত্তি—সমস্ত ছেড়েছে, এখন এতদিনকার সযত্নলালিত সংস্কারও ছেড়ে দিল। ঐ সংস্কার না ছাড়লে সুভাষকে সন্দেহভাজন হতে হয়, অন্তে তার এত কষ্ট করে ইউরোপ পালিয়ে আসার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে। সে তো এখন পুরোপুরি

ইটালিয়ান। তার বিবেচনায় সর্বাগ্রস্থানীয় দেশের স্বাধীনতা।

'কী খেলাম জানো? ভদকা।' এমিলি শেঙ্কলকে বললে সুভাষ, 'ইট বার্নট্ মি।'

কিন্তু কে এমিলি শেঙ্কল?

এমিলি সুভাষের সেক্রেটারি। যখন সুভাষ ভিয়েনায়, স্বাস্থ্যনিবাসে, তখন থেকে তার সে সহায়িকা। সুভাষের বক্তৃতার ও বক্তব্যের সে নোট নেয়, টাইপ করে। অনলস কর্মের মধ্যে একটু বা মমতার স্পর্শ রাখে। তারপর সুভাষ যখন তার ইণ্ডিয়ান-স্ট্রাগল লিখল, সমস্ত পাণ্ডুলিপি টাইপ করেছে শেঙ্কল। প্রকাশ ও প্রচারের ব্যাপারেও প্রভূত খেটেছে। তারপরে দীর্ঘ সাহচর্যের থেকে দুজনের মধ্যে জেগেছে বন্ধুত্ব। অন্তর-বিনিময়।

এমিলি সুভাষের সহধর্মিনী। তাদের একটি মেয়ে—অনিতা।

মস্কো থেকে বিমানে করে বার্লিন। বার্লিনে মাৎসোটাকে বাড়ি দেওয়া হল ৬নং সোফিয়েনস্ট্রাসে। সেটা আগে ছিল ব্রিটিশ দূতাবাস, এখন সুভাষ-ভবন।

হিটলারের জার্মানি সুভাষের প্রতি প্রীতিপ্রেরিত নয়। কাবুলের জার্মান রাষ্ট্রদূতের ভাব-ভঙ্গি থেকেই তা বোঝা গেছে। বস্তুত সুভাষ তো নাৎসিবাদের স্বস্তিবাদক নয়—যদিও হিটলারের পাতাকা চিহ্ন স্বস্তিকা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই সুভাষের অকৃত্রিম কামনার ধন আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থই হচ্ছে ব্রিটিশ প্রভুত্বের উচ্ছেদ, আর সম্প্রতি হিটলার সেই ব্রিটিশ প্রভুত্বকে পরাস্ত করবার জন্যেই যুদ্ধোন্মত্ত। সুতরাং শত্রু যখন এক, তখন জার্মানি আর ভারতবর্ষ তো বন্ধু। ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে জার্মানির সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, কিন্তু এক শর্তে। শর্তটি কী, সুভাষ গোপন পত্রে জানাল হিটলারকে।

শর্ত এই: ইংলণ্ডকে পরাভূত করে অক্ষশক্তি যখন জয়ী হবে তখন স্বতঃসিদ্ধভাবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। এই ন্যায্য প্রতিশ্রুতিটুকু পেলেই ভারতবর্ষের রোষানল এসে যুক্ত হবে অক্ষশক্তির রণানলের সঙ্গে। জানবেন প্রত্যেকটি ভারতবাসী সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের শত্রু এবং প্রত্যেকটি ভারতবাসীই প্রসুপ্ত বারুদের স্তূপ।

কিন্তু জার্মান পররাষ্ট্রদপ্তর থেকে চিঠির কোনো উত্তর নেই।

জার্মানি তখন যুদ্ধের নতুন পরিকল্পনা তৈরী করছে, তখন ভারতবর্ষ নিয়ে মাথা ঘামাবার তার সময় আছে কি?

ব্রিটিশ প্রভুত্বকে পর্যুদস্ত করার পক্ষে ভারতবর্ষ যে কত বড় শক্তি তা যেন জার্মানি বুঝতে চাইছে না। না, তাদের সুভাষকে অবিশ্বাস? জার্মান সরকার গড়িমসি করতে চাইলেও ইটালিয়ান সরকারের কোনো দ্বিধা ছিল না। ইটালির রাষ্ট্রদূতের বিবরণ উৎসাহব্যঞ্জক।

'সুভাষ বোসকে আমরা জানি। জানি তাঁর কাজ থেকে। তাঁর উজ্জ্বলন্ত ব্যক্তিত্ব থেকে। তাঁর সামর্থ্য ও যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে তিনি এক অনন্য পুরুষ।

তাঁর প্রথম কাজ হবে ইউরোপে কোথাও একটি অস্থায়ী স্বাধীন গভর্ণমেন্ট গঠন করা। শুধু গঠন করা নয়, বিশ্বের দরবারে তা ঘোষণা করা। তিনি আশা করেন ইটালি জার্মানি ও জাপান অবিলম্বে তাঁর গভর্নমেণ্টকে স্বীকৃতি দেবে। ভারতবর্ষ বিপ্লবের জন্যে উন্মুখ। যদি একবার জার্মানি কি ইটালি কি জাপান ভারতের সীমান্তে গিয়ে দাঁড়াতে পারে,—তাহলে ভারতীয় সৈন্য অবলীলায় ইংরেজ পক্ষ ছেড়ে চলে আসবে। যুগপৎ বিদ্রোহ করবে জনসাধারণ। দেখতে দেখতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমাধি ঘটবে।'

কিন্তু এ মুহূর্তে সুভাষ তো বার্লিনে। বার্লিন তার প্রস্তাবে কতটা সাড়া দিচ্ছে সেইটেই

প্রশ্ন। কই তার চিঠির উত্তর তো এখনো এল না। আর কত অপেক্ষা করবে? সময়ই সব চেয়ে মূল্যবান। কাবুলে থেকে যত না বুঝেছে এখন বার্লিনে বসে বুঝছে তার শতগুণ।

অর্ল্যাণ্ডো মাৎসোটা একদিন জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে সশরীরে এসে হাজির হল। নিজেকেই নিজের পথ করে নিতে হবে। কিছুতেই প্রতিহত হব না। ভাগ্য বুঝি সদয় হল। মুখোমুখি আলাপ হল অ্যাডাম ফন ট্রট ও তার সহকারী আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থের সঙ্গে। স্পেশাল ইণ্ডিয়া ডিভিশনের প্রধান হচ্ছে ট্রট আর ওয়ার্থ তার ডান হাত। বৈদেশিক দপ্তরে প্রাচ্য সমস্যা সম্পর্কে

এই সুভাষ বোস! দেশের স্বাধীনতার ক্ষুধার যে জলন্ত হুতাশন। উজ্জ্বল চোখে সম্বর্ধনা করল ট্রট। ওয়ার্থও হাত বাড়াল।

বলুন আপনার কী পরিকল্পনা। আমরা কী ভাবে কত দূর কী সাহায্য করতে পারি!

পরিকল্পনা সেই একটাই। এখানে কোথাও স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা। সেই গভর্নমেন্টকে ইটালি জার্মানি ও জাপানের মেনে নেওয়া। তার মানেই ঐ তিনদেশের এই নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে যুদ্ধজয়ের পর ভারতের স্বাধীনতা অবধারিত—তখন আবার কেউ যেন না তার দিকে শোষণের হাত বাড়ায়। নতুন করে তাকে না শৃঙ্খলিত করে।

ট্রট আর তার সহকারী উৎসাহে উদ্বেল হয়ে উঠল। চমৎকার প্রস্তাব। বিদ্রোহী ভারতবর্ষের বন্ধুতা অক্ষশক্তির পক্ষে এক মজবুত হাতিয়ার।

চলুন রিবেনট্রপ আর গোয়েবলসের কাছে নিয়ে যাই। পরামর্শ করি।

পররাষ্ট্র সচিব রিবেনট্রপ আর প্রচার-অধিকর্তা গোয়েবলস। একটা ডাহা মিথ্যে কথা উচ্চনাদে বারে বারে বললেই সত্য হয়ে যায়—এই যার বিশ্বাস সেই গোয়েবলস। আর পৃথিবীর সমস্ত অশান্তির মূলে আছে ইহুদিরা এই যার অন্ধ সংস্কার সেই রিবেনট্রপ। তারা সুভাষকে আশ্বস্ত করল, দেখা যাক কী করা যায়।

আমি চাই জার্মানি ইটালি আর জাপান একটি সম্মিলিত ঘোষণা করুক যে তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে। এই যুক্ত বিবৃতির প্রতিশ্রুতি পেলেই আমি ভারতীয় বিপ্লবকে এই মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রণ করে আনব। আর আমাদের সকলের শত্রু যে ইংলণ্ড তার পতন হবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিতে রাজি হল মুসোলিনি। রাজি হল ওসিমা, বার্লিনে অবস্থিত জাপানের রাষ্ট্রদূত। কিন্তু হিটলার গা করল না। বললে, যুক্ত বিবৃতির এখনো সময় আসেনি।

আসলে ইংরেজের প্রতি চেতনার গভীরে কিছু বুঝি মমতা ছিল হিটলারের। যুদ্ধে অবিশ্রান্ত বোমা-বর্ষণে ইংলণ্ড ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে যাক, পরাজিত হয়ে তার পদতলে বসে সন্ধি স্থাপন করুক, সুযোগ-সুবিধের সিংহভাগ জার্মানির হোক, এই হিটলারের অভীষ্ট। তাই বলে ইংলণ্ড তার সাম্রাজ্য খুইয়ে, অর্থাৎ সর্বস্ব খুইয়ে, একেবারে বেকার হয়ে যাক এটা কি সুসদৃশ? হিটলারের আসল শত্রু ফ্রান্স আর রাশিয়া। ফ্রান্স তো আগেই ঘায়েল হয়েছে এখন শুধু রাশিয়াকে সজুত করা। এই সময় মানচিত্রে কোথায় কোন ভারতবর্ষ!

কিন্তু এটা কেন বুঝতে পাচ্ছেন না যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ থেকেই সমস্ত শক্তি আহরণ করে কাজে লাগাচ্ছে। হরণ করেই তার আহরণ। শোষণ করেই তার প্রপূরণ। এই ভারতবর্ষকে যদি ব্রিটিশের কব্জা থেকে আলগা করে ফেলা যায় তবে সে ইংলণ্ড একেবারে নাজেহাল। ইংলণ্ডের মেরুদণ্ড ভেঙে যাক, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমে সে অবস্থাটা কি জার্মানির কাম্য নয়?

সেও একটা কথা বটে। তবে, পরের কথা পরে, আপাতত সুভাষ বোস এখানে থেকে স্বাধীনতার জন্যে যা করতে চাচ্ছেন তা করুক, জার্মানি তাতে বাদ সাধবে না। তাই বা কম কী। বিরাট সংগঠক, সুভাষ ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টার বা আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ গড়ে তুলল। এই আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ থেকেই কালক্রমে গড়ে উঠল আজাদ হিন্দ সরকার। জার্মানি এখন পিছিয়ে থাকলে কী হবে, যখন পূর্ব এশিয়ায় সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হল তখন তাকে স্বীকৃতি দিতে সে এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না, দেরি করল না। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের জন্যে আজাদ হিন্দ রেডিও। যুদ্ধের অনেক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে প্রচারযন্ত্র একটা প্রবল প্রহরণ। মিথ্যাকে পুনরাবৃত্তিতে সত্য করে তোলা নয়, মিথ্যার মোহে এখনো যারা আচ্ছন্ন আছে তাদের কাছে পরাধীনতার যন্ত্রণাকে প্রজ্বলন্ত সত্য করে তোলা। যারা এখনো নৈরাজ্যে নিমজ্জিত আছে তাদেরকে সাহসে-সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ করে বিপ্লববুদ্ধিতে নামিয়ে দেওয়া। নিশ্চেতন ছাপার অক্ষরে বিশেষ কিছু কাজ হবে না, চাই প্রতপ্ত কণ্ঠস্বর। চাই অভ্রান্ত প্রাণস্পর্শ। অমেয় আন্তরিকতা।

আমি এসেছি। আমি আছি। আমি বলছি।

হ্যাঁ, নির্ভুল সুভাষের কণ্ঠস্বর। সমস্ত ভারত উচ্চকিত হয়ে উঠল। আনন্দ আস্তীর্ণ হল দিকে দিকে। ভারতের গৌরব-রবি এখনো মধ্য গগনে দীপ্যমান। তবে আর ভয় নেই। ক্লৈব্য পরিহার করে একবার তবে যুদ্ধে যোগযুক্ত হও। নেতাজী ডেকেছেন।

এই একটা মাইকের অভাব ইম্ফল রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজকে কী ভীষণ দুর্বল করে ফেলেছিল। অন্য উপকরণ না থাক যদি অন্তত একটা মাইক থাকত! যদি লাউড স্পিকারে নেতাজী ব্রিটিশ পক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের একবার সম্ভাষণ করতে পারতেন! যদি একবার ওদের বুঝিয়ে বলতে পারতেন কাদের সঙ্গে ওরা লড়ছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ কোনো জাপানী পঞ্চম বাহিনী নয়, ভারতের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী সৈনিকদল। তার সর্বাধিনায়ক সুভাষ বোস। ঠিক ওরা চিনত কণ্ঠস্বর। প্রাণে লাগত এসে আন্তরিকতার বহ্নিস্পর্শ। মুহূর্তে ম্যাজিক হয়ে যেত। ব্রিটিশের মাইনে-করা সৈনিকেরা মুহূর্তে ভারতীয় সৈনিক হয়ে যেত। দলে দলে চলে আসত এদিকে। সঙ্গে করে নিয়ে আসত রণসম্ভার। আর কিছু দেখতে হত না। চলো দিল্লী চলো। ধূর্তামি করবার অবকাশ না পেয়ে ইংরেজ পালাত ঊর্ধ্বশ্বাসে। ঠিক-ঠাক চেহারায় স্বাধীনতা আসত।

সামান্য একটা মাইক—একটা লাউড স্পিকার। সমস্ত সমরোপকরণের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী সব চেয়ে দুর্বারণ। নিমেষে দেড় লাখ ভারতীয় সৈন্যকে নিয়ে আসা যেত নেতাজীর পতাকার নিচে।

আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের পরিকল্পনা জার্মানির বৈদেশিক দপ্তরে পেশ করা হল। প্রথম কাজ প্রচার। রেডিওর মাধ্যমে নানা ভাষায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সপক্ষে বক্তৃতা দেওয়া হবে। শুধু ভারতের অভ্যন্তরে নয়, বহির্বিশ্বে। বোঝানো হবে কেন ব্রিটিশের উৎখাত চাই। ইংরেজ শাসক কী ভীষণ অমানুষ! সভ্যতার খোলসে বর্বরতম ব্যভিচার।

আর, দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন। অর্থাৎ যত ভারতীয় যুদ্ধবন্দী জার্মানির হাতে আসবে তার থেকে বাছাই করে মুক্তি বাহিনী তৈরী করা। অর্থাৎ ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা জার্মানির কারাগারে পচবে না, তারা ফের যুদ্ধ করবে—এবার আর পেটের জন্য নয়, প্রাণের জন্যে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবে ব্রিটিশ বা বিদেশী

সেনাপতির অধীনস্থ হয়ে নয়, তাদের আপনজন নেতাজীর নেতৃত্বে।

কি, রাজি?

রাজি। ফন ট্রট আশ্বাস দিল।

শোনো, আমাদের প্রতিষ্ঠান হবে সম্পূর্ণ জাতীয় সংস্থা। আমাদের ব্যাপারে তোমরা আদৌ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, আর আমরাও তোমাদের ব্যাপারে যাব না নাক গলাতে। কোন রাষ্ট্র তোমাদের শত্রু কি মিত্র, কার সঙ্গে তোমাদের কী বোঝাপড়া তা নিয়ে আমরা ব্যস্ত হতে যাব না। একটি রাষ্ট্রই মাত্র আমাদের শত্রু, আর তার সঙ্গে আমাদের একটাই মাত্র বোঝাপড়া—সে হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা, তার এক চুল কম নয়, এক ইঞ্চি ফারাক নয়।

কি, রাজি?

রাজি। দেশকে এমন যে ভালোবাসে, যে দেশের জন্যে প্রাণ তো তুচ্ছ কথা, ইহ-পর সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে, যে শুধু স্বপ্নই দেখে না, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্যে মরুভূমিতেও পথ কাটে, তার ব্যক্তিত্বকে সম্মান না করে উপায় কী।

আরো এক কথা। আমাদের মুক্তিবাহিনীর সৈন্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ভার নিতে হবে তোমাদের। তোমরাই মিলিটারি অফিসর ও টেকনিশিয়ান নিযুক্ত করবে। খরচ যা পড়ে তার হিসেব রাখবে। আমাদেব স্বাধীন হবার পর সুদে-আসলে আমরা তা শোধ করে দেব। আমরা ইংবেজেব মত কথাব খেলাপ করিনে।

আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি। বললে ওয়ার্থ।

এবার ইউরোপে কে কোথায় স্বাধীনতাকামী ভারতীয় আছে তাদের খোঁজ নিতে লাগল সুভাষ। ঠিকানা সংগ্রহ কবল। অর্ল্যাণ্ডো মাৎসোটার নামে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। সাদাসিধে চায়ের নেমন্তন্ন। আসুন একটা ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হই।

কে এই মাৎসোটা? যে বসিক সন্ধান জানে, সে বুঝুক। সুভায নাম বৈধ নয়, কাগজে-কলমে আনুষ্ঠানিক নাম অর্ল্যাণ্ডো মাৎসোটা।

এদিকে রোমহর্যক কাণ্ড ঘটে গেল। অবিশ্বাস্য কাণ্ড। বাইশে জুন সূর্যোদয়ে জার্মানি হঠাৎ রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনাক্রমণ চুক্তি কী হল?

চুক্তি তো শুধু সুবিধাবাদের ছলনা। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে ঘায়েল করতে ব্যস্ত আছি, ততদিন হে রাশিয়া, তুমি নিরস্ত থাকো, ববং ফিনল্যাণ্ডের দিকে যাও, আমাকে বিব্রত করতে এস না। হিটলারের শুধু বকধার্মিক সেজে চুপ করে মুহূর্ত গোণা। আসলে তার স্বপ্ন তো সমস্ত ইউরোপে তার একনায়কত্ব হাসিল করা। স্পেন থেকে রাশিয়া সমস্ত ভূ-ভাগ গ্রাস করারই লালসা। আমাকে আরো স্থান দাও, দাও প্রসার-ক্ষেত্র, হাত-পা মেলে ছড়িয়ে থাকার আরাম যেমন আমেরিকার আছে, রাশিয়ার আছে— দাও তেমনি বিস্তর বিস্তার। ছোট সীমার মধ্যে নিমীলিত হয়ে থাকতে পারি না। পুঁচকে দ্বীপ একটা ইংলণ্ড, তারও দেখ সূর্য-অস্ত-যায় না এমনি সাম্রাজ্য আছে! সহ্য হয় না স্থান-সঙ্কোচ। দুর্বারণ হিটলার বিপুল বিক্রমে রাশিয়াকে আক্রমণ করে বসল।

পর পর সাফল্যে খুন তখন হিটলারের মাথায় চড়েছে। পোল্যাণ্ড গেছে, ডানকার্ক গেছে, বলকান গেছে। গ্রীসও আত্মসমর্পণ করেছে। ক্রীটও পদানত। বোমায়-বোমায় ইংলণ্ডও যায়-যায়। এই সোনার সময়। লোহা গরম থাকতে থাকতেই হাতুড়ির ঘা মারো। চলো লেনিনগ্রাদ। অধিক খেতে করে আশা তার নাম বুদ্ধিনাশা। বুদ্ধিনাশা না হলে কেউ দুহাজার মাইল বিস্তীর্ণ রুশ-সীমান্ত

ভেদ করতে যায়? জার্মানির আক্রমণে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। রাশিয়াও প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল কেউ এমনি ভদ্রলোকের চুক্তি ভাঙতে পারে?

কিন্তু চার্চিলের কী আনন্দ! যা শত্রু পরে-পরে। রাশিয়া তো নিঃসন্দেহে ইংলণ্ডের শত্রু যে ইংলণ্ড ধনতন্ত্রের উপাসক, সাম্রাজ্যবাদের পুরোধা। যদি এ সংঘর্ষে রাশিয়া ঘায়েল হয় তবে সেটা তো ইংলণ্ডের প্রাণের আরাম। আর যদি জার্মানি ঘায়েল হয় তবে তো কথাই নেই। হিটলারকে হারাতে চার্চিল নরকের সঙ্গে মিতালি করতেও প্রস্তুত। বাইশে জুন রাত্রেই চার্চিল রাশিয়ার উদ্দেশে প্রাণস্পর্শী আশ্বাসবাণী পাঠাল। রাশিয়ার এ বিপদে ইংলণ্ড উদার হাতে সাহায্য করবে। শুধু দাতার হাতে নয় বন্ধুতার হাতে। যে হিটলারের শত্রু সে যতই অপছন্দের লোক হোক সে চার্চিলের স্বজন। রাশিয়া কোন ছার, হিটলার যদি নরক আক্রমণ করে তবে চার্চিল নরকের অধিকর্তার সঙ্গে শুধু সহানুভূতি করবে না, সহযোগিতা করবে।

চার্চিলের রেডিও ভাষণে এতটুকুও তৃপ্ত হল না স্ট্যালিন। শুধু কথায় কি বরফ গলে? চার্চিল তো অবাক। দরাজ কণ্ঠে বদান্যতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তবু এতটুকু সাড়া নেই? টেলিগ্রাম পাঠাও। একটায় স্পন্দন না জাগে, আরেকটা। ভাষাটা আরো গাঢ় আরো রংদার করো। ফুলঝুরি ফোটাও।

শুধু টন-টন কথা, এক আউন্স কাজ নয়। শুধু সৌখিন মৌলিকতা। তা দিয়ে স্ট্যালিনের কী এগোবে? একটা সেকেণ্ড ফ্রন্ট খুলতে পারো?

শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল স্ট্যালিন: সহানুভূতিটা কথায় না দেখিয়ে কাজে দেখান। পূবে আমরা হিটলারকে ঠেকাচ্ছি আপনারা পশ্চিমে একটা সেকেণ্ড ফ্রন্ট খুলুন। দু মুখো আক্রমণের ধাক্কায় হিটলার সহজেই নাজেহাল হয়ে পড়বে।

চার্চিলের আর উচ্চবাচ্য নেই। সে শুধু কাল হরণ করতে লাগল। সেকেণ্ড ফ্রন্ট খোলার নামও করল না।

এখন সুভাষ কী করে? সে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কিছু জানে না। তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। তার একমাত্র অন্তরায় ইংলণ্ড। তার একমাত্র অরাতি ইংলণ্ড। অন্য দেশের যুদ্ধ বিগ্রহে তার কোনো সংশ্লেষ নেই। সে শুধু বোঝে ইংলণ্ডের পরাজয়। সে শুধু বোঝে আজাদ হিন্দের অভ্যুদয়। তার শুধু এক মন্ত্র জয় হিন্দ।

মাৎসোটার ডাকে দোসরা নভেম্বর আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের প্রথম বৈঠক বসল। এল নাম্বিয়ার, এল গনপুলে, এল আবিদ হাসান। গিরিজা মুখার্জি, প্রমোদ দাশগুপ্ত, কান্তরাম। ডক্টর মল্লিক, ডক্টর সুলতান, এম ভি. রাও, বালকৃষ্ণ শর্মা। কজন ভারত-অনুরাগী অস্ট্রিয়ান বন্ধু নিয়ে এল এমিলি শেঙ্কল। তাদের মধ্যে একজন লিওপোল্ড ফিশার।

'এই সুভাষ বোস!' বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ফিশার।

ইংরেজদের রটানো গুজব সুভাষ বোস মারা গেছে এই শোনা ছিল ফিশারের। নিমন্ত্রণে যখন ডেকেছেন তখন গুজবটা যে মিথ্যে তাতে আর সন্দেহ নেই। তবু একবার স্বচক্ষে দেখে আসি কেমনতরো বেঁচে আছেন! দেখেই অভিভূত ফিশার। শুধু বেঁচে আছেন নয়, প্রদীপ্ত দিব্যাগ্নিশিখার মত বেঁচে আছেন। উন্নত শির, দীর্ঘায়ত দেহ, উজ্জ্বল-বিশাল চক্ষু। যুদ্ধজয়ের সঙ্কল্পে দৃঢ়ীভূত ব্যক্তিত্ব। তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল ফিশার।

বললে, 'সেই থেকে আর ঘরে ফিরিনি। নেতাজীর সঙ্গে ভর্তি হয়ে গেলাম।'

সেই সভাতেই দলের নাম হল আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ। দলপতি সুভাষের নাম নেতাজী।

আর মন্ত্র কী? জাগরণের মন্ত্র, উজ্জীবনের মন্ত্র, উদযাপনের মন্ত্র! মন্ত্র জয় হিন্দ। আসমুদ্র হিমাচল একীকরণের মন্ত্র এই জয় হিন্দ।

বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্। সুভাষের জয় হিন্দ।

কিশারও নাম বদলাল। হল রামচন্দ্র। তারপরে আরো পরে—সন্ন্যাস নিল। তার সন্ন্যাস-নাম অগেহানন্দ। বই লিখল—বইয়ের নাম, 'ওকার রোবস'—গেরুয়ার আলখাল্লা।

প্রতিষ্ঠানের সরকারি অফিসের ইংরিজি নাম ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার। তার মানেই আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ। কর্মীর সংখ্যা গোড়ায় অতি সামান্যই। দিনে দিনে তা বাড়তে লাগল। আগে আগে যখনই সুভাষ এসেছে ইউরোপে সর্বত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বাণীই প্রচার করেছে। ভিয়েনায়, প্রাগে, ওয়ারশতে, বার্লিনে, রোমে, লণ্ডনে, ডাবলিনে। দিকে দিকে তার নাম রটেছে—ভারতের চলন্ত রাষ্ট্রদূত। শুধু চলন্ত নয়, জ্বলন্ত রাষ্ট্রদূত। কত বিদেশী ভারতের বন্ধু হয়েছে, শুধু হৃদয়ের উত্তাপই দেয়নি, দিয়েছে সহযোগিতার স্পর্শ।

প্রচার আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আমরা স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন করেছি। জনগণমন-অধিনায়কই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। আমরা আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে যাচ্ছি দিল্লির দিকে। তোমরা, আমার ভারতের ভাই-বোন, তোমরাও বিপ্লবে উত্থিত হও। বলো জয় হিন্দ।

এখন কাজ হবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা। এ কি শুধু কথার ফুলঝুরি, না কি কাগজে-কলমে অঙ্ক কষা? সুভাষ প্রত্যক্ষ প্রস্তাব দিল। আফ্রিকার যুদ্ধে জার্মানির ফিল্ড মার্শাল রোমেলের হাতে বহু ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছে। তাদের একটা মোটা দল আটক রয়েছে ড্রেসডেনের কাছে আনাবুর্গ শিবিরে। ওদেরকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ওদের দিয়ে স্বাধীন ভারতের ফৌজ গাড়ি।

সামরিক বিভাগের সঙ্গে কথা চালাচালি করে কি এ প্রস্তাবের দ্রুত রূপায়ণ হবে? সুভাষ চঞ্চল হয়ে উঠল। এমনিতে ধীর স্থির শান্ত-দান্ত মানুষ, কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের সুযোগ পেলে সে একেবারে আহিতাগ্নি। সে নিজেই জার্মানির আর্মি-হেড কোয়ার্টার্সে দেখা করতে গেল। বিশদ করে বোঝালে তার বক্তব্য। এতে জার্মানির লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। রাশিয়া জয় করে জার্মানি উজবেকিস্তান ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে এগোবে আর আমরা, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা ভারতে ঢুকে ব্রিটিশের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেব। ভিতরে-বাইরে সমান আঘাত খেয়ে ব্রিটিশ সিংহ লেজ গুটোবে। পালাবার পথ পাবে না।

কিন্তু তোমার শর্ত কী? আর্মি হেডকোয়ার্টার্স স্পষ্টাস্পষ্টি জানতে চাইল।

ট্রটের মারফত সে তো একবার জানিয়েছি। শর্ত খুব সরল। আজাদ হিন্দ ফৌজ আমাদের নিজস্ব ফৌজ। এ লড়বে শুধু আমাদের একমাত্র শত্রু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। লড়বে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে। একে অন্য লক্ষ্যে অন্য রণাঙ্গনে প্রেরিত করতে পারবে না। মিশিয়ে দিতে পারবে না তোমাদের বাহিনীর সঙ্গে। মাইনে-ভাতা পোশাক-আশাক তোমাদের বাহিনীরই সমমাত্রিক হবে। ইতরবিশেষ চলবে না। আর খরচ? বলেছি তো আগেই—খরচ সব তোমরা চালাবে। ভারতবর্ষ একবার স্বাধীন হোক, বলছি তো, তোমাদের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেব।

কিন্তু স্বাধীন হবার পর ভারত সরকার যদি এ ঋণ না মানে?

না মানে, এ ঋণের বোঝা আমি আমার নিজের কাঁধে তুলে নেব। এ আমার ব্যক্তিগত

দায়িত্ব, আমি নিজে এ ঋণ শোধ করব। আমাকে বিশ্বাস করো।

আর্মি হেড কোয়ার্টার্স সুভাষের সমস্ত শর্ত মেনে নিল। এ বুঝি এমন এক ব্যক্তিত্ব যাকে অবিশ্বাস করা যায় না। আকাশের সূর্যও বুঝি এমনি সত্যেই জ্বলছে।

বেশ, এবার তবে বন্দীনিবাস থেকে তোমার সৈন্য সংগ্রহ করো।

সুভাষ আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সভ্য আবিদ হোসেন ও গনপুলেকে পাঠাল বন্দী-নিবাসে। নাম লিখিয়ে সকলকে দলভুক্ত করে নাও! কিন্তু সেখানে গিয়ে অপ্রত্যাশিতের সম্মুখীন হতে হল। বন্দীরা আসতে রাজি নয়।

রাজি নয়? কী বলে? বলে, আমরা ব্রিটিশের নুন খেয়েছি। আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়তে পারব না।

বার্তা শুনে সুভাষ বিমর্ষ হয়ে গেল। বললে, ওদের দোষ নেই। এমনি করে ইংরেজের কূটনীতি, আর্মি-পলিসি সফল হয়েছে। দেশকে দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় আচ্ছন্ন করে রাখো, শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা করো না, দিয়ো না ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা—তা হলেই সহজে অল্প মাইনেয় পুলিশ পাবে, সৈন্য পাবে। পুলিশ আর সৈন্যই তো সাম্রাজ্যের দুই স্তম্ভ। অশিক্ষিত গরিব দেশের জোয়ান মানুষগুলো যাবে কোথায়? অবলীলায় পুলিশ আর সৈন্যের ব্যারাকে চাকরির জন্যে লাইন দেবে। বিকল্প কই?

না, ওদের দোষ কী। সঙ্কটে ফেলে ওদের যেমন শিখিয়েছে তেমনি আওড়াচ্ছে ওরা। যাই আমি নিজে যাই। বন্দী শিবিরে সুভাষ নিজে গেল। রব পড়ে গেল চারদিকে। সুভাষ বোস এসেছে।

ভারতীয় সৈন্যদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল সুভাষ।

তোমরা ব্রিটিশের নুন খেয়েছ? ভারত মাতা—তোমাদের দেশজননীর স্তন্য পান করনি? কে তোমাদের লালন-পালন করেছে, কে তোমাদের গড়ে পিটে বড় করে তুলেছে? কে তোমাদের মুখে ভাষা দিয়েছে, গান দিয়েছে, দিয়েছে পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধনের আনন্দ? সেই মায়ের ঘরে তোমাদের কোনো ঋণ নেই? শুধু ব্রিটিশের নুন দেখলে, মায়ের চোখের জল দেখলে না? ব্রিটিশের নুন! দেখলে না ব্রিটিশের ঐ নুন মায়ের চোখের জল দিয়ে তৈরী?

বন্দীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। সত্যিই তো আমরা এখানেও বন্দী ওখানেও বন্দী।

তোমরা ভেবে দেখ তোমরা ভারতবাসী হয়ে ভারতের জন্যে লড়বে না ইংলণ্ডের জন্য লড়বে? লড়বে দেশকে স্বাধীন করতে, না তাকে পরাধীনতার পঙ্কে ডুবিয়ে দিতে? তোমরা ভেবে দেখ।

শিবিরে সুভাষ বারে বারে এল। বারে-বারে বোঝাল। স্বাধীনতার কথা বলার মানেই সুভাষের শুচি-ভাস্বর সূর্য ওঠা।

কী আমাদের কাম্য হতে পারে? শুধু নিজের স্বাচ্ছন্দ্য, না আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর স্বাচ্ছন্দ্য? স্বাধীনতা ছাড়া সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে কী করে? আমরা কি চিরকাল ব্রিটিশ শোষণের বলি হয়ে থাকব? আমরা কি ওদের এ যুদ্ধেও জিতিয়ে দেব? যাতে কিনা আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল আরো দৃঢ় হয়? যাতে আমাদের মায়ের লাঞ্ছনা আরো নিদারুণ হয়ে ওঠে? আমরা কি মায়ের সুসন্তান নই? আমরা কি মায়ের মুখে হাসি ফোটাব না?

কেউ কেউ প্রশ্ন করলে, আজাদ হিন্দ ফৌজে গেলে আমাদের পদমর্যাদা কী রকম হবে?

সে সব ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দিন। স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই, কোনো বিনিময়

নেই। স্বাধীনতা কোনো বাজারের জিনিস নয়, তাকে নিয়ে কোনো দরাদরি চলে না। স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার—সে অধিকার অর্জন করতে আমরা জীবনপন প্রয়াস করব। আমাদের প্রাণ কি ব্রিটিশের স্বার্থে কামানের খোরাক হবার জন্যে? আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দেব—জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই আমরা মায়ের সন্তান, মায়ের অপমানের গ্লানি দূর করবার জন্যে আত্মোৎসর্গ করব—মানবজীবনে এত বড় মর্যাদা আর কী হতে পারে? আমরা যে দেশমুক্তির যুদ্ধের জন্যে নির্বাচিত এই তো আমাদের পরম পদ, পরম গৌরব।

সুভাষের আহ্বানে বন্দী সৈন্যরা প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠল। তারা চিনল দেশকে বুঝল কাকে বলে স্বাধীনতা! কী তাদের জন্মগত অধিকার! কোথায় তাদের প্রাণের মূল্য, বাঁচার সার্থকতা! আর কে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে! তাদের ত্রাতা-নেতা-অধিপতি। তারা সমস্বরে ধ্বনি দিয়ে উঠল নেতাজী জিন্দাবাদ!

সুভাষ প্রতিধ্বনিত হল: আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

বন্দীরা দলে-দলে আজাদ হিন্দের পতাকার নিচে সমবেত হল। গড়ে উঠল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

না, কোনো শর্ত নয়, দর-কষাকষি নয়, নেতাজী যেমন বলবেন তাই আমাদের মত। যেমন চলবেন তাই আমাদের পথ। ফৌজের সবাই মেনে নিল নেতাজীর নেতৃত্ব।

ঝাঁপানে বাঘ—ঝম্পোদ্যত ব্যাঘ্র—এই হল আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রতীক-চিহ্ন। এই চিহ্ন নেতাজীর নিজের উদ্ভাবন। তোমরা মনে রাখবে সব সময়েই তোমরা শত্রুর উপর আক্রমণে উদ্যত হয়ে আছ। একটি মুহূর্তও তোমরা শিথিল নও, অবসন্ন নও, অন্যমনস্ক নও। তোমরা উদ্যত খড়্গ। তোমরা সবেগে আঘাত হানবে শৃঙ্খলের উপর শোষনের উপর নিপীড়ণের উপর। ঝাঁপিয়ে পড়া বাঘটাকে একবার দেখ। অমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে আনতে হবে। স্বাধীনতা কেউ দেয় না, ছিনিয়ে নিতে হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ধন, স্তুতি-বিনতির ভিক্ষান্ন নয়। প্রখরনখর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ো, শাণিতকঠিন খড়্গের মত মূলোচ্ছেদের প্রহার হানো। আবার বলো আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

ঘটনার পর ঘটনা। কিংবা অঘটনের পর অঘটন।

এই বছরেই অর্থাৎ ১৯৪১ সালেই সাতুই ডিসেম্বর জাপান হঠাৎ পার্ল হারবার আক্রমণ করে বসল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বন্দর পার্ল হারবার। সিঙ্গাপুর যেমন ইংরেজের নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার তেমনি আমেরিকার। নানানটা ভেবেই জাপান এই হঠকারিতার কাজ করলে। তারও বোধ করি সাম্রাজ্যবিস্তারের লোভ হল। জার্মানি তো সমস্ত ইউরোপ গ্রাস করতে বসেছে, আমেরিকা ঠিক আফ্রিকাকে লুফে নেবে তবে তার ভাগে এশিয়া ছাড়া আর থাকল কী। সুতরাং এই বেলাই থাবা বাড়ানো যাক। তার তো একমাত্র নৌ-শক্তি আর বিমান-শক্তি। তার তো সাম্রাজ্য নেই, ভারতবর্ষ নেই। আর ঐ তো সমুদ্রবেষ্টিত ইংলণ্ডের অবস্থা। সে নিজেও সমুদ্রবেষ্টিত। অই তার নিরাপদ স্বার্থ-বিস্তারের পথে দুই অন্তরায় উৎখাত করা দরকার। এক অন্তরায় পার্ল-হারবার। আরেক অন্তরায় সিঙ্গাপুর। ঘরের কাছে আরেক প্রতিবন্ধক হংকং আছে বটে কিন্তু সে তত মজবুত নয়। সে দু-তুড়িতে উড়ে যাবে।

কোনো যুদ্ধাক্রমণের পিছনেই যেন কোনো ন্যায় নেই, আদর্শ নেই। সব স্বার্থসন্ধান আধিপত্য-অর্জন। আসলে সমস্তই শক্তিমত্ততার বিকৃতি।

ভারতবর্ষের বেলায় কী? ভারতবর্ষ তো কাউকে আক্রমণ করছে না, সে শুধু দাসত্বমোচনের সংগ্রামে উদ্যত হয়েছে। সে তো পররাজ্যে লুব্ধ নয়, সে শুধু দস্যু বিতাড়নে বদ্ধপরিকর। তার এই আয়োজনকে যদি যুদ্ধ বলো সে যুদ্ধের পিছনে ন্যায় আছে, আদর্শ আছে। সে স্বাধীনতার যুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ। পবিত্র যুদ্ধ। স্বাধীনতাই পবিত্রতা।

পরদিন অর্থাৎ আটুই ডিসেম্বর আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। শুধু জাপানের বিরুদ্ধে নয়, অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে। অক্ষশক্তি বলতে তিন দুর্গ্রহের সমাবেশ—জার্মানি, ইটালি আর জাপান। এক ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে তারা আগে থেকেই গ্রন্থিবদ্ধ।

মহাকালের কি বিচিত্র রসিকতা! ধনতন্ত্রী ইংলণ্ড ও আমেরিকা দুইই সাম্যতন্ত্রী রাশিয়ার পরিপন্থী। অথচ এখন তারা রাশিয়ার পক্ষে। রাশিয়াকে বাঁচানোই এখন আমেরিকার দায়। রাশিয়ার প্রতি প্রেম নয় জাপানের প্রতি ঈর্ষা। জার্মানি আর জাপান দুদিক থেকে দুই বাহু বাড়াবে এ আমেরিকার অসহ্য। তারপর সমুদ্রের গলায় মৌক্তিকের মালা—পার্ল হারবার বিধ্বস্ত? এ স্পর্ধা ক্ষমা করা যায় না। রণাগ্নিতে আমেরিকাও নিমগ্ন হল।

চার্চিলের আনন্দ তখন দেখে কে। আমেরিকা নেমেছে! তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার ত্রাহি-ত্রাহি ডাক তবে শুনতে পেয়েছেন ঈশ্বর! পাঠিয়ে দিয়েছেন আমেরিকাকে! তবে আর ভয় কী—চার্চিল গদগদস্বরে বললে, 'আমরা এবার জিতে গেছি।'

দেখতে দেখতে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে জ্বলল অগ্নিকুণ্ড। শুরু হল ভুজঙ্গ-ভূষণের প্রচণ্ড তাণ্ডব।

দুদিন পর, দশুই ডিসেম্বর জাপানীরা ইংরেজের দু দুটো যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিল। প্রিন্স অব ওয়েলস আর রিপালস। শুধু দুটো দুর্ধর্ষ যুদ্ধ জাহাজই নয়, বিরাট নৌবহরও গেল তলিয়ে। পলকে প্রলয় ঘটে গেল। হাহাকার পড়ে গেল ইংলণ্ডে। কিন্তু চার্চিল নরম হলেও দমবার পাত্র নয়। আমাদের আমেরিকা আছে।

সাত দিন না পেরোতেই হংকং-এ হানা দিল জাপান। আর সাত দিনে তার পতন ঘটল। এখন বাকি শুধু সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর নিয়ে নিতে পারলেই জাপানের কাছে প্রশান্ত মহাসাগর একেবারে প্রশান্ত। তখন আর তাতে ইংরেজ বা মার্কিনি জাহাজের লেশ থাকবে না। কিন্তু সিঙ্গাপুর কি মুখের কথা? কোটি টাকা ঢেলে একে তৈরি করা হয়েছে। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ধরে চলেছে এর নির্মিতি। এ এখন দুরাক্রম—দুষ্প্রবেশ।

এদিকে সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দের কাজ এগিয়ে চলেছে পুরোদমে। একাগ্র উৎসাহে জ্বলছে নেতাজী। জ্বলছে ঊর্ধ্বোত্থিত একটি বহ্নি-স্তম্ভের মত। কত কাজ! সংগঠনের কাজ। প্রচারণের কাজ। আরো কত প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন বাকি। তাদেরকে চিঠি লেখো, সঙ্গে এনে জড়ো করো। তারপর আছে রেডিওর পরিচালনা। পুস্তিকা-প্রচার। আজাদ হিন্দ পত্রিকা সম্পাদন। এমনকি স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্যে প্ল্যানিং কমিটির তত্ত্বাবধান। শত দিকে শত ভাবনার প্রমূর্ত রূপায়ন।

আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের জন্যে কূটনীতিক স্বীকৃতি আদায় করলেন নেতাজী। সেই সুবাদে আর সব মিশনের সঙ্গেও সংস্পর্শ রাখা সম্ভব হল। সঙ্ঘের জন্যে একটা স্পেশাল ফণ্ড তৈরি হল। যখন যেমন দরকার নেতাজীর হাতে টাকা আসতে লাগল ফণ্ড থেকে। এ দান নয়, এ ধার। যেমন নিচ্ছেন তেমনি আবার কিছু-কিছু শোধ করতেও শুরু করেছেন।

জয় আন্তরিকতার। জয় বীর্যবত্তার। জয় সর্বসমর্পিত ব্যাকুল দেশপ্রেমের। সর্বনায়ক সুভাষ

এখন মূর্তিমান বিভাবসু। ভারতবর্ষের কালকর্তা। এখন আসল কাজ হচ্ছে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। ইংরেজের অধীনে ভারতীয় সৈন্যদের অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা হত না। ভিতরে-ভিতরে ভয় ছিল যদি বা এরা সকলে উত্থিত হয়ে পলকে রাজত্ব উৎসন্ন করে দেয়। আসলে ভারতীয় সৈন্যরা তো ক্যানন-ফডার, কামানের খোরাক—বড়জোর পরিখায় বসে যুদ্ধ করার মত বন্দুক চালাতে শেখাও—আর কিছু শেখাতে হবে না, না মরতে না বা পালাতে। এবার ইংরেজ দেখুক ঠিকমত নেতৃত্ব পেলে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যেকে কী বজ্রায়ুধ যোদ্ধা, কী শত্রুদমন জয়বর্ধন মহাবীর! আপাদমস্তক একাগ্রশীল সংকল্পের মশাল। আমাদের যুদ্ধ আগ্রাসের যুদ্ধ নয়, আদর্শের যুদ্ধ। আমরা জিতব না তো কে জিতবে।

ফৌজের প্রথম দল যাচ্ছে লিজিয়নের হেড কোয়ার্টার্স ফ্রাকেনবুর্গ ক্যাম্পে। যাচ্ছে প্রশিক্ষণ নিতে। অপরাভবের দীক্ষা নিতে। তাদের আজ সংবর্ধনা। প্রত্যেকের ইউনিফর্মের বুকে ঝাঁপানো বাঘের ব্যাজ, পনেরো জনের প্রথম দল দাঁড়াল এসে তাদের অধিনায়ক নেতাজীর সামনে। আজাদ হিন্দ ফৌজ জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলল। প্রত্যক্ষ চক্ষে দেখেও যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। দূর বিদেশে স্বাধীন ভারতের প্রথম সশস্ত্র সেনাবাহিনী। শত্রু মর্দনে মুক্তি-অর্জনে অগ্রণী যাত্রী। স্বাধীনতা ভিক্ষে করে পাবার নয় যুদ্ধ করে অর্জন করবার বস্তু। আমরা প্রস্তুত। আমরা উন্মুখ। আমরা বীতভয়।

সংবর্ধনা সভায় বার্লিন শহরের ভারতীয়রা সমবেত হয়েছে। সে কী আনন্দ! ভারতের দেখ কী গৌরব। প্রথম সেনাদল। দেখ ভারতের মহানায়ক দ্রষ্টা-স্রষ্টা ঐ নেতাজী। ভারতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা নিয়ে সেনাদল মার্চ করল। অভিবাদন করল পতাকাকে। নেতাজীকে।

পরদিন ছাব্বিশে ডিসেম্বর আনহলটার রেলওয়ে স্টেশন থেকে তারা যাত্রা করবে। ট্রেন ছাড়বে ভোরবেলা। নেতাজী বললেন, কাল ভোরে আবার আমরা রেলস্টেশনে জমায়েত হব। তোমাদের সি-অফ করব।

রাত্রি থেকে ভীষণ দুর্যোগ। ভোরবেলাতেও বরফ-পড়া বন্ধ হয়নি। এ দুর্দিনে কে বেরোয় বাড়ি থেকে। কে বাইরে পা বাড়ায়! কিন্তু যারা স্বাধীনতার সংগ্রামী, যারা স্বাধীনতার প্রকামী দুর্দিন বলে কিছু নেই। তারা কখনো যাত্রা স্থগিত রাখে না। পরাধীনতাই তাদের চরম দুর্দিন। তাই সেই বরফ-ঝরা ঠাণ্ডা ভোরে ভারতীয় প্রবাসীরা আনহলটার রেলওয়ে স্টেশনে এসে সমবেত হয়েছে। তাদের পুরোভাগে নেতাজী। তোমরা আমাদের অভিবাদন নাও। তোমাদের যাত্রা শুভাবহ হোক, জয়াবহ হোক। তোমাদের ব্যাঘ্রকেতন চিহ্ন যেন অম্লান থাকে। উড্ডীন থাকে ভারতবর্ষের ত্রিবর্ণ পতাকা। উত্তপ্ত করমর্দন হল। হল সস্নেহে আলিঙ্গন। সৈনিকেরা সবাই প্রায় তরুণ বয়স্ক। তাই তাদের সম্ভাবনা যেমন অসীম উৎসাহও তেমনি অগাধ। ট্রেনটা ছাড়তেই সৈনিকেরা আনন্দে বিস্ফুরিত হল; আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

নেতাজী প্রতিধ্বনি করলেন: জয় হিন্দ।

জয় হিন্দ যেন এক উজ্জীবনী মন্ত্র। সমস্ত জং-ধরা বন্ধ দরজা খুলে দেবার সোনার চাবি। জাতি নেই ধর্ম নেই প্রদেশ নেই প্রভেদ নেই, এক প্রাণ এক লক্ষ্য একঅগ্র হবার উচ্চারণ।

দ্বিতীয় ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হল মেসেরিজ-এ। সেখানেও কজন সৈনিক শিক্ষার্থীকে পাঠানো হল। সংখ্যাটা যেন আশানুরূপ স্ফীত হচ্ছে না। এখানে-ওখানে আরো সব জার্মান ক্যাম্পে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী আটক আছে, আফ্রিকার ক্যাম্পেও আছে কয়েক শ, তাদের সবাইকে

আমার ফেরত চাই। নেতাজী জার্মানির পররাষ্ট্র দপ্তরে অনুরোধ পাঠাল। তাদের সবাইকে আনাবুর্গ ক্যাম্পে একত্র করো। আমি তাদের বাজিয়ে দেখি।

নেতাজী ছুঁলে কে বলে বাজবে না? আপাদমস্তক ঝংকৃত হয়ে উঠবে। না, কোনো জোর নেই। সম্পূর্ণ তোমাদের ইচ্ছা। তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি। তোমাদের মাতৃ-ঋণ। ক্যাম্পে বসে-বসে তাস-পাশা খেলবে না কি আজাদ হিন্দ বাহিনীতে এসে জীবনকে মরণাতীত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে?

নেতাজীকে শোনা অর্থই নতুন মূল্যের নতুন মানের মানুষ হয়ে ওঠা।

জার্মান কর্তৃপক্ষ অন্যদেশীয় যুদ্ধবন্দীদের লেবার-ক্যাম্পে রেখেছে, কিন্তু ভারতীয় বন্দীদের রাখেনি সেই হীনাবস্থায়। রাখেনি মানে রাখতে চায়নি। সুভাষকে যে তারা চিনেছে ইতিমধ্যে, ভালোবেসে ফেলেছে। বিশ্বাস করেছে তার আন্তরিকতায় কোনো খাদ নেই। তার কর্মনীতি পরিচ্ছন্ন। সে শুধু তার দেশের স্বাধীনতা চায়। চায় তার একমাত্র শত্রু ইংরেজের উৎসাদন। সে-ইংরেজ সুভাষকে কুইসলিং বলবে তাতে আর বিস্ময় কি। আরো কতো কী অপবাদ রটাবে! কিন্তু সূর্যকে ধূমাঙ্কিত করবে এমন কে আছে? তাই বন্দীনিবাসে থেকেও যে সব ভারতীয় সৈন্য আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয়নি, যাদের বলা যায় ফালতু, তাদেরকেও জার্মান সরকার লেবারক্যাম্পে চালান করেনি। তারাও আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। যেন তারা ওয়েটিং লিস্টের যাত্রী। বলা যায় না, সম্প্রতি হয়তো পরাঙ্মুখ আছে, দ্বিধাগ্রস্ত আছে, কিন্তু ঠিক-ঠিক ডাক এসে পৌঁছুলে এরাও নিঃসংশয় হবে, ঝাঁপানে বাঘ হয়ে উঠবে, হবে শূরশার্দূল। ওরা আমাদের দলের নয় বলে ওদের প্রতি নির্মম হতে পারবে না। শত হলেও ওরা ভারতীয়, আমার স্বদেশবাসী।

মাঝে-মাঝে শিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করতে যান নেতাজী। এ সব আর এখন ভারতীয় বন্দী-শিবির নয়, ভারতীয় সৈনিক-শিবির।

'হিজ এক্সেলেন্সি বোস যখন শিবিরে আসেন,' বলছে শিক্ষণ-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, 'তখন আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। সকলের হৃদয়ে সমমর্মিতার মাধুর্যের ঢেউ উথলে ওঠে।'

সুভাষ সকলের বরণীয় শুধু নয়, সকলের আদরণীয়।

কিন্তু এদিকে যুদ্ধের খবর কী? ঝড়ের গতিতে জার্মান সৈন্য রাশিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এগিয়ে চলেছে দুর্বার উন্মাদনায়। অভিযান যত ক্ষিপ্ত হবে ততই ক্ষিপ্র হবে শত্রু নিপাতের সম্ভাবনা। টিমেতেতালায় আর যে বাজনা বাজুক হিটলারের যুদ্ধের বাজনা নয়। তার নাৎসার বাহিনী অনির্বাণ বিদ্যুতের বেগে প্রধাবিত। দেখতে-দেখতে প্রায় চার শো মাইল অধিকার করে বসল। লেলিনগ্রাদ প্রায় ছুঁই-ছুঁই। হিটলার ঘোষণা করল শীতের আগেই রাশিয়াকে ফতে করতে হবে। রাশিয়ার শীত সাংঘাতিক। সাংঘাতিক তার জনগণের মনোবল। দুর্ভেদ্য তার প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা। হিটলার লেলিনগ্রাদে ঢুকতে পেল না। চলো তবে মস্কোকে ঘায়েল করি। মস্কোর পথে এগোতে-এগোতেই শীত এসে পড়ল। জমতে লাগল বরফ। দৃঢ়ীভূত হতে লাগল সোভিয়েতের সংগঠনের নিষ্ঠা। মস্কোর আর মোটে ত্রিশ-বত্রিশ মাইল বাকি। হিটলারের ঝঞ্ঝা-বাহিনীকে থামতে হল। সাধ্য নেই এই তুষারের দহ তারা পার হয়। রাশিয়ার প্রাণশক্তির সঙ্গে মিলেছে এসে তার প্রকৃতি-শক্তি। ঝঞ্ঝা-বাহিনী নিশ্চল হয়ে পড়ল। অসাড়, অথর্ব, অকর্মণ্য।

এগোনো দূরের কথা, থেমে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। এখন হটে যাওয়াই মঙ্গল। কিন্তু হঠকারী হিটলার কিছুতেই তার গোঁ ছাড়ল না। হুকুম দিল ঐ বরফ আঁকড়েই মস্কোর দ্বার

প্রান্তে অপেক্ষা করতে হবে। বরফ গলে যেতে আর কতক্ষণ। শীত তো চিরস্থায়ী নয়। শীতের পরই বসন্ত। বসন্তের অভ্যুদয়েই মস্কো বিধস্ত হবে। মস্কো গেলে রাশিয়ার আর থাকল কী! ততদিন একটু ধৈর্য ধরো। অপেক্ষা করো।

গোয়েবলস নেতাজীকে বললে, 'আপনার রেডিও থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করুন না।'

নেতাজী বললেন, 'না। রাশিয়ার বিরুদ্ধে বলতে যাব কেন? রাশিয়া আমাদের শত্রু নয়। আমাদের একমাত্র শত্রু ইংলণ্ড। যা আমাদের বলবার তা আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বলব।'

'কিন্তু আমরা তো আপনার বন্ধু।'

'ইংলণ্ড ছাড়া সমস্ত পৃথিবীই আমাদের বন্ধু।' নেতাজী এতটুকুও বিচলিত বা বিচ্যুত হলেন না: 'যে কোনো বিষয়ে যেমন খুশি আপনারা বলুন তাতে আমাদের কিছু বলবার নেই। আমাদের একমাত্র বিষয় আমাদেব স্বাধীনতা। সেই আমাদের রেডিওর একমাত্র বক্তব্য।

গোয়েবলস চুপ করে গেল। জার্মানির দুর্ধর্ষ প্রচার'সচিব যে প্রচারের গুণে মিথ্যেকে সত্য করে দিতে ওস্তাদ, দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে দিতে—সে যেন সুভাষের সত্যের সামনে উচ্চকণ্ঠ হতে পারল না।

আজাদ হিন্দের কাজে রোমে এসেছেন নেতাজী। জার্মান দূতাবাসের প্রধান ডটেনবার্গ নেতাজীর সম্বর্ধনায় একটা ভোজসভার আয়োজন করেছেন। সে-সভায় দেশী-বিদেশী অনেক কূটনীতিবিদের আসবার কথা। নেতাজী ডটেনবার্গকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

নেতাজীর প্রতি ডটেনবার্গের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ডটেনবার্গ বললে, 'বলুন।'

'প্রায় দুশো জন ভারতীয় সেনা ইটালিয়ান ক্যাম্পে বন্দী আছে। ওদেরকে জার্মানিতে পাঠিয়ে দিতে হবে। আপনিই যোগ্য ব্যক্তি, আপনিই এর ভার নিন।'

কথাটায় ডটেনবার্গ গুরুত্ব দিতে চাইল না। বিরস মুখে বললে, 'এখন ওসব কথা ভাবা যায় না।'

'কেন?' নেতাজী তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন।

'আফ্রিকায় যুদ্ধের খবর ভালো নয়।' ডটেনবার্গের মুখ বিমর্ষ; 'কয়েক হাজার জার্মান সৈন্য ঘোরতব বিপদের মুখে পড়ে গিয়েছে। কী করে তাদেব উদ্ধার করা যায় এখন শুধু সেই পবামর্শই চলছে।'

'সে তো আফ্রিকায়।' নেতাজী অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন: 'আর আমাদের সৈনিকেরা তো এখানে—এদেশে।'

'রাখুন।' ডটেনবার্গ তিক্তস্বরে বললে, 'কয়েক হাজার জার্মান সৈন্যের জীবন যখন দারুণ সঙ্কটের মধ্যে, তখন সামান্য দুশো জন ভারতীয় বন্দীর নিরাপত্তার কথা নিয়ে কে মাথা ঘামায়?'

'আপনি ঘামাবেন। কেননা এখানকার জার্মান রাষ্ট্রদূত আপনি।'

'ও নিয়ে ভাববার আমার সময় নেই। কয়েক হাজার জার্মান সৈন্যের কাছে সামান্য দুশো জন ভারতীয় যুদ্ধবন্দী!' ডটেনবার্গের গলায় বুঝি উপেক্ষার সুর ফুটল।

'শুনুন।' নেতাজী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন: 'আমার কাছে ঐ দুশো জন ভারতীয়ের প্রাণের মূল্য অসামান্য। আপনার কয়েক হাজারের চেয়ে আমার দুশো আমার কাছে অনেক বেশি। সুতরাং, মাপ করুন, আপনার আজকের ভোজে আমি যোগ দিতে পারছি না।'

দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নেতাজী। এ কী সর্বনাশ! নেতাজী যদি উপস্থিত না থাকেন তো কিসের ভোজ! কত গণ্যমান্য লোক নিমন্ত্রিত হয়েছে শুধু নেতাজীর সঙ্গেই পরিচিত হবার জন্যে। তারা এসে দেখবে হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেটই অনুপস্থিত! ডটেনবার্গের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। ঐ নেতাজী যাচ্ছেন! ডটেনবার্গ ছুটল তাঁর পিছু-পিছু। মুখে কাতর অনুনয়: 'ইয়োর এক্সেলেনসি, আমাকে মার্জনা করুন, আমার মাথা ঠিক ছিল না, ওরকম করে বলা আমার অন্যায় হয়েছে—শুনুন—'

অনেক পীড়াপীড়িতে নেতাজী শান্ত হলেন। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের স্থানান্তরিত করবার প্রস্তাব সফল করা হবে ডটেনবার্গ আশ্বাস দিল। তখন নেতাজীর উপস্থিতিতে বসল ভোজসভা।

স্বামী বিবেকানন্দের মত নেতাজীর কাছেও ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণাই তীর্থরেণু। প্রতিটি মানুষই আত্মার আত্মীয়, স্বাধীনতার জ্বলন্ত মশাল।

যুদ্ধের অবস্থা বুঝি সত্যিই খারাপ। বিদ্যুৎ বাহিনীর বেগ যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। সময় বেশি নিয়ে ফেলছে। বরফ বুঝি পাথর হয়ে উঠল। অতি-মন্থনে না গরল ওঠে এবার। হিটলার হাঁসফাঁস করতে লাগল।

কিন্তু এদিকে প্রকাণ্ড সুখবর আছে। উনিশ শো বিয়াল্লিশের পনরোই ফেব্রুয়ারি জাপানীরা সিঙ্গাপুর বিধ্বস্ত করে দিল। সেই সিঙ্গাপুর। ব্রিটিশের দুর্ভেদ্যতম নৌঘাঁটি বলে যার প্রসিদ্ধি। কত বিজ্ঞাপন, কত ঢক্কানাদ। কোটি-কোটি টাকায় দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে যা তৈরি হয়েছিল তা দুদিনেই শিঙ্গা ফুঁকল। যত গর্জেছিল তার কিছুই বর্ষাল না। ভাসামান ডক হাসতে হাসতে ডুবে গেল অতলে। ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারেল পার্সিভ্যাল প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে জাপানী সেনাপতি জেনারেল ইয়ামাশিটার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করল। ঐ এক লক্ষের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। সে চল্লিশ হাজারের ভার ছেড়ে দেওয়া হল ক্যাপেটেন মোহন সিংয়ের উপর। ওদের জন্যে জাপানের আলাদা ব্যবস্থা। ওরা যদিও শত্রুপক্ষে নাম লিখিয়েছিল, ওরা শত্রু নয়।

ঐ শোনো জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো কী বলছেন! বলছেন: ইণ্ডিয়া ফর দ্য ইণ্ডিয়ানস। এশিয়া ফর দ্য এশিয়াটিকস।

ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্যে। এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্যে। পররাজ্যলিপ্সু বিদেশী দস্যুর দল, তোমরা বিতাড়িত হও। তোমাদের অবৈধ আধিপত্য বরদাস্ত করা হবে না। না, এক ও না।

তোজোর মুখ দিয়ে কে বলাচ্ছে একথা? কার তপস্যায় জাপানের এ সত্য দর্শন সার্থক হয়েছে? সম্ভব হয়েছে এ উদার উচ্চারণ! সে আরেক ভারতবাসী। রাসবিহারী বসু।

আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে নেতাজী ভারতবর্ষকে সম্বোধন করলেন: ভারতবাসীর জন্যেই ভারতবর্ষ। সুতরাং ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ করো। পরে সমস্ত এশিয়াবাসী পারস্পরিক আত্মীয়তায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সমস্ত মহাদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাও। জাপান দাঁড়িয়েছে সহায়ক প্রতিবেশী রূপে—আমাদের আঘাত হানবার এই চূড়ান্ত সুযোগ। এই সুযোগ, ইতিহাসের এ মুহূর্তবিন্দু যদি আমরা বয়ে যেতে দিই, আমরা অতলের চিরতিমিরে ডুবে যাব। সুতরাং ওঠো জাগো অভীষ্টকে আয়ত্ত করবার আগে নিবৃত্ত হয়ো না।

দুই প্রান্তে দুই নায়ক—দুইই বসু। বসুই তো অগ্নি, বসুই তো সূর্য—বসুই তো গণদেবতা। রাসবিহারী আর সুভাষ। দেশের জন্যে দুজনেই দেশান্তরী।

চার

এদিকে খোদ দেশ—ভারতবর্ষের খবর কী? কংগ্রেসের একক সত্যাগ্রহ অনেক আগেই, অর্থাৎ উনিশ শো চল্লিশের ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিন মাসের আন্দোলনে সারা ভারতে প্রায় কুড়ি হাজার বন্দী।

'ওরা সবাই এক-এক করে বন্দী হচ্ছে কেন বলতে পারিস?'

'বা, ওরা যে সত্যাগ্রহী।'

'ওদের সত্যিকার আগ্রহ কী বলতে পারিস?'

'পারি। শুধু ইংরেজের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে।'

'কী করে?'

'ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনো বিপ্লবাত্মক আন্দোলন না করে। গান্ধীজির রবারস্ট্যাম্প হয়ে নির্বিবাদে জেলে গেলেন নিষ্ক্রিয়তার ট্রেড-মার্ক নিয়ে। ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রাম না করার অর্থই তো ইংরেজের সংগ্রামকে জোরদার করে তোলা।'

পথচারীরা পরস্পর পরিহাস করে। কিন্তু এ বুঝি অদৃষ্টের পরিহাস।

জার্মানিতে রাশিয়া-আক্রমণের পর থেকেই আমেরিকা ইংলণ্ডকে সাহায্য করে আসছিল। আমেরিকার যুদ্ধে নামবার কিছু আগেই, ১৯৪১-এর আগস্টে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের যুক্ত স্বাক্ষরে এক সনদ তৈরি হল যার নাম আটলান্টিক চার্টার। বড় গলা করে তার সারকথা সর্ব বিশ্বের গোচর করা হল। সারকথার মর্ম এই: যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতা হারিয়েছে তারা ফিরে পাবে তাদের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার। তাদের সার্বিক মৌল কর্তৃত্ব।

ভারতের ভাগ্যে বুঝি শিকে ছিঁড়ল। আটলান্টিক চার্টারই বুঝি এনে দেবে অত্যলান্তিক আনন্দ। ভারতবর্ষ এবার স্বাধীন হবে। কংগ্রেস নেতারাও অর্ধ-নিমীলিত চোখে খোয়াব দেখলেন। স্বাধীনতা কী কেউ ভিক্ষে দেয়? না কি স্বাধীনতা কেউ কুড়িয়ে পায়? স্বাধীনতা জোর করে কেড়ে ছিনিয়ে নিতে হয়। স্বাধীনতা কি দেওয়া পাওয়ার জিনিস? না, স্বাধীনতা হওয়ার ব্যাপার। লোকে স্বাধীনতা পায় না, লোকে স্বাধীন হয়—স্বাধীন হয়ে ওঠে। আর যাকেই চেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে চেননি। তার বাইরে সরল, ভিতরে গরল। তার বাইরের দৃষ্টি উদার, ভিতরের দৃষ্টি ক্ষুধার।

আমড়া গাছে কি আম হয়? চার্চিলে কি কখনো ভারত-সৌহার্দ্যের ফল ধরে? শকুনের ভাগাড় ছাড়া আর কোথাও কি চোখ আছে?

কদিন পরে চার্চিল নিজেই চার্টারে ব্যাখ্যা করলে। এতে ভারতবর্ষের কথা ওঠে কী করে? ভারতবর্ষ কি এই যুদ্ধে স্বাধীনতা হারিয়েছে? তার পরাধীনতা তো ইতিহাসের কোন মান্ধাতার আমল থেকে। যুদ্ধজয়ের পর আলাপ-আলোচনা করে দেখা যাবে কতটা কী তাকে দেওয়া যেতে পারে। এখুনি তার নোলা বাড়ানোর হেতু কী। তা হলেই বোঝো ইংরেজ কূটনীতি কী ক্রূর কী অসাধু। বাইরে মখমলের দস্তানা, ভিতরে ভাল্লুকের নোখ। আর বেশি দেরি নেই, ঝাঁপানে বাঘ এসে পড়ল বলে। তোমারে বধিবে যে, বিদেশে বাড়িছে সে।

চার্চিলের এই অন্যায় ভাষ্য রুজভেল্টের ভালো লাগল না। জাপান যেমন তোড়ে এগোচ্ছে তাতে সমস্ত ভারতবর্ষ ইংরেজের হাতছাড়া হবার জোগাড়। জাপানকে রুখতে হলে ভারতবর্ষকে সক্রিয় করা দরকার। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না দিলে ভারতবর্ষ সক্রিয় হয় কী করে? একি

বুঝেও বুঝছে না? জাপানের কাছে ইংরেজের হার তো আমেরিকারও অপমান। ইংলণ্ড আর আমেরিকা তো এক নৌকোর সোয়ারি। সুতরাং ভারতবর্ষের অচল অবস্থার অবসান দরকার। রুজভেল্টের চাপেই চার্চিল কিছুটা নরম হল। সত্যাগ্রহী কংগ্রেস-নেতারা মুক্তি পেল। কিন্তু তাদের তখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। তাদের ধারণা হল জাপান ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবে। আক্রমণ করবে দখল করে নেবার জন্যে। এ অবস্থায় ভারতবর্ষ কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে? ইংরেজের বিরুদ্ধে, না, জাপানের বিরুদ্ধে? ভারতবর্ষের শত্রু কে? ইংলণ্ড না জাপান?

জাপানী আক্রমণে চীন তখন বিপর্যস্ত—বিত্রাসিত। জাপান বুঝি চীন আর ভারতবর্ষ দুই-ই নিয়ে নেয়। চীনের রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল চিয়াংকাইশেক দিল্লিতে ছুটে এল। হিন্দি-চীনী ভাই-ভাই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে নতুন বয়ান প্রচার করলে, চীন আর ভারতবর্ষ সংযুক্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে প্রতিহত করবে। ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন বটে কিন্তু সেটা জাপানকে প্রতিরোধ করবার ব্যাপারে বিবেচ্য হতে পারে না। রুগীর ঘরের দরজার বাঘটাকে আগে তাড়ানো দরকার, তারপর রুগীর চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার ডাকা যাবে। মোটকথা, চিয়াংকাইশেক চাইল কোনো সর্ত-আরোপ না করেই ভারতবর্ষ জাপানকে তাড়াবার যুদ্ধে ইংলণ্ডের সহযোগিতা করুক।

জওহরলাল চিয়াঙের সঙ্গে একমত হল। জাপানীর চেয়ে ইংরেজ তার বেশি পছন্দের।

কিন্তু গান্ধী? আশ্চর্য, গান্ধী অন্য সুর ধরলেন। ভারতবর্ষ অহিংস, চীনের সঙ্গে ভারতের সেই দিক থেকে কোনো সমতা নেই—চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী বিরাট সংস্কৃতি ক্ষেত্রে। নচেৎ তোমাদের শত্রু তোমাদের, আমাদের শত্রু আমাদের। আমাদের-তোমাদের যুদ্ধের রীতি-পদ্ধতিও আলাদা। সুতরাং আমরা তোমাদের সহযোগিতা কী করব? আমরা অপারগ।

বিয়াল্লিশের সাতুই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হল। ইংরেজের গৌরবরবি ডোবে-ডোবে! ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক ও সোস্যালিস্ট সদস্যেরা চার্চিলের উপর প্রবল চাপ দিল—ভারতের সঙ্গে একটা মীমাংসা করুন। চাপ দিল রুজভেল্ট, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্যেই মিটমাটের প্রয়োজন। চাপ দিল রাশিয়া ও চীন, ভারতবর্ষ পাশে না দাঁড়ালে জাপানকে ঠেকানো যাবে না।

চার্চিল ঢোঁক গিলল, মাথা চুলকোল। তার পর বড় গলায় বললে, এবার সবাই আশ্বস্ত হোন। আমাদের ক্যাবিনেট-সদস্য স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে যাচ্ছেন একটি ঘোষণাপত্র নিয়ে। সেই ঘোষণাপত্র সমগ্র ভারতের হৃদয়গ্রাহ্য হবে।

সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কী না জানি সেই ঘোষণ-পরিতোষ!

গান্ধী ঠিক আঁচ করতে পেরেছিলেন। অনেক বাগাড়ম্বর হবে কিন্তু কাজের বেলায় গোলমাল। যোগ-বিয়োগে ফল দাঁড়াবে শূন্য। অতিমেঘে অনাবৃষ্টি। নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাবে। সাম্রাজ্যবাদের জাহাজে চড়ে ক্রিপস আসছে, নিজের জাহাজ নিজেই সে কখনো ভরাডুবি করবে না।

আসার দরকার কী। তার চেয়ে, যারা এখানে আছ তারা সরে পড়ো। বলছ ভারতবাসীদের মধ্যে নানা জাতীয় বিরোধ আছে বলেই তোমাদের এখানে থাকা। তোমরা একবার সরে দাঁড়িয়ে দেখ না আমরা আমাদের বিরোধ নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারি কিনা। ভারতবর্ষে তোমাদের উপস্থিতিই তো জাপানী আক্রমণ টেনে এনেছে।

বার্লিনে নেতাজীও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বেতারে পাঠালেন তার দৃপ্ত ভাষণ। সে আরেক ঘোষণা। আমি আপনাদের সুভাষ। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, ব্রিটিশ চক্রান্তে বিভ্রান্ত

হবেন না। ক্রিপস মিশন আগাগোড়া ভাঁওতা—বলা যায়, 'কলোসাল হোক্স', সেই ধাপ্পাবাজিতে ভুলবেন না। ক্রিপস মিশন প্রত্যাখ্যান করুন। আমি বলছি, জার্মানি জাপান বা ইতালি কখনো ভারতবর্ষের শত্রু নয়। ওরা আমাদের স্বাধীনতার সমর্থন। ওদের দিক থেকে আমাদের সাত্যিকার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। ওদের সমস্ত আক্রোশ ব্রিটিশ ও মার্কিন সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। দেখুন জাপানী আক্রমণে ব্রিটিশের প্রাচ্য সাম্রাজ্য কেমন ধ্বসে পড়ছে, ওদের সাম্রাজ্যবাদের ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালবার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। আপনারা অবহিত হোন। ভিতর থেকে আপনারা আঘাত হানুন। স্বাধীনতা আপস-রক্ষা করে পাবার জিনিস নয়, শৌর্যে-বীর্যে অর্জন করবার জিনিস। ওদের সঙ্গে চুক্তি করতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে ওদের হাতের পুতুল হয়ে থাকা। ধূর্তের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসুন। স্বাধীনতার কোন চুক্তি নেই। কোনো পরিশিষ্ট নেই। স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। স্বাধীনতা আমাদের খাদ্য-পানীয়, আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

সঙ্গে সঙ্গে জাপান থেকে রাসবিহারী বসু সোচ্চার হয়ে উঠলেন। ভারতীয় নেতাদের লক্ষ্য করে বেতারে তিনিও পাঠালেন আবেদন: ব্রিটিশ ফাঁদে পা দেবেন না। ভুলবেন না ওদের কথার ভেলকিতে। নদী পার হবার পর ঠিক ওরা কুমিরকে কলা দেখাবে। ওদের এত দিনেও চিনতে না পারার কথা নয়। ওদের শুধু কথার জিলিপি, কথার মারপ্যাঁচ। ওদের প্রস্তাব এক কথায় প্রত্যাখ্যান করুন। আপনাদের অসহযোগে দৃঢ় থাকুন। দিন আগত ঐ: ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্যে। এশিয়া এশিয়াবাসীর।

ইংরেজ তখন এক কারসাজি খেলল। রয়টার মারফত বেতারে এক খবর প্রচার করল—সুভাষ মারা গেছে। বার্লিন থেকে বিমানে করে টোকিও যাচ্ছিল—আকাশপথে আকস্মিক দুর্ঘটনা। খবর শুনে সমস্ত ভারতবর্ষ পাথর হয়ে গেল। এ কি কখনো বিশ্বাস করবার ?

'কখনো বিশ্বাস করবেন না। আমি জলজ্যান্ত বেঁচে আছি।' সুভাষের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল বেতারে, বার্লিন থেকে: 'ইংরেজের এমন কোনো অস্ত্র নেই, বোমা নেই, বন্দুক নেই যে আমাকে মারতে পারে। আমি মরে গেলে ওরা খুশি হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু নিয়তির নির্দেশ এবার বিপরীত। এবার ওদের মুখ কালো হবে আর আমরা খুশি হব।'

আজাদ হিন্দ বাহিনী তখন রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্ককে হটে যাচ্ছে। বাহিনীর দলপতি সর্বাধিনায়ক নেতাজী। সুখে-দুঃখে জয়ে-পরাজয়ে উত্থানে-পতনে নির্বিচল, মৃত্যুর সম্মুখেও সমান প্রশান্ত, সমান নির্নিমেষ। পেগু পেরিয়ে পৌঁচেছেন ওয়া-তে। নদীতীরে সুন্দর প্রভাতের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

খোলা মাঠে একটা গাছের নিচে বসে দাড়ি কামাচ্ছেন নেতাজী। অফিসাররা কাছে-পিঠেই রয়েছেন। কেউ মানচিত্র আলোচনা করছেন, কেউ বা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন আশে-পাশে। হঠাৎ শত্রু পক্ষের বিমানের গর্জন শোনা গেল। শত্রুপক্ষ মানে ব্রিটিশ সৈন্য। আওয়াজ শুনে অফিসারেরা যে যেখানে পারল আশ্রয় নিল। একান্ত সচিব আয়ার একটা খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু নেতাজী নড়লেন না। আয়নার দৃষ্টি যেমন নিবদ্ধ ছিল তেমনি রইল। এক ঝাঁক ব্রিটিশ ফাইটার বিমান নিচু হয়ে এসে সেই মাঠের উপর মেশিন গানের গুলি বর্ষণ করে বেরিয়ে গেল। নেতাজীর তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। যেমন দাড়ি কামাচ্ছিলেন তেমনি কামাতে লাগলেন। সবাই ভাবল চরম সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে বুঝি। মাথার উপরে শত্রুপক্ষের বিমান টের পেয়েও কেউ আশ্রয় না নেয়! কিন্তু সবাই হতবাক হয়ে গেল। দেখল নেতাজী তাঁর জায়গায় স্থির হয়ে

বসে আছেন। যেন আছেন কোন সুদৃঢ় আশ্রয়ে সুরক্ষিত হয়ে। আর এ আশ্রয়ও বুঝি মাথার উপরে। মাথার ছাদ যদি না-ও থাকে, ভগবানের আশীর্বাদ আছে।

এ কী, নেতাজী হাসছেন! বলছেন, 'কোনো ভয় নেই। ব্রিটিশের বোমা বা বুলেটের সাধ্য নেই আমাকে হত্যা করে।'

বিমান-দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যুর খবর পেয়ে সরল বিশ্বাসে সুভাষের মায়ের কাছে সান্ত্বনার তার পাঠিয়েছিলেন গান্ধী। তার উত্তরে মা বলেছিলেন, আমি এ খবর বিশ্বাস করি না। আমার সুভাষ মরবার ছেলে নয়।

মায়ের মুখ দিয়ে এ স্পষ্ট দেশজননীর কথা।

বন্ধ লেপাফা থেকে ক্রিপস্-এর ঘোষণাপত্র বেরিয়ে এল।

কী সেই ঘোষণাপত্র? তোমাদের সব দেওয়া হবে, যা তোমাদের কাম্য যা তোমাদের বরণীয়। হ্যাঁ, নির্ব্যূঢ় স্বায়ত্তশাসন, তোমাদের ইচ্ছে মত সংবিধান। ইচ্ছে করলেই কমনওয়েলথ থেকে আসতে পারবে বেরিয়ে। ইচ্ছেমতই আঁকতে পারবে অধিকারের রূপরেখা। তোমরাই তোমাদের মালিক, তোমাদের নিয়ন্তা।

সে কবে? সারা ভারত কান খাড়া করে রইল।

সেটা যুদ্ধের শেষে। যুদ্ধ চলাকালীন সেটা হয় কী করে? দেখছ না ভারতের উপরেই জাপান বোমা ফেলছে। চার্চিলের চেলা ক্রিপস দিব্যি চালবাজি দেখাল। আগে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করে আমাদের মামলাটা জিতিয়ে দাও, পরে আমরা তোমাদের ভারি হাতে বকশিস দেব। আগে ইংরেজের যুদ্ধজয়, পরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

এ নিতান্ত ক্ষুদ্র চিত্ত দোকানদারি। কিংবা এ বুঝি দুরাত্মার নতুন ছলনা। আগে মরো পরে তোমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেব।

একা গান্ধীই সতেজে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, 'ফেল-পড়ো-পড়ো ব্যাঙ্কে পরের তারিখের চেক। এ পোস্ট-ডেটেড চেক অন এ ক্র্যাশিং ব্যাঙ্ক। এ চেক কে নেয়? কোন বাজারে বিকোবে এ চেক? এ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির জঞ্জালের মতই অসার।'

সদ্য-সদ্য আজকের তারিখের চেক নয়। ভবিষ্যতে কোনো এক তারিখে ভাঙিয়ে নিও। আর ভাঙাবেই বা কোথায়, কোন ব্যাঙ্কে? সে ব্যাঙ্কে লাল বাতি যে জ্বলো জ্বলো? তোমরা যে যুদ্ধে জিতবে তার নিশ্চয়তা কী? যুদ্ধে যদি জেত-ও, তোমরা কথা রাখবে তাই বা বিশ্বাস করি কী করে? এ পর্যন্ত কোন কথাটা রেখেছ? ইতিহাস কী বলে? চিরদিন কেবল টাল-বাহানা করেছ, পাশ কাটিয়েছ, ছলের পর ছুতো, ছুতোর পর আবার অছিলা দেখিয়েছ। তোমাদের চিনতে কি আমাদের এখনো বাকি আছে?

অনেক ওকালতি করল ক্রিপস। জওহরলাল যদিও ক্রিপসের বন্ধু, ক্রিপসকে আখ্যা দিল—শয়তানের উকিল। জওহরলালের আশা রুজভেল্ট ও চিয়াংকাইশেক চার্চিলকে চাপ দেবে যাতে দৌত্য একেবারে ব্যর্থ না হয়। আজাদ আর রাজাগোপাল জওহরলালের হাত-ধরা। কিন্তু গান্ধী এবার অনন্য। অনম্য, অদম্য, অবিচাল্য।

কেউ-কেউ ক্রিপসকে গিয়ে ধরল: আপনার ঘোষণাপত্রে রুজভেল্ট কি দস্তখৎ করবেন? তাঁকে দিয়ে দস্তখৎ করিয়ে আনুন। রুজভেল্টের সই থাকলে আপনার ঘোষণাপত্রে আমরা আস্থা স্থাপন করতে পারি। নইলে আপনার ঘোষণাপত্র কাগজ-কালির আবর্জনা। কী, পারবেন

আপনাদের বড় সরিকের সই আনতে?

ক্রিপস মিটিমিটি হাসতে লাগল। চার্চিলের দলিলের একটি অক্ষর সে রদ করতে পারে না। পারে না নতুন একটি অক্ষর যোজনা করতে।

রুজভেল্ট জনসনকে ভারতে পাঠিয়ে দিলেন খবরদারি করতে, যাতে দৌত্যের ফলে একটা সুরাহা হয়। ভারতকে এ মুহূর্তেই সুখী ও সমর্থ করতে না পারলে সে এ যুদ্ধে মিত্রশক্তির মিত্রতা করতে যাবে কেন? তার সুখ আর সামর্থ্য একমাত্র স্বাধীনতায়। সুতরাং তা স্বাধীনতা এ দণ্ডেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত। তবেই সে আমাদের হয়ে উঠে পড়ে লাগবে। উত্থিত ভারতবর্ষ ছাড়া জাপানকে রোখা যাবে না।

কিন্তু কাকে তুমি ধর্মের কাহিনী শোনাচ্ছ?

জনসন রুজভেল্টকে জানাল ক্রিপসের ব্যক্তিগত সদিচ্ছার কোনো অভাব নেই কিন্তু তার হাত-পা-বাঁধা। রুজভেল্ট সরাসরি টেলিগ্রাম করল চার্চিলকে ক্রিপস যেন ভারতের সঙ্গে সম্মানসূচক মীমাংসা না করে বাড়ি না ফেরে। উত্তরে চার্চিল একটি শব্দ পর্যন্ত করল না।

অবশেষে ক্রিপস নিজেই স্বীকার করল ভারতবর্ষের সঙ্গে সসম্মান মীমাংসা করতে ইংলণ্ড মোটেই ইচ্ছুক নয়।

তবে আর কথা কী। সমগ্র ভারত এক বাক্যে ক্রিপস-প্রস্তাব নাকচ করে দিল। ভারত আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তার এক্ষুনি-এক্ষুনি স্বাধীনতা চাই। আর সে বিদেশীর যুদ্ধে রসদ জোগাবে না, না ধনে না প্রাণে। সে নিজের পথ নিজে করে নেবে। ক্রিপস, তোমার সাধের ঘোষণাপত্র তোমার পকেটেই থাক, তুমি শুভে লাভে বাড়ি ফিরে যাও। পথ দেখ।

বারোই এপ্রিল ক্রিপস ফিরে গেল।

রুজভেল্ট রুষ্ট কণ্ঠে মন্তব্য করল, ব্রিটিশ সরকারের কঠোর মনোভাবের জন্যেই ভারতবর্ষে এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হল।

কিন্তু নৃত্যে সচল হয়ে উঠল চার্চিল। ভাগ্যিস ভারতবর্ষ ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। গ্রাহ্য করলে কোথায় কোন বাক্যাংশের বদ-খদ ব্যাখ্যা করে গোলমাল বাধাত তার ঠিক নেই। এ ভালোই হল—মূলে-মূলে আদ্যন্ত নাকচ হল। ঝামেলা মিটল। স্ফূর্তিতে চার্চিল ক্যাবিনেট ভবনে নাচতে শুরু করল।

তারপরেই গম্ভীর হয়ে বললে, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলে করবার জন্যে আমি প্রধানমন্ত্রী হইনি।'

চার্চিলের চেয়েও গম্ভীরতর, গভীরতর আনন্দের স্বর ভেসে এল বাতাসে—বেতারে—বার্লিন থেকে। সে স্বর নেতাজীর।

'সিস্টার্স য়্যাণ্ড ব্রাদার্স অব ইণ্ডিয়া—' এ যেন সেই বিবেকানন্দের সম্বোধন—'আমার বোনেরা আর ভায়েরা, আপনারা যে ক্রিপস প্রস্তাব সমূলে অগ্রাহ্য করেছেন তার জন্যে আমার উত্তপ্ত অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

কংগ্রেসের মধ্যে এখনো হয়তো কেউ-কেউ ইংরেজ-প্রণয়ী আছেন। ইংরেজের সাম্প্রতিক দুর্দশায় এরা যেন কিছুটা বিষণ্ন। কিন্তু আমাদের দুর্দশায় ইংরেজের কী মনোভাব? তারা তো শোষণে-লুণ্ঠনে সমান উৎফুল্ল। তাদের প্রতি আবার সহানুভূতি! না, আপনারা ঠিক করেছেন, অবমাননাকর প্রস্তাব সমূলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যারা ইংরেজদের সঙ্গে এখনো সহযোগিতা করতে চায় কংগ্রেসে তাঁদের ঠাঁই হয় কী করে? তারা বাইরের আক্রমণ রুখতে চায়, কিন্তু

ভিতরের আক্রমণ রাখতে চায় জীইয়ে। জিজ্ঞেস করি এই ভিতরের আক্রমণ কবে শেষ হবে—এবং কী উপায়ে? বাইরে থেকে যে আক্রমণ হয়েছে এটা নিশ্চয়ই বিধাতার অভিপ্রায়। বাইরের শক্তি অর্থাৎ অক্ষশক্তি ইংরেজের সম্রাজ্যস্পৃহাকে এবার চূর্ণ করে করে দেবে। সেইখানেই আমাদের সফল হবার সুযোগ। আমরা তো শুধু দেশকে স্বাধীন করব না, স্বাধীনতার পর দেশকে বড় করে গড়ে তুলব। সে বৃহত্ত্ব ন্যায়ে, সাম্যে, মৈত্রীতে।

আমি অক্ষশক্তির স্তাবক নই। ওদের মাহাত্ম্য কীর্তন করা আমার পেশা নয়। আমার স্তবের ও কীর্তনের একমাত্র বস্তু ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। ইংরেজের পরাজয়েই আমাদের স্বাধীনতা। ওদের হারেই আমাদের ছাড়। ওরা এবার ধ্বংসের মুখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, শেষ ধাক্কাটা আমাদের হাতে আসবে এবার সহজে। আপনাদের হাত মুষ্টিবদ্ধ হোক, শক্ত হোক, দৃঢ় হোক—লোহা গরম থাকতে থাকতেই হাতুড়ির ঘা মারুন। এ লগ্ন বয়ে যেতে দেবেন না। এ লগ্ন বয়ে যেতে দিলেই ইংরেজ ঘর গুছিয়ে নেবে, যুদ্ধে জিতে যাবে শেষ পর্যন্ত। আর ইংরেজের এবারের জয়ের অর্থ ভারতের চিরকালীন দাসত্ব। তাকিয়ে দেখুন এবার আবার আমেরিকাকে সঙ্গে করে এনেছে—অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। ভারতবর্ষের কাছে এখন দুটো বিকল্প আছে। হয় স্বাধীনতা নয় অক্ষয় দাসত্ব। হয় নব-নবায়ন নয় চিরাবসান। উজ্জীবন নয় অবলুপ্তি।'

নেতাজী একা নন, টোকিও থেকে রাসবিহারী বসুও রেডিওতে অভিনন্দন পাঠালেন:

প্রাচ্য এশিয়ার ভারতীয়দেব পক্ষ থেকে আমি ভারতবর্ষকে সম্বর্ধনা জানাই যেহেতু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে রিক্তহস্তে ফিরে যেতে হয়েছে—ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। নইলে ভারতবর্ষ কী ভয়াবহ বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ত তা ভাবা যায় না।

একথা মননে-চিন্তনে সর্বদা জ্বলন্ত রাখতে হবে—ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্যে। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীদের জন্যে নয়।

রাসবিহারী যে জাপানে পালিয়ে এসেছে তা বৃটিশ গুপ্তচরেরা জানতে পেরেছে। জাপানী সরকারকে জরুরি অনুরোধ পাঠিয়েছে রাসবিহারীকে জাপান থেকে বহিষ্কার করে দাও। অর্থাৎ পাকড়াও করে আমাদের হেপাজতে জমা করে দাও, তারপর আমরা দেখব কোথায় তাকে চালান করা যায়।

সাংহাইয়ে সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল রাসবিহারীর। সান-ইয়াৎও জাপানে এসেছে ব্ল্যাক-ড্রাগন পার্টির কাজে। বলো তো কী করা যায়, সান-ইয়াতের কাছে বুদ্ধি চাইল রাসবিহারী। জাপানের মতো দেশ, স্বাধীন দেশ, সে আমাকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হবে? আমি ব্রিটেনের চোখে অপরাধী হতে পারি, কিন্তু জাপানের চোখে তো অপরাধী নই। স্বাধীনতাহীনতার যন্ত্রণায় সাম্রাজ্যবাদকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছি, তার জন্যে জাপানের তো কোনো অসন্তোষ থাকতে পারে না, তবে আমাকে ধরে ব্রিটিশের হাতে গছিয়ে দেবার চেষ্টা কেন? বদান্য জাপান কেন আমাকে বহিষ্কার করে দেবে?

সান-ইয়াৎ বললে, কোথাকার কে রাসবিহারী বসু, তার জন্যে জাপানী সরকারের ভারি মাথাব্যথা পড়েছে। কেন সে তোমার জন্যে ব্রিটিশ দূতাবাসের সঙ্গে বিরোধ করতে যাবে? কেউ যায়?

তবে কোনো উপায় নেই? আছে। হাসল সান-ইয়াৎ: তোমাকে ব্ল্যাক-ড্রাগন পার্টির এক কর্তাব্যক্তির হাতে পৌঁছে দিচ্ছি। সে-ই তোমাকে আশ্রয় দেবে।

কী নাম ?

মিতসু তোয়ামা।

তোয়ামা সানন্দে আশ্রয় দিল রাসবিহারীকে। যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে বিপ্লবের যজ্ঞে আহুতি জোগায় সে তোয়ামার নমস্য, প্রিয়জন। তোয়ামা তার বাড়িতে স্থানীয় সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ করে আনল। সে বৈঠকে রাসবিহারী জানাল তার বিপদের কথা, বেদনার কথা। ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদকল্পে সে বিপ্লবের আয়োজন করেছে আর সেই প্রয়োজনেই সে এখন এসেছে জাপানে। ব্রিটিশ সরকার তার পিছু নিয়েছে, তাকে নিরস্ত করা নিরস্ত্র করাই তাদের অভিসন্ধি। জাপান সরকার ব্রিটিশ সরকারকে মদত দিচ্ছে। আমাকে জাপান থেকে বিতাড়িত করবার হুকুম জারি করেছে যৌথ ভাবে। বৃটেন ভারতের শত্রু এ কে না জানে কিন্তু জাপান তো আমাদের বন্ধু আমাদের আত্মীয়—আমরা পৃথিবীর এক গোলার্ধে—এক এশিয়ায়। এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য—এ তো জাপানেরই মর্মবাণী। সেই জাপানে আশ্রয় নিতে এসে আমি বঞ্চিত হব, বিতাড়িত হব ? বিপদকে আমি ভয় করি না, এক্ষেত্রে বিপদের চেয়ে আমার বেদনাই গুরুতর। আদর্শের পূজারী জাপান এক আশ্রয়প্রার্থী আত্মজনকে স্থান দেবে না ? তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবে ?

এ অন্যায়। পরদিন জাপানের খবরের কাগজে ফলাও করে রাষ্ট্র হল ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে তার শত্রু বৃটিশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। একজন নিরাশ্রয় পলাতক বিপ্লবীকে তার শত্রুর মুখে ঠেলে দেওয়াটা কি জাপানী সরকারের পক্ষে উচিত হবে, না, শোভন হবে ?

ব্ল্যাক ড্র্যাগন পার্টির সভ্যেরা রব তুলল, না, না, কিছুতেই রাসবিহারী বসুকে তার জঘন্যতম শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। আমরা তাকে আশ্রয় দেব।

শুধু আহার্য আর আচ্ছাদন দিলেই তো চলবে না, কে তার সর্বক্ষণের প্রহরী হয়ে থাকবে ? দরকার মত কে টেনে দেবে বাতাবরণ ? দুই দুর্ধর্ষ সরকার—জাপানী আর ব্রিটিশ যখন জোট বেঁধেছে তখন গুপ্তচরদের চোখে কে কত ধুলো দেবে ? স্থানীয় টিকটিকি তো আছেই, তার উপর এসে গেছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা। কতদিন পালিয়ে বেড়াবে ? কে রাখবে লুকিয়ে ?

নির্দিষ্ট দিন সমাগত। কাল ভোর হবার আগেই সরকারি হুকুম মত রাসবিহারীকে জাপান ত্যাগ করতে হবে। ভোর হবার সঙ্গেই পুলিশ এসে তোয়ামার বাড়ি ঘিরল। কোথায় রাসবিহারী। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল—আনাচ কানাচ পর্যন্ত। রাসবিহারীর দেখা মিলল না।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়ে রাসবিহারীকে তোয়ামা মিস্টার সোমার বাড়িতে নিয়ে এল। সোমা রুটীর কারখানা চালায়। তার অবস্থা ভালো। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে তার সুন্দর সুখের সংসার। সোমা এবং তার স্ত্রীর কেমন মায়া পড়ে গেল রাসবিহারীর উপর। আপন ছেলের মতো স্নেহের চোখে দেখতে লাগল তাকে। আহা, বেচারা, কত কষ্ট সয়ে বিদেশে আত্মগোপন করে আছে, দু চোখে দেশ স্বাধীন করার প্রতিজ্ঞার দীপ্তি। এমন সুন্দর স্বভাবের তেজস্বী ছেলেকে মমতা না করে পারা যায় ! রাসবিহারীও সন্তানের শ্রদ্ধায় ও আনুগত্যে দুজনকে মান্য করে, ভালোবাসে। সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, সামান্য কয়েক মাসেই জাপানী ভাষা রপ্ত করেছে রাসবিহারী। সুন্দর অনর্গল বলতে পারে জাপানী, লিখতেও পারে। এক বর্ণও ঠেকতে হয় না। সোমাদের বড় মেয়ে তোসিকোই বুঝি শিখিয়েছে ভাষা। ভাষার অতীত তীরে বা অব্যক্তের

উচ্চারণ। তোয়ামাই এসে একদিন কথাটা উত্থাপন করল। রাসবিহারীর সঙ্গে তোমাদের মেয়ে তোসিকোর বিয়ে দাও।

এ কি কখনো সম্ভব? তোসিকো কি কখনো রাজি হতে পারে? বুকে কত বড় বিপদের পাথর বেঁধে জীবন কাটাতে হবে, প্রতিক্ষণেই উচাটন, প্রতি নিশ্বাসেই বুঝি আতঙ্কের পদপাত। এমন একটা স্তব্ধ যন্ত্রণা নিয়ে বসবাস করতে কি মেয়ে রাজি হবে?

মেয়েকে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করতে হবে। মেয়ে বড় হয়েছে। মতামত হয়েছে।

তুমি কি রাসবিহারীকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে পারবে? মা জিজ্ঞেস করলেন মেয়েকে।

তোসিকো মায়ের মুখের দিকে তাকাল। বিয়ে করলেই বুঝি সর্বাংশে রক্ষা করার দায়িত্ব নেওয়া যায়। বিয়ে করার চেয়েও বড় দায়িত্ব বুঝি রাসবিহারীকে রক্ষা করা। ঘনিষ্ঠ আচরণে শত্রুচক্ষুর থেকে আড়াল করে রাখা। নিরাময় করে রাখা।

তোসিকো বললে, 'ভেবে দেখি।'

কিছু দিন নিলেন মা। শেষে একদিন অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসবিহারীকে কী বলব?'

তোসিকো শান্তস্বরে বললে, 'তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই বলব।'

মা প্রফুল্ল মুখে বললেন, 'তাহলে তুমি রাজি আছ?'

'আছি।' তোসিকোর স্বরে শান্তির সঙ্গে দৃঢ়তা এসে মিশল; 'শুধু তো একটা প্রাণ নয়, এর সঙ্গে গাঁথা লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর প্রাণ। এ না বাঁচলে ওরা বাঁচে কী করে?'

মহীয়সী নারী শ্রীমতী তোসিকো!

আরেক মহীয়সী নারী শ্রীমতী শেঙ্কল।

রাসবিহারীর সভাপতিত্বে ব্যাঙ্কক সম্মিলন বসল পনেরোই জুন।

তার আগে মার্চে টোকিও সম্মিলন হয়ে গেছে। তারও সভাপতি রাসবিহারী। সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই রাসবিহারী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়ান লিগ বা ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ নামে একটা সংগঠন গড়ে তুললেন। তার শাখা প্রাচ্যএশিয়ায় প্রায় সর্বত্র স্থাপিত হল—মালয়ে, থাইল্যাণ্ডে, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিস-এ, ফরাসী-ইন্দো-চীনে, বর্মায়, কোরিয়ায়। রাসবিহারী জাপানী যুদ্ধমন্ত্রীদের সঙ্গে মীমাংসায় পৌঁছলেন—জাপান যদি কোনো প্রদেশ জয় করতে পারে তবে সেই অধিকৃত প্রদেশের ভারতীয়দের যেন শত্রুর চক্ষে না দেখে, যেন তাদের উপর উৎপীড়ন না চালায়। জানবে প্রত্যেকটি ভারতীয় মুক্তির পিপাসু, সেই অর্থে ইংরেজের শত্রু, আর ইংরেজের শত্রু বলে তোমাদের একান্ত মিত্র। তাই তোমাদের সৈন্যদের বলে দাও যেন ভারতীয়দের তারা লাঞ্ছনা না করে, ভারতীয় নারীদের কোনো অসম্ভ্রম না ঘটায়। আর যদি কোনো ব্রিটিশ বাহিনী পরাজিত হয়ে তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবে সেই বাহিনীর মধ্য থেকে ভারতীয় সৈন্যদের যেন আলাদা করে নেওয়া হয়—ঐ সৈন্যদল থেকে গড়ে উঠবে আমাদের নিজস্ব ফৌজ, আর সেই ফৌজই ব্রিটিশের কবল থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করবে।

রাসবিহারী বললেন, আমি চিরকালীন যোদ্ধা, আমার এক যুদ্ধ শুধু বাকি আছে সেটাই আমার জীবনের শেষতম ও মহত্তম যুদ্ধ।

চতুর্দশ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ফার্স্ট ব্যাটালিয়ন অফিসর মোহন সিং। মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোণঠাসা অবস্থায় অ্যালর-স্টার শহরে আশ্রয় নিয়েছেন, সঙ্গে ক্যাপটেন মহম্মদ আক্রম খাঁ। আর একজন ব্রিটিশ কর্নেল ফিজপ্যাট্রিক।

সেখানে হঠাৎ একটি শিখ ভদ্রলোক দেখা করতে এল। এল গাড়ি করে। আর, আশ্চর্য, গাড়িতে ভারতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা লাগানো।

নাম বললে গিয়ানী প্রীতম সিং। থাকে ব্যাঙ্ককে। পেশা বিপ্লববাদ—বিপ্লববাদ ভারতের স্বাধীনতার জন্যে। রাসবিহারী বসুর ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের ব্যাঙ্কক শাখার নির্দেশে তিনি জাপানী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গে এসেছেন। ওদের সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপড়া হয়েছে যে আমরা একটা ভারতীয় মুক্তি ফৌজ গড়ে তুলব। সে ফৌজ নিয়ে আমরা বাইরে থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে আক্রমণ করব আর তার ফলে ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লব জাগবে, আর দু দিকের দুই আঘাতে ব্রিটিশ পরাভূত হয়ে মিশে যাবে মাটির সঙ্গে—আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করব। ক্যাপটেন, আপনি আমাদের জাতীয় ফৌজ—মুক্তিফৌজ গড়ে তুলুন।

মোহন সিং হকচকিয়ে গেল। সাধুসন্তের মত চেহারা অথচ দুচোখে বিপ্লবের আগুন, কে এ আগন্তুক! এ যে তারই প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি শোনাচ্ছে! কিন্তু জাপানী সামরিক অফিসারেরা কী বলে ?

জাপানী গোয়েন্দা-বিভাগের অফিসার মেজর ফুজিয়ারা মোহন সিংকে লক্ষ্য করে বললে, 'আপনার পুরনো মনিবের দিন আর নেই, তাদের সূর্য এই ডুবল বলে। দেখলেন তো ওদের কাণ্ডটা। নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে ভারতবর্ষকে কাজে লাগাচ্ছে অথচ ভারতবর্ষের বেলায় স্বাধীনতার কথাটা উচ্চারণ করতেও রাজি হচ্ছে না।'

শুধু তাই নয়। মোহন সিং বললে, যে জিনিস চাই বললে আমাদের নেতারা যেখানে দণ্ডিত হয়ে জেলে যাচ্ছেন, সেখানে ওদের স্বার্থে সেই একই জিনিস চেয়ে আমরা ওদের জন্যে যুদ্ধ করে মরি কেন ?

সেই কথাটা ভারতীয় সৈন্যদের আপনি বুঝিয়ে বলুন। ফুজিয়ারা আরো উসকে দিল : কেন আপনারা লড়ছেন মিছিমিছি।

একেবারে মিছিমিছি। মোহন সিং সোচ্ছ্বাসে স্বীকার করল : আমরা লড়ছি ইংরেজের স্বার্থে যাতে ওদের জিতিয়ে দিয়ে আমাদের পরাধীনতাটা কায়েম করতে পারি। আর লড়ছি আমরা আমাদেরই দরিদ্র দেশের টাকায়। আমাদের টাকা, আমাদের রসদ, কিন্তু জয় ওদের, স্বাধীনতা ওদের। ইতিহাস আমাদের একদল মূর্খ ছাড়া আর কী বলবে!

ফুজিয়ারা সান্ত্বনার সুরে বললে, 'কিন্তু ভারতীয় সৈন্য তো যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক বীরত্ব দেখিয়েছে!'

'যতই কেননা বীরত্ব দেখাই সেটা নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্যে নয়। তাই আমরা কেউই বীর নই, আমরা সবাই ভাড়াটে সৈন্য। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আমাদের বলে ব্রিটিশের ওয়াচ-ডগ—প্রহরী-কুকুর।'

প্রীতম সিং উৎসাহে এগিয়ে এল : 'আপনি তবে এবার ভারতীয় মুক্তি-ফৌজ গড়ে তুলুন—।'

ফুজিয়ারা বললে, 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-লিগের আপনি সভ্য হয়ে যান, সমস্ত ভারতীয় বন্দী সৈন্য আপনার অধীনে এনে দিচ্ছি। আপনিই অধিনায়ক হোন।'

'অন্তত আমাদের নেতা [illegible] না পৌঁছুচ্ছেন এখানে।' প্রীতম সিং আশ্বস্ত করতে চাইল।

'নেতা!' মোহন সিং অকাল উজ্জ্বল চোখে।

'হ্যাঁ, নেতাজী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। নেতা বলতে সে একজনই।' প্রীতম আশ্বস্ত করল।

'তিনি কোথায়?'

'তিনি এখন ইউরোপে, জার্মানিতে।' প্রীতম অন্তরঙ্গ সুরে বললে, 'তাঁর কথা শোনেননি রেডিওতে? শোনা বারণ ছিল। এবার শুনবেন।'

মোহন সিং তাকিয়ে দেখল ফিজপ্যাট্রিক কোথায়? তাকে চালাকি করে আগেই ফুজিয়ারা সরিয়ে নিয়েছে। ভারতীয়দের কথায় সে যেন না থাকে।

শেষ পর্যন্ত মোহন সিং প্রস্তাবে রাজি হল। ভেবে দেখল মুক্তি ফৌজ গড়ে জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাতে ভারতীয় সৈন্যরাই শুধু বাঁচবে না, মালয়ের অসামরিক ভারতীয়রাও রক্ষা পাবে। মালয়ের যুদ্ধে ইংরেজ অফিসাররা যেভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়েছে তা কহতব্য নয়। ওরা যে এত ভীতু তা কে জানত!

মোহন সিং আরো পরিষ্কার করে নিল। বললে, 'ভারতীয় মুক্তি-বাহিনী তোমাদের বিভীষণ-বাহিনী হয়ে থাকবে না, তারা এক লক্ষ্যে তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়বে, ইংরেজের গদিতে তোমাদের বসাবার জন্যে নয়।'

'না না, রাসবিহারী আছেন না? আসছেন না সুভাষচন্দ্র?' ফুজিয়ারাও পরিষ্কার হল: 'জাপানের সেরকম কোনো অভিসন্ধি নেই। ভারত শুধু ভারতীয়দের জন্যে—আমাদের প্রধান মন্ত্রীর বাণী শোননি? ও, তোমাদের তো ঐ রেডিও শোনা বারণ ছিল!'

'হ্যাঁ, ইংরেজ জাপান ও ভারতবর্ষের সমান শত্রু।' বললে মোহন সিং, 'মালয়ে ইংরেজকে হারিয়ে জখম করতে পারো কিন্তু তাকে সমূলে নিপাত করতে হবে ভারতবর্ষে। অন্য জায়গায় তুমি তার শাখা প্রশাখা ছাঁটতে পারো কিন্তু তার শেকড় ভারতবর্ষের মাটিতে। সেখান থেকে তাকে উৎখাত করতে পারলেই সে নিশ্চিহ্ন হবে।'

জাপানী সামরিক দপ্তর ফুজিয়ারার সুপারিশে মোহন সিংকেই নির্বাচিত করলে।

সিঙ্গাপুরের পতনের পর ভারতীয় বাহিনীকে একটা পার্কে জড়ো করা হল। তাদের ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ লেফটেনেন্ট কর্নেল হাণ্ট ঘোষণা করল: আমরা এখন জাপানের যুদ্ধ-বন্দী। আমার অভিভাবকত্বের অবসান হল। আপনারা এখন জাপান সরকারের হেপাজতে। ওঁরা এখন যেমন আদেশ করবেন তেমনি পালন করবেন আপনারা।'

'আপনাদের ভার পেয়ে আমি আবার আপনাদের জিম্মা করে দিচ্ছি ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে। এখন থেকে মোহন সিংই আপনাদের অধিকর্তা।'

এখন এই ব্যাপারটাকে টোকিওতে নিয়ে যেতে হবে রাসবিহারী বসুর অনুমোদনের জন্যে। সেই হেতু টোকিও কনফারেন্স। আটাশে মার্চ উনিশ শো বিয়াল্লিশ।

জাপানীদের হাতে থাইল্যাণ্ডের পতন হলে ব্যাঙ্ককে যে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ-এর শাখা স্থাপিত হয় তার নেতা স্বামী সত্যানন্দ পুরী। তারই ডান হাত গিয়ানী প্রীতম সিং। দুজনেই সন্ন্যাসী কিন্তু দুজনে দেশের মুক্তি সাধনাকে ঈশ্বরসাধনারই অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছে। শুধু আত্মমোক্ষে তারা তৃপ্ত নয়, তাদের মোক্ষ দেশমুক্তিতে। পরাধীনতার বন্ধন মোচনে যারা উদ্যোগী নয় তাদের কিসের সংসারমোচন! স্বাধীনতার সন্ধানই তো ঈশ্বর সন্ধান।

কিন্তু নিয়তির কী দুর্বার বিধান, টোকিও যাবার পথে বিমান-দুর্ঘটনায় স্বামী সত্যানন্দ পুরী আর গিয়ানী প্রীতম সিং মারা গেলেন। সঙ্গে আরো দুজন গেলেন—ক্যাপটেন মহম্মদ

আক্রম খাঁ আর নীলকান্ত আয়ার। তবু এলেন অনেকে। ক্যাপটেন মোহন সিং, লেফটেনেণ্ট কর্নেল, এন. এস গিল, কে. পি. কে মেনন, রাঘবন, এস. সি. গুহ। আরো অনেক প্রতিনিধি।

প্রধানমন্ত্রী তোজো সান্ত্বনার বার্তা পাঠালেন। যে চারজন নেতা বিমান-দুর্ঘনায় প্রাণ দিলেন তাঁরা স্বাধীনতার যুদ্ধেই প্রাণ দিলেন। আর স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা প্রাণ দেয় তারাই মহাত্মা।

তোজো প্রগাঢ় আশ্বাস দিলেন ভারতের সার্বিক স্বাধীনতা লাভের জন্যে সম্ভবপর সমস্ত সাহায্যে আমরা প্রতিশ্রুত।

কনফারেন্সের সভাপতি রাসবিহারী। রাসবিহারীর ছাপ না পড়া পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাই পাকা করা যাচ্ছে না। রাসবিহারীর নেতৃত্বে কনফারেন্সে ঠিক হল জাপ-অধিকৃত প্রাচ্য এশিয়ায় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ-এর শাখা বিস্তারিত করা হোক ও আগামী জুন মাসে ব্যাঙ্ককে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্মিলন বসুক। ইত্যবসরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনকল্পে ভারতীয় বন্দীদের মধ্যে প্রচার চালানো হোক। প্রচারের কর্তৃত্ব রইল মোহন সিং-এর উপর। শুধু তো গঠন নয়, নিয়ন্ত্রণ, সুশৃঙ্খল পরিচালনা। সে চারটিখানি কথা নয়। নিয়ম-কানুন করণ-প্রকরণ মোটা-মিহি সমস্ত বিষয়টা বৃহত্তর ব্যাঙ্কক বৈঠকে ঠিক করা।

আরেক কথা। জার্মানিতে সুভাষ বোসকে অনুরোধ করা হোক তিনি ইটালি, জার্মানি ও জাপান এই তিন দেশ থেকে একটা যুক্ত ঘোষণা করুন। এই যুক্ত ঘোষণায় বলা হবে যে ভারতবর্ষ স্বাধীন। বলা হবে ভারতবর্ষ শুধু ভারতবাসীর জন্যে।

'আপনি রাসবিহারী বসুকে চেনেন?' বার্লিনে জাপ-রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওসিমা জিজ্ঞেস করল সুভাষকে।

সুভাষ বললে, 'আমি তাঁকে চিনি না, মানে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। কিন্তু তিনি আমার বিপ্লবের গুরু।'

'অনেক বছর আছেন টোকিওতে।'

'আর ভারতের স্বাধীনতার জন্যে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম করছেন!' সুভাষ উদ্দীপ্তকণ্ঠে বললে, 'আমি যদি একবার যেতে পারতাম টোকিও! তাহলে তাঁর নেতৃত্বের অধীনে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লড়তে পেয়ে ধন্য হয়ে যেতাম।'

বাইশে মে সুভাষ জার্মান সরকারকে চিঠি লিখল।

'জাপানী সৈন্য ভারতের সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। ভারত এখন বিপ্লবের জন্যে উদগ্রীব। ব্রিটিশের শাসনভার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীন হয়ে উঠে দাঁড়াবার সুবর্ণ সুযোগ তার হাতে এসেছে—বলা যায় ঐতিহাসিক সুযোগ। আমার হয়ে বলতে গেলে আমিও এই সুযোগ পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চাই। দূরে থেকে কিছু সংগঠনের কাজ আমি এখানে করেছি কিন্তু আমি অনুভব করছি এ সময় দূর প্রাচ্যে আমি উপস্থিত হতে পারলেই ভারতে স্বাধীনতার অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হবে যেহেতু আমি গিয়ে ভারতীয় বিদ্রোহ শক্তিকে ঠিক পথে চালিত করতে পারব। আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে যে আপনারা ত্রিশক্তি ও ভারত একই লক্ষ্যে প্রেরিত—সে হচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উৎসাদন। সেই অবিচলিত লক্ষ্যে ভারতকে সার্থক ভাবে চালিত করবার জন্যে আমার সাক্ষাৎ সান্নিধ্যের প্রয়োজন—অন্তত ভারতের যতটা কাছাকাছি আমি থাকতে পারি, থাকা সম্ভব। আমার সান্নিধ্য প্রত্যক্ষরূপে কার্যকর হবে। এ সময় যান্ত্রিক সহায়তায় দূরে প্রাচ্যে যাওয়া অসম্ভব নয়। জার্মান ও ইটালিয়ান সরকার ইচ্ছে করলেই আমাকে সেই

সহায়তা জুটিয়ে দিতে পারেন। বিষয়ের গুরুত্বটা বিবেচনা করে দেখুন, ভারতের এই বহ্নিমান অবস্থায় আমার সশরীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি ভারতীয় বিদ্রোহের নেতারূপে আমাকে আমার নিজস্ব ভূমিকা যথাযথ পালন করতে দেবেন।'

চিঠির উত্তর নেই। কিন্তু সুভাষের নিদারুণ ত্বরা। তার একমাত্র উদ্দেশ্য কী করে ভারতের স্বাধীনতাকে দ্রুত করা যায়।

সে আটাশে মে খোদ হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে গেল। হিটলারের দিকে ছিল রিবেনট্রপ আর হিমলার আর সুভাষের দিকে ফন ট্রট আর স্টেট সেক্রেটারি কেপলার।

সুভাষের প্রাচ্য যাত্রাকে সুগম করবার পক্ষে এই মুহূর্তে অসুবিধে থাকতে পারে কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে যুক্ত ইস্তাহারে সই করতে জার্মানির আপত্তি কী? ইটালী আর জাপান রাজি আছে? তারা রাজি। মুসোলিনি স্বয়ং এ ঘোষণায় উৎসাহী আর জাপানের পক্ষে ওসিমা আর সামরিক অফিসার ইয়ামামোটো তো এক পায়ে খাড়া।

কিন্তু হিটলার নরম হল না। বললে, ও-ধরনের ঘোষণার সময় এখনও আসেনি।

আমার তো মনে হয় এই উপযুক্ত সময়। মিশর আর ভারতবর্ষ সম্পর্কে একসঙ্গেই ঘোষণা করা যায়।

মিশর সম্পর্কে করা যায় নিশ্চয়। বললে হিটলার, মিশরের সীমান্তে পৌঁছে গেছে রোমেল। তাদের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের খসড়াও তৈরি। সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তা কার্যকর করবার জন্যে রোমেল আছে। ভারতবর্ষে তেমন কেউ নেই। ভারতবর্ষে তেমন অবস্থা এখনো আসেনি। দেয়ালে টাঙানো ম্যাপের দিকে সুভাষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল হিটলার: 'এই দেখুন রাশিয়ায় কোথায় আমরা রয়েছি, আর কোথায় ভারতবর্ষ। ব্যবধান এখনো দুস্তর। একমাত্র দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেই তবে ঘোষণা করার মানে হয়—তার আগে নয়।'

চঞ্চল হয়ে উঠল সুভাষ। দৃঢ়স্বরে বললে, এসময় এমনি একটা সম্মিলিত ঘোষণা পেলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক কার্য কলাপ অনেক বেড়ে যেত।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলতে আপনি কী বোঝেন, কতটুকু বোঝেন?

হিটলারের কথার সুরে রুষ্ট হয়ে সুভাষ ট্রটকে উদ্দেশ্য করে বললে, 'হিজ এক্সেলেন্সিকে বলুন, সারাজীবন আমি সক্রিয় রাজনীতি করে আসছি, সে সম্পর্কে বাইরে কারু কাছ থেকে আমার পাঠ নিতে হবে না।'

ট্রট অবশ্যি ঘুরিয়ে কথাটাকে নরম করে অনুবাদ করল। কিন্তু সুভাষের কণ্ঠের ঝাঁজটুকু হিটলারের কান এড়াল না।

সুভাষ আরো স্পষ্ট হল। বললে, 'আসলে আপনি ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল নন।'

চোখ বড় করে তাকাল হিটলার।

সুভাষের মনে একটা পুরোনো জ্বালা জেগে উঠল। বললে, 'আপনি আপনার 'মেইন ক্যাম্প' বইয়ে অযথা ভারতবর্ষের নিন্দা করেছেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। আপনার উচিত হবে পরবর্তী সংস্করণে ও অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া।'

হিটলারের মুখের উপর দাঁড়িয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে পারে এমন মানুষ আছে পৃথিবীতে? হিটলার বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল। আছে—ভারতবর্ষে আছে, বাংলা দেশে আছে। একজনই আছে। তার নাম অর্ল্যাণ্ডো মাৎসোটা নয়, তার একটাই নাম—সে নাম নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বোস।

সুভাষ নিরাশ হল নিঃসন্দেহে। ঠিক করল ঘোষণা-পত্র না হয় না হল, সে নিজেই যে করে হোক চলে যাবে পূর্বাঞ্চলে। তারই জন্যে সে দিন গুনতে লাগল। পথ খুঁজতে লাগল। শুধু ঘোষণা নয়, একেবারে সশরীর আবির্ভাব।

ব্যাঙ্কক অধিবেশন চলল পনেরোই থেকে তেইশে জুন। মূল সভাপতি রাসবিহারী বসু, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেবনাথ দাস।

কী উত্তাল উৎসাহ! দেশ-বিদেশ থেকে প্রতিনিধি এসেছে, এসেছে ত্রিশক্তির রাষ্ট্রদূতের দল। উর্ধ্বাকাশে উঠেছে ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা। সাম্য, শান্তি আর সমৃদ্ধি। একতা, বিশ্বাস আর উৎসর্গ।

ন দিন ধরে একে-একে পঁয়ত্রিশটি প্রস্তাব পাশ করা হল। কিন্তু তাদের মধ্যে সেরা প্রস্তাব ঐ একটি—নেতাজীকে আমরা চাই। জাপানী সরকারের কাছে আমাদের এই একটি অনুরোধ, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আমাদের মাঝখানে এনে দাও, তাঁর প্রাচ্য যাত্রাকে নির্বিঘ্নে করো। তাঁদের পক্ষে তাদের মিত্রশক্তি জার্মানিকে প্রভাবিত করা কঠিন হবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতাজী নেতৃত্ব অপরিহার্য। শুধু ভারতবর্ষের নয়, এশিয়ার মুক্তির জন্যে নেতাজীকে দরকার। রেডিও টেলিফোনে সুভাষের সঙ্গে কথা হল রাসবিহারীর।

তুমি চলে এস এখানে।

যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি। জাপকে চাপ দিতে বলুন। যতদিন আমি না পৌঁছুচ্ছি আপনি ততদিন হাল ধরে থাকুন।

আমি আছি। তুমি এস।

জাপানীদের কাছে রাসবিহারী বসু হচ্ছে বিহারী বোস আর সুভাষচন্দ্র বসু হচ্ছে চন্দ্র বোস। আর গান্ধী গান্ধী। জাপানী সৈন্য ভারতীয় লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করে, গান্ধী কা?

গান্ধী কা-র কী মানে প্রথমটা অনেকে ধরতে পারত না। মানে, গান্ধী কোথায়, না, গান্ধী কে? শেষে সহজ অর্থেই বোঝা গেল, জাপানী সৈন্য জানতে চাইছে, তুমি কি গান্ধীর দলের লোক? যখন উত্তর পেয়েছে, হ্যাঁ, ইয়েস, তখন সেই জাপানী সৈন্যের আনন্দ দেখে কে! তখন হয় উচ্ছ্বল করমর্দন করবে নয় তো উদার হাস্যে নমস্কার জানাবে।

ব্যাঙ্কক বৈঠকে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর এই কটা :

পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করতে পাঁচ জন সদস্য নিয়ে একটি সংগ্রাম-পরিষদ গঠন করা হল। সেই পাঁচ জনের প্রধান রাসবিহারী বসু সভাপতি আর বাকি চারজন ক্যাপটেন মোহন সিং, এন রাঘবন, কে পি কে মেনন আর লেফটেনেণ্ট কর্নেল জি. কিউ. গিলানি। এই সংগ্রাম-পরিষদই সব কিছু প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের কর্তৃত্ব করবে। স্থির হল ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ও অসামরিক ভারতীয়দের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে পাকাপাকি ভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে এক ফৌজ গঠন করতে হবে আর সেই নবগঠিত ফৌজের অধিনায়ক হবেন ক্যাপটেন মোহন সিং। স্বাধীনতাই ভারতীয়দের জন্মগত অধিকার আর সেই অধিকার অর্জনের জন্যেই এই ফৌজ যুদ্ধ করবে। জাপন-সরকার এই যুদ্ধে প্রয়োজনীয় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ও অন্যান্য সম্ভার সরবরাহ করবেন। আর যুদ্ধোপকরণ যা দেবেন তা স্বাধীন ভারতের ঋণ বলে বিবেচিত হবে। আর এই আজাদ হিন্দ ফৌজকে সমগ্র অক্ষশক্তি স্বাধীন ও মিত্রতাবদ্ধ বাহিনী জ্ঞানে সম্যক মর্যাদা দেবে।

আরো বলা হল, স্বীকার করতে হবে ভারত এক অখণ্ড ভূখণ্ড, আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই ভারতের একমাত্র প্রতিভূ প্রতিষ্ঠান। এই মুহূর্ত থেকে জাপানী সরকার পূর্ব-প্রাচ্যবাসী ভারতীয়দের স্বাধীন দেশের অধিবাসী বলে মনে করবেন এবং তাদের কোনো সম্পত্তিই শত্রুসম্পত্তি বলে গণ্য করা হবে না। যদি ভারতীয়েরা সম্পত্তি ফেলে রেখে অন্যত্র চলে গিয়েও থাকে, তাহলে সে সব পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংগ্রাম-পরিষদের কাছে গচ্ছিত থাকবে।

শত্রুমুক্ত হবার পর ভারতবর্ষ সার্বভৌম স্বাধীন হবে। তারপর স্বাধীন ভারত ও জাপানের মধ্যে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে। সর্বশেষে মুখ্য প্রস্তাব হল জাপানী সরকার এই প্রস্তাবগুলি অবিলম্বে অনুমোদন করবেন। কিন্তু, কই, কই সেই অনুমোদন!

এদিকে একটি নতুন মন্ত্রে ভারতবর্ষ প্রাণায়িত হয়ে উঠল। আসমুদ্র হিমাচলে জাগল নতুন আলোড়ন। নতুন জন-জল-কল্লোল। সেটিও অমনি দু কথার মন্ত্র। যেমন বন্দে মাতরম। যেমন জয় হিন্দ। তেমনি কুইট ইণ্ডিয়া।

বঙ্কিমের বন্দে মাতরম। নেতাজীর জয় হিন্দ। গান্ধীজির কুইট ইণ্ডিয়া।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহাভারতে এই তিনটি অমোঘ মন্ত্র—উচ্চনাদ উচ্চারণ। প্রথম মন্ত্রে মাতৃশক্তির উদ্বোধন। দ্বিতীয় মন্ত্রে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশের অখণ্ড চেতনা। তৃতীয় মন্ত্রে অনধিকার প্রবেশকারীর উৎপাটন।

কুইট ইণ্ডিয়া। ভারত ছাড়ো। সরে দাঁড়াও। কেটে পড়ো। পথ দেখ।

কোন ক্রোধ নয়, ঘৃণা নয়, আর্তনাদ নয়, আস্ফালন নয়,—একটি বৈধ সমীচীন প্রস্তাব—পরের বাড়ি ছেড়ে যাও। এ মন্ত্রের মধ্যে সত্যের শক্তি আছে। আছে ন্যায়ের শাসন। আছে বা আইনের সঙ্গতি। ভাড়াটের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে বাড়িওয়ালা তাকে বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দেয় না? তাই তো নোটিশ টু কুইট। আমরা ভারতবাসীরা তো নিঃসন্দেহে বাড়িওয়ালা, আর তোমরা, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী, তোমরা তো ভাড়াটের চেয়েও অধম, তোমরা তো ডাকাত, রাহাজান। আমরা তো তোমাদের ডেকে এনে বসাইনি। স্বত্ব দূরের কথা, তোমাদের তো সামান্য অনুমতিরও ভিত্তি নেই। তোমাদের দখল তো একেবারে গায়ের জোরে। বলো জবরদখলে তোমাদের কী নৈতিক যুক্তি আছে? ভাব দেখাচ্ছ ভারতবর্ষ যেন ভারতবাসীর নয়, তোমাদের জমিদারি। তোমাদের আমরা অনেক প্রশ্রয় দিয়েছি, তোমাদের ভজনা করতে আর বিবেক সায় দিচ্ছে না। তোমরা এবার স্থূলে-মূলে সরে পড়ো। যত তাড়াতাড়ি সরবে ততই সকলের কল্যাণ হবে। তোমরা ও তোমাদের মার্কিন সাকরেদেরা বড় গলা করে আর গণতন্ত্র রক্ষার কথা বোলো না। যতদিন তোমরা শ্বেত চর্মের শ্রেষ্ঠতাবোধ না বর্জন করবে ততদিন গণতন্ত্র নেই। তোমাদের এই উদ্ধত মনোভাবের অবসানেই সভ্যতার অভ্যুদয়।

এ এক নতুন গান্ধী। আরেক গান্ধী। পর্বত আর ধূমায়িত নয়, পর্বত এবার বহ্নিমান।

ইংরেজদের সম্বোধন করে গান্ধী বললেন, ভারতবর্ষকে ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও—যদি মনে হয় এটা বাড়াবাড়ি, তবে একে ছেড়ে দাও অরাজকতার হাতে।

গান্ধীর এ যুধ্যমান ভঙ্গি জওহরলালের মনঃপূত হল না। আজাদও জওহরলালের হাত-ধরা। জওহরলালের ধারণা জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে, সেই কারণে আমাদের জাপানকেই রোখা উচিত, উচিত ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে জোরদার করা।

গান্ধী বললেন, 'আর নয়, কখনো নয়। ভারতবর্ষের প্রতি জাপানের লোভ আছে তারই জন্যে সে আক্রমণ করবে এর নিশ্চয়তা কী। ইংরেজ গায়ের জোরে ভারতবর্ষের বুকের উপর বসে আছে এই বিসদৃশ অবস্থার জন্যেই জাপানের যা বিক্ষেপ। ইংরেজ দূর হয়ে গেলেই জাপান স্থির হবে। আর জাপান যদি নিতান্তই আক্রমণ করে, তবে বর্তমান যে দুর্দশার মধ্যে ভারতবাসীরা আছে তার চেয়ে ঘোরতর অবস্থা কিছু হবে না। অজানা শয়তানের চেয়ে জানা শয়তান বেশী ঘৃণ্য।'

এ আরেক গান্ধী। নতুন গান্ধী। তার মুখে একেবারে নতুন ভাষা, নতুন ধ্বনি—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। করব নয় মরব। হয় হেস্ত নয় নেস্ত। ডু অর ডাই। আর নিরাশের অভিমান নয়, এবার হতাশের অভিযান। সব কিছুর মত সহ্যেরও সীমা আছে, অপমানেরও সীমা আছে। আর সইব না, মানব না। এবার একতাবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। দুঃসাধ্য সাধন করব।

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। এই বাণীর এই অর্থ—এই একটাই অর্থ। বল প্রয়োগ করব। বিস্ফোরিত হব। বিস্ফারিত হব। পরমাণু যেমন ভাঙতে-ভাঙতে যায় তেমনি ভাঙতে-ভাঙতেই পরমায়ু পাব।

আই-সি-এস ছেড়ে বিলেত থেকে ফিরে গান্ধীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে সুভাষ এই কথারই আভাস দিয়েছিল—অসহযোগ করে আপনি ইংরেজ-শরীরটাকে পঙ্গু করতে পারেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ নিশ্চল দেহটাকে সিংহাসন হতে টেনে নামিয়ে ফেলতে আপনাকে বল প্রয়োগ করতেই হবে। সুতরাং আদ্যোপান্ত অহিংসা থাকার কথাটা ফাঁকিবাজি। ফাঁকিবাজি না হোক অবাস্তব। একটা মৃতদেহকে বেঁধে-ছেঁদে সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিতে হলেও জোর লাগে।

গান্ধীর মনেও এই কথাটাই কি নিগূঢ়নিহিত ছিল না যখন তিনি বিপ্লববাদীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমার হাতে বন্দুক থাকলে আমি সোজাসুজি বন্দুক দিয়েই লড়তাম, কিন্তু বন্দুক নেই বলেই আমি চরকা তুলে নিয়েছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংসা যুদ্ধের একটা কৌশল মাত্র, পদ্ধতি-প্রকরণ। অহিংসাতেই দুর্বলের পক্ষে দীক্ষিত হওয়া সহজ, এই দীক্ষার আশ্রয়েই স্বাধীনতা-স্পৃহা সমগ্র দেশে ব্যাপক হয়ে উঠবে আর উঠতে-উঠতে তা শেষ পর্যন্ত রূপায়িত হবে একটি আগ্নেয় উচ্চারণে: করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। সেদিন গান্ধীর হাতের চরকা আর চরকা থাকবে না, হয়ে দাঁড়াবে বিষ্ণুর হাতের সুদর্শন চক্র।

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। এ ধ্বনি ব্যক্তিগত আইন-ভঙ্গের ধ্বনি নয়, এ ধ্বনি জনতার ধ্বনি—বিপ্লব-উত্থিত বিক্ষুব্ধ জনতার রণডাক।

গান্ধীর মধ্যে দুই গান্ধী আছে—এক গান্ধী মোহনদাস আরেক গান্ধী করমচাঁদ। মোহনদাস গান্ধীই মহাত্মা, মহামানব, সেখানে অহিংসা তাঁর সত্তার সম্পদ, তাঁর জীবনের জলবায়ু। আর করমচাঁদ গান্ধী বিপ্লবী, জাতির জনক, অপমানের উত্তরে আঘাত হানবার মন্ত্রগুরু। এই কর্মবীর করমচাঁদেরই শেষতম যুদ্ধের শেষতম মন্ত্র—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় বললেন, এই যুদ্ধই আমার শেষ যুদ্ধ। এবার পাশার শেষ দান ছুঁড়েছি। এবার মুক্তি নয় মৃত্যু। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

বিশাখাপত্তন আর কোকোনাদে বোমা ফেলেছে জাপানীরা, বঙ্গোপসাগরে দেখা যাচ্ছে তাদের নৌবহর, মাদ্রাজ থেকে কলকাতা সমস্ত পূর্ব-উপকূল আতঙ্কে কাঁপছে থরহরি, শহর-বন্দর ছেড়ে সবাই পালাচ্ছে জঙ্গলে—বেশ তো, তাতে হল কী? বেশ তো ধরে নেওয়া যাক,

জাপানীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে ও ইংরেজদের হটিয়ে নিজেরাই রাজা হয়ে বসবে। তার জন্যে আমরা ভারতবাসীরা নবতন দাসত্বকে রোখবার জন্যে পুরাতন দাসত্বকে মেনে নেব? আমাদের প্রতিরোধ জাপানীরা পরাস্ত হবে আর আমরা যেমন ইংরেজের পদানত আছি তেমনি পদানত থাকব? অসম্ভব এই জল্পনা। সুদুঃসহ। জাপানীদের সঙ্গে মোকাবিলায় আমাদের যা হবার হবে, সে আমরা পরে দেখব, এখন তুমি বৃটেন, তুমি উৎখাত হও। কুইট ইণ্ডিয়া।

বৃটেন যদি স্বাধীনতার পূজারি হত তবে ইতিহাসের এই লগ্নে সে ভারতবর্ষকেও স্বাধীন করে দিত, আর তখন ভারতবর্ষ বৃটেনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সমান উৎসাহে রুখত জাপানকে। ভারতবর্ষ তার নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বিপন্ন হতে দিত না। এ যে এখন অন্যায়ের চূড়ান্ত, অপমানের চূড়ান্ত। এ আর সহ্য হচ্ছে না। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

গান্ধী বললেন, 'যদি কেউ আমার সঙ্গে না-ও আসে আমি একা লড়ব। দরকার হলে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়ব। আমার স্বদেশবাসীরাও যদি আমাকে নিবৃত্ত করতে চায় আমি নিবৃত্ত হব না। স্বাধীনতার জন্যে আমি আর অপেক্ষা করতে রাজি নই। আর অপেক্ষা করতে গেলে ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দেবেন। জীবনে এই আমার শেষ যুদ্ধ।'

এ যেন গান্ধীজির কণ্ঠে নেতাজীর স্বর।

চোদ্দই জুলাই ওয়ার্দায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ইংরেজকে বলা হবে ভারত ছাড়ো। আর গড়িমসি নয়, এবার পাততাড়ি গুটোও। নইলে এবার অন্তত আমরা ছাড়ছি না। সবাই বুঝতে পেল এবার দেশময় প্রলয়কাণ্ড শুরু হবে। ইংরেজ চোখ কচলাল।

এতদিন কম্যুনিস্ট পার্টির উপর গভর্নমেন্টের নিষেধাজ্ঞা ছিল। এবার সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। এবার তোমরা এস, কাজে হাত দাও, কংগ্রেসের বিরোধিতা করো। তারা যদি চরম আন্দোলনে নামে তোমরা সে আন্দোলনকে অবজ্ঞেয় করে দেখাও। যেহেতু রাশিয়া আর ইংলণ্ড এক পক্ষে সেইহেতু ইংলণ্ডের বিরোধিতা করাই দেশের শত্রুতা করা। তোমরা জনে-জনে সেটা বুঝিয়ে বলো। বুঝিয়ে বলো কাকে বলে জনযুদ্ধ। ইংরেজের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সক্রিয় সাহায্যই এখন জনযুদ্ধ!

যে যাই বলুক, যেমনটিই ব্যাখ্যা করুক, গান্ধী আর ফিরে তাকাবেন না। তবু একবার শেষ সুযোগ দেবার অভিলাষে তাঁর শিষ্যা মীরা বেন বা মিস শ্লেডকে বড়লাটের কাছে পাঠালেন। এখনো পরিস্থিতি বুঝে পুনর্বিবেচনা করুন, আপসে ভারতবাসীর স্বপ্নকে সফল হতে দিন। মহানুভ গান্ধী। ভদ্রতা করতে চেয়েছিলেন, কোমরের নিচে আঘাত হানতে চাননি। কিন্তু লিনলিথগো সে সুযোগ নিল না। দেখা না করেই মীরা বেনকে তাড়িয়ে দিল দরজা থেকে। তবে আর কথা কী। বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই এক লাল তারিখ—উনিশশো বিয়াল্লিশের আটই আগস্ট।

দুটি পরিচ্ছন্ন শব্দ কুইট ইণ্ডিয়া। দুয়ে মিলে একটি তেজোগর্ভ, সত্যপূত বাক্য। একটি প্রদীপ্ত মন্ত্রসূক্ত। ন্যায়ের কাছে অপরাধী, হে অনধিকারী, পরধনে গৃধ্নুতা পরিহার করো। নইলে উদ্যত মহাবজ্রের কাছে মাথা পাতো। আর পরিত্রাণ নেই।

এদিকে জাপান থেকে রাসবিহারীর অভিনন্দন এসে পৌঁচেছে। সবার উপরে মহাত্মা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। মহাত্মার জয় হোক। জয় হোক স্বাধীন ভারতের।

রেডিও মারফত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহ্বান পাঠাল রাসবিহারী। তোমরা দলে-দলে

গান্ধীর এই আন্দোলনে সামিল হও। ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করো। শাসনে-শোষণে ভারতকে দারিদ্র্যজর্জর করলেও ভারতের আত্মাকে সে ম্রিয়মাণ করতে পারেনি। সেই আত্মারই উন্মোচন দেখ আজ গান্ধীতে। তাঁর মান রাখো—শত শত শহিদের মান রাখো। পতাকা উচ্চে তোলো, শত চার্চিল বা রুজভল্টের সাধ্য নেই এ পতাকা অবনমিত করে। কেউ-কেউ বললে এ সময় সুভাষ যদি থাকত! আবার কেউ-কেউ ভাবলে, এ সময়ে সে থাকবে কী, এ সময়ে যদি সে আসত! কিন্তু সে তো বিনা-অস্ত্রে বিনা প্রস্তুতিতে আসবে না, সে সসৈন্যে প্রবেশ করবে, সে আসবে তার আজাদ্ হিন্দ বাহিনী নিয়ে। কত উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে সে আসবে, কত দুরারোহ পর্বত উল্লঙ্ঘন করে। অপেক্ষা করো কত দিনে সে তার জয়যাত্রা শুরু করে। না, আর অপেক্ষা নয়, গান্ধী বলেছেন আর অপেক্ষা করতে গেলে ভগবান শাস্তি দেবেন। এক্ষুণি কাজে লাগো, ভিতর থেকে আঘাত হানো, সুভাষ বাইরে থেকে আঘাত হানুন। লগ্ন ত্বরান্বিত হোক। যতই কঠিন হোক পথ তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিক। তুমি তোমার কাজ করো। ডু অর ডাই।

চূড়ান্ত প্রস্তাব গৃহীত হল আটই অগাষ্টের রাত দশটায় আর পরদিন প্রত্যুষেই পুলিশ এসে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে গেল নেতাদের। প্রথম সারের সব কটি কংগ্রেসীকেই গ্রেপ্তার করে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে একটা স্পেশাল ট্রেনে বোঝাই করল। যুদ্ধে যেমন ঝটিকা-আক্রমণ শোনা গেছে এ তেমনি ঝটিকা-গ্রেপ্তার। পার্ল হারবারে জাপানীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার মতই তড়িঘড়ি। যাতে নেতারা কেউ আর বাক্যস্ফুট না করতে পারে। যাতে পরবর্তী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া দূরের কথা, আন্দোলন কী ভাবে কোন পথে চালাতে হবে, তার কোনো নির্দেশও ছকে দিতে না পারে। যাতে সব তালগোল পাকিয়ে যায়, যাতে আদ্যোপান্ত অন্ধকার হয়ে থাকে।

গান্ধী কি চেয়েছিলেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনও অহিংস হবে? তাহলে ডু অর ডাই-এর তাৎপর্য কী? ডু—করা, কী করব? আর এমন সে কৃত্য যাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সেই মৃত্যুফলান্বিত কৃত্য কি অহিংস? এ কি তবে মারমুখো বিপ্লবের ডাক নয়? কে জানে নির্দেশ হয়তো পরে প্রচারিত হত। ধীরেসুস্থে বিস্তৃত বয়ানে। নেতারা প্রত্যাশাই করেননি এমন ঝড়ের বেগে সবাই ছিনতাই হয়ে যাবেন। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে কেউ প্রস্তুত হবারও সময় পেল না। চলুন, পুলিশের গাড়িতে উঠুন, সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, সেখান থেকে ট্রেনে করে আপনাদের বন্দীনিবাসে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে। উঠে পড়ুন চটপট, পুলিশ তাড়া দিল, সাজগোজ করার সময় দিতে পারব না।

হাতের কাছে দরকারি জিনিস যে যা পেল তাই গুছিয়ে নিয়ে চলল নেতার দল। স্টেশনে পৌঁছে সবার কী হাসাহাসি। তাড়াতাড়িতে কেউ চশমা আনতেই ভুলে গেছেন, কেউ ফেলে এসেছেন মনি-ব্যাগ, কেউ আধখানা-পড়া বইটা রেখে কী আরেকটা বাজে বই তুলে এনেছেন, কেউ আবার পুঁটলি বাঁধলেও ধুতিই সঙ্গে নেননি। তাই নিয়ে সবাই খুশমেজাজে পরিহাসে মেতে উঠলেন। মন্দ কী, সবাই একট্রেনের প্যাসেঞ্জার হয়ে চলেছি পিকনিকে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের? কেউ বললে, পূর্ব আফ্রিকায় উগাণ্ডায়, কেউ বললে আরো দূরে। আসলে গান্ধীকে নিয়ে যাওয়া হল পুনায়, আগা খাঁর প্রাসাদে। জওহরলাল আর আজাদকে রাখা হল চাঁদবিবির দুর্গে, আমেদনগরে। আর বাকিদের বিভিন্ন জেলখানায়। গান্ধীর সঙ্গে থাকতে পেলেন সহধর্মিনী কস্তুরবা, আর মহাদেব দেশাই, মীরা বেন আর সরোজিনী নাইডু।

কোথায় বিপ্লবের রক্তাক্ত সূর্য—এ যে দেখি এক প্রশান্ত প্রভাত। বৃটিশ সরকার স্বস্তির

নিশ্বাস ফেলল। এক বেড়াজালে সমস্ত রাঘববোয়ালকে ঘায়েল করা হয়েছে। জনতার কাছে কোনো প্ল্যান নেই, কোনো হুকুমনামা নেই। সব ঝাপসা, সব এলোমেলো। পথের সন্ধান নেই তবু কিনা বলা পথ চলো। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। কী করবেটা শুনি? চরকা কাটবে? আর রামধুন গাইবে? সরকারের লোকেরাও হাসাহাসি করতে বসল।

নেতা না থাক, জনতা আছে। জনতার প্রত্যেকেই এখন জননেতা। বিপ্লবের মহামন্ত্র পৌঁছে গেছে সাধারণের কাছে। কখনো-কখনো নেতার চেয়েও তার বাণী বেশি কার্যকর।

একটি মন্ত্রের স্ফুলিঙ্গে দিক-বিদিকে দাবানল জ্বলে উঠল। আগুন ধরল থানায়, পুলিশ ব্যারাকে, সরকারি ভবনে, স্টেশনে, পোস্ট-অফিসে। টেলিগ্রাফের তার কাটা হল, ফিশপ্লেট সরিয়ে রুদ্ধ করা হল ট্রেনের যাতায়াত। শুধু ফিশপ্লেট নয়, উপড়ে তুলে ফেলা হল মাইলের-পর-মাইল রেল-লাইন।

সে এক তাণ্ডব প্রচণ্ড। কিন্তু জনতার হাতে প্রার্থিত অস্ত্র কই? অস্ত্র বলতে শুধু এক আগুন, অপমানের আগুন, বঞ্চনার যন্ত্রণা। হ্যাঁ, এবার আর প্রতিরোধ নয়—এবার প্রতিশোধ। বিধ্বংসী উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত হয়েছে জনতা, কিন্তু তাদের মাল কই, রসদ কই? বুলেটের বিরুদ্ধে কত লড়বে আর ইট-পাটকেল? আগুন আর কত পোড়াবে, কতক্ষণ পোড়াবে? নেতারা বিপ্লবে ডাক দিলেন কিন্তু সেটাকে প্রসারিত করবার মত উপায় প্রণয়ন করলেন না। অরাজকতাকে টিকিয়ে রাখতে গেলেও চাই দৃঢ়ীভূত গণশক্তি। গণশক্তিকে সেভাবে সংগঠন করা হল কই? শুধু কথায় কিছু হবার নয়, কাজ চাই, আর কাজও হওয়া চাই কাজের মত কাজ। মুক্তি শুধু আকাঙ্ক্ষা করেই পাবার নয় তার জন্যে চাই শক্তি, বিপুল শক্তি, পার্থিব শক্তি,—এক কথায় অস্ত্রের শক্তি। পর্যাপ্ত অস্ত্র ছাড়া বিপ্লব অপর্যাপ্ত হয় কী করে? তবু যা হবার, যতটুকু হবার তো হোক। দেশ নেতাজীর পথের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। নেতাজী আসুন। তার আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সঙ্গে করে। নেতাজী না এলে কিছু হবে না।

কজন পলাতক বিপ্লবী আত্মগোপন করেছিল। তারা স্থির করল বড়লাট লিনলিথগোকে শেষ করতে হবে। বড়লাট সদলে সিনেমা দেখতে আসছে। সেই সিনেমায় যথাস্থানে একটি টাইম-বোমা রাখা হল। আসন নিক, ঘর অন্ধকার হোক, ছবি চলুক, যথাসময়ে বোমা ঠিক বিদীর্ণ হবে। তখন আর দেখতে হবে না। যথাসময়ে বোমা বিদীর্ণ হল। আর দেখতেও হল না। লিনলিথগো আদৌ আসেনি সিনেমায়। শেষ মুহূর্তে কী জানি কেন নিমন্ত্রণ নাকচ হয়ে গেল। রক্ষা পেল বড়লাট।

দিল্লী থেকে বোম্বাই যাচ্ছে ওয়াভেল, যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। বিপ্লবীরা ঠিক করল ট্রেন লাইনে ডিনামাইট বসিয়ে উড়িয়ে দেব ট্রেন। কিন্তু এবারও নিয়তি বাদ সাধল। ওয়াভেলের স্পেশাল ট্রেনের আগে যে একটা পাইলট এঞ্জিন ছাড়া হবে তা বিপ্লবীরা জানে। তাই পাইলট এঞ্জিন বেরিয়ে যাবার পরই তারা বসাল ডিনামাইট। এবার আর স্পেশাল ট্রেনকে দেখতে হবে না, চকিতে পিণ্ডীকৃত হয়ে যাবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আরো একটা পাইলট এঞ্জিন বেরুল আগ বাড়িয়ে। দ্বিগুণ সতর্ক তার জন্যেই এই দ্বিতীয় পাইলটা ডিনামাইট ঠিক ফাটল কিন্তু ওয়াভেলকে স্পর্শ করতে পারল না। ওয়াভেল ধরল অন্য পথ।

অগাষ্ট বিপ্লবের বীর নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ভারতবর্ষের কোনো এক জায়গা থেকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বাণী প্রচার করল: বিস্ফোরণ সফল হলেই কি সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ ভেঙে

পড়ত ? দু-একটা বিস্ফোরণ ব্যর্থ হলেও কিছু যায় আসে না। আসল হচ্ছে বিদ্রোহের মনোভাবটাকে বিস্ফারিত করে দেওয়া। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। গুরুদত্ত মন্ত্র অব্যর্থ হতে বাধ্য। তোমরা এগোও, আমি আছি তোমাদের সহচর, তোমাদের গৌরবেই আমার মর্যাদা, বিপ্লবের মর্যাদা।

কী হয়েছিল জয়প্রকাশের ? কংগ্রেসী না হয়েও অগাস্ট বিপ্লবে বন্দী হয়েছিল জয়প্রকাশ। আটক ছিল সে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে। তারপর সে কী করল ? জেলের দেয়াল টপকালো। আর তাকে কে ধরে, কে আটকায়। পায় হেঁটে চলে গেল নেপাল। যদি পারি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে মিলব একদিন। এদিকে রেডিওতে ভেসে এল নেতাজীর কণ্ঠস্বর। সেই উদাত্ত গম্ভীর সুদৃঢ় আশ্বাসবাণী। যেমন মধুর তেমনি পবিত্র। মনে হয় যেন কোন দেবদূত কথা কইছে।

'কুইট ইণ্ডিয়া। সর্বত্র অগ্নির অক্ষরে এই বাণী লিখে দাও—লিখে দাও প্রতিটি মানুষের বুকের পাঁজরায়, প্রতিটি ঘরের দেয়ালে, মাঠে-ক্ষেতে কলে-কারখানায়, স্কুলে-কলেজে, জেলে-থানায়, অফিসে-আদালতে, স্টেশনে-দপ্তরে—যত্র-তত্র। গাছের পাতায়-পাতায়, মাঠের ঘাসে-ঘাসে। কুইট ইণ্ডিয়া। নেতারা অদৃশ্য হয়েছেন, তাঁরা অদৃশ্য থাকুন। তাঁদের আজকের ত্যাগ ও দুঃখ তোমাদের কাছে মহত্তর প্রেরণা হয়ে উঠুক। সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচার আরো নির্মম হবে কিন্তু এবার আর আমাদের বিরাম নেই, আমরা পেয়ে গেছি আক্রমণের তীক্ষ্ণতম অস্ত্র—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। আমাদের মহান নেতা এবার পাঞ্চজন্যে ডাক দিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী জিন্দাবাদ।'

এই কুইট ইণ্ডিয়ার কথা সুভাষই প্রথম তুলেছিল হরিপুরায়, তখন তাকে আমল দেওয়া হয়নি, আজ তারই মন্ত্র ফলপ্রসু হয়েছে।

'ইংরেজ এবার একটা মরণ-কামড় দেবে, কিন্তু তাতে ভীত হবার কিছু নেই। সিংহের আর সেই তেজ নেই, নেই সেই গর্জন, সিংহ এখন মুমূর্ষ। তোমরা ভিতর থেকে মারো আমরা বাইরে থেকে মারছি। সবাই মিলে এক অবিভাজ্য আজাদ হিন্দ ফৌজ। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।'

ভিতরে গান্ধীজি আর বাইরে নেতাজী—দুয়ে মিলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

ইংরেজ তো আমাদের দিয়েই আমাদেরকে মারছে। আমাদের ছেলেকে আমরাই পুলিশ হয়ে গুলি করছি। আমরাই হাকিম হয়ে দেশসেবককে জেলে পাঠাচ্ছি। শহিদ বলে যে একদিন কীর্তিত হবে তাকে তুলছি ফাঁসিকাঠে। দেশকে পদানত রাখবার জন্যে আমরাই জোট বেঁধে বৃটিশের সৈন্য হয়ে জিতিয়ে দিচ্ছি বৃটিশকে। এমনটি আর চলবে না। মুখ ঘোরাও। পুলিশের মধ্যে হাকিমের মধ্যে সৈন্যের মধ্যে সর্বস্তরের বেতনভোগীর মধ্যেই দেশপ্রেমিক আছে। এবার তবে নিজের দিকে দেশের দিকে মুখ ঘোরাও। দল-বদল করে স্বদলে চলে এস। তখন কিন্তু এ কথা বললে চলবে না যে আজাদ হিন্দ বাহিনী দেশের সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়ছে। দেশের সৈন্য কোথায় ? ও তো বৃটিশ পক্ষের সৈন্য। বৃটিশ পক্ষ ছেড়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দিয়ে খাঁটি দেশের সৈন্য হয়ে যাও।

পুলিশের উপর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব পড়ল। তাদের কেউ-কেউ বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করলে। বিদেশী সৈন্যদের কাছ থেকে নানা উপায়ে অস্ত্র সংগ্রহের পথ বাতলে দিল। বিপ্লবীদের হাতে এল কিছু টমিগান, রাইফেল। কিন্তু এই সামান্য উপকরণে কি একটা অভ্যুত্থান জয়ী হতে পারে ? অভ্যুত্থানের পিছনে তাই সামরিক শক্তির প্রয়োজন।

গান্ধীজির পিছনে নেতাজী।

প্রদেশে প্রদেশে সমস্ত কংগ্রেস কমিটি বে-আইনি বলে ঘোষিত হল। বঙ্গদেশেরটা দশুই অগাষ্ট। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ। শোভাযাত্রা নিবারিত। তপ্তপ্রাণ ছাত্রদল মানল না নিষেধাজ্ঞা। বারোই অগাষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা ডাকল। সম্মিলিত কণ্ঠে উঠল জয়ঘোষ : কুইট ইণ্ডিয়া। কুইট ইণ্ডিয়া!

দখলের সপক্ষে অনধিকারী বিদেশীর কী বলবার আছে? ন্যায়ের আদালতে কিছুই বলবার নেই। যা করবার, তা শুধু জোরজুলুমের মুলুকে।

পুলিশের পিছনে সাজোয়া বাহিনী—ইংরেজের দম্ভ তখন দেখে কে। লাঠিচার্জে না হয় সরাসরি গুলি চালাও। গুলি স্থলে জলে অন্তরীক্ষে। প্রথম গুলি চলল শ্রীমানী বাজারের সামনে। প্রথম শহিদ হল বৈদ্যনাথ সেন। তারিখটা রক্তের অক্ষরে শাশ্বত হয়ে রইল—তেরই অগাষ্ট। পর দিন গুলি চলল ভবানীপুরে। শহিদ হল দিলীপ ঘোষ।

প্রত্যুত্তরে দেশের ভিতরে-বাইরে প্রকটে-অপ্রকটে জ্বলে উঠল রোষানল। জনতা হাতের কাছে যা পেল তাই পোড়াতে লাগল—ডাক-বাক্স থেকে ডাক-ঘর, ট্রাম, ট্রাক—এমনকি পুলিসের গাড়ি। গুলি চলল নিরর্গল। প্রত্যুত্তরে চলল প্রত্যাঘাত। আর আমরা গৃহপালিত পশুর মত দাঁড়িয়ে মরব না। আমরা পেয়ে গিয়েছি আমাদের মরণ মন্ত্র—মারণ মন্ত্র—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

আন্দোলন বাংলার জেলায়-জেলায় ছড়িয়ে পড়ল, শহরে-মহকুমায় গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে ঘাটে-বন্দরে। উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে। মৈমনসিং থেকে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম থেকে মুর্শিদাবাদ। যতই ছড়ায় ততই আগুন ঊর্ধ্বে ওঠে। এক জায়গার সংবাদ পেয়ে আরেক জায়গা কোমর বাঁধে—ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিপর্যস্ত সরকার তখন হুকুম জারি করল আন্দোলনের সংবাদ খবরের কাগজে বার করা চলবে না। গুলিতে কত মরল তাও না, আগুনে কত পুড়ল তাও না। নিরীহ মজদুররা টেলিফোনের লাইন সারাচ্ছে মাটির নিচে, তাদেরও যে বিপ্লবী ভেবে গুলি করা হল সে কথাও চেপে যেত হবে। কিংবা রেল-লাইনে কর্মরত কুলিদের উপর যে বিমান থেকে নির্বিচার মেশিন-গান চালানো হল সেটাও অন্ধকার!

অসম্ভব এই বাকরোধ। প্রতিবাদে খবরে কাগজ বন্ধ রাখা হল। স্তূপীভূত নিস্তব্ধতার মধ্যেই অসন্তোষ রোষায়িত হয়ে উঠুক।

মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সরকারি খাতিয়ান দিলেন—নিহত কুড়ি, আহত একশো বাহান্ন আর গ্রেপ্তার সাড়ে তিন হাজার। এ শুধু এক অগাষ্ট মাসে শুধু কলকাতায়। এ সামান্য আভাস থেকেই বোঝা গেল সমস্ত প্রদেশে ব্যাপার কী অতিকায়! আর এ তো শুধু প্রদেশের ব্যাপার নয়, এ সমগ্র দেশের অভ্যুত্থান।

সেপ্টেম্বরে জ্বলে উঠল মেদিনীপুর। স্বাধীনতার সংগ্রামে চিরদিনের অগ্রণী মেদিনীপুর।

সরকারের হুকুম—যুদ্ধের জন্যে চাল চাই। দানিপুরের চালকল-মালিকের উপর সে হুকুম জারি করেছে পুলিশ। কলের মালিক সে হুকুম তামিল করতে উৎসুক। চালের দামের উপর বাধ্যতারও দাম পাবে বোধ হয়।

সব ব্যবস্থা পাকা—গ্রামবাসী তরুণের দল এসে বাধা দিল। এ চাল যাচ্ছে কোথায়? ওয়ার-ফ্রন্টে। যুদ্ধক্ষেত্রে। সে কোথায়? দেশে না বিদেশে? বিদেশে। অসম্ভব। তরুণের দল প্রতিরোধে দৃঢ় হল : এ চাল বিদেশে চালান হতে পারবে না।

প্রয়োজন যে মহৎ। পুলিশ অফিসার বোঝাতে চাইল : চাল না পেলে সৈন্যরা খাবে

কী? যুদ্ধ করবে কী করে?

কার যুদ্ধ কে করে? প্রতিরোধীর দল দ্বিগুণ ছেড়ে চতুর্গুণ হয়ে উঠল। কেন এই যুদ্ধ? কিসের জন্যে? দেশের শত্রুকে বিতাড়িত করবার জন্যে। দেশের শত্রু? হ্যাঁ, কে সে শত্রু? তাকে চিনতে আর আমাদের বাকি নেই। হ্যাঁ, তাকে বিতাড়িত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কুইট ইণ্ডিয়া। তাকে তাড়াবার যুদ্ধে আমরা সবাই সৈনিক সেজেছি। তাই এ চাল আমাদের জন্যে। এর এক দানা বাইরে নিয়ে যেতে দেব না।

পুলিশের দলবলও তেড়ে উঠল। কুইট ইণ্ডিয়া। প্রতিরোধীরা বিতাড়ন-মন্ত্র পেয়ে গিয়েছে। সঙ্গে আছে আর উজ্জীবন-মন্ত্র—করঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

পুলিশ গুলি চালাল। জনতাকে সাময়িক ভাবে বিপর্যস্ত করা হল বটে কিন্তু চাল রপ্তানি বন্ধ হল।

গুলিতে কজন মরেছে? কেউ বলে তিন, কেউ বলে পাঁচ। মৃতদেহগুলি আমাদের চাই—দাবি করল জনতা। পুলিশ বললে ময়না-তদন্তের পর দেওয়া যাবে। কিন্তু পুলিশ তার কথা রাখল না, তদন্তের পর মৃতদেহগুলিকে নদীতে ফেলে দিল। ঝাঁপিয়ে পড়ল জনতা। শহিদদের এমনি ভেসে যেতে দেব না। দেহগুলিকে তুলল জল থেকে। শহিদের মর্যাদা দিয়ে সাড়ম্বরে সৎকার করব ওদের। দেহগুলি পুলিশ ছিনিয়ে নিল। এবার আর ভাসিয়ে দিতে সাহস পেল না। এক চিতায় স্তূপীকৃত করে অগ্নিসাৎ করা হল। এ দেহ ভস্ম হয় না। আগুন হয়ে আগুনের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। এরা করা? এরা স্বাধীনতার আকাশে নামহীন নক্ষত্রের অক্ষর। অন্তহীন উৎসর্গের সঙ্কেত।

আশে পাশের গ্রাম থেকে নিরীহ মানুষদেরও গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নিয়ে এল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। ভর-দুপুরে খোলা মাঠে রোদে ঠাঁয় বসিয়ে রাখল। বেছে-বেছে তেরো জনকে সনাক্ত করে জেলে ঠেলল। কারু কারু দণ্ড দু বছর কারাবাস।

এদিকে জনতার আদালতও বসে গিয়েছে। সে আদালতের বিচারে চালকল মালিক দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। জরিমানা দু হাজার টাকা। উপায় নেই। চালকল-মালিক রায় মেনে নিয়েছে। দিয়েছে জরিমানা। গুলির আঘাতে নিহত শহিদদের পরিবারে সে টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভাগ করে দেওয়া হল। ক্ষতিপূরণটা বড় কথা নয়, বড় কথা জনতার আদালত। আরো এক কথা। চালকল-মালিককে সতর্ক করে দেওয়া হল যেন এক কণা চালও না পাচার হয়। মালিক ঘাড় নোয়াল। এক কণাও যাবে না।

মহিষাদলে সভায় পুলিশ নিয়ে স্বয়ং এস-ডি-ও হাজির। বক্তাদের মধ্য থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিল। কে গ্রেপ্তার করে—জনতা বক্তাদের ঘিরে ব্যূহ রচনা করল। হাকিম বললে, লাঠি চালাও। কিন্তু, কী আশ্চর্য, পুলিশ লাঠি তুলল না। বললে হাতে ব্যথা। পারব না। আধোমুখে এস-ডি-ও ফিরে গেল তমলুকে।

আজাদ হিন্দ-এর হাওয়া ক্রমশই বুঝি ছড়িয়ে পড়ছে। বৃটিশের পক্ষে যেমন ভারত ছাড়ো, ভারতবাসীর পক্ষে তেমনি ইংরেজ ছাড়ো। কেউ কেউ বেঁকে দাঁড়ালেও বেশির ভাগই এখনো ইংরেজের কৃপাশ্রিত। তারা অত্যাচারকে চরম করে তুলল।

উনত্রিশে সেপ্টেম্বর। প্রকাশ্য সভায় নেতারা ঠিক করলেন থানা কোর্ট অফিস ডাকঘর—সব ধ্বংস করে সরকারি শাসনকে পঙ্গু করে দিতে হবে। আর প্রতিরোধ নয়, এবার সমবেত আক্রমণ। তোমরা রাজি? হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন নেই, হাজার হাজার লোক সমস্বরে বলে

উঠল : রাজি। এক জাতি, এক দেশ, এক ভগবান।

বিদ্যুৎবাহিনী তৈরী হল দিকে-দিকে—যোগাযোগের পথ-ঘাট সব বিচ্ছিন্ন করে দাও। সুতাহাটা, মহিষদল, নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া, তমলুক। যে ক্ষুদিরাম একদিন বিদায় নিয়ে গিয়েছিল একবার ঘুরে আসবার জন্যে সে আবার ফিরে এসেছে—শত-শত হয়ে ফিরে এসেছে। কথা রেখেছে ক্ষুদিরাম।

এখানে-ওখানে গাছ কেটে ফেলে রাস্তাঘাট বন্ধ হল, ভেঙে দেওয়া হল ত্রিশ-বত্রিশটি কালভার্ট, মাইলের পর মাইল টেলিফোনের তার কাটা, শ দুয়েক টেলিগ্রাফ পোস্ট ওপড়ানো। কাঁসাই ও হুগলি নদী দিয়ে সৈন্য যাতে না আসতে পারে তারই জন্যে নৌকা সব জলের অতলে। পুলিশ ছুটে এল, কিন্তু কোথায় যাবে, কদ্দূর যাবে? রাস্তার উপর থেকে শোয়ানো গাছ না হয় সারানো যায়, কিন্তু জায়গায়-জায়গায় যে বিশাল সব গর্ত খোঁড়া। বেয়নেটের ভয় দেখিয়ে মজুর জোগাড় হলেও মেরামত হবে কতক্ষণে—কত দিনে!

এদিকে দুদিনেই দুটো পুলিশ ফাঁড়ি লোপাট হয়েছে, দুটো সাব-রেজেস্ট্রি অফিস, তেরোটা ডাকঘর, চারটে ডাকবাংলো, ইউনিয়ন বোর্ড আর পঞ্চায়েৎ অফিস মিলে কুড়ি-একুশ। রাজ এস্টেটের তেরোটা কাচারি ভস্মীভূত। চৌকিদারদের বলা হল— তাঁবেদারি ছেড়ে দেশের স্বাধীনতাকে চৌকি দাও। তার আগে ঐ নীল কুর্তা পোশাক ছাড়ো। সাদাসিধা বিপ্লবী হয়ে যাও। সাড়ে তিন শো চৌকিদারের পোশাক কেড়ে নিয়ে বহ্ন্যুৎসব করা হল। পুড়ে যাক দাসত্বের বোঝা, কলঙ্কের ইতিহাস। শুধু চৌকিদারই নয়, কজন সরকারি কর্মচারি ও পুলিশ অফিসারকেও বিপ্লবীরা বন্দী করল। মুচলেকা দিন সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেবেন আর এমুখো হবেন না, নইলে আমাদের তৈরি জেলখানায় পচতে হবে আপনাদের। মুচলেকা দিয়ে কর্মচারীরা ছাড়ান নিয়ে যার-যার দেশের বাড়ির দিকে রওনা হল।

তমলুক শহরকে মিলিটারি রক্ষা করছে, এর থানা যেন না আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু তমলুক তো পুরোনো তাম্রলিপ্ত। সে বোধহয় ইংরেজের সৈন্যদের জানা নেই। চার দিক থেকে চারটে বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছে শহরকে ঘিরে ফেলতে। পশ্চিম দিকের মিছিলে প্রায় আট হাজার বিপ্লবী। তাদের লক্ষ্য থানা— যে করে হোক, থানা দখল করা চাই। পুলিশ উচ্ছৃঙ্খল লাঠিচার্জ করল, তাতে জনপ্লাবন রোধ করা গেল না। সৈন্যদের উপর আদেশ হল : এবার তবে বেপরোয়া গুলি চালাও। গুলিতে মরল পাঁচ জন—পড়ল আরো পাঁচ জন। তার মধ্যে আহত রামচন্দ্র বেরা শুয়ে আছে ঠিক রাস্তার উপর। ওটাকে রাস্তা থেকে সরাও, হুমকে উঠল অফিসর। দুজন সৈন্য রামচন্দ্রের রক্তাপ্লুত ক্ষতাক্ত দেহটাকে রাস্তার উপর দিয়ে হেঁচড়াতে-হেঁচড়াতে টেনে এনে ছুঁড়ে ফেলল থানার সামনে। রামচন্দ্র অজ্ঞান। কটি নিশ্বাস শুধু বাকি আছে। ওর দিকে আর কে তাকায়! কখন রামচন্দ্রের জ্ঞান ফিরে এসেছে তা কে জানে। অতি কষ্টে প্রায় বুকে হেঁটে-হেঁটে থানার এলাকার মধ্যে চলে এল রামচন্দ্র। আর তক্ষুনি উল্লাসে তার কণ্ঠ জয়ধ্বনি করে উঠল : দখল করেছি। থানা দখল করেছি।

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল রামচন্দ্র। ক্ষুদিরামের পর আরেক রাম।

কিন্তু উত্তর দিক থেকে কে ঐ আসছে রণরামা? বাঁ হাতে শঙ্খ, ডান হাতে ত্রিবর্ণ পতাকা। মুখে মন্ত্র, ইংরেজ ভারত ছাড়ো। তফাৎ যাও। ঐ মাতঙ্গিনী হাজরা। তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা—আদরের নাম গান্ধী-বুড়ি। তার নেত্রীত্বেও বিরাট জনতা। সৈন্যদল পথরোধ করে দাঁড়াল। ভয় পেল না গান্ধী-বুড়ি। না বা সেই তেরো বছর বয়সের কিশোর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। লক্ষ্মীনারায়ণ

সৈন্যব্যূহ ঢুকে পড়ল। এক সৈন্যের অতর্কিত হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গেল রাইফেল। সেও বুঝেছে যদি একটা বন্দুক থাকত তার হাতে! তার কিশোর হাতও কুণ্ঠিত হত না। লক্ষ্মীনারায়ণ ধরা পড়ল। তাকে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেল হল।

মাতঙ্গিনী থামল না, তাকাল না পিছন ফিরে। ধ্বনি তুলল : বন্দে মাতরম। ধ্বনি তুলল : ইংরেজ ভারত ছাড়ো। ইংরেজের সৈন্য মাতঙ্গিনীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গুলি লাগল বাঁ হাতে। শঙ্খ পড়ে গেল ধূলোয়। মাতঙ্গিনীর মধ্যে সেই চিরন্তনী বীরাঙ্গনা জেগে উঠেছে। ধূলোয় মলিন শঙ্খের অপমান যে সইবে না, যে নীরব শঙ্খের মধ্য থেকে বিজয়ের ডঙ্কা বাজাবে।

তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে
　　কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে
　　এ কী রে দুর্দৈব!
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে
গান আছে যার ওঠ না গেয়ে
চলবি যারা চল্‌রে ধেয়ে
　　আয়না রে নিঃশঙ্ক।
ধূলায় পড়ে রইল চেয়ে
　　ওই যে অভয় শঙ্খ।

আহত হাতের শঙ্খ আবার তুলে নিল মাতঙ্গিনী। সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বললে, তোমরা চাকরি ছেড়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দাও। ইংরেজ বাঁচাও না, ইংরেজ হটাও।

ভারতীয় সৈন্য হয়েও এরা ভারতের নয়। যদি কোনোক্রমে বন্দুকের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে ইংরেজ আধিপত্য ভেঙে পড়তে আর কতক্ষণ। যা ন্যায্য যা স্বাভাবিক তাই কেন সহজে হয়ে ওঠে না? গুলি এসে লাগল এবার ডান হাতে। তবু মাতঙ্গিনী জাতীয় পতাকাকে বিচ্যুত হতে দিল না। পতাকা উচে তুলে ধরে আবার সে প্রদীপ্ত ধ্বনি তুলল : বন্দে মাতরম। ইংরেজ ভারত ছাড়ো।

জানি জানি তন্দ্রা মম
　　রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ ধারাসম
　　বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
　　সুপ্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
　　তোমার মহাশঙ্খ॥

আবার গুলি এসে মাতঙ্গিনীর কপালে লাগল। মাতঙ্গিনীর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু কী আশ্চর্য, ডান হাতের মুষ্টি শিথিল হয়নি, জাতীয় পতাকা তখনো আকাশে

মাথা উঁচু করে রয়েছে। আমি স্খলিত হই কিন্তু আমার পতাকা অবনমিত হবে না। মাতঙ্গিনীর এই হাতে পতাকা মহাকালের মতই অখণ্ড দণ্ডায়মান। এর পরাভব নেই। এর জয় অবধারিত।

আসামে তেমনি কনকলতা। চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরী কনকলতা। সে চলেছে গোহপুর থানায় জাতীয় পতাকা তুলতে। তার সঙ্গে হাজার মানুষের বাহিনী। মুখে সেই একই নির্ভুলমন্ত্র : ইংরেজ ভারত ছাড়ো।

থানার দারোগা যথারীতি বাধা দিল। দূরে যাও। দূর হয়ে যাও। বীরাঙ্গনা কনকলতা বললে, দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। এখন এ থানা আমাদের।

দারোগা বললে, সাবধান। আর এক পা এগিয়েছ কি গুলি খাবে।

মরতে ভয় থাকলে জাতীয় পতাকা হাতে নিতাম না। দর্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে এল কনকলতা। দারোগা গুলি চালাল। কনকলতা মাটিতে পড়ে গেলেও হাতের পতাকা শ্লথ করল না। মুকুন্দ কাকতি ছুটে গিয়ে সে-পতাকা তুলে নিল। দু পা এগোল থানার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি খেয়ে পড়ল মাটিতে। আবার কে এসে তার থেকে তুলে নিল পতাকা। এক হাত থেকে আরেক হাত। দেখা গেল অন্য পথ দিয়ে ক'জন তরুণ বিপ্লবী ঢুকছে ভিতরে, উঠে পড়েছে থানার ছাদে। উড়িয়ে দিয়েছে জাতীয় পাতাকা। চোখ বোজবার আগে দেখে নিল মুকুন্দ। শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে শুনে গেল কনকলতা।

ইংরেজ তখন শঠতার আশ্রয় নিল। থানার ভিতরে গুণ্ডা পুরে রাখল। শোভাযাত্রীরা থানা আক্রমণ করতে এলেই ওদের উপর হাম্বি হও। লুটতরাজ খুন জখম হরণ-ধর্ষণ যা তোমাদের অভিরুচি চালাও অবাধে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার এই চিরাচরিত সহজ পথটা ছাড়ে কে? ঢেকিয়াজুলি থানার দখল নিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিল ফুলেশ্বরী বারো বছরের কিশোরী। কামরূপে সোরভোগ বিমান বন্দরে ইংরেজ সেনানায়ক কিশোরী রত্নমালার হাত থেকে জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। ধস্তাধস্তিতে পড়ে গেল রত্নমালা। মাঝে ছিল ঠাকুমা ভোগেশ্বরী ফুকননী। সে তার হাতের পতাকার দণ্ড দিয়ে সেনাপতির মাথায় মারল এক ঘা। তৎক্ষণাৎ গুলি খেয়ে পড়ে গেল ফুকননি। এগিয়ে এল লক্ষ্মীরাম হাজারিকা, সঙ্গে তনুরাম আর বলুরাম সুট। বৃদ্ধাকে মেরে খুব বাহাদুরি দেখিয়েছ, পারো তো আমাকে মারো। বুক চিতিয়ে দাঁড়াল লক্ষ্মীরাম। ইংরেজের বর্বর গুলি তাকে রেহাই দিল না। শুধু লক্ষ্মীরাম নয়, তনুরাম আর বলুরামও রাইফেলের শিকার হল। শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে লক্ষ্মীরাম তার জামার পকেট থেকে ছটি পয়সা বের করে সহযাত্রীদের বললে, এই আমার শেষ বিত্ত—আমার প্রাণ আর এই ছটি পয়সা। তাই আমি দিয়ে গেলাম আমার দেশকে।

শিবসাগরে বিপ্লবী কোশল কুঁয়র মৃত্যুবাহিনী গঠন করেছে। তার ডান হাত কুমারী কমলা মিরি। সৈন্য বোঝাই চলন্ত ট্রেনকে তারা উড়িয়ে দিয়েছে। ধরা পড়েছে কুশল। বিচারে কুশলের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। ফাঁসিতে ওঠবার আগে কুশল বললে, 'আমার মত ভাগ্যবান কে? দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিতে পারার মত আনন্দ আর কী আছে? ভগবানের কত করুণা আমি এই মৃত্যুর জন্যে নির্বাচিত হয়েছি।'

কমলা মিরির আটমাস সশ্রম জেল হল। পুলিশি পীড়নে জেলের মধ্যে তার ঘোরতর অসুখ করে গেল। আন্দোলন করবে না, শান্ত হয়ে থাকবে—এই মর্মে বণ্ড দাও, এক্ষুনি তোমাকে খালাস করে দিচ্ছি। ঘৃণায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল কমলা। তিল-তিল করে দগ্ধে-দগ্ধে

প্রাণ দিল। তবু তার পার্বত্য প্রতিজ্ঞা থেকে সে ভ্রষ্ট হল না।

ইংরেজের বর্বরতা ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে দিয়েই প্রকটিত হচ্ছে। যে যত বেশি কটু ইংরেজের চোখে সে তত বেশি পটু। ভারতীয় সেনা ইংরেজের হয়ে লড়ছে। যাতে ইংরেজের মান-মর্যাদা অটুট থাকে। ভারতীয় পুলিশ ইংরেজকে পাহারা দিচ্ছে। যাতে ইংরেজ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। আর ইংরেজ ভারতকে এত দরিদ্র করে রাখছে যাতে সহজেই নামমাত্র মাইনেয় পেতে পারে এন্তার পুলিশ আর সৈন্য। আর ভারতীয় অফিসর ? কৃতী ও কর্মী—তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে যাতে ইংরেজের আরো বাড়-বাড়ন্ত হয়, যাতে তার শাসনের শেকড় আরো গভীরে যায়। ইংরেজকে প্রমুদিত করতে পারলেই ওদের প্রমোশন। ওদের পদক-পদবী। কী চতুরতা ইংরেজের! শুধু পরের ধনে পোদ্দারিই করছে না, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙছে। তার চেয়েও বেশি—পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করছে।

সেনানায়ক অপূর্ব ঘোষ হুঙ্কার ছাড়ল : যারা গুলি খেয়ে মরতে রাজি তারাই যেন এগিয়ে আসে।

অপূর্ব ভেবেছিল তার হুঙ্কারে জনতা বুঝি ভয় পাবে, পিছিয়ে যাবে। মিদিনীপুরের মেদিনী অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি, তৈরি বজ্রদৃঢ় মনোবল দিয়ে। প্রতিক্রিয়া যে এমন অপূর্ব হবে তা অপূর্বেরও অভাবনীয় ছিল। সকলে গুলি খেতে বুক পেতে দিল। করঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। এক পা পিছু হটল না। ভয় পেল সেনানায়ক। বন্দুক সরিয়ে রেখে লাঠির শরণাপন্ন হল।

কিন্তু গুলি চলল মহিষাদলে, বৃন্দাপুরে, বেলকনিতে। সর্বত্রই থানা আক্রমণ। থানা অভিযান। গুলিতে বহুবীর বিপ্লবী প্রাণ দিলেন। নামের পর নাম, রক্তের অক্ষরে স্বাধীনতার আকাশে জ্বলতে লাগল নক্ষত্রের মত। সর্বত্রই মৃত্যুঞ্জয় জনতার জয়। মরব আমরা ঠিক কিন্তু ইংরেজকে উৎখাত না করে মরব না। সুতাহাটা থানার দারোগাকে বেঁধে ফেলল জনতা। ছ-ছটা রাইফেল ছিনিয়ে নিল। দারোগার সাঙ্গোপাঙ্গরা উধাও। থানা তখন জনতার দখলে। এবার তবে সুরু হোক লঙ্কাদহন। থানা, খাসমহল, সাবরেজিস্ট্রি, ইউনিয়ন বোর্ড পুড়তে লাগল একে-একে। দিকে-দিকে সর্বভুকের রসনা।

নন্দীগ্রামে পুড়ল গাঁজা-আফিঙের দোকান, ঋণ-নালিশী বোর্ড, খাসমহল আর পোষ্ট অফিস। কেশপুরে শহিদ হলেন শশীবালা। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল কাঁথিতে, গড়বেতায়, খড়্গপুরে। আগুন জ্বলল পটাশপুরে, ভগবানপুরে, খেজুরিতে। কুইট ইণ্ডিয়া। অনধিকারী, বিতাড়িত হও।

এর মত জোরালো ধ্বনি আর কী আছে! এ জোর সত্যের জোর। কে হে তুমি অনাহূত, আঙুল থেকে ক্রমে ক্রমে ফাল হয়েছ এখনো বেরুতে চাইছ না। কাকুতি-মিনতিতে যাবে না, সে সব নিষ্ফল চেষ্টা। আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়, এবার সক্রিয় বিতাড়ন। আর মনোরঞ্জন নয়, এবার রক্তরঞ্জন।

হাজারে হাজারে শহিদ দিল মেদিনীপুর। 'তুমি আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব।'

ইংরেজ প্রতিশোধের নেশায় ক্ষেপে উঠল। হাজারে-হাজারে সৈন্য নামাল। গোরা আর পাঠান। শুরু হল ব্যাপক লুটতরাজ, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ, কথায় অকথায় গুলি, যত্র-তত্র অত্যাচার।

তারপর ষোলই অক্টোবর ঝড় এল রাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রোচ্ছ্বাস। উন্মাদ ঝড়, দুর্বার বন্যা। প্রকৃতিও নির্লজ্জের মত আঘাত করল মেদিনীপুরকে। ইংরেজ ধর্ম দেখল! মেদিনীপুর

ভাসছে ডুবছে এ যেন তার গোপন পরিতৃপ্তি। উচ্ছৃঙ্খল এবার অনুগত হবে।

শাসক হলেও তো সে মানুষ। কিন্তু এমন নৃশংসতা কল্পনা করা যায় না। ঝড়ের আগেই আবহাওয়া বিভাগ থেকে হুঁশিয়ারি এসেছিল—প্রচণ্ড ঝড় আসছে, অধিবাসীদের সতর্ক করে দিন, সমুদ্রের কাছাকাছি যারা আছে তাদের সরিয়ে দিন নিরাপদে। দুর্গতির থেকে দূরে রাখুন। শাসনকর্তা ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসলেন মাত্র। হুঁশিয়ারিটা ফাইলে চাপা দিলেন—এক বর্ণও বাইরে প্রচার হল না—একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত না। ঝড় আসছে তো আসুক, প্রবল বিক্রমে আসুক—এলেই টের পাবে। সমুদ্র জাগছে তো জাগুক, আসুক উত্তাল হয়ে, জলেই সব ধুয়ে যাবে। আর উপায় নেই, বাছাধনরা এবার জব্দ হবেন।

নিমেষে গৃহহীন হয়ে অগণিত মানুষ অসহায়তার সমুদ্রে এসে পড়ল। কোথায় কূল, কোথায় আশ্রয়, কোন শূন্যে কাকে মানুষ জিজ্ঞেস করে—শাসকের দল বিরূপ বধির উদাসীন হয়ে রইলেন। কিন্তু বাছাধনরা জব্দ হলেও বিপ্লবী কখনো নিরস্ত হয় না। উচ্ছৃঙ্খল অনুগত হতে পারে কিন্তু বিপ্লবী বশ্যতা মানে না। প্রাপ্য আদায়ের আগে তার মৃত্যু নেই। আর ধর্ম কী করে দেখতে হয় তা ধর্মই ভালো জানে।

মেদিনীপুরের মাটিতেই প্রথম স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। লাল তারিখটা সতেরোই ডিসেম্বর, উনিশ শো বিয়াল্লিশ। স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকারে কোন বিভাগটা না ছিল ? স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থ, কারা, ডাক, বিচার—সমস্ত। পুলিশ, গুপ্তচর, কারাবিভাগ এমন কি নিজস্ব সেনাবাহিনী। সব মিলে একটা পূর্ণাঙ্গীণ স্বাধীন রাজ্যের রূপায়ণ।

অথচ দু মাস আগে ষোলই অক্টোবর মেদিনীপুরের উপর দিয়ে বয়ে গেল বিধ্বংসী ঝটিকা। সঙ্গে বিপুল জলোচ্ছ্বাস। কত লোক যে উড়ে গেল ভেসে গেল কে তার হিসেব করে! আর ইংরেজ সরকার এমন অমানুষ, প্রাণপণ চেষ্টা করল মেদিনীপুরের এ বিপদের কথা যেন বাইরে না রাষ্ট্র হয়। রাষ্ট্র না হলেই মেদিনীপুরে সাহায্য আসতে পারবে না, সাহায্য এসে না পৌঁছুলেই মেদিনীপুরের চরম শিক্ষা হবে, সে আর মাথা তুলতে পারবে না, তলিয়ে যাবে নিঃশেষে। ঝড়ে-জলে ইংরেজ যেন ধর্ম দেখল—যাক, বুঝুক এবার মেদিনীপুর, ইংরেজের বিরুদ্ধে উদ্ধত হলে কী হয় পরিণাম! কিন্তু শত বিপর্যয়েও মেদিনীপুর দমবার নয়। দেরি নেই, মেদিনীপুরও ধর্ম দেখবে। শুধু মেদিনীপুর নয়, বাংলা দেশ নয়, সমস্ত ভারতবর্ষই ধর্ম দেখবে, পরের দেশ লুণ্ঠন করে শোষণ করে সর্বস্বান্ত করলে কী পরিণম হয়! কেমন সে পথের ভিক্ষুক সাজে। সবুর করো, ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই। লাল মানচিত্র শাদা হয়ে যাবে।

বলা নেই কওয়া নেই, উনিশ শো বিয়াল্লিশের বিশে ডিসেম্বর মধ্যরাতে জাপানি বিমান কলকাতার উপর হানা দিল। বোমা ফেলল গোটাকতক। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য কী ? জাপান কি ইংরেজদের হটিয়ে ভারতবর্ষ দখল করতে চায় ? ইংরেজদের যে ভারতবর্ষ থেকে হটাতে চায় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতবর্ষকে সে কবজা করে তার সাধ্য কী। ভারতবর্ষ ইংরেজকে পরাস্ত করছে জাপানীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হবে বলে নয়। যদি দরকার হয় সে আবার লড়বে জাপানের বিরুদ্ধে। জাপানের সাহায্য যেটুকু সে নিচ্ছে সে শুধু এশিয়াবাসীদের স্বপ্নকেই সার্থক করবার জন্যে। এশিয়া ফর দ্য এশিয়ানস—এশিয়াবাসীদের জন্যেই এশিয়া। তার চেয়েও বড় কথা, তার চেয়েও মহত্তর স্বপ্ন—ইণ্ডিয়া ফর দ্য ইণ্ডিয়ানস—ভারতবর্ষ ভারতবাসীদের জন্যে। এই বাণীর উদ্গাতা, এই মন্ত্রের প্রণেতা নেতাজী। পুরুষপ্রবীর সুভাষচন্দ্র।

তোজোর কাছে রাসবিহারীর তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ: জার্মানি থেকে সুভাষকে নিরাপদে নিয়ে এস জাপানে। তারপরে আমাদের সম্মিলিত আক্রমণে দেখি ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসানের আর দেরি কত!

পাঁচ

আর কেউ নয়, স্বয়ং মোহন সিং রাসবিহারী অবাধ্যতা করল। যে তাকে সামান্য ক্যাপটেন থেকে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের জেনারেল করে দিয়েছিল তারই বিরুদ্ধে মোহন সিং-এর বিদ্রোহ। আর কিছু নয়, শুধু কর্তৃত্বের তাপ। আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা। কুয়েলালামপুর থেকে ক'দল সৈন্যকে বর্মায় পাঠিয়ে দিল মোহন সিং। পাঠিয়ে দিল জাপানী সেনাপতি ইয়াকুরোর পরামর্শে। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের খোদ সমর পরিষদকে না জানিয়ে।

'এটা আপনি কী করলেন?' স্থানীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্বরাজ ইনষ্টিটিউটের কর্তা রাঘবন—যে প্রতিষ্ঠানের মূল কথা হল দেশপ্রীতি—মোহন সিং-এর কাছে আপত্তি জানাল 'এ সৈন্যরা তো গেল জাপানীদের হয়ে লড়াই করতে। আজাদ-হিন্দ-ফৌজ কি জাপানের তাঁবেদারি করবার জন্যে তৈরি হয়েছে?'

না, তা হয়নি, আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি হয়েছে ইংরেজকে বিতাড়িত করবার জন্যে ভারতীয় বিপ্লবকে সাহায্য করতে। কিন্তু বাহির থেকে সক্রিয় সাহায্য করতে গেলে জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ না করলে চলবে কেন? এই বুঝি মিলে-মিশে কাজ করবার নমুনা? ভারতীয় সৈন্যদের আর কোনো পৃথক সত্তা থাকছে না। তাদেরকে জাপানী অফিসারের অধীনে জাপানী দলের সামিল করে নেওয়া হচ্ছে। তাদের লাগানো হচ্ছে গুপ্তচরের কাজে।

'যাই হোক, সমর-পরিষদের অনুমতি ছাড়া আপনার এ পদক্ষেপ ঠিক হয়নি।' বললে রাঘবন।

মোহন সিং তার ভুল বুঝতে পারল, কিন্তু কিছু দেরিতে। সমর-পরিষদের কাছে ক্ষমা চাইল, প্রতিশ্রুতি দিল সমর-পরিষদের অনুমতি ছাড়া সৈন্যচালনা করবে না। কিন্তু সৈন্যের পরিচালক কে? মোহন সিং, না, রাসবিহারী?

জাপানীদের রাগ গিয়ে পড়ল রাঘবনের উপর। তার স্বরাজ-ইনস্টিটিউটে হানা দিয়ে বাছাই-করা কজন তরুণকে ধরে নিয়ে গেল। কার হুকুমে কোথায় নিয়ে গেল—রাঘবন চেষ্টা করেও কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। এ কী দুষ্কাণ্ড!

একজন সাধারণ অসামরিক ভদ্রলোক—রাঘবন সইল না এ অত্যাচার। গর্জন করে উঠল: আমাদের এ প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের স্বদেশপ্রেমী স্বদেশব্রতী করবার জন্যে, জাপানীদের গুপ্তচর হবার জন্যে নয়। আমাদের সবার আগে ভারতবর্ষ, সবার আগে স্বাধীনতা।

জাপানীদের তবু টনক নড়ল না। প্রতিবাদে রাঘবন স্বরাজ ইনস্টিটিউট তুলে দিল। জাপানীরা খেপে গেল রাঘবনের উপর। তারা তাকে তার বাড়িতে পেনাংএ অন্তরীণ করে রাখল। এখন কী করণীয়! সব যেন কেমন তাল পাকিয়ে যাচ্ছে! জাপানীরা ভারতীয়দের বিশ্বাস করতে পারছে না আর ভারতীয়রাও চাইছে না জাপানীরা তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার করুক। অথচ ভারতীয়দের একমাত্র অভীষ্ট ব্রিটিশ-উচ্ছেদ। সে উচ্ছেদে অস্ত্র জোগাবে কে? নিশ্চয়ই জাপানীরা। তাই বলে অস্ত্র কিনতে গিয়ে জাপানীদের কাছে মাথা বিকোতে হবে সে অসম্ভব।

উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে 'আজাদ হিন্দ'। মেজর জেনারেল শা নওয়াজখান ঠিক

বলেছেন : 'জাপনীদের সঙ্গে নিয়ে যদি আমরা ভারতবর্ষে গিয়ে উঠি, তাহলে দেশবাসীরা আমাদের অভ্যর্থনা করে নেবে না, মুখে থুতু দেবে।'

সব চেয়ে ভালো হত যদি সরকারী ভাবে জাপানীরা আশ্বাস দিত যে আজাদ হিন্দ-ফৌজ ও ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের ব্যাপারে জাপানীরা লেশমাত্র হস্তক্ষেপ করবে না, আর ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের জেনারেল মোহন সিং এর নেতৃত্বাধীনে রাখতে হবে। ব্যাঙ্কক বৈঠকে এসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কিন্তু এখনো জাপানী সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছে না। অ-হস্তক্ষেপের আশ্বাস তো নেইই, বরং ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের জাপানীরা তাদের নিজের আয়ত্তেই রাখতে চাইছে।

মোহন সিংএর ধৈর্যচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক। ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে থাকার চাইতে নিজের পায়ের নিচে মাটি খুঁজে নেওয়াই ভালো। সে কিছু ভারতীয় সৈন্য ও অফিসার পাঠাল ব্রহ্মসীমান্তে। উদ্দেশ্য তারা গোপনে ভারতবর্ষে ঢুকবে ও ভারতীয় নেতাদের থেকে জেনে নেবে সত্যিকার কী পরিস্থিতি! বেতার যন্ত্র নিয়ে যাবে, ওখানে থেকে খবর পাঠাবে নিয়মিত। কিন্তু বিধি বাদ সাধল। ভারতীয় সৈন্যদের যিনি দলপতি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। সীমান্তে পৌঁছে শত্রুপক্ষ ব্রিটিশের খাতায় চুপিচুপি নাম লেখালেন ও স্বদলের সকলকে ধরিয়ে দিলেন।

সর্বত্যাগী বীরের পাশেই দেখা যায় বিশ্বাসহন্তাকে। মহাবীরের পাশে পাশেই বিভীষণ ঘোরে ফেরে।

আরো অনেকের সঙ্গে ধরা পড়ল ত্রিবাঙ্কুরের আবদুল কাদির, পাঞ্জাবের ফৌজা সিং আর বাংলার সত্যেন বর্ধন। এরা মালয় থেকে এসেছে সাবমেরিনে করে, পরে তীরে উঠছে রবারের নৌকোয়। এরা ভারতের উপকূলে থেকে বেতারে সংবাদ পাঠাবে। চট্টগ্রাম, কাথিওয়াড়। বিভীষণের দেওয়া সূত্র ধরে ভারতীয় পুলিশ এদেরকে ধরে ফেলল। 'ওয়ার এমার্জেন্সি অর্ডিন্যান্স' অনুযায়ী তাদের বিচার হল। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে—শাস্তি সামান্য কারাবাস হতে পারে না। শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মাদ্রাজ জেলে এদের ফাঁসি হল। ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে সত্যেন চেঁচিয়ে উঠল : বন্দে মাতরম। ফৌজা সিং চেঁচিয়ে উঠল : জয় ভারত! আর আবদুল কাদিরের হুঙ্কার। জয় সুভাষবাবু কী জয়!

সুভাষ কবে আসবে ? কেমন করে আসবে ?

সত্যেনের ডাক নাম কানু। মৃত্যুর আগে সে তার ভাইকে চিঠি লিখল : 'মাতৃভূমির বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করতে পেরে আমি আনন্দিত, আমি গৌরবান্বিত। এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কী আছে ? একটা কথা শুধু বলে যাই, যদি বা যখনই হাতের কাছে সুযোগ পাও, শত্রুপক্ষের উপর প্রতিশোধ নিও। স্বদেশের জন্যে প্রাণবিসর্জনে বাঙালী আবার কবে পরাঙ্মুখ ?' ইতি তোমার কানু।

বর্মায় মোহন সিং যে সৈন্যদল পাঠিয়েছিল তাদের সঙ্গে ছিল কর্ণেল গিল আর মেজর ধীলন। গিল ফিরে এল, বা পালিয়ে এল, ধীলন থেকে গেল বৃটিশের আশ্রয়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সভাভূষণ হয়ে। মোহন সিংএর মুখ কালো হয়ে গেল। কত বড় দেশপ্রাণ বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল ধীলন। তার এই বেচাকেনা, এই মতিগতি।

গিল বললে, এ ভাবে আর চলবে না। ব্যাঙ্কক বৈঠকের প্রস্তাব পাকা না হওয়া পর্যন্ত বর্মায় সৈন্য পাঠানো বন্ধ করে দিন। সরকারী অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত আজাদ-হিন্দ-ফৌজই তো বে-আইনি। কেন তবে আর বুনো হাঁসের পিছু নেওয়া ? ছেড়ে দিন এই অরণ্যযাত্রা।

মোহন সিং অস্থির হয়ে উঠল। কর্নেল ইয়াকুরোকে চিঠি লিখল: আপনাদের আসল বক্তব্যটা কী? এগোবও না পেছোবও না—আমরা কতদিন বসে থাকব?

রাসবিহারী এগিয়ে এলেন। বললেন, ধৈর্য ধরো। কূটনীতি বুঝতে চেষ্টা করো।

কূটনীতি!

জাপান তার নিজের স্বার্থেই আমাদের পক্ষ নেবে, তার লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদের উৎসাদন। আমরাও নিজের স্বার্থে জাপানের সাহায্য নেব, আমাদের লক্ষ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। সুতরাং ধৈর্য ধরো, আমি প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সরাসরি কথা বলছি। সে সব মৌখিক কথা তো আগেই হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে জাপানের রাজ্যস্থাপনের ইচ্ছে যে নেই তা আমরা মানি, বর্মার পতনের পর অনায়াসে ঢুকতে পারত ভারতে, তার থেকে ওরা নিবৃত্ত রয়েছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থেকে আমাদের ওরা নিবৃত্ত করে কেন? কেন আমাদের স্বাধীন বুদ্ধিতে ওরা আমাদের সৈন্য চালনা করতে দেয় না? কেন ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের কর্তৃত্ব ওরা নিজের হাতে রাখতে চায়? বেশ এক মাস সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে যদি জাপান আমাদের দাবি পূরণ না করে আমরা আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ভেঙে দেব।

এ যেন একটা চরম পত্রের মত শোনাচ্ছে। এর দ্বারা দ্রুত যা আসবে তা সিদ্ধি নয় তা অসিদ্ধি। যে কেউ আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ছেড়ে দিতে পারো কিন্তু আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ভেঙে দেবার অধিকার কারু নেই, না, শত মোহন সিংএরও নয়।

আটুই ডিসেম্বর জাপনীরা কর্নেল গিলকে গ্রেপ্তার করল। অপরাধ? সে ব্রিটিশের গুপ্তচর আর তারই পরামর্শে ধীলন শত্রুদল না হয়ে শত্রুভূষণ হয়েছে। যে সব ভারতীয় সৈনিক বা স্বেচ্ছাসেবক গিয়েছিল সংবাদ জোগাতে, তাদের ধরিয়ে দেবার মূলেও এই কর্নেল। জাপানীদের এই সন্দেহ হবার কারণ কিছুদিন আগে বৃটিশের এক প্যারসুট বাহিনী তাদের হাতে ধরা পড়ে। বাহিনীর অফিসাররা স্বীকার করে তাদের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি: গিল আর ধীলনের সঙ্গে সংযোগস্থাপন, আজাদ-হিন্দ-ফৌজ আর জাপানী সৈন্যদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টি আর জাপানী সৈন্যদের গতিবিধির তথ্য সংগ্রহ। তবে আর কথা কী! গিলকে যখন পাওয়া গিয়েছে তখন তাকে গ্রেপ্তার করো।

আর তর সইল না। মোহন সিং পদত্যাগ করে বসল। সংগ্রাম-পরিষদের অন্যান্য সভ্যরাও মোহন সিং এর পদাঙ্ক অনুসরণ করল। জাপানীদের দাবার ছকে আমরা আর ঘুঁটি হতে চাইনে। ওদের সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেবার সময় এসেছে। আর সেই বিচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে আমাদের উচিত হল আজাদ-হিন্দ ছেড়ে দেওয়া, আজাদ-হিন্দ ভেঙে ফেলা।

কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা চাই না? টোকিয়ো থেকে রাসবিহারী আর্তনাদ করে উঠলেন।

মোহন সিংএর দল রাসবিহারীর কথায় কান পাতল না। উলটে রাসবিহারীকে বললে, জাপনীদের কাষ্ঠপুত্তলিকা।

রাসবিহারী গর্জন করে উঠলেন: আমি কাঠের পুতুল নই, আমি রক্ত-মাংসের মানুষ, আমি মুক্তিপিপাসু ভারতের সন্তান। আমার দেশের স্বাধীনতাই আমার ধ্যান-জ্ঞান-আরাধনা। এই ব্রতসাধনেই আমি নির্নিমেষ। বার্ধক্য বা অস্বাস্থ্য, নির্বাসন বা নির্যাতন, কিছুতেই আমার ব্রতভঙ্গ করতে পারেনি, পারবে না। ইতিহাস যে সুযোগ রচনা করে দিয়েছে তা আমাদের হঠকারিতায় নষ্ট করলে চলবে না। সমরাঙ্গনেও ধৈর্যের প্রয়োজন আছে। আমরা আকাঙ্ক্ষনীয়

আর কী? আমার দেশ স্বাধীন হবে আর আমি তার গভীর নির্জনে একা-একা কোথাও চলে যাব।

মোহন সিংকে সরকারি চিঠি দিলেন রাসবিহারী: সিঙ্গাপুরে আমার বাড়িতে কয়েকজন সিনিয়র অফিসার পাঠিয়ে দিন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টা বিশদ করি।

সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি রাসবিহারী। মোহন সিং আইনত তাঁর আজ্ঞাধীন। কিন্তু মোহন সিং এমন একটা উত্তর দিল যেন সে-ই নাটের গুরু, সর্বেসর্বা।

'কোনো অফিসরই আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক নয় আর যদি কেউ দেখা করতে চায়ও আমি তাকে যেতে দেব না।' রূঢ়তারও সীমা ছাড়িয়ে গেল মোহন সিং: 'আপনি যুদ্ধের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—নির্বোধ।'

রাসবিহারী মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিলেন। রাসবিহারী আদেশ তামিল করতে রওনা হলেন ইয়াকুরো। জেনারেল ইয়াকুরো। এক জেনারেলকে গ্রেপ্তার করতে আরেক জেনারেল।

আপনি বন্দী। ইয়াকুরো রাসবিহারীর পরোয়ানা দেখাল।

মোহন সিং বুঝি বিপদ শুঁকতে পেরেছিল। কম্যাণ্ডারদের বলে রেখেছিল তার গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন তারা আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ভেঙে দেয়, বরবাদ করে দেয়। সমস্ত দলিলপত্র পুড়িয়ে ফেলে। হলও তাই। বন্দী করে মোহন সিংকে নিয়ে যাওয়া হল সিঙ্গাপুরের কাছে, 'সেন্ট জন' দ্বীপে আর এদিকে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বিভিন্ন দলের সৈন্য-সেনাপতিরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করল মুখ ফিরিয়ে নিল। গা থেকে খুলে ফেলল ইউনিফর্ম, পুড়িয়ে ফেলল ব্যাজ ও অন্যান্য নিদর্শন-চিহ্ন। রব তুলল আমাদের আবার যুদ্ধবন্দী করে দাও।

জাপানীরা বললে, যুদ্ধবন্দীদের যখন একবার মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে তখন আর তাদের যুদ্ধবন্দী বলে গণ্য করা যায় না।

তবে, আমরা যদি মুক্ত, দলত্যাগী সৈন্যরা বললে, আমরা স্বেচ্ছায় মার্চ করে ভারতবর্ষে চলে যাব নয়তো মালয় বা শ্যাম বা বার্মায় গিয়ে অসামরিক জীবনযাপন করব। আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও।

না। জাপানীরা বললে, তোমাদের শিবির ছেড়ে চলে যেতে দেওয়া হবে না।

সব চেয়ে বড় কথা বললেন রাসবিহারী। আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর নেতৃপদ পরিত্যাগ করবার অধিকার মোহন সিংএর নিশ্চয়ই আছে, সব সময়েই আছে, কিন্তু আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ভেঙে দেবার তাঁর বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। এ ফৌজ তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানা নয়। এ ভারতের ফৌজ। এ ফৌজের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে মোহন সিং ঘোরতর দেশদ্রোহী হয়েছেন। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এ ফৌজের মৃত্যু নেই।

ইতিহাস ভারতবর্ষের জন্যে আবার একটা সঙ্কটময় মুহূর্ত তৈরি করল। দিব্যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে স্বাধীনতার অধ্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কেমন বানচাল হয়ে গেল। শুধু একটা ভুল-বোঝাবুঝি, শুধু বা একটা ন্যায়ানুগত্যের প্রশ্ন—কে চলবে আর কে চালাবে। ফলে জয়যাত্রা এক বছর পিছিয়ে পড়ল।

এখন সব চেয়ে বড় কথা হল ভাঙা ফৌজ আবার গড়ে তুলতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে রাসবিহারী একটা নতুন কমিটি গঠন করলেন। তাতে থাকলেন লেফটেনেন্ট কর্ণেল লোকনাথন, ভোঁসলে, কিয়ানি, ইশান কাদির, শা নওয়াজ। তাদের কাজ হবে ফৌজের শিবির পরিচালনা

করা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। সৈন্যদের আশ্বাস দেওয়া, যারা ছেড়ে যেতে চায় যাবে, তাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না, আর জাপানীরা যদি স্বার্থসিদ্ধির কাজে তাদেরকে ব্যবহার করতে চায় তারা সদর্পে প্রতিরোধ করতে পারবে।

'কিন্তু সভাপতি যদি তার কর্তব্য পালনে অসমর্থ হয়?' কে এক সাহসী সৈন্য সরাসরি প্রশ্ন করল।

সভাপতি রাসবিহারী এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন না, নির্ভীক কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তাকে তোমরা তখন গুলি করে মেরে ফেলবে।'

এই তো প্রকৃত যোদ্ধার কণ্ঠস্বর। দৃপ্তি আর দীপ্তি দিয়ে ভরা।

সবাই রব তুলল আমরা সুভাষচন্দ্রকে চাই। একমাত্র সুভাষই পারে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের নেতৃত্ব করতে।

'সুভাষকে তো আমিও চাই। সেই তো মহত্তম নেতা।' বললেন রাসবিহারী, 'কিন্তু জার্মানি থেকে সুভাষ আসবে কী করে?'

জাপানীদের সক্রিয় অনুরোধ করা হোক তারা বন্ধু-দেশ জার্মানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সুভাষকে আমাদের মধ্যে এনে দিক।

জেনারেল ইয়াকুরো আশ্বাস দিলেন 'চন্দ্র বোস'কে জার্মানি থেকে সিঙ্গাপুরে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

তাহলে আর কথা নেই। আজাদ-হিন্দের সভ্যরা উল্লসিত হয়ে উঠল। তাহলে ভাঙা ফৌজ আবার আস্ত হয়ে উঠবে, শুধু তাই নয়, উত্তাল হয়ে উঠবে। কত নতুন লোক, সৈন্য ও অসৈন্য, দলে দলে যোগ দেবে। যারা চলে গিয়েছিল তারা তো ফিরবেই, যারা আছে তারাও আর ফিরে যাবার কথা ভাববে না। কিন্তু তখন আবার দুই বসুতে কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই লাগবে না?

সেই মর্মে জাপানী জেনারেল আরিসু সরাসরি প্রশ্ন করল রাসবিহারীকে: 'তখন কে নেতা হবে?

'সুভাষ।' একবাক্যে সম্মত হলেন রাসবিহারী? 'আমি তার আজ্ঞাধীন হব, হব বশংবদ।'

জাপানী জেনারেল উপলব্ধি করলেন রাসবিহারী কত মহৎচরিত্র, কত বড় দেশপ্রেমিক। মানুষ বড় নয়, আদর্শ বড়। নেতৃত্ব বড় নয়, বড় দেশপ্রেম। কিন্তু যাই বলো সুভাষ কী করে আসে? কী করে মারণাস্ত্রসঙ্কুল মহাসমুদ্র অতিক্রম করে?

জার্মান সরকারের কাছে আবার আবেদন করল সুভাষ: সাবমেরিনে হোক বিমানে হোক জাহাজে হোক দূর প্রাচ্যে আমার যাবার ব্যবস্থা করা এখনো সম্ভব। আমি জানি এ কাজে জীবন সংশয় বিপদ আছে, কিন্তু বিপদকে আমি গ্রাহ্য করি না, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আমি তার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। আমি ভাগ্যে বিশ্বাসী। আর এও আমার বিশ্বাস আমার ভাগ্য আমাকে জয়ী করবে।

লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় যাই হোক, আপনারা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। যত দ্রুত যেতে পারব তত শীঘ্র ভারতের সুদিন।

জার্মান সরকার বললে, জাপান সরকারের নিমন্ত্রণ কই?

জাপানের রাষ্ট্রদূত ওসিমাকে ধরল সুভাষ। আর দেরি তো সহ্য হয় না।

টেলিফোনে রাসবিহারীর সঙ্গে সংযোগ হয়েছে সুভাষের। টোকিও-বার্লিনে। ওদিক থেকে উত্তপ্ত আহ্বান, এসো; এপার থেকে প্রতিধ্বনি, আমি প্রস্তুত, উন্মুখ—উদ্যত। কিন্তু সরকারি নিমন্ত্রণ কই?

ওসিমার দৌত্যে সরকারি নিমন্ত্রণ এসে পৌঁছুল সুভাষের কাছে। হিটলার আর আপত্তি করতে পারল না। কিন্তু সব চেয়ে দুরূহ প্রশ্ন—যায় কিসে? পারলে তো উড়ে যায় সুভাষ কিন্তু পাখা কই? প্রথমে ঠিক হল ইটালিয়ান বিমানে রোম থেকে সিঙ্গাপুর এক উড়ালে পাড়ি দেবে। যাকে বলে নন-স্টপ ফ্লাইট। কিন্তু বিচার-বিবেচনা করে দেখা গেল সেটা সম্ভব-সাধ্য নয়। সুভাষ বললে, সাধারণ জাহাজে চড়েই চলে যাই। জার্মান সরকার বা হিটলার তাতে রাজি নয়। জাহাজে যাওয়া অর্থ ঘোরতর বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। জাপান সরকারের নিমন্ত্রিত অতিথিকে অমন মুক্ত বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না। সুভাষের সাহস থাকে থাক, হিটলারের সাহস নেই।

সাবমেরিন! ডুবো জাহাজ। ইউরেকা। ঠিক হল সুভাষ সাবমেরিনে যাবে। যাওয়া নিয়ে কথা। সুভাষ যেন হাতে সূর্য পেল। কিন্তু কতদূর যাবে? ঠিক হল মাঝপথে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় জাপানী সাবমেরিন এসে তাকে তুলে নেবে। শেষ হবে জার্মানির দায়িত্ব। শুরু হবে জাপানীর এলেকা।

দুদিক থেকে দু সাবমেরিন সময় মত এসে মিলবে—মধ্য সমুদ্রে—তারপর জলৌকা যেমন এক তৃণখণ্ড ছেড়ে আরেক তৃণখণ্ডে ওঠে—তেমনি এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে—এক জীবন থেকে আরেক জীবনে উত্তীর্ণ হবে সুভাষ। টোকিওর জার্মান রাষ্ট্রদূত খবর পাঠাল জাপানী সাবমেরিন আপত্তি করছে। বলছে, সামরিক লোক ছাড়া অন্য কাউকে জাপানী যুদ্ধজাহাজে নিয়ে যাবার আইন নেই। বলে কী! সুভাষ বোস কি অন্য কেউ? পাল্টা খবর গেল জাপানে: সুভাষ বোস ভারতীয় মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

কাগজে-কলমে সব নিষ্পন্ন কিন্তু জাপানী সাবমেরিন আর আসে না। জার্মান সাবমেরিন তৈরি হয়ে আছে, প্রতীক্ষা করে-করে জাহাজের কাপ্তেন অস্থির হয়ে উঠেছে—কতদিন এমনি থাকতে হবে নিষ্ক্রিয় হয়ে। ভগ্ন মনে সুভাষ দিন কাটাচ্ছে। তার সঙ্কল্প কি সিদ্ধ হবে না? তার ঐকান্তিকতা কি ব্যর্থ হবে? তার যোগ আনবে না বিভূতি? এ কখনো হয়? হতে পারে? শেষ পর্যন্ত খবর এসে গেল—জাপান পাঠাচ্ছে সাবমেরিন।

জাপানি দূতাবাসের কাউনসিলর কাওয়াহারা সুভাষকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছে। সুভাষের সঙ্গে আছে তার ঘনিষ্ঠ দুই সঙ্গী—ওয়ার্থ আর নাম্বিয়ার। সবাই খাচ্ছে কিন্তু সুভাষের রুচি নেই, খাবার নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করছে। এর চেয়ে ভালো খাদ্য ছিল যদি জাপানী সাবমেরিনের খবর আসত। কী আর কথা কইবে সে? সব চেয়ে ভালো কথা ছিল যদি জানা যেত জাপানী সাবমেরিন আসছে, শিগ্‌গিরই আসছে।

'আমি না বলে পারছি না', কাওয়াহারা বললে নিচু গলায়, 'যদিও এটা লাঞ্চ-টেবিলে বলার মত কথা নয়। এ খবর—'

'কী খবর?' সুভাষ অস্থির হয়ে উঠল।

'আপনার এই অস্থির অবস্থা দেখেই আগেভাগে বলতে হচ্ছে আমাকে,' কাওয়াহারা বললে উৎফুল্ল হয়ে: 'বাঞ্ছিত খবর এসে গেছে। জাপানী সাবমেরিন তৈরি হয়েছে আপনার জন্যে। যথাকালে আমাদের মিশন সরকারি ভাবে জানাবে আপনাকে—আপনার মিশনকে।'

আর দেরি নেই। যোগযুক্ত পুরুষ—সুভাষ আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠল।

এর কদিন পরেই তেইশে জানুয়ারী, ১৯৪৩—সুভাষের জন্মদিন। জন্মদিনের উৎসব তার গৃহে, পত্নী এমিলি আর কন্যা অনীতার সাহচর্যে—হয়তো সন্নিহিত ছিলেন আরো কজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে উৎসব অনাড়ম্বর, হয়তো বা কিছুটা বিষাদগম্ভীর। তার তিন দিন পরেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব-পালন।

এয়ারফোর্স হাউস আয়োজিত সভায় সুভাষ জার্মান ভাষায় রোমাঞ্চকর বক্তৃতা দিল ; বললে, ভারতীয়দের কাছে ঈশ্বর লীলার মহেশ্বর, উল্লাসের মহেশ্বর। ভারতীয়দের কাছে জীবন এক অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরলীলা। বহুধা শক্তির বিচিত্র বিকাশ-বিস্ফার। এই লীলা শুধু সূর্যালোকে নয় আছে আবার গহন-গভীর অন্ধকারে, এতে শুধু আনন্দই নেই আছে অনপনেয় দুঃখ, শুধু উত্থানই নয়, আছে নিশ্চল পতন। সমস্তই ভগবানের বিভাব। আমরা যদি যোগস্থ হয়ে কর্ম করতে পারি, আমরা যদি এই বিশ্বাসে দৃঢ় হই যে আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরব্রত সাধন করতে এসেছি তবে সমস্ত অন্ধকার ও অপমানের পথ পার হয়ে আমরা অতন্দ্র তপস্যার উজ্জ্বলতম আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হব।

আমরা স্বাধীন হতে চাই কেন? স্বাধীন হতে চাই এক বিপুল অস্তিত্বের মধ্যে সত্তাকে প্রসারিত করবার জন্যে। দুঃখ আছে বন্ধন আছে এ কথা স্বীকার করে নাও কিন্তু এ দুঃখকে জয় করবার ও এ বন্ধনকে ছিন্ন করবার পর্যাপ্ত শক্তিও তোমার আছে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করো। দূরীভূত হবার জন্যেই দুঃখ, পরাভূত হবার জন্যেই লাঞ্ছনা। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার জন্যেই তোমার আত্মার বিভূতি।

ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা ইংলণ্ড বুঝতে পারেনি, জার্মানি পারবে যেহেতু ওখানে জন্মেছে কান্ট হেগেল গ্যেটে শোপেনহাওয়ার, ম্যাক্সমুলার। ঈশ্বরের প্রমাণ কোথায়? ঈশ্বরের প্রমাণ আমাদের চেতনার নিরন্তর বৃহৎ হতে বৃহত্তর হবার প্রয়াসে। আমরা সবাই নানা দিক দিয়ে কেবলই বড় হতে চাইছি, বেশি হতে চাইছি। চেতনার এই যে সর্বাঙ্গীন বৃহত্ত্ব এই ব্রহ্ম—এই ঈশ্বর। আত্মচেতনার এই প্রসার-প্রেরণাই আমাদের সমস্ত আদর্শবাদের মূলকথা।

রাজনীতি নিয়েও অনেক বললে সুভাষ। স্বাধীনতার সংগ্রামও ভারতীয়দের কাছে ব্রহ্মলাভেরই তপস্যা। সেই সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৮৫৭ থেকে, সিপাহি-বিদ্রোহের পটভূমিকায়। সিপাহী বিদ্রোহ শুধু একটা সামরিক উত্থান নয়, স্বাধীনতা যজ্ঞের পবিত্র বেদীরচনা। পথ দীর্ঘ, সংগ্রাম ক্ষান্তিহীন, রক্তমূল্য অপরিমেয় কিন্তু বিশ্বাসে দৃঢ় থাকো, জয়ী আমরা হবই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এক সঙ্গে বাঁচতে পারে না। একটার বাঁচার জন্যে আরেকটার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বাঁচবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু অবধারিত।

চূড়ান্ত জয় আমাদের। এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। গান্ধীজি আমাদের মহান নেতা, তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী। একটা নিরীহ নিরস্ত্র জাতি কী করে বলস্পর্ধী মহান্ধ শত্রুর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তিনি শিখিয়েছেন সেই মহামন্ত্র! কিন্তু শুধু অসহযোগ আর সত্যাগ্রহই শত্রুর উচ্ছেদে যথেষ্ট নয়। তাদের সাহায্যে শাসনযন্ত্রটাকে সাময়িকভাবে বিকল করা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চল করা যায় না। গাছের শাখাগুলোকে শুধু শুষ্ক ও নিস্তেজ করে শান্তি নেই, গভীরপ্রোথিত গাছের শেকড়টাকে—নির্মূল করতে হবে। সেই নির্মূলীকরণের প্রয়োজনেই সশস্ত্র সংগ্রাম অপরিহার্য।

জার্মানিতে সুভাষের শেষ বক্তৃতা আটাশে জানুয়ারী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সমাবেশে

কনিগসব্রুক-এর শিবিরে। আগে শিবির ছিল ছোট, য়্যানাবার্গ-এ। এখন দলবৃদ্ধির জন্যে বাহিনী বড় হয়েছে তাই ঠাঁই হয়েছে বৃহত্তর ক্যাম্পে। খোলা মাঠে সমাবেশ। শীতের দিন বরফ পড়ছে। হাজার-হাজার সৈনিক তবু জড়ো হয়েছে, কোনো দুর্যোগ তাদের নিরস্ত করতে পারেনি। সুভাষেরও শরীর ভালো নেই, পনেরো কুড়ি মিনিট বলবেন বলে দাঁড়ালেন। বেশি বলবার কী বা আছে! তোমারা রইলে ফৌজ রইল, তোমাদের দেখাশোনা করবার জন্যে নাম্বিয়ার রইলেন, আমার কাছে আবার সুদূরের ডাক এসে পৌঁচেছে, দুর্বার ডাক এসে পৌঁচেছে, দুর্বার ডাক, আমি আবার পথে বেরুই। আমাকে বিদায় দাও।

পনেরো-কুড়ি মিনিটের বক্তৃতা দিতে উঠে সুভাষ প্রায় আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতা দিল। কোথায় ক্লান্তি, কোথায় অস্বাস্থ্য, কোথায় তুষারবর্ষণ! সে কি একটুখানি কথা! সে যে স্বাধীনতার কথা, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের কথা, বিপদ বাধা তুচ্ছ করে অতল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা—নিরন্তর সম্মুখযাত্রা—জয়যাত্রার কথা। কণ্ঠস্বর কী করে শীতল থাকে, যে বৃহদব্রতে কৃতসঙ্কল্প তার স্বরে বজ্রনিনাদের দীপ্তি না এসে পারে কই? ছেড়ে যেতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। তবু না গেলেই নয়। এ যে পরমের ডাক, চরমের ডাক।

এক ডাকেরই আরেক ধ্বনি: জয় হিন্দ।

হাজার হাজার সৈনিক সমস্বরে প্রতিধ্বনিত হল: জয় হিন্দ। আওয়াজ তুলল: নেতাজী জিন্দাবাদ। নেতাজী মৃত্যুহীন। ব্যাঘ্র-লাঞ্ছিত পাতাকা ইণ্ডিয়ানে লিজিয়নের হাতে তুলে দিল সুভাষ। এ শান্তির পতাকা নয়, এ সংগ্রামের পতাকা। এ একাকী বনচর নিস্পৃহ বাঘ নয়, এ আক্রমণে উদ্যত প্রখরনখর প্রচণ্ড বাঘ। সে শিকারের খোঁজে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে না, সে পেয়েছে তার শিকারের সন্ধান, তারই আয়ত্তের মধ্যে, আর তাই সে আক্রমণে লক্ষ্যের উপর লাফিয়ে পড়েছে। আর লক্ষ্যভ্রংশের ভয় নেই, শক্তির ব্যবহারে নেই আর শিথিলতা। আর আন্দোলন নয় এবার আস্ফালন। স্বাধীনতার জন্যে অনেকেই পাগল হয়েছে কিন্তু সুভাষের মত এমন মরীয়া হয়েছে কজন? একবার আফগানিস্থান এবার সুমাত্রা। একবার পাহাড় ডিঙিয়ে এবার সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে। কোন উত্তুঙ্গে না কি কোন গভীর জীবনের পরম ধন বাস করে নাজানি।

ছেড়ে যেতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। তবু না গেলেই নয়।

এমিলির কাছ থেকে কী ভাবে বিদায় নিল সুভাষ? বিদায় নিল স্নেহপুত্তলী কন্যা অনীতার কাছ থেকে? ভালোবাসাকে মমতাকে বাদ দিয়ে তো সুভাষ নয়। তবু সে থামল না। পিছু হটল না। তথাগত বুদ্ধের মত নির্বাণলাভের তপস্যায় নিষ্ক্রান্ত হল। এমিলিও পথের কণ্টক হতে চাইল না। স্বামীর ব্রতপূর্তির যজ্ঞে মহত্তমা সহধর্মিনী হয়ে রইল। সুভাষকে বিদায় দেবার সময় আজাদ-হিন্দ বাহিনী বলেছিল, আবার এস। এমিলির অন্তরেও বুঝি সেই প্রার্থনা, সেই মিনতি: আবার এস।

সুভাষের এই অতল-যাত্রার সঙ্গী কে? সঙ্গী একমাত্র আবিদ হাসান। হায়দ্রাবাদে বাড়ি, তরুণ বয়স, পড়ছে বার্লিনে। সেই সুভাষের ডাকে সাড়া দেওয়া প্রথম সারের ছেলে এই আবিদ। কিন্তু সে জানে না সত্যি সে কোথায় যাচ্ছে। নেতাজী তাকে নির্বাচন করেছেন, সাথি করে নিয়ে চলেছেন এতেই সে চরিতার্থ।

বার্লিনের লেহ্‌টার বানহফ রেল-স্টেশনে আবিদকে নিয়ে সুভাষ ট্রেনে উঠল। শত্রুপক্ষের গুপ্তচর কে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে চারদিকে তাই সুতীক্ষ্ণ সতর্কতা। রুদ্ধশ্বাস চুপচাপ নিরাপত্তার

খাতিরে কোথাও কোনো ঔৎসুক্য বা উত্তেজনা নেই। সাধারণ দিনের সাদামাঠা ঘটনার মতই এই চলাফেরা। ওয়ার্থ আর নাম্বিয়ারও চলেছে কীল পর্যন্ত। এখানেই ট্রেনের যাত্রা শেষ হবে। এখান থেকেই ছাড়বে সাবমেরিন। আবিদের ধারণা সে বুঝি নেতাজীর সঙ্গে গ্রীসে চলেছে। সারা ট্রেন সে গভীর মনোযোগে গ্রীক ব্যাকরণ মুখস্থ করছে।

নাম্বিয়ার জিজ্ঞেস করলে, 'কী অত পড়ছ একমনে?'

'গ্রীক ভাষাটা একটু রপ্ত করছি।' আবিদ বললে গম্ভীর মুখে, 'কী বলো গ্রীক শেখাটা ভালো নয়?'

'নিশ্চয় ভালো।' নাম্বিয়ার বললে, 'গ্রীক কেন গ্রীক থাকে?'

আটই ফেব্রুয়ারি, উনিশশো তেতাল্লিশ। কীল-এ পৌঁছে ইউ বোটে করে সুভাষ আবিদকে নিয়ে সাবমেরিনে উঠল। এখন কে আবিদ? আবিদ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একান্ত সচিব।

ঐ তারিখেই সাবমেরিনে চড়বার আগে সুভাষ তার মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুর উদ্দেশে একটি চিঠি লিখল: 'আমি আবার বিপদের পথে যাত্রা করছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে। পথের সমাপ্তি হয়তো দেখতে পাব না। তেমন দুর্বিপাক যদি উপস্থিত হয়, তবে ইহজীবনের সমস্ত সংবাদে ছেদ পড়বে। শুধু একটিমাত্র অনুরোধ—আমার অবর্তমানে আমার স্ত্রী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাবে যেমন সমস্ত জীবন আমার প্রতি দেখিয়েছ।'

এমিলিকে যাবার আগে সুভাষ বলে দিয়েছে, আমি চলে যাবার পর এমন ভাব দেখাবে যেন কিছুই হয়নি, আমি যেমন-কে তেমন এই সোফিয়েন স্ট্রাসের বাড়িতেই আছি। উতলা হয়ো না, উদাসীন হয়ে থেকো।

যথাদিষ্ট তেমনি শূন্য বাড়িতে পূর্ণ হৃদয়েই বিরাজ করল এমিলি। সে তো শুধু স্ত্রী নয়, সে সহধর্মিনী। যেন খুব তাড়াহুড়ো করে চলে গেল। যেন এক চক্ষের পলকে। কীল-এ এক হোটেলে এসে উঠেছিল সুভাষ। সাবমেরিনের কম্যাণ্ডার এসে তাড়া দিল। গাড়ি এনেছি, চটপট উঠে পড়ুন। লাগেজ রেডি তো? সব রেডি। নেতাজীর এক মুহূর্ত দেরি হল না। আবিদ হাসানও সমান তীক্ষ্ণ।

কবে থেকে সাবমেরিন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। একবার রওনা হবার তারিখ বিজ্ঞাপিত হয় আবার কী কারণে তা পিছিয়ে যায়। কী কারণ ক্রু বা ক্যাপটেন কেউ কিছু হদিস করতে পারে না। যেন কী একটা গুরুতর কাজ সম্পন্ন করতে হবে তাই অপেক্ষায় থাকা। কী সে কাজ তা কম্যাণ্ডার জানে।

নয়ই ফেব্রুয়ারিই মিলে গেল চূড়ান্ত নির্দেশ। নোঙর তুলে যাত্রা করল সাবমেরিন। দেখা গেল ছোট একটা বোট সাবমেরিনের দিকে এগিয়ে আসছে। কী ব্যাপার? ছোট বোটে দুজন আরোহী, কম্যাণ্ডার আদেশ করল, তাদের সাবমেরিনে তুলে নিতে হবে। সাবমেরিনের গতি ঘনীভূত হল আর ছোট বোটের দুই আরোহী দিব্যি উঠে এল সাবমেরিনে। কারা এরা? এরা দুজন ইঞ্জিনিয়র। যাবেন কোথায়? নরওয়ে। কিন্তু কয়েক দিন পরে সাবমেরিন যখন নরওয়ের উপকূলে এসে ভিড়ল, তখন কই আগন্তুক ইঞ্জিনিয়র দুজন নামলেন না তো? চুপচাপ সাবমেরিনেই থেকে গেলেন। কী ব্যাপার? তখন কম্যাণ্ডার ধাঁধার সমাধান করল। নাবিকদের জানাল আগন্তুক আরোহীরা হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বসু আর তাঁর এডজুটান্ট আবিদ হাসান। কে সুভাষচন্দ্র বসু ব্যাখ্যা করতে হবে না। হিজ একসেলেন্সি সুপ্রিম কম্যাণ্ডার আজাদ-হিন্দ ফৌজ। আরো একটি গোপন নির্দেশ জানাল দৃঢ়স্বরে। গোপন নির্দেশ মানে হিটলারের খোলা আদেশ। নির্ধারিত জায়গায়

নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে পৌঁছে দিতেই হবে। নিরাপদে, সসম্মানে।

আশে-পাশে সামনে-পিছনে চতুর্দিকে শত্রুপক্ষের মারণাস্ত্র ব্যূহ রচনা করে আছে—কত রকম যুদ্ধজাহাজ তো আনাগোনা করছেই, অন্তরীক্ষে আছে আবার বিমানবহর। আছে ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার, টর্পেডো। তাছাড়া রাডার বসানো আছে যাতে ধরা পড়বে সাবমেরিনের অবস্থান। সুতরাং, বলাই বাহুল্য, খুব সজাগ হয়ে চলতে হবে, নীরন্ধ্র সতর্কতায়। এতটুকু ভুল কি অমনোযোগ, ফল অত্যন্ত সরল—নিশ্চিহ্ন অতলায়ন।

এক আধ দিন নয়, দু-এক সপ্তাহ নয়, পুরো তিন মাস—টানা নব্বই দিন জলের তলে সুভাষ আর আবিদ হাসান। সাবমেরিণের এক কোণে ছোট্ট একটা ক্যাবিনের মধ্যে দুজন অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বাস করছে। চারদিকে বিপদের কী বেড়াজাল ছড়ানো রয়েছে তাতে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই, নাবিকেরা কী কৌশলে পথ করে চলেছে সে সম্পর্কেও কোনো কৌতুহল নেই। তারা নিজের কাজ নিয়েই তন্ময়, নিজের সাধনায়ই অর্পিতচিত্ত।

কী কাজ? নেতাজী আজাদ-হিন্দ বাহিনীর জন্যে নানা পরিকল্পনা রচনা করছেন আর তারই শ্রুতলিপি নোট করছে আবিদ। সাধনা কী? সাধনা পরশাসন থেকে দেশকে নির্মুক্ত করার সাধনা। ভয় নেই ভাবনা নেই উদ্বেগ নেই দুশ্চিন্তা নেই সংশয় নেই জিজ্ঞাসা নেই। তোমাদের কাজ তোমরা করো, আমাদের কাজ আমাদের। তোমরা ভাগ্য বলতে চাও বলো। আমরা বলি ভগবান। রাখতে হলে তিনি রাখবেন, ফেলতে হলেও তিনিই। পথেও তিনি পৌঁছুনোতেও তিনি।

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি ধন্য হরি ধন্য হরি।

ক্যাবিনটা এমনি, সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। না বা দুপা নড়বার চড়বার। শারীরিক স্বাস্থ্যবিধিকেও জলাঞ্জলী দিতে হয়েছে। দাড়ি কামানো অসম্ভব। তাতে স্পৃহাও নেই। কলকাতা থেকে অদৃশ্য হবার সময় যেমন হয়েছিল সুভাষের আনন্দমণ্ডল তেমনি ধীরে ধীরে শ্মশ্রুমণ্ডিত হয়ে উঠল। আবিদ হাসানেরও সেই একই দশা, একই রূপান্তর। এই পটভূমিকায় কে সুভাষকে সুভাষ বলে চিহ্নিত করে। পরনে নৌ-সৈন্যের পোশাক, গায়ের রঙ ফরসা, একগাল দাড়ি, নিখুঁত জার্মান ভাষায় অনর্গল কথা বলছে, কে বলবে সে এই জাহজেরই একজন জার্মান নাবিক নয়! যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, আবিদ হাসানও পুরোদস্তুর জার্মান। যদি শত্রুপক্ষের হাতে সাবমেরিন ধরাও পড়ে, নাবিকের দল থেকে সুভাষ আর আবিদকে তারা পৃথক করতে পারবে না।

বাইরে নির্মম ঔদাসীন্য অন্তরে নির্বিচল শান্তি—সমুদ্রের অতলে তপস্যারত সুভাষ। ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—সুভাষের ব্যক্তিত্বে মহাতাপস বুদ্ধের প্রতিজ্ঞা। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—এই মহামন্ত্রের সে মৃত্যুঞ্জয় উচ্চারণ।

সুয়েজ ক্যানেল বন্ধ তাই সাবমেরিনকে যেতে হচ্ছে উল্টো-পথে, ঘুর-পথে—ভূমধ্যসাগর ছেড়ে অতলান্তিক সাগর দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ছুঁয়ে। পথ যতই দীর্ঘ হোক, সঙ্কল্পও ততই দৃঢ়। ক্লান্তি যতই কঠিন হোক তপস্যাও ততই অমোঘ। অন্তরে স্ফটিকস্বচ্ছ স্থির অনুভব—জয় হবেই, স্বাধীনতা বরমাল্য নিয়ে কাছেই কোথাও অপেক্ষা করছে।

অনন্যমনোযোগে ঝাঁসির-রাণী-বাহিনীর পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে সুভাষ, হঠাৎ শত্রুপক্ষের ফ্রেইটার জাহাজ সাবমেরিনকে আক্রমণ করে বসল। কোনো যান্ত্রিক গোলমালে সাবমেরিন বুঝি ক্ষণকালের জন্যে ভেসে উঠেছিল আর তাই দেখতে পেয়ে শত্রুপক্ষের ফ্রেইটার একেবারে

ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঘোরতম বিপদ উপস্থিত। মৃত্যুর সম্মুখীন সাবমেরিন। তিলার্ধ মুহূর্তও বুঝি আর হাতে নেই।

ডাইভ! ডাইভ! ভয়ার্ত কণ্ঠে কম্যাণ্ডার আদেশ জারি করল। তলিয়ে গিয়ে বাঁচো নয়তো মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে যাও।

সাবমেরিনের সকলের মুখেই আতঙ্কের ছায়া। আসন্ন মৃত্যুর কল্পনায় সকলেই বিচলিত বিমূঢ়। প্রায় ছিন্নমূল।

শুধু একজন ছাড়া। সে নেতাজী সুভাষ। সুভাষ আবিদ হাসানকে মৃদু তিরস্কার করে উঠল : আমি তোমাকে কথাটা দু-দুবার বললাম আর তুমি সেটা নোট করলে না। আবিদ হাসানও ভয় পেয়েছিল। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুভাষের বিচ্যুতি নেই, বিন্দুমাত্র মৃত্যুভয় নেই। সে তার কর্তব্যে সমাহিতচিত্ত। তারই অবিকম্প যোগ। বিস্মৃতি বা মোহ নয়, নিত্যজাগ্রত অভিনিবেশ। এ এক বৃহত্তর আনন্দকে জানার ফলশ্রুতি। বৃহতের আনন্দকে যে জানে, কোথাও থেকে তার আর ভয় থাকে না। সুভাষও তাই বিগতভীঃ।

ধমক খেয়ে আবিদ হাসান স্থির হল। লজ্জিত মুখে বললে, 'ভুল হয়ে গেছে স্যার, বলুন, আমি টুকে নিচ্ছি।'

লিখবে কী, আবিদের হাত কাঁপছে, বুক ধড়াস ধড়াস করছে, কিন্তু যে বলছে তার স্বর কাঁপছে না, আসন টলছে না, তার উদ্বেগ নেই, সংশয় নেই, প্রমাদ নেই, উচ্ছেদ নেই। না দিন না রাত্রি, সে চিরন্তন নিরস্ততমস। শান্ত স্বরে বলতে লাগল সুভাষ আর অচঞ্চল থাকবার চেষ্টায় আঁকাবাঁকা রেখায় আঁক কাটল আবিদ। ফ্রেইটার সাবমেরিনকে আঘাত করেছে আর সাবমেরিন পাশ কাটাবার আশায় কাত হয়ে শুরু করেছে ডুবতে। এই নিমজ্জনই বোধহয় অন্তিমতম পাতাল প্রবেশ।

সুভাষ নির্দ্বন্দ্ব, নিঃসংশয়। বলছে, মেয়েদেরও ডাকব সশস্ত্র সংগ্রামে সামিল হতে। বাহিনীর নাম ঝাঁসির রাণী-বাহিনী। চমৎকার হবে না? রাণী লক্ষ্মীবাই আর তাঁর সহচারিকা মতিবাই, সুন্দরবাই, কাশীবাই। পুনরাবৃত্ত হবার জন্যেই তো ইতিহাস। ভারতবর্ষের সে গৌরব অধ্যায় কি আরেকবার প্রাণ পারে না? লেখা হবে না নতুন সোনার, নতুন শোণিতের অক্ষরে?

ডুবতে-ডুবতে সামলে নিয়েছে সাবমেরিন। মৃত্যুর তিমির মুছে যেতে-যেতে আবার আশার আলোকে চোখ মেলেছে। কিন্তু সুভাষ যেমন আসীন তেমনি আসীন। স্থিতধী, নিয়তমানস।

বিপদ কেটে যাবার পর নাবিকদের সম্বোধন করে ক্যাপটেন বললে, আমাদের মহামান্য অতিথি ও এডজুটান্টের কাছ থেকে আজ আমরা এক মহৎ শিক্ষা গ্রহণ করলাম—কী করে মরণাবহ বিপদের মধ্যেও বীরের মত প্রশান্ত থাককে হয়।

আবিদ হাসান লিখছে: 'প্রশস্তির মধ্যে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করল—যে আমি কিনা ভয়ে কাঁপছিলাম সর্বক্ষণ। কিন্তু আমি জানি আমি এক মহাপুরুষের পাশে ছিলাম এবং আমার সমস্ত দুর্বলতা তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তরালে চাপা পড়ে গিয়েছিল।'

'আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।'

আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফল আক্রমণ করবার জন্যে বর্মা অভিমুখে যাত্রা করবে, ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর মেয়েরা নেতাজীর কাছে এক আবেদন-পত্র পেশ করল। অভিনব আবেদন-পত্র।

রক্তের অক্ষরে লেখা: দেশের স্বাধীনতার জন্যে পুরুষ সৈনিকদের মত আমরাও যুদ্ধ করতে চাই, যুদ্ধাঙ্গনে প্রাণ দিতে চাই।

আবেদন মঞ্জুর করলেন নেতাজী।

গোড়ায় বাহিনী যখন গঠন করেছিলেন তখন নেতাজী কী বলেছিলেন তা স্বেচ্ছাসেবিকাদের এখনো মনে আছে। বলেছিলেন, 'এই আমাদের স্বাধীনতার সর্বশেষ সংগ্রাম। ঝাঁসির রাণীদের চাই এই সংগ্রামে। শুধু একজন ঝাঁসির রাণী নয়, হাজার হাজার ঝাঁসির রাণী। কটা রাইফেল আপনারা ব্যবহার করবেন সেইটেই বড় কথা নয় শত্রুকে লক্ষ্য করে কটা গুলি ছুঁড়বেন সেইটেই বড় কথা।'

সামরিক শিক্ষার আওতায় সেবা-নায়িকারা সেনা-নায়িকা হয়ে উঠল। নেতাজীর কাছে আবেদন মঞ্জুর হতে ঝাঁসির-রাণী বাহিনী সিঙ্গাপুর থেকে এল রেঙ্গুনে।

'যদি কলকাতা জয় করা সম্ভব হয়', নেতাজী বললেন, 'তবে সেদিন তোমরা এই ঝাঁসির-রাণী বাহিনীই আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মুখবর্তিনী হয়ে বিপুল জয়োল্লাসে সেখানে প্রবেশ করবে।'

রাণী-বাহিনী জয়োল্লাস করে উঠল: জয় হিন্দ।

উনিশ শো চুয়াল্লিশের অক্টোবরে রেঙ্গুনের সেন্ট্রাল পার্কে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট সামরিক সমাবেশ হয়েছে। আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব। প্রায় তিন হাজার আজাদী সৈন্য ও পাঁচ শো রাণী-বাহিনীর মেয়ে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে যোগ দেবার জন্যে উপস্থিত। উপস্থিত জাপানী জেনারেল, বর্মী মন্ত্রী, আজাদী ফৌজের সর্বোচ্চ অফিসর। তাছাড়া স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য। বিরাট ময়দান মানুষে উথলে উঠেছে। মাঝখানে উঁচু মঞ্চ। সেই মঞ্চে সবচেয়ে উঁচু মানুষটি দাঁড়িয়ে। নেতাজী সুভাষ।

প্রথমে আজাদ হিন্দ ফৌজের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হল:

> শুভ সুখ চায়েন কী বর্খা বরষে, ভারত ভাগ হ্যায় জাগা
> পঞ্জাব, সিন্ধ, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড় উৎকল বংগা
> চঞ্চল সাগর বিন্ধ্ হিমালা, নীল যমুনা গংগা
> তেরে নিত গুণ গাঁয়ে, তুঝ সে জীওন পাঁয়ে'
> সব তন্ পাঁয়ে আশা
> সূরয্ বন্ কর্ জগ পর চমকেঁ, ভারত নাম সুভাগা
> জয় হো জয় হো, জয় হো, জয় জয় জয় জয় হো
> ভারত নাম সুভাগা।

একটি মুসলিম তরুণ—নাম হুসেন—'জনগণমন'-এর অনুকরণে এই গানটি রচনা করেছে। নেতাজীর নির্বাচিত কমিটি এই গানটিকেই বরণীয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। হুসেন সেই স্বীকৃতির মর্যাদা পেয়েছে দশ হাজার ডলার।

সেনাবাহিনী—পুরুষ আর নারী—খোলা মাঠে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নেতাজী কী বলেন তা শোনবার জন্যে। রোমাঞ্চিত, অনুপ্রাণিত, উৎসর্গীকৃত হবার জন্যে। নেতাজীকে শোনার অর্থই হচ্ছে মুক্তির জন্যে বলিপ্রদত্ত হয়ে ওঠা। কী বলছেন নেতাজী? বলছেন: 'আমি তোমাদের কোনো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাদের ভবিষ্যৎবংশীয়দের। তোমরা আমাকে তোমাদের হৃদয়ের রক্ত দাও, আমি তোমাদের হৃদয়ের নিধি স্বাধীনতা এনে দেব।

আমাদের মৃত্যু হলেও আমাদের বাহিনীর মৃত্যু নেই—তাদের জয়—রক্তরঞ্জিত জয় অবধারিত। আমাদের বাহিনীই একদিন বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অঙ্গারশ্মশান পার হয়ে দিল্লীর লালকেল্লায় বিজয়-পতাকা উত্তোলন করবে।'

চলো দিল্লী চলো! জয় হিন্দ-এর পরে এ আরেক রণনাদ—দিল্লী চলো। বন্ধনের দেশ থেকে চলো স্পন্দনের দেশে। প্রসুপ্তির দেশ থেকে জাগরণের রাজ্যে। তমসার তীর থেকে উত্তাল উদ্ভাসনে। ঝড়ের তাণ্ডবে ঝাঁপিয়ে পড়া কেন? মৃত্যুতরুণ অমৃত লাভের পিপাসায়।

মার্চ পাস্ট শুরু হল। ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর পাঁচ শো মেয়ে এবার নেতাজীর সম্মুখ দিয়ে সামরিক অভিবাদন জানিয়ে ছন্দিত পদক্ষেপে চলে যাবে। অভিবাদন শুধু নেতাজীকে নয়, এক ধাপ নিচে দাঁড়ানো সর্বাধিনায়িকা ক্যাপটেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনকেও! সর্বাগ্রে দলনেত্রী লেফটেনেণ্ট থিবার্স, তার হাতে সামরিক পতাকা, সঙ্গে ব্যাণ্ড পার্টি, পিছনে রাণী-বাহিনীর অন্যান্যদের পদসঞ্চার। এমনতরো মহিমময় দৃশ্য কে কবে দেখেছে রেঙ্গুনে!

হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। জাপানী সাইরেন। বোঝা গেল বৃটিশ বোমারু বিমান রেঙ্গুন আক্রমণ করতে আসছে। কথা নেই, সঙ্গে-সঙ্গেই কাছের বিমানঘাঁটি থেকে জাপানী জঙ্গী বিমান আকাশে উঠল। পালাও। আশ্রয় নাও। মণ্ডপ প্রায় খালি হয়ে গেল। জাপানী জেনারেল পর্যন্ত ছুটল পরিখার দিকে।

পালাবার আগে নেতাজীকে বলে গেল কানে-কানে, দেরি করবেন না, ডিসবার্সের অর্ডার দিন। আত্মরক্ষা করুন।

অচল অটল সুমেরুবৎ নেতাজী। নিবাত নিষ্কম্প—নির্বিকার।

রাণী-বাহিনীর ব্যাণ্ড বাজছে সমানে। সাইরেনের তীব্র আর্তনাদেও সে-বাজনা চাপা দিতে পারেনি। রাণী-বাহিনীর নায়িকারা সমানে মার্চ করে চলেছে। এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই, শিথিলতা নেই। সামনেই সর্বলোকমহেশ্বর নেতাজী দাঁড়িয়ে। বৃটিশ বিমান রেঙ্গুন আক্রমণ করতে আসছে। ময়দানের এই উজ্জ্বল সমাবেশ তাদের আকৃষ্ট করছে কিনা কে জানে। জাপানী বিমানও তাদের ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সমাবেশের মাথার উপরই প্রচণ্ড মেশিনগানের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। নেতাজী তবুও নড়ছেন না। তাঁকে অচঞ্চল দেখে লেফটেনেণ্ট থিবার্সও পারছে না মিছিল ভেঙ্গে দেবার আদেশ দিতে। অসাহসের কুয়াশা নেই কোথাও। সামনেই নেতাজীর অভয়প্রদ উপস্থিতি।

সারে সারে মার্চ পাস্ট করে যাচ্ছে মেয়েরা, নেতাজী আত্মস্থ, অনন্যচিত্ত।

শত্রু-বিমানগুলি হঠাৎ নিচু হয়ে প্রায় মাটি ছুঁয়ে প্যারেড গ্রাউণ্ডের উপর দিয়ে চলে গেল। একটা বিমান নেতাজীর মোটে একশ গজ দূরে। সে-বিমানে ছ-ছটা মেশিনগান ছিল। যদি সেই মেশিনগানগুলি চালানো হত রাণী-বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত—নেতাজীও পরিত্রাণ পেতেন কিনা কে জানে। কিন্তু জাপানের বিমানবিধ্বংসী কামান এই দলছুট বিমানকে রেহাই দিল না। তাকে লক্ষ্য করে গোলবর্ষণ করতে লাগল। একটা গোলা সরাসরি এসে লাগল রাণী বাহিনীর একটি মেয়ের মাথায়। মেয়েটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তবুও রাণী-বাহিনীর লাইন ভাঙল না। বাজনায় তাল কাটল না। পদক্ষেপে ঘটল না যতিপাত। অভিবাদনের ভঙ্গিতে নেই একটুকু শিথিলতা।

কী দুর্মদ সাহস দেখালে তোমরা। নেতাজী নিজেই মেয়েদের অভিবাদন জানালেন। আদেশ দিলেন যেন পুরোপুরি সামরিক মর্যাদার মেয়েটির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। আমাকে খবর দিও।

আমি উপস্থিত থাকব।

সাবমেরিনের ক্যাপটেনের উপর কড়া নির্দেশ ছিল পথে যেন কোনো সংঘর্ষে না লিপ্ত হয়। শত্রুপক্ষের কোনো জাহাজ না ডোবাতে চেষ্টা করে। তোমার কাজ হবে— একমাত্র কাজ—নেতাজীকে নিরাপদ জাপানী সাবমেরিনে তুলে দেওয়া। আরো নির্দেশ ছিল কোনো অবস্থায় নেতাজীর কথা না অমান্য করা হয়।

জাপানী সাবমেরিনের নাগাল পাওয়া যাবে কোথায়? মাদাগাস্কারের অদূরে মানচিত্রের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে। কিন্তু কত দিনে? মাঝে মাঝে অধীর হয়ে ওঠেন নেতাজী। আবার যোগস্থ হয়ে নিজেকে সম্বৃত করেন। তপস্যা আর কী! একান্ত তীব্র জাগ্রত প্রতীক্ষাই তপস্যা। যজ্ঞেশ্বর ফল না দিয়ে যাবেন কোথায়? হয় কূল নয় তল—সর্বত্রই আমার সমান সিদ্ধি।

একটা বৃটিশ কার্গোশিপ সামমেরিনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। বুঝি যুদ্ধের উপকরণ নিয়ে চলেছে ইংলণ্ডে—শত্রুদেশে। নেতাজী কম্যাণ্ডারকে হুকুম করলেন: টর্পেডো চার্জ করুন। আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই ওদের জাহাজটা কেমন নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যায়। কম্যাণ্ডর এক মুহূর্ত বুঝি দ্বিধা করল কিন্তু নেতাজীর আদেশ আগ্রাহ্য করে এমনও সাধ্য নেই, নেই বা বিবেকের সম্মতি।

চার্জ!

বজ্রপ্রহারে বৃটিশ কার্গোশিপে আগুন ধরে গেল। দেখতে দেখতে সলিলসমাধিতেই নির্বাপণ খুঁজল। চক্ষু চরিতার্থ করে দৃশ্যটা দেখলেন নেতাজী। কিন্তু আর কতদূর? জাপানী সাবমেরিনের হাতছানি কবে দেখা যাবে? এদিকে পেনাং থেকে যাত্রা করে জাপানী সাবমেরিন চিহ্নিত স্থানে পৌঁছে গেছে কিন্তু চন্দ্র বোসকে নিয়ে জার্মান সাবমেরিন পৌঁছুল কই?

দৈবনির্বন্ধ অখণ্ডনীয়—দুই সাবমেরিনে দেখা হল। কিন্তু কষ্টের লিখন তখনো শেষ হয় নি। সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। এ ঝড় শান্ত না হলে নেতাজী রবারের নৌকো করে পৌঁছন কী করে? অপেক্ষা না করে উপায় নেই। সামনে আরাধ্য ধন এসে পৌঁচেছে কিন্তু নাগালের মধ্যে পেয়ে তুমি তাকে স্পর্শ করতে পারছ না। নেতাজী জানেন কী করে থাকতে হয় নিরাসক্ত হয়ে।

আর দুদিন কাটল। আকাশ নম্র হল। আটাশে এপ্রিল আবিদ হাসানকে নিয়ে নেতাজী রবারের নৌকোয় চাপলেন। কিন্তু এবার অন্য বিপদ। এবার দলে-দলে হাঙরের আক্রমণ। সে আক্রমণও কাটিয়ে উঠলেন নেতাজী। জাপানী সাবমেরিনে এসে উঠলেন শেষ পর্যন্ত। সঙ্গে সেই চিরস্থির আবিদ হাসান।

জাপানী সাবমেরিনের কম্যাণ্ডার, নাম ইজু, চন্দ্র বোসকে উত্তপ্ত অভ্যর্থনা করে উঠল: ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি পৌঁছে গিয়েছ।

এখন প্রায় সাত দিন লাগবে পেনাং-এ পৌঁছুতে। পেনাংএ নেতাজী মাটির স্পর্শ পাবেন। ভাবতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। নেতাজীর এখনকার কম্যাণ্ডার মাৎসুদা। ক্যাপটেনের কেবিনেই তাঁর জায়গা হয়েছে। এখানে নড়বার-চড়বার জায়গা একটু বেশি, হাঁটা চলা করতে পারেন। যথাসাধ্য শারীরিক ব্যায়াম করতে ভোলেন না, আর যখনই পারেন এক চমক ঘুমিয়ে নেন। কত দীর্ঘ দিন-রাত একাসনে বসে থেকে-থেকে ভুলে গেছেন কাকে বলে ঘুম। তবু এত ক্লেশ-কৃচ্ছ্রেও তাঁর ক্লান্তি নেই। সবার সঙ্গে আনন্দোদ্বেল হয়ে কথা বলছেন, আলাপ করতে না করতেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছেন, সবাই তার বুদ্ধির প্রাখর্যে ও স্বভাবের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে

যাচ্ছে। সর্বব্যাপারে আদ্যোপান্ত জানবার স্পৃহা, ব্যক্তিত্বের দীপ্তি। এই না হলে নেতা। পাশে-পাশে থেকে আবিদ হাসানও সকলের প্রিয়ত্বভোগী।

কিন্তু পেনাং-এর কাছাকাছি এসে নির্দেশ পাওয়া গেল, পেনাংএ নয়, সাবানবন্দরে চলে যাও। ব্যাপার কী? ব্যাপার আর কিছুই নয়, পেনাংএ গুজব রটে গিয়েছে সুভাষ আসছেন। নিরাপত্তার খাতিরেই পেনাংকে পরিহার করা দরকার।

কে আসছে? স্বাধীনতার কারিগর সুভাষচন্দ্র। ওয়াকবিহ্বল মহলে জিজ্ঞেস করে জনতা।

জানি না। আমাদের কাছে খবর তো কম্যাণ্ডর মাৎসুদা আসছেন।

উনিশশো তেতাল্লিশের ছয়ুই মে সাবানে পা দিলেন নেতাজী। মুক্ত আকাশের নিচে স্থির মাটিতে দাঁড়ালেন ঋজু হয়ে।

অভ্যর্থনা করতে এল কর্নেল ইয়ামামোতো, বার্লিনের জাপ দূতাবাসের প্রাক্তন যুদ্ধোপদেষ্টা। সে-ই নেতাজীকে নিয়ে যাবে টোকিও। কিন্তু তিন-চার দিন কেটে গেল বাঞ্ছিত বিমান সবুজ সঙ্গেত নিয়ে হাজির হল কই?

বিমান এল এগারোই মে। আর সেদিনই সকালে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে টোকিও অভিমুখে যাত্রা করলেন নেতাজী। প্রথমেই রাসবিহারী বোস-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। রাসবিহারী এখন কোথায়? সিঙ্গাপুরে। সুভাষের খবর এসে গেছে তাঁর কাছে। তিনি কি আর পারেন বসে থাকতে? অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সুভাষ। সমুদ্রের পর সমুদ্র পেরিয়ে এসেছে। তাকে বুকে জড়িয়ে না ধরা পর্যন্ত শান্তি কই? অনেক পথ ঘুরে ঘুরে অনেক বন্দর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দু দিন পর ১৩ই মে সুভাষ টোকিওতে পৌঁছুল। জায়গা হল ইম্পিরিয়াল হোটেলে। রাসবিহারীও টোকিওতে পৌঁছে সেই হোটেলের অভিমুখে রওনা হলেন।

দুই বসুতে দেখা হল। ইয়ামামোতো ঘরে উপস্থিত ছিল, তার উপর ভার ছিল দুই বিপ্লবীকে পরস্পর আলাপ করিয়ে দেবার। কোনো প্রয়োজন হল না, এক অগ্নিশিখা আরেক অগ্নিশিখাকে সহজেই চিনে নিতে পারল। মুহূর্তে করবদ্ধ হল দুজনে; মুহূর্তেই আলিঙ্গনাবদ্ধ। ইয়ামামোতো বলছে, এর আগে ওদের কাউকে এত আনন্দিত দেখিনি। কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে রইল দুজনে। আবেগে সৌহার্দ্যে সমমর্মিতায়। পরে যখন পরস্পর কথা বলতে শুরু করল, ইয়ামামোতো বুঝল সে ভাষা বোঝবার তার বিদ্যে নেই, সে হৃদয়ের ভাষা, ভালোবাসার ভাষা— বাঙলা ভাষা।

সর্বাগ্রে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে দেখা করা দরকার। দেরি করার সময় নেই। তোজো রাজি হলেন দেখা করতে। কী না জানি ফল হয় এই সাক্ষাৎকারের। ইউরোপে দুবছর হিটলার আর মুসোলিনির কাছে ধরণা দিয়েও কাম্য ফল কিছুই আদায় করতে পারেনি সুভাষ, তোজোর কাছ থেকেও কি রিক্ত হাতেই বিদায় নেবে?

এই—এই হিজ একসলেন্সি চন্দ্র বোস!

মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল তোজো। যেন প্রাণশক্তির গৌরবে গরীয়ান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নেতাজী, ব্যক্তিত্বের বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে। সাধ্য নেই তোজো তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। ফিরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, যথাসর্বস্ব তাঁর হাতে বিলিয়ে দিতে সাধ জাগে।

'হ্যাঁ, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আমি জাপানের সাহায্য চাই।' নেতাজী বললেন স্পষ্ট কণ্ঠে: 'এতে কোনো অপৌরুষ নেই। ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি ডি-ভেলেরা লেনিন সানইয়াৎ-সেন কে না পররাষ্ট্রের থেকে সাহায্য নিয়েছে। আপনি শুধু বলুন, ঘোষণা করুণ, ভারতবর্ষ ভারতীয়দের

জন্য। স্বাধীন ভারত একলা স্বাধীন ভারতের।'

তথাস্তু। জাপানী পার্লামেণ্টের অধিবেশনে তোজো নেতাজীকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন। ১৬ই জুন, ১৯৪৩। নেতাজীর বরেণ্য উপস্থিতিতেই ঘোষণা করলেন তোজো : 'ভারতীয় জনগণের শত্রু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ভারতের মাটি থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করবার জন্যে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা-অর্জনে ভারতকে সর্ববিধ উপায়ে সাহায্য করবার জন্যে জাপান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই শুভ সঙ্কল্পের কথা, আমি জাপানের প্রধানমন্ত্রী, সগৌরবে ঘোষণা করছি।'

নেতাজীর আনন্দ আর ধরে না। এত পাহাড়-ডিঙানো পাথার-পেরোনো বুঝি কিছুটা সফল হল।

তোজো নেতাজীকে বললেন, এবার তবে আজাদী সরকার গঠন করুন।

রাসবিহারীর কাছ থেকে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জেনে নিলেন নেতাজী। তারপর ১৯ শে জুন প্রকাশ্যে এক সাংবাদিক সন্মিলন আহ্বান করলেন।

বললেন, 'বৃটিশের মিষ্টি কথায় আর আমরা ভুলছি না। অনেক ভুলেছি, অনেক ঠকেছি, আর নয়। বলে দিন, তাদের সঙ্গে আর আমাদের আপস নয়। আমরা যে অক্ষশক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। যদিও আমি জানি আমাদেরই নিজের রক্তেই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, এবং সেই রক্তদানের শক্তিতেই রক্ষা করতে হবে স্বাধীনতা। ভয় নেই অক্ষশক্তি আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। ছলনার রাজনীতিতে ধুরন্ধর বৃটিশ নেতারাই কাবু হয়েছে, ঐ খেলা খেলতে এলে অন্যরাও হালে পানি পাবে না।

সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল নেতাজী বার্লিন ত্যাগ করে জাপানে পৌঁছেছেন। আর কথা কী! আনন্দের ঢেউ পড়ে গেল আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবিরে-শিবিরে। স্বকর্ণে শোনা যাবে নেতাজীর কণ্ঠস্বর। রাত দশটায় টোকিও রেডিও থেকে তিনি ভাষণ দেবেন। সে কী উৎসাহ! নেতাজীকে শোনা অর্থই নতুন হয়ে ওঠা। সঙ্কল্পে নতুন, সাধনায় নতুন, প্রতিজ্ঞায় নতুন, প্রাণনায় নতুন।

'আমি সুভাষচন্দ্র বোস।

স্বাধীনতা আমরা করায়ত্ত করবই আর তা সন্মুখ সমরে, সশস্ত্র সংঘর্ষে। অকুণ্ঠিত তরবারির সাহয্যে। ইংরেজ এখন অনেক স্তোক বাক্য বলবে কিন্তু ওদের কথায় আর আমরা প্রতারিত হব না। আপসের কথায় কর্ণপাত করবার আর আমাদের সময় নেই। স্বাধীনতা সন্ধির জিনিস নয় জয়ের জিনিস। ভিক্ষায় তা মেলে না, মেলে আত্মশক্তিতে, মেলে অস্ত্রশক্তিতে।'

ইংরেজের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। জার্মান আর ইটালি সুভাষকে যা দিতে পারেনি, এবার বুঝি জাপান তাই দেবে। সেটা কী? প্রত্যক্ষ হৃদ্যতা। সামরিক আচ্ছাদন। কিন্তু ব্যগ্র হলেও নেতাজী তার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁর আসল ব্যস্ততা স্ব-শক্তির উদ্বোধনে, আজাদ হিন্দ ফৌজের উজ্জীবনে। নিজেই নিজের নিয়ামক, নিজেই নিজের উদ্ধারকর্তা।

ওদিকে সিঙ্গাপুর ডাক দিল নেতাজিকে। আমরা তোমার ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। তুমি এস। আমাদের সামনে এসে দাঁড়াও। আমরা সর্বতশ্চক্ষু হয়ে দেখি তোমাকে। তোমার জয় হিন্দ মন্ত্রে প্রাণায়িত হই। এক জাতি এক জনতা এক ভারতীয়তা।

চলো দিল্লী চলো।

ছয়

ঠিক কোন সময়ে নেতাজী সিঙ্গাপুরে পৌঁছুবেন জনসাধারণকে জানতে দেওয়া হয়নি।

জানেন শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার আর মুষ্টিমেয় কজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—সামরিক ও অসামরিক জগতে যাঁরা গণনীয়। সকলেরই চোখ আকাশে নিবদ্ধ— কতক্ষণে প্রার্থিত বিমান দেখা যায়। দোসরা জুলাই উনিশশো তেতাল্লিশ, দুপুর প্রায় বারোটার সময় নেতাজীর প্লেন সিঙ্গাপুরের মাটি স্পর্শ করল। এ কী, এ উত্তাল জনসমুদ্র এল কোত্থেকে। কে এদের খবর দিল? কে বাজাল পাঞ্চজন্য? কী করে দিন-ক্ষণ পথ-ঘাট চিনে নিল এক পলকে? বন্যা যখন উদবারিত হয় তখন তার বুঝি পথ চিনতে হয় না। কই নেতাজী কোথায়? জনতার মধ্যে শুধু ভারতীয় নয়, আছে চীনী আছে জাপানী আছে বর্মী আছে মালয়ী। কে সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে সামনে থেকে ভরা চোখে নেতাজীকে দেখবে, পরস্পর ধাক্কাধাক্কি চলেছে। আমাকে দেখতে দাও। দেখিয়ে দাও আমাকে।

দেখিয়ে দিতে হয় না, চিনিয়ে দিতে হয় না—নেতাজী এমনি উজ্জ্বল, এমনি জ্বলন্ত। তাঁর ব্যক্তিত্ব শুধু বলিষ্ঠতারই দীপ্তি নয়, নয় শুধু বা সৌন্দর্যের দীপ্তি— সে বুঝি এক লোকোত্তর উদ্ভাস! সকলে ধ্বনি করে উঠল: নেতাজী জিন্দাবাদ।

প্রথমে নামলেন নেতাজী, পিছনে সেক্রেটারী আবিদ হাসান। পরে একে একে নামলেন রাসবিহারী বোস, কর্নেল ইয়ামামোতো, জাপানী সেনাপতি সেগু।

সামনে সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী—নেতাজীর চোখ জুড়িয়ে গেল। নেতাজী এগিয়ে গেলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের সঙ্গে করমর্দন করতে। ভোঁসলে, কিয়ানি, শা নওয়াজ। সবাই চমৎকৃত হল। অবিসম্বাদিত নেতা হবার মত পৌরুষেয়। দেখলেই বিশ্বাস হয় আরাধ্য বস্তু পাইয়ে দেবেন, পৌঁছিয়ে দেবেন রাজধানীতে।

শা নওয়াজ তো রোমাঞ্চিত। লিখছেন: তাঁর করস্পর্শে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। জীবনে এই প্রথম তাঁকে দেখলাম। মনে হল সমস্ত প্রত্যাশার বুঝি এবার পূরণ হবে।'

নেতাজীর পরনে সামরিক পোশাক নয়, একটি হাল্কা বাদামী রঙের স্যুট, মাথায় গান্ধী টুপি। দেখতে কত নিরীহ কিন্তু আসলে বিদ্যুৎগর্ভ। পরনে কখনো পূর্ণাঙ্গ ফৌজী পোশাক, কখনো পরনে একখানি গেরুয়া-রঙের সিল্কের ধুতি, নগ্ন গাত্রে সিল্কের উত্তরীয়।

নেতাজী গার্ড অব অনার পরিদর্শন করলেন, ভাষণে বললেন, 'বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে আমাদের একটাই শুধু অভাব ছিল—প্রকাণ্ড অভাব। সেটা হল সুগঠিত সেনাবাহিনী। আপনারা মাতৃভূমির বীর সন্তান, আপনারাই সে অভাব মোচন করেছেন। আর সন্দেহ নেই, মাতৃভূমির স্বাধীনতার আর দেরি নেই। কারাগারের রুদ্ধ দ্বার এবার উন্মুক্ত হবে। জয় স্বাধীন ভারত! জয় সশস্ত্র ভারত!'

নেতাজীর জন্যে সরকারি অবাস নির্দিষ্ট হয়েছে। সেই আবাসে তিনি উঠলেন। তিনি অনন্য, তিনি আবার অনন্য হয়ে সর্বসাধারণের।

আদাজ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক, আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নেতাজী সুভাষ নিঝুম মধ্যরাতে তাঁর আবাস থেকে গাড়ি নিয়ে একা বেরিয়ে পড়লেন। যথারীতি দেহরক্ষী এগিয়ে এলো সঙ্গে যেতে। নেতাজী তাকে ফিরিয়ে দিলেন। না, একা যাব। শুধু ড্রাইভারকে নিয়ে একা এই ব্ল্যাক-আউটের রাতে কোথায় চলেছেন তিনি? শুধু আবিদ হাসানকে চুপি চুপি বলেছেন, যাচ্ছি আশ্রমে।

আবিদের ব্যাপারটা জানা, তাই সে চমকাল না। আশ্রম মানে সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশণ

আশ্রমে। যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরাজমান। কোয়ার্টার্স থেকে ফোন গেল আশ্রমে, নেতাজী রওনা হয়ে গেছেন।

আশ্রমে পৌঁছে বাইরে ফৌজী পোশাক ছেড়ে গেরুয়া রঙের সিল্কের ধুতি পরলেন নেতাজী, খালি গায়ে সিল্কের উড়ুনি। তাঁর ছোট্ট হাত-ব্যাগটি কিন্তু তাঁর সঙ্গে আছে। সেই হাত-ব্যাগে তিনটি জিনিষ—একখানি পকেট-গীতা, এক গাছি তুলসীর মালা আর এক জোড়া পড়বার চশমা। আর সব খোয়াতে পারেন কিন্তু এই ক্ষুদ্র ব্যাগটি নয়—কিছুতেই নয়।

মন্দিরে ঢুকে ধ্যানে বসলেন নেতাজী। আশ্রমের সন্ন্যাসী-মহারাজ আসন পেতে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। দরজা-জানলা বন্ধ, আলোর বিন্দুতম আভাসও বাইরে কোথাও নেই। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে জ্বলছে আরেকটি ধ্যানশিখা—তন্ময় নেতাজী, ঈশ্বরতন্ময়। ব্রহ্মচৈতন্য অধিষ্ঠিত না হলে কি এত বড় নেতা হওয়া যায়। তাই স্বামীজীর পরেই নেতাজী। শুধু নিজের মোক্ষের জন্যেই সমাহিত নন, দেশের শৃঙ্খলমোচনে সমর্পিত।

খাড়া দুঘণ্টা ধ্যান করলেন নেতাজী। বাইরে জাপানী সাইরেন বাজছে, হচ্ছে বা বোমা-ফাটার শব্দ, তবু নেতাজীর চাঞ্চল্য নেই, ঔৎসুক্য নেই। তিনি ব্রহ্মে শুধু অভিনিবিষ্ট নন, তিনি ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট। তিনি দিব্যানুভূতির ভাস্বর মহিমায় সমাসীন। দুঘণ্টা পরে আসন ছাড়লেন নেতাজী। গেরুয়া ছেড়ে আবার পরলেন ফৌজী পোশাক, পূর্ববৎ সাজলেন সর্বাধিনায়ক।

স্বরাট না হলে কি সম্রাট হওয়া যায়?

আশ্রমের মহারাজ হেড-কোয়ার্টার্সে ফোন করলেন, নেতাজী ফিরলেন এতক্ষণে। পনেরো মিনিটের পথ। রক্ষীদল সজাগ হয়ে রইল। কিন্তু সমস্ত চুপচাপ, গভীর-গম্ভীর।

শিবত্বে আসীন থেকে শক্তির উল্লাসকে মুক্তি দেওয়ার ব্রতই নেতাজীর ব্রত।

পরদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হলেন নেতাজী। বর্মা বোর্নিয়ো হংকং শ্যামদেশে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-লীগ বা ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভ্যরাও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা চলল আধুনিক যুদ্ধের রীতি-নীতি ও কলাকৌশল নিয়ে। অস্ত্রশস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ে। সকলে অবাক হল নেতাজীর জ্ঞান কী সর্বাতিশয়ী। যেমন বিস্তীর্ণ তেমনি অগাধ।

পরদিন চৌঠা জুলাই স্থানীয় 'ক্যাথে বিল্ডিং'এ এক বিরাট জনসভার আয়োজন হল। দাঁড়ালেন রাসবিহারী। আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সমস্ত ভার সুভাষকে সমর্পণ করে দিলেন। তিনি শুধু ফৌজের অধিপতি হলেন না, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-লীগেরও সভাপতি হলেন। আজ থেকে তিনি আমাদের, আমরা তাঁর আজ্ঞাধীন।

মাধ্যন্দিন সূর্যের মহিমায় দাঁড়ালেন নেতাজী। দিকবিদিক আলোতে আলোকময় হয়ে উঠল।

নেতাজী সসম্ভ্রমে সমস্ত ভার গ্রহণ করলেন। ফৌজের আধিপত্য নয়, আনুগত্য। কেউ কারু আজ্ঞাবাহী নয়, সকলেই আমরা মাতৃভূমির সেবক, মায়ের জন্যে বলিপ্রদত্ত। শুধু সামরিক শৃঙ্খলা রাখবার জন্যেই একটা বিধিব্যবস্থা যাতে অভিযান তীক্ষ্ণ হয় দ্রুত হয় যাতে জয় হয় হাতের আমলকী। আমরা সকলে এক পথের পথিক, এক যাত্রার সহচর, এক দুর্দিনের বন্ধু, এক সুদিনের অংশভাক। আমরা সবাই সাথি ও সুহৃদ।

'সাথিয়োঁ ঔর দোস্তোঁ'—নেতাজী উদাত্তকণ্ঠে সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করলেন।

আশিরবাদনখ সকলে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আহ্বানে কী উত্তাপ কী সারল্য কী গভীর আন্তরিকতা! এই না হলে সঙ্ঘ-পুরুষ, চালক-নায়ক। এক ডাকেই সকলে মাতোয়ারা হয়ে

উঠল। সবাই দিয়ে ফেলল শুধু বশ্যতা নয় বাধ্যতা নয়, গুরু ভক্তিও নয়, দিয়ে ফেলল হৃদয়ের ধন যার আরেক নাম ভালোবাসা।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের রেশনে কতদিন নুন জোটেনি, তাতেও তাদের ক্ষোভ বা অবসাদ নেই—নেতাজীর প্রতি তাদের ভালোবাসাই তাদের ব্যঞ্জনের নুন। তাদের আহার্যের আস্বাদ।

নেতাজী ডাক দিলেন: আমরা আজাদ হিন্দ সরকার গড়ে তুলব। তাহলেই জাপানের সঙ্গে বন্ধুতায় পা মেলানো সহজ হবে। তাহলেই বলদর্পী বৃটিশকে চূড়ান্ত আঘাত হানা যাবে। আমি ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাইরে স্বাধীনতার সমস্ত সৈনিককে ডাক দিচ্ছি, আপনারা সবাই আমাদের সরকারের পতাকার নিচে সমবেত হোন।

কিন্তু এ ভুললে চলবে না, আমাদের পথ অত্যন্ত বন্ধুর, সংগ্রাম অত্যন্ত নির্দয়। আমাদের শত্রু প্রবল, বিবেকবর্জিত। তবু এ ভুললেও চলবে না আমাদের ভয় নেই, ক্লান্তি নেই, কিছুই আমাদের কাতর করতে পারে না, না ক্ষুধা না তৃষ্ণা না বা নিদ্রাহীন পথশ্রম। মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়েও আমরা স্মিতমুখ। এই সঙ্কল্পে উদ্দীপ্ত হয়ে অগ্রসর হলে কে আমাদের স্বাধীনতাকে স্থগিত রাখে? পিছন ফিরে না তাকিয়ে এগিয়ে চলো, আমি তোমাদের দিল্লী নিয়ে যাব।

পরদিন আজাদ হিন্দ ফৌজ—সংখ্যায় দশহাজার—পরিদর্শন করলেন নেতাজী। দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দিলেন এই ফৌজের কথা। বললেন, আজ আমার জীবনে একটি বৃহত্তম গৌরবের দিন। ভগবানের কৃপায় দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে একটা ফৌজ গড়ে তুলতে পেরেছি। এই ফৌজ সম্পূর্ণ ভারতীয় নেতৃত্বে গঠিত আর ভারতের মুক্তি সংগ্রামেই নিয়োজিত। আর তা গঠিত হল কোথায়? সিঙ্গাপুরে। সে সিঙ্গাপুর বৃটিশের দুর্ভেদ্য আশ্রয় ছিল সেই শ্মশানে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানে কি আর সন্দেহ আছে?

চলো দিল্লী চলো। চলো আমাদের ফৌজই স্বাধীনতা এনে দেবে। আমাদের রণনাদ ঐ দিল্লী চলো। যতদিন বৃটিশ রাজ্যের আর এক মহাশ্মশান দিল্লীতে পৌঁছে তার লালকেল্লায় আমাদের বিজয়-পতাকা না উড্ডীন করছি ততদিন আমাদের নিবৃত্তি নেই। জানি না আমরা কজন সেদিন বেঁচে থাকব, আমাদের জীবনের থেকেও মূল্যবান আমাদের স্বাধীনতা আর যে সেই স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দেয় সে মরে না।

স্বাধীনতা লাভের জন্যে ভারতের আর সব যোগ্যতাই ছিল, ছিল না শুধু স্বকীয় ফৌজের সামর্থ্য। আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্য ছাড়া কবে কোন দেশ স্বাধীন হতে পেরেছে? হাতে সৈন্যদল ছিল বলেই ওয়াশিংটন যুদ্ধ করে আমেরিকাকে স্বাধীন করতে পেরেছিল। ইটালিও স্বাধীন হয়েছিল গ্যারিব্যাল্ডির হাতে সশস্ত্র সাহায্য এসেছিল বলে। কত বড় গৌরব, ভারতের মুক্তির জন্যে আপনারাই প্রথম ফৌজ গড়লেন— সশস্ত্র ফৌজ। আর কি আমাদের স্বাধীনতা লাভে সন্দেহ আছে?

যুদ্ধশেষে বেঁচে থেকে কে কে স্বাধীন ভারত দেখব সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা ভারত—আমাদের ভারত স্বাধীন হবে আর সেই স্বাধীনতা অর্জনে আমরা আমাদের যথাসর্বস্ব দান করব, ত্যাগ করব, উৎসর্গ করব।

ভগবান আমাদের ফৌজকে আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন যুদ্ধে জয়ী হই।

পরদিন মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং-এর সামনে প্রধানমন্ত্রী তোজোর সম্মানে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ হল। তোজো সতেজে ঘোষণা করলেন: ভারতবর্ষে জাপানের কোনো উচ্চাভিলাষ নেই—না সাম্রাজ্যিক, না অর্থনৈতিক। সমস্ত বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ

স্বাধীন হবে। সে স্বাধীনতার সংগ্রামে সর্বাত্মক সাহায্য করবে জাপান। তবে আর কথা কী! জাপান-ভারত সাহায্য সংস্থা 'হিকারী কিকন'-এর লোকেরা আজাদ হিন্দের স্বাধীন সরকারের প্রস্তাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল কিন্তু নেতাজী তা গ্রাহ্য করেননি, কেননা তিনি জানেন মূল গায়েন হচ্ছে তোজো, আর তোজো যদি পক্ষে থাকে তাহলে ওসব ভুয়ো আপত্তি ধোপে টিকবে না। আর জাপানের এখন এমন অবস্থা আজাদ হিন্দ প্রতিষ্ঠানকে পরিপূর্ণ মদত না দিয়ে তার পথ নেই।

তাই তো সবাই দেখল। তোজো সর্বস্বপণ প্রতিশ্রুতি দিতে কার্পণ্য করল না।

নয়ই জুলাই আজাদ হিন্দের এক বিরাট সভা আহ্বান করলেন নেতাজী। প্রায় ষাট হাজার লোকের সমাবেশ। সে কী উৎসাহ, কী প্রাণাবেগ! প্রচণ্ড ধারাবর্ষণ শুরু হল। কিন্তু নেতাজী বিরত হলেন না। ক্রমাগত জনতাও মন্ত্রমুগ্ধের মত দৃঢ়বদ্ধ হয়ে রইল। এককর্ণে শুনল নেতাজীকে।

'সাথিয়োঁ ঔর দোস্তোঁ—' সবাইকে প্রাণের মধ্যে ডেকে নিলেন নেতাজী। বললেন: 'আপনাদের কাছে আমি সব কথা প্রাণ খুলে বলতে চাই—কেন আমি ঘরবাড়ি ছেড়ে এই ভয়াবহ দুর্গম পথে বেরিয়ে পড়েছি।

কারাবাস আমার গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল, এ পর্যন্ত আমি এগারো বার কারাবন্দী হয়েছি। কিন্তু এ বার, শেষবার, কারাগারে বসে আমার মনে হতে লাগল দেশের বাইরে গিয়ে স্বাধীনতার চেষ্টা না করলে হবে না। দেশের বাইরে যেতে হলে কারাগারের বাইরে আসা দরকার। তা কী করে সম্ভব? আমি অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম। সাত দিন অনশনের পর সরকার আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেন। সুস্থ করে তুলে আমাকে ফের জেলে পোরবার আগেই আমি তাদের নাগাল এড়িয়ে চলে গেলাম।

দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্যে কী উপায় অবলম্বন করেছি তা জগৎবাসী ভারতবাসী এমন কি আমাদের শত্রুকেও মুক্তকণ্ঠে জানাবার দিন আজ এসেছে। কত বড় গৌরবের দিন আজ। আমরা এমন এক শক্তিশালী ফৌজ গড়েছি, গড়তে চলেছি, যা ভারতে মোতায়েন বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করবার স্পর্ধা রাখে। শুধু আক্রমণ করবার নয়, পরাস্ত করবার।

আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লব শুরু হবে আর সে বিপ্লব শুধু জনসাধারণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না, বৃটিশ মাইনেখোর ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়বে। ভিতরে-বাইরে এই যুগপৎ আক্রমণে পরভোজী বৃটিশ ভারত থেকে বিতাড়িত হবে।

পূর্ব এশিয়ায় ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় আছে, সামরিক প্রয়োজনে তারা তাদের সমস্ত সম্পদ নিয়োজিত করুক। আজ থেকে আমাদের আওয়াজ হোক: সর্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্য সর্বশক্তির বিনিয়োগ। আমার লক্ষ্য তিন লক্ষ সৈন্য আর তিন কোটি ডলার।'

চতুর্দিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল, দাও-দাও—সর্বস্ব দেবার অর্ঘ্য-মন্ত্র। কে এই পুরুষোত্তম যার ডাকে বিত্তবৈভব দূরের কথা, প্রাণ পর্যন্ত ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে। কে এমন করে টানে, উদ্বেলিত উদ্বোধিত করে তোলে!

মধ্য রাত্রি পার করে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ডেরায় ফিরছেন নেতাজী, হঠাৎ রাস্তার মাঝে তাঁর গাড়ি বিগড়ে গেল।

খুটখাট অনেক চেষ্টা করল ড্রাইভার, কোনোই সুরাহা হল না। এখন কী উপায়! এই

ব্ল্যাক-আউটের রাতে কোথায় সে সাহায্য পায়। আশে-পাশের লোকালয় সমস্ত নিঝুম নিদ্রিত। গাড়িতে নেতাজীকে একা রেখে যে দূরে-অদূরে সাহায্যের সন্ধান করবে সেটাও সম্ভব নয়।

কী করা যায় তাহলে। নেতাজীর দিকে তাকাল ড্রাইভার। নেতাজী অচঞ্চল। ধ্যানাসীন। তিনি জানেন তিনি এমন কোনোই বিপদে পড়বেন না যার থেকে ত্রাণ নেই। বিপদে যিদি ফেলবেন তিনিই শ্রীপদে আশ্রয় দেবেন। ঠিক তাই। সিঙ্গাপুরের বড় মোটর ব্যবসায়ী হরগোবিন্দ সিং তার মোটর সাইকেলে এসে হাজির। এ যে ফৌজী গাড়ি। কী হয়েছে? গাড়ি চলছে না। যাবে কোথায়? গাড়িতে কে আছে? সর্দারজী তাকাতে গিয়েই একেবারে প্রস্তরভূত। নেতাজী! মধ্যরাতে মূর্তিমান সূর্য!

হরগোবিন্দ নত হয়ে প্রণাম করল নেতাজীকে। বললে, আমি সব ব্যবস্থা করছি। মোটর সাইকেলে বেরিয়ে গিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে এল—সঙ্গে তিন-চারজন মজুর। মজুরেরা ফৌজী গাড়িটাকে ঠেলে-ঠেলে সর্দারজীর রিপেয়ারিং গ্যারেজে নিয়ে যাবে, সারিয়ে ফেরত দিতে বড়জোর সকাল। ফৌজী গাড়ির দাবি সর্বাগ্রগণ্য।

আপন আমার গাড়িতে আসুন! হরগোবিন্দ বললে সসম্ভ্রমে।

নেতাজী পৌঁছে গেলেন নিরাপদে।

পরদিন সকালে সারানো গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন হরগোবিন্দ। মেরামত করতে কত খরচ পড়েছে জানতে চাইলেন নেতাজী।

হরগোবিন্দ হাত জোড় করে বললে, 'গোস্তাকি মাপ করবেন।'

সে কী কথা! মোটর সারানো তোমার ব্যবসা। তুমি তোমার ন্যায্য প্রাপ্য বুঝে নেবে না কেন?

কী বলছে তা বুঝি হরগোবিন্দ জানে না। বললে, আপনি তো আজাদী লড়াইয়ে সকলের কাছ থেকে দান নিচ্ছেন। আমার এ ক্ষুদ্র মেহনতি—

কী বলছেন তা বুঝি নেতাজীরও অজানা। বললেন, তোমার মত বড় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঐটুকু শুধু নিলে তোমার অসম্মান হবে না?

তাহলে কত দেব? কাউকে বলতে হল না। হরগোবিন্দ অস্থির হয়ে উঠে সংখ্যাটা একপলকে নিজেই স্থির করল। হিপ-পকেট থেকে চেক-বই আর কলম বার করে একটা চেক কেটে নেতাজীকে দিলে।

নেতাজী দেখলেন—দশ হাজার ডলারের বেয়ারার চেক।

নয়ুই জুলাই সেই বর্ষাস্নাত সভাতেই নেতাজী ঘোষণা করলেন, এখান থেকে একটি ভারতীয় নারী বাহিনীও গড়ে তুলতে চাই। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধে ঝাঁসির রাণী যেমন করে অস্ত্র ধরেছিলেন ঠিক তেমনি করেই আমাদের বীরাঙ্গনারা অস্ত্র ধরবেন। মৃত্যুভয় কাকে বলে তা তাদের মনেও পড়বে না। আর কলকাতায় যখন আমাদের সেনাবাহিনী প্রবেশ করবে, অগ্রবর্তিনী হবে এই রাণীর দল। প্রথম ক্যাম্প সিঙ্গাপুরে। পরে রেঙ্গুনে। রেঙ্গুনেও রাণীবাহিনী। নেতাজী যখন ফ্রন্টে গেলেন, সেখানেও ঝাঁসির রাণীরা রণসজ্জিত, উদ্যতাস্ত্র। একেবারে গুলিগোলার এলাকায়। কোহিমার কাছাকাছি, হটে যেতে হবে।

জাপানী কর্তারা নেতাজীকে বললে, রেঙ্গুনও ছেড়ে চলুন।

নেতাজী বললেন, না, নড়ব না, এইখানেই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাব।

জাপানী সমরবিশারদরা বৈঠকে বসল। নেতাজীকে বোঝাল রেঙ্গুন ত্যাগ করাই এখন যুদ্ধসঙ্গত। বললে, আপনাকে প্লেন দিচ্ছি, আপনি ব্যাঙ্ককে চলে যান।

'কিন্তু তার আগে ঝাঁসির রাণীবাহিনীর মেয়েদের সরাতে হবে।' নেতাজী সন্ধিৎসু হলেন : তার ব্যবস্থা কী ?

'ওদের জন্যে ট্রেন আসবে। ট্রেনে করেই ওরা যাবে নির্বিঘ্নে। আপনি চলুন।'

'আগে ওরা যাক, পরে আমি।'

এই না হলে নেতা। এই না হলে দেশসেবক। ওরা সব যে আমার মা-বোন, আমার ঘরের প্রদীপ। জাপানীরা নেতাজীকে আর কিছু সাহায্য দিক না দিক, রাণীবাহিনীর সৈনিকদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন সুগম করে দিক। ওরা নির্বিঘ্ন না হওয়া পর্যন্ত আমার নিরাপত্তা নেই।

রাণীবাহিনীর মেয়েরা ঠিক করেছিল তারা রেঙ্গুনেই থেকে যাবে—তাদের সদরদপ্তর একটি পরিত্যক্ত স্কুলবাড়িতে। এখানে থেকেই তারা যুদ্ধ করতে পারবে—যাকে বলে স্ট্রিট ফাইটিং। পথে-পথে ব্যারিকেড তৈরি করে শত্রুবাহিনীর অগ্রসরণকে বাধা দিতে পারি। মলোটোভ ককটেল ছুঁড়ে পারি ওদের সাঁজোয়া গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে। করতে পারি আরো অনেক প্রতিরোধের জল্পনা। কিন্তু ফৌজী আদেশ যদি স্থানান্তরের কথা বলে ? স্থানান্তরিত করবে কী করে ? অন্য যানবাহন জোগাড় হবে কোথায় ? তবে ? ভয় ? যারা মৃত্যুতে বৃত তাদের অকৃত কী !

রাণীবাহিনীর কম্যাণ্ডার লেফটেনেন্ট জানকী থিবার্স নেতাজীর সঙ্গে দেখা করল। বিনয়স্মিত স্নিগ্ধ মুখে বললে, আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।

নেতাজী কি একটু অপ্রস্তুত হলেন ? বললেন, বলো কী চাই।

'পাঁচশোটি বুলেট। আমাদের বাহিনীর প্রত্যেকের জন্যে একটি। জীবন্ত ধরা পড়বার আগে যাতে সেটি নিজের উপর প্রয়োগ করা যায়। জানি কত কষ্ট করে সমরোপকরণ জোগাড় করছেন আপনি, তবু—' একটু কি কুণ্ঠিত হল থিবার্স—'এ আমার শেষ ভিক্ষা, শেষের ভিক্ষা।'

নেতাজী এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন না। বললেন, 'দেব। পাবে।'

তার বুঝি দরকার হল না। রাণীবাহিনীর মেয়েদের জন্যে ট্রেন আসছে। ট্রেন ওদের রেঙ্গুন থেকে ওয়া-য় নিয়ে যাবে।

রাত প্রায় দশটা। নেতাজীর বাঙলোয় কে এসে খবর দিল রাণীবাহিনীর মেয়েদের স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু তারা প্ল্যাটফর্মে দু-তিন ঘণ্টা বসে আছে, ট্রেনের দেখা নেই। শেষ পর্যন্ত যদি বা একটা ট্রেন এসেছিল মেয়েদের বলা হল এতে তাদের জায়গা হবে না।

শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন নেতাজী। এমনতরো রাগ তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক কিন্তু এখনকার অবস্থাটাই তো বিপরীত। তিনি প্রচারসচিব আয়ারকে ডেকে বললেন, 'আপনি এখুনি জাপ-মন্ত্রী হাচাইয়ার সঙ্গে দেখা করুন। বলুন ঝাঁসির রাণীদের স্থানান্তরিত করা না হলে আমি রেঙ্গুন ছাড়ব না। আর সেটার কী ফল দাঁড়াবে তা যেন তারা ভেবে দ্যাখে। বলবেন, জাপ সরকারের কাছ থেকে আমি আর কোনো সাহায্য চাইব না, এই আমার শেষ ভিক্ষা।'

আয়ার ছুটে গেল হাচাইয়ার কাছে। হাচাইয়া ছুটল জেনারেলন ইসোডার কাছে। ইসোডা নেতাজীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন যে ট্রেনে রাণীবাহিনীদের নিয়ে যাওয়ার কথা হয়েছিল পথিমধ্যে শত্রুপক্ষের বোমায় তার এঞ্জিন বিধ্বস্ত হয়েছে সুতরাং ট্রেনযোগে মেয়েদের

সরানো সম্ভব হচ্ছে না। আমি ট্রাক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নেতাজী কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। আয়ারকে বললেন, তুমি, তৈরি হয়ে নাও, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

আমাদের সঙ্গে! নেতাজী ও তাঁর প্রধান পারিষদদের নিয়ে যাবার জন্যে গাড়িগুলি তো সন্ধে থেকেই মজুত, কিন্তু রাণীবাহিনীর জন্যে ট্রাক আগে আসুক, তবে গাত্রোত্থান।

কিন্তু রাত গড়িয়ে যাচ্ছে, ট্রাক কই? সামরিক পোশাকে তৈরী হয়ে বসে আছেন নেতাজী, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কাছাকাছি তাঁর প্রধান পার্শ্বচর, কিন্তু ট্রাকের নাম-গন্ধ নেই।

রাত সাড়ে চারটে—নেতাজীর ধ্যান ভাঙল। ট্রাক এসেছে। বারোখানা ট্রাক।

নেতাজী মৃদু হাসলেন। বললেন, 'এখন তবে একটু শোওয়া যাক। কাল সবাইকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।'

পয়লা অগাষ্ট বর্মার স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিলেন নেতাজী। নবগঠিত বর্মা সরকারকে ভারতবর্ষের শুভেচ্ছা স্বরূপ দু লক্ষ টাকা উপহার দিলেন।

বললেন, 'এই বর্মায় মান্দালয় জেলে ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ প্রায় তিন বছর আমি বন্দী ছিলাম। জেলের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই বর্মার প্রাচীন রাজপ্রাসাদ আমার চোখে পড়ত। ভাবতাম, করে আবার বর্মা স্বাধীন হবে, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ ইতিহাসের নির্দেশে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। সন্দেহ কী, ভারতবর্ষের স্বপ্নও নিষ্ফল হবে না।

একদিন বৃটিশ ভারতবর্ষকে ঘাঁটি করে বর্মা জয় করেছিল আজ সেই বর্মাকে ঘাঁটি করে আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করব। ভারত ও বর্মা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। ভারতবাসী স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এশিয়ার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না। এশিয়ায় আমরা পরস্পরের প্রতি প্রীতিপ্রেরিত হলেই এশিয়া এশিয়াবাসীর হবে।

ব-ম বর্মার ভাবী প্রধানমন্ত্রী। জাপান আক্রমণে রেঙ্গুনের পতন যখন আসন্ন তখন ইংরেজ ঠিক করল মারাত্মক বন্দী ব-মকে ভারতের কারাগারে চালান করে দেবে। কিন্তু কারাগারের দরজা খুলে দেখল ব-ম পালিয়েছে।

ব-ম বলছে সুভাষ সম্পর্কে: সবার চেয়ে মাথায় উঁচু, কী দীর্ঘকায় প্রাণবন্ত কান্ত-মূর্তি এই সুভাষচন্দ্র অথচ সবার সঙ্গে এমন স্বচ্ছন্দে কথা কইছেন যেন সকলেরই তিনি একজন। সামরিক শক্তি ও মর্যাদায় মণ্ডিত হয়ে দাঁড়ালেই যে ব্যক্তিত্ব একটি মহৎ স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুভাষচন্দ্র তারই বলিষ্ঠ উদাহরণ।

বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা জেনে নেতাজী অস্থির হয়ে উঠলেন। ঘোষণা করলেন ভারতের বন্দরে নির্বিঘ্নে ভিড়তে পারবে এমন যদি কোনো সরকারী প্রতিশ্রুতি পান তাহলে তিনি এক জাহাজ চাল—এক লক্ষ টন—পাঠাতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তাতে কর্ণপাত করল না। দ্যাখো ইংরেজের মনোভাব। দেশকে তারা না খাইয়ে মারবে, তবু সুভাষের চাল তারা নেবে না। এ চালের ভাত খেলে যদি মরন্ত বাংলা স্বাধীনতার ক্ষুধায় আরো মরীয়া হয়ে ওঠে।

পঁচিশে অগাষ্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিক ভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সার্বিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। সৈনিকদের উদ্দেশ করে জারি করলেন তাঁর বিশেষ হুকুমনামা: ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থে ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কল্যাণমানসে আজ থেকে আমি আপনাদের ফৌজের

প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব গ্রহণ করছি। এ আমার পক্ষে পরম আনন্দ ও গৌরবের কথা, কেননা কোনো ভারতীয়ের পক্ষে ভারতের মুক্তি ফৌজের সেনাধিনায়ক হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান আর কিছুতে হতে পারে না। আমি নিজেকে আমার দেশের নানা ধর্মাবলম্বী আটত্রিশ কোটি অধিবাসীর সেবক বলে মনে করি। আমি আমার কর্তব্য এমনি ভাবে সম্পাদন করতে চাই যাতে এই আটত্রিশ কোটি লোকের স্বার্থ আমার হাতে অক্ষুণ্ন থাকে, যাতে আমার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে তারা শান্তিতে বাস করতে পারে। বিশুদ্ধ জাতীয়তাবোধ, নিরঙ্কুশ ন্যায় ও উদার নিরপেক্ষতার ভিত্তিতেই ভারতের সত্যিকার মুক্তি ফৌজ গড়ে উঠতে পারে। আমাদের একটাই লক্ষ্য—তা হল ভারতের স্বাধীনতা, আর আমাদের একটাই সংকল্প মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন উঠে দাঁড়াবে মনে হবে যেন গ্রানাইট পাথরের একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে, আর আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন মার্চ করে এগিয়ে যাবে মনে হবে যেন একটা স্টিমরোলার চলেছে। আমাদের কাজ সহজ নয়, আমাদের সংগ্রাম হবে কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু আমাদের আদর্শ ন্যায্য ও অপরাজেয়। সুতরাং ভয় নেই, আমাদের জয়ও অবধারিত। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে জন্মগত অধিকার লাভে আমাদের প্রতিহত করতে পারে। আমাদের অভিযান শুরু হয়ে গেছে। যতক্ষণ না নয়াদিল্লীর লাটভবনে আমাদের জাতীয় পতাকা উড়ছে, যতক্ষণ না লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের ক্ষান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। চলো দিল্লী চলো।

দোসরা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষে ফারার পার্কে বিরাট জনসভায় ভাষণ দিলেন নেতাজী : মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার নবতন পথপ্রণেতা—তিনি পথ, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য। ভারতবর্ষকে তিনি দুটো জিনিস শিখিয়েছেন— এক, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধে, দুই, সঙ্ঘবদ্ধতা। স্বাধীনতা লাভের জন্য এ দুটোই অপরিহার্য। আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ বলেই ভারতবাসীর হৃদয়ে জ্বলছে বিপ্লবের আগুন আর তার শিখা দূর-দূরান্তে নিভৃত পল্লী অঞ্চলেও শাখা মেলেছে। প্রথম অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার সময় তিনি বলেছিলেন ভারতের হাতে যদি তলোয়ার থাকত তাহলে সে তলোয়ার হাতে নিয়েই যুদ্ধে নামত। মহাত্মা এখন কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করছেন কিন্তু কালচক্রে ভারতীয়দের হাতে তলোয়ার এসে গেছে, গড়ে উঠেছে আজাদ হিন্দ ফৌজ, স্বাধীন ভারত সেনাবাহিনী—জয়ের আর সংশয় কোথায় ? মহাত্মার স্বপ্ন সফল হতে আর দেরি নেই।

উনিশে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা-পত্র রচনা করলেন নেতাজী। সে এক অমানুষিক ব্যাপার। রাত প্রায় দশটা। নেতাজী তাঁর প্রচার সচিব আয়ারকে বললেন টাইপরাইটার নিয়ে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে। সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা-পত্র রচিত হবে। নেতাজীর স্টাডি-রুমের পাশে একটা কালি ঘরে আয়ার স-সরঞ্জাম নিয়ে অপেক্ষা করছে কিন্তু নেতাজী তাকে ডাকছেন না। কারা কারা আসছে, নেতাজীর সঙ্গে দেখা করে চলে যাচ্ছে স্পষ্ট কিছু বোঝবার জো নেই। ঘুম পাচ্ছে আয়ারের, মনে হচ্ছে আজ রাত্রে কিছু হবে না। মাঝরাতে ডাক পড়ল।

ছোট একটা ঘর, লম্বায়-চওড়ায় বড়জোর তেরো-চোদ্দ হাত। মাঝখানে ছোট একটি টেবিল, টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে, বাঁ পাশে একটা রেডিও। পিছনে দেয়াল ঘেঁষে একটা বইয়ের আলমারি। একটা চেয়ারে নেতাজী বসে আছেন, টেবিলের দুপাশে আরো দুটো চেয়ার। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নেতাজী আয়ারকে বললেন, বোসো।

আয়ার বসল।

'কোত্থেকে আরম্ভ করি বলো তো?' নেতাজী যেন একটু চিন্তায় পড়লেন: 'এতক্ষণ এতটুকু একটুও ভাববার সময় পাইনি। কিন্তু আজ রাত্রেই ওটা শেষ করতে হবে। দেরি করা চলবে না। ঘোষণা পত্রের সঙ্গে একটা বিবৃতিও থাকা দরকার।'

নেতাজী এক গোছা শাদা কাগজ তুলে নিলেন, আর একটা পেন্সিল। কফির কাপে আরেকবার চুমুক দিলেন। ঝুঁকে পড়ে নিজেই দ্রুতবেগে লিখে চললেন: 'বৃটিশের হাতে বাংলা দেশে ১৭৫৭ সালে প্রথম পরাজয়ের পর ভারতীয় জনগণ শতবর্ষ ধরে নিরবচ্ছিন্ন কঠিন সংগ্রাম করে আসছে। ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে কত শত বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত। বাংলার সিরাজউদ্দৌলা আর মোহনলাল, দক্ষিণ ভারতের হায়দর আলি, টিপু সুলতান আর ভেলু অম্পি, মহারাষ্ট্রের আপ্পাসাহেব ভোঁসলে আর পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগমবৃন্দ, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিং আতারিওয়ালা, এবং সেই সঙ্গে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া তোপী ডুমরাওয়ের মহারাজা কুনওয়ার সিং আর নানা সাহেব—এমনি আরো বীরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে—'

কাগজ থেকে একবারও চোখ তুললেন না নেতাজী, কী লিখেছেন একবারও চোখ বুলোলেন না, অবলীলায় প্রথম পৃষ্ঠাটা আয়ারের হাতে দিয়ে কাগজের দ্বিতীয় পাতায় পেন্সিল চালালেন। প্রথম পৃষ্ঠার শেষ বাক্যটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তারও খোঁজ নেবার প্রয়োজন নেই। আয়ারের মনে হল এ এক দৈবপ্রেরিত মহাপুরুষ।

পাশের ঘরে টাইপ করতে বসল আয়ার। আশ্চর্য, কোথাও একটু কাটাকুটি নেই, তোলা-পাঠ নেই, নিখুঁত নির্ভুল। টাইপ শেষ হতে না হতেই আবিদ হাসান নিয়ে এল দ্বিতীয় পৃষ্ঠা। দ্বিতীয়ের পর দ্রুত গতিতে চলে এল তৃতীয়। প্রথমের মত দ্বিতীয় তৃতীয়ও ভ্রান্তিহীন, অমলিন। এমনি করে একেকটি পৃষ্ঠা শেষ হয় আর চলে আসে আয়ারের কাছে। পরের পৃষ্ঠা লেখবার আগে আগের পৃষ্ঠাটা একবার দেখে স্মৃতিশক্তিকে যাচাই করে নেবার কথাও ভাবেন না নেতাজী। সমগ্র লেখায় একটি শব্দেরও নড়চড় নেই, না একটি কমা-ফুলস্টপের। না বা কোথাও পুনরাবৃত্তি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা এক চেয়ারে বসে অনর্গল অনবদ্য ভাষায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তৈরি করলেন একটা সুদীর্ঘ দলিল। কী তীক্ষ্ণ মননশক্তি, কী মেধা, কী ইতিহাসচেতনা! সর্বোপরি কী স্বচ্ছন্দ লিখনভঙ্গি!

লেখা যখন শেষ হল তখন সকাল প্রায় ছ'টা। সারা রাত ধরে ক কাপ কফি খেয়েছেন নেতাজী—দুধ-ছাড়া কালো কফি—তা কেউ বলতে পারে না। কফি হচ্ছে তাঁর রাত জেগে কাজ করার পরিমাপ। রাতে তাঁর কফি খাওয়ার বহর দেখে অনুমান করা যায় কটা পর্যন্ত তিনি কাজ করবেন, না কি ভোর হয়ে যাবে!

হুবহু টাইপ করল আয়ার। টাইপের আগে রচয়িতা মূল দলিল একবার পড়ে দেখে না এ অভিনব ব্যাপার। আয়ার ভাবল টাইপের পর নেতাজী দলিলটা পড়ে নিশ্চয়ই কিছু সংশোধন-প্রসাধন করবেন। নেতাজী সমস্তটা পড়লেন মনোযোগ দিয়ে কিন্তু কোথাও এক বিন্দু আঁচড় টানলেন না। বললেন, ঠিক আছে।

ধীরে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। বললেন, এবার শুতে যাব। তুমি দলিলটার ছাপার ব্যবস্থা করো।

একুশ অক্টোবর, ১৯৪৩, সকাল সাড়ে দশটায় সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিংসএ ঐতিহাসিক

অধিবেশন বসল। সে কী বর্ণাঢ্য উৎসব! স্বর্গ থেকে দেবতাদের চোখ ফেলে দেখবার মত! দেড়ঘণ্টা ধরে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন নেতাজী: অস্থায়ী সরকার গঠনের পিছনে অসামরিক জনসাধারণের সমর্থন তো আছেই, বৃটেনের অধীন ভারতীয় সৈনবাহিনীর বৃহৎ একটা অংশও এর স্বপক্ষে। একবার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করতে পারলেই দেশ জুড়ে সত্যিকার বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে যার আঘাতে বৃটিশ রাজত্বের চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না।

সে কী উদ্দীপনা! মনে হল স্বাধীনতা বুঝি আর কথার কথা নয়, একেবারে মুঠোর মধ্যে।

অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ সরকার গঠিত হল এই ভাবে: রাষ্ট্রপতি স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। তদুপরি তিনিই প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধ ও পররাষ্ট্রসচিব। নারীবাহিনী-গঠনের ভার পড়ল ক্যাপটেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের উপর। অর্থসচিব হলেন লেফটেনেন্ট কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জি। প্রচার সচিব এস. এ. আয়ার। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি হলেন এন.এম. ভগত, জে. কে. ভোঁসলে, গুলজার সিং, এম. জেড. কিয়ানি, এ.ভি. লোগনাথন, ইশান কাদের আর শা নওয়াজ খান—সবাই লেফটেনেন্ট কর্ণেল। মন্ত্রীর সমমর্যাদায় সেক্রেটারি এ. এম. সহায়। আইন বিষয়ে উপদেষ্টা এ.এন. সরকার। প্রধান পরামর্শদাতা রাসবিহারী বসু এবং তাকে সাহায্য করবেন করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান, ইয়েলাপ্পা, ঈশ্বর সিং আর থিবি।

বৈকালিক অধিবেশনে ঘোষণাপত্র পড়া হল। প্রাচ্যের কূটনীতিবিদ নেতারা সবাই উপস্থিত—উপস্থিত কর্ণেল ইয়ামামোতো। জাপানীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দশটি জঙ্গী বিমানের দাম দিতে চাইলেন নেতাজী। আজাদ হিন্দ সরকার কারু বশংবদ রাষ্ট্র নয়, তারা দশ-দশটি বিমান উপহার দিতে পারে, বাংলা দেশে লক্ষ টন চাল পাঠাবার মত ক্ষমতা রাখে।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে নেতাজী শপথ গ্রহণ করলেন: 'ঈশ্বরের নামে আমি, সুভাষচন্দ্র বসু, এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে ভারতবর্ষকে ও আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্যে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রাম করব। আমি চিরদিন ভারতের সেবক থেকে আমার আটত্রিশ কোটি ভাই-বোনের মঙ্গলসাধনে আত্মনিয়োগ করব। স্বাধীনতা লাভের পরেও সেই স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার সঙ্কল্পে আমি আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকব।'

মন্ত্রিসভার সদস্যেরাও নেতাজীর সামনে দাঁড়িয়ে একে একে শপথ নিলেন: 'ঈশ্বরের নামে আমি এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে আমি ভারতবর্ষ ও আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর স্বাধীনতা লাভের জন্যে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকব ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে সেই স্বাধীনতার সংগ্রামে আমার জীবন ও যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করতে দ্বিধা করব না।'

সমবেতকণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হল—'জনগণমনে'র হিন্দি অনুবাদ: 'শুভ সুখ চয়ন কী বরখা বরষে ভারত ভাগ হৈ জাগা'—আর গান শুরু হতেই যে যেখানে ছিল সবাই উঠে দাঁড়াল। নেতাজী, ইয়ামামোতো আর মন্ত্রিসভার সদস্যেরা সবাই য়্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন খাড়া হয়ে। চতুর্দিকে হর্ষধ্বনি উঠল, উঠল নানা স্লোগানের আওয়াজ, অন্তরমথিত আবেগের হোমশিখা। দুর্জয়, অশাসনীয়।

তেইশে অক্টোবর মধ্যেরাত্রে আজাদ হিন্দ সরকার বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ ঘোষণা করল। পঁচিশে অক্টোবর ফৌজের বিরাট জনতার মুখোমুখি হয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে এ শুভ সংবাদ ঘোষণা করলেন নেতাজী। বললেন, যুদ্ধ যুদ্ধই। আমৃত্যু যুদ্ধ—আমুক্তি যুদ্ধ। পঞ্চাশ হাজারের জনতা প্রবল আনন্দে ঘোষণাকে সম্বর্ধনা জানাল। পনেরো মিনিট ধরে চলল এই উন্মাদনা—মরণোন্মাদনা। নেতাজী বললেন, যে যেখানে আছেন সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে হাত তুলুন, হাত তুলে অনুমোদন জানান।

নিমেষে এত হাত উঠল মনে হল যেন আকাশটাকে একটানে ছিনিয়ে আনবে।

সবার মুখে এক মন্ত্র : দিল্লী চলো।

ক্রমে ক্রমে নানাদেশ স্বীকৃতি দিল আজাদ হিন্দ সরকারকে। জাপান, বর্মা, ক্রোশিয়া, জার্মানি, মাঞ্চুকু, নানকিন, ফিলিপিন, থাইল্যাণ্ড। অভিনন্দন পাঠালেন ডি ভ্যালেরা।

যুদ্ধের জন্যে চাই সমরোপকরণ। সৈন্যের ভরণপোষণ। সাজসজ্জা, শিক্ষা-দীক্ষা, চর্চা-চর্যা। একরাজ্যের আয়োজন—এক রাজ্যের টাকা। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। কে এক জাদুকর কী এক মন্ত্রোচ্চারণ করেছে—সবাই সর্বস্ব দিয়ে দেবার নেশায় মেতে উঠল। এ তো শুধু মন্ত্র নয়, এ মূর্তি। এ তো শুধু প্রার্থনা নয় এ পরিপূর্ণতা! যে নিজে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে সেই পারে সর্বস্বান্ত হবার ডাক দিতে। যে ফকির হতে পারে সেই বলতে পারে আমিরি হটাও।

যেখানে যে ভারতীয় আছে ব্যাঙ্ককে সাইগনে সিঙ্গাপুরে রেঙ্গুনে পেনাংএ কুয়ালালামপুরে সাংহাইয়ে ক্যাণ্টনে টাকার থলে খুলে ধরল। রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যবসাদার হাবিব সাহেবই একা এক কোটির উপর টাকা ঢেলে দিল। কে না দিয়েছে? ব্যবসায়ীরা দেবে—লাখ-লাখ দেবে ভূপেন চৌধুরী আটচল্লিশ লাখ বা নিজামি সাহেব সাতাশ লাখ—এ আর বেশি কথা কী। ইঞ্জিনিয়র বি ঘোষ তো তাঁর কারখানাটিই দিয়ে ফেললেন যেমন তাঁর রবার বাগানের এক চতুর্থাংশ স্বত্বই দিয়ে ফেললেন উত্তম সিং। শুধু বিত্তবানেরাই নয় ছাপোষা সাধারণ মানুষও পিছিয়ে রইল না। উকিল ডাক্তার কেরানি শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী দোকানি-ফিরিওলা মুটে-মজুর ধোপা-নাপিত, পূর্ব এশিয়ার সর্বস্তরের সমস্ত সমাজ যেন কী দেবে কত দেবে—বিপুল এক বিসর্জনের নেশায় মেতে উঠল। অলক্ষ্যে চলতে লাগল প্রতিযোগিতা।

অলক্ষ্যে নয়, প্রকাশ্যে, উন্মুক্ত জনসভায়।

উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের ২৬শে জানুয়ারি রেঙ্গুনে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং প্রাঙ্গণে বিরাট জনসভায় নেতাজী ভাষণ দিচ্ছেন। রেঙ্গুনে এই তাঁর প্রথম জন-সম্ভাষ। উপস্থিত যাট হাজার লোক মন্ত্রস্পন্দিত, স্তব্ধীভূত।

নেতাজীকে তারা শুধু কানে শুনছে না, চোখে দেখছে। কখনো কখনো চোখ যে শোনে কান যে দেখে এই বুঝি তেমনি একটা সময়।

চন্দ্রমল্লিকা আর গোলাপে গাঁথা প্রকাণ্ড একটা মালা সভার তরফ থেকে নেতাজীর গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেতাজী মালাটা খুলে রাখলেন সিটের উপর। প্রথমটা গ্রাহ্য করলেন না, এগিয়ে গেলেন মাইকের কাছে। বক্তৃতান্তে যখন বসতে যাচ্ছেন তখন মালার উপর তাঁর নজর পড়ল, মালার মূল্যবত্তার উপর। মাইকের দিকে আবার এগোলেন নেতাজী। জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা এই মালাটি আমাকে উপহার দিয়েছেন। মালা হিসেবে কী এর দাম, দুদিনেই এর ফুলগুলি শুকিয়ে কালো হয়ে যাবে। কিন্তু এই মালাটি আসলে বর্মাবাসী স্বাধীনতাকামী মানুষের সংগ্রাম লিপ্সার প্রতীক—সেই হিসেবে এর দাম অপরিসীম। আমি এই

মালটিকে নিলাম করতে চাই। এর অর্থমূল্য যা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ ফাণ্ড খোলা হবে। আসুন, ডাক দিন।

সর্দার হরগোবিন্দ সিং জাপানী সৈন্যবাহিনীতে ঠিকেদারির কাজ করে, মজুর জোগান দিয়ে বিস্তর অবস্থা করেছে, সে বলে উঠল, আমি কিনব—এক লাখ ডলার।

সিঙ্গাপুরের চেট্টিয়ার ধনকুবের ব্রিজলাল হাঁক দিলেন : দু লাখ ডলার।

নেতাজীর বক্তৃতা কী ভাবে জনতাকে অনুপ্রাণিত করেছে, উদ্বেলিত সমুদ্র কী ভাবে কূল ছাপিয়েছে তা জলজ্যান্ত দেখল সকলে, বিস্ফারিত চোখে।

ডাক চড়তে-চড়তে পৌঁছুল গিয়ে সাত লাখে। এ ডাক শেষ ডাক। এ ডাক চেট্টিয়ার ব্রিজলালের। একটা ফুলের মালার দাম সাত লাখ ডলার। কিন্তু হরগোবিন্দ থামেনি। সে পথে বেরিয়ে থামতে জানে না।

বললে, 'আমার সমস্ত সম্পত্তির কত দাম হবে কাউকে হিসেব করতে বলুন। যোগ করে দেখুন তা সাত লাখ ডলারের বেশি হবে কিনা। আজাদ হিন্দ ফণ্ডে আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে বিনিময়ে ঐ মালাটি আমি চাই।'

'সমস্ত সম্পত্তি?'

'হ্যাঁ, সিঙ্গাপুরে আমার দুখানা বাড়ি, গ্যারেজ, খান আষ্টেক ট্রাক, আর ব্যাঙ্কে কম করে তিন-চার লাখের মত টাকা। দেখুন সব মিলিয়ে কত হতে পারে। আমি আমার শেষ কপর্দক বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হতে চাই।'

তুমুল কলরোল উঠল।

ব্রিজলাল কিছু বলতে যাচ্ছিল, নেতাজী নিরস্ত করলেন : 'সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে হরগোবিন্দ তো এখন ফকির হয়ে গিয়েছে। ফকিরের সঙ্গে ধনীর প্রতিযোগিতা কী! আপনি তো আর ওর মত ফকির হতে পারবেন না।'

ব্রিজলাল হটে গেল।

নেতাজী হরগোবিন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মালা তোমার। এস পরিয়ে দিই।'

মালা নিতে হরগোবিন্দ গলা বাড়াল না। নেতাজীর গলার মালা সে গলায় দোলাবে এ স্পর্ধা শোভা পায় না। হাত বাড়িয়ে নিয়ে মালাটা সে বুকের উপর চেপে ধরল, বললে, 'আপনার কাছে একটি ভিক্ষে চাই।'

যে এখন পথের ভিখিরি, তরুতল ছাড়া যার আশ্রয় নেই, যার অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ অবস্থা, তার ভিক্ষে ছাড়া গতি কী?

'কী ভিক্ষা?'

'আমাকে আজাদ হিন্দ ফৌজে ভর্তি করে নিন।'

সুভাষ হরগোবিন্দকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের বিরাট মন্দির সিঙ্গাপুরে। মন্দির-কমিটির হাতে বিস্তর পয়সা। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে একজন কর্তা-ব্যক্তি এসেছে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে। কী চাই? কিছু চাই না। আজাদ হিন্দ ফণ্ডে কিছু দিতে এসেছি।

শুনে খুব খুশি হলেন নেতাজী। বললেন, 'খুব ভালো কথা। আমি সব সময়ে উপযাচক হয়ে চাইব কেন? আপনারাই নিজেদের কর্তব্যবুদ্ধিতে দিয়ে যাবেন। যারা রক্ত দিচ্ছে তাদের

জন্যে কিছু অর্থ। তা টাকাটা কে দেবে?'

'মন্দির-কমিটি। কিন্তু একটি অনুরোধ আপনি আমাদের মন্দিরে যাবেন আর আনুষ্ঠানিক ভাবে টাকাটা আমারা আপনার হাতে তুলে দেব।'

নেতাজী দৃঢ় হলেন। বললেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পক্ষে কোনো সাম্প্রদায়িক মন্দিরে যাওয়া ঠিক হবে না।

কিন্তু আপনি তো হিন্দু, নেতাজী।

নেতাজী হাসলেন: সুভাষ বোস হিন্দু। কিন্তু নেতাজী কোনো সম্প্রদায়ের নয়, নেতাজী সর্বভারতের।

বেশ, তবে সুভাষ বোস হিসেবেই চলুন।

তা হলে ব্যক্তিগত সাধারণ পোশাকে যাব, ফৌজী পোশাকে নয়। আর সে অবস্থায় আপনাদের থেকে টাকা নেওয়াও সম্ভব হবে না। তাতে আবার মন ওঠে না মন্দির কমিটির। আমরা যে টাকাটা নেতাজীকে দিতে চাই।

বেশ, নেতাজী যাবেন আর সেই সঙ্গে তাঁর সহকর্মীরাও যাবেন—মুসলমান খৃষ্টান শিখ—সকলে। সবাই মন্দির-চত্বরে সমবেত হবে, সর্বসমক্ষে অনুষ্ঠান হবে সেখানে। কি, রাজি?

চট করে রাজি হওয়া কি সম্ভব? বিধর্মীদের কি মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢুকতে দেওয়া যায়? ঢুকতে কোনোদিন দেখেছে কেউ? যাই সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি। নেতাজীর অনুচরেরা প্রমাদ গুনলেন। নেতাজীর এই চালটা বোধহয় ঠিক হল না। বেশ কিছু টাকা বুঝি ঠকতে হল।

'আমার বিবেকের দাম টাকার চেয়ে বেশি।' বললেন নেতাজী, 'আমি কোনো প্রদেশের বা সম্প্রদায়ের নই। আমি সমস্ত ভারতবর্ষের, সমস্ত ধর্মমতের। ভুলে যেও না আমার আওয়াজ জয় হিন্দ।'

পরদিন মন্দির-কমিটি সসম্মানে নিমন্ত্রণ করতে এল নেতাজীকে। চলুন আমাদের মন্দিরে সহচর পরিবৃত হয়ে। আমরা নেতাজীকে চাই।

সে এক অভিনব দৃশ্য। মন্দির-দ্বার অবারিত হল। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান শিখ সর্ব ধর্মের ভারতীয় সবাই ঢুকল অকাতরে। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল: জয় হিন্দ। কোনো অঞ্চলের বা গোষ্ঠীর জয় নয়—জয় সমগ্র ভারতবর্ষের। আমাদের এক ধর্ম—ভারত-প্রেম, এক সিদ্ধি—ভারত-মুক্তি।

চেট্টিয়ারের মন্দির থেকে পাওয়া গেল এক লক্ষ ডলার। চারদিকে দানের বহ্ন্যুৎসব পড়ে গেল। ভারতবর্ষের মুক্তির জন্যে সর্বস্বদানও যথেষ্ট নয়। জীবন বিসর্জনও যৎসামান্য।

সাইগনে একটি সিক্রি যুবক চাইল নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে। কে এ যুবক? কেউ তাকে চেনে না। নাম বলতে চায় না। কী চায়? নেতাজীর সঙ্গে গোপনে একটিবার দেখা করতে চায়। গোপনে? আশে-পাশে সবাই 'কিন্তু' করতে লাগল। কিন্তু নেতাজী অকুতোভয়। নিয়ে এস তাকে। গোপনেই দেখা হবে।

নিভৃতে দেখা হতেই নেতাজী যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?

'শুধু আপনাকে একবার চাক্ষুষ দেখতে চাই। আর চাই এই সামান্য প্রণামী আপনাকে নিবেদন করতে।'

নেতাজী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন যুবকটির হাতে একটি পাঁচ লাখ টাকার চেক।

'যদি দয়া করে চেকটা নেন কৃতার্থ হব।' যুবকটি বললে সবিনয়ে।

'তোমার নাম কী ?'

'আমার নামটা অজ্ঞাত থাক।' যুকবটি বললে দৃঢ়স্বরে, 'ভারতের মুক্তি যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে কত সৈনিকই তো নামহীন হয়ে আছে। তাদের মধ্যে আমি আর আমার দান! নাম উল্লেখ করতেও রুচি হয় না।'

পেনাঙে একটি কিশোর নেতাজীকে একটা ফুলদানি উপহার দিল। কিশোরকে তার মার দেওয়া এই ফুলদানি। তার নিজের বলতে এই শেষ সম্বল। নেতাজী নিলাম ডাকলেন। মার দেওয়া জিনিস। পবিত্র সম্পদ। ডাক চড়তে-চড়তে দাম উঠল এক লাখ পঁচিশ হাজার ডলার।

ব্যাঙ্ককে ভারতীয় গোয়ালারা তাদের অগণন গরু-মোষ দান করল। এ দান অভিনব। গরু-মোষগুলির থেকে যত দুধ পাওয়া যাবে সব যাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেবায়। গোয়ালাদের চলবে কি করে ? তারা ফৌজী বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ নেবে।

একটা ভিখারিনিও কম যায় না! সে তার জীবনের সঞ্চয় তিনটি টাকা নেতাজীর হাতে দিল। এই আমার সমস্ত। এ টাকাটা নিলে ভিখারিনির কষ্ট হবে সন্দেহ নেই। সেটা কায়িক কষ্ট। কিন্তু না নিলে যা কষ্ট পাবে তা আত্মিক কষ্ট—কায়িক কষ্টের চেয়ে বেশি। তাই নেতাজী ঐ দান প্রত্যাখ্যান করে ভিখারিনির দুঃখ বাড়াতে চাইলেন না। মাথা পেতে নিলেন তিন টাকা। কী তৃপ্তি, কী প্রশান্তি! ভিখারিনির চোখ জলে ভরে উঠল। নেতাজী তাকে ফিরিয়ে দেননি, তাকেও জায়গা দিয়েছেন।

কিন্তু সব ভারতীয় ব্যবসায়ীই কি মুক্ত হস্ত ? কেউ কেউ আবার বদ্ধমুষ্টি।

ধনী ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে নেতাজী ডাক দিলেন: 'মনে রাখবেন, এখন আপনাদের ধন-প্রাণ আর আপনাদের নয়, ভারতবর্ষের। যখন আপনারা টাকা রোজগার করছেন তখন আপনারা ভারতীয় আর যখন দেশের মুক্তিযুদ্ধে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে ডাকা হচ্ছে তখন আর আপনারা ভারতীয় নন, এ চলতে পারে না। হয় আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন নয় দেশশত্রু বৃটিশের সঙ্গে আছেন। এখানে একদিন রাজত্ব করেছিল বৃটিশ—আজ এখানে তাদের স্থান কোথায় ? জেলখানায়। আপনারা যদি তাদের সঙ্গেই থাকতে চান তাহলে তাদের পাশে কারাগারেই আপনাদের স্থান হবে। আর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হবে তখন সেদিন সেখানেও আপনাদের ঠাঁই হবে না।

আপনাদের কাছে আমি আবেদন করছি, ভারতীয় হিসেবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। নয়তো আমি আপনাদের উপর 'লেভি' চাপিয়ে টাকা আদায় করব। জানবেন আপনাদের ধনদৌলতের মালিক আজাদ হিন্দ সরকার, তার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের কাছে অর্থ ভিক্ষা করছি, যদি আপনারা উপযুক্ত সাড়া না দেন তবে সেই ভিক্ষা দাবির মূর্তি নেবে। সাধ্যের মধ্যে না এলে আপনাদেরকে বাধ্যের মধ্যে আনতে হবে। আমাদের লক্ষ্যসাধনে যারা আমাদের সাহায্য করতে বিমুখ হবে তাদেরকে আমরা শত্রু বলে মনে করব। আর শত্রুর স্থান বন্দীশালায়।

সুতরাং অবহিত হোন। এগিয়ে আসুন। সিন্দুকের ঢাকনা খুলে দিন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই। সে স্বাধীনতার যজ্ঞে আপনারাও কিছু ইন্ধন জুগিয়েছিলেন সেটা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা থাক।'

সাত

এবার রণযাত্রা। ফৌজের বাছা-বাছা সৈনিক নিয়ে তৈরি হল অগ্রগামী বাহিনী, এরাই প্রথম যুদ্ধে নামবে, এরাই জ্বালবে স্বাধীনতার হুতাশন। এই বাহিনী বা ব্রিগেডের নাম হবে কী? আগে তিনটি ব্রিগেড ছিল—গান্ধী, আজাদ আর নেহরু ব্রিগেড। তাদের থেকে নির্বাচন করে নিয়েই এই বাহিনী-রচনা। সৈনিকেরা এক বাক্যে আনন্দ করে উঠল: এর নাম সুভাষ ব্রিগেড।

নেতাজী বারে-বারে নিষেধ করলেন, আমার নাম নয়, নাম শুধু আমার দেশের, স্বাধীন ভারতের। আমি যা কিছু করছি যা কিছু করব তা আত্মতর্পণের জন্যে নয়, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেবার জন্যে। স্বাধীন ভারতই আমার যজ্ঞেশ্বর।

কিন্তু সৈনিকেরা ছাড়বে না কিছুতেই। সুভাষ নামই তাদের প্রাণ-মন্ত্র। তাদের সত্তা ও চেতনায় প্রচণ্ড জ্যোতিঃশক্তি। এ নামেই তারা মৃত্যুসমুদ্র লঙ্ঘন করে যাবে।

সুভাষ ব্রিগেডের পরিচালনার ভার পড়ল মেজর জেনারেল শা নওয়াজের উপর। চলল কঠোর শিক্ষানবিশি। যুদ্ধে যত রকম কৌশল প্রয়োজন, প্রকাশ্য ও গুপ্ত সমস্ত আয়ত্ত করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে গোয়েন্দা-বাহিনী, দেশের সঙ্গে যোগাযোগ। তীব্রতর করতে হবে ভারতীয় সৈন্যদের ভাঙিয়ে আনার চেষ্টা। কার জন্যে কোন স্বার্থে তারা লড়ছে? এবং কার বিরুদ্ধে? সুভাষ-মন্ত্র ঠিকমতো ওদের কানে পৌঁছে দিতে পারলে ওরা দলে-দলে চলে আসবে, ভর্তি হবে আজাদ হিন্দে। নেতাজী ফৌজের মাইনে বাড়িয়ে দিলেন, রেশন বাড়িয়ে দিলেন—কিন্তু অস্ত্র, যথোপযুক্ত অস্ত্র কই? জাপান কি চাহিদামত সাহায্য করবে?

নেতাজী গর্জে উঠলেন, 'যুদ্ধ আমাদের। আমরা নিজেরই নিজেদের উদ্ধার করব। জাপানের সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে কেন?'

আপামর সাধারণ থেকে যত টাকা সংগ্রহ করছেন তাই দিয়ে খোলা বাজারে অস্ত্র কিনছেন নেতাজী। মেশিন গান রাইফেল হাত-বোমা। জানি এ পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু এ আমাদের জঙ্গলের যুদ্ধ, আমাদের বাহিনী আসলে গেরিলা-বাহিনী। প্রাথমিক পরিচ্ছেদটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই আমরা বিস্তৃততর অধ্যায়ে উপনীত হব। প্রয়োজন যত তীব্র হবে আয়োজনও তত ব্যাপক হবে। স্বাধীনতাই একমাত্র প্রয়োজন।

সোজাসুজি বললেন নেতাজী, 'এই যুদ্ধে তোমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে, অনেক অসুবিধে। যারা এই কষ্ট ও অসুবিধে সহ্য করতে রাজি নও, তারা এস না, তারা পিছনে থাকো, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তাদের লড়াই করতে হবে না।'

'না, না, না,' সৈন্যদল একশব্দে উল্লাস করে উঠল: 'আমরা যাব। আমরা লড়ব। আমরা পারব।'

জাপানী সৈন্যদলের কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ কাউণ্ট তেরাউচি প্রস্তাব করল: আজাদ হিন্দ ফৌজকে সিঙ্গাপুরে রেখে দেওয়াই ভালো। ওরা বৃটিশের হয়ে লড়ে একবার হেরে গেছে মালয়ে ওদের আর মনোবল নেই। তাছাড়া ওরা বৃটিশের অধীনে বেশ আরামে ছিল, জাপানী সৈন্যের মত ওরা কষ্টসহিষ্ণু নয়। ওদেরকে দরকার হবে না, ওদেরকে পেছনে থাকতে বলুন, জাপানী সৈন্যই যুদ্ধ করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে দিতে পারবে।'

নেতাজী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'জাপানীরা নিজের মাতব্বরিতে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা পাইয়ে

দেবে তা হবে পরাধীনতার চেয়েও জঘন্য। মণিপুরের যুদ্ধ—তাই হবে ভারতীয় স্বাধীনতারই যুদ্ধ। সে যুদ্ধে এগিয়ে থাকবে জাপানীরা আর আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছনে থেকে হাততালি দেবে এ অসম্ভব। আগামী যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনীই আক্রমণের ভূমিকা নেবে, তারাই প্রথম রক্ত দেবে ভারতবর্ষকে। তারাই প্রথম পতাকা পুঁতবে স্বাধীনতার।'

তেরাউচি চুপ করে গেল। সাধ্য নেই হিজ এক্সেলেন্সি চন্দ্র বোসকে তার সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা নেতাজীকে ঘিরে দাঁড়াল। নেতাজী তাদের শুধু অধিনায়ক নন, নেতাজী তাদের বন্ধু, তাদের সুখ-দুঃখের সমব্যথী, তাদের আপনজন। তারা বললে, 'বৃটিশের অধীনে একদিন মাইনে নিয়ে লড়েছি বলে আমরা হেয় হয়ে গিয়েছি, কিন্তু আপনি আমাদের একবার সুযোগ দিন, দেখুন, আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে কেমন লড়তে পারি। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের সৈন্যের চেয়ে আমরা কম যাব না।'

নেতাজী তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তোমরা ভারতীয় এ গৌরববোধ তোমাদের অমূল্য সম্পদ পাইয়ে দেবে। সে সম্পদের একটাই নাম—ভারতীয় স্বাধীনতা।'

চলো দিল্লী চলো।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজি-মহারাজের জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন নেতাজী। শিগগির একবার আসুন।

আমাকে একখানা চণ্ডী দিতে পারেন ?

পারি।

আমার ব্যাগে একখানা গীতা আছে এবার একখানা চণ্ডী আসবে।

বৃপারিতা গীতাই তো চণ্ডী।

টোকিয়োতে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মিলনে যোগ দেবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়েছেন নেতাজী। সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন—অভিযানের আগে তোজোর সঙ্গে সমানে সমানে একবার কথা কয়ে নেওয়া যাবে। পাঁচশে অক্টোবর সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা করলেন নেতাজী।

পয়লা নভেম্বর দেখা করলেন তোজোর সঙ্গে। দৃঢ়তার সঙ্গে অনেকগুলো দাবি পেশ করলেন একে একে। তোজো এক কথায় 'না' করতে পারলেন না।

প্রথম দাবি আসন্ন ইম্ফল অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমগ্র প্রথম ডিভিশনকেই পাঠাতে হবে। আরো দুটো ডিভিশন তিনি গড়বেন মালয়ে। তাঁর প্রধান কর্মস্থল সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে সরিয়ে নেবেন। আরো দাবি, জাপান যে আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেছে, যেহেতু সেগুলো ভারতীয় এলাকা, তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। তাছাড়া ভারত-অভিযানে জাপান যখনই যেটুকু অঞ্চল করায়ত্ত করুক তার কর্তৃত্ব থাকবে নেতাজীর হাতে।

নেতাজীর কোনো দাবিই তোজো নস্যাৎ করতে পারলেন না। পাঁচুই নভেম্বর তাঁর সভাপতিত্ব যে পূর্ব-এশিয়া সম্মিলন বসেছিল তাতে তিনি ঘোষণা করলেন আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিকার আজাদ হিন্দ সরকারকে অর্পন করা হল। এই প্রথম দাঁড়াবার জায়গা হল অস্থায়ী সরকারের। এত বড় নৌঘাঁটি। তাছাড়া ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের মহিমান্বিত সাক্ষী। নেতাজী আন্দামানের নতুন নাম রাখলেন—'শহীদ দ্বীপ'। আর নিকোবরের নাম হল 'স্বরাজ-দ্বীপ'।

সিঙ্গাপুরে ফিরে যাবার আগে টোকিও রেডিয়ো থেকে নেতাজী বললেন, 'আর যে খুশি বৃটেনের সঙ্গে আপস করুক, আমরা নয়। ভারতের সামনে একটিই পথ, বৃটেনের বিরুদ্ধে

আপসহীন সংগ্রাম। বৃটেনের সঙ্গে আপস করার মানেই হল দাসত্বের সঙ্গে আপস করা। আমরা পণ করেছি সে আপস আর নয়।

জার্মানি যদি হেরেও যায় আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। যদি দরকার হয় রাশিয়ার সঙ্গে হাত মেলাব। বৃটিশের অত্যাচারে আমরা এত নিপীড়িত হচ্ছি, মুক্তির জন্যে রাশিয়া কেন স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে হাত মেলাতে আমারা পেছপা হব না।'

আঠারোই নভেম্বর রেঙ্গুনের পথে যাত্রা করলেন। নানকিংএ নামলেন, চিয়াং-কাই শেকের উদ্দেশে বললেন, আপনি এশিয়ার মুক্তির জন্যে লড়াই করুন, এশিয়ার শত্রুদের সিদ্ধির জন্যে নয়। শাংহাইএ নেমে আবার সে অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলেন: জাপানের সঙ্গে এমন একটা সম্মানজনক চুক্তি করুন যাতে চীন থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারিত হয়। শাংহাই থেকে ম্যানিলা। ম্যানিলায় নেতাজীকে রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হল। নেতাজী মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মরতে বসেছে, তার জায়গায় মাথা চাড়া দিচ্ছে মার্কিনি সংস্করণ। পৃথিবীকে বেছে নিতে হবে—পরবশ্যতা না সৌভ্রাত্য। পর শোষণ না সসম্মান সমত্ববোধ?

তারপর সাইগন। সেখানে তেরাউচিকে জানালেন তাঁর সম্মুখ অভিযানের হেড কোয়ার্টার্স রেঙ্গুনেই স্থাপিত হবে। কোন বাহিনী কী ভাবে কোন রণাঙ্গণে লড়াই করবে তারও একটা বোঝাপড়া হল। কত কাজ, কত ব্যবস্থা, কত হুকুমনামা। সংগঠন, সম্বন্ধন, পরিচালন। কাজের পর কাজ—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম থেকে দুরূহদুরারোহ। কত কুণ্ডলী-মোচন। কত বা সরলীকরণ। একটি রুগ্ন সৈনিকের আরোগ্যবিধান থেকে সমরাস্ত্র আহরণ। সমস্ত সমস্যার ভার একা নেতাজীর কাঁধে। তবু তিনি কখনো একার জন্যে নন, সর্বসময়েই সকলের জন্যে।

কাজ আর কাজ, চিন্তা আর চিন্তা—প্রায় সর্বদাই সিগারেট খাচ্ছেন নেতাজী। জাপানী সমরবিদদের সঙ্গে যখন আলোচনায় বসেন, কখনো বা পাঁচ-ছ ঘণ্টা, তাঁর বিরতিহীন ধূমপান চলে, যাকে বলে চেন-স্মোকিং। ধূমায়িত শৃঙ্খল না কি শৃঙ্খলায়িত ধূম! একটা সিগারেট শেষ হয়-হয়, তার জ্বলন্ত মুখ দিয়ে নতুন আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নেন। যতটা সিগারেটই পোড়ান দেশলায়ের কাঠির খরচ সেই একটাই। এ কাঠির মায়ায় নয়, একটা সিগারেটকে নিখুঁতভাবে নিঃশেষ করে খাবর জন্যে।

এমনিতে সকালে উঠে স্নান সেরে প্রাতরাশে বসতে-বসতে আটটা। প্রাতরাশ যৎসামান্য—গোটা দুই আধ-সেদ্ধ ডিম আর দু'পেয়ালা চা।

প্রাতরাশের পর প্রথম সিগারেট। সারাদিনে কটা? কম করে ত্রিশ-চল্লিশটা। আর যদি কনফারেন্সে বসতে হত তবে সংখ্যা বুঝি গণনার বাইরে। সমস্যা যত জটিল, ধোঁয়াও তত কুটিল।

দুপুর দুটোয় মধ্যাহ্ন ভোজন। যারা কাছে আছে তাদের সবাইকে নিয়ে এক টেবিলে। ভাত, ডাল, সেদ্ধ তরকারী, এক প্লেট দই, একটা কলা। আহারান্তে এক কাপ কফি। প্রত্যেকের জন্যে এই বরাদ্দ। আর সকলের জন্যে বোধহয় একটি অতিরিক্ত স্বাদ বস্তু আছে। সেটা নিঃসংশয়ে নেতাজীর সুধাসঙ্গ।

দুপুরের আহারের পর নিটোল একটি সিগারেট। তারপর বিছানায় শুয়ে আধঘণ্টাটাক বিশ্রাম। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। হোক ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী তবু ঘুমটুকু গভীর। একটা বোমা ফাটলেও চিড় ধরবে না। এ ঘুম না ফেনসমাধি তা কে জানে।

বেলা তিনটে থেকে লোক সাক্ষাৎ। সঙ্গে সঙ্গে ধূম্রজাল বিস্তার।

শেষ ধূমপান রাত বারোটা নাগাদ। যদি ব্যতিক্রম না ঘটে ঘুমুতে ঘুমুতে রাত দুটো-তিনটে। মাঝের এই দু-তিন ঘণ্টা সিগারেট খান না। মশারি ফেলে বিছানায় শুয়ে বই পড়েন। মশারির মধ্যে সিগারেট খাওয়াটা নিরাপদ নয়।

কাজ আর কাজ। ডাক আর ডাক। অবিচ্ছিন্ন চলা। মৃত্যু থেকে অমৃতে। অমানিশি থেকে আলোকলোকে।

তাইপিং থেকে রেঙ্গুনে-যাত্রার দিন রেলওয়ে স্টেশনে সে কী দৃশ্য! সুভাষ ব্রিগেড বা ১নং রেজিমেণ্টের প্রথমদল ব্রহ্ম অভিযানে চলেছে। তারিখ ১৯৪৩, নয়ুই নভেম্বর।

যারা সুস্থ-সমর্থ তারাই শুধু চলেছে ট্রেনে করে, যারা রুগ্ন, অক্ষম-অসমর্থ, তারা কী করে যাবে? তারা অপেক্ষা করবে তাইপিংএ।

'না, আমরাও যাব।' অসুস্থ সৈনিকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল: 'আমাদের সঙ্গে না নিলে আমরা ট্রেন ছাড়তে দেব না।'

সে কী! ডাক্তার যে অসুস্থতার দরুণ তোমাদের বারণ করে দিয়েছে। তোমরা যে লড়াইয়ের জন্যে এখন উপযুক্ত নও।

'কিন্তু আমরা তো প্রাণ দিতে উপযুক্ত। সব সময়েই উপযুক্ত। আমরা নেতাজীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা দেশের জন্যে প্রাণ দেব। সে সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হব এ অসম্ভব।' অসুস্থ সৈনিকের দল এঞ্জিনের সামনে রেল লাইনের উপর শুয়ে পড়ল।

কথাটা শুনুন—

'আমরা নেতাজীর ডাক ছাড়া আর কিছু শুনতে চাই না। আমরা রক্ত দেব।'

কর্তৃপক্ষ তখন অনেক করে তাদের বোঝাল। নিশ্চয়, তোমরাও রেজিমেণ্টে যোগ দেবে, যাবে ফ্রণ্টে। শেষ দল যেতে এখনো কদিন দেরি আছে! ততদিনে তোমরা সেরে উঠতে পারবে। যুদ্ধের স্বার্থেই তো তোমাদের সেরে ওঠা দরকার। তোমাদের এমন প্রতিজ্ঞা, তোমাদের ছাড়া যুদ্ধজয় হবে কী করে? যাবে তোমরাও যাবে।

সৈন্যদল আশ্বস্ত হল।

সাইগন থেকে নেতাজী ফিরলেন সিঙ্গাপুর। অস্থায়ী সরকার সরে গেলেও লীগের সদর দপ্তর সিঙ্গাপুরে ঠিক বহাল থাকবে।

এবার একবার আন্দামানে যেতে হয় দখল কায়েম করতে।

বিকেলে ব্যাডমিণ্টন খেলেন নেতাজী। করে সঙ্গে? তাঁরই ব্যক্তিগত ডাক্তার কর্ণেল রাজুর সঙ্গে।

কিন্তু রাজু নেতাজীর সঙ্গে পেরে ওঠে না। না খেলায় না শাসনে।

তিন সেট বড় জোর চার সেট খেলার পরেই রাজু নেতাজীকে থামতে বলে। বলে, আর বেশি পরিশ্রম উচিত হবে না।

নেতাজী উড়িয়ে দেন। আট-নয় সেট না খেলে নিরস্ত হন না। তোমার দম চলে গিয়ে থাকে তো আর কাউকে ব্যাট দাও।

আলো কমে এসেছে যে।

নেতাজী হেসে ওঠেন: সে তোমার চোখের আলো। ডাক্তারেরও ডাক্তার লাগে। চোখের ডাক্তারের তালাস করো।

এমনিতেই হার মানতে হয় রাজুকে—এত বারণ করেন অত সিগারেট খাবেন না,

শুপুরি চিবোবেন না, শুনেও শোনেন না নেতাজী—তাই রাজু তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করার উদ্দেশ্যে পরের সেট কটা হেরে যায় তাড়াতাড়ি। কিন্তু ততক্ষণে নেতাজী ক্লান্ত, ঘর্মাপ্লুত। বলতে পারা যায়, শ্রমতৃপ্ত।

রাত আটটায় ডিনার। পুরি আর ডাল—আস্তে-সুস্থে খাওয়া—মাছ-মাংস থাকলে রসিয়ে-রসিয়ে। ঝোলটা বেশ ভালো ঠেকলে বাড়তি এক প্লেট ভাত। মিষ্টি এক-আধটু চেখে দেখেন মাত্র, ওজন বাড়বার ভয়ে পুরোপুরি খান না।

ঘরোয়া পরিবেশে বেশ হালকা মনে থাকেন, সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার গুণে হাস্য-পরিহাসেও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। এ বুঝি সৌহার্দ্যেরই সুবাস-বিতরণ।

সেদিন নৈশাহারে দইয়ের কথা উঠেছে। কোন দই ভালো—গরুর দুধের, না মোষের দুধের? স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী নেতা ইয়েলাপ্পা মোষের দইয়ের গুণপনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললে, মোষের দইয়ে শরীর তো মোটা করেই, বুদ্ধিও মোটা করে।

নেতাজী বললেন, 'এ আপনি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকেই বলছেন বোধহয়।'

নেতাজীর পরিহাসে সবাই হেসে উঠল।

এ তো মোষ। জেলখানার ব্রিটিশ সুপারইনটেণ্ডেণ্ট আমাকে গাধা বলেছিল।

নিজের সম্পর্কে রসিকতা করতে বুঝি নেতাজীর বেশি আনন্দ।

'জানো কী হয়েছিল? উনিশ শো চল্লিশের ডিসেম্বরে আমি জেলে—ঠিক করলাম এই যুদ্ধের বাজারে জেলে বন্দী হয়ে থাকলে চলবে না। যে করে হোক আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে, শুধু জেলের বাইরে নয় ভারতবর্ষের বাইরে। কিন্তু পথ কোথায়? ঠিক করলাম অনশন করব। দেখি ছাড়ে কিনা। অনশনের কথা জানালাম সুপারইনটেণ্ডেণ্টকে। সে আমাকে কী বললে জানো? বললে, 'ভুলে যাবেন না, একটা মৃত সিংহের থেকে একটা জীবন্ত গাধা অনেক দামী—' বলে হাসিতে ফেটে পড়লেন।' নেতাজী। বললেন, 'আমি কিন্তু ওর উপদেশ মানলুম না। প্রতিজ্ঞায় অটুট থাকলুম।'

তারপর জীবন্ত সিংহই খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। আর যে ফ্যালফ্যাল করে শূন্যে তাকিয়ে রইল সেই মৃত গাধা।

আবার হাসির রোল উঠল।

তেতাল্লিশ সালের ২৯শে ডিসেম্বর আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছুলেন নেতাজী। সে কী সংবর্ধনা। প্রাক্তন ইংরেজ চিফ কমিশনারের কুঠিতে তিনি বাসা নিলেন। বিরাট জনসভায় তুললেন জয়পতাকা। আন্দামান এখন শহীদ দ্বীপ, ভারতীয় ফৌজের দখলে।

লেফটেনাণ্ট কর্ণেল লোকনাথনকে চিফ কমিশনার করলেন। বেসামরিক শাসন-পরিচালনের ভার তার উপর। সহকারী মেজর আলি। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কিন্তু জাপ সরকারের। জাপ সরকারই তো নেতাজীর সংবর্ধনার আয়োজক।

চলো এবার একবার সেলুলার জেলটা দেখে আসি—যেখানে নির্বাসিতের দল জীবনভোর তপস্যা করে গেছে। একটাই মাত্র জীবন একটাই মাত্র তপস্যা। সে সন্তান-জীবন, সে স্বাধীনতার তপস্যা।

কত বীর প্রাণ দিয়েছে এখানে। উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। এ বুঝি সেই কালাপানির দেশ যেখানে গেলে আর কেউ ফেরে না। না, ফেরে কালাপানি রক্তে লাল হতে চাইলেই ফেরে—আন্দামান শহীদ-দ্বীপ হয়ে যায়।

এবার রেঙ্গুনে যেতে হয়। সেখানেই এখন সম্মুখ-অভিযানের হেডকোয়ার্টার্স বসবে।

শ্যামদেশের সরকার নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। এখানে আমাদের অতিথি হয়ে থেকে যান কটা দিন। আমরাও এশিয়াবাসী, এক মহাদেশের অংশীদার, আপনার প্রেরণায় আমাদের চেতনায়ও শান পড়ুক।

রাজ-অতিথি হয়ে শ্যামদেশে কাটালেন এক সপ্তাহ। নেতাজী নিজে আগুন হয়ে সবাইকে চান আগুন করে তুলতে। কারু সন্দেহ রইল না এই সেই বীর যিনি বিজয়ী হবার জন্যেই দৈবপ্রেরিত।

শ্যাম সফর ছেড়ে নেতাজী ১৯৪৪-এর ৭ই জানুয়ারী রেঙ্গুনে এসে পৌঁছুলেন।

এদিকে সুভাষ ব্রিগেড বা ১নং রেজিমেন্টের খবর কী?

তাইপিং থেকে পেনাং, মারগুই, ট্যাভয়, মৌলমিন হয়ে রেঙ্গুন। কখনো ট্রেনে কখনো স্টিমারে কখনো ট্রাকে। মাইলের পর মাইল শুদ্ধ পায়ে হেঁটে। জাপানী সৈন্যও চলেছে একই পথের পথিক হয়ে। তারা মুরুব্বিয়ানা দেখাতে চাইলে ভারতীয়েরা তা বরদাস্ত করতে পারত না। ছোটখাট সঙ্ঘর্ষ বাধত মাঝে মাঝে। তবে সে কলহ অস্ত্রে পৌঁছুবার আগেই নিরস্ত হত।

কত দ্রুত পৌঁছুনো যায় যেন তারই প্রতিযোগিতা। যেই পথ হাঁটতে জাপানীদের পাঁচ দিন লাগছে, ভারতীয়েরা সেই পথ পেরিয়ে যাচ্ছে দু দিনে। তবু তো জাপানীরা হালকা পায়ে চলেছে আর ভারতীয়দের কাঁধে-পিঠে এক-এক মণ জিনিসের ভার। সেই ভার নিয়ে দিনে প্রায় পঁচিশ মাইল করে হেঁটেছে। ক্যাপটেন অমৃক সিং ও শান্তা সিং-এর অধীনে যে দুই দল ছিল কিঞ্চিৎ লঘুভার ছিল বলে তাদের দৈনিক হাঁটা আটত্রিশ মাইল।

পেগুর কাছাকাছি ওয়া-তে সেনাবাহিনীর ট্রেনে বৃটিশ জঙ্গী বিমান বোমা ফেলল। জাপানীদের মধ্যে নিহত আট, আহত ছয়। ভারতীয়দের মধ্যে আহত দুই আর নিহত শুধু একজন—গাড়োয়ালের জিৎ সিং।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সে-ই প্রথম শহীদ। মাতৃযজ্ঞে সেই প্রথম আহুতি।

রেঙ্গুনে পৌঁছে 'মিঙলা ডোন'-এর মিলিটারি ব্যারাকে সৈন্যদের থাকবার জায়গা হল। নেতাজীর পৌঁছবার দিনই জাপানী কম্যাণ্ডারের উপর নির্দেশ এল—ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হও। সে ডাক ভারতীয় ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। তারা দীপ্ত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করে উঠল: দিল্লী চলো। ইম্ফলে পৌঁছনোই দিল্লীতে পদার্পণ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় রেজিমেন্টও আসছে ক্রমে-ক্রমে। এ জীবন-জল-তরঙ্গ কে ঠেকাবে?

পরদিন রেঙ্গুন রেডিও থেকে নেতাজী ঘোষণা করলেন: ভারতবর্ষ থেকে আমার চলে আসা কেউ যেমন ঠেকাতে পারেনি তেমনি আমার ফিরে যাওয়াও কেউ ঠেকাতে পারবে না।

নেতাজী নির্বন্ধন। যেমন পলায়নে তেমনি প্রত্যাবর্তনে।

চতুর্দিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কিন্তু ভারতীয়েরা যে সাজবে তার উপযুক্ত সরঞ্জাম কই? পর্যাপ্ত যান-বাহন দূরের কথা, তেমন গরম জামা-কাপড়েরও অভাব। কালাদান উপত্যকায় যে দারুণ শীত, একটা কম্বল ও শার্ট তার কী করবে? তারপর যা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ মশারি নেই। তার অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ—তাও কিছু অঢেল নয়। জাপানীরা মুখেই শুধু আশ্বাস দিচ্ছে, আসলে ফক্কা। তাদের শুধু এক কথা, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছেও সব পেয়ে যাবে। যেন যুদ্ধে রওনা হবার আগে সব পেয়ে গেলে যাত্রা অশুদ্ধ হয়। তার অর্থ, জাপানীরা বোধহয় চায়

ভারতীয় বাহিনী তাদের ল্যাংবোট হয়ে থাক, স্বশক্তিতে পৃথক সত্তায় সোজা হয়ে না দাঁড়ায়। যুদ্ধজয় হলে যেন লোকে বোঝে এ জাপানেরই যুদ্ধজয়।

প্রতিবিধানে এগিয়ে এলেন নেতাজী। সাধ্যমত আদায় করলেন উপকরণ, বিলিব্যবস্থা করলেন। বুঝলেন জাপানী পাষাণ গলবে না সহজে। অফিসাররা বললে, আর কিছুদিন অপেক্ষা করা যাক, আরো কিছু লরি ও গরম জামা-কাপড় জোগাড় হবে হয়তো।

সৈন্যরা সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়াই এখন একমাত্র আস্পৃহা—প্রাণের ক্ষুধা। তাদের সঙ্কল্পই অস্ত্র, তাদের উদ্দীপনাই যান-বাহন, তাদের উৎসাহই খাদ্যপানীয়, তাদের দেশপ্রেমই তাদের আচ্ছাদনের উষ্ণতা। কিছু ভয় নেই, আমরা জয়ের রথে যতই এগোব ততই 'চার্চিলের ভাণ্ডার' আমাদের হাতে আসবে।

ক্রমেই বৃটিশের অধীনস্থ ভারতীয় সৈন্যরা পরাস্ত হবে—হয় অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালাবে নয় আমাদের হাতে বন্দী হবে। আমাদের মালামাল যা চার্চিলের ভাণ্ডারে গিয়ে জমেছিল তা ফেরত পাব। কে জানে তারা পালাবেও না ধরাও দেবে না, সানন্দে আমাদের দিকে চলে আসবে, ঝাঁকের কই ঝাঁকে এসে মিশবে, আর মাইনেখোর কর্মচারী হয়ে থাকবে না।

জাপানী যুদ্ধনায়ক জেনারেল কাওয়াবির সঙ্গে নেতাজীর একটা বোঝাপড়া হল। কাওয়াবির ইচ্ছে ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে জাপানী সৈন্যদলের অধীন করে দেওয়া—নেতাজী দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রতিরোধ করলেন। বললেন, ব্যাটেলিয়নের চেয়ে ছোট দলে আজাদ হিন্দ ফৌজ সঙ্কুচিত হবে না, আর তা আদ্যোপান্ত পরিচালনা করবে ভারতীয় অফিসার। আরো শুনুন, স্বতন্ত্র চিহ্নিত জায়গায় থেকে আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধ করবে। আর ক্রমাগত অভিযানে ভারতের যে-যে স্থান স্বাধীন হতে থাকবে সে-সে স্থানের অধিকার আমাদের সৈন্যদের হাতে আসবে আর সে-সে স্থানের গভর্নর হবেন আমাদের মেজর জেনারেল চ্যাটার্জি। তাছাড়া যত যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম করণ-উপকরণ—যা কিছু যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া যাবে সব আজাদ হিন্দ সরকারের। কি, রাজি?

কাওয়াবি রাজি না হয়ে করে কী।

দু দেশের সৈন্যদের জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নও বিবেচিত হল। দু দলের সম-মর্যাদার অফিসারের দেখা হলে কে কাকে আগে অভিবাদন করবে? কাওয়াবি বললেন, জাপানী সৈন্যদল অনেক পুরোনো, আজাদ হিন্দ ফৌজ সদ্যগঠিত, সুতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসরকেই জাপানী অফিসারকে প্রথম অভিবাদন করতে হবে। নেতাজী দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে উঠলেন, কখনো না। জাতীয় মর্যাদায় ভারতীয় কখনো ছোট হবে না। আমি বলি সমপদস্থ দুজনের দেখা হলে দুজন একসঙ্গে পরস্পরকে অভিবাদন জানাবে। কেউ আগে-পরে নয়, একসঙ্গে, সমান সৌজন্যে।

কাওয়াবি মেনে নিলেন।

এর পর কথা উঠল কোন দেশের সামরিক আইন-কানুন বলবৎ হবে।

কাওয়াবি বলতে চাইলেন, জাপানী হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশেই যখন যুদ্ধ করতে হচ্ছে তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের উচিত হবে জাপানী সামরিক আইন মেনে চলা।

নেতাজী মানতে চাইলেন না। তা হলে তো জাপানী মিলিটারি পুলিশ ইচ্ছে করলেই যে-কোনো ভারতীয় সৈন্য বা অফিসারকে গ্রেপ্তার করতে পারবে, নেতাজীর সম্মতিরও অপেক্ষা করবে না। কেন, আমাদের নিজস্ব সামরিক আইন আছে, তার দ্বারাই আমাদের সৈন্যরা চালিত হবে, শাসন বা শৃঙ্খলার ব্যাপারে জাপানী কর্তৃত্ব বরদাস্ত হবে না।

কাওয়াবি ফাঁপরে পড়লেন। দাঁড়ান এটা খুব জটিল ব্যাপার। টোকিয়োকে জানাই।

তা জানান। কিন্তু নেতাজী নিষ্কম্প।

টোকিয়ো নেতাজীর প্রস্তাবেই সমর্থন করল। যার-যার বাহিনী তার-তার আইন।

হ্যাঁ, আমরা ভারতীয়েরা এ যুদ্ধকে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছি। তারই জন্যে সমস্ত পূর্ব এশিয়া জুড়ে ভারতীয়দের মধ্যে এত প্রাণের জোয়ার এসেছে। আমাদের প্রতিটি সৈন্য দেশের জন্যে অর্পিতপ্রাণ, বিদ্যুদবীর্যে সমুজ্জ্বল। আর শুনে রাখুন, এ আমার নির্দেশ আমাদের সৈন্যরা আগাগোড়া আক্রমণের পুরোভাগে থাকবে, যেহেতু আমি চাই ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যই তার প্রথম রক্তবিন্দু উপহার দেবে। সেই পবিত্রতম রক্তবিন্দুতেই হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অভিষেক।

সমস্ত মেনে নিলেন কাওয়াবি।

নেতাজী আরো নির্দেশ দিলেন, ভারতের ভূখণ্ডে ভারতের জাতীয় পতাকা— ত্রিবর্ণ পতাকা ছাড়া অন্য কোনো পতাকা ওড়ানো চলবে না। আর স্থলপথে আক্রমণের সময় কলকাতার উপর এলোপাথাড়ি ব্যাপক বোমাবর্ষণের অভিসন্ধি জাপানীদের পরিত্যাগ করতে হবে। আমি চাই না আমার প্রিয় দেশবাসী অকারণ লাঞ্ছনার শিকার হোক। লক্ষ্য ইংরেজ-বিতাড়ন, জন-মর্দন নয়।

ঠিক কথা। যুক্তি দেখলেন কাওয়াবি।

আজাদ হিন্দ বাহিনীতে প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার হল। বর্মাবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে আসতে লাগল বিপুল বিত্ত। হাবিব আর খান্না কয়েক লাখ টাকা দিলেন অকাতরে। একেই বলে অকৈতব প্রেম—দেশের জন্যে ফকির বনলেন। এবার যথাসম্ভব রসদ কিনে নাও, ওষুধপত্র, জামাকাপড়, সাজসরঞ্জাম—আর নেতাজীর থেকে নিয়ে নাও প্রাণশক্তি। অধৃষ্য বীর্য, দুর্বার জয়স্পৃহা, অবিচল আত্মপ্রত্যয়। চিরন্তন অমৃত-চেতনা।

সব এসে যাবে। যন্ত্রপাতি যানবাহন অস্ত্রশস্ত্র। আরো, আরো সৈন্য, আরো আরো রক্ত। এসে যাবে স্বাধীনতা।

সুভাষ ব্রিগেডকে ৩রা ফেব্রুয়ারী বিদায় জানালেন নেতাজী। আবেগমথিত মেঘ-মন্দ্রস্বরে বললেন: 'এই নদী পর্বত বন-বনানী পেরিয়ে আমাদের সেই প্রার্থিত দেশ যে দেশের মাটিতে আমাদের জন্ম, সেই দেশেই আমরা এখন ফিরে যাব।

শোনো! ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে। ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকছে। আমাদের কোটি কোটি স্বদেশবাসী আমাদের ডাকছে। রক্ত ডাকছে রক্তকে। আপনজন আপনজনকে।

ওঠো, এক মুহূর্ত দেরি করবার সময় নেই। অস্ত্র হাতে নাও, রণসাজে সজ্জিত হও। তোমাদের সামনে যে পথ সে আমাদের পূর্বসূরীদের তৈরি। সেই পথ ধরেই আমরা এগিয়ে যাব। শত্রুব্যূহ ভেদ করেই আমরা আমাদের পথ করে নেব, আর যদি ঈশ্বর এই চান আমরা মৃত্যুবরণ করে শহীদ হব। যে পথ আমাদের সৈন্যবাহিনীকে দিল্লী নিয়ে যাবে সেই পথে চিরনিদ্রায় শুয়ে সেই পথকেই আমরা চুম্বন করব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী। দিল্লী চলো।'

চলো দিল্লী! তিন হাজার সসজ্জ আজাদী সৈন্য সমস্বরে ফেটে পড়ল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তারা নেতাজীর বক্তৃতার প্রতিটি কথা যেন অনন্য মনোযোগে মর্মের মধ্যে গেঁথে নিয়েছে, তারপর সেই মন্ত্রের জাগরণে বিস্ফোরিত

হয়ে উঠেছে: দিল্লী চলো।

যে পরমতম লাভ না করা পর্যন্ত নিবৃত্তি নেই তার নাম হচ্ছে দিল্লী, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

নেতাজী আরো বললেন: তোমরাই আমার বাহুবল, আমার প্রাণশক্তি। তোমাদের দিয়েই আমি অসাধ্যসাধন করব, অর্জন করব আমাদের জীবনের স্বত্বাধিকার। তোমরাই ভবিষ্যতের নির্মাতা, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরাই তার ভিত্তি রচনা করবে। ক্লেশে কাঠিন্যে অবসন্ন হবে না, শত বাধায়ও থাকবে অবিচল। জাপানীরা তোমাদের দিয়ে নানা কষ্টসাধ্য কাজ সম্পন্ন করে নিতে চাইবে, হাসিমুখে তা মেনে নেবে। অবসন্ন হবে না। সেই তো তোমাদের স্বদেশপ্রেমের পরীক্ষা, তোমরা ক্লেশবহনে পরাঙ্মুখ নও। যদি ক্লেশবহনে কেউ অসম্মত থাকো, যদি দুঃখ দেখে কেউ সঙ্কুচিত হও সে বরং থেকে যাও, তার যুদ্ধে গিয়ে কাজ নেই।

না, না, আমরা ফিরব না, হটব না, পড়ে থাকব না। সৈন্যদল সোৎসাহ আশ্বাস দিল: বাঁচি-মরি, আমরা ছিনিয়ে আনব স্বাধীনতার রাজমুকুট।

ফৌজ মার্চ করে এগিয়ে চলল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নেতাজী। তার দুচোখ বেয়ে আনন্দের ধারা নামল।

জয়—জয়—জয়ের পথে এগিয়ে চলল আজাদ হিন্দ।

আরাকান অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনী পর্যুদস্ত। এটা সম্ভব হয়েছে কর্ণেল এল. এস. মিশ্রের কৌশলে, তার সুযোগসন্ধানী চকিত আক্রমণে। বলা যেতে পারে লেফটেনেন্ট হরি সিং-এর তৎপরতায়। সে একাই সাত-সাতটা বৃটিশ সৈন্য শেষ করেছে। খবর পেয়ে উল্লসিত হলেন নেতাজী।

মেজর এল. এস. মিশ্রের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পাঠালেন: আরাকান সীমানায় ভারতীয় বাহিনীর কৃতিত্বের জন্যে আমরা গর্বিত। আর লেফটেনেন্ট হরি সিং-এর জন্যে শের-ই-হিন্দ পদক—ভিক্টোরিয়া ক্রশের মতই যার সম্মান মূল্য। আর সন্দেহ নেই, জয় আমাদের হবেই।

ট্রেনে রেঙ্গুন থেকে প্রোম—তারপর সেখান থেকে টানা হাঁটা-পথ। চলেছে সুভাষ ব্রিগেড। প্রায় একশো মাইল পথ হেঁটে তাউনগুপ।

মালপত্র জাপানী লরিতে।

তাউনগুপে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করল বৃটিশ। ভারতীয়দের ষোলজন মারা গেল। তবু পিছনে কে তাকায়! সামনে ইম্ফল। আর সেখানে পৌঁছতে পারলেই দিল্লী।

আবার হাঁটা-পথে দেড়শো মাইল। মিউহাউ। নৌকো করে আসছিল জিনিসপত্র, শত্রুপক্ষের জঙ্গীবিমান মেশিনগান চালিয়ে কতগুলো ডুবিয়ে দিল। কত বাধা, কত অভাব, তবু প্রদীপ্ত উৎসাহে সেনাবাহিনী এগিয়ে চলল। অস্ত্রশস্ত্রের অনটন, অনটন যানবাহনের। তাছাড়া আবরণ-আচ্ছাদনও বিশীর্ণ। তবু দুঃসাধ্য-দুর্গম পথে পাহাড় ডিঙিয়ে বনজঙ্গল ভেদ করে চলেছে একলক্ষ্যে। কে তাদের আকৃষ্ট করছে? কে প্রেরিত করছে? আকৃষ্ট করছে দিল্লী। প্রেরিত করছে সুভাষ। সামনে দিল্লী চলো। পিছনে জয় হিন্দ।

সামনে ভারত-মাতা। পিছনে নেতাজী।

মার্চের মাঝামাঝি ভারতীয় বাহিনী কিয়াকটয়ে এসে পৌঁছুল। সামনেই কালাদন নদী। খবর এল সেই নদীর পুব দিক ঘেঁষে রাস্তা বানাচ্ছে নিগ্রোরা। সেই রাস্তা দিয়ে তাদের দক্ষিণ দিকে অভিযানের মতলব। কালাদন-এর উপরে একটা সেতুও তারা তৈরি করেছে যাতে পশ্চিম

থেকে পুবে পা বাড়ানো সহজ হয়।

খবরদার! নিগ্রোরা যেন কালাদন পেরিয়ে পুবে না আসে।

ভারতীয় বাহিনীর পুরোপুরি প্রস্তুত হবার আগেই সেতু পেরিয়ে চলে এসেছে ওরা। শুধু তাই নয়, একটা পাহাড়ের গায়ে পরিখা খুঁড়ে মজবুত ঘাঁটি বানিয়েছে।

মেজর রাতুরি আর কালহরণ করল না, দু দল সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হল। গুঁড়ি মেরে সৈন্যরা ঘাঁটির কাছাকাছি এসে পৌঁছুল। রাতুরি ইঙ্গিত করল, ঝাঁপিয়ে পড়ো।

'ভারতমাতা কি জয়।' 'নেতাজী কি জয়।' ভারতীয় ফৌজ আচম্বিতে লাফিয়ে পড়ল পরিখায়। শত্রুপক্ষ নিমেষে ছত্রখান হয়ে গেল। পড়ি-মরি করে ছুটল নদীর দিকে। বুঝল ভারতীয়েরা ঢের বেশি শক্তিশালী। চলো, পালাই, নদীর পশ্চিম পারে গিয়ে কামান ছুঁড়ি। নদীর ঘাটে নৌকো বাঁধা, সারি-সারি নৌকো—তাতে করে বিপক্ষীয়েরা পালাতে চাইল। কোথায় পালাবে? ওদের ষোল খানা নৌকো তলিয়ে গেল। যারা বাঁচল তারা ওপারে গিয়ে হাঁফ ছাড়ল। পরাভূতের দল তখন কামানের আশ্রয় নিল।

কিন্তু আজাদী-ফৌজের তো কামান নেই, তাদের শুধু মেশিনগান আর রাইফেল আর হাত-বোমা। আর অনমনীয় প্রতিজ্ঞা।

পরিত্যক্ত শূন্য পরিখায় আজাদীরা এবার আশ্রয় নিল। কামান তাদের নাগাল পেল না। কামান যতই দূর-পাল্লার হোক, আজাদীদের প্রতিজ্ঞার পতাকা আরো ঊর্ধ্বে।

দেখা গেল পরিখা-যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য মরেছে চোদ্দ জন, আহতের সংখ্যা বাইশ আর ওদের বিপক্ষীয়দের মরেছে দুশো পঞ্চাশ জন। তাছাড়া বিতাড়িতের দল কত-শত অস্ত্র ফেলে গেছে, কত গুলি-গোলা, কামান-বন্দুক আর কত আহার্য! একেই বলে 'চার্চিলের ভাণ্ডার'। আমাদের এমনিতে রসদ না থাকে আমরা জয় করে লুটে নেব।

জাপানী সৈন্যরাও এসে দলে ভারী হল। কালাদনের দুই পার ধরে এগিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে পালটোয়ায় দারুণ সংঘর্ষ হল। এখানেও বৃটিশদলের পরাজয়। আজাদী ফৌজের কবজায় এল পালটোয়া। কাছেই দালেতমি। চলো ওটাও অধিকার করি।

দালেতমিও এসে গেল অধিকারে। ভারত-সীমান্ত আর মোটে চল্লিশ মাইল। পশ্চিম দিকে তাকাও—ঐ দিগন্তরেখাই ভারতবর্ষের নীলিমা দিয়ে আঁকা।

কিন্তু এদিকে রেঙ্গুনে জাপানী সেনাপতি ইসোদার সঙ্গে কঠিন মতদ্বৈধ ঘটেছে। কথাটা হচ্ছে জয়ী বাহিনী যখন ভারতে পদার্পণ করবে তখন তার উপর কর্তৃত্ব করবে কে? ইসোদা বলছে, কর্তৃত্ব করবে জাপানী চেয়ারম্যান। নেতাজী এক হুঙ্কারে প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিলেন। ও কথা মুখেও এনো না।

ইসোদা কুঁকড়ে গেলেও জেদ ছাড়ল না। তা হলে জাপানের স্বার্থ কী?

স্বার্থ? স্বার্থ ইংরেজকে নির্বিষ নির্বীর্য করে দেওয়া। ইংরেজ হারলে ইংরেজ হটলে ভারতবর্ষের যেমন স্বাধীনতা, জাপানেরও তেমনি অব্যাহতি।

ইসোদা অবিচল। জাপানী চেয়ারম্যান চাই।

অসম্ভব। নেতাজী আবার গর্জে উঠলেন; আপনার এই প্রস্তাব স্বাধীন ভারতবর্ষের সার্বভৌম মর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর। আমরা কি স্বাধীনতা অর্জন করব জাপানীদের দ্বারা পরিচালিত হবার জন্যে? সমস্ত ভারতবাসী কি তাতে ধিক্কৃত হবে না।

তা হলে জাপান ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার যুদ্ধে সাহায্য করছে কেন?

করছে নিজের স্বার্থে, এশিয়ার স্বার্থে। আপনাদের সাহায্যের অর্থ এই হবে না যে স্বাধীনতার পরেও ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকবে না।

চুপ করে গেল ইসোদা। মনে হল সহযোগিতার বন্ধন বুঝি ছিন্ন হয়ে যায়।

যুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতার যে একটা কাউন্সিল আছে, আপনার কি ইচ্ছে সেটা ভেঙে যাক? ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল ইসোদা।

নেতাজী সরাসরি উত্তর দিলেন: তা কেন? সহযোগিতার কাউন্সিল থাক কিন্তু তার চেয়ারম্যান জাপানী হবে না।

তবে কে হবে?

ভারতীয়। মৃদু হেসে নম্র স্বরে নেতাজী বললেন, আর এক বিকল্প আছে। কাউন্সিলে কোনো চেয়ারম্যান থাকবে না, না ভারতীয়, না জাপানী। দু দেশের সমান সংখ্যক সদস্য থাকবে আর থাকবে মিত্রতা, সমমর্মিতা, কেউ কারু ওপর আধিপত্য করতে পারবে না। না কোনো হামবড়া ভাব নয়, নয় কোনো মুরুব্বিয়ানার ভাব। কি রাজি?

রাজি। নেতাজীর ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানল ইসোদা।

দালেতমিতে বাহিনীর পুনর্গঠনের জন্যে কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অদূরে মোটে চল্লিশ মাইল পশ্চিমে ভারতের সীমান্ত-রেখা দেখা যাচ্ছে, সৈন্যরা তাই ব্যাকুল হয়ে উঠল, সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বলতে লাগল: আমাদের বিশ্রামে মন নেই। আমাদের নেতাজীর আদেশ যত শিগগির পারো ভারতভূখণ্ডে গিয়ে আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়ে দাও। তাই বিশ্রাম না করে আমরা ছুটে এগিয়ে যেতে চাই।

সুভাষ ব্রিগেডের পিঠ-পিঠ রওনা হল গান্ধী বিগ্রেড। তার নেতৃত্বের ভার নিল কর্ণেল এম. জেড. কিয়ানি। তার পিছনে আসছে আজাদ ব্রিগেড, তার সেনানায়ক কর্ণেল গুলজার সিং ছামলে। এক-এক ব্রিগেডের এক-এক রাস্তা। কিন্তু সকলের লক্ষ্য ইম্ফল। সকল রাস্তা ইম্ফলের দিকে।

দালেৎমি ছেড়ে সুভাষ ব্রিগেড এগুলো ভারতীয় এলাকায়, মোডকের দিকে। বৃটিশের বড় ঘাঁটি এই মোডক। রাতুরি হুকুম দিল বিদ্যুৎ-বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আচমকা আক্রমণে শত্রুপক্ষ ছত্রখান হয়ে যত্রতত্র পালাতে লাগল। আজাদ বাহিনীর বিরাট লাভ হল। শুধু ঘাঁটি নয়, অনেক খাদ্যবস্তু, অনেক যুদ্ধোপকরণ। একটা তিন ইঞ্চি মুখের কামান পর্যন্ত। আবার সেই চার্চিলের ভাণ্ডার।

মোডক অধিকারে পেয়ে আজাদ বাহিনীর সে কী আনন্দ! সৈন্যরা সর্বাঙ্গীণ প্রণামের ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়ে ভারতের মাটি চুম্বন করতে লাগল। উচ্চনাদে ধরল জাতীয় সঙ্গীত—'সব সুখ চায়েন কী বরখা বরষে, ভারত ভাগ হ্যায় জাগা—' ওড়াল জয়-পতাকা।

নেতাজী কোথায়?

নেতাজী পিছনে পড়ে নেই। ফৌজের সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও এগোচ্ছেন। রেঙ্গুন থেকে তাঁর হেডকোয়ার্টার এগিয়ে এনেছেন মেমিওতে। কোহিমার পতন আসন্ন। ইম্ফলকেও ঘিরে ফেলা হয়েছে। ইম্ফল কবজায় এসে গেলেই বাংলার মাটি।

ব্রিগেডের উপর সেই নির্দেশ এসেছে: ব্রিগেডের প্রধান অংশ কোহিমায় যাবে, তারপর ইম্ফলের পতন হলে দ্রুত ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে ঢুকবে বাংলাদেশে।

আর একবার বাংলা দেশে ঢুকতে পারলে সমস্ত ভারত অভ্যর্থনায় উত্তাল হয়ে উঠবে।

লেলিহান বিদ্রোহবহ্নিতে বৃটিশ মসনদ ভস্মসাৎ হয়ে যাবে।

বড় জোর আর তিন সপ্তাহ!

নেতাজী মেনিওতে এসেছেন এ খবর পৌঁচেছে শত্রুমহলে। সহসা তারা বিমানে করে বোমা-বর্ষণ শুরু করল।

কিন্তু নেতাজীর গায়ে একটু আঁচড়ও লাগল না। যিনি ঈশ্বর-আবৃত তাঁর বর্ম কে ভেদ করে?

শুধু ঝাঁসির রাণী বাহিনীর ক্যাম্পগুলি উড়ে গেল। কিন্তু মেয়েরা কেউ হতাহত হয়নি। ঠিক সময়ে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিতে পেরেছিল। আর তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস নেতাজী তাদের কাছাকাছি আছেন তাদের আবার কিসের বিপদ।

রাণী বাহিনীর ক্যাম্প একটা পরিত্যক্ত স্কুল-বাড়িতে স্থানান্তরিত হল। নেতাজী নিজে দাঁড়িয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করলেন।

মোভক জায়গাটা বিপদমুক্ত নয়। বৃটিশের পাল্টা-আক্রমণের আওতার মধ্যে। জাপানী কম্যাণ্ডার মেজর রাতুরিকে পরামর্শ দিল: পিছিয়ে গিয়ে ঘাঁটি তৈরি করি এস। এখানে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বুথিডং থেকে বৃটিশরা আক্রমণ করবে।

করুক। রাতুরি দৃঢ়স্বরে বললে, আমরা সরব না। পিছু হটব না।

জাপানী কম্যাণ্ডার এ দৃঢ়তাকে চাপল্য মনে করল। নিজের গরজে জাপানী সৈন্যদের পিছনের দিকে সরিয়ে নিয়ে চলল। রাতুরি আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের ডাকল। এখন কী করা উচিত। জাপানীরা দিব্যি পিছিয়ে চলেছে।

ওরা যাক। অফিসাররা একতন্ত্রে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল: ওদের চৌকিও পিছনে পড়ে, ওরা পিছোক। কিন্তু দিল্লী আমাদের সামনে। আমরা দিল্লীর দিকে চলেছি। আমরা ফিরব না, পিঠ দেখাব না।

আরো কথা: যে জাতীয় পতাকা আমরা একবার পুঁতেছি তা পারব না তুলে নিতে।

তবু দীর্ঘ সাপ্লাই-লাইন বজায় রাখতে আজাদ-হিন্দ বাহিনীকে যদি স্থান বদল করতেও হয় জাতীয় পতাকাকে একলা ফেলে যাওয়া চলবে না।

ক্যাপটেন সুরজমলের অধীনে এক দল সৈন্য পতাকা-রক্ষায় মোতায়েন রইল। আর সবাই চলে যাক অংশুমালী সূর্য জেগে থাকবে। ভারতের যেটুকু ভূমি দখলে এসেছে তা প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে থাকবে।

জাপানী কম্যাণ্ডার স্তম্ভিত। এমন মৃত্যুঞ্জয় পণ কারো হয় নাকি? এ যে দারুণ হঠকারিতা। বৃটিশের অনাবৃত আক্রমণে এরা যে নিমেষে ধুলো হয়ে যাবে।

কিন্তু ভারতীয় বীরত্বকে মর্যাদা না দিয়ে পারল না কম্যাণ্ডার। একেই বলে দেশপ্রেম পতাকা-প্রণাম! কম্যাণ্ডার এক প্লেটুন জাপানী সৈন্য সুরজমলের নেতৃত্বাধীনে নিযুক্ত করে গেল। ওরা সুরজমলকে সাহায্য করবে। সুরজমলের কাছ থেকে ওরা শিখুক কাকে বলে সাহস কাকে বলে আত্মত্যাগ।

অভিনব ব্যাপার! একজন ভারতীয় ক্যাপটেনের পরিচালনায় জাপানী সৈন্য! ইতিহাসে লেখে না। কিন্তু এমন মৃত্যু-তরণ দুর্জয় সাহসের কথাও বা কে দেখেছে, কে শুনেছে!

'এরা পেটের জন্যে যুদ্ধ করে না বা পয়সার জন্যে।' বর্মার কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ নেতাজীকে অভিবাদন জানালেন: এরা, আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সৈন্যেরা বেতনভুক অস্ত্র-কর্মচারী নয়, এরা

সত্যিকার দেশপ্রেমিক। দেশের প্রতি জ্বলন্ত ভালোবাসা না থাকলে এত কষ্ট কেউ সহ্য করতে পারত না, পারত না এত বীরত্ব দেখাতে। আমরা ভুল স্বীকার করছি, আপনার এই ফৌজকে আমরা ঠিক ধারণা করতে পারিনি।

নেতাজীর চোখ সজল হয়ে উঠল।

প্রায় পাঁচ মাস, মে থেকে সেপ্টেম্বর, সুরজমল মোভক আঁকড়ে রইল। শত বৃটিশ আক্রমণও তাকে হটাতে পারল না। এমন তার কৌশল, এমন তার প্রতিরোধ। উড্ডীন রইল পতাকা।

গান্ধী ব্রিগেড চলেছে মান্দালয়ের দিকে! সঙ্গে জাপানী বাহিনী— জেনারেল মাতাগুচির নেতৃত্বে।

ক্রমান্বয়ে এগোতে এগোতে যুক্ত বাহিনী কোহিমা অধিকার করে নিল। প্রতি পদে কষ্ট, প্রতি পদে ক্লান্তি। ভারতীয়দের কত বাড়তি অসুবিধে। তাদের প্রথম প্রয়োজন যে খাদ্য তাই নেই পুরোপুরি। নেপোলিয়ন কী খাঁটি কথাই বলেছিলেন: সৈন্যরা জয়যাত্রায় যায় পেটে হেঁটে। অর্থাৎ তাদের পেট-ভরতি খাদ্য দাও তবেই তারা বীরদর্পে এগিয়ে যাবে, শত্রুকে উৎখাত করবে সবলে। খাদ্য ছাড়া দেহে শক্তি, প্রাণে উৎসাহ আসবে কী করে? তার উপর অস্ত্রবলও সামান্য। পায়ের জুতো ছেঁড়া, গায়ের জামাও তথৈবচ— সবচেয়ে বড় বিপদ ম্যালেরিয়া আর সৈন্যদের কিনা একটাও মশারি নেই। ঘুমের দফারফা তো বটেই, দেখা দিল জ্বরের তাণ্ডব। ওষুধপত্র কই? ডাক্তার কই?

তবু আজাদ-হিন্দ বাহিনীর কোনো নালিশ নেই, বিক্ষোভ নেই। শত ঝড়-ঝাপটায়ও তাদের প্রাণের পতাকা অবনমিত হচ্ছে না। কী আছে তাদের? আছে এক আদর্শের পরিষ্কার আকাশ আর তাকে দীপ্যমান দিবাকর— নেতাজী। দেশের জন্যে সর্ববিসর্জনের ডাক। জীবনের পুণ্যতম অর্জন স্বাধীনতা।

বৃটিশ কমাণ্ডাররা আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল বিলোতে লাগল। বিমান থেকে বোমা-বর্ষণ না প্রলোভন-বর্ষণ:

কী তোমরা ছেলেখেলা খেলতে এসেছে! কী তোমাদের আছে যে যুদ্ধ করবে? গোলাগুলি নেই, কামান-বিমান নেই, জুতো-জামা নেই। খাবার নেই, ওষুধ নেই, চিকিৎসা নেই। আর মাইনে কত পাও শুনি? আমাদের কথা শোনো। আমাদের দলে চলে এস, আমাদের খাতায় নাম লেখাও। সব পাবে। মোটা মাইনে, মজবুত সাজপাট, সুস্বাদু আহার। আহতেরা পাবে পর্যাপ্ত চিকিৎসা। যদি চাও তো দুমাসের সবেতন ছুটি। কোনো ভয় নেই। তোমাদের বুকে টেনে নেবার জন্যে বাহুবিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। চলে এস।

আজাদ হিন্দ বাহিনী ঘৃণায় মুখ ফেরাল। বললে, আমরা দল চিনেছি। দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছি একবার, স্বদেশের জন্যে হাসিমুখে মরব তবু ফাঁসির দড়ি আর গলায় জড়াব না। তোমরা ফিরে যাও, উড়ে পালাও।

আজাদ হিন্দ বাহিনী যত এগোয় ততই পলায়মান বৃটিশ পক্ষ থেকে কিছু কিছু ভারতীয় সেনা ছিটকে বেরিয়ে পড়ে, আজাদ হিন্দ বাহিনীর অঙ্গীভূত হয়ে যায়। বেতনভুক সৈনিক স্বাধীনতার শহীদ হয়ে ওঠে। ক্রীতদাস হয়ে দাঁড়ায় মুক্তানন্দ।

শুধু মর্মের সংবাদটি পৌঁছে দাও ঠিক-ঠিক। তারপর দেখ কে কোন দলে আসে! আজাদ

হিন্দ বৃটিশ পক্ষে নাম লেখায় না বৃটিশ দলের ভারতীয়েরা আজাদ হিন্দ বাহিনীতে এসে কোলাকুলি করে। কে কার বেশি আত্মীয়। রুল ব্রিটানিয়া, না, জয় হিন্দ!

ইংরেজ কেমন ভয় পেয়েছে দেখ। ইস্তাহার ছেড়েছে:

'মণিপুরে জাপানীরা অবাধে এগিয়ে চলেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজও কালাদান পেরিয়ে গেছে। শুধু পালাটোয়া নয়, তিদ্দিম, তোংজাং ও পালামও দখল করে নিয়েছে। আমাদের সতেরো ডিভিসনের সৈন্যরা এখন পিছু হটতে ব্যস্ত। ইম্ফল-শিলচর সড়ক বিচ্ছিন্ন। আমাদের অবস্থা গুরুতর সন্দেহ নেই কিন্তু নৈরাশ্যব্যঞ্জক নয়।'

ইংরেজের আর কিছু না থাক কল-কারখানা আছে। শেষ পর্যন্ত তারা যদি জেতে এই কল-কারখানার জন্যেই জিতবে। শুধু ভারে আর সম্ভারে, উপকরণে আর উৎপাদনে।

তবু আজাদ হিন্দ বাহিনীও নিরাশ নয়। তাদেরও অমোঘ অস্ত্র আছে—স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনা। তাইতে নির্মূল হবে ইংরেজ। ওদের উৎপাদন আমাদের উৎসাদন।

কোহিমার পর ময়রাং ময়রাং-এর পর বিষেনপুর। ইম্ফল আর মোটে তিন মাইল।

চলো ইম্ফল।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সব কটা ব্রিগেডকে ইম্ফল রণাঙ্গণে একত্র করবার আদেশ হল। সমবেত শক্তিতে শত্রুব্যূহে আঘাত করো। ইম্ফল আমাদের অধিকারে এল বলে—আর কটি মুহূর্তে মাত্র বাকি।

যে যে ভারতীয় অঞ্চল আজাদ হিন্দ সরকারের অধিকারে এসেছে তাদের শাসন শৃঙ্খলার ভার পড়েছে কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জীর উপর। সমস্ত একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় নিখুঁত।

সৈন্যবল ও অর্থসামর্থ্য বাড়াবার জন্যে নেতাজী রেঙ্গুনে ফিরলেন।

প্রতিপক্ষ ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তারাও খরতর আক্রমণ চালাল।

মেমিও হাসপাতালে ঝাঁসির রাণী বাহিনীর মেয়েরা আছে শুশ্রূষাকারিণীর কাজ নিয়ে—বেলা দত্ত, রেবা সেন, মায়া গাঙ্গুলী, শিপ্রা সেন, চিত্রা মুখার্জি—আরো অনেকে, কম্যাণ্ডাণ্ট হচ্ছেন লেফটেনেণ্ট জানকী থিবার্স। এরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল—আমরাও যুদ্ধ করব। আমরা শুধু আর্তকেই পরিত্রাণ করি না, দুর্বৃত্তকেও নিধন করি। আমাদের সৈনিক ভাইয়েরা যুদ্ধে প্রাণ দেবে আর আমরা তাদের সরিক হব না এ কেমনতরো কথা?

তারা নেতাজীর কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠাল।

আপনার প্রেরণায়ই আমাদের এ রণসাজ। আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি সাহসিকতার মন্ত্র, ঐশী শক্তির উদ্দীপন। সোজা কথা, আমরা সামরিক শিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছি। তবে কেন আমরা পিছিয়ে থাকব? আর আপনিই তো এ যুদ্ধে পুরুষ আর নারীকে সমান অংশ নিতে ডাক দিয়েছেন। পুরুষ আর নারীর এক স্বদেশ, এক স্বাধীনতা। সুতরাং দয়া করে অনুমতি দিন আমরা শুধু হাসপাতালে নয় রণাঙ্গনেও আমাদের পরিচয় রাখি। আমরা শুধু মমতাময়ী লক্ষ্মী নই, আমরা অসুরদলনী দুর্গা।

নেতাজী নির্দেশ পাঠালেন রাণীবাহিনী থেকে দুটো দল সম্মুখ যুদ্ধে এগিয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান—মরবে, ধরা দেবে না।

বাহিনীর মেয়েরা উল্লাসে ফেটে পড়ল। নেতাজী অনুমতি দিয়েছেন। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

বাছাই দল চলল এগিয়ে। কে বলবে এরা নারী বসন্তমঞ্জরী। এরা যেন সবাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, যুদ্ধের সরঞ্জাম। এক ছন্দে ঝংকৃত। এক উদ্দেশ্যে প্রধাবিত।

যে শত্রুদলের সঙ্গে তাদের সশস্ত্র মোকাবিলা করতে হল, ভাবতে জানকী থিবার্সের মুখ অবর্ণনীয় গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—তারা সহজেই শুধু বন্দুকের গুলিতেই নিস্তেজ হয়ে গেল। বাহিনীর মেয়েদের উপর হুকুম হল, বেয়নেট চার্জ করো, কিন্তু হুকুম তামিল করবার আগেই প্রতিপক্ষ আত্মসমর্পণ করেছে।

এ মেয়েদের একক যুদ্ধের জয়। তাদের মধ্যে অনেকেই আহত, কিন্তু কী হবে শরীর দিয়ে যদি তাকে কোনো বৃহত্তম যজ্ঞের ইন্ধন করা না যায়। শরীর যাক, মন্ত্রের সিদ্ধি হোক। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন।

তার পর? তার পর কী হল?

তারপর অঝোরে বৃষ্টি নামল। পাহাড়ী বর্ষণ।

বর্মার সীমান্ত পেরিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতবর্ষের প্রায় দেড়শ মাইল ভিতরে ঢুকে পড়েছে। প্রায় দেড় লক্ষ বর্গমাইল ভারত ভূখণ্ড শাসন করেছে আজাদ হিন্দ সরকার। আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে সামান্য ক মাসে প্রায় বিশ কোটি টাকা জমা পড়েছে। সবই প্রায় মালয় ও বর্মা-প্রবাসী ভারতীয়দের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কিন্তু ইম্ফল তাঁবে আসছে না যে।

দু মাসেরও বেশি ইম্ফল অবরুদ্ধ হয়ে আছে তবু তাকে কবজা করা যাচ্ছে না। আজাদ হিন্দ বাহিনী তো শুধু শহর দখল চাইছে না, তারা চাইছে অস্ত্র দখল। বৃটিশ সেনাপতি তার বাহিনী নিয়ে পিছু হটে পালিয়ে যেতে চেয়েছে, বাধা দিয়েছে এপক্ষ, কোহিমা-ইম্ফল সড়ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। উদ্দেশ্য তোমাদের বন্দী করব, কেড়ে নেব তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র। আমরা যে সমরসজ্জায় বড় দুর্বল।

বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে দেড় লক্ষ সৈন্য ভারতীয়। সে দেড় লক্ষকে বশীভূত করে সমরোপকরণসহ দলে টেনে আনতে হবে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর মারণাস্ত্র না থাক, যদি অন্তত একটা লাউডস্পিকার—মোহনাস্ত্র থাকত। নেতাজী যদি বিপক্ষ দলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাইকে ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দিতে পারতেন, প্রাণের আবেগে ভরা প্রতপ্ত সম্ভাষণ, দেখতে দেখতে ওরা সগৌরবে স্ব-দলের চলে আসত। চার্চিলের ভাণ্ডার উজাড় করে দিত।

কিন্তু শুরু হল বৃষ্টি। বৃষ্টি সমস্ত কিছু থামিয়ে দিল। স্থগিত রাখল।

রেঙ্গুনে নেতাজী-সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। নেতাজী সর্বাগ্রে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। রেডিও স্টেশনে গিয়ে মহাত্মাজীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। সম্বোধন করলেন 'জাতির জনক' বলে। সে সম্বোধন আবেগে গাঢ়, আন্তরিকতায় মধুর।

'যতদিন জাপান আমাদের শত্রু ছিল বা ইংরেজের বন্ধু ছিল ততদিন আমি ওদের কাছে আসিনি। যখন ওরা বৃটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে তখন, মাত্র তখনই আমি স্বেচ্ছায় ওদের সঙ্গে নিয়েছি। জানি মুখের কথার কোনো দাম নেই, প্রতিশ্রুতির প্রলোভনে আর ভুগছি না, ওদের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার পরিচয় পেয়েছি বলেই আমার এ অভিযান। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে এই শেষ সংগ্রাম। আপনি আশীর্বাদ করুন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব যেন জয়যুক্ত হয়। ইংরেজ বিতাড়িত হয় দেশ থেকে দিল্লীর লাট-প্রাসাদে ওড়ে ত্রিবর্ণ পতাকা!

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামে মহাত্মাজী আর নেতাজী—কৃষ্ণ আর অর্জুন—যোগেশ্বর কৃষ্ণ আর ধনুর্ধর অর্জুন। একজন ভিতর থেকে আরেকজন বাইরে থেকে। একজনের হাল,

আরেকজনের দাঁড়। একজনের 'কুইট ইণ্ডিয়া' আরেকজনের 'জয় হিন্দ'।

কিন্তু যতটা ভাবা গিয়েছিল কার্যকালে ঠিকমত সাহায্য করছে না জাপান। তাদের কাছে ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে নিজেদের স্বার্থই বেশি দামী! এখন কটা বোমারু বিমান পেলে কত সুবিধে হত! কোথায় বিমান! প্রশান্ত মহাসাগর এলেকায় সমস্ত বিমান জাপান সরিয়ে নিয়ে গেছে। বিমন না দাও অন্তত একটা লাউডস্পিকার দাও। বোমার গর্জন না শুনে ওরা একবার নেতাজীর আহ্বান শুনুক, উদাত্তকণ্ঠে উদ্ঘারিত আহ্বান! দেখি সে ডাক শুনে কে প্রসুপ্ত থাকে! কে না এসে নেতাজীর সামনে দাঁড়ায় নত হয়ে, রণগুরুর কাছ থেকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেয়।

কত সহজেই ইম্ফলের যুদ্ধকে ফলবান করা যেত কিন্তু জাপানী 'কিকান' সামান্য একটা লাউডস্পিকার জোগাড় করে দিল না।

তার উপরে আকাশভাঙা নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি। বৃষ্টি থামলে আকাশে ঝাঁকে-ঝাঁকে মার্কিন বিমানের আর্বিভাব।

জাপানী কম্যাণ্ডার শা নওয়াজ খানকে বললেন, এখানে আর অপেক্ষা করা যাবে না, পিছনে সরে যেতে হবে।

অসম্ভব। গর্জে উঠল শা নাওয়াজ। ভারতের মাটিতে যে তিনরঙা পতাকা একবার পুঁতেছি তা তুলে নিতে পারবে না। এখান থেকে এক পা সরব না আমরা।

তোমরা না যাও আমরা চললাম।

হুকুম এসে পৌঁছুল: জাপানী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও পিছু হটে চিন্দুইন নদীর পূব পাড়ে ফিরে যেতে হবে।

পিছু হটা! আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকেরা বিদ্রোহ করে উঠল। আমরা এ অন্যায় হুকুম মানব না কিছুতেই। যে জায়গা একবার অধিকার করে নিয়েছি তা বিনা যুদ্ধে অমনি-অমনি হাত ছাড়া করতে পারব না।

শা নওয়াজ খান তাদের শান্ত করতে চাইল: কিন্তু লড়বে যে উপযুক্ত অস্ত্র কই? রসদ কই? বৃষ্টিতে বন্যায় সব জলময় হয়ে গিয়েছে, কোন পথে খাবার পাবে, কে পাঠাবে? ঘাস-পাতা খেয়ে কদিন বাঁচবে, কদিন লড়বে খাড়া হয়ে? মাটি আঁকড়ে যে পড়ে থাকবে আকাশে ধ্বংসের আয়োজনটা দেখেছ? ঠেকাবে কী দিয়ে? তাছাড়া, যাই তোমরা বলো, এ উপরালার হুকুম, এ তোমাদের নির্বিচারে মানতে হবে। সৈনিকের কাজ কী। হুকুমের ন্যায়-অন্যায় যাচাই করা নয়, বিনাবাক্যে তা তালিম করা।

আজাদী সৈন্যরা তবু ক্ষান্ত হয় না। আমরা একমাত্র নেতাজীর হুকুম মানব। তাঁর হুকুম, দিল্লী চলো। আমরা দিল্লী যাব। ফিরব না কিছুতেই।

নিশ্চয়ই। নেতাজীর হুকুম মানবে। একশো বার মানবে। শা নওয়াজ গম্ভীর হলেন: এ পিছু হটার হুকুমও নেতাজীর।

জয় হিন্দ! নেতাজীর নাম শুনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কণ্ঠ থেকে ধ্বনি উদ্গীত হল।

নেতাজী আজাদী ফৌজের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বাণী পাঠিয়েছেন—কেন তোমরা পিছু হটবে। এ পলায়ন নয়, এ যুদ্ধ জয়ের প্রস্তুতি।

তোমরা জাপানী বাহিনীর সঙ্গে একযোগে বর্মা সীমান্ত পার হয়ে ভারতের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতের মুক্তির জন্য আপ্রাণ যুদ্ধ করছ। তোমাদের বীরত্বের তুলনা নেই। প্রতিপক্ষ সুসজ্জিত

ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও প্রতি যুদ্ধে তাদের তোমরা পরাস্ত করেছ। কোনো কষ্ট, কোনো অভাবই তোমাদের কাছে অসহনীয় ছিল না। দুর্বার শক্তিতে শত্রুর মনোবল ভেঙে দিয়েছ। এখন যখন আমরা ইম্ফল আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছি, জয় যখন অবধারিত, তখন দৈবদুর্বিপাকে প্রবল বর্ষা নামল—আমাদের সমস্ত আয়োজন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। উপায় নেই, সমস্ত বর্ষাকাল আমাদের আক্রমণ স্থগিত রাখতে হবে। সেই অবস্থায় তোমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেখানে তোমরা নিরাপদ অথচ যেখানে থেকে তোমরা ভবিষ্যৎ আক্রমণের জন্যে প্রবলতর প্রস্তুতি নিতে পারবে। কোনো গ্লানি নেই, সঙ্কোচ নেই, তোমাদের অদম্য সাহস ও অবিচল কর্তব্যবোধই আমাদের জিতিয়ে দেবে। যারা রণাঙ্গনে প্রাণ দিয়েছে তাদের আত্মা তো আমাদের যুদ্ধজয়ের অনির্বাণ অনুপ্রাণনা।

নেতাজীর আদেশ! তবে আর কথা কী। আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গেল সৈন্যদের। চলো ফিরে চলো। নেতাজী বলেছেন। বর্ষা-অন্তে আসবে শরতের উজ্জ্বল নীলাকাশ।

কিন্তু জাতীয় পতাকার কী হবে?

তাকে ফেলে যাওয়া চলবে না। তাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো। সে জড় প্রতীকমাত্র নয়, সে আমাদের নিত্য জাগ্রত দিব্য প্রাণপুরুষ।

কিন্তু ফিরে চলা কি সহজ কথা? হাঁটু সমান কাদা, রাস্তা কই? ওদিকে তো নিবিড় জঙ্গল, সাপে-জোঁকে ভরতি, চলব কী করে? নদীর এপারে বসে আছি, পারাপারের নৌকা কই? আর যারা রুগী, অচল, তাদের জন্যে সামান্য গরুর গাড়িও কোথায় জোগাড় হবে?

বোঝা যাচ্ছে জাপানীরা তাদের সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা অনাহারে মরুক এই কি তাদের গোপন অভিলাষ?

কিন্তু যে বীর সৈনিক যে আদর্শে এক লক্ষ্য তার অসাফল্য নেই—সে মরে না।

যুদ্ধে-আহত একটি সৈনিক মরণকে পাশে নিয়ে পথের উপর শুয়ে রয়েছে। কয়েক মাইল হেঁটে এসেছে, আর পা টানতে পারছে না। টলে পড়েছে।

শা নাওয়াজকে দেখে সে থামতে ইশারা করল। ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, দুটো কথা আছে।

শা নওয়াজ পাশে বসল।

'সাহেব, আপনি তো ফিরে যাচ্ছেন, আপনার সঙ্গে নেতাজীর দেখা হবে। কিন্তু আমার সঙ্গে আর হবে না।' সৈনিকের দু চোখ জলে ভরে উঠল। আবার কান্নাকে পিছু হটিয়ে বললে গর্বের সুরে: 'নেতাজীকে আমার জয় হিন্দ জানিয়ে বলবেন তাঁর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা আমি পূরণ করেছি। কিসের প্রতিজ্ঞা বুঝতে পাচ্ছেন?

পাচ্ছি। সমস্ত দুঃখ কষ্ট সয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া।

গভীর তৃপ্তিতে চোখ বুজল সৈনিক। বললে, বলবেন, ঘায়ে পোকা কিলবিল করছে, কী অমানুষিক যন্ত্রণায় প্রাণ দিলাম। কিন্তু শত যন্ত্রণার মাঝেও অগাধ তৃপ্তি—নেতাজীর জন্যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে মরছি। সাহেব, নেতাজীকে আপনি আবার দেখবেন। কিন্তু আমার আর দেখা হবে না।

কত সৈন্য ভুগছে আমাশয়ে, বেরিবেরিতে—হাত-পা-মুখ ফোলা, চলতে পারছে না। তাদের অফিসার এসে তাদের চাঙ্গা করে তুলছে: নেতাজীর কাছে কী প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলে মনে নেই?

আছে। মুমূর্ষুর দল সতেজ হয়ে উঠল। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সমস্ত দুঃখকষ্ট হাসিমুখে

বহন করব। কাতর হব না কুণ্ঠিত হব না।

তবে কষ্ট সয়ে পথ ভাঙো। আর মোটে পঞ্চাশ মাইল। পঞ্চাশ মাইল দূরে কালেওয়াতে নেতাজী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করছে না?

জয় হিন্দ। যেন এক ডাকে রোগ পালাল, কষ্ট পালাল। এমনি খাড়া হয়ে হাঁটতে পাচ্ছে না কেউ কেউ চলল হামাগুড়ি দিয়ে। চোখ বোজবার আগে যদি একবার তাঁকে দেখে চোখ সার্থক করতে পারি।

উনিশশো চুয়াল্লিশের আগস্ট। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ইম্ফল আক্রমণ নিষ্ফল হল।

এ নিষ্ফল্যের আসল কারণ জাপানীদের হিকারী-কিকান-এর অসহযোগ। খোদ সমর-দপ্তরের সঙ্গে কোনো বিরোধ নয়, স্থানীয় সেনাপতিদেরই কুটিল চক্রান্ত। তাদের প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি ছিল ইংরেজের স্থলাভিসিক্ত হয়ে তারাই ভারতে রাজত্ব করবে। কিন্তু তারা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পেরেছে আজাদ হিন্দ বাহিনী তাদের আধিপত্য বরদাস্ত করবে না। এই উপলব্ধির থেকেই তাদের যত তিক্ততা। তিক্ততার চেয়েও হেয় কথা—বিশ্বাসঘাতকতা। শুধু বরাদ্দ সাহায্য থেকেই বঞ্চিত করেনি নয়, যুদ্ধ করতে প্রত্যক্ষে বাধা দিয়েছে। জাপানী সেনাপতিরা চায় না আজাদ হিন্দ ফৌজ বড় হোক, জয়ী হোক।

এখন প্রত্যাবর্তনের পথে মাঝে-মাঝে মুখোমুখি লড়াই হচ্ছে জাপানীদের সঙ্গে। জাপানীরা বুঝি চায় না আজাদ হিন্দ ফৌজের একজনও নিরাপদে ফিরে যাক।

সন্দেহ কী, আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিজের শক্তিতেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। নিজেই নিজের পালক-চালক, নিজেই নিজের উদ্ধার-কর্তা। ভারতের অভ্যন্তরে যতই আমরা ঢুকতে পারব ততই আমাদের শক্তি বাড়বে, ভাণ্ডার পূর্ণ হবে। একবারের পশ্চাদপসরণ আরেক বারের সম্মুখ-আক্রমণ। বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়েছি, দরকার হলে জাপানের বিরুদ্ধে লড়ব। শাদা হোক বা হলদে হোক কোন বিশ্বাসঘাতককেই আমরা রেয়াত করব না।

অথচ ইংরেজের প্রচার যন্ত্র আজাদ হিন্দ বাহিনীর নাম রেখেছে জাপানের পুতুল-বাহিনী। কিন্তু আসলে যে এ মুক্তি ফৌজ এ বুঝি তার মর্মের যন্ত্রণা।

কালেওয়ার আর মান্দালয়ের মাঝামাঝি ইয়ু-তে আছেন তখন নেতাজী, যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তার আগেই তিনি আর্তত্রাণের বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা নিয়েছেন—সেই ছেলেবেলা থেকে দুঃস্থের দুঃখে উদ্বেলপ্রাণ সুভাষ—খাবার-দাবার জুতো জামা ওষুধ ডাক্তার পাঠিয়েছেন এখানে-ওখানে নানান হাসপাতালে। বসিয়েছেন বিশ্রাম-শিবির, পাঠিয়েছেন যান-বাহন। যে একজনকে বাঁচানো যাবে সেই পরে একশো শত্রুর নিহন্তা হবে।

নেতাজী হাসপাতাল পরিদর্শনে বেরুলেন। মেমিওতে পৌঁছে দেখলেন সেখানে প্রায় দু হাজার রুগী। সকলেরই প্রায় শোচনীয় অবস্থা।

যাদের কণ্ঠস্বরে এখনো আর্তনাদ আছে তারা জয়ধ্বনি করে উঠল: জয় হিন্দ।

নেতাজী একটি শয্যালীন রুগীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে সহৃদয় বন্ধুতায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কবে সেরে উঠবে?

আপনি যেদিন বলবেন। রুগ্ন সৈনিকের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল।

নেতাজী বুঝি এক পলক স্তব্ধ রইলেন।

রুগ্ন সৈনিক দীপ্ততর কণ্ঠে বললে, আপনি হুকুম দেবেন যুদ্ধে এগিয়ে চলো সেই দিনই আমি বিছানা ছেড়ে ঠিক উঠে দাঁড়াব।

পারলে রুগ্ন সৈনিক যেন এখুনিই বিছানায় উঠে বসে।

সেবাশুশ্রূষা কেমন চলেছে জানতে চাইলেন নেতাজী।

ঐ যে কিশোরী নার্সটি দেখছেন—বয়স মোটে ষোল—নাম বেলা দত্ত—সে একাই পঁচাশি জন আমাশয় রুগীর সেবা করছে। নার্সের সংখ্যা কম, তা হলেও বেলা একাই ঐ পঁচাশি জনের কাপড়-চোপড় ধুচ্ছে, গা 'স্পঞ্জ' করছে, বিছানা পালটাচ্ছে, জোগাচ্ছে ওষুধ-পথ্য। বেলার প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ। আর ইনি মিসেস চ্যাটার্জী। তাঁর স্বামীও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিক ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এঁরা আমাদের মা-বোনের চেয়েও বেশি।

শুনে আনন্দে নেতাজীর বুক ভরে উঠল। তিনি বেলাকে হাবিলদারের পদে উন্নীত করলেন। আর মিসেস চ্যাটার্জী হলেন লেফটেনেণ্ট।

নেতাজী মান্দালয় হয়ে রেঙ্গুনে ফিরলেন। নতুন করে গড়লেন সমর-পরিষদ। নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। আমাদের যুদ্ধ স্থগিত রয়েছে মাত্র। বর্ষার পরে আবার আমরা আক্রমণ করব। তোমরা সবাই প্রস্তুত হও, সজ্জিত হও, জাগ্রত হও। ভেজা বারুদ শুকিয়ে নাও। অস্ত্রে নতুন করে শান চড়াও।

আজাদ হিন্দ সৈন্যসংখ্যা বাড়তে লাগল। বেড়ে বেড়ে দাঁড়ালো পঞ্চাশ হাজার।

হেড কোয়ার্টার্স মান্দালয়।

রেঙ্গুনের পনেরো মাইল দূরে মিংলাডোনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সামরিক শিবির। সপারিষদ নেতাজী সেখানে এসে পৌঁছেছেন। এক বছর আগে সিঙ্গাপুরে জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়েছিল—তারই জয়ন্তী উৎসব পালিত হচ্ছে।

একুশে অক্টোবর উনিশশো চুয়াল্লিশ। মিংলাডোনের ময়দানে উচ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করছেন নেতাজী, সহসা শত্রুপক্ষের বিমান দেখা দিল মাথার উপর। জাপানী পাহাড় ডিঙিয়ে কী করে উড়ে এল এ পর্যন্ত তার কোন হিসেব-হদিস করবার আগেই বিমান থেকে গুলিবৃষ্টি শুরু হল।

তাকিয়ে দেখ, নেতাজী মঞ্চের উপর নির্বিচল দাঁড়িয়ে। তিনি বুঝতে পেরেছেন তিনিই গুলির লক্ষ্য তবু তাঁর এতটুকু চাঞ্চল্য নেই।

মঞ্চের নিচে দিয়ে মার্চ করে চলেছে আজাদী ফৌজ।

জেনারেল ভিয়ানী নেতাজীকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠলেন: নেমে আসুন। শেল্টার নিন।

নেতাজী নড়লেন না। বললেন, নেমে শেল্টার নেবার মুখে মরার চেয়ে এ মঞ্চে দাঁড়িয়ে মরা অনেক ভালো। বাহিনীর মার্চ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ঠাঁই নাড়া হব না।

ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি, কিন্তু কী ঐশ কৌশল, একটা গুলিও নেতাজীকে স্পর্শ করল না। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি—সেই ঈশ্বরে তিনি শরণাগত, তাই তিনি নিশ্চিন্ত, অক্ষত-অমর। যার মাত্র একে অভিনিবেশ তার আবার ভয় কী, দুঃখ কোথায়?

এ পক্ষের তাড়া খেয়ে বৃটিশ ফাইটার অন্তর্ধান করলে।

তোজো পদত্যাগ করেছে। তার জায়গায় এসেছে জেনারেল কোইসো।

নভেম্বরের গোড়ার দিকে নেতাজী টোকিও গেলেন—জাপানের নতুন সরকারের সঙ্গে নতুন করে কথা চালাতে। আর হিকারী-কিকান নয়, এখন থেকে আমরা স্বেচ্ছাধীন।

নেতাজীর সমস্ত প্রস্তাব মেনে নিল কোইসো। সসম্ভ্রম সৌহার্দ্য স্থাপিত হল। সুদিনে-দুর্দিনে

আমরা পাশাপাশি থাকব, লড়ব এশীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে। সমস্বার্থের সমর্থনে।

টোকিয়ো থেকে আমেরিকার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন নেতাজী: প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধনে জাপানের সাহায্য নিয়ে আমরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছি। তোমাদের বিরুদ্ধে আর আমাদের ভয়ঙ্কর শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে আমরা জাপানকে সাহায্য করছি না, সাহায্য করছি ভারতবর্ষকে—এশিয়াকে। বর্মা আর মালয় ইংরেজের প্রত্যাবর্তন চায় না, চীন চায় না চিয়াংকাইশেককে আর ফিলিপাইনে তোমরা অবাঞ্ছিত।

টোকিও ছাড়বার আগে নেতাজী চেয়েছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে কথা বলে দেখতে। ইউরোপের যুদ্ধ চুকে গেলে ইংলণ্ড-আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার ভাব ঠিক চটে যাবে, তখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে রাশিয়া নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হবে না। তাই ভাবটা এখন থেকে একটু জমিয়ে তুলি। কিন্তু জাপান তাঁকে যেতে দিতে রাজি হল না। নেতাজী দৌত্য করলে জাপানের সঙ্গেও রাশিয়ার সম্পর্ক ভালো হবার সম্ভাবনা—তবুও, না।

ডিসেম্বরে নেতাজী ফিরলেন সিঙ্গাপুর। ঝটিকা-সফর শুরু করলেন। টাকা চাই মানুষ চাই। আবার নতুন করে আক্রমণ রচনা করতে হবে। নানা মুখে নানা পথে, অবিশ্রান্ত অভিযানে।

খবর এল একুশে জানুয়ারী, ১৯৪৫, রাসবিহারী বসু দেহত্যাগ করেছেন।

নেতাজী পতাকা অর্ধনমিত করলেন। নতমস্তকে প্রাণপূর্ণ শ্রদ্ধা জানালেন। হে আত্মা অনির্বাণ, আমাদের পথ প্রদীপ্ত করো, লক্ষ্য নিকটতর করে আনো। তোমার শীল-শক্তি আমাদের মধ্যে বিচ্ছুরিত হোক, তোমার উদারতা তোমার অপ্রমেয়তা যেন আমরা অনুভব করতে পারি।

তেইশে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিন পালিত হল। সবাই প্রস্তাব করল নেতাজীকে সোনা নিয়ে ওজন করা হবে আর সেই সোনা আজাদ হিন্দ ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকবে আর সেই থেকে যুদ্ধায়োজন সমৃদ্ধ হবে। সোনা ভালো, ভাণ্ডার ভালো, যুদ্ধায়োজন আরো ভালো—কিন্তু ওজন করা কেন? নেতাজী আপত্তি করলেন। কিন্তু সোনার সঙ্গে তুলিত হতে পারে নেতাজী ছাড়া আর কে আছে?

স্বর্ণসংগ্রহের অভিযানে রেঙ্গুনের করিম গণি তৎপর হল। ওজনের চেয়েও বেশি সোনা আদায় হল। তাই তো হবে—এ সোনা যে তৌলের নয়, এ যে অপরিমেয়।

দু কোটির উপরে টাকা উঠল।

নতুন একদল তরুণ তরুণী এগিয়ে এল। তারা নিজেদের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করলে: আমরা এমন কাজে নিযুক্ত হতে প্রস্তুত যার পরিণতি অবধারিত মৃত্যু।

চৌদ্দ ফেব্রুয়ারী সৈন্যবাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হল। জেনারেল ভোঁসলে, চ্যাটার্জী, কিয়ানি আর লোগনাথনকে নেতাজী মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে দিলেন। পুরোদস্তুর সাজ-সরঞ্জাম ও সরবরাহের ব্যবস্থা হল। এবার নিশ্চয়ই সৈন্যবাহিনী দু পায়ে খাড়া থেকে লড়াই করবে, পিছু হটবে না। যারা পিছু হটতে চায় তারা যেন আদৌ না যায়, তারা এখান থেকেই পিছু হটুক। নেতাজী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, তবে আর কিসের কী সংশয়! কোথায় আর অবসাদ!

দশুই ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুনের মাইল পাঁচেক দূরে মিয়াং হাসপাতালে শত্রুপক্ষ বোমা ফেলল—আগুনে বোমা। যুদ্ধ যতই বর্বর হোক তবু তার কিছু সভ্য নিয়ম আছে—তার একটা হচ্ছে হাসপাতালকে সরাসরি না মারা। এটা যে হাসপাতাল সেটা প্রকাণ্ড সাইন বোর্ডে নির্দেশ করা ছিল তবু ইঙ্গ মার্কিন চক্রান্ত সেদিন জেনেশুনে কতগুলি অসুস্থ আহত সৈনিককে পুড়িয়ে মারল।

নেতাজী আবার সেবা ও সংগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কিন্তু নানা দিক থেকেই যুদ্ধের অবস্থা খুব ঘোরালো। উত্তরের দিকে মান্দালয়ে জাপানী প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। শহর দখল করে নিয়েছে বৃটিশ বাহিনী—কার্পেট বম্বিং করে সমস্ত গুড়ো করে দিয়েছে। যে দুর্গে অতীতে নেতাজীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেটিও এখন

পশ্চিম দিকের অবস্থাও শোচনীয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের কম্যাণ্ডার লেফটেনেন্ট হরিরাম স্বদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দল ত্যাগ করে চলে গিয়েছে বৃটিশ-শিবিরে। খালি হাতে যায়নি, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে জরুরি কাগজপত্র। আর তারই ফলে পশ্চিমে ইরাবতীর এপারে নিওঙ্গুতে ধীলনের বাহিনীতে ভাঙন ধরেছে।

ধীলনকে চিঠি পাঠালেন নেতাজী: অপরিসীম দুঃখে ও লজ্জায় লেফটেনেন্ট হরিরাম ও অন্যান্যদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনলাম। আমি আশা করি আপনার অধীনে নতুন রেজিমেন্টের সৈনিকেরা তাদের রক্ত দিয়ে আই-এন-এর কলঙ্ক স্খালন করবে।

মান্দালয়েও আজাদ হিন্দ বাহিনীর কিছু সৈন্য দলত্যাগ করেছিল। সেখানকার দলীয় পুলিশ-অফিসারকে চিঠি লিখলেন নেতাজী: যারা দলত্যাগী যারা বিশ্বাসঘাতক তাদের ক্ষমা নেই। মান্দালয়ে আমাদের যে সব সৈন্য ফেরারী হয়েছে তারা কাছাকাছিই আছে আমি এই মর্মে খবর পেয়েছি। তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত পাহারাধীনে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেবেন। যদি গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হয় তাদের গুলি করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

মান্দালয়ে-মেকটিলা-রেঙ্গুন সড়ক দিয়ে শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসছে দক্ষিণে।

পশ্চিম দিক থেকে আগুয়ান শত্রুবাহিনীরও লক্ষ্য মিকটিলা।

আঠারোই ফেব্রুয়ারী নেতাজী এলেন পিনমানায়, সেখানে শা নওয়াজ একটা বাহিনীর কর্তৃত্ব করছিল। কিন্তু পশ্চিম মাউন্ট পোপার খবর খারাপ। কম্যাণ্ডার কর্নেল আজিজ আহমদ বোমার আঘাতে আহত হয়েছে। নেতাজী শা নওয়াজকে বললেন, তুমি পোপায় গিয়ে নেতৃত্ব নাও।

দুদিন পরে সবাই ইন্দোগ্রামে এসে পৌঁছুল। আর কুড়ি মাইল উত্তরে মিকটিলা। কিন্তু মিকটিলাও যায়-যায়।

নেতাজী বললেন, আমি যাব মিকটিলায়। নিভঙ্গু রণাঙ্গনের ভাঙা ব্যূহ আমি গিয়ে জোড়া দেব। দরকার হলে একেবারে পোপার মুক্ত যুদ্ধমঞ্চে অবতীর্ণ হব।

বিশে ফেব্রুয়ারী সদলে মিকটিলায় পৌঁছলেন। সঙ্গে তার সহকারীদল, কুড়িজন দেহরক্ষী আর একজন জাপানী দোভাষী।

মিকটিলা রেল-জংশন, যান-বাহনের সংযোগ-পথ। শত্রুপক্ষের লুব্ধ-দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ। অথচ জায়গাটা জাপানীরা সুরক্ষিত করে রাখেনি। মিকটিলা যদি যায় তবে সমস্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।

যাবে না মিকটিলা। আমি আছি। নেতাজী অস্থির হয়ে উঠলেন: আমিই পোপায় এগিয়ে গিয়ে বৃটিশ বাহিনীর মোকাবিলা করব।

আমি বরং আগে পোপার অবস্থাটা দেখে আসি, শা নওয়াজ নেতাজীকে নিরস্ত করতে চাইল: যদি ভালো বুঝি আপনাকে জানাব, আপনাকে নিয়ে যাব সেখানে। আপনি ততক্ষণ পিনমানায় গিয়ে থাকুন।

না, আমি মিকটিলা ছাড়ব না। তোমরা খবর নিয়ে এস।

কুড়িজন দেহরক্ষী নিয়ে মিকটিলায় থেকে গেলেন নেতাজী। অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নেতাজীর মিলিটারি সেক্রেটারি মেজর জেনারেল মহবুব আহমেদকে নিয়ে শা নওয়াজ চলে গেল পোপায়।

কী আর খবর আনবে! নেতাজী কি বুঝতে পারছিলেন না জাপানীদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। ইউরোপে অক্ষশক্তির চেহারাও অত্যন্ত ম্লান। কিন্তু যে যায় যাক, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, আমাদের পতন নেই। আমাদের জয় হবেই। আমাদের যুদ্ধের কারণ যে পবিত্রতম। আমাদের যে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ।

বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে এসে নেতাজী বললেন, কোনো সন্দেহ নেই আমরা জয়ী হব। যদি অক্ষশক্তি যুদ্ধে বিরত হয় আমরা হব না। শেষতম বৃটিশ আমাদের দেশের সীমানা থেকে বহিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করে যাব।

তিন দিন পরেই ফিরে এল দুজন। যা অনুমান করা গিয়েছিল, খবর মোটেই শুভ নয়। বৃটিশ সাজোয়া বাহিনী আরো অগ্রসর হয়েছে। এ অবস্থায়, সকলেই রায় দিল, নেতাজীর মিকটিলা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। কুড়িজন দেহরক্ষী নিয়ে সাজোয়া বাহিনীর মোকাবিলা করা চলে না।

কিন্তু নেতাজীর দৃঢ়সঙ্কল্প। আমি পোপায় যাবই যাব। সেখানকার রণাঙ্গন আমি নতুন করে সাজাব। ধীলনের সঙ্গে যোগাযোগ করব। কর্ণেল সায়গলকে অর্ডার দেব নতুন করে। আমাদের হাতে এখনো পঞ্চাশ হাজার সৈনিক আছে। তারা তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করবে। মরবে তবু সরবে না।

শা নওয়াজ বললে, মরতে কে ভয় পায়? কিন্তু বৃথা রক্ত দিয়ে কি স্বাধীনতা আনা যাবে?

তুমি বলো কী! বীরের রক্ত কখনো বৃথা হয়? বীরের রক্তস্রোতে ভেসে যাবে বৃটিশ সাম্রাজ্য। আমি কী বলেছিলাম? বলেছিলাম তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব। আমার যাবার ব্যবস্থা করো। আমার সৈন্যরা যেখানে মরছে সেখান থেকে দূরে সরে থেকে আমি নিরাপদ হতে চাই না।

শা নওয়াজ ব্যাকুল হয়ে উঠল। বললে, কিন্তু ওখানে আপনার যদি কোনো বিপদ ঘটে তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের কী দশা হবে, কোথায় যাবে বা ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন? দয়া করুন, আপনি ওদিকে পা বাড়াবেন না।

এ অবাধ্যতা নয় এ আকুলতা। নেতাজীর কণ্ঠে তাই স্নেহ ফুটল। বললেন, তুমি আমাকে অকারণে অনুরোধ করছ। আমি যখন যাব বলে মনস্থ করেছি তখন আমি যাবই। শোনো, চিন্তা কোরো না, সুভাষ বোসকে মারতে পারে এমন বোমা ইংরেজ আজো তৈরি করতে পারেনি।

হয়তো তাই ঠিক তবু শা নওয়াজ ঐ বিপজ্জনক এলেকায় নেতাজীকে কী করে যেতে দেয়? শা নওয়াজের নিজেরও তো একটা কর্তব্য আছে, সে সেই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয় কী করে?

তাই শা নওয়াজও দৃঢ় হল। নম্র অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, নেতাজী, আপনি আমার চেয়ে সর্ব ব্যাপারে সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনার পায়ের নিচে বসবারও আমার যোগ্যতা নেই।

তবু আমি বলব, ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, এ আপনার খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে—

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন নেতাজী।

হ্যাঁ, আপনি স্বার্থপরের মত কাজ করতে চাইছেন।

স্বার্থপরের মত?

তাছাড়া আবার কী। আপনি নিজের বীরত্ব দেখাবার জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে চাইছেন। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনার জীবন আর আপনার নিজের নয়, সে আমাদের দেশের, ভারতবর্ষের। শুনুন, এ রণাঙ্গনে আমি সেই ভারতবর্ষের সেনাপতি। আপনার জীবন আমার কাছে গচ্ছিত সম্পত্তি। তা আমি বিপন্ন হতে দিতে পারি না। যদি দিই—

নেতাজী উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

যদি দিই, সারা দেশ আমার কাছে কৈফিয়ত দাবি করবে।

যদি কৈফিয়ত দাবি করে, বলবে, আমি অপ্রতিবাদে আমার নেতাজীর আদেশ পালন করেছি। বলবে, আমি সৈনিক, নেতাজীর জীবনের চেয়েও নেতাজীর আদেশই আমার কাছে বেশি মূল্যবান।

নেতাজী লক্ষ্য করলেন শা নওয়াজের মুখ বিষণ্ন। তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন নেতাজী। হাসিমুখে বললেন, তুমি কেন ভাবছ, তোমাকে তো আগেই বলেছি আমাকে মারবার মত অস্ত্র ইংরেজের জানা নেই।

দিন গড়িয়ে যেতে-না-যেতেই এক ঝাঁক শত্রু বিমান মাথার উপরে দেখা দিল আর সঙ্গে-সঙ্গেই তুমুল বোমাবর্ষণ। চারধার বিধ্বস্ত হয়ে গেল নিমেষে। ব্রিজ উড়ে গেল, পুড়ে গেল ছাউনি। কিন্তু নেতাজীর গায়ে একটা কণাও এসে স্পর্শ করল না।

কে তাঁকে বাঁচায়। কে তাঁকে ঢেকে রাখে?

কিন্তু এততেও নেতাজী পোপায় যাওয়া বন্ধ করতে চাইলেন না। বরং অধীর হয়ে উঠলেন, যাত্রার উদ্যোগে বিলম্ব হচ্ছে কেন?

কোনোক্রমে শুধু দু তিন ঘণ্টা দেরি করিয়ে দিলে বুঝি এ যাত্রা ঠেকানো যায়। আর কিছুটা সময় কাটিয়ে দিতে পারলেই অন্ধকার পাতলা হয়ে আসবে আর রাত পেরিয়ে ভোরের দিকে নিশ্চয়ই বেরুনো চলবে না।

এ্যাডজুট্যান্ট মেজর রাওয়াতকে একটা জরুরি চিঠি টাইপ করতে দিয়েছেন নেতাজী—সে চিঠি এতক্ষণেও টাইপ হচ্ছে না। ব্যাপাব কী! এদিকে গাড়ির ড্রাইভার গাড়ির কী ত্রুটি মেরামত করতে সময় নিচ্ছে!

এ সব আর কিছু নয় নেতাজীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে রাখার চেষ্টা। অন্তত এক দিনের জন্যে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা। চেষ্টা মানে সূক্ষ্ম চক্রান্ত। নেতাজীব এক দিনের জীবন একটা জাতির এক জীবনের ইতিহাস।

এটায়-ওটায় রাত প্রায় কাবার হয়ে গেল।

পাশের গ্রামে একটা চালাঘরে নেতাজীর শোবার ব্যবস্থা হল। উপায় নেই, যাওয়া বন্ধ, ভোরের আলো ফুটি-ফুটি।

ব্রিচেস টপবুট পরেই শুলেন নেতাজী। শুতে-শুতেই ঘুম।

এদিকে মেজর জেনারেল কিয়ানী জরুরি তার করেছে নেতাজী যেন অবিলম্বে রেঙ্গুনে

সকাল আটটা নাগাদ জাপানী লিয়াজঁ অফিসার তাকাসি এসে হাজির।

নেতাজী কোথায় ?

এই খানিক আগে ঘুমিয়েছেন।

এখুনি বেরিয়ে পড়া দরকার। খবর এসেছে বৃটিশ বাহিনী দু দিকের সড়কই বন্ধ করে দিয়েছে। রেঙ্গুনের ডাক জরুরি, দক্ষিণে পিনমানা হয়ে রেঙ্গুনের পথই ধরতে হবে। শত্রুদল যদি সড়ক রুদ্ধ করে থাকে, আমরা ওদের ব্যূহ ভেদ করেই বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করব। মরতে হয় তো মরব যুদ্ধ করে। নেতাজী হুকুম দিলেন, গাড়ি ঠিক করো।

একটা মাত্র গাড়ি—ড্রাইভার ছাড়া আর চারজন মাত্র যেতে পারে।

নেতাজী একজন, আর বাকি তিনজন কে-কে ?

এক মেজর তাকাসি, দুই নেতাজীর নিজস্ব ডাক্তার কর্ণেল রাজু, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি কে ?

শা নওয়াজ দারুণ সমস্যার পড়ে গেল। সেনাপতি হিসেবে তার উচিত পোপায় গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর পাশে দাঁড়ানো, আবার এদিকে নেতাজীকে অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াও বিপজ্জনক।

শা নওয়াজ তাকাল নেতাজীর দিকে। যিনি সর্বাধিপতি সর্বাধিনায়ক তিনি আদেশ করুন।

নেতাজী বললেন, আমাদের পথে হয়তো যুদ্ধ করতে হবে। তাই একজন যোদ্ধা সৈনিক আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত। তুমিই তবে চলো। তোমার রেঙ্গুন পর্যন্ত যাবার দরকার নেই, আমাদের পিনমানায় পৌঁছেই তুমি ফেরৎ এস। আর দেরি নয়। গাড়ি আনো।

নেতাজীর আদেশ। স্বচ্ছ বিবেকে শা নওয়াজ যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। গাড়িটায় সাধ্যমত হাত-বোমা ও গুলিগোলা ভরে নিল। পিছনের সিটে এক পাশে নেতাজী আরেক পাশে শা নওয়াজ, মধ্যখানে রাজু। ড্রাইভারের পাশে তাকাসি। নেতাজীর কোলের উপর গুলি-ভর্তি টমীগান, শা নওয়াজের হাতে গুলি-ভর্তি ব্রেনগান, মাঝখানে রাজুর দুহাতে দুটি হাত-বোমা, আর তাকাসি ? তাকাসি সিট ছেড়ে টমীগান হাতে গাড়ির পা-দানির উপর দাঁড়িয়েছে। তার লক্ষ্য শত্রুবিমান আকাশপথে উড়ে আসে কিনা, কখন আসে।

সংগ্রামই সর্বাবলম্বন। সকলেই দৃঢ়সঙ্কল্প, উল্লসিত। সবাই একসঙ্গে গুলি চালাতে পারবে এমনি ভাবে সবাই উন্মুখ। আর এ ভেবে সবাই নিশ্চিন্ত যে জীবন্ত বন্দী হব না কিছুতেই। আর যদি মরতেই হয়, সবার অনুভবে এই মহত্ত্ব, নেতাজীর সঙ্গে মরব।

কুড়ি মাইল দক্ষিণে ইন্দোতে নির্বিঘ্নে পৌঁছুলেন নেতাজী। চল্লিশ মিনিটের পথ, কোথায় শত্রুবিমান, কোথায় পথরোধ। ঠিক হল এইখানেই আজকের মত অপেক্ষা করা যাক।

পরিত্যক্ত কোনো কুটীরে আশ্রয় নেওয়া যায় কিনা একটু খোঁজাখুঁজি করছে সকলে—সহসা বোমা-বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। কখন দশ-বারোখানা বৃটিশ বিমান উড়ে এসে নিমেষে সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিল। কিন্তু আবার সেই সর্বকার্যসমর্থ জগৎনিয়ন্তা নেতাজীকে রক্ষা করলেন। শুধু নেতাজীকে নয়, তাঁর সহচরদেরও। নেতাজীর সঙ্গে মরতে পারলেই শুধু গৌরব নয় নেতাজীর সঙ্গে বাঁচতে পারলেও সেই সম্মান।

আর পরিত্যক্ত কুটিরের দিকে নয়, জঙ্গলের দিকে যাওয়াই সমীচীন। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে শত্রুপক্ষের কর্মী গুপ্তচরেরা আনাগোনা করছে, তাদের থেকে আড়ালে থাকাই ভালো। গ্রামের কাছেই একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে লুকোলেন নেতাজী। কিছু পরেই একটা লোক এদিক-সেদিক

উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। দেখেই মনে হল এ শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা না হয়ে যায় না।

শা নওয়াজ বললে, চলুন এখান থেকে সরে পড়ি।

চলো। নেতাজী দ্বিরুক্তি করলেন না।

জীপে করে সবাই মাইল খানেক দূরে আরেকটা জঙ্গলের দিকে এগোল। এটা ঘনতর ও বিস্তৃততর। একটু ফাঁকা-মতন জায়গা খুঁজে নিয়ে নেতাজীর বসবার জন্যে আস্তরণ পাতা হচ্ছে, শোনা গেল বিমানের শব্দ। শা নাওয়াজ ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে দেখল আগের সেই কাঁটাঝোপের উপর দুটো বৃটিশ বিমান খুব নিচু হয়ে চক্কর দিচ্ছে।

'ঐ দেখুন,' শা নওয়াজ নেতাজীকে বললে সহাস্যে, 'ওরা আপনাকে খুঁজছে।'

'লোকটা তাহলে ঠিকই স্পাই। চিনতে পেরেছে আমাদের।'

'বেতার-সঙ্কেতে ক্যাম্পে খবর পাঠিয়েছে।'

'কিন্তু বৃথা।' নেতাজী হাসলেন: 'কাবুল থেকে কোহিমা, স্বর্গমর্ত ঢুঁড়েও আমরা তারা খোঁজ পাবে না।'

সারাটা দিন সেই জঙ্গলেই কাটাল। কিন্তু না খেয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? বেলা পড়ে আসছে কিন্তু খিদে তো পড়ছে না।

গ্রামের ভিতরে গিয়ে খাবার সংগ্রহের চেষ্টা করলে কেমন হয়?

তাতে জানাজানি হবার ভয় থাকে। দরকার নেই বেরিয়ে। দেখি না কতক্ষণ থাকা যায় না খেয়ে।

এ কি একটা কথা হল? ড্রাইভার আর শা নওয়াজ এগুলো সন্তর্পণে। দেখল জঙ্গলের বাইরে একটা ফলা ছোলা-ক্ষেত পড়ে আছে। বোঝা গেল ফসল না তুলেই চাষী পালিয়েছে বোমার ভয়ে। সেই ছোলাই তোলা যাক মুঠো ভরে।

কাঁচা ছোলার ভোজ বসল সেদিন। নেতাজীর কী আনন্দ, কী বদান্যতা! সবার সঙ্গে ছোলা ভাগ করে খাচ্ছেন—সমান-সমান।

কিন্তু আকাশে শত্রু-বিমান দেখা দিয়েছে। ঠিক বোধহয় সন্ধান পায়নি, তাই উড়ছে উঁচুতে। উড়ুক। যিনি সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন করে আছেন তিনিই আচ্ছাদন করে রাখবেন।

নেতাজীর জন্যে ছোট একটা ট্রেঞ্চ ইতিমধ্যেই খুঁড়ে ফেলেছে শা নওয়াজ। সে নেতাজীকে অনুরোধ করল, আপনি ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিন।

নেতাজী রাজী হলেন: চলো তুমিও চলো। আমার জায়গা হলে তোমরাও জায়গা হবে।

দুজনে, নেতাজী আর শা নওয়াজ টেঞ্চে প্রবেশ করল। বাকি তিনজন জঙ্গলের গভীরে গা-ঢাকা দিল।

কিন্তু কোথায় বোমা! বোমার বদলে একটা বিষধর কালো বিছে নেতাজীর গলার কাছে উঠে এসেছে।

শা নওয়াজের মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল: নেতাজী, আপনার ঘাড়ের কাছে বিছে।

দেখেছি। নেতাজী একটুও ভড়কালেন না, নড়লেন না একচুল। নিষ্কম্প নির্লিপ্ত রইলেন। যেন বিমান থেকে জীবনের কোনো ইঙ্গিত না পায়। যোগারূঢ় হয়ে রইলেন।

বিমান চলে গেল। বিছেও চলে গেল।

আবার একটা জরুরি তার এসেছে রেঙ্গুন থেকে। নেতাজীর এখুনি চলে আসা দরকার। পয়লা মার্চ রওনা হলেন জিপে করে। সঙ্গে শা নওয়াজ আর রাজু।

যাবার আগে সবার সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে খেলেন নেতাজী। শুধু ভাত আর নুন, সঙ্গে পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা।

যারা থেকে গেল তাদের নেতাজী আশীর্বাদ করলেন: আমাদের ফৌজের সম্মান যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

যাচ্ছেন বটে রেঙ্গুন কিন্তু নেতাজীর মন পড়ে আছে পোপায়। মিকটিলায়। অন্তত মিকটিলায় যারা আটকে আছে তাদের যদি সরিয়ে আনা যেত। কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থা বোধহয় সহজ হবে রেঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছুলে।

রেঙ্গুনে পৌঁছে খবর যা পাওয়া গেল তা মর্মবিদারক। পোপায় আই-এন-এর চারজন উর্ধ্বতন অফিসার দলত্যাগ করে বৃটিশ পক্ষে চলে গিয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন নেতাজী। আর সব অপরাধ বুঝি ক্ষমা করা যায় বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষমা নেই। মৃত্যুদণ্ডও বুঝি তার পক্ষে লঘুদণ্ড।

চারজন নতুন স্টাফ অফিসার নিযুক্ত করলেন নেতাজী। মেজর রামস্বরূপ, মেজর মেহেরদাস, মেজর আজব সিং আর মেজর রাওয়াত। হুকুমনামা জারি করলেন: আই-এন-এর যে কোনো অফিসার—এমনকি নিম্নতম সেপাই পর্যন্ত—আই-এন-এ দলভুক্ত যে কোনো ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে গুলি করতে পারবে।

নতুন অফিসারদের নিয়ে শা নওয়াজ সাতুই মার্চ পোপার অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

যাত্রা করবার আগে নেতাজীর সঙ্গে একত্র আহার করল সকলে।

নেতাজী ভারাতুর কণ্ঠে বললেন, বুঝতে পারছি যুদ্ধে আমরা হেরে যাচ্ছি কিন্তু তবুও আমাদের নিরুদ্যম হবার কিছু নেই। আমরা আমৃত্যু লড়ে যাব আর কিছুতেই আমাদের দেশের সম্মান ম্লান হতে দেব না।

সকলে একবাক্যে নেতাজীকে আশ্বাস দিল: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের দলের কাউকে আর বেইমান হতে দেব না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বিদায় দিতে বারান্দার সিঁড়ির উপর এসে দাঁড়ালেন নেতাজী।

শা নওয়াজ লক্ষ্য করল নেতাজীর চোখে জল। কী বিপৎসাগরেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে এই বীরদল! এদের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা কে জানে!

যেমন কৃতঘ্ন কাপুরুষ আছে তেমনি আবার আছে তেজস্বী শূরপুরুষ। আছে মেজর ধীলন। তার রেজিমেন্ট প্রবল বিক্রমে রুখে দাঁড়িয়েছে। নিয়ঙ্গু থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেও এখন মাটি কামড়ে যুদ্ধ করছে। পোপা থেকে শত্রু সৈন্যকে ঝেঁটিয়ে না তাড়িয়ে সে ছাড়বে না।

নেতাজী ধীলনের কাছে অভিনন্দন পাঠালেন:

তোমার জন্যে আমাদের গর্ব ও আনন্দ হচ্ছে। তুমি ও তোমার বাহিনী মহৎ কর্ম ও আত্মত্যাগের দ্বারা দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের কলঙ্ক মোচন করো।

ধীলন উত্তর দিল: ভয় নেই নেতাজী, আমরা প্রাণ দিয়ে আজাদ হিন্দের মান বাঁচাব। পরিণামে ফল কী হবে জানি না, আমরা আমাদের চোখের সামনে আপনার আদর্শ খাড়া রেখে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাব। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সৈন্যও বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ স্থায়ী হবে। রেশন জোটে কি না জোটে, জল মেলে কি না মেলে, আমরা বিরত হব না।

অস্ত্রের যা ঘাটতি তা আমরা আমাদের সঙ্কল্প দিয়ে পূরণ করব।

কিন্তু দেখতে-দেখতে অবস্থা যেন হাতের বাইরে চলে গেল। সত্যি, জাপান কী করছে? সেই যে ইম্ফল থেকে পিছু হটতে শুরু করেছে, অনবরতই পিছু হটছে। কোথাও একটা বাধার প্রাচীর তুলে ধরে দাঁড়ায়নি খাড়া হয়ে। যেন ত্রস্ত, বিপর্যস্ত। কোনো প্রাণ নেই, আন্তরিকতা নেই। দুর্ধর্ষতার নাম-গন্ধ নেই। রেঙ্গুনকে বাঁচাবার দায়িত্ব যেন একা আই-এন-এর—জাপানী সৈন্যরা নিষ্ক্রিয়, বর্মী সৈন্যরা নির্জীব।

তবু যা লড়ছে একা এই আজাদ হিন্দ বাহিনীই লড়ছে। সাদিপাহাড়ে, তাউংজিনে, লেগীতে। দলত্যাগী বিশ্বাসহন্তারাই নয়, আছে খান মহম্মদ, আছে জ্ঞান সিং, আছে ক্যাপটেন বাগড়ি।

এক ব্যাটালিয়ন বৃটিশ সৈন্য সাদি পাহাড়টা দখল করে আছে। তাদের তাড়িয়ে দিয়ে পাহাড়টা কব্জা করা দরকার—পাহাড়ের মাথাটা যুদ্ধের পক্ষে খুব দামী। কিন্তু নিচে থেকে আক্রমণ চালিয়ে উঁচুতে শত্রুঘাঁটি ঘায়েল করা প্রায় অসম্ভব। পাহাড়ের মাথায় কত তাদের কামান কত তাদের রণসম্ভার। কিন্তু মাত্র দেড়শো সৈন্য নিয়ে খান মহম্মদ অসাধ্যসাধন করলে, শুধু মাত্র অপূর্ব রণকৌশলে আর দূরন্ত সাহসে। তাও তার সৈন্যদের পায়ে জুতো নেই। গুড়ি মেরে রাতের অন্ধকারে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেল উপরে। শত্রুপক্ষ কামান দাগল, কামানের গোলা ওদের মাথা টপকে পড়ল গিয়ে বাইরে-দূরে। মেশিনগানকে অগ্রাহ্য করে খান মহম্মদের দল একেবারে বেয়নেট চার্জ করে বসল। পালাই-পালাই করে বৃটিশ বাহিনী ছুট দিল।

নেতাজী-কি-জয়! সাদি পাহাড়ের শীর্ষে ত্রিবর্ণ পতাকা প্রোথিত করল খান মহম্মদ।

আর তাউংজিন শুধু রাইফেল দিয়ে ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লড়ে শত্রুকে ঘায়েল করেছিল জ্ঞান সিং। শুধু দুটি মাত্র ধ্বনি: চার্জ! আর, নেতাজী কি জয়। ট্যাঙ্কগুলো গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে আর পাশাপাশি চালাঘরে জ্বলে উঠেছে আগুন। আর সেই আগুন ক্রুদ্ধ শিখায় গ্রাস করেছে ট্যাঙ্কগুলোকে।

যুদ্ধ জয় করেও বাঁচল না জ্ঞান সিং। শত্রুপক্ষের এক আহত সৈনিক আচম্বিতে তাকে গুলি করে বসল। ক্যাপটেন জ্ঞান সিং বরাবর বলত সৈন্যদের সঙ্গেই সে যুদ্ধেই প্রাণ দেবে, তফাত থাকবে না। তার সে-কথার খেলাপ হল না।

আর দুহাতে দু হাত-বোমা নিয়ে ক্যাপটেন বাগড়ি উদ্যত কামানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টহল দিয়ে ফিরছিল বাগড়ির দল, হঠাৎ শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। খোলা মাঠ, গর্ত খুঁড়ে আত্মরক্ষার সময় নেই। এখন হয় আত্মসমর্পণ নয় তো যুদ্ধ করে মরণ-বরণ। তোমাদের কী মত, অনুগামী সৈনিকদের জিজ্ঞেস করল বাগড়ি।

আপনি কী করবেন?

আমি কী করব!

মুহূর্তে দু হাতে দু হাত বোমা নিয়ে সামনের ট্যাঙ্কেব কামানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাগড়ি। বোমার বিস্ফোরণে উলটে পড়ল ট্যাঙ্ক।

বাগড়ি অবশ্য বাঁচল না। সবাই নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল কাকে বলে বীরের মৃত্যু। যুদ্ধে ফল নেই জেনেও আত্মরক্ষায় অনিচ্ছুক, এমন মহত্ত আছে কোথায়? আত্মসমর্পণ করে আত্মরক্ষা এ যার বুদ্ধিতে আসুক সে বাগড়ি নয়।

এত সব প্রাণের সম্পদ, সঙ্গে যদি সমর-সম্পদ [illegible] কী বিচিত্র আয়োজন, কী বিপুল রণসম্ভার!

বিশে এপ্রিল জাপ-সেনাপতি জেনারেল কিমুরা নেতাজীকে জানাল যে জাপানীরা রেঙ্গুন ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। তোমরা কী করবে?

সমর-পরিষদের সভা ডাকলেন নেতাজী। নেতাজীর ইচ্ছে ছিল একাই লড়ে যাবেন রেঙ্গুনে—তাঁর শেষ লড়াই। তাতে যদি তাঁর মৃত্যু হয় তো হবে, তিনি লড়াই ছাড়বেন না। জাপানীরা ফেলে গেলেও না।

কিন্তু সমর-পরিষদের অন্য বক্তব্য। মালয়ে এখনো আজাদ হিন্দের সৈন্য আছে, সেখানে গড়ে তুলব প্রতিরোধ। নতুন বাহিনী তৈরী করব ব্যাঙ্ককে। এখানে শেষ লড়াই করতে গিয়ে নিঃশেষ হব কেন? নেতাজী ছাড়া কে আর নতুন নির্মিতির উদ্দীপনা জোগাবে? কে জানে আপনার মন্ত্রনাদে শুকনো নদী প্রাণের জোয়ারে উত্তাল হয়ে উঠবে, ছাপিয়ে যাবে কুল কিনারা। আপনি রেঙ্গুন ছাড়ুন।

উপদেষ্টাদের সিদ্ধান্ত মানতে হল নেতাজীকে। কিন্তু ঝাঁসির রাণী-বাহিনীর মেয়েদের কী হবে? তাদের আগে সরানো চাই। তাদের ফেলে আমি পালাতে পারব না।

একদল মেয়ে সৈনিক প্রায় তিন সপ্তাহ আগে দেবনাথ দাসের কর্তৃত্বাধীনে আগেই বেরিয়ে গিয়েছে ব্যাঙ্ককের পথে। সংখ্যায় দেড় শো, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছে একশো জোয়ান। সিতাং নদী পর্যন্ত নির্বিঘ্নে আসা গেল লরি করে। কিন্তু খেয়া নৌকায় নদী পার হবার আগেই শত্রুপক্ষের বিমান বোমা ফেলতে শুরু করল। সবাই ঝোপে-জঙ্গলে আশ্রয় নিল। এলোপাথাড়ি বোমা ফেলে চলে গেল বিমান। কেউ হতাহত হল না।

নদী পেরিয়ে এবার ট্রেন ধরতে হবে। মালগাড়ির একটা ওয়াগন শুধু পাওয়া গিয়েছে, তারও আবার দরজা নেই। যে করে হোক, তারই মধ্যে আড়াইশো লোকের স্থান করে নিতে হবে। উপায় নেই। এ গাড়িরই বা ভবিষ্যৎ কী কেউ জানে না। গেরিলারা কে কোথায় ওৎ পেতে আছে ঠিক নেই।

চটপট উঠে পড়ো।

এখন কে আগে ওঠে!

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল নাকি? না। কেউ উঠছে না। জোয়ানরা বলছে, বোনেরা আগে উঠুক। আমরা থাকব দরজার ফাঁকের দিকে। বোনেদের গায়ে একটি ফুলকিও পড়তে দেব না।

রাণী-বাহিনীর বোনেরা হাসল। আমাদের প্রাণের এমন দাম কী! ভবিষ্যতের ভারী লড়াইয়ে আমাদের জোয়ান ভাইদেরই তো এগিয়ে যেতে হবে। তাই আমরাই ওদের রক্ষী হব। দরজার গোড়ায় আমরাই বসব রাইফেল নিয়ে।

তাই হল। জোয়ান ভায়েরা আগে উঠল। পরে ভগ্নী-বাহিনী। দরজার মুখে রাইফেল বাগিয়ে বসল স্টেলা কমলা জোসেফাইন।

অন্ধকারকে আরো অন্ধকার করে দিয়ে ট্রেন ছাড়ল। এক ইঞ্জিন এক বগি!

এখনো শ খানেক মতো মেয়ে-সৈন্য আছে রেঙ্গুনে। তাদের নিরাপদ অপসারণের জন্যেই নেতাজী উদ্বেগ-ব্যাকুল। যারা রেঙ্গুন-অঞ্চলের মেয়ে তাদের বাছাই করে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হল। বাকি রইল প্রায় ষাট জন। তাদের কারু বাড়ি সিঙ্গাপুরে, কারু বা জাভা, কারু বা আরো দূরে। ওরা নেতাজীর সঙ্গী হবে। যতদূর যাওয়া যায়।

লরির জন্যে এক দিন দেরি হয়ে গেল। উনিশশো পঁয়তাল্লিশের চব্বিশে এপ্রিল সন্ধ্যা

পার করেই নেতাজী সদলে রেঙ্গুন ছাড়লেন। চারখানা গাড়ি আর বারোটা লরির কনভয়। বারোটা লরির মধ্যে তিনটেতে রাণী বাহিনীর সৈনিকরা।

যাবার আগে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর অফিসার ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক উত্তপ্ত সম্ভাষণ পাঠালেন: 'যে শৌর্য-বীর্যে তোমরা ব্রহ্মদেশে সংগ্রাম করেছ তার তুলনা হয় না। উনিশশো চুয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারী থেকে সে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, এখনো তার সমাপ্তি ঘটেনি। ইম্ফলে ও বর্মায় সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়ে আমরা হেরেছি, কিন্তু এখনো অনেক অধ্যায় বাকি আর আমি ঘোরতর আশাবাদী, শেষ পর্যন্ত আমরা জয়ী হবই।

ভারতের মুক্তি হবেই এ বিশ্বাসে আমি অপরাভূয়। তোমাদের হাতে ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা, ভারতের জাতীয় সম্মান ও ভারতের বীর যোদ্ধাদের অমূল্য ঐতিহ্য তোমার হাতে সমর্পণ করে যাচ্ছি। তোমরা ভারতের মুক্তি ফৌজের অগ্রনায়ক, অন্যত্র যুদ্ধরত তোমাদের সঙ্গীদের অনুপ্রাণিত করবার জন্যে তোমরা মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাবে, এমন কি, আমি জানি নিজেদের বলি দিতেও কার্পণ্য করবে না।

তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার মর্ম-বিদারণ কষ্ট হচ্ছে। নিজের ইচ্ছা মতো চলতে পেলে তোমাদের সঙ্গে এই সাময়িক পরাজয়ের দুঃখ একসঙ্গে ভাগ করে নিতাম কিন্তু আমার মন্ত্রীমণ্ডলী ও উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের পরামর্শে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে—তোমরা বুঝতেই পারছ, মুক্তি সংগ্রামে বৃহত্তর প্রস্তুতি নেবার জন্যে। তোমরা হতাশ হয়ো না, তোমাদের দুঃখ কষ্ট আত্মত্যাগ অনর্থক হবার নয়। তোমরা আশ্বস্ত থাকো যে যেখানে ভারতবাসী আছে সবাই তোমাদের এই মুক্তি-সংগ্রামে শরিক হবে আর আমি নিজের কথা শুধু এইটুকু বলতে চাই যে ১৯৪৩-এর ২১ শে অক্টোবর আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর মঙ্গলকল্পে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করব বলে যে শপথ করেছি তার থেকে আমি ভ্রষ্ট হব না। আমার মত আপনারাও আশাবাদী হোন, বিশ্বাস করুন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই, এবং আমি বলছি, অত্যল্পকালের মধ্যেই।

ভগবান নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ।'

মেজর জেনারেল লোকনাথন রইলেন আই-এন-এর আত্মসমর্পণে পৌরোহিত্য করবার জন্যে। নেতাজী আরো বললেন: 'সাময়িকভাবে যদি হেরে যেতেই হয় জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উঁচু করে তুলে ধরে লড়তে-লড়তে হেরে যাও। বীরের মত পরাজয় মানো, পরম সম্মান ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্যর্থতা বরণ করে নাও। সাময়িক পরাজয়ের ভূমিতেই চূড়ান্ত সাফল্য ও গৌরবের সৌধ নির্মিত হবে।'

বর্মায় ভারতীয় ও বর্মী বন্ধুগণের উদ্দেশে আরেক বাণী প্রচারিত করলেন নেতাজী:

ভারাতুর হৃদয়ে আমি বর্মাদেশ ছেড়ে যাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বে আমাদের পরাজয় হয়েছে। সে পরাজয় শুধু প্রথম পর্বেই। এক প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে বলে আমাদের নিরাশ বা নিরুদ্যম হবার কারণ নেই।

বর্মাপ্রবাসী আমার স্বদেশবাসীরা, যে ভাবে আপনারা আপনাদের মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য পালন করেছেন তা দেখে সমস্ত পৃথিবী আজ মুগ্ধ। মুক্ত হস্তে আপনারা আপনাদের ধন জন ও সম্পদ দান করেছেন, অক্লেশে অকাতরে—সামগ্রিক যুদ্ধের আদর্শ কী, দেখিয়েছেন তারই মহত্তম দৃষ্টান্ত। বিশেষত বর্মায় আমার সদর দপ্তর উঠিয়ে আনার পর আপনাদের যে নিঃস্বার্থ

আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখেছি অ কোনো দিন ভুলব না।

আমি আপনাদের কাছে আকুল আবেদন জানাই ভারতের স্বাধীনতার কথা মনে রেখে আপনারা সেই আত্মত্যাগের স্পৃহাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, আর অই ধরে মাথা উঁচু করে চলবেন আর অপেক্ষা করবেন কখন আবার ভারতের মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার ডাক আসে!

ভারতের শেষ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বর্মাপ্রবাসী ভারতীয়দের নাম যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাতে সন্দেহ নেই।

শুধু ভারতীয়দের কাছেই নয়, সার্বিক সাহায্যের জন্যে বর্মার সরকার ও জনসাধারণের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যখন সময় আসবে স্বাধীন ভারত সর্বতোভাবে এই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করবে।

আমি চিরকাল বলে এসেছি প্রভাতের পূর্ব মুহূর্তেই ঘোর অন্ধকার। এখন যখন ঘোর অন্ধকার আমাদের ঘিরে ধরেছে তখন আর সন্দেহ নেই প্রভাত সমাসন্ন।

নেতাজীর কনভয় চলেছে উত্তরমুখো পেগুর দিকে। গাছের লতা-পাতা দিয়ে গাড়ির মাথাগুলো ঢাকা, উপর থেকে যেন চেনা না যায়, যেন ঝোপ জঙ্গল বলে ঠাহর হয়।

জাপানীরাও চলেছে। যত কাগজ-পত্র দলিল-ইস্তাহার ছিল সব পুড়িয়ে ফেলছে স্তূপ করে। পেগুর দিকে যতই এগুনো যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে শুধু আগুনের তাণ্ডব। জাপানীর 'পোড়া মাটি' নীতির ব্যাপক রূপায়ন। যে জিনিস নিয়ে যাওয়া যাবে না, তা দামী সমরোপকরণ হলেও, তাকে অকেজো করে রেখে যাওয়া। এও একরকম শত্রুর মুখে ছাই দিয়েই পালানো।

জ্বলন্ত পেগু শহর পেরিয়ে কনভয় ওয়া নদীর কাছাকাছি এসে থামল। ভোরের আলো ফুটছে আর এগুনো চলবে না।

তারিখ ২৫শে এপ্রিল। সময় সকাল আটটা।

ঘনপত্রাচ্ছন্ন গাছের আড়ালে বসে রাণীবাহিনীর কটি মেয়ে চা তৈরি করছে, অদূরে একাকী একটা গাছের তলায় কম্বল বিছিয়ে বসে দাড়ি কামাচ্ছেন নেতাজী আর কাছাকাছি মাঠে প্রচারসচিব আয়ার প্রভাতী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে—হঠাৎ আকাশে খানকয়েক জঙ্গী বিমান এসে উপস্থিত। আর সঙ্গে সঙ্গে বুলেটবৃষ্টি। যে যার বুদ্ধিবিবেচনামত দ্রুত আশ্রয় নিল, মেয়েরা গাছের ছায়ায় একটু নিবিড়তর আড়াল খুঁজল, আয়ার ছুট দিল, ঢুকল গিয়ে এক খড়ের গাদায়, রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে।

আর নেতাজী? এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই। যেমন দাড়ি কামাচ্ছিলেন তেমনি কামাতে লাগলেন।

নেতাজীর সমাধিযোগ। নেতাজী নির্বিচল, নেতাজী চিন্তাশূন্য। নির্বিচলতাই যোগ, চিন্তাশূন্যতাই ধ্যান, মনকে আত্মাতে নিহিত করাই সমাধি।

যিনি আত্মস্থ তার আবার আশ্রয়ের কী প্রয়োজন? যিনি স্থিতাসন নির্বেদশূন্য তার আবার ভয় কোথায়?

রাণীবাহিনীর মেয়েরা গ্রামের মধ্যে কোথায় জায়গা করে নিয়েছে দেখতে চললেন নেতাজী।

খোলা মাঠে একটা ধানখেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন—সঙ্গে জানকী থিবার্স— আচম্বিতে ছ খানা শত্রু বিমান দেখা দিল। কী বিপদ, নেতাজীকেই কিনা আত্মরক্ষার নির্দেশ দিল জানকী। এখানে তো কোনো পরিখা নেই, জানকী ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেল : মাটিতে শুয়ে পড়ুন—এক্ষুনি—

নেতাজী মৃদু হাসলেন। মাটির উপর বসলেন। শান্তিতে একটা সিগারেট ধরালেন।

বিমানগুলি চলে গেল।

কে এ লোক যে বিপদে থেকেও বিপদে পড়ে না। ভয়ই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভয় পেয়ে।

বেলা চারটে নাগাদ নেতাজী অর্ডার দিলেন, আমাদের পিছনকার বাহিনীর কাছে খবর পাঠাও তারা যেন সড়ক ছেড়ে দিয়ে রেল-লাইন ধরে আসে। নচেৎ, আমি অনুভব করছি, শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক-বাহিনী আসছে সড়ক ধরে।

এ এক প্রাকচেতনা। দিব্য চেতনা। ভবিষ্যত দৃষ্টি।

একটা মোটর সাইকেলে করে বার্তাবহ পাঠানো হল। খবর পৌঁছুনো হল যথাসময়ে। আর বাহিনীর সড়ক ছেড়ে সরে আসবার কয়েক মিনিট পরেই শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক-বাহিনীর আবির্ভাব।

ছশো সৈন্য ছিল সেই বাহিনীতে। নেতাজীর নির্দেশ এসে না পৌঁছুলে কাউকে বাঁচতে হত না।

সন্ধে ছটায় আবার যাত্রা শুরু হল। কিন্তু নামল বৃষ্টি—তুমুল বৃষ্টি। সবাই ভিজে গেল—নেতাজীও। তাতে দমবার কিছু নেই—এগিয়ে চলো। বৃটিশ ট্যাঙ্কের মুখে পড়বার আগেই সিতাং নদী পার হওয়া চাই।

নেতাজীর গাড়ি একেবারে সামনের দিকে। হঠাৎ কী হল, গাড়িটা চাকা পিছলে পাশের নালার মধ্যে নেমে পড়ল।

কী সর্বনাশ! পিছনে রাণীবাহিনীর মেয়েরা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল—নেতাজী!

না, নেতাজীর কিছু হয়নি। তিনি ঠিক সময়ে আশ্চর্য তৎপরতায় দ্রুত নেমে পড়েছেন।

সবাই বিস্ময়ে হতবাক—এ কী অঘটন! যে চালায় সেই থামায় সেই আমার মরণের মুখ থেকে টেনে রাখে।

গাড়িটাও শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হয়।

ওয়ায় পৌঁছুতে রাত প্রায় দুটো। জাপানী লরিও শয়ে-শয়ে এসে পড়েছে। নদীর উপরে কোনো সাঁকো নেই। নদী পেরোবে কী করে?

যে কটা খেয়ার নৌকা ছিল জাপানীরাই গ্রাস করেছে। আজাদ হিন্দের জন্যে একখানা।

জেনারেল ইসোডা আপ্যায়িত করার ভঙ্গীতে নেতাজীকে বললে, 'বহুকষ্টে এই একখানা আপনার জন্যে জোগাড় করেছি। এতে করে আপনি প্রথমে পার হোন।'

আমি পার হব? আর আমার মেয়েরা? নেতাজী দারুণ বিরক্ত হলেন। বললেন, মেয়েরা পার না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না এক পা।

আপনি ভাববেন না নেতাজী। জানকী থিবার্স এগিয়ে এল: আমরা মেয়েরা সবাই সাঁতার জানি, আমার মাথার উপরে রাইফেল তুলে নিয়ে নদী পেরিয়ে যাব দেখবেন।

কর্ণেল মালিক আর মেজর স্বামী পরীক্ষা করে দেখে এল এক জায়গায় নদীর জল মোটে ছ'ফুট গভীর। সেই জায়গায় এসে বীরাঙ্গনারা জলে নামল, হাতের রাইফেল নত করল না। মালিক আর স্বামী সঙ্গে রইল। কেউ যদি হঠাৎ পড়ে যায়, ডুবে যায়, তারা সক্ষম হাতে রক্ষা করবে।

এ পারে দাঁড়িয়ে নেতাজী দেখলেন পার হওয়া।

নেতাজীর জন্যে আবার রাণীদের দুশ্চিন্তা। নেতাজী যেন বড্ড বেশি ফাঁকা আর একা—যদি হঠাৎ শত্রুবিমান উড়ে আসে। আবার মনে-মনে তারা বিরাট বিশ্বাসের বল সঞ্চয় করল—বিপদ ভঞ্জন রয়েছেন নেতাজীর সঙ্গে। তাঁকে মারতে পারে বৃটিশের এমন বোমা নেই।

সবাই পার হয়ে গেলে শেষ খেয়ায় নেতাজী পার হলেন।

সারা রাতের চেষ্টায় মোটে ছখানা লরি নদী পার করা গিয়েছে। বাকিগুলি থাক ওপারে।

নদী পেরিয়ে যে গ্রাম তার নাম আপিয়া। কাছেই একটা মণ্ডপওয়ালা খালি বাড়ি পেয়ে সবাই তাতে আশ্রয় নিল। নেতাজী দাওয়ার উপর বসলেন। সিগারেট ধরালেন।

'ভিতরে চলুন স্যার।'

'না, ভিতরে মেয়েরা বিশ্রাম করুক।'

এক ঝাঁক বিমান উড়ে আসছে—শব্দ শোনা গেল। চলো ঐ গাছতলায় যাই।

এটা একটা আম-বাগান। গাছতলায় মাচা বাঁধা। বাগানের মালির জন্যেই এই মাচা বোধ হয়। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। নেতাজী ন্যাড়া সেই মাচার উপর শুয়ে পড়লেন। একটা কিছু বিছিয়ে নেবার প্রয়োজন দেখলেন না।

শুতে না শুতেই ঘুম। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বিমান-আক্রমণ।

'মাচা থেকে নেমে পড়ে কোথাও আশ্রয় নিন।' অফিসাররা চেঁচিয়ে উঠল।

ঘুমের আরামে নেতাজী শুধু পাশ ফিরে শুলেন। যিনি জাগরণে দেখেছেন তিনি নিদ্রায়ও দেখবেন। তাঁর তো নিদ্রা নেই।

মণ্ডপের উপর বোমা পড়েছে। রাণীবাহিনীর অনেকেই আহত হয়েছে, যদিও কেউ প্রাণে মরেনি। লরি এসে ঠেকেছে ছয়খানায়। সেই ছখানা লরিতে আহতদের নিয়ে রাত্রে ফের যাত্রা শুরু।

নেতাজীর গাড়ি ছিল, কিন্তু তিনি তাতে উঠলেন না। পায়ে হেঁটে চললেন। একটানা প্রায় দশ মাইল।

শেষ রাতে সেতাং নদীর প্রান্তে এসে পৌঁছলেন। নদীটা পেরিয়ে যেতে পারলে বিপদের ঘোরটা লাঘব হবে। একটা মাঠের প্রান্তে কতগুলো আবৃত চালাঘর, তাতেই আহতেরা বিশ্রাম করছে। নেতাজী তাদের দেখতে যাচ্ছেন, সঙ্গে দেহরক্ষীরূপে লেফটেনেন্ট নাজির আহম্মদ, চলেছে পাশাপাশি কিন্তু পা কি আর চলে!

ছুটুন! আশ্রয় নিন।

শত্রু পক্ষের একটা ফাইটার-বিমান উড়ে এসেছে মাঠের উপর। এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। এবার আর নিস্তার নেই।

যত দ্রুত সম্ভব চালাঘরে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। সেটা এই খাঁ-খাঁ ফাঁকা মাঠের চেয়ে ভালো।

চালাঘরের দাওয়ায় লাফ দিয়ে ওঠবার মুহূর্তেই কতগুলি গুলি পড়ল ছিটিয়ে। বিদ্ধ করল নাজিরকে। নেতাজীকে স্পর্শও করল না। আগেই তিনি দাওয়ায় উঠে পড়েছেন।

সন্ধ্যার পরে সেতাং নদী পার হওয়া গেল। নেতাজীর গাড়ি ছাড়া আর একখানা লরিও আসতে পারেনি।

নেতাজী বললেন, আমার গাড়িতে শুধু আহতেরা যাবে।

আপনি?

আর সকলের সঙ্গে হেঁটে যাব।

শুধু হেঁটে নয়, পিঠে আধমণ আন্দাজ বোঝা বয়ে। নেতাজী নিজেও এই বোঝা বইছেন। বইছে রাণীবাহিনীর মেয়েরা। তাদের সংখ্যা বুঝি এখন চল্লিশ। যতক্ষণ বাঁচা ততক্ষণ লড়া,

আর যতক্ষণ নড়া ততক্ষণই বাঁচা এই মন্ত্রে, এই চলার মন্ত্রে তারা একরাত্রে দশ মাইল পথ হাঁটল।

সকালে একটা গ্রামে এসে থামলেন সকলে। অপেক্ষা করতে লাগলেন কতক্ষণে রাত হবে, আর রাত হলে শুরু হবে পদযাত্রা।

পরদিন রাত্রে আবার পনেরো মাইল।

এ কী, নেতাজী খুঁড়িয়ে হাঁটছেন কেন? কিছু নয়, বলে এড়িয়ে যাওয়া গেল না। অফিসাররা প্রায় জোর করে নেতাজীর জুতো-মোজা খুলে ফেলল। দেখা গেল দুপায়ে বড়-বড় ফোস্কা। টপ-বুট পরে এত দীর্ঘ পথ চলার এই পুরস্কার।

হ্যাঁ, এই খোঁড়া পায়েই চলব আমি। নেতাজী বললেন, আমাদের মৌলমিনে পৌঁছুতে হবে।

সন্ধ্যাগমে আবর যাত্রা। এ বুঝি এক নিশাচর বাহিনী। দিনের বেলায় আচ্ছাদন, রাত্রিতে অপসরণ।

ঐ ফোস্কা পায়ে আরো পনেরো মাইল হাঁটলেন নেতাজী। অফিসাররা সঙ্গে আছে, রাণীবাহিনীর মেয়েরাও সঙ্গে আছে—শুধু সৈন্যদলই রয়েছে পিছিয়ে।

আপনি আসুন আমাদের গাড়িতে। জাপানী মেজর যাচ্ছিল গাড়ি করে, নেতাজীকে ডাকল : মৌলমিনে পৌঁছে দিই।

নেতাজী হাসলেন। ধন্যবাদ। আমার এ চল্লিশটি বোন ফেলে রেখে আমি যেতে পারব না।

জাপানী গাড়ি চলে গেল।

বিলিন নদীর খেয়া পার হল সকলে কিন্তু খোদ সৈন্যদল কই? নেতাজী তাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন ঠিক করলেন! কাউকে তিনি ফেলে রেখে যাবেন না।

জেনারেল ইসোদা মৌলমিন থেকে কতগুলি লরি নিয়ে এসেছে। এই লরি করে আপনি আপনার রাণীবাহিনীর মেয়েদের নিয়ে কেটে পড়ুন।

আর আমার সৈন্যরা?

তারা পায়ে হেঁটে যাবে।

না, ওরা খেয়া পেরিয়ে আগে আসুক।

নেতাজী অনুভব করলেন তিনি যদি একবার সৈন্যদের পিছনে ফেলে যান তা হলে জাপানীরা তাদেরকে তাদেরও পিছনে ফেলে রাখবে—খেয়াই পেরোতে দেবে না। জাপানীদের ধাপ্পাবাজিতে তিনি আর ভুলছেন না।

বললেন, আমার সৈন্যদল না গেলে আমি যেতে পারি না।

যেতে পারি না তো—যাবেন কিসে?

যেমন এসেছি এতদিন—তেমনি পায়ে হেঁটে।

আবার রাত্রে হাঁটা-পথে পনেরো মাইল। ত্রিরিশে এপ্রিলে ভোরে মার্তবান।

মৌলমিনের আর দেরি নেই। মৌলমিনে পৌঁছুলে বুঝি হাঁটা-পথের অবসান হবে।

পয়লা মে সকালে মৌলমিন!

মৌলমিনে পৌঁছেও জিরোবার সময় নেই নেতাজীর। রাণীবাহিনীর মেয়েদের জন্যে ট্রেন জোগাড় করলেন, এ ট্রেন সটান ব্যাঙ্কক যাবে। সঙ্গে রইলেন জেনারেল চ্যাটার্জি আর কর্ণেল

মালিক।

বীরাঙ্গনাদের প্রতপ্ত আভিনন্দন জানিয়ে নেতাজী বললেন, ব্যাঙ্ককে পৌঁছে তোমরা আবার নতুন করে কর্মোদ্যত হবে। যতক্ষণ উদ্যতি ততক্ষণ যুদ্ধ আর যতক্ষণ যুদ্ধ ততক্ষণ পরাজয় বলে কিছু নেই। পলায়ন অর্থ অবসান নয় শুধু নতুন করে আক্রমণ করবার প্রস্তুতি নেওয়া। স্তিমিত শিখাই আবার অনুকূল বাতাসে দাবানল হয়ে উঠবে।

মেয়েদের রওনা করিয়ে দিয়ে পরদিন ছয়ুই মে নেতাজী ব্যাঙ্কক রওনা হলেন। তাঁর একটা রেল-মোটর জুটল। অন্যান্যদের জন্যে ট্রেন।

ব্যাঙ্ককে শিল্পপতি সেবকরাম মাঠানি নেতাজীকে তার বাড়ি ছেড়ে দিল। অফিসারদের জন্যে পাওয়া গেল অন্য বাড়ি। ব্যাঙ্ককে এসে নতুন কাজ হল আই-এন-এর যে যেখানে আছে তাদেরকে নানা পথে, বিচিত্র পথে ব্যাঙ্ককে টেনে এসে সমবেত করে তোলা। যে যুদ্ধের জন্যে যোগযুক্ত সে কখনো পরাভূত নয়।

কিন্তু এদিকে ইউরোপের খবর রোমাঞ্চকর। হিটলার আত্মহত্যা করেছে। আত্মসমর্পণ করেছে জার্মানি। জাপান আর কত দিন টিকে থাকবে?

আঠারোই জুন নেতাজী ব্যাঙ্কক ছেড়ে সিঙ্গাপুরে পৌঁছুলেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর যে সব সৈনিক শহীদ হয়েছে তাদেরই স্মরণ-স্তম্ভের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন। ইতিহাসে তাদের নাম নেই শুধু স্মরণে-মননেই তারা আয়ুষ্মান। তারা মূর্তি নয়, তারা মূর্ছনা।

সিঙ্গাপুর থেকে সেরামবামে ছুটে গেলেন নেতাজী। সেখানে আজাদ হিন্দের সমর-শিক্ষার আস্তানা। জরুরি কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার কথা, কিন্তু আটকে গেলেন। এক চীনী মেয়ে-গোয়েন্দা এক আজাদ হিন্দ অফিসারকে ফুসলে কতকগুলি সামরিক তথ্য সংগ্রহ করেছে সেই দায়ে অফিসার আর গোয়েন্দা দুজনেই সামরিক আদালতে অভিযুক্ত হয়েছে। সামরিক আদালতের বিচারপতিরা তিনজনেই আজাদ হিন্দের লোক। জাপানীরা চাপ দিচ্ছে বিচারপতিরা তাদের নিজের দেশের লোকের বিচার করুক, গোয়েন্দা-মেয়ের বিচার তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে, যেহেতু সে ভারতীয় নয়। সে জাপানীও নয়, নেতাজী মাঝে এসে পড়লেন: সে নারী, সে জননী—তাকে সামরিক আদালতের বাইরে কারু হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। ছয়ই অগাষ্ট আমেরিকা হিরোসিমায় পরমাণবিক বোমা ফাটাল।

কুয়ালালামপুর থেকে টেলিফোন এসেছে। মেজর জেনারেল কিয়ানী নেতাজীকে খুঁজছে।

কী খবর?

রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ও! এই কথা?

নেতাজী কি কোনো একসময় ভেবেছিলেন রাশিয়া যাবেন তাদের বন্ধুতার প্রার্থনায়? সে পথে তবে কাঁটা পড়ল। তবে তিনি পৃথবীর কোন ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাবেন? ভয় কী, তিনি যেখানে দাঁড়াবেন সেই মাটিই তাঁর আশ্রয়. তাঁর অপ্রাময় প্রতিজ্ঞাই তাঁর জয়পতাকা।

দুদিন পরে বারোই অগাষ্ট জাপান আত্মসমর্পণ করল।

আমরা এখন কী করব ?

'আমরা যা করছি তাই করব। আমরণ যুদ্ধ করব। আমরা হার মানব না। কারুর ধার ধারব না। আমরা একেশ্বর। শোনো': নেতাজী সহজ হলেন: 'জাপানের আত্মসমর্পণ অর্থ আজাদ হিন্দ সরকারের আত্মসমর্পণ নয়। জাপান চূড়ান্ত নতিস্বীকার করতে পারে কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ যুদ্ধও আছে আর যুদ্ধের শেষে জয়ও আছে।'

একে-একে নিবেছে দেউটি। ইটালি গিয়েছে, জার্মানি গিয়েছে, জাপানও গেল। পৃথিবীতে আজাদ হিন্দ সরকারই একমাত্র স্বাধীন ও স্বীকৃত সরকার যে একা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত। অক্ষশক্তি যাক কিন্তু আমরা একাই অক্ষৌহিনী।

সেই দিনই সেরামবাগ থেকে সিঙ্গাপুরে ফিরলেন নেতাজী। খোলা মাঠে রাণীবাহিনীর মেয়েরা নাটক করছে—'ঝাঁসির রাণী', তাই দেখতে গেলেন। ভরে উঠলেন আনন্দে।

যে মেয়েটি রাণী সেজেছিল সেও তো পায়ে হেঁটে এসেছে। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি মেয়েটিকে আশীর্বাদ করলেন: তোমার জীবন ও তুমি ঐ রাণীর মত স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে বিসর্জন দাও।

কর্ণেল স্ট্র্যাচি ইঞ্জিনিয়র। তাকে ডেকে পাঠালেন নেতাজী। শহীদস্তম্ভের জন্যে একটা মডেল তিনি নির্বাচন করেছেন। একটি ত্রিশীর্ষ স্তম্ভ—যেন বা একটি ত্রিচূড় মন্দির। গায়ে তিনটি শিলালিপি—ইত্তেফাক, ইতমদ আর কোরবানি—এক প্রাণ, সত্যবান আর আত্মদান। বললেন, ইংরেজ বাহিনীর আসবার আগেই এটা নির্মিত দেখতে চাই। পারবে ?

স্ট্র্যাচি সময়ের হিসেব করতে গেল না, একবাক্যে বললে, পারব।

সমুদ্রতীরে ভিত্তিস্থাপন করা হয়েছে, সেটা পূর্ণায়ত করতে হবে নিশ্চয়ই। এবং সেটা ইংরেজদের পদার্পণ করবার আগেই।

দৌড়ে ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে ফেলে নেতাজীর স্বপ্নকে মূর্তিমন্ত করে তুলল স্ট্র্যাচি। জানি অচিরেই একদিন ইংরেজ নামবে সিঙ্গাপুরে আর হয়তো মাউণ্টবেটেনের আদেশে শহীদ স্তম্ভ ভেঙে ফেলবে। কিন্তু প্রথম যখন নামবে তখন আমাদের এ স্তম্ভকে নমস্কার না করে পারবে না।

পনেরোই অগাস্ট বিকেলে টোকিও-রেডিও থেকে আত্মসমর্পণের সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হল। আর দেরি নয়, নেতাজীকে এই মুহূর্তেই সিঙ্গাপুর ছাড়তে হবে। ইংরেজের হাতে আর ধরা পড়া নয়। কিন্তু যাবেন কোথায় ? জাপানের আত্মসমর্পণের পর টোকিও যাবার মানে হয় না, রাশিয়ার দরজা একেবার বন্ধ তাই বা কে বললে, নয়তো মাঞ্চুরিয়া। চিরকাল অনিশ্চিতের পথে চলেছি, অজানা সুদূরে, এবারও না হয় তাই যাব।

কিন্তু যেতে হবে তো জাপানী বিমানে ?

তাতে কী। জানো তো আমি নিয়তিবাদী। আমার সঙ্গে যাবে কে ?

যাকে বলবেন সেই যাবে।

যাবে কর্ণেল হবিবর রহমান, প্রীতম সিং, আয়ার, দোভাষী নিগেশি আর ব্যাঙ্কক থেকে দেবনাথ আর আবিদ হাসান। মেজর জেনারেল কিয়ানী থাকবেন আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিনিধি হয়ে।

ষোলই অগাষ্ট সকাল সাড়ে-নটায় নেতাজীর প্লেন ছাড়ল। কোথায় যাচ্ছি কোন অকূলে

কেউ জানে না। শুধু সিঙ্গাপুরে আর নয় এটুকুই কেবল বোধগম্য হচ্ছে।

বেলা তিনটে নাগাদ প্লেন ব্যাঙ্ককে নামল।

দপ্তরে খবর পৌঁছুতেই মেজর জেনারেল ভোঁসলে গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন। নেতাজী ব্যাঙ্ককে এসেছেন, প্রবাসী ভারতীয়েরা দর্শনেচ্ছু হয়ে আসতে লাগল দলে-দলে। যে আসে সে আর উঠে যেতে চায় না, বাড়িতে আর তিলধারণের স্থান নেই। তারা শুধু দেখতেই আসেনি, শুনতে এসেছে। বলুন এর পরে কী করবেন, কোথায় যাবেন, স্বাধীনতার আর দেরি কত ?

স্বাধীনতার আর দেরি নেই। ঘোর অন্ধকারই প্রভাতের অগ্রদূত। আর আমি কী করব কোথায় যাব তা শুধু মহা-অজানা ঈশ্বরই জানেন।

জনে-জনে বহুতর জিজ্ঞাসা। প্রশান্তচিত্তে নির্বিচল ধৈর্যে সব প্রশ্নের অন্তরঙ্গ উত্তর দিচ্ছেন। এরই মধ্যে সকলের ও সব কিছুর খোঁজ খবর নিচ্ছেন, যে কটি রাণী-বাহিনীর মেয়ে পিছনে পড়ে গিয়েছিল তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করছেন। সাধ্যের মধ্যে কোথাও যেন কিছু পরিতাপের না থাকে। শেষ কাঁটাটিও যেন সস্নেহে তুলে দিয়ে যাই।

কে এ সঙ্ঘ-পুরুষ হয়েও আবার বিবক্ত পুরুষ। যুদ্ধলিপ্ত হয়েও বোধিদীপ্ত। শুধু ঈশ্বর-আশ্রিত নন ঈশ্বর উদ্বুদ্ধ।

মধ্যরাত্রে খাবার জন্যে সামান্য একটু সময় করে নিলেন। কিন্তু ঘুম কই? দুপুর রাত থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বারান্দায় বসে অফিসারদের সঙ্গে নানা আলোচনা। তারপর ঐ বারান্দায়ই একটা খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়লেন। পুরো একঘণ্টাও ঘুমিয়েছেন কিনা সন্দেহ, ওঠে পড়লেন। কি, তোমরা তৈরি ?

আমরা যাচ্ছি কোথায় ?

সায়গনে।

সেখানে পৌঁছে জাপানী ফিল্ড মার্শাল তেরাগুচির সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে এই পরিস্থিতিতে নেতাজী কতটা বিমান-সাহায্য পেতে পারে। এক, দুই, না, শূন্য। না কি আবার পদক্ষেপ।

ব্যাঙ্কক থেকে দুখানা বিমানে করে সবাই এল ব্যাঙ্কক। জাপানী অফিসাররাও ছিল সঙ্গে। তাই পথে কেউ রুখতে এল না।

সাইগন পৌঁছতে বেলা দশটা। উঠলেন এসে আজাদ হিন্দের স্থানীয় অফিসার নারায়ণ দাসের বাড়িতে। বাড়িতে পৌঁছেই স্নান করলেন নেতাজী, তারপর পাতা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। কত রাত ঘুমোননি গা মেলে।

কিন্তু নিয়তি দিল কই ঘুমুতে?

আধঘণ্টাটাক বাদে জাপানী লিয়াজঁ অফিসার কিয়ানো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। এক্ষুণি একটা জাপানী প্লেন সাইগন ছাড়ছে। তাতে একটা সিট খালি আছে। নেতাজী কি যাবেন ?

কারু ইচ্ছে ছিল না নেতাজীকে জাগানো হয়। কিন্তু খবরটা অত্যন্ত জরুরি। যত শীঘ্র সম্ভব নেতাজীর সাইগন ত্যাগ করে চলে যাওয়াই মঙ্গল।

নেতাজী উঠে বসলেন বিছানায়। জিজ্ঞেস করলেন, প্লেনটা যাচ্ছে কোথায় ?

কিয়ানো তা জানে না। তার কাছে তার খবর নেই।

যার কাছে খবর আছে তাকে পাঠিয়ে দিন। বললেন নেতাজী, কোথায় যাচ্ছি না জেনে

আমি প্লেনে উঠছি না।

আধঘন্টার মধ্যে জেনারেল ইসোদা ও ফিল্ড মার্শাল তারাগুচি মোটরে এসে হাজির। একটা রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন নেতাজী। বেরিয়ে এসে ডাকলেন স্টাফ-অফিসারদের।

শোনো, প্লেনে একটা মাত্র সিট খালি পাওয়া গেছে। তোমরা বলো ওটাতে আমি যাব?

আরেকটা সিট হয় না?

আমি বলেছি আরেকটা সিটের জন্যে। বললেন নেতাজী, কিন্তু তা হবে বলে মনে হয় না। না হলে কী হবে? আমি একা যাব? তোমাদের কী মত?

হ্যাঁ, আপনি একাই চলে যান।

নেতাজী একাই একটা লোকোত্তর রূপান্তর।

খানিকক্ষণ পরে পাশের ঘরে জাপানীদের সঙ্গে আরো একটু কথাবার্তা সেরে এসে বললেন, আরেকটা সিট পাওয়া যাচ্ছে। হবিবর, তুমি আমার সঙ্গে চলো।

বিমানবন্দরে সবাই এসে পৌঁছুল তড়িঘড়ি।

নেতাজী আর হবিবর রহমান উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

জয় হিন্দ। সবাইকে প্রগাঢ় অভিবাদন জানালেন নেতাজী।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর অফিসাররা আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠল: জয় হিন্দ।

সতেরোই অগাস্ট, বিকেল পাঁচটা পনেরো মিনিটে প্লেন ছাড়ল। প্লেনটা যতক্ষণ না বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল আকাশে, দূর দিগন্তে তাকিয়ে রইল সবাই। কিন্তু কোথায় চলেছেন নেতাজী কেউ কোনো ঠিকানা পেল না।

জানো আমার কী রকম মৃত্যু পছন্দ? ফরোয়ার্ড ব্লকের নাথালাল পারিখকে একবার নেতাজী প্রশ্ন করেছিলেন।

পারিখ কী বলবে? তার বম্বের বাড়িতে নেতাজী অতিথি হয়ে আছেন, এখন মৃত্যুর কথা কেন?

মেরিন ড্রাইভ ছেড়ে সমুদ্রের দিকে এগোলেন নেতাজী। রাত প্রায় দুটো, জ্যোৎস্নায় চরাচর ভেসে যাচ্ছে, সহসা নেতাজীর সেই মৃত্যু জিজ্ঞাসা।

ধরো আমি ঐ সীমাশূন্য আকাশে খুব উঁচুতে উড়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটল আর আমি একছুটে নেমে এসে আমার ধরিত্রী-মার কোলে ঘুমিয়ে পড়লাম। এ মৃত্যু পরমরমণীয় নয়?

শত প্লেন ভেঙে পড়লেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র মারা যান না। তিনি অনির্দেশ্য পথে অজানার সন্ধানে চিরন্তন যাত্রী। তাঁর লক্ষ্য মানবমুক্তি লভ্য দিব্যতার রূপান্তর।

সুভাষের মৃত্যু নেই।

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে নিম্নলিখিত বইগুলির থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে: